ভূদেব গ্রন্থাবলী।

—:*:—

প্রথম খণ্ড।

—:০:—

পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ, ঐ ২য় ভাগ,
ঐতিহাসিক উপন্যাস, শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব, ভূদেব জীবনী,
বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.
RAJA RAMMOHUNPUR.

R SO.C
GA/2
(2 of 2

STOCK TAKING - 2011

24341
16 AUG 1968

ST - VERF

পারিবারিক প্রবন্ধ।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

মনুসংহিতা।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

সপ্তম সংস্করণ।

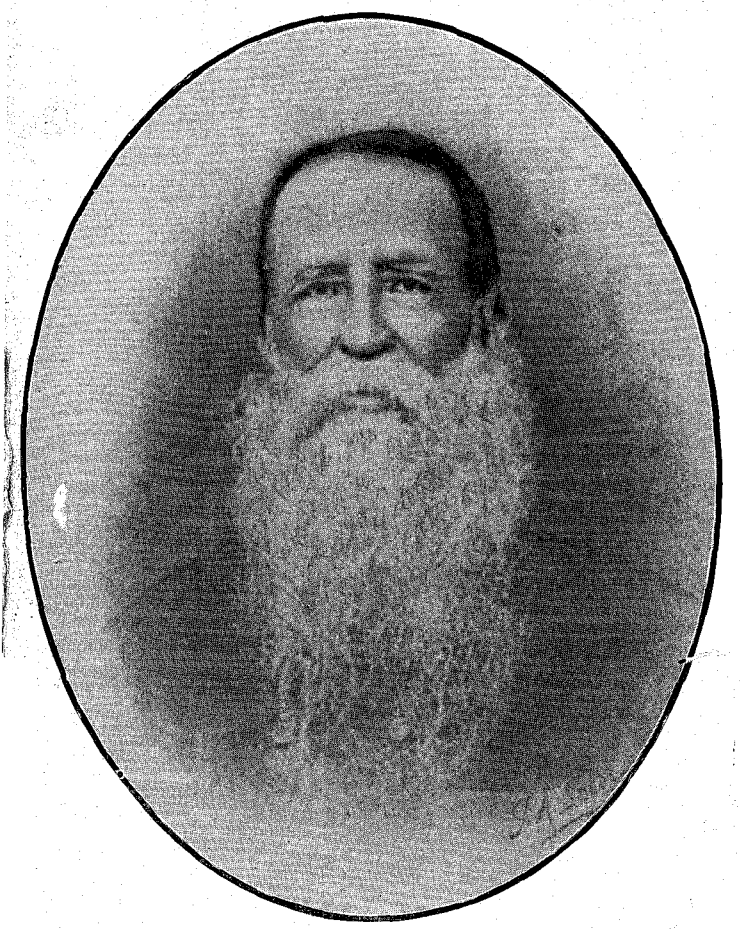
চুঁচুড়া।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।



পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

Indian Art School, Calcutta.

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ	৵০	জেঁয়াচ	৯৮
সূচনা	৷৵০	নিরপত্যতা	১০১
বাল্য বিবাহ	১	সন্তান পালন	১০৬
দাম্পত্য প্রণয়	৫	শিক্ষাভিত্তি	১১০
উদ্বাহসংস্কার	৯	সন্তানের শিক্ষা	১১৩
স্ত্রীশিক্ষা	১২	গৃহশূন্যতা	১১৯
সতীর ধর্ম্ম	১৪	দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ	১২৪
সৌভাগ্য গর্ব্ব	১৯	বহু বিবাহ	১২৭
দম্পতী কলহ	২৩	বৈধব্য ব্রত	১৩০
লজ্জাশীলতা	২৮	চির কৌমার	১৩৫
গৃহিণীপনা	৩২	ধর্ম্ম চর্য্যা	১৪০
গহনা গড়ান	৩৫	আচার রক্ষা	১৪৭
কুটুম্বতা	৪০	গৃহে ধর্ম্মাধিকরণ	১৫৩
জ্ঞাতিত্ব	৪৪	গৃহ কার্য্যের ব্যবস্থা	১৫৭
কৃত্রিম স্বজনতা	৪৯	কাজ করা	১৬১
অতিথি সেবা	৫৫	একান্নবর্ত্তিতা	১৬৬
পরিচ্ছন্নতা	৫৯	অর্থ সঞ্চয়	১৭৩
চাকর প্রতিপালন	৬২	চিনিতে পারিলেন না	১৭৭
পশ্বাদি পালন	৬৬	গৃহে মৃত্যু ঘটনা	১৮৩
পিতামহ ঠাকুর	৭০	ডাক্তার দেখান	১৮৮
পিতা মাতা	৭৩	রোগীর সেবা	১৮৮
পুত্র কন্যা	৭৬	ভোজনাদি	১৯৫
ভাই ভগিনী	৮০	শয়ন এবং নিদ্রাদি	১৯৯
পুত্রবধূ	৮৭	দলাদলি	২০৩
কন্যা পুত্রের বিবাহ	৯১	পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ	২০৭

পারিবারিক প্রবন্ধ।

উৎসর্গ

আমি কি? এবং কি জন্য হইলাম?—গাছে যেমন পাতা হয়, তেমনি হইয়াছি বইত নয়। আমার ঐ 'আমি' পদার্থটী কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির আবেশ বইত নয়। এখন আমার থাকাই কি?—আর না থাকাই বা কি?

মন যেন কি চায়, পায় না—কি যে চায়, তা জানেই না। যাহারা শৈশবে আমাকে কোলে পিঠে করিত এবং আপনাদের বলিত, তাহারা ত অনেকেই নাই—যাহারা আছে তাহারাও থাকিবে না। পৃথিবী শ্মশানভূমি—এখানে থেকে কাজ কি?

মনের এই ভাব, এমত সময়ে একটী দেবী মূর্ত্তি আমার সম্মুখীন হইল—আমার দুই চক্ষুতে দুই চক্ষু মিলাইল—আমার হাতে হাত দিল—বলিল 'আমি তোমার'।

'আমার' আছে।—তবে 'আমি' এক জন! আমি থাকিব, আমি করিব, আমি বাড়িব, আমি বাড়াইব। ইতি স্থিতি-বিধায়িনী—

অন্তর্দৃষ্টি অতীতকালের প্রতি ধাবিত হইয়া আর পৃথিবীকে শ্মশানভূমিরূপে দেখাইল না।—বর্ত্তমান কাল

দেবীর হাস্যপ্রভায় রঞ্জিত হইয়া আশার ফলকে চিত্রিত ভবিষ্যৎ কালের সহিত একীভূত হইল। ধরাতলে একটী রমণীয় আরাম প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। ঐ আরাম, দেবীর ক্রীড়া ভূমি। ইতি আশ্রম-বিধায়িনী—

ক্রীড়ারস অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ উদ্যানবাটিকার মধ্যে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। আদ্যাশক্তি আকর্ষণীর স্বরূপ উপলব্ধ হইল। জড় জগতে চিন্ময়তা দেখিলাম। ইতি লীলাময়ী—

মুখের হাসি আর মুখে ধরে না! প্রতি পাদবিক্ষেপে প্রসূনচয় প্রস্ফুটিত হয়; প্রতি দৃষ্টিপাতে হিমাংশুকিরণ বর্ষণ হয়। ইতি আনন্দময়ী—

কিছুরই অভাব নাই—কিছুরই অস্থিরতা নাই। সকলই যথাযথ। যাহাতে দৃষ্টি করেন তাহাই উথলিয়া উঠে। যাহাতে হাত দেন তাহাই শোভাময় হয়। ইতি গৃহলক্ষ্মী—

দেখিতে দেখিতে একটী একটী করিয়া কয়েকটী শিশু-মূর্ত্তি ঐ আরাম নিকেতনে দেখা দিল—উহাদিগের শরীরে তাঁহার এবং আমার উভয়ের অবয়ব একত্র সম্মিলিত দেখিলাম। হৃদয় মমতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ও গুলিকে নিতান্ত নিজস্ব জ্ঞান করিলাম। একান্তই আপনার মনে করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি বর-প্রদায়িনী—

বর পাইয়া কি আনন্দ এবং উৎসাহ! জড় জগৎকে স্পষ্ট চক্ষে চিন্ময় জগৎ দেখিলাম। নিজের শক্তিকে অপরিমেয়

বুঝিলাম। বিনা ভীতিকম্পনে এবং বিনা রাগপ্রকটনে চিত্তগিরি উন্নত হইতে হইতে যেন আকাশ ছুঁইতে চলিল এবং শ্রমশীলতা, কার্য্যতৎপরতা, পরিণামদর্শিতা সেইগিরির শিখরদেশে দৃঢ় হইয়া বসিল। ইতি সামর্থ্যবিধায়িনী—

কৈ?—একি হইল?—সেইটী—সেই সর্ব্ব প্রথমেরটী?—সেই সাক্ষাৎ দেবতুল্য শক্তিসম্পন্নটী?—সেই কোথায় গেল?—আর এখানে থাকিব না। বৃক্ষবাটিকা হইতে বাহির হইয়া সে যথা গিয়াছে সেই খানেই যাইব।—বাহির হই—হাত বরিলেন—নিকটে একটী গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। দেখিলেন গাছটীর তলায় অনেকগুলি অপক্ক কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রু-পূর্ণ নয়নে বাষ্পাদিগ্ধ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'মুকুল যত হয় ফল তত হয় না'। তথ্য বুঝিলাম। থামিলাম। ইতি প্রবোধদায়িনী—

এ কি হইল?—তিনি কৈ?—যে সকলকে এই নিতান্ত আমার বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদিগকেও ত আর তত আমার বলিয়া মনে হইতেছে না! সকলেই যেন আমা হইতে দূরগত হইতেছে! আমি আবার জগতে 'একা'!- আবার আমার পৃথিবী 'শ্মশান'! যেমন হৃদয় মধ্যে এইরূপ ভাবিলাম, অমনি তথায় অশরীরিণী বাণী নিঃসৃত হইল।—"শোকে মুগ্ধ হইও না—তুমি আর তেমন 'একা' হইতে পার না, তোমার পৃথিবী আর তেমন 'শ্মশান' হইতে পারে না।—তোমার হৃদয় শূন্য নাই—তুমি

পৃথিবীকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াই জানিয়াছ"। ইতি হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী—

পৃথিবী এখনও আমার কর্ম্মক্ষেত্র? আমি কি জন্য এবং কাহার জন্যই বা কাজ করিব? আমার বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমার সাহস নাই—অমনি হৃদয়বাণীও শুনিলাম—'পৃথিবী শ্মশানও নয়, আবাস বাটিকাও নয়। ইহা যে কর্ম্মক্ষেত্র তাহা তুমি শিখিয়াছ। তোমার সাহস নাই, ত সাহস আছে কার? যদি সাহস নাই তবে মরিতে ভয় কর না কেন?" ইতি যম-ভয়-বারিণী—

যে প্রকৃতিশক্তি উল্লিখিত দশবিধ রূপে আমার প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে বঙ্গবাসী স্ত্রী পুরুষের হস্তে এই পুস্তক খানি সমর্পণ করিলাম।

লেখক।

সূচনা।

আকাশমার্গে সূর্য্যের গমন হইতেছে; তুমিও দেখিতেছ, আমিও দেখিতেছি। কিন্তু সূর্য্যের যে রশ্মিবিশেষ তোমার নেত্রমুকুরে পতিত হইয়া তথায় সূর্য্য প্রতিবিম্ব জন্মাইতেছে, আমার নেত্রমুকুরে সূর্য্যের সেই রশ্মি পড়িয়া সূর্য্যদর্শন জ্ঞান জন্মাইতেছে না। আমরা উভয়েই একই সূর্য্যের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি। সকলের পক্ষেই এইরূপ। যে সূর্য্যকে দেখিতেছে, সে আপন নেত্রসংলগ্ন রশ্মিবিশেষের দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতেছে, অন্যের নেত্রসংলগ্ন রশ্মিদ্বারা দেখিতেছে না।

মনুষ্যের সম্বন্ধে সত্যের অববোধও অবিকল ঐ প্রকার। যেমন সূর্য্যও এক, তেমনি সত্যও এক। কিন্তু এক ব্যক্তি সত্যের যে অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অপরে ঠিক সেই অভিজ্ঞানটী পায় না। আমি যে প্রকার শরীর এবং প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং যেরূপ শিক্ষা এবং যেরূপ সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইগুলিই আমার পক্ষে সত্যোপলব্ধির রশ্মিস্বরূপ হইয়াছে। তুমি পিতৃমাতৃ স্থানে যে প্রকার দেহ এবং স্বভাব অধিকার করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, এবং যেরূপে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইয়াছ, তাহাই তোমার সত্যজ্ঞান লাভের উপায়। প্রতিব্যক্তির অভিজ্ঞতা ভিন্ন, সুতরাং সত্যোপলব্ধির পথও ভিন্ন।

বিভিন্ন রশ্মিসংযোগজাত বিভিন্ন সূর্য্য প্রতিবিম্ব যেমন সাধারণতঃ এক-বিধ—এমন একবিধ যে, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতীতি কিছুমাত্র ভিন্ন বলিয়া মনে হয় না; সেই প্রকার কোন দুই জনের অভিজ্ঞতা ঠিক একরূপ না হউক, তথাপি এত একরূপ হয় যে, প্রায় সকল বিষয়েই পরস্পরের কথোপকথন এবং মনোগত ভাবের বিনিময় অব্যাঘাতে চলিতে পারে। আমার অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে, তোমার অভিজ্ঞতাও তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিতেছে, এরূপ বোধ না থাকিলে মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি হইত না—দেশভাষা জন্মিত না

—পরস্পর কথাবার্ত্তা থাকিত না—বাদানুবাদ চলিত না—গ্রন্থরচনাও হইত না।

অস্মজ্জাতীয় পারিবারিক অবস্থা এবং ব্যবহার বিষয়ে আমি যেরূপ দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, এবং করিয়াছি, অন্য কেহই অবিকল সেইরূপ দেখেন নাই, বুঝেন নাই, এবং করেন নাই সত্য; কিন্তু যাহা আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট, উপলব্ধ, এবং কৃত হইয়াছে, তাহা অন্যের দর্শন, অববোধ এবং কৃতি হইতে নিতান্ত ভিন্ন হইতেও পারে না। এরূপ বুঝিয়া লইতে না পারিলে, আমি এই প্রবন্ধ কয়েকটী জনসমাজে প্রচারিত করিতাম না।

আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যে জন্য এবং যেরূপে ভাল লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তির মনেও স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহা বোধ হইলে এই পরাধীন, হীনবীর্য্য, অবজ্ঞাত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা চিরন্তন বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্ম্ম প্রণালীই বল, সামাজিক প্রণালীই বল, আর শাসন প্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদান-ভূত।

আমাদিগের পারিবারিক সুখ অধিক—এটী নিতান্ত অল্প কথা নয়; যদি পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্ম্মও অধিক এবং ধর্ম্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমশালিতাও জন্মিতে পারে।

পারিবারিক প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ।

বাল্য-বিবাহ।

এক্ষণে অনেকে বাল্য-বিবাহ প্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক বিবেচনাপূর্ব্বক চলিতে না পারিলে বাল্য-বিবাহ হইতে যে কতকগুলি গুরুতর দোষ ঘটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্য বিবাহের যেমন দোষ আছে, তেমন গুণও আছে। যাঁহারা বাল্য-বিবাহপ্রণালীর কেবল দোষ মাত্র দেখেন, ইহার গুণ দেখিতে পান না, তাঁহাদিগকে ইংরাজদিগের নির-বচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষু বলিলে অন্যায্য গালি দেওয়া হয় না।

সম্প্রতি একজন সরলচেতা বহুদর্শী ইংরাজের সহিত বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। ক্ষণকাল বিচারের পর তিনি বলিলেন, বাল্য-বিবাহ প্রণালীতে জাতিগত শান্তি ও ব্যক্তিগত সুখের আধিক্য এবং বয়োধিক বিবাহ প্রণালীতে জাতিগত উদ্যম ও ব্যক্তিগত ওজস্বিতার আধিক্য লক্ষিত হয়। এই কথা বলিয়া তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধানের কোন পথই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি বলিলাম, আমাদিগের প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা বোধ হয় ঐরূপ সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই স্ত্রীর বয়স কম এবং পুরুষের বয়স অধিক রাখিয়া উদ্বাহপ্রণালীর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ, দ্বাদশবর্ষীয়া মনোমত কন্যার পাণিগ্রহণ করি-বেন। ইংরাজটী বলিলেন—তাহা হইলেও হইবে না—অপক্ক মাতৃশরীর-প্রসূত সন্তান সুস্থ এবং সবলকায় হইবে না। আমি বলিলাম, আপনা-দিগের ভাষায় পশুপালন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে

কোন নব্য এবং বহুজনসম্মত গ্রন্থে ওরূপ কোন কথা নাই—পিতৃশরীর যথাযোগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই সন্তান পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ এবং সবলকায় হইতে পারে, পশুজনন বিধানে এই মত। ইংরাজটি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরিপাক অল্প বয়সেই হয় বটে—সুতরাং পুরুষের বয়স অধিক এবং স্ত্রীর বয়স কম রাখিয়া বিবাহ দেওয়াই বিধেয় এবং তাহাতে সকল দিকই বজায় থাকিতে পারে দেখিতেছি—প্রণয়, শান্তি এবং সুখ অধিক হয়, উদ্যম এবং ওজস্বিতা জন্মিবারও অবসর থাকে, এবং সন্তানও বলহীন হয় না। আমি বলিলাম বর্ত্তমান অবস্থাতেও হিন্দু দম্পতীর পিতৃমাতৃগণ কিঞ্চিৎ পরিণামদর্শী হইলে এবং তাঁহারা স্বয়ং একটু তপস্তাপরায়ণ হইলে ঐ সকল শুভফল দর্শিতে পারে।

মোটামুটি ভাবিতে গেলেও বয়োধিকদিগের বিবাহটা যেন কেমন কেমন দেখায়। ১৯।২০ বৎসরের যে যুবতী ২৪।২৫ বৎসরের একজন পুরুষকে লইয়া আপনার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, প্রভৃতি আশৈশব সহচর সমস্তকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি যে কেমন "লজ্জাভয়বিভূষণা" তাহা অনুভব করিতেও পারা যায় না। ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুইটীকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটী নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে? বয়োধিকদিগের মন পাকিয়া যায়, অভ্যাস স্থির হইয়া দাঁড়ায়: চরিত্র নির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন করে; তাহারা কি আর তেমন পরস্পরে মিলিয়া একতাসম্পন্ন হইতে পারে? ফলতঃ দম্পতীর পরস্পর প্রণয়াধিক্য উৎপাদন করাই যদি উদ্বাহ প্রণালীর মুখ্যতম সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তবে বাল্য-বিবাহ যে বয়োধিক বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় থাকে না। ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। মা বাপের প্রতি, ভাই ভগিনীর প্রতি, খেলুড়িদিগের প্রতি মনটী যেমন কোমলভাবাপন্ন থাকে, বয়স হইলে যাহাদিগের সহিত পরিচয় হয়, তাহাদিগের কাহারও প্রতি প্রায়ই মন তেমন হয় না। ছেলেবেলার বন্ধুদিগের কোন দোষই ধরিতে ইচ্ছা হয়

না। তাহারা যাহা করে, তাহাই ভাল; যাহা বলে তাহাই মধুর। তাহাদিগের কাহাকেও দেখিলে, ভাবিলে, কাহার নাম মাত্র শুনিলে, মন সরল এবং আর্দ্র হইয়া পড়ে। এবং ছেলেবেলার সময় দাম্পত্য প্রণয়ের বীজ বপন না করিয়া যাহারা বিলম্ব করে, তাহারা প্রণয়পীযূষের প্রকৃত রসাস্বাদনে নিতান্ত বঞ্চিত থাকে।

বয়স হইয়া বুদ্ধির পরিপাক জন্মিলে পরস্পর স্বভাব চরিত্র বুঝিয়া যুবক যুবতী বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, এই যে একটী কথা আছে; উটী কথার কথা মাত্র। অন্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নয়। ঐ কার্য্যে অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯—২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪—২৫ বৎসরের পুরুষের ত কথাই নাই। ঐ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবলা, কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী, এবং অনুরাগ একান্ত উন্মুখ। পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা ঐ সময়ে অকর্ম্মণ্যপ্রায় থাকে। একটী সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ, একটী মৃদু মধুর হাস্য, একটী অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য, হঠাৎ মনোদুর্গ অধিকার করিয়া লয়; স্বভাব, চরিত্র, রুচি, পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেয় না। এই জন্য অধিক বয়সে বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না।

দেখ, যে দেশে অধিক বয়সে পরিণয়ের নিয়ম, সেই দেশেই পরিণয়োচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রচলিত *। যদি প্রকৃতরূপে স্বভাবাদির পরীক্ষা হইতে পারিত তবে ওরূপ হইবে কেন? ফলতঃ অন্ধ অনুরাগ প্রণোদিত উদ্বাহ বন্ধনে প্রকৃত প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা বিরল। সেই জন্যই কারণান্তর উপস্থিত হইয়া ঐ বন্ধনের রক্ষা এবং দৃঢ়তা সম্পাদন না করিলে উহা স্বতঃই বিচ্ছিন্ন এবং স্খলিত হইতে পারে। ইংরাজেরা অধিক বয়সে বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা আছে। ঐ ব্যবস্থা তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ সহজ নয় বলিয়া ইংরাজেরা আজি কালি বড়ই দুঃখিত। মার্কিনদিগের দেশেও অধিক বয়সে বিবাহ করিবার

* কনেকটিকট প্রদেশে প্রতি দশটীর মধ্যে একটি, কালিফর্ণিয়ায় প্রতি শতটীর মধ্যে একটী বিবাহের বিচ্ছেদ হয়।

নিয়ম। সম্প্রতি ঐ দেশে বিবাহ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনেকে মত প্রচার করিতেছেন। যদি ঐ সকল দেশে উদ্বাহবন্ধন সুখের বন্ধন হইত, তবে ঐ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য এত যত্ন এবং এত আগ্রহ কেন হইবে? বস্তুতঃ যেখানে যত অধিক বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেই খানেই ঐ প্রকার গোলযোগ অধিক পরিমাণে ঘটিতেছে। উহা অধিক বয়সে বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া ধরা যায়।

স্পেন, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোকেরাও ত লেখা পড়া শিখে কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় ঐ সকল দেশে এ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমার বিবেচনায় ঐ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া দম্পতীর পরস্পর প্রণয় অধিক।

কোন কোন ইংরাজ পর্য্যাটক বলেন বটে যে, স্পেন ইটালী প্রভৃতি যে সকল দেশে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় কার্য্যতঃ উদ্বাহ-বন্ধন নিতান্ত শিথিল। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উচ্ছৃঙ্খল এবং ভ্রষ্টাচার। কিন্তু ঐ সকল পর্য্যাটকেরা সাধ্বী স্ত্রী জাতির পবিত্র আবাস ভূমি ভারতবর্ষের প্রতিও ঐ প্রকার কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে লঘুপ্রকৃতিক মনে করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত কথা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করাই যুক্তিসঙ্গত।

যে দেশে বয়োধিক হইলে বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহবন্ধন শিথিল এবং দম্পতীপ্রণয় অন্ধ অনুরাগমূলক বলিয়া অচিরস্থায়ী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

—:: ** ::—

দাম্পত্য প্রণয়।

প্রণয় পদার্থটী কি? তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বলা বড় কঠিন। প্রণয়ের বর্ণনায় এত সঙ্গীত, কাব্য এবং আখ্যায়িকা বিরচিত হইয়াছে, এবং সেই রচনা সকল জনসাধারণের কথাবার্ত্তায় এমত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রণয় সম্বন্ধে রূপক এবং অতিশয়োক্তি অলঙ্কারবিবর্জ্জিত কোন কথাই প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। 'জগদীশ্বর প্রেমময়', 'প্রীতিপুষ্পই পরমেশ্বরের পবিত্র উপহার,' প্রণয়ই জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ', 'প্রণয়-সুখই স্বর্গসুখ,' 'যাহার শরীরে প্রেম আছে, সে জীবন্মুক্ত'—এবম্বিধ বাক্য সমস্ত বোধ হয়, পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষাতেই প্রচলিত। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল বাক্য হইতে সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের বোধসুলভ কোন বিষয়ে ভাবার্থই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'জগদীশ্বর' 'পরমেশ' 'স্বর্গ' 'মুক্তি' এই সকল শব্দ অনাদি এবং অনন্ত পদার্থ সকলকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মনুষ্যের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সকল অসীম পদার্থের সমগ্রতা ধারণায় একান্ত অশক্ত। সুতরাং ঐ সকল শব্দ দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পদার্থের সুপরিস্ফুট অববোধ হইতে পারে না। 'জীবনের জীবন' 'প্রাণের প্রাণ' প্রভৃতি শব্দও ঐ দোষে দূষিত। জীবন এবং প্রাণ কি? তাহাই আমরা জানি না, তবে জীবনের আবার জীবন, প্রাণের আবার প্রাণ কি তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

অতএব সাধারণতঃ প্রণয় শব্দে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বলিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা যে গাঢ়তম প্রেম স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পাই, তাহারই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিব। দাম্পত্য প্রেমই সংসারী জীবের পক্ষে সকল প্রেম অপেক্ষা অধিক প্রগাঢ়। শাস্ত্রকারেরা, কবিরা এবং উপন্যাসরচয়িতারা পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়কেই স্বর্গীয় প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় তাদৃশ কোন সম্বন্ধ ঘটিলেই যে মুক্তি-

ফললাভ হয়, ইহা পরম ভাগবতদিগের অভিমত; দাম্পত্য প্রণয়টী কিরূপ? ইহা অতি উপাদেয় পদার্থ বটে, কিন্তু উহার প্রধান প্রধান উপাদান কি?

দাম্পত্যপ্রণয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ দম্পতীর পরস্পর মনোগত আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের একটী হেতু শরীরী জীবের শারীর ধর্ম্মবিশেষ। এটী স্বতঃসিদ্ধ বস্তু—মৌলিক পদার্থ—ইহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্মতর কোন মূল পাওয়া যায় না।

আকর্ষণের দ্বিতীয় হেতু সৌন্দর্য্যোপলব্ধি। পত্নী পতিকে এবং পতি পত্নীকে সুন্দর দেখিবে—অপর সকল পুরুষ অপেক্ষা অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখিবে; প্রণয়ের এই উপাদানটী নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। দেখ, পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকের সৌন্দর্য্যাববোধ সমান নয়। সকলের সমান হওয়া দূরে থাকুক, বোধ হয়, কোন দুই জনের সৌন্দর্য্যোপলব্ধি সর্ব্বতোভাবে এক হয় না। যদি সকল স্ত্রী এবং সকল পুরুষ চিত্রবিদ্যার পারগ হইত, এবং সকলেই আপনাপন ইচ্ছানুরূপ সুন্দর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারিত, তবে কোন দুইখানি চিত্র অবিকল একরূপ হইত না। সৌন্দর্য্যাববোধের অন্তরে স্নেহ ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মনোভাব সমস্ত গূঢ়রূপে নিহিত থাকে। সুতরাং সৌন্দর্য্যবোধ শক্তিটী প্রাণিমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ঐ শক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতে পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হয়। মনে কর, যখন তোমার পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তোমার মাতা একটী প্রতিবেশিনীর কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন। সেই কামিনী তোমার বাল্যক্রীড়ার সহচরী ছিল। তোমরা দুই জনে বর কন্যা সাজিয়া খেলা করিতে। তুমি তাহাকে ভাল বাসিতে। ভাবিয়া দেখ, তাহার সেই মুখ খানি, সেই চক্ষু দুইটী, অদ্যাপি তোমার মনে সুন্দর মুখ এবং সুন্দর চক্ষুর আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। ফলকথা, অবস্থা, শিক্ষা, সংসর্গ প্রভৃতির গুণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই কথারও মূল কথা—জগতে কিছুই অসুন্দর নাই। নারায়ণ—বিশ্বব্যাপী এবং লক্ষ্মী—শোভাদেবী—তাঁহার বক্ষঃস্থলোপরি বিরাজিতা। দ্রষ্টার অবস্থানভেদে শোভাদেবীর কোন অঙ্গ—কাহার নয়নাকর্ষণ করে, কোন অঙ্গ নয়নাকর্ষণ করে না। কেহ বা তাঁহার সুপ্রসন্ন

কপোলদেশ, কেহ বা তাঁহার আনন্দোদ্দীপক আয়ত লোচন, কেহ বা তাঁহার সুগোল করযুগল, কেহ বা তাঁহার চরণপদ্ম দর্শন করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। অসুন্দর পদার্থ কেহই ভাল বাসে না। কিন্তু সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিও কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। পূর্ণ জ্ঞানানন্দ এবং পূর্ণ শোভা অভিন্ন পদার্থ।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আকর্ষণের তৃতীয় হেতু অন্যোন্যের গুণোপলব্ধি। সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, গুণের সম্বন্ধেও সেই সকল কথা সঙ্গত। পৃথিবীতে সম্যক্ গুণহীন কেহ নাই। তবে তোমার পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, সেই প্রয়োজন যিনি পূরণ করিতে পারেন—তিনিই তোমার পক্ষে গুণশালী। তুমি তাঁহার গুণই দেখিতে পাও, সেই গুণেরই বশীভূত হও। বস্তুতঃ গুণের উপলব্ধি সৌন্দর্য্যের উপলব্ধির ন্যায়, মনুষ্যের অবস্থা-ভেদে ভিন্ন হয়। যাহা অবস্থাভেদে ভিন্ন হয়, তাহা অবশ্যই শিক্ষার সাপেক্ষ; সুতরাং মনুষ্যের যত্নের আয়ত্ত। যদি এরূপ হইল, তবে দম্পতীর পরস্পর প্রণয়াকর্ষণের তিনটী হেতুই আমরা ইচ্ছানুরূপ প্রয়োগ করিতে পারি! আমরা একটী কুমার এবং কুমারীকে এমন ভাবে অবস্থাপিত করিতে পারি যে, (১ মতঃ) তাহারা যথাকালে স্বতঃসিদ্ধ শারীর ধর্ম্মপ্রভাবে পরস্পরে সমাকৃষ্ট হইবে; (২ য়তঃ) তাহারা অন্যোন্যের সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিবে, এবং (৩য়তঃ) তাহারা পরস্পর গুণের আতিশয্য এবং উৎকর্ষ অনুভব করিবে।

আমাদিগের মধ্যে যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইয়া আছে, তাহাতেই দাম্পত্য প্রণয় সঞ্চারিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় আমাদিগের নিজের হাতে আছে। বাপ, মা এবং শ্বশুর, শাশুড়ী, নিতান্ত নির্ব্বোধ, নীচাশয় অথবা দুষ্ট-প্রকৃতিক না হইলে তাঁহারা অনায়াসেই পুত্র পুত্রবধূ এবং কন্যা জামাতার পরস্পর প্রণয়সঞ্চারের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারেন। শ্বশুর শাশুড়ী জামাতার প্রতি অনুরাগবদ্ধ হইয়া তাঁহার রূপগুণাদির প্রশংসা করিবেন; বাপ মা, পুত্রবধূর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহসম্পন্ন হইয়া তাঁহার রূপ গুণের ব্যাখ্যা করিবেন। ভাল দেখিব মনে করিলেই ভাল দেখা যায়। এইরূপে জামাতৃ কন্যার এবং পুত্র পুত্রবধূর মন পরস্পরের রূপ

গুণ দর্শনে উন্মুখ করিয়া দিতে হইবে। উন্মুখ হইলেই দেখিতে পাইবে, এবং দেখিলেই পরস্পরে আকৃষ্ট, প্রণয়রসে অভিষিক্ত এবং সৌহার্দ্দবন্ধনে সম্বদ্ধ হইবে। এই জন্যই আমাদিগের দেশে দাম্পত্যপ্রণয়টী দুষ্প্রাপ্য বনফল নয়। ইহা বাল্যবিবাহ ক্ষেত্রে যথোচিত কর্ষণ এবং সেচনের ফল। এই জন্যই ইহা এত সরস এবং এত সুমিষ্ট।

'প্রণয় আমাদিগের অনায়ত্ত মনোভাব' ইহা হঠাৎ সবলে আকর্ষণ করিয়া সমস্ত মনোভাণ্ডার বিলুণ্ঠিত করে,—'ভালবাসা স্বাধীনভাব' ইহাকে কেহই ইচ্ছার বশীভূত করিতে পারে না,—এই সকল কথায় যে কত উচ্ছৃঙ্খলতার এবং অনিষ্টাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সকল উপদেশের প্রভাবে কত সুখের ঘর উৎসাদিত, কত পবিত্র আত্মা কলঙ্কিত ও কত সুন্দর বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে! এই সকল মত অনেক দুঃখ এবং দুশ্চরিত্রতার হেতুভূত।

আমার বিবেচনায় ভালবাসা জিনিসটী নরনারীর শিরোভূষণ মুকুট-স্বরূপ। উহা পথে ঘাটে যেখানে সেখানে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। উহাকে বহু যত্নে গড়াইয়া পরিতে হয়। ভালবাসাটী প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্ম। উহা একেবারে ফাঁপিয়া উঠে না। উহা অতি অল্পে অল্পেই উঠে—আদৌ নাল পরে বৃন্ত, অনন্তর মুকুলভাবে অবস্থিত হয়, এবং পরিশেষে বায়ু, সলিল, তাপের সহযোগে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। ভালবাসা পদার্থটী অভীষ্ট দেবতা। গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধিলাভ হয় না। জপ, তপ, ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে ক্রমে মন্ত্র চেতন এবং তপঃ-সিদ্ধি হয়।

আমাদিগের পক্ষে প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় লাভ করিবার যত সুবিধা, এমত আর কোন জাতির নাই। যাঁহারা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সুখময়, ধর্ম্মময়, আনন্দময়, দাম্পত্য প্রেমলাভের অধিকারী হইয়াও মায়াবিনী অনুচিকীর্ষা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয়েন, তাঁহাদিগের কি বিড়ম্বনা!

তৃতীয় প্রবন্ধ।

— :*::*:—

উদ্বাহ সংস্কার।

আমাদিগের দেশে বিবাহ না করিয়া কেহই থাকে না; তাহাতে দেশের যে প্রকার অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা এস্থলে আমার উচিত নহে। উদ্বাহ-সংস্কার কি জন্য সংস্কার অর্থাৎ পবিত্রতাসম্পাদক হইল, তাহারই কিঞ্চিৎ দেখাইয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রচল অহং বিন্দু। আপনার চক্ষু খুলিলেই সৃষ্টি, চক্ষু মুদিলেই প্রলয়। আপনার সুখ অসুখ মনুষ্যের মনে যে প্রকার দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়, অন্য কাহার সুখ দুঃখ তেমন হয় না। কোন আত্মীয় ব্যক্তির মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায় সত্য, জগৎ শূন্যময় দেখিতে হয় সত্য, কিন্তু নিজের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দীপশিখায় দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ যে প্রকার জ্বালা বোধ হয়, এবং তাহাতে যে প্রকার তাপিত এবং ব্যস্ত হইতে হয়, অন্য কাহার দুঃখে তেমন জ্বালা অথবা তেমন উদ্বেগ সচরাচর অনুভূত হয় না। আমি দেখিয়াছি একজন বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেল-গাড়ীতে আসিতেছিলেন; আসিবার সময় তাঁহার চক্ষুকোণে রেণুপ্রমাণ কয়লার গুঁড়া পড়ে। আসিয়া দেখিলেন বন্ধুর বিয়োগ হইয়াছে; কিন্তু তিনি আপনার চক্ষু ধুইতেই ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবিয়োগযাতনা তৎকালে তাঁহার প্রায় কিছুই অনুভূত হইল না। তাঁহার চক্ষু হইতে যে জল পড়িল, তাহার কারণ বন্ধুবিচ্ছেদ নয়, কয়লার গুঁড়ার জ্বালা।

আমি এস্থলে পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক বীরপুরুষদিগের কথা বলিতেছি না; যাঁহারা স্বেচ্ছাতঃ জলদগ্নি মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখেন, অথবা স্বীয় সৌন্দর্য্যের নমুনা দেখাইবার জন্য স্বহস্তচ্ছিন্ন নিজ বাহু-ভাগ পাঠাইয়া দেন, কিম্বা দন্ত দ্বারা জিহ্বাগ্র ছেদন করিয়া ফেলেন, অথবা সহাস্য মুখে স্বশরীর ক্রকচ দ্বারা দ্বিধা করিতে দেন, সেই সকল নররূপধারী দেবতার কথা স্বতন্ত্র। সচরাচর যে সকল স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ দেখিতে

পাই, তাহাদিগের শারীরিক সামান্য ক্লেশ মানসিক বিপুল যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর হয় বলিয়াই বোধ হয়। ফলকথা, মনুষ্যসাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতারই যৎপরোনাস্তি প্রাবল্য। সেই প্রাবল্য উচিত কি অনুচিত, তাহাতে জগতের অপকার অপেক্ষা উপকার অধিক হইতেছে কি না সে বিষয়ের বিচার করা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু স্বার্থপরতা যতই বলবতী হউক, কোন মনুষ্যই উহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। প্রত্যুত সকলেই স্বার্থপরতাকে লজ্জাকর জ্ঞান করেন। লোকসমাজে যে সকল প্রশংসাবাদ প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে তাহার দুই একটী স্মরণ করিলেই এ বিষয়ে মনুষ্যমনের যেরূপ গতি, তাহা কতক বুঝা যাইতে পারে। 'অমুক আপনি না খাইয়া পরকে খাওয়ায়' 'অমুক নিজের দিক কিছুই দেখে না, কেবল হিতচিন্তা করে'—এই সকল কথাতেই বোধ হয় যে স্বার্থশূন্যতা বড়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু ও দিকে দেখা গিয়াছে, স্বার্থপরতা বড়ই প্রবল।

মনুষ্যমনে যখন এই স্ববিসম্বাদী ভাব বিদ্যমান, তখন মনুষ্যের পক্ষে সুখী এবং সন্তুষ্ট হওয়া যে কেমন দুরূহ ব্যাপার তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হইতে পারে। উহা অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা সর্ব্বদাই আপনার দিকে আকর্ষণ করিবে অথচ সেই আকর্ষণের বশীভূত হইলেই আত্মগ্লানি আসিয়া আবার লাঞ্ছনা করিবে। উভয় দিকেই সঙ্কট।

বিবাহ-প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় দ্বারা মনুষ্যদিগকে ঐ বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ দুই জনে প্রণয় সম্বদ্ধ হইলে পরস্পরকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া থাকে, এবং সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই আপনার স্বার্থসিদ্ধি হইয়া যায়। উত্তমরূপে পান ভোজন করিতে সকলেরই ইচ্ছা বটে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মসুখের জন্য সেই ইচ্ছার পূরণ করিতে গেলে 'শূয়ার পেটে খাওয়া হয়।' কিন্তু তুমি ভাল করিয়া খাইতেছ, ইহা দেখিয়া আর এক জনের আত্মা পুলকিত হইবে, এমন বুঝিয়া খাইলে আর 'শূয়ার পেটে খাওয়া' হয় না—দেবসেবা হয়। এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহের বেশ বিন্যাসের সময় অতিবাহিত করিতে কোন সহৃদয় ব্যক্তির লজ্জাবোধ না হয়

কিন্তু তুমি প্রিয়তমের আনন্দসম্বর্দ্ধনের অভিলাষে নিজ দেহের যত্ন করিতেছ, এরূপ ভাবিলে আর লজ্জার লেশ মাত্র থাকে না। প্রত্যুত ইহাই বোধ হয় যে, এই দেহের যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা অপেক্ষা কোটী গুণ অধিক না হইলে সেই জীবিতেশ্বরের চরণকমলযুগলে সমর্পণ করিবার যোগ্য হইবে না। ফিট ফাট্ করিয়া ফুলবাবু হইয়া থাকিতে কোন্ গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তির মনে লাগে? কিন্তু আমার হৃদয়ধাম সেই আনন্দময়ীর বিহার ভূমি, এই দেহ তাঁহারই পীঠস্থল, এরূপ মনে হইলে আর অপরিচ্ছন্ন অথবা অশুচি থাকিবার যো থাকে না। ধন ব্যয়ে যত সুখ, ধন রাখায় তত সুখ নাই। ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেই অপরের দুঃখমোচন দেখা যায়, লোকে যশোবিস্তার আরম্ভ করে, ধর্ম্মকার্য্য করিতেছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ধন রাখায় যাচকের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হয়, লোকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করে, এবং দানধর্ম্মের অনুযায়ী কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া মনে গ্লানি জন্মে। কিন্তু পুত্রকলত্রপরিবার সম্পন্ন ব্যক্তি পাছে তাঁহার সেই অবশ্যপোষ্যেরা দুঃখ পায় এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যয়সঙ্কোচ করেন এবং তাহা করিয়াও আত্মগ্লানির ভাজন হয়েন না।

আপনি খাইব, সুখ হইবে আর এক জনের; আপনি পরিব, তুষ্ট হইবে আর একজন; আপনি ধনসঞ্চয় করিব, আর একজনের ভাবী হিতসাধন হইবে, এই ভাবটী বিবাহ-প্রণালী হইতে অতি সহজে এবং সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বার্থ এবং পরার্থ মিলাইয়া দেওয়া বিবাহ সংস্কারেরই কার্য্য। বিবাহ দ্বারাই স্বার্থ বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়—এই জন্যই বিবাহ অতি প্রধান সংস্কার।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

স্ত্রী-শিক্ষা।

প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দটী থাকাতে এমন মনে হইতে পারে যে আমি বালিকা বিদ্যালয়ের পোষকতায় কোন কথা বলিব। বাস্তবিক আমার সে অভিপ্রায় নহে। লোকে আপনাপন পরিণীতা ভার্য্যাকে কিরূপ শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করিবেন, আমি তাহারই কয়েকটী কথামাত্র বলিব।

আমার মতে পৌরাণিক দুইটী আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য স্ত্রীদিগের প্রথম শিক্ষার বিষয়। প্রজাপতি দক্ষরাজের কন্যা সতী এবং গিরিশরাজ হিমালয়ের কন্যা উমা, ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পিতার ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ সত্ত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে দানব-নন্দিনী পৌলোমী দেবরাজ ইন্দ্রের গৃহিণী হইয়া যে সময়ে সপ্ত স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী সকলে রসাতলেও নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পান নাই। এই দুইটী বিবরণ হইতে স্ত্রী ইহাই শিখিবেন যে, মা, বাপ, ভগিনী ইহাঁদিগের সম্পদ বা অসম্পদ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। স্বামীর সম্পদেই তাঁহার সম্পদ, স্বামীর অসম্পদেই তাঁহার অসম্পদ। অতএব বাপের বাড়ী কিছুই নয়—শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী।

বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক ঐ শিক্ষাটী দিতে হয়। স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিতে হয়, বিলক্ষণ সমাদর এবং যত্ন করিতে হয়। তাঁহার প্রতি যথোচিত গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়। বিশেষতঃ অপর কাহার সমক্ষে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটির উল্লেখ করিতে নাই। কোন ত্রুটি দেখিলে অতি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পিত্রালয়ের যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ, কিন্তু তথায় সম্মান পাওয়া তত সহজ নয়। অতএব যত্ন ও সমাদর সহকারে সম্মান এবং গৌরব প্রদান করাই নববধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

স্ত্রীর দ্বিতীয় শিক্ষা শাস্ত্রমূলক। মনোভূমি জ্বলিয়া থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদ্গত হইতে পারে না। ধর্ম্মকার্য্য পবিত্র প্রীতিবীজেরই শুভময়

অঙ্কুর। এই জন্যই স্ত্রী স্বামিকৃত ধর্ম্মকর্ম্মের অর্দ্ধ ফলভাগিনী—এই জন্যই 'সস্ত্রী'কা ধর্ম্মমাচরেৎ' শাস্ত্রের বিধি। অতএব সত্য সত্যই স্ত্রীকে আপন কার্য্যের ফলভাগিনী করিতে চেষ্টা পাও। তাঁহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ কর। যৌবনাবস্থায় মনে মনে ত নানা মহৎ মহৎ কার্য্যের কল্পনা করিয়া থাক। স্ত্রীর সহিত সেই সকল বিষয়ে কথা কও। সে অশিক্ষিতা বালিকা—ও সকল কথার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, একবার ভ্রমক্রমেও এরূপ মনে করিও না। যাহা মনে আইসে তাহাই বল, যত রাজ উজীর মারিতে চাও, মার। গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, আমেরিকার ইতিহাস পড়িয়া যত বীরতা উদারতার উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছ, গল্প কর, দেখিতে পাইবে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত বিবরণের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, বীরদিগের কাজেরও দুই একটী ভুল ধরিয়া দিবে, এবং তোমার মন কি চায়, কোন্ দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ তাহাও নিশ্চয় বুঝিয়া লইয়া আপনার মনকে তোমার অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ হইলে স্ত্রী তোমার লেখা পড়া কাজ কর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবেন না। প্রত্যুত তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের উত্তেজিকা এবং সহায়া হইয়া প্রকৃত 'সহধর্ম্মিণী' পদ বাচ্য হইবেন।

কিন্তু উল্লিখিত দুইটী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র। মহাগুরু স্বামী স্ত্রীকে যে উপদেশ দিবেন, উহা তাহার মূল মন্ত্র নয়। মূল মন্ত্র এই—ছেলে মেয়ে, বৌ, জামাই, বাড়ী, বাগান, ধন, জন, সকলই তোমার—আমিও তোমার—ওসব তোমার বলেই আমার।" প্রাথমিক শিক্ষার সহিত এই শিক্ষার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তথাপি এই মন্ত্র অভ্যস্ত করাইবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিতে হয়। ইহা কেবল মাত্র কথায় বার বার আবৃত্তি করিলেই হয় না। ভুল হইলেই শোধরাইয়া দিতে হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারাও এই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়, কিন্তু মন্ত্রটী একবার হৃদগত হইয়া গেলে অমনি হৃদয়পদ্ম বিকসিত হইয়া উঠে—সেই পদ্মে একটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, এবং শিষ্য সেই দেবতার ধ্যান পূজাতেই নিবিষ্টমনা হইয়া তপঃসিদ্ধি লাভ করে। শিষ্য, গুরু এবং দেবতাকে যথার্থই অভিন্ন দেখিতে পায়।

কিন্তু আবার বলি, এই মন্ত্রটী সামান্য নয়। ইহা পৌরাণিক অথবা বৈদিক মন্ত্র নহে—ইহা সজীব তান্ত্রিক দীক্ষার মন্ত্র। "আমি তোমার, ওরা তোমার বলেই আমার।" যিনি এই মন্ত্র দিবেন, তাঁহার স্বয়ং সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সত্য সত্যই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। অমৃত বাদী শঠতাসম্পন্ন গুরুর মন্ত্র অরিমন্ত্র। উহা দ্বারা দীক্ষার ফল ফলে না। এইজন্য কর্ত্তাভজারা বলে, মানুষ ধর্ত্তে গেলে মর্ত্তে হয়। যদি তুমি কাহাকেও ধরিতে চাও. অর্থাৎ নিতান্ত নিজস্ব করিতে চাও তবে আপনি মর, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থেক না, একবারে তাহার হইয়া যাও।

—০—

পঞ্চম প্রবন্ধ।

সতীর ধর্ম্ম।

"কবিগণ কল্পনা শক্তির প্রভাবে নূতন ঘটনা নূতন পদার্থ এবং নূতন পাত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কবি-কল্পিত এমত অনেক ব্যাপার, বিষয় এবং ব্যক্তি আছে, যাহা বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কোথাও নাই।" এগুলি নিতান্ত মোটা কথা। যাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক কবিদিগের সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন যে, কোন কাব্যের মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে কোন নূতন সৃষ্টি থাকে না। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা আছে, তাহারই সংযোগ বিয়োগ করিয়া সমুদায় কাব্যসংসার বিরচিত হয়। পক্ষিরাজঘোড়া কবির সৃষ্টি, ব্রহ্মার সৃষ্টি নয়। কিন্তু উটী কি নূতন পদার্থ? বিধাতৃসৃষ্ট ঘোটকের গাত্রে বিধাতৃসৃষ্ট পক্ষীর পক্ষ সংযোজিত করিয়াই কবি পক্ষিরাজ ঘোড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র। প্রত্যক্ষের কন্যা স্মৃতি, এবং স্মৃতিই কল্পনার একমাত্র উপজীব্য। অতএব কবি কল্পনা কখনই মূলশূন্য অলীক হইতে পারে না। উহার মধ্যে প্রকৃত বস্তুরই বীজ সমস্ত নিহিত থাকে। অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্র, পরম্পরাসম্বন্ধে প্রকৃত ইতি-বৃত্তমূলকই হয়; এবং সেই জন্যই কোন কাব্যপাঠ দ্বারা, যে সময়ে এবং

আগে যান, বাবা থাকেন—এই বংশের পুরুষেরা দীর্ঘকাল বাঁচেন—তুমিই আগে যাবে, আমাকে থাকিতে হইবে'—স্বামীর এবম্বিধ বাক্যে সাধ্বীর ভয় ব্যাকুলতা দূর হইল, মুখমণ্ডলের মলিনতা অপনীত হইল—প্রফুল্লতা জন্মিল। সেই প্রফুল্লতাও সাধ্বীর লক্ষণ।

সতীধর্ম্মের মূলে স্বামীর জীবন সম্বন্ধীয় যে গূঢ় শঙ্কাটী নিহিত থাকে, তাহা অস্মদ্দেশীয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টরূপেই জানিতেন। ভগবান বেদব্যাস মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন, অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণান্তর তাঁহার স্থানে বিদায় লইতে চাহিলে, উলূপী অর্জ্জুনের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিলেন না, নিঃসন্দিগ্ধরূপে অর্জ্জুনের ভদ্রাভদ্র জানিবার একটী উপায় যাচ্ঞা করিলেন। অর্জ্জুন ঐ পতিপ্রাণার গৃহাঙ্গনে একটী দাড়িম্ব বৃক্ষ রোপণ করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! যত দিন এই বৃক্ষটী সজীব থাকিবে তত দিন আমিও কুশলে থাকিব।" উলূপী অহরহঃ ঐ দাড়িম্ব বৃক্ষে জলসেক করিতেন, এবং চিরদিন তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন। ইহাই সতীর লক্ষণ।

স্বামী বেঁচে আছেন, ভাল আছেন, সুখে আছেন এটী জানিলে—স্বামী বেঁচে থাকিবেন, ভাল থাকিবেন সুখে থাকিবেন, মনকে এই প্রবোধ দিতে পারিলে—সতীর প্রফুল্লতা জন্মে। স্বামী পাছে না বাঁচেন, না ভাল থাকেন, না সুখী হন, এই ভয়েই সতীর মলিনতা হয়। স্বামীর চিন্তা ভিন্ন সতীর অন্তঃকরণে আর কোন চিন্তাই ব্যাপক কাল স্থান পায় না। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, সতী ধর্ম্মের মূল ঐ প্রগাঢ় চিন্তা, এবং চিন্তা-মূল বলিয়াই সতী-ধর্ম্মের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী গাম্ভীর্য্যভাব থাকে। সাধ্বীদিগের আমোদেও নিতান্ত তরলতা প্রকাশ পায় না—তাঁহাদের খুসির ঢলাঢলি হয় না—হাসি উপচিয়া পড়ে না—মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া থাকে এই গাম্ভীর্য্যভাবও একটী সাধ্বীলক্ষণ।

সতী ধর্ম্মের মূলীভূত ঐ প্রগাঢ় চিন্তা হইতে একটী অতি অদ্ভুত কাণ্ড উদ্গত হয়। তাহার নাম সতত স্বামী দর্শন-লালসা। উহা সতীর হৃদয়ে নিরন্তর বিদ্যমান। সতীর মনের ইচ্ছা সর্ব্বদাই স্বামীকে দর্শন করেন। স্বামী চক্ষুর আড় হইলেই তাঁহার জগৎ শূন্য হয়। এরূপ কেন হয়? সতী

ধর্ম্মের মূলীভূত স্বামীর অনিষ্টশঙ্কাই তাহার প্রকৃত হেতু। 'তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন ত?' এই চিন্তা হইতেই সতীর হৃদয়ে স্বামি-দর্শন কামনা তেমন প্রবল ভাব ধারণ করে। সতীধর্ম্ম যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম—উহার কোন স্থলে কোন প্রকার স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। স্বামী বহির্বাটীতে কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন—তিনি জানিতে পারেন, তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নী বাতায়নদ্বার অথবা কবাটের ছিদ্র দিয়া কতবার তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন! স্বামী আবিষ্টমনে কাজ করিতেছেন, অথবা আগ্রহাতিশয় সহকারে পাঁচ জনের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ক্লান্তি জন্মিতেছে—সেই ক্লান্তি তিনি স্বয়ং অনুভব করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাঁহার পত্নী অলক্ষ্য স্থান হইতে দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়স্থিত মূর্ত্তির সহিত তাঁহার তাৎকালিক মূর্ত্তির ঈষৎ প্রভেদও জানিতেছেন, এবং তাহা জানিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে কার্য্যের বিরাম হউক,—কথাবার্ত্তা থামুক। যে ব্যক্তি শক্তিসত্ত্বে ঐ কার্য্যে বিরত না হয়, ঐ কথাবার্ত্তা স্থগিত না করে, সে নিষ্ঠুর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সতী ধর্ম্মের মূল স্বামীর অনিষ্টশঙ্কা, উহার কাণ্ড নিরন্তর স্বামিদর্শনলালসা। এই কল্পতরুরূপ সতীধর্ম্মের শাখা প্রশাখা অসংখ্য। স্বামীর অনিষ্টশঙ্কা যদিও মূল বটে, তথাপি ঐ মূল অপরাপর বৃক্ষ-মূলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকে। উহা সতীর হৃদয়কন্দরে প্রোথিত। কদাচিৎ উহাতে কিঞ্চিন্মাত্র টান পড়িলেই সমুদায় হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু সামান্যতঃ ঐ মূল কেহ দেখিতে পায় না। স্বামী স্বয়ংও বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী এবং অনুসন্ধিৎসু না হইলে উহা দেখিতে পান না। তিনি সাক্ষাৎ-কার বাসনারূপ কাণ্ডটী মাত্র দেখিতে পান—এবং বোধ হয়, ঐ কাণ্ডের প্রকৃত অবয়ব কেবল তাঁহারই দৃষ্টিতে পড়ে। কিন্তু স্বামীর সত্যহানির ভয়, মহিম-হানির ভয়, অর্থহানির ভয় প্রভৃতি সতী-ধর্ম্মের শাখা প্রশাখাগুলি সতীর চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া থাকে। অপরেও সেইগুলি দেখিতে পায়। কোন সাধ্বী তাঁহার পুত্রকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—"বাছা! যাহা বলিতেছ সত্য বটে, এরূপ করায় ক্ষতি হইল—কিন্তু যখন তিনি বলিয়াছেন, তখন ত করিতেই হইবে—তাঁহার কথা ত মিথ্যা হইবে না।" সতী-পুত্র মাতৃহৃদয়-

স্থিত সত্যহানির ভয়রূপ ধর্ম্মশাখাটি দেখিতে পাইল। এইরূপে অন্যান্য শাখাগুলিও সময়বিশেষে অপরের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মবৃক্ষটী আমূলশীর্ষ অতি মনোহরভাবে পল্লবিত। সতীর ক্রিয়া-কলাপই ঐ পল্লব—উহা অসংখ্য, বিবিধ, কিন্তু একবর্ণাত্মক। পতি ভিন্ন সতীর দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। সেই দেবতার বিধি-বোধিত পূজার জন্যই তাঁহার যাবৎ ক্রিয়া। গৃহকার্য্যে গমন, স্বহস্তে রন্ধন, স্বয়ং পরিবেশন, দেহে অলঙ্কার-ভার ধারণ, সেই জন্যই তাঁহার সব। যে কার্য্যে স্বামিপূজা নাই, এরূপ কাজ সতীর মনেই আইসে না। মেঘদূতের শেষ ভাগে কালিদাস বিরহ-বিধুরা যক্ষপত্নীর যে ভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কবি-কল্পনা নহে। যাহা হউক, সতী-ধর্ম্মের মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব দেখা হইল।—উহার পুষ্প কৈ?—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নিকটে যাও। যে বাটীতে সাধ্বী স্ত্রীর আবির্ভাব, তথায় দাস দাসী পরিজনবর্গ সকলেই হৃষ্টচিত্ত, কলহপরিশূন্য, নম্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহা সেই পুষ্প-সৌরভ। আরও নিকটে যাও, ছেলেদের সঙ্গে আলাপ কর, তাহাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা সরলমনা, ঔদার্য্য-গুণ-সম্পন্ন, পরস্পর ঈর্ষাবিহীন। সতী সন্তানেরা যেন সেই পবিত্র কুক্ষিবাস-বশতঃ সেই কুসুম-সৌরভে সুরভি হইয়া থাকে। আরও নিকটে যাইতে পার কি? অধিকার থাকে ত যাও। মনে ভক্তির উদ্রেক হইবে, একটু ভয়ও জন্মিবে—কথা বাধবাধ করিবে—কিন্তু ইচ্ছা হইবে আপনার এবং আপনার বলিতে যে যেখানে আছে, সকলের ঐ খানেই স্থির নিবাস হইয়া থাকে। ফিরিয়া আইস—এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাতে কোন পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে কি না। সংসার, অসার পদার্থ নয়—ধর্ম্ম, কল্পিত ব্যাপার নয়—এই জ্ঞান দৃঢ়তর হইয়াছে কি না? তুমিও সেই পুষ্প সৌরভে বাসিত হইয়া আসিলে।

——(*)——

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

—:*:::*:—

সৌভাগ্যগর্ব্ব।

একবার মনে ভাব, বিধাতা তোমার বশে আসিয়াছেন—তুমি যাহা মনে কর, তাঁহাকে দিয়া তাহাই করাইতে পার। তোমার মনটী কেমন হয়? বিধাতা সব জানেন, সব করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছাও মঙ্গলময়ী। তুমি তাঁহাকে দিয়া কি করাইয়া লইবে? আপনার হৃদয় তাঁহার হৃদয়ের সহিত অভিন্ন করিয়া রাখিবে? শুদ্ধ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবে? তাহা ত পাইবেই—কিন্তু ক্রমশঃ। যতদিন নির্বাণ না হয় কদাপি চিনি হইব ভাবিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবে না। অবশ্যই চিনি খাইবার ইচ্ছা থাকিবে। বিধাতাকে দিয়া যদি দুই একটী ফরমাইস খাটাইবার মানস না হয়, তবে তুমি মানুষ নও। যতদিন অহং বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিবে, তত দিন ফরমাইস খাটান চাই।

শাস্ত্রকারেরা প্রণয়কে দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এক ত্বদীয়তা, অপর মদীয়তা। 'আমি তোমার' এই ভাবটী ত্বদীয়তা, 'তুমি আমার' এই বোধটী মদীয়তা। প্রকৃতিভেদে কাহার ত্বদীয়তা কাহার বা মদীয়তাভাব প্রবল দেখা যায়। বাস্তবিক বিশুদ্ধ ত্বদীয়তা অথবা বিশুদ্ধ মদীয়তা কোথাও জন্মিতে পারে না। পতিপ্রাণা, পতিদেবতা, সাধ্বী স্ত্রীর অন্তঃকরণে ত্বদীয়তা ভাব যার পর নাই প্রবল বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শন করিলে উহার অন্তর্ভূত মদীয়তা ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও বিধাতাকে দিয়া ফরমাইস্ খাটাইতে ভাল বাসেন। দেবতা যে তাঁহার তপস্যার আয়ত্ত হইয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং অন্যকে ঐ তপঃসিদ্ধি দেখাইতে তাঁহারও ইচ্ছা হইয়া থাকে।

ত্বদীয়তা ভাবের অন্তর্ভূত এই মদীয়তা ভাবটীর নাম সৌভাগ্যগর্ব্ব। 'গর্ব্ব' এই কুৎসিত শব্দটী শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিও না। এ গর্ব্বটী ভাল

গর্ব্ব—যে ইহাকে খর্ব্ব করিতে চায়, সে স্ত্রীহত্যার পাতকী হয়। যে স্ত্রীর সৌভাগ গর্ব্ব নাই, তাঁহার স্ত্রীজন্মই বৃথা। তাঁহার রূপ গুণ কিছুই কিছু নয়। তিনি আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া মনে করেন। যে ধর্ম্ম-শীলার সৌভাগ্য গর্ব্ব জন্মিতে পায় নাই, জগদীশ্বর তাঁহাকে বিড়ম্বনা করিয়াছেন। তিনি জীবন্মৃতা। পুণ্য করিলেই যে ইহলোকে সুখভোগ হয় না, তাদৃশ স্ত্রীলোকের জীবনবৃত্তই তাহার সম্যক্ উদাহরণ। যে পতিপরায়ণার সৌভাগ গর্ব্ব নাই, তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হয় নাই—তাঁহার জীবনবৃক্ষের ফল ফলে নাই—তিনিই যথার্থ বন্ধ্যা।

অতএব সৌভাগ্যগর্ব্ব জন্মিতে দাও। বিধাতা ফরমাইস্ খাটীতে স্বীকার করুন। তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার কার্য্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বিধাতাকে যে ফরমাইস্ খাটাইতে পায়, সে বিধাতার ইচ্ছার অনুকূল বই কদাপি প্রতিকূল ফরমাইস্ করিতে পারে না। যাহা তাঁহার নিজের মনোমত তাঁহার উপর এরূপ অনুজ্ঞাই হইবে, যাহা তাঁহার মনোমত না হয়, এমন অনুজ্ঞা হইবে না।

সাধ্বী স্ত্রীদিগের সৌভাগ্য গর্ব্বটী বড়ই অপূর্ব্ব পদার্থ। তাঁহাদিগের এই মদীয়তার অন্তর্ভূত অতি প্রবলতর ত্বদীয়তা ভাব বিদ্যমান থাকে। তাঁহার মনটী আমি এত বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি মুখ দিয়া বলিতে না বলিতে আমি তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি, তাঁহার মনের কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইলে আমার যেমন সুখ হয়, এমন সুখ আর কিছুতেই হয় না।" ফলতঃ বিধাতার উপর ফরমাইস্ বিধাতার ইচ্ছার অনুকূল ভিন্ন সেই ইচ্ছার প্রতিকূল হইতে পারে না। যদি কিছুমাত্র প্রতিকূল হইল সন্দেহ হয়, তবে আর ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। এখনও তাঁহার মন বুঝিতে পারিলাম না, তবে কি করিলাম? কি হইল?

কোন পতিপরায়ণা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "তুমি সাংসারিক সকল বিষয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং আমি যাহা বলি প্রায় তাহাই কর—না করিলে পাছে আমার দুঃখ হয়, এই জন্যই ওরূপ কর কি?" "যদি তাহাই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি?—সে ত ভালই।" "ভাল বটে, কিন্তু তাহা ভাবিলে আমার মনে সুখ হয় না। আমার কথায় তোমার

নিজের যাহা ইচ্ছা নয়, তাহা করা হইতেছে মনে হইলে—আমার না থাকাই ভাল, বোধ হয়"। বড় শক্ত কথা হইল। ঐ কথার পর স্বামী কয়েকটী সাদা কাগজ বাঁধিয়া এক খানি বহি প্রস্তুত করিলেন, এবং স্ত্রীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ঐ বহিতে আপনার অভিমত অগ্রে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসার পর স্ত্রী নিজমত প্রকাশ করিলে স্বামী ঐ পুস্তকে কি কি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতেন। কয়েক মাস এইরূপে গেল। স্বামী অনেকগুলি গৃহকার্য্যের চিন্তা হইতে একেবারে অবসর পাইলেন। বিধাতা সৃষ্টি পালনের ভার কাহার প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কিন্তু সুভগা স্ত্রীর পতি সংসারের অনেক ভার পত্নীর প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বিধাতা কাহার বশীভূত হন না বলিয়াই তাঁহার ঐ দুঃখ। সুভগা স্ত্রীর স্বামী বিধাতা অপেক্ষাও সুখী হইতে পারেন।

সৌভাগ্য গর্ব্বের মধ্যে আর এক প্রকারে ত্বদীয়তা ভাব অনুস্যূত দেখা যায়। "তিনি আমাকে ভাল বাসেন ভাবিয়া আমি এত সুখী হই—ইহা জানিলে তাঁহার সন্তোষ হইবে, অতএব জানাইব।" এটীও একটী বিচিত্র মনোভাব। কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"আজি অমুকের বিবাহ—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাদিগের বাটীতে যাইতে হইবে।" "এত দায় কি?—যাবার ইচ্ছা না থাকে, যেও না" "না গেলে তাহার মা দুঃখ করিবেন—তিনি আমাকে বই আর কাহাকেও দিয়া হাই-আমলা বাটাইতে চাহেন না।" এ কথার তাৎপর্য্য কি? স্ত্রীলোকেরা সুভগাকে দিয়া হাই আমলা বাটায়। তিনি স্বামীকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে সকলে সুভগা মনে করে, এবং তাহাতে তাঁহার পরম সুখ হয়। অপর কোন সময়ে ঐ স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—"আজি ঘাটে অমুকের মাকে দেখিলাম—তেমন যে রূপ একেবারে কালিহাড়া হইয়া গিয়াছে। কেন অমন হলে? জিজ্ঞাসা করিলে বলিল "আর দিদি! একটু পায়ের ধূলা ত দিলে না।" "ও কথা কেন বলিল?—তাৎপর্য্য কি?" "সে কথায় কাজ নাই—তার স্বামীর দোষ জন্মিয়াছে, তাই ও কথা বলিল।" ইহার তাৎপর্য্য এই, তোমার আদরেই আমার এত গৌরব।

ফলতঃ সাধ্বীদিগের 'সৌভাগ্যগর্ব্ব' বর্দ্ধিত করিতে ভয় পাইও না—তাহাতে কোন হানি নাই, অনেক লাভ আছে—এবং তাহা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। ত্বদীয়তা এবং মদীয়তা ভাব কাপড়ের টানা পড়েনের ন্যায় এমনি পরস্পর অনুস্যূত যে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লওয়া নিতান্ত অসাধ্য। ত্বদীয়তার অন্তর্ভূত মদীয়তা এবং সেই মদীয়তার অন্তর্ভূত ত্বদীয়তা দেখা গিয়াছে। শেষের ঐ ত্বদীয়তার ভিতরেও আবার মদীয়তা এবং সেই মদীয়তার অন্তরেও ত্বদীয়তা দেখা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ-চিত্ত স্ত্রী পুরুষের দুইটী হৃদয় দুই খানি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থিত—এ উহার এবং ও ইহার অন্তর্ভূত ভাব সকল গ্রহণ করিয়া নিরন্তর অশেষ বার প্রতিভাত করিতে থাকে।

সপ্তম প্রবন্ধ।

দম্পতী-কলহ।

উপন্যাস, আখ্যায়িকা, পুরাণাদি পাঠে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ প্রকার কোন গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিবার সময় আমার অনেকবার এরূপ বোধ হইয়াছে যে, যদি ঐ সকল গ্রন্থে রোগাদি কষ্টকর ব্যাপারের সামান্য বর্ণনও থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল গ্রন্থ আমাদিগের অধিকতর উপকারে আসিত। কাব্য, উপন্যাসাদির নায়ক নায়িকা, এমন কি, ঐ সকল গ্রন্থের অপ্রধান পাত্রেরাও যেন চিরসুস্থ শরীর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন দেশের কোন কাব্যে কাষ্টর অইল খাইবার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর কয় জন লোক ঐ নরকযাতনা ভোগ না করিয়াছে? এইরূপ কতকগুলি কারণে কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের অবস্থা, মনুষ্য সাধারণের প্রকৃত অবস্থা হইতে ভিন্নভাব ধারণ করিয়া থাকে। উহা গ্রন্থকারের মনঃকল্পিত কৃত্রিম পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, এবং আমাদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি তাহার দৃষ্টান্তের প্রভাব স্বল্পতর হইয়া পড়ে।

গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে ওরূপ মনঃকল্পিত কৃত্রিম পদার্থের বর্ণন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য এই প্রবন্ধে গৃহস্থাশ্রমের একটী সাধারণ কষ্টকর ব্যাপারের উল্লেখ করিব। স্ত্রী পুরুষে কলহ হইয়া থাকে। উভয়ের পক্ষেই ঐ কলহ বিলক্ষণ কষ্টকর। কিন্তু যতই কষ্টকর হউক, উহার সংঘটন নিতান্ত অসাধারণ ব্যাপার নহে। প্রত্যুত, উহা অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আমার বিবেচনায় মনুষ্য দম্পতীর মধ্যে কলহ হইবেই হইবে।

যাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় এবং ঘনিষ্ঠতা, তাঁহাদের মধ্যেও বিবাদ না হইয়া চলে না, ইহার কারণ কি?—তাহার কারণ ঐ প্রণয় এবং ঘনিষ্ঠতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন দম্পতী সর্ব্বতোভাবে অভিন্নহৃদয় হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইহলোকে

সম্যক্ অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইয়া উঠে না, এবং তাহা হইয়া উঠে না বলিয়াই অভিমান এবং উদ্বেগের উদয় হইয়া কলহের সূত্রপাত করে। "এই বিষয়টিতে আমার এইরূপ অভিমত; কিন্তু তাঁহার ওরূপ যদি এই বিষয়েই মতভেদ হইল, তবে ত অমুক বিষয়ে মতভেদ হইবেই? এবং তাহা হইলে ঐ অমুক বিষয়েই বা কি জন্য মতভেদ না হইবে?—তবেই আমার মনের গতি হইতে তাঁহার মনের গতি ভিন্ন প্রকার—তবে আর ভালবাসা কৈ? যদি ভাল বাসাই নাই, তবে আর জীবনে ফল কি?" দম্পতী কলহের অন্তরে এই প্রকার একটি অপূর্ব্ব বিচারপ্রণালী নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ঐ বিচার প্রণালীতে কল্পনা-বায়ুর প্রভাব বশতঃ এত দুরভিসন্ধি ও গূঢ়াভিসন্ধির বিচিত্র লহরীলীলার সৃষ্টি হয় যে, তদ্দর্শনে দ্রষ্টৃবর্গের যৎপরোনাস্তি আমোদ জন্মে। দম্পতীর কলহ অপর সকলেরই চিত্ত-রঞ্জক। এত চিত্তরঞ্জক যে, কেহ কেহ কৌশলপূর্ব্বক কলহ বাধাইয়া দিয়া তামাসা দেখিতে ভাল বাসেন। কিন্তু অন্যে যতই উপহাসাস্পদ জ্ঞান করুক, দম্পতীর কলহ দম্পতীর নিজের পক্ষে যৎপরোনাস্তি কষ্ট-কর ব্যাপার। বিবাদটী যতক্ষণ থাকে, তাহাদিগের মনে আপন আপন জীবনকে এমত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হয় যে, সে সময়ের মধ্যে আত্মহত্যা করাও নিতান্ত অসম্ভব নহে। রক্ষা এই, দম্পতী কলহ প্রায়ই অতি অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়। সৃষ্টিনাশক বজ্রাগ্নি চকিতের ন্যায় থাকিয়াই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঐ অগ্নি স্থায়ী ভাব পাইলে বিশ্বসংসার দগ্ধ হইয়া যাইত।

আমার বিবেচনায় ঐ আগুনটি উঠায় কোন দোষ নাই। কারণ উহা উঠিবার প্রয়োজন আছে। যেমন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট দুইটী মেঘের মধ্যে তাড়িতের ইতরবিশেষ থাকিলেই বৈদ্যুতাগ্নি নিঃসৃত হয়; এবং নিঃসৃত হইয়া মেঘ দুইটীর তাড়িত-সামঞ্জস্য বিধান করে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও সেই প্রকার অভিমতির কিছুমাত্র অনৈক্য থাকিলেই কলহাগ্নি উদ্রিক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মনের একতা সম্পাদিত হয়। তুমি আমি এখনও ভিন্নহৃদয় আছি কেন? এখনও একমনা হই-

নাই কেন? অবশ্যই একাত্মতা প্রাপ্ত হইতে হইবে, এই ভাবটী দম্পতী কলহের অন্তর্নিহিত। সুতরাং দম্পতীকলহও দম্পতীপ্রণয়ের পরিচায়ক এবং ঐ প্রণয়ের দৃঢ়তাসাধক।

এই জন্য স্ত্রী পুরুষে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা প্রায়ই কেহ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। যতক্ষণ বিবাদ থাকে, ততক্ষণই কথা কাটাকাটি চলে। যদি একজন চুপ করিয়া থাকিলেন, অথবা স্থানান্তরে গমনের চেষ্টা করিলেন, তাহা হইলে অপরের ক্রোধ শান্ত না হইয়া শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কিন্তু বিবাদের কথা পাছে গুরুজনের কর্ণে উঠে অতএব এখন তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিব না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যদি একজন চুপ করেন অথবা স্থানান্তর যান তাহাতে অধিক দোষ হয় না। কিন্তু যথাসময়ে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের কথাগুলা উঠাইও—একেবারে ছাড়া ভাল নয়। কিন্তু অধিক স্থলেই পূর্ব্বের কথাটা ভুলিলেই যিনি দোষী তাঁহার লজ্জা বোধ হয়। লজ্জা দেখা দিলে আর বাড়াইতে নাই। বিবদমান দুই জনের মধ্যে যিনি চুপ করিলেন, অথবা স্থানত্যাগ করিলেন, অপরের বিবেচনায় তিনি আপন মনের দ্বার রুদ্ধ করিলেন, তিনি অভিন্নহৃদয় হইবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিলেন না, তিনি কেবল আপন মতটি বজায় রাখিবার জন্যই বিবাদ করিতেছেন, তিনি স্বৈরাচারী স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, তাঁহার মনে যথার্থ ভালবাসা নাই।

এই জন্য অপর সকল বিবাদের স্থলে যদিও এক জনের মৌনাবলম্বন সৎপরামর্শ—কারণ তাহাতে বিবাদ মিটিবার উপক্রম হয়—কিন্তু দম্পতীকলহে মৌনাবলম্বন সৎপরামর্শ নয়। তাহাতে কলহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে—অথবা বাহিরে নিবিয়া অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক চিত্তভূমি দগ্ধ করিয়া ফেলে। অপর সকল বিবাদে এক জনের স্থান ত্যাগ করা ভাল। দম্পতীকলহে স্থানত্যাগ প্রকাণ্ড অপমানজনক বলিয়া বোধ হয়। যে যে স্থলে দম্পতীকলহ আত্মহত্যায় পরিণত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই একজনের কলহক্ষেত্র পরিত্যাগ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকিয়া সম্মুখসংগ্রাম করাই এখানকার বিধি। যদি সম্মুখসংগ্রামে মরিতে পার, তবে দেখিতে পাইবে, শাস্ত্রকারেরা মিথ্যা কথা

বলেন নাই—সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলে সাক্ষাৎ স্বর্গলাভ হয়। বিবাদটি মিটিয়া গেলে, অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইলে. কালবৈশাখীর মেঘ, ঝড়, জল ছাড়িলে তাড়িতের সামঞ্জস্যবিধান হইয়া গেলে, কেমন সুবিমল শোভা, কেমন অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা জন্মে। দম্পতী কলহের এই চরম ফলটী বড়ই মধুর।

সুবোধ, দান্তস্বভাব পুরুষের কর্ত্তব্য যাহাতে ঐ চরম ফলটী শীঘ্র ফলে, তাহার নিমিত্ত যত্ন করেন। বিবাদ হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বিবাদটি যেন শীঘ্র মিটিয়া যায়—কোন মতে ব্যাপককাল স্থায়ী হইতে না পায়। প্রণয়ক্ষীরসিন্ধুমন্থনোদ্ভূত কলহ কালকূট মহাদেবই পান করিতে পারেন, শীঘ্রই পান করুন, নচেৎ সিন্ধু শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশে কৃত্রিম ক্রোধপ্রকাশ করেন। তদ্দ্বারা স্থলবিশেষে উদ্দেশ্যসাধন হয়—বড় আগুনে ছোট আগুন নিভে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই প্রণালী অবিশুদ্ধ। ইহাতে দম্পতী কলহের প্রকৃত প্রয়োজন যে অভিন্নহৃদয়তাসাধন তাহা কিছুমাত্র হয় না। অপর, কেহ কেহ আহারাদি করেন না, কিম্বা মাথা খুঁড়েন, অথবা অপরাপর প্রকারে আপনার শরীরকে ক্লেশ দেন। এ উপায়েও কলহ শান্তি হয়—খুব সত্বরেই হয়। কিন্তু এটিও বিশুদ্ধ উপায় নহে। ইহা আসুরিক ভেষজ সেবনের ন্যায় আশু ফলোপধায়ক, কিন্তু আভ্যন্তরিক তেজোহানির কারণ। ঐ প্রকার দুষ্ট উপায় বারবার অবলম্বন করিলে অভিন্নহৃদয়তা সাধনের কথা দূরে থাকুক, মূলপ্রণয় গ্রন্থি পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তিতে কালকূট পান করেন নাই—শিবমূর্ত্তিতেই করিয়াছিলেন।

আমার বিবেচনায় দম্পতী কলহের প্রকৃত শুভ ফল লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি রক্ষা করা বিধেয়;—

(১) আপনাদিগের মতভেদ অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না।

(২) আপনাদিগের বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ নিও না।

(৩ যদি কোন অর্ব্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি দিও না।

(৪) হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিও না। দম্পতী কলহে যে হারি মানে, সেই জিতে।

(৫) যতক্ষণ বিবাদ না মিটে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া থাকিও। সংসার উৎসন্ন হউক, সৃষ্টি বহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদ ভঞ্জন না হইবে, ততক্ষণ কোন কাজই করা হইতে পারে না, অপর কাহার সহিত কথা কহা হইতে পারে না, খাওয়া হইতে পারে না, ঘুমান হইতে পারে না—বিশেষতঃ ঘুমানটী কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

উল্লিখিত পাঁচটি নিয়মই অতি গুরুতর, বিশেষতঃ পঞ্চম নিয়মটী এবং তাহার শেষ ভাগের কথাটী—সকল নিয়মের সার নিয়ম। এইগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলে দম্পতীর মধ্যে কলহ অল্প হয়; যখন হয়, তখন স্বল্পকাল মাত্র থাকে, এবং নিবৃত্তিতে অন্তঃকরণ সরল এবং সুখে আপ্লুত হয়। দম্পতী কলহের পরিসমাপ্তিতে যে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তাহা হৃদয়ের সরলতার লক্ষণ—দুই চারিবার বিদ্যুৎ প্রকাশের পরেই বৃষ্টি—জগতীতল শীতল।

—(*)—

অষ্টম প্রবন্ধ।

লজ্জাশীলতা।

লজ্জাশীলতাটী বড়ই মিষ্ট জিনিস। উহাতে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য শত গুণে বর্দ্ধিত এবং অসুন্দরীর অসৌন্দর্য্য সহস্র মাত্রায় তিরোহিত হয়। লজ্জাশীলতাটী মনুষ্যের ধর্ম্ম—পশুর ধর্ম্ম নয়। আমার বিবেচনায় মনুষ্যের প্রকৃতিতে পশুধর্ম্মের অস্তিত্ব অনুভূত হইলেই লজ্জার উদ্রেক হয়। যদি কাহাকেও হাঁস্ হাঁস্ করিয়া খাইতে দেখি, তবে আপনাদের মনে একটু লজ্জার উদ্রেক হয়। যিনি সেরূপে খাইতেছেন, তিনিও তাহা বুঝিতে পারিলে স্বয়ং লজ্জিত হইয়া থাকেন। যদি কোন নর নারীর নয়নে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তবে শুদ্ধাত্মার চিত্তে লজ্জার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি কেহ চিৎপাত হইয়া ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়া অপরের একটু সলজ্জ হাসি আইসে, এবং তিনি নিদ্রা হইতে উঠিলে যদি তাঁহাকে বলা যায়, তোমার নাক বেশ ডাকিতেছিল, তিনিও বিলক্ষণ লজ্জাযুক্ত হয়েন।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, পাশব ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের যে ঘৃণা, তাহাই লজ্জার মূল কারণ। যে মনুষ্যসমাজ যত দিব্যভাবসম্পন্ন এবং সুশীল ও সভ্য হইবার জন্য যত্নশীল, সেই সমাজের মধ্যে লজ্জার তত আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বন্যদশাপন্ন লোকেরা উলঙ্গ হইয়া থাকিতে, কুক্কুর শিয়ালের মত বৃহৎ বৃহৎ গ্রাস তুলিয়া খাইতে, ষাঁড়ের মত নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে এবং পশুদিগের ন্যায় ব্যাপার নিরত হইতে, সঙ্কুচিত হয় না। ইউরোপীয় ছোট লোকেরাও অত্যন্ত পশুধর্ম্মপ্রবণ। ফলতঃ লোকে কেমন সকল বিষয়ের কথায় আমোদ করে, কেমন অশ্লীল শব্দ সকলের অসঙ্কোচে ব্যবহার করে, ইহা দেখিলেই তাহাদিগের মধ্যে দিব্যভাবের কি পশুভাবের আধিক্য হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

নিসর্গতঃ স্ত্রীলোকদিগের মনে পশুভাব অপেক্ষা দিব্যভাবের আধিক্য। এই জন্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লজ্জানুভব করেন। শরীরের বস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্র অপসারিত হইয়া গেলে, ভোজনের সময় অপর কেহ দেখিলে, ভোজনপাত্র নোঙরা হইলে, আহারের জন্য কাহার স্থানে কিছু চাহিতে হইলে, আপনাদের মধ্যে কেহ খুব হাঁ করিয়া মুখ নাড়িয়া দন্তের মাড়ি বাহির করিয়া খাইতেছে দেখিলে, কথোপকথনে একটী মাত্র কদর্য্য ভাবের শব্দ শুনিলে, হাসির গড়রা উঠিলে, তাঁহারা লজ্জিত, ক্ষুভিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া যান। উহাঁদিগের মধ্যে যদি কেহ ঐ সকল কার্য্যে বিরক্ত বা লজ্জাযুক্ত না হয়েন, প্রত্যুত তাহার বিপরীতাচরণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের দিব্য প্রকৃতির বিকৃতি এবং অধঃপতনের সূচনা হয় মাত্র। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের একত্র সমাবেশ, সকল সময়েই একত্র বসিয়া বাক্যালাপ, একত্র পান ভোজন, একত্র পর্য্যটন, সে সমাজে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র কিছু অকোমল, কিছু দিব্যভাববর্জ্জিত এবং অধিকতর পরিমাণে পশুভাবসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য তাদৃশ সামাজিক রীতি সম্যক্ নির্দ্দোষ বলিয়া আমার বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন বটে যে, তাদৃশ সমাজে স্ত্রীলোকদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রব নিবন্ধন পুরুষদিগের স্বভাব কিছু কোমল এবং পবিত্র হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব অকোমল এবং বিকৃত হওয়ায় যত দোষ, পুরুষস্বভাব কোমল হওয়ায় গুণ তত্টা কি? কিন্তু যতই বলা যাউক, ভাবা যাউক, এবং সাবধান হওয়া যাউক, মনুষ্য কোন দেশে কোন কালে সর্ব্বতোভাবে দিব্যভাবসম্পন্ন এবং সম্যক্ প্রকারে পশুভাব বর্জ্জিত হইতে পারে না। প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থপতির অট্টালিকা সৃষ্টির ন্যায়, তালার উপর তালা। নীচে যে বস্তু সৃষ্ট, তাহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করাইয়া উপরের বস্তু সৃষ্ট হয়। খনিজ দ্রব্যের যে সকল গুণ,—সেই সকল গুণের পরিণামেই উদ্ভিদ—উদ্ভিদের যে সকল গুণ, তাহারই পরিণামে প্রাণী—এবং অপরাপর প্রাণীতে যে যে ধর্ম্ম—সেই সকল ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পরিপাকে মনুষ্য ধর্ম্ম। এই জন্য মানুষ সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মপরিশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। ভোজন, নিদ্রা, অন্তর্মলত্যাগ, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য না করিলে জীবন রক্ষা এবং

বংশ রক্ষা হয় না। অথচ সেই কার্য্যগুলি পশুধর্ম্মিক—উন্নত দিব্যভাবের বিরুদ্ধ এবং সেই জন্য লজ্জাপ্রদ।

মানবের মনে এইরূপ ভাববৈপরীত্য হইতে যে কষ্টানুভূতি হয়, তাহা নিবারণের নিমিত্ত বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের আর্য্যসমাজের নিয়ন্তৃগণ যে অত্যুন্নত ও মহদ্ভাব-সম্পন্ন ছিলেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থার বিধান করিয়া আমাদিগকে দিব্যভাবের তেজস্বিতা, পশুভাবের দৌর্ব্বল্য এবং লজ্জাদুঃখ নিবারণের উপায় সাধন করিয়া গিয়াছেন। সকল ব্যাপারের অন্তর্ভূত যে একটি অত্যুদার মহান্ ভাব আছে, তাঁহাদের পবিত্র আত্মা সেই ব্রহ্মভাবেই ওতপ্রোতরূপে পরিষিক্ত ছিল। তাঁহারা প্রাণিমাত্রের ভক্ষ্য গ্রহণ, নিদ্রাগমন এবং সন্তানোৎপত্তি ক্রিয়াতে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলেন, এবং চিত্রক্ষেত্রে তাদৃশ ঈশ্বরাধিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াই ঐ সকল অবশ্য করণীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ দেখি, ভোজনাদি ক্রিয়াতে কি অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত নিয়ত নির্ব্বাহিত হইয়া যাইতেছে! তুমি খাইতেছ ভাত, মাছ, রুটি, দাইল—সেগুলি তোমার শরীরে পরিণত হইয়া হইতেছে বল, বুদ্ধি, চৈতন্য। 'অন্নং ব্রহ্ম—অন্নাদ্বৈ প্রজাপতিঃ'। তুমি শয্যায় শুইয়া ঘুমাইতেছ—তোমার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই—কিন্তু তুমি যখন নিদ্রা হইতে উঠিলে, একেবারে চৈতন্যময়—এবং "সুখমহং স্বাপ্সম্' জ্ঞানে আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াই উঠিলে! সন্তানোৎপাদনে তুমি নিজের "প্রাজাপত্য" শক্তি অনুভব করিলে, বিষ্ণুর' স্মরণ করিলে, তোমার যে সন্তান জন্মিবে, তাহার চরিত্র অতি পবিত্র এবং উদার হইবার উপায় বিধান করিলে—পত্নীকেও সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা জীব-জননী বলিয়া জানিলে।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা এইরূপে পশুধর্ম্মের অন্তর্গূঢ় ব্রহ্মভাবের আবিষ্কৃতি করিয়া পাশব কার্য্যগুলির পাশবত্ব মোচন করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে এরূপ হয় নাই। সেখানকার লোকদিগের ধর্ম্মচর্য্যা এবং জীবন চর্য্যা পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। তাঁহারা ধর্ম্মভাবের অধীন হইয়া সকল কাজ করিতে চাহেন না—ওরূপ করাকে যাজক-তন্ত্রতা বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু

উহাঁরাও মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ পশুধর্ম্মগুলির উপর একটী আবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উহাঁরা ভোজন ক্রিয়াটীকে কেবল জঠরজ্বালা নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ না রাখিয়া উহাকে আলাপ পরিচয়ের, আমোদের এবং সুসামাজিকতার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। উহাঁরা পান ভোজনের সহিত স্ত্রী পুরুষ একত্র কথোপকথন এবং নৃত্য গীত বাদ্যের আমোদ বিমিশ্রিত করিয়া ভোজনক্ষেত্রটীকে কেমন রমণীয় করিয়া লইয়াছেন। উহাঁরা শয়নাদি ব্যাপারের পাশব ভাব তত প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পান নাই। কারণ শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে উহাঁদিগের মধ্যে অনেকেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তীব্র সুরাপানের অভ্যাস প্রবর্ত্তিত থাকায়, তত্তৎকালে পাশবধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া একেবারে লজ্জার তিরোধান হইয়া যায়।

ফল কথা, আর্য্য প্রণালীতে ধর্ম্মাভাবের আধিক্য, ইউরোপীয় প্রণালীতে ভোগ সুখের আধিক্য। আর্য্যপ্রণালীতে স্ত্রী, দেবী। ইউরোপীয় প্রণালীতে স্ত্রী, সখী এবং সহচরী। "আজিকার নিমন্ত্রণে যে স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের শব্দ অনেকবার বাহির বাটী পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল"। * * "কে বল দেখি"। * * "কেমন করিয়া জানিব" "ও সেই সুকুমারী—যে চলিলে পায়ের শব্দ হইত না— মুখ তুলিয়া কথা কহিত না—যাহার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়া থাকিত, ও সেই সুকুমারী, আহা বাছার দোষ কি? স্বামী উহাকে ইংরাজদের সহিত কথা কহাইয়াছে তাহাদের সাম্‌নে গান করাইয়াছে—আপনার সঙ্গে মদ পর্য্যন্ত খাওয়াইয়াছে —আর কি ওর লজ্জা রাখিয়াছে? তাই অত গলা হইয়াছে, ধরণ ধারণ সব বদল হইয়া গিয়াছে।"

—১০—

নবম প্রবন্ধ।

গৃহিণীপনা।

গৃহিণীপনা দুই প্রকার। এক, কর্ত্তৃত্ববিহীন—অপর, কর্ত্তৃত্বসমন্বিত। যে স্থলে গৃহিণী, কর্ত্তার অনুমতি পাইয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সে স্থলে কর্ত্তৃত্ববিহীন গৃহিণীপনা বলা যায়, যে স্থলে গৃহিণী, কর্ত্তার মন বুঝিয়া আপনি বিবেচনাপূর্ব্বক গৃহকার্য্য সম্পাদন করেন, সেইখানে কর্ত্তৃত্বসমন্বিত গৃহিণীপনা দৃষ্ট হয়। আমি সকর্ত্তৃত্ব গৃহিণীপনারই বিশিষ্ট সমাদর করিয়া থাকি। অপর প্রকার গৃহিণীর কার্য্যে তাদৃশ কোন গৌরবই নাই—উহা অনুজ্ঞাপালন মাত্র।

আমার বন্ধুবর্গ আমাকে গৃহকার্য্যে উদাসীনবৎ দেখিয়াছেন, এবং তাহা দেখিয়াছেন এবং সেই কথা বলিয়াছেন বলিয়াই আমি মনে মনে শ্লাঘা করি যে, আমি সংসারের কর্ত্তৃত্ব নিতান্ত মন্দ করি নাই। আমার পত্নী গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহার 'হাতেই সব,' আমার হস্তে কখন এক কড়া কড়িও থাকিত না। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি স্বয়ং আমাকে গৃহকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, গৃহকার্য্যের মূলসূত্রগুলি আমারইস্থানে শিখিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তথাপি ঐ সূত্রের বৃত্তিবিরচন এবং সূত্রানুযায়ী সমস্ত পদসাধন তিনি নিজেই যে করিয়া লইতেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার গৃহিণীপনা সর্ব্বতোভাবে সকর্ত্তৃত্ব গৃহিণীপনাই ছিল।

আমার বিবেচনায় যাঁহারা সংসারাশ্রমে থাকিয়া ঐ আশ্রম কিরূপে জ্ঞান এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির উপযোগী হইতে পারে, তাহার কোন চিন্তাই করেন, না, তাঁহারা দোষভাগী। আবার আমার ইহাও বোধ হয় যে, যাঁহারা উন্নত-বুদ্ধি এবং উচ্চাভিলাষী হইয়াও কেবল সংসারের খুটিনাটির চিন্তা তেই সেই বুদ্ধি এবং সেই অভিলাষের পর্য্যবসান করেন, তাঁহারাও দোষ ভাগী। স্ত্রী কি ভগিনী আছেন, তিনি, গৃহস্থালীর যাবতীয় ব্যাপার

নির্ব্বাহ করিবেন, আমি ভাল খাইব, ভাল খাওয়াইব, মনের সুখে বহি পড়িব, এবং বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ করিব, সংসারের কিছুই দেখিব না, ভাবিব না, অকুলান পড়ে টাকা ধার করিয়া দিব—যাহারা এরূপ করিয়া চলে আমি এমন লোকও দেখিয়াছি। আবার, ঘর প্রস্তুত হইতেছে, স্বয়ং বসিয়া তাহার ছাদ পেটায় এবং বাটীর উঠানে খাঙ্‌রা কাটি পড়িয়া আছে, দেখিলেই আপনি কুড়াইয়া রাখে, এবং অনেকগুলি কাটি জড় হইলে একগাছি খাঙ্‌রা বাঁধায়, এ প্রকার লোকও দেখিয়াছি। আমার মতে ঐ দুই প্রকার লোকের কোন প্রকার লোকই সংসারাশ্রমের প্রকৃত পথের অনুবর্ত্তী নহেন—প্রকৃত পথ ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী—সম্পূর্ণ অনবধানতাও নহে, সম্পূর্ণ অনৌদার্য্যও নহে। মনুষ্যের চক্ষু মনুষ্যেরই কার্য্যের উপযুক্ত। উহা দূরবীক্ষণ হইলেও দোষ—অনুবীক্ষণ হইলেও দোষ। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবেন—উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দিবেন—আর কিছুই করিবেন না। ঔদার্য্য রক্ষা করিতে গিয়া সতর্কতা ত্যাগ করিতে নাই—সতর্ক হইতে গিয়া নীচ হইয়া পড়িতেও নাই।

কিন্তু ইহাও বলি, বরং কিয়ৎপরিমাণে অনবধান হওয়া ভাল, তথাপি নিতান্ত নীচাশয় হইয়া স্বহস্তে সমুদায় খুটি নাটি করা ভাল নয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি তুমিই সংসারের বিষয় স্বয়ং দেখিলে এবং চিন্তা করিলে, তবে তোমার স্ত্রী আর কি করিবেন? শুদ্ধ খেয়ে খেলিয়ে সময় কাটাইবেন? তাহাতে ত তাঁহার বুদ্ধি খুলিবে না—নিজচিত্তজ্ঞতা এবং পরচিত্তজ্ঞতা জন্মিবে না—মন বড় হইবে না। তিনি একটী স্বার্থপর, আদুরে ক্রীড়া সামগ্রী মাত্র হইয়া থাকিবেন। কাজে বুদ্ধি খুলে—বুদ্ধি স্বয়ং প্রথম হইতে কাজ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব পত্নীর হস্তে গৃহকার্য্যের ভার যত দেওয়া যাইতে পারে ততই দেওয়া বিধেয়। তাহা দিলে তুমি নিজে অনেক অবসর পাইতে পারিবে, এবং তাঁহাকেও মানুষ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু গৃহকার্য্য স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং একেবারে উদাসীন হইলে ঐ ব্যবস্থার সমগ্র শুভ ফল ফলে না। নিতান্ত ঔদাসীন্য তাঁহার প্রতি অনাদররূপে প্রতীয়মান হয়। শুদ্ধ প্রতীয়মান হয়, এমত নহে, কালে প্রকৃত অনাদরেই পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার মন গৃহকার্য্যে রহিল, তিনি পৃথিবীতে পা

দিয়া সকল মাটি মাড়াইয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। তুমি হয় ত জগতের হিতচিন্তা অথবা পৃথিবীর ধর্ম্ম-সংস্করণ. এইরূপ একটী প্রকাণ্ড ব্যোমযান যোগে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে উঠিলে। তোমাদিগের ত আর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবার উপায় থাকিল না। অতএব ঘরের কাজ স্ত্রীর হাতে ফেলিয়া দেও, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত গৃহকার্য্যের কথা কহ। তাহা করিলে দেখিতে পাইবে যে, সামান্য গৃহকার্য্যের অভ্যন্তরে অতি প্রশস্ত ভাব সমস্ত নিহিত থাকে। শুদ্ধ ব্যোমযানে উঠিলেই যে জগতের চমৎকারিত্ব অনুভব করা যায় এমত নহে। যে নিয়মের প্রভূত বলে ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব সাধন করিয়াছে, শিশিরবিন্দুর গোলত্ব সাধনেও সেই নিয়মের সমগ্র বল লাগিয়াছে। ব্যাস. বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস হোমর, সেক্‌সপিয়ার, কাণ্ট, কপিল, ও কোম্‌ত, জীবনযাত্রার যে সকল মহৎ সূত্রের আবিষ্কার এবং বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই গৃহকার্য্যের সম্বন্ধে গৃহিণীর মুখ হইতে শুনিতে পাইবে। যদি না পাও, তবে তুমি ঐ দার্শনিক এবং কবি-শ্রেষ্ঠদিগের নাম মাত্র শুনিয়াছ, অথবা তাঁহাদিগের গ্রন্থের পাত উল্টাইয়াছ মাত্র—ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাঁহারা তোমার শরীরে আবির্ভূত হন নাই।

দশম প্রবন্ধ।

গহনা গড়ান।

গহনার উপর কাহার কাহার বড়ই রাগ দেখিতে পাই। গহনায় টাকা বদ্ধ হইয়া থাকে—টাকা বদ্ধ করা অর্থশাস্ত্রের বিধি নয়। গহনাতে টাকার লোক্‌সান হয়—টাকা লোক্‌সান করা গৃহস্থধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার। গহনার দিকে মন পড়িলে নিজের সাজ করিতেই দিন ফুরাইয়া যায়—গৃহস্থালীর কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে পারে। গহনা পরার নেসা জন্মিলে প্রকৃতি লঘু হইবার সম্ভাবনা। গহনার বিরুদ্ধে এবম্বিধ অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অলঙ্কারনিবারিণী সভার কোন সভ্য মহাশয়ের মুখে আমি ঐ প্রকার অনেকগুলি কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম মহাশয়ের কথাগুলি বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, কেহই ঐ সকল যুক্তির অনুসারে কাজ করে না। দেখুন, এমন যে "সর্ব্বগুণাদর্শ" ইংরাজ জাতি ইহাঁদিগের মধ্যেও অর্থশাস্ত্রের নিয়মটী রক্ষা পায় না! কোন কোন ইংলণ্ডীয় জমীদার এবং মহাজনের ঘরে ১০।১২ মণ রূপার প্লেট থাকে। ইউরোপীয় বিবিদিগের মধ্যেও এক্ষণে গহনা পরার সাধ বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ তাঁহারা যেরূপ গহনা পরিতে ভাল বাসেন, তাহাতে টাকার লোক্‌সান অধিক হয়। তাঁহাদিগের গহনায় সোণা রূপা অপেক্ষা হীরা মুক্তাই অধিক থাকে। সোণা রূপার গহনা যত টাকায় গড়ান যায় তাহার সিকি বাদ দিয়াই বিক্রয় করা যাইতে পারে। হীরা মুক্তার গহনা বিক্রয় করিতে গেলে কখন কখন অর্দ্ধেক টাকারও অধিক লোক্‌সান করিতে হয়। গহনার সাজ করিতে অনেক সময় যায় বলিতেছেন, কিন্তু কয়েকখানি সোণা রূপার গহনা পরিতে আমাদিগের পরিজন বর্গের যে সময় যায়—বিবিদিগের কাপড়ের, রঙ্গের, পৌডারের সাজ করিতে তাহার শত গুণ অধিক সময় লাগে। আর গহনার নেসায় প্রকৃতির লঘুতা হয় যে বলিলেন, তাহা গহনার দোষ নয়, তাহা নেসা মাত্রেরই দোষ। গহনা

যে উদ্দেশ্যে পরা হয়, প্রকৃতির লঘুতা বা উদারতা সেই উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। যে স্ত্রীলোক গহনা পরে তাহারই প্রকৃতি লঘু, এরূপ বিবেচনা পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন মহামূর্খেরাই করিয়া থাকে।

অলঙ্কারনিবারিণী সভার সভ্যমহাশয় নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। অনুমান করি, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সভা যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন সে কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত সহজ নয়। ইংরাজী বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ দেশময় বিস্তৃত হইলেও তাঁহার সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি অবশ্যই মনে মনে মানিয়া থাকিবেন যে, অশিক্ষিতা বঙ্গমহিলারাই অলঙ্কার প্রিয় নহে। তাহারা কালক্রমে বিবি হইয়া উঠিলে অলঙ্কারনিবারিণী সভার কাজ বাড়িবে বই কমিবে না।

আমি সামান্য গৃহস্থ লোক। প্রথমাবস্থায় আমার মাসিক আয় দেড় শত টাকার অধিক ছিল না, কখন অধিক হইবে এমন মনেও করি নাই। আমি সেই সময় হইতে স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পরিবার মিতব্যয়িতা না শিখিলে আমার ভদ্রস্থতা নাই। এই ভাবিয়া আমি তাঁহার হস্তে মাসিক বেতনের টাকা গুলি দিয়া বলিতাম, "আমি যাহা উপার্জ্জন করি, সকলই তোমার। যাহাতে আমরা ভাল থাকি এরূপ আহার, আবাস পরিধেয় তুমি দিবে, অসময়ের নিমিত্ত কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। আর তোমার অলঙ্কার নাই—তাহাও কিছু কিছু প্রস্তুত করিতে হইবে।" * * *। "না না তাহা নয়। আমার বন্ধুবর্গ অনেকেই সম্পন্ন লোক। তাঁহাদিগের বাটীতে নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে যাওয়া আবশ্যক হইবে। নিতান্ত দুঃখিনীর মত গেলে আমার সুখ হইবে না। অতএব কিছু কিছু বাঁচাইয়া গহনা গড়াইতে হইবে।"

ঐ কথার পর কিছু দিন গেল। আমাদের খাওয়ার পরার কোন কষ্ট নাই। বন্ধুবর্গ আমাদের বাটীতে আসিলে ভোজনাদি করিয়া বলেন "তোমার বাটীতে রন্ধনের বড় পারিপাটা—আহার করিয়া এত তৃপ্তি আর কোথাও হয় না।" ছেলেদের পীড়া হইলে সাহেব ডাক্তার আনাইয়া দেখাইতে পারি। প্রায় প্রতি মাসেই কিছু কিছু সেভিংস্ বেঙ্কেও যায়। আমার সমান আয়বান আর কাহার বাটীতে ওরূপ হয় দেখিতে পাই না।

অন্যের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইলে দেখি, দ্রব্যাদি পাতে যথেষ্ট নষ্ট হয়, অথবা ভাণ্ডারে বাঁচে। আমার বাটীর ভোজে কিছুই নষ্ট হয় না, এবং প্রায় কিছুই বাঁচে না, ঠিক ঠাক হয়। অন্যের বাটীতে পীড়া উপস্থিত হইলে "অত ভিজিট দিয়া কেমন করিয়া ডাক্তার আনা যাইবে" এরূপ ভাবনার কথা শুনিতে পাই, আমার বাটীতে কখন ওরূপ কথা শুনিতে পাই না, ওরূপ কথা দূরে থাকুক, বরং জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় কাহার পীড়ার সংবাদ পাইলে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হই। প্রথম তিন চারি বৎসর মধ্যে কয়েকখানি গহনাও প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমার বিবেচনায় ঐ গহনায় যে টাকা বদ্ধ হইল, তাহা ব্যয়িত হইলে আমার যে উপকার হইত, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক উপকার হইয়াছিল। একটি ভাল পাচিকা, একটি পাকা মুহুরী, একটি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাখিতে হইলে আমার যে মাহিনা লাগিত—ঐ গহনা গুলিতে তাহা অপেক্ষা অধিক লাগে নাই। অধিকন্তু লাভ এই, স্ত্রী হিসাব পত্র করিতে শিখিলেন, দ্রব্যসামগ্রীর দর দাম করিতে জানিলেন, ব্রাহ্মণ এবং প্রীতি ভোজের ফর্দ্দ করিতে পারিলেন, এবং সর্ব্ব বিষয়েই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। আরও লাভ হইল, আমি পারিবারিক চিন্তা হইতে অনেক অবসর পাইলাম, এবং প্রথমজাত পুত্রটির লেখা পড়ার প্রতি যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে পারিলাম। আমি ঐ সময়ে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম। সেই বহিগুলি বিক্রীত হওয়ায় আমি এ পর্য্যন্ত যত টাকা পাইয়াছি, তাহার হিসাব করিলে আমার স্ত্রী যে কয়েকখানি গহনা গড়াইয়াছিলেন, তাহার দশ গুণেরও অধিক হইতে পারে।

আমার অর্থাগম পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল—গহনা গড়ানও চলিল। নূতন রকমের ভাল গহনা দেখিলেই সেইরূপ গড়ান হয়। কিছুদিন এরূপ হইলে আর গহনা গড়াইয়া তৃপ্তিবোধ হয় না। আবাসবাটী সুন্দর হওয়া চাই—গৃহ সজ্জা ভাল হওয়া চাই, গৃহস্থালীর দ্রব্যজাত পরিমাণে অধিক এবং প্রকারে বিচিত্র হওয়া চাই। ক্রমে সন্তবরূপ তাহাও হইতে লাগিল। গহনা গড়ান প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। নিজের অলঙ্কারপ্রিয়তা সাধারণ

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইল। বোধ হয়, আমার মত অনেক গৃহস্থের ঘরে এত অধিক এবং এত প্রকার গৃহোপকরণ নাই।

এ অবস্থাতেও গহনা গড়ান চলিল। নিজের নিমিত্ত বড় একটা নয়—অন্যের গহনা গড়াইয়া দিতে বড়ই আমোদ। সুখ সরোবর পূর্ণ হইয়া আশে পাশে উপচিয়া পড়িতে লাগিল। "অমুক তোমার আত্মীয়, তাহার আয়ও এত—সেদিন তাহার স্ত্রীকে দেখিলাম, তাহার অমুক গহনাটী আছে, অমুকটি নাই, এটী তাহাকে গড়াইয়া দিব। প্রথমে এত টাকা লাগিবে, তাহা নিজ হইতে দিব—সে মাসে মাসে এত করিয়া দিলেই এত মাসে শোধ যাইবে।" "তাহাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া লাভ?" "আমার লাভ কিছুই নাই—তাহার লাভ আছে। আমার ধার তাহাকে শুধিতেই হইবে—সুতরাং বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। ওর ত যত্র আয়, তত্র ব্যয়—এখন প্রায় কিছুই থাকে না।" * * * "অমুককে তুমি ভালবাস—সেও তোমার বাধ্য। কিন্তু তার মা মাগি বৌটীকে দেখিতে পারে না—গহনা পত্র কিছুই দেয় না। আমি এক ফিকির করিয়াছি—বৌকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছি—আমি দিলে আর তার মা কোন কথা বলিতে পারিবে না। সেও মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া আমার ধার শুধিবে;" * * * অমুকের সব ভাল, কিন্তু মদ খাওয়া দোষটা ছাড়াইতে পারিলে ভাল হয়। বৌকে গহনা গড়াইয়া দি—ধার শুধিতে টাকা ফুরাইয়া যাইবে—আর মদ খাইতে পারিবে না।"

এই প্রকার কথা প্রায় শুনিতাম। একদিন ঐরূপ কথা হইয়াছে, এমত সময়ে সুরাপান নিবারিনী সভার কোন সভ্য মহাশয়ের সন্দর্শন পাইয়া তাঁহাকে অলঙ্কারনিবারিনী সভার উদ্দেশ্য জানাইলাম এবং আমার স্ত্রী গহনা গড়াইয়া যে প্রকারে মদ্যপান নিবারণ করিতে চান, তাহারও গল্প করিলাম। সুরাপাননিবারিনীর সভ্য মহাশয় বলিলেন, এক্ষণে যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তা বর্দ্ধিত করাই শ্রেয়স্কর কার্য্য।

আমার বিবেচনায় গহনা গড়ান এমন দুষ্কর্ম্ম নহে যে, উহাকে নিবারণ

করিতে হয়। উহাতে উপকার বই অপকার হইবার সম্ভাবনা অধিক নহে। আমার মতে গহনার জন্য কচ্‌কচি করাই বড় দোষ। স্ত্রী স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া গহনা গড়াইবেন, ইহা ভাল নয়। তিনি গহনা পরিলে তুমি সুখী হইবে. তিনি যেন এই জন্যেই গহনা গড়াইতে চান। ঐ ভাবে গহনা গড়াইলে মিতব্যয়িতা, গৃহকার্য্যে দক্ষতা, শোভাপ্রিয়তা, এবং পরহিতে চিন্তা জন্মিবে, গৃহে লক্ষ্মী থাকিবে, অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত ফলই ফলিবে।

গহনা গড়ান সম্বন্ধে কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরও আর একরূপ বিষম ভ্রম আছে, দেখিয়াছি। আমার এক জন আত্মীয় একটী ভাল চাকুরী করিতেন। তিনি সেই চাকুরিটী ছাড়িয়া দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিয়া যাহা কিছু মূলধন পূর্ব্বে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া আপনার স্ত্রীর কয়েকখানি গহনা গড়াইয়া দিলেন। ও সময়ে ওরূপ করিলেন কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "আমি চাকুরী ছাড়িলাম বটে কিন্তু স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য, তাহা ত তাহাকে পাইতে হইবে।" আমি কিছুই বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে তিনটী কেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। "যখন চাকরি ছাড়িলে তখন স্ত্রীর মত করিয়া ছাড়িলে না কেন? গহনা স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্য হইল কেন? তাহাকে গহনা পাইতে হইবেই কেন?" তিনি আপন পত্নীর মনের ভাব কিরূপ বুঝিয়াছিলেন—অথবা তাঁহার প্রতি কিরূপ ভাবের আরোপ করিয়াছিলেন?—"তোমারই চাকুরী গিয়াছে, আমার ত যায় নাই"—এইরূপ ভাব না বুঝিলে আর ওরূপ কথা এবং ওরূপ কাজ হয় না।

——১০——

একাদশ প্রবন্ধ।

কুটুম্বতা

আমাদিগের কুটুম্বতা কাণ্ডটী বড়ই জটিল। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক না চলিতে পারিলে ঐ জটিলতানিবন্ধন যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। কুটুম্বতা কাণ্ডটি অত জটিল বলিয়া আজি কালি অনেকে কুটুম্বতার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে কুটুম্বতার ব্যবহার অনাদরের বস্তু নহে। বাহিরের লোকের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, কুটম্বতা তাহার সর্ব্ব প্রধান। বাহিরের লোকে তোমাকে কেমন চক্ষে দেখে, তাহা জানিবার উৎকৃষ্ট উপায় তোমার কুটুম্ববর্গ। কারণ বাহিরের লোক তোমাকে যেমন চক্ষে দেখে, কুটুম্বেরাও তোমাকে প্রায় তেমনি চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

কুটুম্বেরা যদি আর কিছুতেই তোমার সহিত সমহৃদয় না হন, তথাপি একটী বিষয়ে তাঁহাদিগের সমহৃদয়তা থাকিবেই থাকিবে। কুটুম্বেরা কুটুম্বের গৌরব খুঁজেন। জামাই, বেহাই, শ্বশুর, শ্যালক ইহাঁরা বড় লোক, পাঁচ জনে ইহাঁদিগকে জানে শুনে, এরূপ বলিতে এবং মনে করিতে সকলেরই সুখ বোধ হয়। কুটুম্ব সভা-উজ্জ্বল হইলেই মুখ উজ্জ্বল হইল। কুটুম্বকে ছোটলোক মনে করিতে হইলে আত্যন্তিক দুঃখ জন্মে।

কুটুম্বদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উপায় তাঁহাদিগকে সম্ভবমত আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং গৌরবের অংশভাগী করা। তুমি যে বড় কাজটী করিবে, তাহা একাকী হইয়া করিও না, তাহাতে আপনার কুটুম্ববর্গের সহায়তা এবং পরামর্শ প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিবে? ঘটক কুলীনকে কিছু দিবে? দুর্গোৎসব কিম্বা শিবপ্রতিষ্ঠা করিবে? কুটুম্ববর্গের সহিত অগ্রে পরামর্শ করিয়া ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যাহাতে খ্যাতি এবং মহিমার অর্জ্জন হয়, এমন কাজ কুটুম্বদিগের নিরপেক্ষ হইয়া করিও না। সাংসারিক সামান্য কার্য্যের পরামর্শে কুটুম্বদিগকে আহ্বান করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুটুম্বের চক্ষে ছোট লোক হইলে তোমার কুটুম্বেরা সত্য সত্যই কষ্ট পান।

কুটুম্বেরা বড় বড় তত্ত্ব চান বলিয়া যে প্রবাদ আছে, সে প্রবাদ অমূলক নয়। কিন্তু বড় বড় তত্ত্ব চাহিবার হেতু কুটুম্বের অর্থলোভ নহে, তোমারই গৌরবের প্রতি মমতা মাত্র। তত্ত্বের দ্রব্যাদি আসিলে তাঁহারা কি সমুদায় আত্মসাৎ করেন, না, প্রতিবেশিবর্গের বাটী বাটী বণ্টন করিয়া দেন? বণ্টন করিবার সময় তাঁহারা কি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কখন কখন স্ব স্ব ব্যয়ে ঐ দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন না। এগুলি কি লোভের কার্য্য?

ফলতঃ কুটুম্বকে ধনলুব্ধ জ্ঞান করা নীচাশয়তার চিহ্ন। কুটুম্বেরা তোমার খ্যাতি এবং গৌরব বৃদ্ধির লোভ করেন বটে, কিন্তু তোমার ধনের প্রতি তাঁহাদিগের লোভ নাই। কলিকাতা অঞ্চলের কোন কোন ব্যক্তি তত্ত্ব দেওয়া এবং তত্ত্ব লওয়ার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বের দ্রব্যাদি বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কুটুম্বতার যথার্থ ভাবটী বুঝেন না। আবার কোন কোন পল্লী-গ্রামবাসী কুটুম্ব দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে তাহার মূল্য ধরিয়া টাকা পাঠাইয়া দেন। ইহাঁরাও কুটুম্বতার যথার্থ প্রকৃতি বুঝেন না।

যাঁহারা কুটুম্বতার সুখভোগ এবং ঐ সম্বন্ধের শিক্ষা লাভ করিতে চান আমি তাঁহাদিগকে একটী সামান্য পরামর্শ দিতেছি। যদি তোমার অর্থ-সংস্থান অধিক না থাকে, এবং মিতব্যয়িতা রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে বার মাসে তের তত্ত্ব করিবার যে প্রথা আছে, তাহা পরিহার কর। বৎসরের মধ্যে যত বার তোমার সুবিধা হয়, তত বার মাত্র তত্ত্ব কর। কিন্তু যখন করিবে তখন ভাল করিয়াই কর। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে, কুটুম্বেরা সন্তুষ্ট থাকিবেন। আবার বলি—শত বার বলি—কুটুম্বকে অর্থলোভী জ্ঞান করিও না। তিনি তোমার গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত হইতে চাহেন, ইহাই মনে করিয়া কাজ কর। এটী কুটুম্বের দোষ, না গুণ? যিনি দোষ মনে করেন, তিনি নিতান্ত কৃপণ,—তিনি টাকার পুঁটুলি গলায় বাঁধিয়া মরুন। যিনি গুণ মনে করেন, তিনি কুটুম্বতা করিয়া বাহ্য সংসারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে এবং সুসামাজিক হইতে শিখুন।

লাভ হয়। যিনি কুটুম্বতার মূল প্রকৃতিটী না বুঝেন, তিনিই কুটুম্বের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন। দেখ, যাহা তুমি আমি এজ্‌মালিতে অধিকার করিয়া আছি, তাহা কদাপি পরস্পরকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় না—যাহা এজ্‌মালির নয়, এমন বিষয়ই অন্যকে দেখাইবার প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং কিছু দেখাইতে গেলেই তাহা যে এজ্‌মালির নয় এই কথা প্রকারান্তরে বলা হয়। অতএব যদি কুটুম্বের নিকট সাহঙ্কার ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ আপনার ধন, গৌরব, খ্যাতি, মহিমা, কুটুম্বকে দেখাইলে, তাহা হইলেই তাঁহাকে এক প্রকারে বলা হইল যে, যাহা দেখাইতেছি, তাহাতে তোমার অধিকার নাই—তাহা আমার নিজস্ব। এরূপ করিলেই কুটুম্বকে তাঁহার অধিকার হইতে ভ্রষ্ট করা হইল, এবং তাঁহার বিরাগের হেতু জন্মিল। কুটুম্ব তোমার গৌরবের অংশভাগী—তাঁহাকে তাঁহার অংশে বঞ্চিত করিতে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, যেমন এক পক্ষে কুটুম্বের সমীপে নীচ হইতে নাই, তেমনি পক্ষান্তরে কুটুম্বের নিকট অহঙ্কার করিতেও নাই। এইরূপ দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয় বলিয়াই কুটুম্বতার ব্যবহার যত্নপূর্ব্বক শিখিতে হয়। কুটুম্বেরাই সুসামাজিক হইতে শিখান। নিজ পরিবার হইতে ঐ শিক্ষালাভ হয় না। প্রণয়াস্পদ বন্ধুবর্গ হইতেও ঐ শিক্ষালাভ হয় না। কুটুম্বেরা এরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়াই এত সমাদর এবং গৌরবের বস্তু।

কোন কোন অশিক্ষিত দুর্ব্বলমনা ব্যক্তি কুটুম্বতার যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াও কুটম্বতার ব্যবহারে প্রকৃত পথের অনুসরণ করিতে পারেন না। তাঁহারা কুটুম্বদিগের মধ্যে মনে মনে দুইটি দল করিয়া লন। ঐ দুই দলের মধ্যে এক দলের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন, অপরের নিকট বিনীত এবং বিনম্র থাকেন। ইহাঁদিগের চক্ষে কন্যা সম্প্রদাতা কুটুম্বগণ এক দলস্থ, আর কন্যাগ্রহীতা কুটুম্বগণ অপর দলসম্ভুক্ত। ইহাঁরা প্রথম দলের পীড়ন এবং দ্বিতীয় দলের খোসামোদ করেন। এরূপ করাতে যে

গৃহাভ্যন্তরেও ফলিত হইয়া উঠে—বধূ এবং কন্যাগণের মধ্যে পরস্পর প্রবলতর ঈর্ষ্যার সূত্রপাত হইয়া যায়।

গৃহকর্ত্রী যদি সুশীলা এবং বুদ্ধিমতী হয়েন, তাহা হইলে কুটুম্বদিগের মধ্যে ঐ প্রকার দলভেদ এবং কন্যাবধূদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ নিবারণ করিতে পারেন। তিনি কন্যার শ্বশুরের যে প্রকার সমাদর করেন, পুত্রের শ্বশুরেরও সেইরূপ করিয়া থাকেন। মনে কর, কোন গৃহস্থের তিনটী কন্যার এবং একটী পুত্রের বিবাহ হইয়াছে; গৃহকর্ত্রী সুবোধ, তিনি আপন বৈবাহিক চতুষ্টয়ের এইরূপে নাম করণ করিলেন। বড় মেয়ের শ্বশুর বড় বেহাই, মেজো মেয়ের শ্বশুর মেজো বেহাই। কিন্তু পুত্র বধূটীর বয়স তাঁহার তৃতীয় কন্যার অপেক্ষা অধিক, অতএব পুত্রবধূকে সেজ মেয়ের স্থানীয় করিয়া তাঁহার পিতাকে সেজ বেহাই করিলেন। ছোট মেয়ের শ্বশুর ছোট বেহাই রহিলেন। এই ক্ষুদ্র উপায়টী বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইল। পুত্রবধূর পিতা কন্যাদিগের শ্বশুরসম্প্রদায় মধ্যেই রহিলেন—ভিন্ন দলসম্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন না। ঐ গৃহকর্ত্রী যখন কুটুম্বদিগের বাটীতে তত্ত্ব পাঠাইতেন, তখন, কন্যাগণের বাটীতেও যেরূপ পুত্রের শ্বশুরালয়েও অবিকল সেই রূপ পাঠাইতেন। তিনি কন্যাগুলির শ্বাশুড়ীদিগকেও পূজোপলক্ষে যেমন বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন, পুত্রবধূর মাতাকেও সেইরূপ দিতেন। তিনি "বৌয়ের বাপ," "বৌয়ের মা," এই দুইটী কথা মুখে আনিতেন না। তাঁহাদিগের উল্লেখ করিতে হইলে "সেজ বেহাই" "সেজ বেহানী" বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।

এইরূপ ছোট ছোট বিষয় লইয়াই গৃহস্থের সংসার ধর্ম্ম। এইরূপ ছোট ছোট কাজেই গার্হস্থ্যাশ্রমের শিক্ষা। যে ছোট কাজটীর উল্লেখ করিলাম, তাহার অভ্যন্তরে কতটা বিবেচনা, কতটা উদারতা আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হয়।

———০০০———

দ্বাদশ প্রবন্ধ।

জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞাতি শব্দটী এক্ষণে অনেক স্থলে শত্রুবোধক হইয়াছে। অমুক আমার সহিত জ্ঞাতির ব্যবহার করিলেন, এ কথা বলিলে অমুক আমার প্রতি শত্রুর ব্যবহার করিলেন, ইহাই বুঝা যায়। কেহ কেহ পরিহাস পূর্ব্বক উদাহরণ দিয়াও বলেন, "দেখ, অনুজ সহোদর সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জ্ঞাতি। কিন্তু উহাঁর কার্য্য কি কি? উনি গর্ভস্থ হইয়াই জ্যেষ্ঠকে শ্রীভ্রষ্ট করেন, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতৃস্তন্য এবং মাতৃক্রোড় কাড়িয়া লন, অনন্তর পিতৃ-স্নেহেও ভাগ বসান এবং পরিশেষে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশে বঞ্চিত করেন—ওরূপ পরম শত্রু আর কে আছে?"

কিন্তু জ্ঞাতি শব্দ সর্ব্বকালই এরূপ ভাবার্থ প্রকাশ করিত না। যখন সমাজ বৃহদাকার ধারণ করে নাই, রাজতন্ত্রতা প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হয় নাই, জনগণ স্ব স্ব গোত্রস্বামীর অধীন হইয়াই থাকিত, সেই সময়ে জ্ঞাতি ভিন্ন অপর কেহই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন এবং মিত্রতার পাত্র হইতে পারিত না। তখন জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ শুদ্ধ জন্মসম্বন্ধ বুঝাইত না। উহাতে প্রকৃত বন্ধুতা এবং মমতাই বুঝাইত।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞাতিগণ পরম বন্ধুই হইতে পারেন। জ্ঞাতি-দিগের মধ্যে পরস্পর সমহৃদয়তার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। বংশ মর্য্যাদার রক্ষা এবং সেই মর্য্যাদার সম্বর্দ্ধন জ্ঞাতিমাত্রেরই অভিপ্রেত। তুমিও যে পূর্ব্বপুরুষের সম্মান কর যাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাও, যাঁহাদিগের নাম করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান কর, তোমার জ্ঞাতিরাও সেই পূর্ব্বপুরুষের সম্মান এবং সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চান, এবং তাঁহাদিগেরই নামে আপনারা পরিচিত হন।

যখন জ্ঞাতিদিগের মধ্যে সমহৃদয়তার এমন দেদীপ্যমান কারণ রহিয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইতে

পারে না। স্বয়ং কিঞ্চিৎ অভিমানশূন্য হইতে হয়, পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হয় এবং জ্ঞাতিদিগের সহিত ব্যবহারকালে পূর্ব্বপুরুষের নজির উল্লেখ করিয়া কাজ করিতে হয়। এরূপ করিলে জ্ঞাতিদিগের অন্তঃকরণে প্রতিযোগিতা ভাবের উদ্রেক হয় না. তোমার সহিত তাঁহাদিগের যে প্রধান বিষয়টিতে একতা আছে, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ হইতে থাকে, এবং তুমি অনায়াসেই তাঁহাদিগের অনুরাগ এবং সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পার। জ্ঞাতিদিগের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র পর্য্যালোচন কর, এবং আপনার ক্রিয়া কলাপে তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারী করিয়া সেই পূর্ব্বপুরুষগণেরই পূজা করিতে থাক।

কালভেদে রীতি নীতি আচার ব্যবহার পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন হইয়া গেলেও পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্মরণ না করা যথেষ্ট অনিষ্টের হেতু। স্বর্গীয় পিতৃপিতামহদিগকে স্মরণ করিলে যদি আর কোন ফললাভ না হয় তথাপি কেহই যে পৃথিবীতে চিরকালের নিমিত্ত থাকিতে আইসেন নাই, এ তথ্যটীও মনোমধ্যে উদিত হইবেই হইবে; এবং তাহা হইলেই যে বহু স্থলে দুষ্প্রবৃত্তির বল খর্ব্ব হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় কি? ইতিবৃত্তে বলে, প্রাচীন মিশরীয়েরা অমিতাচার এবং অযথাচার নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ভোজনমন্দিরের মধ্যে এক একটী মনুষ্যকঙ্কাল সংস্থাপিত করিয়া রাখিত। সর্ব্বদা পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করা যাঁহাদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মনোমন্দিরে যেন ঐরূপ কঙ্কালসমস্ত সংস্থাপিত থাকে; সুতরাং রিপুদমন অবশ্যই তাঁহাদিগের অভ্যস্ত হয়। পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করায় কেবল মাত্র যে, সংসারের অনিত্যতা এবং জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতীয়মান হয়, এমত নহে। পূর্ব্বপুরুষেরা প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্ররূপেই সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পূর্ব্বপুরুষেরাই মূর্ত্তিমান দেবতা। অন্যের চক্ষে যিনি যেমন লোক হউন, নিজের বংশধরদিগের চক্ষে বোধ হয় কেহই নিতান্ত মন্দলোক হইতে পারেন না। একটী উদাহরণ দ্বারা এই কথার সপ্রমাণ করিতেছি।

ঠগি উপদ্রব নিবারক সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল স্লিমান সাহেব ঝরলপুর নগরে

একটী শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া তথায় কতকগুলি ঠগ এবং তাহাদিগের অপত্যবর্গের শিক্ষার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। কোন ঠগ এবং তাহার পুত্র ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উভয়েই বিলক্ষণ সচ্চরিত্র এবং কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন পরে ঐ ঠগের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র পিতৃবিয়োগে অধীর হইল। বিদ্যালয়ের সম্পাদক কাপ্তেন ব্রোণ সাহেব সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তই হউক, আর যে জন্যই হউক, তাহাকে বলিলেন, "তোমার পিতা ঠগ ছিল—কত নরহত্যা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই—তাহার মৃত্যুতে এত শোক করা অনুচিত।" পুত্র উত্তর করিল, "আমার পিতা ঠগ ছিলেন, এবং নরহত্যাও করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যখন ঠগ হওয়া এবং নরহত্যা করা মন্দ কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন না তখন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ঐসকল কার্য্যে দেবীর আদেশ আছে। কোম্পানি বাহাদুরের একবাল (শুভাদৃষ্ট) তখন দেবীকে পরাস্ত করে নাই। কিন্তু তাঁহার সাহস, বীরতা, ধীরতা এবং অধ্যবসায় কেমন ছিল, তাহা ত আপনি জানেন।" ঠগও মরিয়া তাহার পুত্রের হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যে মরে, সেই স্বর্গীয় হয়। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের স্মরণ করেন, দেবতাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাঁহাদিগের মনও পবিত্র হইতে থাকে।

জাতিবর্গের সংসর্গ পূর্ব্বপুরুষরূপ দেবতাদিগের পূজার উত্তেজক। অতএব যখন তাঁহাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে, তখনই ঐ পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। পূজাকালে অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষাদি দুষ্টভাব অবশ্য পরিহার্য্য। পূজার অবসানে পূজার শুভফল আনন্দ এবং প্রীতিলাভ অবশ্যই হইবে।

কিন্তু এমন পরম ধর্ম্মের সাধক—মানস পূজার প্রবর্ত্তক—যে জ্ঞাতিসংসর্গ, তাহা বহু স্থলেই আমাদিগের বিবেচনার দোষে পারমার্থিক শুভসাধক হইতে পায় না। জ্ঞাতিদিগের সহিত আমাদিগের ইহলৌকিক স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে। ঐ সম্বন্ধটী পূর্ব্ব হইতেই ছাড়াইয়া রাখা উচিত। পূর্ব্ব হইতে না ছাড়াইলে ঐ স্বার্থ ক্রমে ক্রমে অতি প্রবলরূপ ধারণ করে; এমন কি, উহার চরিতার্থতা অবশ্য করণীয় বলিয়াই গণ্য হয়। তাহা

হইলেই জ্ঞাতি বিরোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং সমস্ত পারমার্থিক প্রবৃত্তিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তুমি এবং তোমার অনুজ উভয়ে এক পিতৃ মাতৃ রূপ দেব দেবীর উপাসক। দুই জনে নিভৃতে বসিয়া বাপ মায়ের কথা কও—কি পবিত্রতা উপলব্ধ হইবে! কত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে! তাঁহাদিগের ইহলৌকিক লীলা সমস্ত স্মরণ করিতে করিতে তোমাদিগের চরিত্র কেমন অপূর্ব্ব নির্ম্মলভাব ধারণ করিবে। কিন্তু তোমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি অবিভক্ত রহিয়াছে, এখন কোন দোষ দেখিতেছ না। দুই ভ্রাতার খুব মিল—হরিহর আত্মা। কিন্তু অল্পকালেই দেখিতে পাইবে, ঐ ইহলৌকিক স্বার্থ সম্বন্ধ নিবন্ধন তোমাদিগের পারমার্থিক সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মিবে—প্রথমতঃ পিতৃমাতৃপূজায় অনাস্থা হইবে, অনন্তর কেহ কাহাকেও আর মনের কথা বলিতে পারিবে না—এবং পরিশেষে হয় ত উভয়কেই রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে।

অতএব কদাচিৎ জ্ঞাতির সহিত পৈতৃক অর্থ সংস্রব রাখিওনা। এখনই দুই ভাই মিলিয়া পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিয়া লও। দেশাচার ঐরূপ কাটাছেঁড়া ব্যবহারের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে শাস্ত্রে স্পষ্ট উপদেশই আছে। দায়ভাগকার তাদৃশ বিভাগের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র রক্ষা কর—পরিণামদর্শী হও—পূর্ব্ব পুরুষ পূজারূপ মহৎ ধর্ম্মের পথে কণ্টক রাখিও না। চক্ষু লজ্জা ত্যাগ কর—জ্ঞাতিত্বের শুভফলের আকাঙ্ক্ষী হও।

জ্ঞাতির সহিত পৈতৃক অর্থ সম্বন্ধ শূন্য হইতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞাতি প্রতিপালনে কোনরূপেই পরাঙ্মুখ হওয়া হইবে না। জ্ঞাতির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, তিনি আপনাকে গোত্রস্বামীর স্থানীয় জ্ঞান করিবেন। গোত্রস্বামী গোত্রের রাজা—কর গ্রহণ করিবার রাজা নন, প্রজাপালক রাজা। তিনি গোত্রস্থ সকলের সুখ সচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। কাহার কি জন্য অসুখ হইতেছে দেখিবেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন। গোত্রের কোন ব্যক্তি নীচ, অবমানিত বা অক্ষম হইলে গোত্রস্বামীর গায়ে লাগে। জ্ঞাতির প্রধান যে ব্যক্তি, তাঁহারও জ্ঞাতিদিগের ঐরূপ অবস্থা গায়ে লাগা আবশ্যক।

একধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালেই পরস্পর সহায়তা এবং উপকার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। খৃষ্টানেরা খৃষ্টানের, মুসলমানেরা মুসলমানের এবং জৈনেরা জৈনের উপকারে সমধিক রত হয়। যদি এইরূপ এক ধর্ম্মাবলম্বন পরস্পর উপচিকীর্ষার হেতু হয়, তবে এক পূর্ব্বপুরুষের উপাসক জ্ঞাতিগণ কি জন্য পরস্পর উপকারের পাত্র না হইবেন?

জ্ঞাতিবিরোধ স্ত্রীলোকদিগের কুমন্ত্রণা হইতে জন্মে, এই যে একটী প্রবাদ আছে, তাহা অমূলক নয়। স্ত্রীলোকেরা যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামী ও পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা দেবর, দেবরপুত্র প্রভৃতির মঙ্গল-কামনা তেমন সর্ব্বান্তঃকরণে করিতে পারেন না। সুতরাং যদি শ্বশুর অথবা স্বামী, জ্ঞাতিবর্গ হইতে আপনাদের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন না করিয়া সকলকে জড়াইয়া রাখেন, তাহা হইলেই স্ত্রীলোকদিগের মুখে বিরক্তি এবং অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু জ্ঞাতিদিগের হইতে পৈতৃক অর্থ সম্বন্ধ ছাড়াইয়া ফেল—দেখিবে, তোমার সহধর্ম্মিণী কখন জ্ঞাতিপালনে অথবা জ্ঞাতির সমাদরে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

———•‹———

ত্রয়োদশ প্রবন্ধ।

কৃত্রিম-স্বজনতা।

স্বজন অর্থে আপনার মানুষ। আপনার মানুষ নানাপ্রকারে হয়। কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ বা মিত্র। জ্ঞাতি ও কুটুম্বের মধ্যে প্রভেদ করিবার নিয়ম আছে—যথা. কেহ নিকটজ্ঞাতি, কেহ বা দূরজ্ঞাতি; কেহ নিকট কুটুম্ব, কেহ বা দূর কুটুম্ব। অশৌচ অথবা পিণ্ড সম্বন্ধের উপর জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের নৈকট্য দূরত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। সে সকল কথা শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সে বিষয়ে আমার কোন কর্থা বক্তব্য নাই; জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে নৈকট্য দূরত্ব বিচারের একটি অতি সহস্র উপায় আছে। তোমার সহিত সম্বন্ধাধীন যাঁহার স্বতন্ত্র রূঢ় আখ্যা হয়, তিনিই তোমার নিকট জ্ঞাতি বা নিকট কুটুম্ব;—যাঁহার যোগরূঢ় আখ্যা হয়, তিনি তদপেক্ষা দূর, এবং, যাঁহার স্বতন্ত্র আখ্যা না হয়, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরজ্ঞাতি বা কুটুম্ব। ভ্রাতা, ভগিনী, খুড়া, জেঠা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তোমার নিকট জ্ঞাতি। তোমার সহিত সম্বন্ধাধীন তাঁহাদিগের তাদৃশ রূঢ় আখ্যা হইয়াছে। ভাইপো, ভাইজী, খুড়তুতা ভাই, জেঠতুতা-ভাই, ইহাদিগের আখ্যা যোগরূঢ়—ইহাদিগের জ্ঞাতিত্ব দূরতর। জামাই-বেহাই, শ্যালক, শ্বশুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তোমার নিকট-কুটুম্ব। ইহাঁদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূঢ় আখ্যা তোমার সহিত সম্বন্ধজাত। বেহাই পো, শ্যাল-পো, শ্যালজায়া প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ দূরতর কুটুম্বতাবাচক। আমি যখন জ্ঞাতি অথবা কুটুম্বের উল্লেখ করিব, তখন নিকট জ্ঞাতি কিম্বা নিকট কুটুম্বের কথাই বলিতেছি, বুঝিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি স্বজন সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, এক প্রকার কৃত্রিম বা পাতান স্বজনতা আছে, আমি তাহারই বিষয়ে কিছু বলিব, মনে করিয়াছি।

স্ত্রীলোকেরা সম্বন্ধ পাতাইতে বিশেষ পটু বলিয়া বোধ হয়। 'সই' 'মকর' 'মিতিন' 'গঙ্গাজল' 'গোলাপফুল' 'বেগুণফুল' 'হোঁপারফুল' এবং

(আজি কালি কলিকাতা অঞ্চলে) 'ল্যাবেণ্ডার" 'পমেটন' প্রভৃতি অসংখ্য বিচিত্র নাম সকলই উহার প্রমাণ। সম্বন্ধ পাতাইবার প্রবৃত্তি স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থায় অধিক থাকে, বয়সের আধিক্য হইলেও ঐ প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ উপশম হয় না। তখন 'মা' 'ঝী' 'বৌ' 'বেটা" পাতান হইয়া থাকে। পাতান সম্বন্ধের দরুণ যাতায়াত, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, তত্ত্ব দেওয়া ও লওয়া চলে এবং গৃহস্থালীর কার্য্য বহুমুখ এবং সুবিস্তৃত হইয়া উঠে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এই কার্য্যটী পুরুষদিগের অশ্রদ্ধেয়। তাঁহারা ইহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং কখন কখন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাতান সম্বন্ধ কি জন্য এত অশ্রদ্ধেয় এবং বিরক্তিকর, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় কেহই তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না।

বাস্তবিক, পাতান সম্বন্ধের প্রতি বিরক্ত হইবার প্রকৃত কারণ কিছুই নাই। পৃথিবীতে কেহই চিরকাল থাকিতে আইসে না। দিন কয়েক মাত্র এখানকার আমোদ প্রমোদ—এবং সেই আমোদ প্রমোদও অপর পাঁচ জনকে লইয়া করিতে হয়। আপনি খাইলে পরিলেই কিছু সুখ হয় না পাঁচ জনকে খাওয়াইয়া পরাইয়াই সুখ। যখন আমরা এরূপ অবস্থায় অবস্থিত তখন যে কোন প্রণালীতেই হউক, সংসারে থাকিয়া যত অধিক সংখ্যক লোকের সহিত সম্পর্ক হয়, ততই ভাল বলিতে হইবে। অনুদার লঘুচিত্তেরাই নিতান্ত আপনার এবং পর ভাবিয়া চলে। তাহাদিগের মন ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার বলিয়া দেখিতে পায় না। পরকে আপনার করাই প্রকৃত কাজ. ভাবিয়া দেখিলে "নাহং" কে "অহং" করা বই পৃথিবীতে আর কাজ নাই। কিছু দেখিবে, কিছু শুনিবে, কিছু বুঝিবে, কিছু বলিবে, কিছু করিবে. যতই বল, যাহা তোমার নিজস্ব ছিল না, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লওয়া উহার তাৎপর্য্য। জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ত আপনার হইয়াই আছেন, যাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই —তাঁহাদিগকে আপনার করিবার নিমিত্তই সম্বন্ধ পাতাইবার ব্যবস্থা।

পুরুষেরা যে কারণে প্রণোদিত হইয়া যে প্রণালীতে পরস্পর বন্ধুতা করেন স্ত্রীলোকেরাও অবিকল সেই কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই প্রণালীতে

সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। বিশেষ এই, পুরুষদিগের মধ্যে বন্ধুতাভাবের বিশেষ বিশেষ নামকরণ তত অধিক হয় না, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হয়। উহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যেও বন্ধুতার অনেকরূপ নামকরণ হইত। এখনও দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। লেখকের পিতৃ পর্য্যায়স্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে "মিতা" 'সঙাৎ' 'বন্ধু" 'ভাই' পাতাইবার প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। রাজস্থান প্রদেশের 'রাখী বন্ধ ভাই' সহোদর ভাই অপেক্ষাও সমধিক সমাদরের বস্তু। জৈন মতাবলম্বী ওসোয়ালেরা অনেকেই 'ভাই" পাতাইয়া বহুসংখ্যক অজ্ঞাত কুলশীল নিরন্ন ব্যক্তিকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে সর্ব্বদেশেই সম্পর্ক পাতাইবার ব্যবস্থা স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতি সাধারণ ছিল। বৈবাহিক আচার তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে। আমাদিগের বৈবাহিক ব্যবহারে যে 'মিতবর' এবং 'মিত কন্যা'র সমাবেশ দেখা যায়, তাহা বরের মিতা বা মিত্র এবং কন্যার মিতিন বা মিত্রিণীকে বুঝায়। ইংরাজদিগের মধ্যেও 'ব্রাইডস্ ম্যান' এবং ব্রাইডস্ মেড্—বর কন্যার স্বজন স্বজনীর স্থানীয় হইয়া আছে। ফলতঃ সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারটি মনুষ্যস্বভাব সুলভ প্রণয় প্রবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধকার্য্য—উদারতাসাধনের প্রথম সোপান এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার পরিচায়ক।

তবে এই প্রথাটী কখন সবল কখন দুর্ব্বল, পুরুষদিগের মধ্যে অল্প স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক, কোন দেশে প্রচলিত, কোথাও বা লুপ্তপ্রায়, এরূপ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল যে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, তাহা ত মনুষ্য-জাতি সাধারণ, তবে দেশভেদে, সময়ভেদে, জাতিভেদে, ধর্ম্মজ্ঞানের ইতর বিশেষ হয় কেন? জড়োপাসনা, পৌত্তলিকতা, আত্মোপাসনা প্রভৃতি উপাসনাতে ভেদ জন্মে কেন?—ধর্ম্ম এবং প্রণয়-প্রণালী গঙ্গা যমুনার ন্যায় একই মূল হইতে উৎপন্ন, এক অভিমুখে এক উদ্দেশেই প্রধাবিত, এবং পরিণামে এক হইয়াই চলে। ধর্ম্মোন্নতির সোপানে যেটী পৌত্তলিকতার অবস্থা, প্রণয়োন্নতির সোপানে সম্বন্ধ পাতানটী তাহারই অনুরূপ অবস্থা।

সামাজিক উন্নতির সহিতও ধর্ম্ম এবং প্রণয়োন্নতির একটী গূঢ় সম্বন্ধ আছে। যত দিন মনুষ্য-সমাজ এক একটী গোত্র অর্থাৎ মিলিতপরিবারের আকার ধারণ করিয়া থাকে, তত দিন ধর্ম্মসম্বন্ধে জড় পদার্থ বিশেষের উপাসনা প্রবল হয়, এবং প্রণয় প্রণালী জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যেই একান্ত সম্বদ্ধ থাকে। অনন্তর সমাজ বহু গোত্র সমষ্টি দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে ধর্ম্ম-প্রণালী পৌত্তলিকতার আকার গ্রহণ করে, এবং প্রণয়প্রবৃত্তি কৃত্রিম-স্বজনতা সংগঠনে নিযুক্ত হয়। পরিশেষে সমাজের জটিলতা ও বিপুলতা সমুদ্ভূত হইলে ধর্ম্ম অনাম্য একেশ্বরবাদরূপে প্রতীয়মান এবং প্রণয়বৃত্তি আখ্যানশূন্য বন্ধুতাতে চরিতার্থ হইতে থাকে। মনুষ্য সমাজ আরও জটিল এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীময় সাধারণতন্ত্রতা এবং প্রজা-তন্ত্রতা প্রচলিত হইলে, রাজব্যবস্থা রাজার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে কার্য্য-কারিণী হইলে, ধর্ম্ম-প্রণালী কিরূপ রূপ ধারণ করিবে, প্রণয় প্রবৃত্তিই বা কি প্রকারে চরিতার্থ হইবার চেষ্টা পাইবে, তাহা মনে মনে চিন্তনীয়—কথায় ব্যক্ত করিবার নয়।

এতদ্দেশে স্ত্রীলোকদিগের সমাজ এখনও ক্ষুদ্রাকার। এত ক্ষুদ্রাকার যে, অনেক স্থলেই তাঁহারা স্বসম্পৃক্ত ভিন্ন অপর কাহার মুখদর্শন করিতে পান না। যেখানে তাঁহাদিগের সমাজ ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, যেখানে অপরাপর পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের সন্দর্শন এবং সাহচর্য্য জন্মিয়াছে—সেই স্থলেই কৃত্রিম স্বজনতার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সম্বন্ধ পাতানটি প্রণয়োন্নতির লক্ষণ—প্রণয়োন্নতির চরম ফল নয়। সেইরূপ পৌত্তলিকতাও ধর্ম্মোন্নতির লক্ষণ—তাহার চরম ফল নয়। কোন অবস্থার সহিত তুলনায় পৌত্তলিকতা অপকৃষ্ট, আবার কোন অবস্থার সহিত তুলনায় উহা উৎকৃষ্ট। সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারটীও সেই প্রকার—কোন অবস্থায় অপকৃষ্ট, এবং কোন অবস্থায় উৎকৃষ্ট। ইহা এক পক্ষে আদরণীয় এবং পক্ষান্তরে অবজ্ঞেয়।

কিন্তু কৃত্রিম-স্বজনতা শ্রদ্ধেয়ই হউক, আর অবজ্ঞেয়ই হউক, উহার অবলম্বনে সংসারাশ্রমী মনুষ্যের যে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি তোমার পরিবার মধ্যে উহার সূত্রপাত

হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিবে যে উহা আর তোমার অশ্রদ্ধার বিষয় হইতে পারে না। তখন যাহাতে ঐ ব্যাপারের শুভ ফল সমস্ত ফলে, তজ্জন্য যত্নবান হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। যেরূপে প্রণয়টী বলবৎ হয়, তাহার উপায় কর। তোমার স্ত্রীর "মকর" "মিতিন" প্রভৃতিকে আপনি "মকর" "মিতিন" প্রভৃতি যথাযোগ্য নামে সম্বোধন কর; সম্ভবমত তাঁহাদিগের সুখ দুঃখের অভিভাবক হও, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির পীড়াদিতে কাতরতা অনুভব কর, সময়ে সময়ে এমন কি তোমার স্ত্রী না বলিতে বলিতে তাঁহার স্বজনীদিগের তত্ত্ব করিতে বল। কৃত্রিম স্বজনদিগের তত্ত্ব করা অতি সহজ ব্যাপার। উহাঁদিগের সহিত প্রণয়ের সম্বন্ধ, মান সম্ভ্রম বংশমর্য্যাদার সম্বন্ধ নয়। তোমার যেমন ইচ্ছা—যেমন সুবিধা—উহাঁদিগকে তেমনি তত্ত্ব করিতে পার। ইহাঁরা তোমার স্থানে কেবল মাত্র স্মরণের প্রার্থী। অতএব কোটা মাছ দিয়াও উহাঁদিগের তত্ত্ব হইতে পারে। তত্ত্বের সামগ্রী তাঁহারা অপর কাহাকে দেখাইতে অধিকারী নহেন। আপনারা ভোগ করিতে পারেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। কৃত্রিম স্বজনবর্গকে ক্রিয়া কাণ্ডের উপলক্ষে আহ্বান না করিলেও ক্ষতি নাই। যদি আহ্বান কর, তাঁহাদিগের হস্তে কোন কার্য্যের ভার দিও না। কার্য্যের ভার দিলে প্রায়ই জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সহিত তাঁহাদিগের মনোমালিন্য এবং মতান্তর হইয়া কষ্টের কারণ হইবে। কিন্তু প্রীতি-ভোজে কৃত্রিম স্বজনগণকে আহ্বান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাদৃশ স্থলে তাঁহারাই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

কৃত্রিম-স্বজনদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ভোজাদির উপলক্ষ ব্যতিরেকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনা অসঙ্গত নয়। অসঙ্গত নয় কি—তাহাই ভাল। আপনারা প্রত্যহ যেমন শাক অন্ন খাও, ইহাঁদিগকে লইয়া তাহাই খাওয়াইবে, তাহাতে মানাপমান নাই। কেবল একত্র ভোজন, একত্র অবস্থান প্রীতিপাত্রদিগের পক্ষে যথেষ্ট। কৃত্রিম স্বজনতায় কুটুম্বতার ব্যবহার একান্ত পরিবর্জ্জনীয়। ওস্থলে কুটুম্বতা করিতে গেলেই দোষ জন্মে; স্বজনতার শুভ ফল যে প্রণয়বৃদ্ধি, তাহা না হইয়া, ঈর্ষ্যা, প্রতিযোগিতা, অভিমানাদি সমুৎপন্ন হয়; এবং গৃহকার্য্যে যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হইয়া উঠে।

স্ত্রীলোকদিগের হইতেই কৃত্রিম স্বজনতা অধিক পরিমাণে জন্মে। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই এই সম্বন্ধের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া প্রায়ই কুটুম্বতার সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলেন। পুরুষদিগের কর্ত্তব্য এমন স্থলে অশ্রদ্ধাখ্যাপন অথবা ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিয়া স্ব স্ব গৃহিণীকে প্রকৃত-পথবর্ত্তিনী করিয়া দেন! সেটী করাও বড় কঠিন কাজ নয়। তোমার বন্ধু আছেন? হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে বল, তাঁহাকে লইয়া একত্র ভোজন করিবে। ভোজনের নিমিত্ত কোন বিশেষ উদ্যোগ করাও নিষেধ কর। আর এক দিন তোমার বন্ধু তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন; ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ভোজন করিতে বইস। "উদ্যোগ কিছুই হয় নাই।" "নাই হইয়াছে?" আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক এইরূপ ব্যবহার করিলে তোমার স্ত্রীও তাঁহার 'মকর' 'মিত্তিন' লইয়া ঐরূপ ব্যবহার করিতে শিখিবেন। "কৈ তোমার দিদিকে আনিতে লোক পাঠাইলে—কিন্তু তোমার 'মকরের' নিমন্ত্রণ করিলে না?" * * * "ছেলের বে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, ঠাকুর. ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ, এ সকল কাজে আমি মকরকে আনিতে ভাল বাসি না। তুমি যখন ওমাসে বাটী হইতে আসিবে, তখন মকরকে আনিয়া দশ দিন রাখিব, মনে করিয়াছি।" যে স্ত্রীলোক ঐ প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি কৃত্রিম স্বজনতা সম্বন্ধে যাহা মনে করা উচিত, তাহাই মনে করিয়াছিলেন।

—:*::*:—

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ।

অতিথি সেবা।

"এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়।" এই জনপ্রবাদে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম—করিতাম বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এদেশে আতিথ্য সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। পূর্ব্বে কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী অতিথি আসিলে অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না—বাটীতে যেন একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন, গৃহ প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন কি স্বপাকে খাইবেন, অতি সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। গৃহপ্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন শুনিলে যেন কৃতার্থ হইতেন এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোক জনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন পর্য্যন্ত আপনারা কেহ জলগ্রহণ করিতেন না।

আজি কালি আর ওরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন স্বপাকে ভোজী অতিথি, সহরের কথা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। আর যাঁহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থ তাদৃশ স্থলে বিরক্তি সংগোপনে সতর্ক হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে—নিকটে দোকান—সরাই—সদাব্রত অথবা হোটেল আছে, ইঙ্গিতক্রমে এরূপও বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভাল লোক আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে সম্মত হয়েন না। এখনকার অতিথির মধ্যে অধিকাংশ লোকই উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সন্ন্যাসী বা সাধু; ইহারা সদাব্রতে পেট টালিয়া

এবং গাঁজা খাইয়া বেড়ায়; ফলকথা, প্রকৃতরূপ অতিথি-সৎকার কাল-ক্রমে যে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। যতদিন একান্ন বর্ত্তিতা থাকিবে, যতদিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তায় উদ্বেগে এদেশের লোকেরাও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্বেজিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন আতিথ্য ব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহকারে যতই এদেশের লোকেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে, এবং পরস্পর অথবা আগন্তুক অপর জাতীয়দিগের প্রতিযোগিতায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইবে না, ততই ইউরোপের ন্যায় এতদ্দেশেও আতিথ্যধর্ম্মের হ্রাস হইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই—এখনও অতিথি সৎকার করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ধরা যায়—এখনও আমরা এই ধর্ম্মপালনের ফলভোগী হইতে পারি।

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথিসৎকারের কথা মনে করিতেছি, সে প্রকার অতিথি সচরাচর জুটে না। তিনি কোন পরিচিত বা ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন। তিনি কোন ভদ্রলোক—কার্য্যগতিকে অসময়ে তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মনে কর—বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার স্নান ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটা ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে তাঁহার জন্য কোন যোগাড় করিও। সকল কাজ চাকর চাকরাণীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুধ থাকে, তাহার কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়া গিয়াছে। অতিথির নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করিও না, কিন্তু যে দিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন, সে দিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা

যেন অতিথির খাওয়াটী ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা করিও। যদি অতিথির সৎকার করায় বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগে কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, তবে অতিথি সৎকারে সমগ্র ফল লাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহার উপভোগের ত্রুটি না হইয়া অতিথির সম্যক্ সৎকার হয়, সে বাটীতে মিতব্যয়িতার নিয়মগুলিও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না, এমন বলা যাইতে পারে।

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। নিজের বিদেশ পর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে সেই বিষয়েই কথা কহিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উত্তম সৎকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

কখন কখন এমন সকল লোককে অতিথি হইতে হয়, যাঁহারা স্থানমাত্রের অথবা দ্রব্যবিশেষের প্রার্থী হইয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন রীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি তাদৃশ অতিথির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যদি আমার দ্রব্যই খাবেন না, তবে শুদ্ধ জায়গা দিব কেন?—অথবা যদি সিধাই লইবেন না, তবে একটু দুগ্ধ কিম্বা মৎস্য দিয়া কি হইবে?—এই সকল লোক আতিথ্য-সম্পাদনে যে পুণ্য লাভ হয়, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই পুণ্যের প্রতি একান্ত লুব্ধ। কিন্তু লোভ মহাপাপ—পুণ্যের প্রতি যে লোভ, তাহাও পাপ। অতএব ঐ পুণ্যের লোভও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহার যেটী প্রয়োজন তাহাকে তাহাই দিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার ঘরে বসিয়া অতিথি আপনার দ্রব্য খাইবেন, ইহাতে লজ্জা বোধ করা রাজস প্রকৃতির লক্ষণ—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক স্বভাবের লক্ষণ নয়।

তবে একটী কথা আছে, ওরূপ অতিথির নিকট স্বয়ং থাকিয়া আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। তাঁহার জন্য স্বহস্তে কোন যোগাড় করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই।—তাঁহার পরিচর্য্যায় দাস দাসীর নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে অতিথির আজ্ঞা সকল সত্বরে পালন করিবার আদেশ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য দান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মুষ্টিভিক্ষা দান অতি সৎকার্য্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। ভিখারীর শরীর সবল এবং কর্ম্মক্ষম; অতএব তাহার ভিক্ষা করা উচিত নয়, তাহার খেটে খাওয়াই উচিত—এ সকল বিচার গৃহস্থকে করিতে হইবে না। উহা সমাজের বিচার্য্য বিষয়। তোমার দ্বারে যে ভিখারী আসিল তুমি তাহার প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া এবং চাকর চাকরাণী কাহাকেও কটুভাষা কহিতে না দিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, সে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাউক। ঐ ভিক্ষাদান কার্য্যটী বাটীর শিশুদিগের হাত দিয়া করানই ভাল। মুষ্টি ভিক্ষা ভিন্ন আরও নানা প্রকার চাঁদায় গৃহস্থকে অর্থদান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য, পুস্তকালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, বাপ মা মরা দায়ের জন্য, বারোএয়ারির জন্য, দুর্ভিক্ষ পীড়া নিবারণের জন্য, গৃহস্থকে প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু দান করিতে হয়। আমার বিবেচনায় ঐ সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যাত করিতে নাই। সকলকেই কিছু কিছু দান করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে একটী কথা আছে—দিব বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়ার চেয়েও অধিক দোষাবহ। বরং চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করিয়া একেবারেই দিব না বলা ভাল, কিন্তু দিতে স্বীকার করিয়া কোনমতেই টালমাটাল করা উচিত নয়। যেটি দিবে বলিবে সেটী ঠিক সময়েই যথা পরিমাণে দিবে। ফলকথা, দান ধর্ম্মের মূল সূত্র এই, দাতা এমন ভাবে দান করিবেন, যেন গৃহীতার বোধ হয় যে, উনি দান করিতে পাইয়া আপনাকে উপকৃত এবং কৃতার্থ মনে করিতেছেন। দান ধর্ম্মের এই মূল সূত্র সম্যক্‌রূপে সংরক্ষিত হইবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে দানের মুখ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা, সংসারবিরাগী ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানির ভাজন হয়েন না। তাঁহারা দান গ্রহণ দ্বারা দাতারই বিশেষ উপকার করিলেন, এরূপ মনে করিতে পারেন।

পঞ্চদশ প্রবন্ধ।

পরিচ্ছন্নতা।

পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সেই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। বাহ্যব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়—শরীর কিছু নয়—সংসার কিছু নয়—এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্য করণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটী আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুর ঘর যে ভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেই ভাবে রাখিলেই হইল। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর এবং মহাগুরু স্বামীর ঘর কি ঠাকুর ঘর নয়?

বস্তুতঃ শুচিতাপ্রিয় য়িহুদীদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্প হয়। তাহার কারণ এই যে, গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত অতি সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে আদেশ আছে, এবং য়িহুদীরা আপনাদের শাস্ত্রের আদেশ সমস্ত ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে সকলেই চায়—উহা ধর্ম্ম্য, স্বাস্থ্যকর এবং সাক্ষাৎ সুখপ্রদ। কিন্তু এ কথাও বলি, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য

ব্যাপার; লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্যক্ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানও ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, এই জন্যই পরিচ্ছন্নতা সাধনের মূল মন্ত্রগুলি, লক্ষ্মী সাধনের মূলমন্ত্র হইতে অভিন্ন। ঐ মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী ব্যাপার। গৃহোপকরণ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে হইলেই তাহাদিগকে ছড়াইয়া রাখিবার যো নাই; যথাস্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হয়, এবং তাহা রাখিলেই গৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়।

সকল দ্রব্য হইতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধন হইতে পারে। ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, কুটুনার খোসা, ঘরের আবর্জ্জনা—এমন সকল পদার্থও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ছেঁড়া কাগজ এবং ছেঁড়া নেকড়া ঘরের যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিও না, একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রাখ; দিন কয়েকের মধ্যেই এত জমিয়া যাইবে যে, বদল দিয়া নূতন কাগজ পাইতে পারিবে। আনাজের খোসা, ডাইলের ভূষি ঘরে ছড়াইয়া রাখিলে ঘর নোঙরা দেখাইবে, তুলিয়া একটা কোন পাত্রে জমা কর; পোষিত গরু বাছুর ছাগলাদির খাদ্য হইবে। ঘর ঝাঁইট দিয়া যে ধূলা এবং আবর্জ্জনা পাওয়া যায়, তাহাও জড় করিয়া ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। অতএব পরিচ্ছন্নতা সাধনের একটী প্রধান সূত্র এই যে, ঐ প্রকার দ্রব্য সকল রাখিবার পৃথক পৃথক স্থান এবং পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে, এবং দ্রব্য সকল যার যে স্থান তথায় রাখিতে অভ্যাস করিবে—নিজে অভ্যাস করিবে, এবং পরিজনকেও অভ্যাস করাইবে। ঐরূপ করা এবং করান অভ্যস্ত হইলেই অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে, এবং ঘরদ্বার ঝরঝরে দেখাইবে।

দ্রব্যজাত বে-কেজো করিয়া রাখা সম্পত্তিরক্ষা এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং গৃহের দ্রব্যজাত যে অবস্থায় থাকিলে বে-কেজো হয়, এমন অবস্থায় রাখিতে নাই। কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া কি অন্যরূপে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেই তাহাকে অবিলম্বে সারাইয়া কিম্বা বদলাইয়া

লওয়া উচিত। এই নিয়ম প্রতিপালন অভ্যস্ত হইলে অনেক অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া এবং ঘরও পরিচ্ছন্ন থাকে।

গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরেই ধনক্ষয় হয়। রৌদ্র জল বায়ু এবং কীটাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরন্তরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্য সকলকে এমন অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিবে, যাহাতে ঐ প্রকার ক্ষয় যতদূর সম্ভব, নিবারিত হইতে পারে। সেঁতসেঁতে না হইলে, ময়লা না ধরিলে, মরিচা না পড়িলে, দ্রব্য সকল অধিক দিন টিকে। অতএব গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত যাহাতে যথাপরিমাণ শুষ্ক, পরিষ্কার এবং ঝক্‌ঝকে থাকে তাহার জন্য যত্ন করা অভ্যাস করিতে হয়। তাহা করিলেই পরিচ্ছন্নতা সাধিত হয়।

গৃহ-বাসী প্রাণিমাত্রকে যে পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, তাহা অর্থশাস্ত্র এবং শারীর শাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই অভিমত। ও বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; এই মাত্র বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব যে, গৃহপালিত জীবগণের, আপনাদিগের সন্তান সন্ততিগণের এবং দাস দাসী প্রভৃতি পরিজনগণের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিলেই সমুদায় কাজ হইল না। গৃহিণীকেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া স্বয়ং পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটী গূঢ় অভিমান আছে—সেটী ভাল নয়; যিনি চেষ্টা করিয়াও পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মীচরিত জ্ঞান এখনও সুপক্ক হয় নাই। যিনি বাঁদী এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী—তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

——(*)——

ষষ্ঠদশ প্রবন্ধ।

—:*::*:—

চাকর প্রতিপালন।

চাকরেরা চুরি করে, এখন অনেকেই এই কথা বলেন; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চাকরদিগের যত দোষ হয়, সমুদায়ই প্রায় মনিবের দোষে জন্মে। চৌর্য্য, শঠতা, ধূর্ত্ততা, মিথ্যা কথন—এ সব ভীরুতার কার্য্য—নৈষ্ঠুর্য্যের অবশ্যম্ভাবি ফল। তুমি ভৃত্যের পীড়ন কর, ঐরূপে তাহার প্রতিশোধ পাইবে।

কর্ত্তার জানা উচিত যে, যাহারা তাঁহার নিতান্ত অধীন তাহাদিগের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার অবৈধ। তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলে নিজের মন কঠিন এবং প্রবৃত্তি নীচ হয়; ও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগের দোষের সংশোধন হয় না। কোন কোন বাটীর কর্ত্তা চাকরকে মারেন। বলিতে কি, যিনি ওরূপ করেন, তিনি আমার চক্ষের বড়ই নীচ-প্রকৃতিক। তুমি প্রহার করিলে যদি চাকরও প্রহার দ্বারা তাহার শোধ দিতে পারিত, তবে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু যখন চাকরের সাধ্য নাই যে, তোমার গায়ে হাত তুলে, তখন তুমি কি বিবেচনায় তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হও? যদি বল, বাপ ত ছেলেকে মারিতে পারেন, কিন্তু ছেলের সাধ্য নাই যে, বাপের গায়ে হাত তুলে। আমিও তাহাই বলি, যে ভাবে ছেলের গায়ে হাত তুলিয়া থাক, চাকরের গায়েও সেই ভাবেই হাত তুলিতে পার। কিন্তু আজি কালি ছেলেকেও প্রহার করা কমিয়া আসিতেছে। শিক্ষাবিধান হইতে শারীরদণ্ড প্রায় উঠিয়া গেল। কিন্তু ছেলের প্রতি প্রহারের প্রয়োগ ন্যূন হইয়া চাকরের প্রতি উহা বাড়িতেছে কেন?

নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, চাকর মারা রোগটি আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। উটী অবৈধ অনুকরণের ফল। ইংরাজ মনিবেরা এ দেশীয় চাকরদিগকে মারেন। যাঁহারা সাহেবদিগের সকল কাজই সোণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও চাকরদিগকে মারেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, ইংরাজেরা স্বজাতীয় চাকর দিগের

গায়ে হাত বড় একটা তুলেন না। ফলতঃ স্থূলকথায় শারীর দণ্ডটী মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবার নহে। উহা পশুর প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে। বিজিত, বিমর্দ্দিত, অবজ্ঞাত মনুষ্যগণকে গর্ব্বিত স্বভাব লোকে পশুবৎ জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু একবর্ণসম্ভুক্ত, একভাষা ভাষী, এক ধর্ম্মাবলম্বী চাকর মনিবে এরূপ জ্ঞান সম্ভবে না। মনিব ধনশালী বলিয়া মানুষ, আর চাকর ধনহীন বলিয়া পশু হইতে পারে না। অমন স্থলে চাকর পশু হইলে মনিবও পশু হইবেন।

আমার একজন আত্মীয়ের সহিত চাকর মারা রোগ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, "এখানকার চাকর মনিবে পূর্ব্বাপেক্ষা পার্থক্য বাড়িতেছে। তখনকার মনিবেরা কিয়ৎপরিমাণে চাকরদিগের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহারা চাকরদিগের সহিত সমকক্ষভাবেই অনেক বিষয়ের আলাপ করিতেন, এই জন্য তখনকার চাকরদিগের মনিবের প্রতি অধিকতর স্নেহ মমতা জন্মিত। এখনকার মনিবেরা উন্নত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা চাকর দিগের প্রতি অনুজ্ঞামাত্র করিতে পারেন, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া আলাপ করিতে পারেন না। এই জন্য চাকর মনিবে স্নেহ সম্বন্ধ অল্প হইয়াছে, এবং মনিবেরা চাকরদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।" আত্মীয়বরের মতে এটী সভ্যতা বৃদ্ধির একটী লক্ষণ।

আমার বিবেচনায় ঐ মীমাংসা যথাযথ নহে। আমাদিগের মাতৃভূমি পরাধীন। পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বদেশীয় উচ্চপদস্থদিগের অবস্থার অবনতি। কোন জাতি যত দীর্ঘকাল পরাধীনতা ভোগ করিবে, সেই জাতির উচ্চপদস্থেরা ততই অবনমিত হইবেন—কদাপি উন্নমিত হইবেন না। তদ্ভিন্ন, সাম্যবাদী ইংরাজ জাতির প্রভুতায় এদেশীয় নীচপদস্থ লোকেরা উন্নত বই অবনত হইতেছে না। রাজব্যবস্থা এতদ্দেশজাত সকল লোককেই সমচক্ষে দেখিতেছে। শিক্ষাপ্রণালী দীন দুঃখী প্রজাবৃন্দের চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া সমৃদ্ধিশালী করিতেছে। বর্ণভেদ, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন প্রথা সমাজের অন্তর্ভূত মর্য্যাদা রক্ষা করিত, সেই সকল প্রথাও দিন দিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। এখন এতদ্দেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই।

প্রত্যুত তাহার বিপরীত কারণ সমস্তই বিদ্যমান। ফলকথা, পরাধীনতা সত্ত্বে কখন কোন সমাজের অন্তর্ভূত উচ্চাবচভাব সমর্দ্ধিত হইতে পারে না। উহা ক্রমশঃ অপনীত হইয়াই যায়। আমাদিগের মধ্যে যে তাহাই হইতেছে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। ব্রাহ্মণ বাটীর ভোজে তিলি, তামুলি, কামার, কুমার সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া খায়। আমরাও সর্ব্বোচ্চ ইংরাজ জাতির সমক্ষে পরস্পর পার্থক্যভাব পরিহারপূর্ব্বক একপঙ্‌ক্তিক হইয়া আসিতেছি। এখন যিনি বড় হইব মনে করিতেছেন, তিনি কেবল খুঁড়িয়ে বড় হইতেছেন। বাস্তবিক যাঁতার চাপে, সকল কলায় একসা হইতেছে।

আমার চাকরটী পূর্ব্বে একটি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিল। সে বোধোদয়, চারুপাঠ পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পুস্তক গুলির কিছু কিছু জানে। যখন আমার ছোট ছেলেটী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ বলিয়া লয়, সে দাঁড়াইয়া শুনে এবং ভুল হইলে দুই একটি ধরিয়া দিতে পারে। তাহারই বাপ আমার পিতৃঠাকুরের নিকট চাকুরী করিত। সে লেখা পড়ার কোন ধার ধারিত না। আমার পিতৃঠাকুরের এবং আমার চাকরের বাপের মধ্যে যে অন্তর ছিল, আমাতে এবং আমার চাকরে তত অন্তর নাই, অথচ আমার পিতা তাঁহার চাকরের গায়ে হাত তুলিতেন না। আমি আমার চাকরকে মারিলেও মারিতে পারি—অন্ততঃ যদি মারি, আমার সমকক্ষ ব্যক্তি আমার বিশেষ কোন নিন্দা করিবেন, বোধ হয় না।

কিন্তু আর ও সকল কথায় কাজ নাই। বিচারের, হেতুবাদের, যুক্তিকাটাকাটির সীমা পাওয়া দুর্ঘট। মনে করিলেই নূতন যুক্তি, নূতন হেতুবাদ, নূতন তর্ক, বাহির করা যাইতে পারে। তুল্য বুদ্ধিমান দুই জনের মধ্যে বিতণ্ডার শেষ হয় না। অতএব একটি প্রকৃত বৃত্তান্ত বলি। কোন ভদ্র পরিবারের সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ঐ বাটীর কোন চাকর কখন কিছু চুরি করে নাই। টাকা, পয়সা, গহনা তাহাদিগের হাতে পড়িত, কিন্তু পাইলেই আনিয়া দিত। ঐ বাটীর গৃহিণী এক দিন কর্ত্তাকে বলিতেছিলেন—"আমি মনে করি, চাকরেরা ছেলেদের চেয়েও অধিক দয়ার পাত্র। ছেলেরা তোমার আমার কাছেই থাকে; যখন যা চায়,

তখন তাই পায়। ছেলেদের ব্যারাম হইলে তুমি আমি কাছ ছাড়া হই না। চাকরেরা পীড়ার যাতনায় অধীর হইয়া 'বাবা গো' 'মা গো' করিয়া চীৎকার করে; উহাদের বাপই বা কোথায়? মাই বা কোথায়? তুমি আমিই ওদের বাপ মা। তুমি চাকরকে বড় বিশ্বাস করিলে ত তাহার হাতে বাক্সের চাবিটী দিলে, কিন্তু চাকর তোমারই দয়ার উপর আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া রহিয়াছে।"

ঐ বাটীতে চাকরদিগের সাময়িক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম ছিল। প্রতি-বর্ষেই চাকর চাকরাণীদিগের কিছু কিছু মাহিয়ানা বাড়িত। ঐ বাটীতে চাকরেরা ইচ্ছা করিয়া বেতন ফেলিয়া না রাখিলে কাহার বেতন বাকী থাকিত না। সকলেই কড়া গণ্ডা বুঝিয়া পাইত।

ঐ বাটীতে চাকরদিগের মধ্যে যাহার যে কাজ, তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু এক জনের পীড়া হইলে কি কেহ ছুটী লইলে অপরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কাজ আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত।

ঐ বাটীতে ছুটীর জন্য চাকরের মাহিয়ানা কাটা যাইত না। পীড়ার চিকিৎসার এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যয়ও তাহারা সংসার হইতে পাইত, এবং কখন কাহাকেও হাঁসপাতালে পাঠান হইত না।

ঐ বাটীর চাকরেরা মিথ্যাবাদী এবং চোর হইত না।

সপ্তদশ প্রবন্ধ।

—•(০)•—

পশ্বাদি পালন।

মনুষ্যের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডল এমন অনেক প্রকার প্রাণীর নিবাসভূমি ছিল, যাহাদিগের নাম গন্ধও এক্ষণে নাই। মনুষ্যের সমকালে প্রাদুর্ভূত প্রাণিগণও অনেকে বিকৃত, পরিবর্ত্তিত এবং লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে মানুষের বুদ্ধি এবং ক্ষমতা যত বাড়িতেছে, অন্যান্য জীবগণের মধ্যে ততই কোনটী বা বিনাশ দশার সমীপবর্ত্তী হইতেছে, কোনটী বা মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। যে জীব মানুষের কোন কাজে লাগে, সেই জীবই বাঁচিতে পায়; যে মানুষের কোন কাজে না লাগে, সে জন্তুর আর বাঁচিয়া থাকিবার অধিক আশা করিতে পারা যায় না। জীবলোকের মধ্যে চিরকালই এইরূপ এক জীব অন্য জীবকে নষ্ট করিয়া আসিতেছে। ভূমণ্ডলের জীবপ্রতিপালন শক্তি যতই অধিক হউক ঐ শক্তি অসীম নয়। সুতরাং অত্রত্য এক প্রকার জীবের বৃদ্ধিতে অপর প্রকার জীবের বিকৃতি, হ্রাস এবং বিনাশ সাধিত হইয়া যায়, মনুষ্যের বৃদ্ধিতে সকল জন্তুর সেই দশা হইয়া যাইতেছে। এখন মানুষ পৃথিবীর রাজা। তিনি আপনার কোন কাজে লাগাইবেন বলিয়া যাহাকে রাখেন, সেই থাকে। তাঁহার সংরক্ষিত জীবের মধ্যে গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ, কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু প্রধান—কতকগুলি পক্ষীও মনুষ্য-কর্ত্তৃক পালিত হয়—যথা, টিয়া, কাকাতুয়া, কোকিল, ময়না, দোয়েল, শ্যামা প্রভৃতি। প্রায় এমন গৃহস্থের ঘর নাই, যাহাতে কোন পশু বা পক্ষীর পালন না হইয়া থাকে; অনেক পশু পক্ষী মনুষ্যের সাক্ষাৎ প্রয়োজন সাধন করে। গোরু হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়, ঘোড়াদ্বারা যাতায়াতের সৌকর্য্য হয়, ছাগ মেষাদির দুগ্ধ এবং মাংস মনুষ্যের খাদ্য। কুক্কুর বাটীর চৌকীদার—বিড়াল ইঁদুর মারে। কিন্তু এই সকল দৈহিক এবং বৈষয়িক প্রয়োজন-সাধন ভিন্ন পশু পক্ষ্যাদি পালনবশতঃ গৃহস্থের অনেকগুলি আধ্যাত্মিক উপকারও লাভ হইতে পারে। আমি তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

পশ্বাদি পালনদ্বারা অতি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ হইতে উহাদিগের সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্য ঔচিত্য অনৌচিত্যবোধ পৃথগ্‌ভূত নয়। ঐ সকল বিষয়ে মনুষ্য এবং পশু উভয়েরই বুদ্ধি এবং সংস্কার একবিধ —কেবল মাত্রায় ভিন্ন। মাত্রা ভেদ পরস্পর মনুষ্যদিগের মধ্যেও আছে। যাহা হউক, মনুষ্যের বুদ্ধি ও পশ্বাদির সংস্কার যে এক পদার্থ এই তথ্যটীর জ্ঞান আজ পর্য্যন্তও সকল লোকের মধ্যে সমপরিমাণে সুপরিস্ফুট হয় নাই। ইহা আমাদিগের আর্য্য শাস্ত্রকারেরাই বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহারা বলিতেন জীব নিজ কর্ম্মবশে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সকল জীবই এক—বিভিন্ন নয়। খৃষ্টানেরা এবং মুসলমানেরা ওরূপ বলেন না। তাঁহাদিগের মতে পশ্বাদির শরীরে অবিনাশী আত্মা বিদ্যমান নাই—উহা কেবল মাত্র মনুষ্য শরীরেই আবির্ভূত। কিন্তু যে সকল নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিত পশ্বাদির প্রকৃতি পরীক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, মনুষ্য এবং পশুতে ওরূপ পার্থক্যের আরোপণ অমূলক কল্পনা মাত্র। তাঁহারা জানেন যে, একই অপ্রতর্ক্য শক্তি জড়পদার্থে জড়ধর্ম্মরূপে; উদ্ভিদে অন্তঃসংজ্ঞারূপে, পশুপক্ষ্যাদিতে অস্ফুট সংস্কার রূপে—এবং মনুষ্যে প্রজ্ঞারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারা আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায় এই মায়াপ্রপঞ্চময় জগতের মধ্যে এক নিত্য সদসদাত্মক বস্তুর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গৃহীমাত্রেই আপনাপন পালিত পশু পক্ষ্যাদির বৃত্তি সমুদায় অভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত জ্ঞান লাভের পথ স্বয়ং আবিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। যিনি ঐরূপ করিয়াছেন তিনিই দেখিয়াছেন যে, পশু পক্ষ্যাদি যে কেবল কাম ক্রোধ ঈর্ষ্যাদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া থাকে এরূপ নহে. তাহারা ধীশক্তির সহযোগে, কি করিলে কি হইবে, ইহা নির্ণয়পূর্ব্বক যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্টসাধন করিতে পারে—অত্যাচারে বশীভূত হইয়া আপনাদিগের বাসনা দমন করিতে পারে—এবং যদি কদাচিৎ অনুচিত কাজ করিয়া ফেলে, তবে তিরস্কৃত হইলে অপ্রতিভ হয়। একটী প্রকৃত বিবরণ বলিলে এই কথাগুলি অধিকতর স্পষ্ট হইবে।

কোন ব্যক্তি একটী বিড়াল পুষিয়াছিলেন। তিনি এক দিন ভোজন

করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার দুইটী ছোট নাতিনী এক পার্শ্বে, এবং বিড়ালটী অপর পার্শ্বে। কর্ত্তা আহার করিতে করিতে নাতিনীদিগকে এবং বিড়ালটীকে কিছু কিছু দিতেছেন; এমন সময়ে নাতিনীরা হঠাৎ কান্না ধরিল। কর্ত্তা তাহাদিগের কান্না থামাইবার নিমিত্ত প্রবোধ দিতে লাগিলেন। উহারা থামে না—কোন কোন ছেলে কান্না ধরিলে আর থামিতে চায় না। নিউটন জড়ের গুণ আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, জড়পদার্থ স্থির আছে ত স্থিরই থাকে, যদি চলিতে আরম্ভ করে তবে চলিয়াই যাইবে সেই জড়ধর্ম্ম যেন ঐ সকল ছেলেকে একবারে পাইয়া বইসে, এবং তাহাদিগের কান্নাকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিবার উপক্রম করে। নাতিনীরা সেইরূপ কান্না ধরিল। কর্ত্তা তাহাদিগকে ভুলাইতেই ব্যস্ত—তাঁহার খাওয়া হয় না—বিড়ালটীও কিছু পায় না। বিড়ালটী ক্ষণকাল এই ব্যাপার দেখিল। সে যে পার্শ্বে ছিল, সেই পার্শ্ব হইতে উঠিয়া নাতিনী দিগের নিকট গেল, আপনার ডাইন নুলটী অল্পে অল্পে উঠাইল—যেন দেখাইল যে সে নখর বাহির করে নাই, এবং একটী নাতিনীর গালে একটী চড় মারিল! বিড়ালের চড়ে নাতিনীটী অমনি চুপ করিল। সে চুপ করায় অপরটিও চুপ করিল। বগির চাকার এক খানা থামিলেই দুই খানা থামে। বিড়াল আপনার স্থানে আসিয়া বসিল।

প্রকৃত ব্যাপারটী যেমন দেখিয়াছি অবিকল লিখিলাম। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনি বুঝিয়া লউন—বিড়াল, নিজ খাদ্যের অপ্রাপ্তির হেতু কর্ত্তার অমনযোগ; সেই অমনোযোগের কারণ নাতিনীদিগের কান্না; সেই কান্না নিবারণের উপায় তাহাদিগের গালে চড় এবং সেই চড় কেবল মাত্র ভয় প্রদর্শনের জন্য—তাহাদিগকে কষ্ট প্রদানের জন্য নয়, অতএব নখর অপ্রকাশ রাখা উচিত—এই সকল ভাব নিজ মনোমধ্যে পরিগ্রহ পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিল কি না?—ইহারই মধ্যে ধীশক্তি আত্মসংযম এবং ঔচিত্যবোধের সম্যক্ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না?

পশ্বাদির পালনে স্থির প্রতিজ্ঞতা অভ্যস্ত হয়। পশুকে বশ করিবার মূল মন্ত্র নির্ভীকতা। অশ্ব, মহিষ গোরু, কুকুর প্রভৃতিকে দেখিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্রও ভয়ের অনুভব করিলে, তবে সেই ভয়ের লক্ষণ তোমার

আকার ইঙ্গিতে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। যে পশু হইতে তোমার ভীতির সঞ্চার হইতেছে, সে অবশ্যই তাহা বুঝিবে, এবং তাহা বুঝিলেই আর তোমার বশ হইবে না। জীব মাত্রেই বীরের বশ। যাঁহারা ঘোড়া চড়েন, কুকুর পোষেন, তাঁহারা সম্যক্‌রূপে এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। ঘোড়াকে তাহার নিজ অভিলাষানুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া অবিধেয়—সে তোমারই ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, দুই একবার যত্নপূর্ব্বক এরূপ করিতে পারিলেই ঘোড়া তোমার বশ হইল। কুকুরকেও কথা শুনান অভ্যাস করাইবার নিমিত্ত স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। যে আজ্ঞা পালন করায় কুক্কুর তাহারই অধিক বশ হয়, যে আজ্ঞাপালন না করায় তাহার বশ হয় না। যাঁহারা পশুদিগকে বশীভূত করিতে অভ্যাস করেন, মানুষ বশ করিবারও একটী প্রধান উপকরণ তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়া উঠে। ইউরোপীয়েরা এই কথার প্রমাণ। তাঁহাদের ঘোড়া কুকুর প্রভৃতি যেমন বশ এমন কাহার নয়—পৃথিবীতে তাঁহাদের যেমন প্রতাপ এমনও আর কাহার নয়।

তৃতীয়তঃ, পশ্বাদির সুপালন করিতে হইলে গৃহস্থকে নিয়তাচার হইতে হয়। উহাদিগের শরীর এবং আবাস যথোচিত সুপরিষ্কৃত রাখা চাই, এবং উহাদিগকে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত পরিমাণে আহার দেওয়া চাই। গৃহী খামখেয়ালী হইলে—আজি করিলাম কালি করিলাম না, এখন দেখিলাম, তখন দেখিলাম না—এরূপ করিলে পশ্বাদির পালন হয় না। গৃহস্থ নিয়তাচার না হইলে পশ্বাদি সর্ব্বদা পীড়িত হয় এবং প্রায়ই মারা পড়ে।

পালিত জীবের প্রকৃতিভেদে তাহাদিগের পালন কার্য্য বাটীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতি সমর্পণ করা যাইতে পারে। কুমারীগণ পক্ষিদিগকে, কুমারেরা কুকুর, ছাগল, মেষাদিকে, চাকরেরা অশ্ব গবাদিকে আহার দিবে। কিন্তু গৃহকর্ত্রীকে প্রত্যহ যথা সময়ে সকলগুলির তত্ত্বাবধান অবশ্য করিতে হইবে। শুদ্ধ কাণে শুনিয়া থাকিলেই চলিবে না—প্রত্যেক পশু পক্ষীকে প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখিতে হইবে।

একটী পরিবার একটী ব্রহ্মাণ্ড। গৃহকর্ত্রী ঐ ব্রহ্মাণ্ডের পালিকা—তিনি সম্যক্ নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য কাহার হস্তে উহার পালন ভার সমর্পণ করিতে

পারেন না। মহাবল ভীমেরও হস্তে পৃথিবীর পালনভার দিনৈকের নিমিত্ত ন্যস্ত হওয়ায় অপালন বশতঃ অনেকগুলি জীবের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গৃহিণী স্বয়ং না দেখিলে পোষিত পশুদিগেরও সেইরূপ অপালন এবং বিনাশ হয়।

অষ্টাদশ প্রবন্ধ।

—:*::*:—

পিতামহ ঠাকুর।

বাল্যকালে আমি অনেক লোকের মুখে তাঁহাদিগের স্ব স্ব পিতামহ পর্য্যায়স্থ লোকের গল্প শুনিতে পাইতাম; এখন আর তত লোকের মুখে তাঁহাদিগের পৈতামহিক বিবরণ শুনিতে পাই না। কেন যে এরূপ হইয়াছে, তাহা এ স্থলে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন বশতই হউক, কিম্বা মনুষ্যের আয়ুষ্মত্তার খর্ব্বতা বশতই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যে পৈতামহিক ঘনিষ্ঠতা কম হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ ঘনিষ্ঠতার হ্রাস বিবেচনায় ঐ সম্বন্ধটীর লাঘব হওয়া বিলক্ষণ ক্ষোভের বিষয়। পিতামহের সহিত পৌত্রের সম্বন্ধটীর বড় মধুর। তাহাতে গুরুতা এবং লঘুতা জড়িত হইয়া এমন অপূর্ব্ব পদার্থ জন্মে যে তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে গেলে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইতে হয়।

পিতামহ ঠাকুর, পিতার পিতা মহাগুরুর মহাগুরু—ঈশ্বরের ঈশ্বর তিনি কেমন ভয় এবং ভক্তির পাত্র। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়াও আমাদিগের বাক্যমনের অগোচর থাকেন না। আমাদিগের ক্রীড়া কৌতুকে হাস্য পরিহাসে, ক্ষষ্টি নষ্টিতে যোগ দেন—শুদ্ধ যোগ দেন না, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া কৌতুকাদির উত্তেজনা করেন। বঙ্গভাষায় পিতামহকে যে ঠাকুর দাদা বলে, তাহা ভালই বলে। তিনি ঠাকুর অর্থাৎ দেবতা, এবং তিনি দাদা অর্থাৎ ভাই, সমকক্ষ ব্যক্তি—দেবত্ব এবং সমকক্ষতা একাধারে সন্নিবিষ্ট।

পিতামহের স্নেহ, পিতৃস্নেহ অপেক্ষা গাঢ়তর না হউক, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মধুরতর পদার্থ। পিতৃস্নেহে অনিষ্টের আশঙ্কা প্রবলতর, পরিণামদর্শিতার ভাগ অত্যধিক। পিতামহ তত অনিষ্টের শঙ্কা করেন না, তত পরিণামও ভাবেন না। তিনি পৌত্রটীকে লইয়া কেবল মাত্র আনন্দভোগেই মুগ্ধ থাকেন। শিশু পৌত্রও যেমন ভূত ভবিষ্য কিছুই চিন্তা করে না, কেবল বর্ত্তমান সুখভোগেই পরিতৃপ্ত থাকে, পিতামহের অন্তঃকরণও কিয়ৎপরিমাণে সেই অবস্থায় অবস্থিত। পিতা, পুত্রকে লইয়া যখন ক্রীড়া করেন, তখনও ক্রীড়াব্যপদেশে কি কি সুশিক্ষা প্রদান করিবেন, তাহার চিন্তা করিতে থাকেন। পিতামহ যখন পৌত্রকে লইয়া খেলা করেন, তখন আপনিও প্রকৃতরূপে তাহার খেলুড়ি হইয়া উঠেন। পিতা যখন পুত্রের মুখে কোন খাদ্য সামগ্রী দেন, তখন উহা তাহার শরীরের পক্ষে উপকারী হইবে কি না, ভাবিয়া দেখেন; পিতামহ যখন পৌত্রকে খাওয়াইয়া দেন, তখন আর কিছুই না ভাবিয়া আপনিই যেন সেই তরুণ রসনা সহকারে খাদ্যসামগ্রীর রসাস্বাদন করেন।

ফলতঃ, পিতা মাতার অন্তঃকরণে পুত্র সম্বন্ধে একটী প্রগাঢ় ভয় চিরবিরাজমান। পিতামহের অন্তঃকরণে ঐ ভয়ের ভাব স্বল্পতর—সুখবোধেরই প্রাচুর্য্য। লোকে কথায় বলে আসলের চেয়ে সুদের মায়া বড়—আসল পুত্র, সুদ পৌত্র। বাস্তবিক সুদের উপর মায়া খুব বটে, সুদ পাইলে যার পর নাই সুখ হয়; কিন্তু আসলের উপর ভয় বেশী। সুদ ছাড়া যায়—আসল ছাড়া যায় না। আমাদিগের শাস্ত্রে বিধাতাকে পিতামহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আমার মতে পিতৃসম্বোধন অপেক্ষা পিতামহ সম্বোধন বিধাতার প্রতি সমধিক সঙ্গত। ব্রহ্মার পুত্র, প্রজাপতিগণ—বিভিন্ন জীব শক্তি। ব্রহ্মা জীব শক্তি রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান। কিন্তু জীবশক্তি-জনিত প্রতি প্রাণীর রক্ষার জন্য বিধাতাকে তেমন সযত্ন বোধ হয় না। তিনিও আসল রাখিয়া সুদ ছাড়িতে পারেন।

পিতামহের অন্তঃকরণে পৌত্র সম্বন্ধে ভয়ের ভার লঘু হয় বলিয়া তিনি পৌত্রের প্রকৃতি সমধিক পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারেন। বাপ মায়ের মন সন্তান সম্বন্ধে সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। এই তাহাকে খুব ভাল ছেলে মনে

করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন, আবার পরক্ষণেই অতি সামান্য কারণে তাহার বুদ্ধি চরিত্র এবং ভাগ্য মন্দ হইবে ভাবিয়া দুঃখে অবসন্ন হইতেছেন। পিতামহের অন্তঃকরণ অত আন্দোলিত হয় না তিনি পৌত্রের দোষ গুণ প্রায় যথাযথ পরিমাণেই দেখিতে পান।

পিতামহ পৌত্রের দোষ গুণ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান, অথচ তিনি বয়স্যভাবও ধারণ করিতে পারেন, এই দুই কারণের একত্র সমাবেশ হওয়াতে পিতামহ ঠাকুরই শৈশবের অদ্বিতীয় সুশিক্ষক। মাতা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদাত্রী হইতে পারেন বলিয়া প্রথিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা দেবীর নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, স্যর উইলিয়ম জোন্স সাহেবের বিদ্যানুরাগিতা তাঁহার মাতার শিক্ষাগুণেই জন্মিয়াছিল; প্রেসিডেণ্ট গারফীল্‌ডও তেমন মা না পাইলে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বস্তকুটির হইতে সৌধ-রাজভবনে আগমন করিতে পারিতেন না। পিতামহের স্থানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের ফলবত্তা ওরূপ কোন সুপ্রসিদ্ধ বিবরণের উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তাহা না হউক, যদি পিতামহের স্থানে প্রথম শিক্ষালাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে তবে তিনি বুঝিতে পারেন যে সেই শিক্ষার ফলবত্তা মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষাও অধিক।

"ছেলেটা আমার চেয়ে ঠাকুরের নিকটে থাকিতে অধিক ভালবাসে—ঠাকুরের সহিত ওর সব পরামর্শ—তাঁহার সহিতই উহার মনের মিল"—এইরূপ কথা অনেক পুত্রবতীকেই বলিতে হয়। শাস্ত্রেও বলে, পৌত্র জন্মিলে পুত্রের পিতৃ ঋণ পরিশোধ হয়। যাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবে, তাহাকে উত্তমর্ণের হস্তে সমর্পণ না করিলে ঋণ পরিশোধ হইবে কিরূপে?

——(*)——

ঊনবিংশ প্রবন্ধ।

—:*::*:—

পিতামাতা।

এক দিন কোন আত্মীয়ের সহিত আমার ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। বিচারের বিষয়—কে বড় ?—বাপ কি মা ? আজি কালি এমন দিন পড়িয়াছে যে, উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্যবুদ্ধি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে যাইতেছে। তর্ক, নারদ ঋষির ন্যায় ত্রিলোক মধ্যে অব্যাহতগতি হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমাদিগের দুই জনে তুমুল বিচার বাধিয়া গেল। অন্যান্য যুক্তি প্রদর্শনের মধ্যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় লইয়াও বাদানুবাদ হইল। আত্মীয়-বর "গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী" এই বচনটীর আবৃত্তি করিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। আমি ওরূপ কোন স্পষ্ট বচনের জোর পাইলাম না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র মাতৃদেবী কৌশল্যার নিবারণসত্ত্বেও পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ বনগমন করিয়াছিলেন, এবং বিষ্ণুর অবতার ভগবান পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, এই সকল পৌরাণিক ইতিবৃত্তদ্বারা পিতৃপ্রাধান্য সমর্থন করিতে লাগিলাম। পরস্পরের বিদ্যা বুদ্ধির ঘর্ষণে ক্রোধস্ফুলিঙ্গও মধ্যে মধ্যে উদ্গত হইতে লাগিল। মতভিন্নতার হেতুবাদও উল্লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। আত্মীয়-বর বলিলেন,—"আপনি বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা এবং তেজস্বিতার পক্ষপাতী, এই জন্য পিতৃপ্রাধান্যের পক্ষ, আমি সরলতা এবং নম্রতার ভক্ত, এই জন্য মাতৃ প্রাধান্যের পক্ষ।" আমি উত্তর করিলাম, "সরলতা এবং নম্রতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ন্যূন নহে—আমি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিদ্বেষ্টা।" "মাতৃপক্ষ অবলম্বনে উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বর্দ্ধন কি প্রকারে হয় ?" আমি বুঝাইয়া বলিলাম—

"দেখুন, এখনকার অনেক লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে চায়। সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করাতেই যেন একটা ভারী বাহাদুরি আছে, এরূপ মনে করে। যাহারা এরূপ করে, তাহারাই পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির অধিক গৌরবও করে, এবং যে প্রকার কৌশলে পারে আপনারা

যে খুব মাতৃভক্ত তাহাই লোককে জানায়। মাতৃভক্তির খোসনাম বাহির করা সহজ ব্যাপার। কাহার মাতৃভক্তি সত্য সত্যই কিরূপ, তাহা বাহিরের লোকের পরীক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। তদ্ভিন্ন মাতৃভক্তি প্রকাশ করিতে আপনাকেও বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় না; প্রায় কোন স্বার্থত্যাগই করিতে হয় না। বাপ ছেলেকে আপনার কথা শুনাইতে চান, কিন্তু উপযুক্ত পুত্রের কথা শুনাই মায়ের কর্ত্তব্য। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব পুত্রের পক্ষে পিতৃভক্তি রক্ষা করা যেমন কঠিন, মাতৃভক্তি রক্ষা করা কখনই তেমন কঠিন হইতে পারে না। মাকে 'তুমি বুঝিতে পার না' বলা চলে; বাপকে ও কথা বলিবার যো নাই। পিতৃভক্তির অপেক্ষা মাতৃ-ভক্তির প্রাধান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের পোষক।"

আত্মীয়বর একথার কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিচারটীতে জয়ী হইবার নিমিত্ত তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। অতএব তিনি কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—"চলুন, দুই জনে আপনার পিতৃ ঠাকুরের নিকটে যাই, এবং তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি; তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন উভয়ে তাহাই স্বীকার করিব।" আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম না যে, পিতা ঐ বিচারের মীমাংসা করণে অক্ষম হইবেন; এবং তাঁহার সহজ ঔদার্য্যই তাঁহাকে স্বপ্রতিপক্ষ পক্ষের পক্ষপাতী করিয়া তুলিবে। তাহাই হইল—আমি হারিলাম। হারিলাম বটে, কিন্তু এই বিচার সম্বন্ধে নিজ পত্নীর অভিমতি জানিতে ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন —"ছেলেরা তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করিতে পারে না। তোমার প্রতি ভক্তি করিলেই তাহাদের আমার প্রতি ভক্তি করা হয়। গাছের মাথায় জল দিলেই গোড়ায় জল পায়। ছেলেরা তোমাকে ভাল করিয়া রাখিলে আমি অবশ্যই ভাল থাকিব। তোমাকে কিছু দিয়া আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করা তাহাদিগের অসাধ্য। তোমার প্রতি ভক্তিই ভক্তি— আমার প্রতি ভক্তি কিছুই নয়। আমাকে যাহা বুঝাইবে, ভাল হউক মন্দ হউক, আমি তাহাই বুঝিব। তোমাকে যাহা বুঝাইতে পারিবে তাহাই সত্য।"

ঐ কথাগুলির অভ্যন্তরে একটী প্রধান তথ্য নিহিত আছে। পুরুষের সম্মান তাঁহার নিজের সাক্ষাৎ সম্মান না হইলে হয় না, স্ত্রীলোকের সম্মান

স্বামীর সম্মানেই হইতে পারে। সেই জন্যই মাতৃভক্তি পিতৃভক্তির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। মায়ের কথা না শুনিয়া বাপের কথা শুনায় মায়ের অপমান বোধ হইতে পারে না; কিন্তু বাপের কথা না শুনিয়া মায়ের কথা শুনিলে বাপের অপমান বোধ হয়। শিব ভগবতীর পূজা একত্র হওয়াই শাস্ত্রানুমত। যদি ভগবতীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়, তাহা শিবপূজার পরে। শিব শরীরেই ভগবতীর পূজা করিবার বিধি আছে; ভগবতীর শরীরে শিব পূজার বিধি নাই।

——১০——

বিংশ প্রবন্ধ।

——০(০)০——

পুত্র কন্যা

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পুত্র এবং কন্যা সন্তানে যত ইতর বিশেষ করিতেন শুনা যায়, আমরা বোধ হয় আর তত করি না। অনেকেই বলিয়া থাকেন, পুত্র ও যে পদার্থ কন্যাও সেই পদার্থ। বাস্তবিক তাহাই কি?

পুত্র কন্যায় বিলক্ষণ ইতর বিশেষ আছে। কন্যার ভার অল্প, পুত্রের ভার অধিক। কন্যার লালন, পালন, শিক্ষাসম্পাদন বড় অধিক করিতে হয় ত ১৪ ১৫ বৎসর মাত্র। তাহার পরে কন্যার ভার জামাতার প্রতি অর্পিত হয়। পুত্রের লালন, পালন, শিক্ষাসম্পাদন এবং বৃত্তিসংস্থান ২০।২৫ বৎসরেও শেষ হয় না। অতএব গৃহস্থ লোকের পক্ষে কন্যার ভার অপেক্ষা পুত্রের ভার অনেক অধিক।

পক্ষান্তরে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সহিত সম্বন্ধ অধিক ঘনিষ্ঠ হয়। ঐ সম্বন্ধের শেষ নাই বলিলেও চলে। একত্রাবস্থান, পরস্পর পরামর্শগ্রহণ, অন্যোন্যের সহায়তা করা, যাবজ্জীবন চলিতে পারে—চলিয়াও থাকে। যাঁহাকে কন্যাদান করিলে তিনি কায়মনে ভাল থাকিলেই কন্যার সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে। তিনি ভাল না থাকেন, অথবা ভাল না হয়েন, তুমি বিশেষ কিছুই করিতে পার না। নিজ সামর্থ্যানুসারে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিতে পার, জিজ্ঞাসা না করিতে করিতেও পরামর্শ প্রদানে উন্মুখ হইতে পার, কিন্তু তাঁহার উপর তোমার কোন জোর খাটে না। যাহাতে হাত না থাকে, বোধ হয়, তাহাতে মমতাও ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া আইসে। সুতরাং কন্যা সন্তানের সম্বন্ধে যে প্রকারে হউক, এক প্রকারে নিশ্চিন্ততা ঘটিয়া যায়।

পুত্র সন্তানকে কাহাকেও দান করা হয় না। পুত্রবধূকেও পুত্রের দ্বারা পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিবার ত অধিকার আছেই, স্থলবিশেষে সাক্ষাৎ শিক্ষা-দানেও অধিকার হয়। ঐ অধিকার থাকাতে ক্রমশঃ মমতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং কন্যা অপেক্ষাও পুত্রবধূ অধিকতর স্নেহভাগিনী হইয়া

উঠেন। পুত্র, পরকে আপনার করিয়া দিতে পারে; কন্যা আপনার হইয়াও পর হইয়া যায়।

কিন্তু আপনার কন্যার সুখ দুঃখের হর্ত্তা কর্ত্তা আর একজন হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া কন্যা সম্বন্ধে মনে এক প্রকার ঔদাসীন্য জন্মে—এবং সেই ঔদাসীন্য নিবন্ধন কন্যার প্রতি মনটী বড়ই নরম হইয়া থাকে। কন্যা পিত্রালয়ে আসিলে পিতা যেন হারান ধন ফিরে পান। তাঁহার আর কাহার দিকে মন থাকে না। কন্যার সহিত কথোপকথন করিবেন, দৌহিত্র দৌহিত্রীকে লইয়া কোলে পিঠে করিবেন, কন্যা নিকটে বসিয়া খাওয়াইবেন এই সকল সাধ যায়। বাস্তবিক কি কন্যার প্রতি তাঁহার মমতা অধিক; সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কোমত দর্শনের স্থলবিশেষে উপদেশ আছে যে, মনুষ্যগণ ভূত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের তিনটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারীরূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিবেন। মাতা অতীতকালের অধিষ্ঠাত্রী, ভার্য্যা বর্ত্তমান কালের অধিষ্ঠাত্রী এবং কন্যা ভবিষ্যকালের অধিষ্ঠাত্রী। পণ্ডিতবর কোমতের কন্যা সন্তান হইয়াছিল বোধ হয় না। তাহা হইলে তিনি জানিতেন যে, যদিও স্থূলদর্শনে কন্যাসন্তান ভবিষ্যকালের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য হয়েন, তথাপি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহার বৈপরীত্যই লক্ষিত হয়। কন্যা সন্তান সম্বন্ধে মানসিক দৃষ্টি ভবিষ্যকালকে লক্ষ্য করে না—অতীত কালকেই লক্ষ্য করে। কন্যাসন্তান যখন বড় প্রীতির পাত্র হয়, তখন 'হারাধন' রূপেই প্রীতি পায়। কন্যাকে লইয়া যে সুখ হয়, তাহা স্মৃতির সুখ, আশার সুখ নয়, কন্যা সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে যাই, তাহা তাহার এবং আপনার অতীত কাল লইয়াই ভাবি—তাহার বিষয়ে ভবিষ্য ভাবনা প্রায় কিছুই করি না। সে ভাল থাকুক, তাহার খুব ভাল হউক, এরূপ আশীর্ব্বাদ এবং প্রার্থনা করি বটে; কিন্তু তাহার এমন হউক, এই হউক, অথবা ঐ হউক,—এরূপ কোন কামনাই কন্যার সম্বন্ধে মনোমধ্যে স্বতঃ উত্থিত হয় না।

কন্যা সম্বন্ধে মনুষ্য মনের এই ভাবটী সাধারণতঃ জানা থাকা ভাল। এইটী অনেকের জানা নাই—বিশেষতঃ অল্প বয়সে প্রায়ই কেহ জানিতে পারে না। এই অজ্ঞতা সাংসারিক অনেক কষ্টের কারণ হয়। বিশেষতঃ পুত্রবধূর এবং

পুত্রের মনে প্রায়ই ঐ অজ্ঞতা নিবন্ধন ঈর্ষ্যা জন্মিয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন কর্ত্তা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কন্যাগণের ও তৎসন্তানবর্গের প্রতি সমধিক স্নেহবান। বাস্তবিক কর্ত্তার স্নেহ দুহিতা ও দৌহিত্রাদির প্রতি যতই অধিক থাকুক, পুত্র পুত্রবধূর উপরেই তাঁহার ক্ষমতা অধিক। দুহিতা দৌহিত্রেরা কর্ত্তার 'হারান ধন' বলিয়াই তাহাদিগকে পাইয়া কর্ত্তার অত তদ্গতভাব। কন্যা বাটীতে আসিলে কর্ত্তার মনে কত পূর্ব্ব বিবরণ, কি ভাবে উঠিতেছে, তাহা কে বলিবে? স্মৃতি জাগরূক হইয়া পূর্ব্বানুশোচনার কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তজ্জন্যই চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুবারির বিসর্জ্জন হইতেছে।

আবার বলি, যাহার উপর জোর খাটিতে পারে বলিয়া মনে মনে বোধ হয়, তাহারই প্রতি মমতা থাকে। যাহার উপর কোন জোর চলে না, তাহার প্রতি মমতাও ন্যূন হইয়া যায়। কোন ছেলেকে একটী পুতুল দেখাইয়া বল, ঐটী তোমার পুতুল, এই বলিয়া পুতুলটী একটী উচ্চস্থানে রাখিয়া দেও—ছেলে যেন পুতুলটী ছুঁতে ধরিতে না পারে। সে ছোঁবার ধরিবার জন্য একবার, দুইবার চারিবার কাঁদিবে। তাহার পর আর কিছুই করিবে না। পুতুলের প্রতি তাহার বিশেষ মমতাই জন্মিবে না। আমরাও বড় ছেলে বইত নয়? আমাদিগের কন্যাসন্তান ঐরূপ পুতুল—আমাদের বটে, কিন্তু আমরা উহাকে লইয়া কিছুই করিতে পাই না বলিলেই হয়। আর কত কাঁদিব—ক্রমে ক্রমে মায়া ছাড়িয়া দি।

কন্যাসন্তানের পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হওয়া উচিত কি না? মুসলমানদিগের আইনে, ফরাসীদিগের আইনে, ইটালীদিগের আইনে এবং অপরাপর নব্য ইউরোপীয় আইনে, কন্যাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিবার বিধি আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে এবং ইংরাজদিগের শাস্ত্রে সেরূপ বিধি নাই। দায়ভাগের ব্যবস্থা কেবল মাত্র প্রজার মনের ভাব বুঝিয়া প্রস্তুত হয় না। অর্থশাস্ত্র এবং রাজনীতিশাস্ত্রের কতক বিচারও ব্যবস্থার প্রণয়নে প্রবেশিত হইয়া থাকে। সে সকল শাস্ত্রের বিচার বড় জটিল, তাহা বহুমুখ এবং দেশের অবস্থা ও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন হয়। অতএব ও বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমি বলি, পিতা আপন জীবদ্দশাতেই কন্যা সন্তানদিগকে কিছু কিছু দিবেন—একে বারে নয়—মধ্যে মধ্যে দিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যা সন্তানের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার না হওয়াই ভাল। তাই ভগিনীতে জ্ঞাতিবিরোধের পথ খুলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

——(*)——

একবিংশ প্রবন্ধ।

ভাই ভগিনী।

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধটী বড় সুমিষ্ট। শৈশব হইতে একত্রে থাকা, একত্রে শিক্ষালাভ, একত্রে সুখ দুঃখ ভোগ, এই সকল কারণে ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে একটি গূঢ়রূপ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা থাকিলেও, তাহাতে ঈর্ষ্যা থাকে না। পরস্পরের মধ্যে সাহায্যদান থাকিলেও অহঙ্কার থাকে না; পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ থাকিলেও আত্মগ্লানি থাকে না। ভাই-ভগিনীদের সম্বন্ধটী মূলতঃ সাম্য-সম্বন্ধ এবং সকল অবস্থাতেই ঐ সাম্য ভাবটী উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। উহাঁদিগের মধ্যে কালক্রমে যিনি যত ছোট হউন, কখনই তাঁহার অন্তর্ভূত সাম্য-ভাবটী একেবারে অপনীত হইয়া যায় না। আমরা এক বাপ-মায়ের ছেলে, ভাই ভগিনীরা কখনই এই তথ্যটী ভুলিতে পারে না এবং যাহারা ঐ তথ্যটী বিশিষ্টরূপেই স্মরণ রাখিতে পারে, তাহারাই পরস্পরের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিতে পারে।

ঐ সূত্রটী স্মরণ থাকিলে এবং উহার অনুযায়ী কার্য্য করিলে যে, ভাই-ভগিনীরাই আপনাপন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারে তাহাই নহে; ঐ সূত্রই উহাদিগের পরস্পর কর্ত্তব্যাবধারণের পথ। ঐটী মনে রাখিয়া চলিতে পারিলে, পিতা-মাতাও উহাদিগের পক্ষে ধার্য্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনাদের করণীয় সুনির্ব্বাহিত করিতে পারেন। আপনাদিগের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পর সাম্যভাব উদ্রিক্ত হইলেই তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হয়; অতএব শৈশব হইতেই ঐ সাম্যভাবের বীজ তাহাদিগের হৃদয়ে বপন করা কর্ত্তব্য।

এই কাজটি সুসম্পন্ন হইবার কয়েকটী অন্তরায় আছে। এক অন্তরায় কন্যা-পুত্রের ইতর বিশেষ। যিনি যাহা বলুন, সকল সমাজেই ঐ পার্থক্য আছে এবং তাহা থাকিবার যথেষ্ট কারণও আছে। অপর কোন কারণের এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে এই মাত্র বলিব যে, একটী

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই, কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের জীবনী-শক্তি শৈশবে অধিকতর ক্ষীণা থাকে। সূতিকাগারে অনেক ছেলে মারা যায়—কিন্তু কন্যা সন্তান দুইটীর স্থলে পুত্র সন্তান পাঁচটী মারা যায়; আর পঞ্চমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা সন্তান ছয়টীর স্থানে পুত্র সন্তান আটটী মারা যায়; আর দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা সন্তান দশটীর স্থানে পুত্রসন্তান চৌদ্দটী মারা যায়, আর ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা সন্তান চৌদ্দটীর স্থানে পুত্র সন্তান পনরটী মারা যায়। ষোল সতর বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, পুত্রের জীবন কন্যার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়ায়। এই নৈসর্গিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়াই সকল সমাজে কন্যার অপেক্ষা শৈশবে পুত্রের প্রতিপালন যত্ন কিছু অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আধিক্য নিরন্ধন কন্যাদিগের হৃদয়ে যে বিশেষ ঈর্ষা জন্মে তাহা বোধ হয় না। কন্যাদিগের ধীশক্তি পুত্রদিগের ধীশক্তি অপেক্ষায় অধিক শীঘ্র পরিস্ফুট হয়, এবং যাহার ধীশক্তি পরিস্ফুট হয়, সে স্বভাবভেদে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করিতে বা মুরব্বি আনা করিতে ভাল বাসে। আমি ইংরাজের বাটীতে ইংরাজের ছেলেদের মধ্যেই দেখিয়াছি, পাঁচ বৎসরের বালিকা সাত বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহশীলা হইয়া তাহাকে খাবার বাঁটিয়া দিতেছে এবং আপনি ভ্রাতার অপেক্ষা অল্পভাগ লইতেছে! স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রথমে কন্যা সন্তান হওয়া ভাল, তাহার পরে পুত্র। কন্যা অতি অল্পবয়সেই অন্যের যত্ন করিতে পারে। ফলকথা, কন্যা সন্তানের অপেক্ষা পুত্র সন্তানের একটু বেশী যত্ন হইলেই যে উহাদিগের মধ্যে সামাভাব উদ্রেকের বিশেষ ব্যাঘাত হয় তাহা নহে।

ছোট ছেলের এবং ডাগর ছেলের মধ্যেও একটু ইতর বিশেষ হয়। ছোটকে আগে খাওয়াইতে হইবে, সে আবদার করিলে তাহাকে আগে ভুলাইয়া শান্ত করিতে হইবে, তাহার খেলানাটি বিশেষ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহার হারাইয়া গেলে বড়র স্থানে লইয়া তাহাকে দিতে হইবে, সে অধিকক্ষণ কোলে পিঠে থাকিবে। এইরূপ ইতর বিশেষেও ছেলেদের মধ্যে যে সামাভাবের সংস্থাপন আবশ্যক তাহার বিঘ্ন হয় না। ছেলেরা সত্য সত্যই তত নির্ব্বোধ নয়। উহারা বেশ বুঝিতে পারে যে,

ছোট এবং দুর্ব্বল এবং অক্ষমদিগের প্রতি একটু অধিক যত্নের প্রয়োজন এবং উহারা নিজেও সেই যত্ন করিবার জন্য বিলক্ষণ আগ্রহশীল হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ অমন সকল স্থলে সাম্যভাব প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করা অনৈসর্গিক, অনাবশ্যক, অসাধ্য এবং হানিকর। বাপ মা ঐ সকল বৈষম্য রক্ষা করুন। ও সকল বৈষম্যের হেতু অতি সুস্পষ্ট এবং শিশুদিগেরও বোধগম্য, কিন্তু বাপ মা যেন সত্য সত্যই একটী ছেলেকে বেশী এবং অপর একটীকে কম ভাল না বাসেন—অর্থাৎ ছেলেদের মধ্যে অহেতুক কোন ইতর বিশেষ না করেন। তাহা করিলেই স্ব স্ব সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা জন্মিয়া যাইবে এবং সে ঈর্ষ্যা যাবজ্জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইবে না, কিন্তু সহেতুক বৈষম্যেও কোন কোন স্থলে দোষ হয়। যদি একটী ছেলে অন্য ছেলেদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া বাপ মায়ের আদুরে হয়, তবে অপর সকল ছেলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ করে। যদি একটী অধিক বুদ্ধিমান মেধাবী এবং আবিষ্ট বলিয়া বিশেষ সমাদর পায়, তাহা হইলেও ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়, কিন্তু সে ঈর্ষ্যা প্রবলা হয় না এবং বয়োধিক্যে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হয়। যদি অনেকগুলি কন্যাসন্তানের পর একটী পুত্র সন্তান হয় অথবা অনেক গুলি পুত্র জন্মিবার পর একটী কন্যা জন্মে, তবে তাদৃশ পুত্র বা কন্যা কিছু বেশী আদরের সামগ্রী হইয়া উঠে—এবং সেরূপ হইলে ভাই ভগিনীর মধ্যে কিছু ঈর্ষ্যার উত্তেজনা করে, কিন্তু সে ঈর্ষ্যা অতি প্রবলা হইয়া চরিত্রদূষিত করে না। পিতা মাতা যত দূর পারেন, এই সকল সহেতুক বৈষম্য জনিত ঈর্ষ্যার কারণ নিবারণ করিয়া চলিবেন, আর পুনর্ব্বার বলি, হেতুক বৈষম্য কোন মতেই হইতে দিবেন না। আমাদের দেশে একটা উপধর্ম্মমূলক বৈষম্য আছে—সেটা বিশেষ যত্ন সহকারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে পিতামাতার কোন বিশেষ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে যে সন্তান জন্মে, তাহার প্রতি একটু বিশেষ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হইয়া থাকে এবং পিতা মাতার তাদৃশ আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের ভুক্তভোগী সন্তান প্রায়ই দুর্ব্বল বা কঠিন প্রকৃতিক হইয়া পড়ে। তাদৃশ সন্তান ভাইভগিনীর প্রতি সমীচীন ব্যবহারে কদাপি সমর্থ হয় না। এই 'পয়া' 'অপয়া' কথা দুইটীতে অনেক

সুখ নষ্ট এবং অসুখের বৃদ্ধি করিয়াছে—সহর অঞ্চলে ও শহরটীর তেমন প্রাদুর্ভাব নাই; কিন্তু পল্লীগ্রামে উহাদিগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। এই সকল স্থলে পিতা-মাতা একটু সতর্ক হইয়া চলিলে এবং সন্তানগুলিকে পরস্পর সাহায্যদানে উন্মুখ করিয়া তুলিলে গৃহবাসের সুখ বিশিষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হয়। বড়-ভাই, বড় ভগিনী, ছোট ভাই ভগিনীদিগকে কাপড় পরাইয়া দিবে, খাওয়াইবে, মুখ হাত ধুইয়া দিবে, তাহাদের জুতা, কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিবে, খেলেনা সাজাইয়া দিবে, তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিবে—এইরূপ হইলে পিতা মাতার বিশেষ আনন্দ জন্মে এবং ছেলেদের মধ্যেও সৌভ্রাত্রভাব সুসম্বদ্ধ হয়। আমার বিবেচনায় বড়দিগের মধ্যে ছোটদিগের কাজ কর্ম্ম ভাগাভাগী করিয়া দেওয়া ভাল নয়। মনে কর, যেন কোন গৃহস্থের ক,খ,গ তিনটী কন্যা এবং চ,ছ দুইটী পুত্র আছে। ক,চয়ের কাজগুলি করিবে এবং খ ছয়ের কাজগুলি করিবে, এবং তাহা করিয়া ক, চকে এবং খ ছকে আপনাপন ভাগে বুঝিবে, এরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়। ক, সকলের জ্যেষ্ঠা, সে গ এবং চ এবং ছ এই তিনেরই খাওয়া দাওয়া দেখুক, খ ও গ,চ এবং ছএর বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিবার ভারপ্রাপ্ত হউক,—এইরূপে সকল ছোটগুলিকেই সকল বড়গুলি আপনাদিগের প্রতিপাল্যের মধ্যে পাউক। ইহাই সুব্যবস্থা।

আজি কালি একান্নবর্ত্তী সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে প্রায়ই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় না; এবং তাহা করা হয় না বলিয়াই মিলিত পরিবারের অনেকটা সুখ কম হইয়া যাইতেছে। যদি মিলিত পরিবারের মধ্যে সকল ভ্রাতার সকল সন্তানগুলিকে একদলস্থ মনে করিয়া বড় ছেলেগুলির দ্বারা ছোট, ছেলেদের কাজ লওয়া যায়—তবে মিলিত পরিবারের মধ্যে সুখ এবং ধর্ম্ম সাধনা উৎকৃষ্টতর হয়—

যে পরিবারের ছেলেরা এইরূপে বিবেচনা-পূর্ব্বক পালিত এবং শিক্ষিত হয়, সে পরিবারে ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া কম হয়, তাহাতে বয়োধিকদিগের যোগ কম হয় এবং অল্পকারণে অন্তর্ব্বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

সেরূপে পালিত পরিবারের মধ্যে ভাই-ভগিনীদিগের পরস্পর মনের মিল অতি সুমধুর হইয়া উঠে। ছেলেবেলায় ত এ খাইল বেশী, ও পরিল

ভাল, এ সকল কচকচির কোন উল্লেখই হয় না; বড় হইয়া উঠিলে পরস্পরকে সাহায্যদান করা, অতি সহজ ব্যাপারই হইয়া থাকে। এক জনের কোন জিনিষটী আছে, আর একজনের নাই বা হারাইয়া গিয়াছে, যাহার নাই বা হারাইয়াছে, সেই উহা পায়—কেমন করিয়া পায় তাহার কোন উচ্চবাচ্য হয় না। 'তুই নেনা' বা "তুমি নাওনা" কখন কখন এই কথা দুই একবার শুনা যায় মাত্র। একজনের পাঠশিক্ষা হইয়াছে, খেলিতে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু ভগিনীটীর হয় নাই—যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ খেলিতে যাওয়া হয় না। একটীর পীড়া হইয়াছে, আর বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি থাকে না—কান্না কাটনার এবং আমোদ প্রমোদের চেঁচাচেঁচি হয় না।

আরও বয়োবৃদ্ধি হইলে, ভগিনীদিগের বিবাহ হইয়া গেলে, শ্যালক-দিগের সহিত ভগিনীপতিদিগের বিলক্ষণ মনের মিল জন্মে। ভগিনীদিগেরও পরস্পর সৌহার্দ্দ ন্যূন হইয়া যায় না। যদি এক ভগিনীর বড় মানুষের বাটীতে বিবাহ আর একটীর সামান্য গৃহস্থের বাটীতে বিবাহ হইয়া থাকে, তথাপি ভগিনীদিগের মধ্যে তাচ্ছিল্য বা ঈর্ষা জন্মিতে পারে না। কিন্তু সকল কন্যাকে সমান ঘরে (সঘরে) বিবাহ দিবার চেষ্টা করা পিতা মাতার কর্ত্তব্য।

ভ্রাতৃবর্গের বিবাহ হইবার পর এবং পিতা মাতার অবর্ত্তমানে ভ্রাতৃবিচ্ছে-দের সূত্রপাত হইয়া থাকে। কিন্তু সুপালিত পরিবারের মধ্যে এবং পৈতৃক ধনের বিভাগ স্পষ্টরূপে করা থাকিলে প্রায়ই তাহা হইতে পায় না। যদি ভাইয়ে ভাইয়ে সত্য সত্যই মনের মিল থাকে তবে তাঁহাদিগের পত্নীগণও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইতে পারে না। যায়ে যায়ে ঝকড়া বাধাই-বার মূল (১ম) ছেলেয় ছেলেয় ঝকড়া, (২য়) ঝিয়ে ঝিয়ে ঝকড়া। ঐ দুইটীই অতি সামান্য বিষয় এবং অল্প মাত্র সাবধানতায় উহাদিগের প্রতিবিধান হইয়া যায়। ভ্রাতাদিগের মধ্যে উপায়ক্ষমতার ইতর বিশেষ নিবন্ধন যদি মনোমালিন্যের সম্ভাবনা হয় তাহার প্রতিবিধানের উপায় একটী মাত্র—পৃথগন্ন হওয়া। ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্মতি ক্রমেই তাহা করা ভাল, মনোমালিন্য পর্য্যন্ত জন্মিতে দেওয়া অনুচিত, আর যাঁহার উপায় কম অথবা

সন্তানাদি অধিক তাঁহার দ্বারাই পৃথগন্নতার প্রস্তাব হওয়া বিধেয়। কিন্তু পৃথগন্ন হইয়া গেলেও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনের ঐক্য সর্ব্বোতোভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে এবং তাহা না হইলেই উহাদিগের স্বভাবে দোষ জন্মে। পৃথগন্ন হইলেও পরস্পর সাহায্য চলিবে, সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, বিষয় বিশেষে সম্মিলিত পরামর্শ হইবে এবং একযোগে অনুষ্ঠান চলিবে। সৌভ্রাত্র এবং সৌভাগিন্য ইহারা নিত্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের রক্ষায় পবিত্রতা সাধন হয়, আত্মগৌরবের কোন কারণ হয় না; ইহা রক্ষা না করায় পবিত্রতার হানি হয় এবং লোকনিন্দাও জন্মে।

ইউরোপীয়দিগের স্থানে আমরা পারিবারিক কোন ধর্ম্মই প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে পারি না। উহাঁদের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মনীতি এবং সমাজনীতির অনৈক্য নিবন্ধন আমাদিগের পারিবারিক নীতিও ভিন্নরূপ। উহাঁদিগের মধ্যে অর্থের গৌরব কিছু অতিরিক্ত। এইজন্য উহাঁরা স্বজনের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে অথবা স্বজনকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে বড়ই নারাজ। কিন্তু সত্য সত্যই অর্থ সাহায্য ত অপর সকল প্রকার সাহায্য অপেক্ষা উচ্চতর সাহায্য নয়। শারীরিক পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা, বুদ্ধিশক্তির পরিচালন দ্বারা, প্রভাবশালিতার প্রয়োগ দ্বারা, এবং প্রীতি ভক্তি এবং উৎসাহ প্রদান দ্বারা, যে সাহায্য হয় তাহা অর্থ সাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক। ঐ সকল সাহায্যের আদান প্রদানে যখন কোন আপত্তি হয় না, তখন টাকার সাহায্য সম্বন্ধেই অতটা লজ্জাবোধ এবং মানসিক সঙ্কোচ হয় কেন? আমার বিবেচনায় অপরের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণে যে দোষ এবং লজ্জা, ভাই ভগিনীর মধ্যে সে দোষ এবং লজ্জার কোন হেতুই নাই। ভাই-ভগিনীর মধ্যে অর্থ সাহায্যের যদি প্রয়োজন থাকে এবং অর্থ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজে নিন্দা হয়। সুতরাং যিনি ওরূপ সাহায্য করিতে না দেন, তিনি আপনার স্বজনদিগকে নিন্দাভাগী করেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইহার ভিন্নভাব। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) অনেক গুণশালী গারফীল্ডের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন গারফীল্ডকে তাঁহার শৈশবাবস্থায় কোলে করিয়া দুই ক্রোশ পথ

লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিতেন এবং সায়ংকালে পুনর্ব্বার বিদ্যালয় হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিতেন। ঐ জ্যেষ্ঠার বিবাহ হইয়া গেলে গারফীল্ড কিছুকাল তাঁহারই বাটীতে থাকিয়া লেখা পড়া এবং শিল্পকার্য্য শিক্ষা করেন। গারফীল্ড ভগিনীর বাটীতে বাসাখরচ দিতেন এবং জ্যেষ্ঠা তাহা লইতেন; বলিতেন, গারফীল্ডকে বাসা খরচ না দিতে দিলে, সে ভগিনীপতির বাটীতে থাকিতে লজ্জিত হইবে। (২) গারফীল্ডের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন সময় কনিষ্ঠের পাঠের সাহায্যার্থে নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিতে চাহিলে; গারফীল্ড তাহা লইলেন, কিন্তু প্রথমে আপনার লাইফ-ইনসুয়র করিয়া উহার প্রমাণপত্রখানি জ্যেষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গারফীল্ডের জীবনচরিত লেখক ঐ উদাহরণগুলিকে সৌভ্রাত্রভাবের বিশেষ পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যজাতীয় লোকের চক্ষে ঐগুলি বিশেষ সৌভ্রাত্রের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। যে জাতি ধনকেই পরম পদার্থ বলিয়া পূজা করে, তাহাদিগের চক্ষে ঐ গুলি বিশেষ ভ্রাতৃবাৎসল্যের চিহ্ন স্বরূপ হইতে পারে। আমার বিবেচনায় জ্যেষ্ঠাকে বাসা খরচ না ধরিয়া দিলে এবং জ্যেষ্ঠের হস্তে লাইফ ইনসুয়রের সর্টিফিকেট জমা করিয়া না দিলে, গারফীল্ড উহাঁদিগকে অধিকতর সুখী করিতে পারিতেন। অন্ততঃ আমার মতে উহাই ভাই ভগিনীর প্রতি উচিত ব্যবহার হইত। আর গারফীল্ড ইউনাইটেড সাম্রাজ্যের সম্রাট সভাপতি হইলে পর ঐ জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ভ্রাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়া আছে। কিন্তু চরিত্রলেখকের মনে ঐ কৌতূহল উঠে নাই—তিনি ঐ বিষয়ে নির্ব্বাক্।

——০(০)০——

দ্বাবিংশ প্রবন্ধ।

পুত্রবধূ।

স্ত্রী। বৌয়ের মুখ দেখা বড় ভাগ্যের কথা। লে হবে—বাঁচিবে—বের যোগ্য হবে—বে হবে—তবে বৌয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌয়ের মুখ দেখা বড় ভাগ্যের কথা।

পুরুষ। তবুও ত শাশুড়ীরা বৌকে ক্লেশ দেয়। কেন ক্লেশ দেয় বলিতে পার?

স্ত্রী। সকল কারণ বোধ হয় জানি না, বলিতেও পারি না। যে কয়েকটী মনে হয়, বলিতেছি। এক কারণ যে শাশুড়ী নিজে বৌ যন্ত্রণা ভুগিয়াছে, সে বৌয়ের যন্ত্র শিখে নাই। সে মনে করে, আমার প্রতি যেমন করিয়াছে, আমিও তেমনি করিব।

পুরুষ। এতে একটু না জানা দেখায়, আর একটু দাদতোলা দেখায়। আর?

স্ত্রী। আর এক কারণ, যদি আপনার স্বামী না থাকে, ছেলের বশে থাকিতে হইবে এমন বোধ হয়, তাহা হইলেও বৌকে যন্ত্রণা দেয়।

পুরুষ। শাশুড়ী মনে করে, ছেলের ভালবাসার উপর আমার সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে—বৌ সেই ভালবাসা সমুদায় আত্মসাৎ করিবে, এই শঙ্কা করিয়া বৌয়ের প্রতি বিদ্বেষ করে। কিন্তু এ ত বিধবা শাশুড়ীদিগের কথা হইল। সধবা শাশুড়ীরাও কি বৌয়ের প্রতি অত্যাচার করে না?

স্ত্রী। করে বই কি—কিন্তু বিধবাদের চেয়ে ঢের কম করে। বিধবা শাশুড়ী যত দেখিয়াছি, প্রায় সকলেই বৌ-কাঁটকী। * * *।

পুরুষ। * * * ত বিধবা নয়—সে বড় বৌ-কাঁটকী না?

স্ত্রী। তার স্বামী অক্ষম—ছেলেই রোজগারী। তার বৌয়ের প্রতি অযত্ন বিধবা শাশুড়ীরই অযত্নের মত।

পুরুষ। ভাল; তার বেলা যেন ও কথা বলা যায়। কিন্তু * * * র বেলা কি বলিবে? তার স্বামী ত অক্ষম মনুষ্য নয়? কিন্তু তোমারই মুখে শুনিয়াছি, সে বৌয়ের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করে।

স্ত্রী। তার কথা ছেড়ে দাও। সে চিরকালই কনে বৌ থাকিবে—তার চুল পাকিতে গেল, তবু বৌয়ের রূপের নিন্দা করে। সধবা শাশুড়ীরা বৌ কাঁটকী হইলে বৌয়ের রূপের নিন্দা করিতেই চায়।

পুরুষ। ওরা বৌয়ের রূপের নিন্দা করে কেন?

স্ত্রী। আপনার রূপ ভাল বলিবার জন্য। যার ছেলের বে হয়ে বৌ হয়েছে, তার বয়স অবশ্যই হয়েছে। যাদের মনে মনে রূপের গৌরব বেশী, তারা আপনাদের বয়স বেশী ভাবিতে ভাল বাসে না।

পুরুষ। সধবা স্ত্রীলোকদিগের ত আপনার বয়স অধিক হইয়াছে, ভাবিতে নাই। সধবা স্ত্রীলোকদিগের যতই বয়স হউক, তিনি একজনের চক্ষে চির কালই ছেলে মানুষ। স্বামী থাকিতে মেয়ে মানুষের বুড়ী হইবার যো নাই।

স্ত্রী। তা সত্য—কিন্তু তা বলে কি বৌয়ের হিংসা করা উচিত? বৌ ত তাকে বুড়ী করে নাই? বয়স হয়েছে—ছেলে হয়েছে—ছেলের বে দিয়েছে, তবে বৌ হয়েছে। বৌ আর আপনি এসে শাশুড়ীকে বুড়ী করে না।

পুরুষ। তবে বৌ যন্ত্রণার মূল চারিটি—এক শাশুড়ীর অজ্ঞতা, দ্বিতীয় তাঁর দাদ তুলিবার ইচ্ছা, তৃতীয় তাঁর মনের ভয়, চতুর্থ তাঁর হিংসা। কিন্তু এ সব ত শাশুড়ীর দোষই বলিলে—বৌয়ের দোষ কি কিছু থাকে না।

স্ত্রী। আমার বোধে ত বৌয়ের দোষ কিছুই হইতে পারে না। ছেলে মন্দ হয়, বাপ মার দোষে—স্ত্রী মন্দ হয়, স্বামীর দোষে—বৌ মন্দ হয়, শাশুড়ীর দোষে।

পুরুষ। আমার বৌমা কেমন হবেন?

স্ত্রী। তোমার জানা আছে, আমি ছেলে বেলায় একটু বৌ-যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম—সেইজন্য তোমার মনে মনে ভয় আছে, পাছে আমিও আমার বৌ মাকে যন্ত্রণা দি। কিন্তু আমি ত আমার নিজের শাশুড়ীর স্থানে কোন যন্ত্রণাই পাই নাই। আমাকে যন্ত্রণা দিয়াছিল অপর লোকে।—* ** আমি অক্ষম স্বামীর হাতেও পড়ি নাই। হিংসাটী আমার মনে উঠিতে পারে কি না, তাহা তুমিই ভাল বলিতে পার। আমি এই জানি যে, আগে আমার যেমন আদর ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

পুরুষ। তুমি বৌ মার যত্ন কিরূপ করিবে?

স্ত্রী। তাহা বলিতে পারি না। তবে এই বলিতে পারি, একটি পাখীকে তার কোটর থেকে আনা হইবে, তাকে পোষ মানাইতে হইবে—সে সুখ না পেলে পোষ মানিবে কেন? যাহাতে সে আপনার কোটর ভুলে, আপনার বাপ মাকে ভুলে, বাপের বাড়ী যাইতে না চায়, তাকে এরূপ করিয়া তুলিতে হইবে।

পুরুষ। যে মা ছেলেকে সত্য সত্য ভাল বাসে, সে কখন বৌয়ের উপর বিরূপ হয় না। দেখ, ছেলে যদি বৌকে না ভালবাসে, তবে ছেলেরও দুর্ভাগ্য, ছেলের মায়েরও দুর্ভাগ্য।

স্ত্রী। যে বৌকে দেখিতে পারে না, সে ছেলেকেও ভালবাসে না, সত্য! যারা বৌকে ভালবাসে না, তারা প্রায়ই ছেলের আবার বে দেবার চেষ্টা করে। আর একটা বে দিলে যে পরে ছেলের ক্লেশ হইবে, তা কি তারা জানে না? তারা জেনে শুনেই ছেলের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইয়া ছেলেকে যাবজ্জীবন কষ্টে ফেলে। তেমন মায়ের কথা না শুনায় ছেলের পাপ হয় না।

পুরুষ। এগুলি খুব পাকা কথা। কিন্তু আমার বোধ হয়, বৌ যন্ত্রণার আর একটী মূল আছে, সেটী তোমার মনে পড়ে নাই। সে মূলটী একটি মেয়েলী শ্লোকে পাওয়া যায়—

'চন্দ্রমুখী মেয়ে আমার পরের বাড়ী যায়।
আর খাঁদা নাকি বৌ এসে বাটায় পান খায়॥'

এতেই বৌ যন্ত্রণার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর মূলটী আছে। এই মূলটী শুদ্ধ শাশুড়ীর চেষ্টায় অপনীত হইতে পারে না। ছেলে এবং বৌ দুই জনকে বিশেষতঃ ছেলেকে ঐ মূলটী নষ্ট করিবার নিমিত্ত মায়ের সহায়তা করিতে হয়। বৌ যদি ননদটীকে দেখিতে না পারে, এবং ছেলে যদি বৌয়ের সেই বিদ্বেষ নিবারণ না করে, তাহা হইলে কোন্ মায়ের মনে দুঃখ না হয়? তখনই বোধ হয়, ছেলেও যে পদার্থ, মেয়েও সেই পদার্থ—ছেলের বে দিলাম বলিয়া কি আমার পেটের মেয়েরা পর হইয়া যাইবে? এইরূপ ভাবিয়া যে ক্রোধ জন্মে, তাহা নিতান্ত অন্যায্য বলিয়াও মনে করিতে পারি না।

স্ত্রী। আমি অত শত বুঝিতে পারি না। আমি এইমাত্র বুঝি—আমিও যে পদার্থ, বৌ মাও সেই পদার্থ। আমি আজ ঘরের গিন্নি, যা করি তাই হয়। কালি বৌ-মা ঘরের গিন্নি, যা করিবেন, তাহাই হইবে। আমি আপনার ছেলে বেলার কথা মনে করিব। তখন আপনি যাহা চাহিতাম, বৌ-মাও তাই চায়—তখন আমি যা মনে করিতাম, বৌ-মাও তাই মনে করে। এইরূপ করিয়া বৌ-মার মন বুঝিতে পারিব—সেই মন বুঝিয়া চলিব।

—:*:*: —

ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ।

কন্যা পুত্রের বিবাহ।

কন্যার বিবাহের দায় চিরকালই বড় দায়—আজি কালি এ প্রদেশে ঐ দায়ের কথার কিছু বেশী রকম আন্দোলন হইতেছে। আন্দোলনের মূল কথা, কন্যার বিবাহে ব্যয়ব্যসন বড়ই বাড়িয়াছে। কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঐ আন্দোলন সংক্রামিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ লইয়া এবং পণ দিয়া বিবাহ দিবার, উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। দ্রাবিড়ভূমির অপরাপর স্থলে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিবার রীতিই সমধিক প্রবল। আর্য্যাবর্ত্তে, সারস্বত এবং আদি-গৌড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও পণ লইয়া এবং পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা আছে। সুতরাং কি দাক্ষিণাত্যে কি পঞ্জাব প্রদেশে কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোথাও কন্যার বিবাহে অধিক ব্যয় হয় বলিয়া বিশেষ কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। ক্ষত্রিয় এবং রাজপুত প্রভৃতি রাজারাজড়ার মধ্যে হইয়াছে, এবং সেই আন্দোলন তাঁহাদিগের হীনাবস্থার দ্যোতক। বিহার প্রদেশে এবং বঙ্গভূমিতে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে সকল উৎকৃষ্ট বর্ণের মধ্যেই এই বিষয়ের অধিক আন্দোলন হইতেছে। আবার দেখা যায় যে, ঐ সকল প্রদেশে কুলীন মৌলিক বলিয়া দুইটী থাক জন্মিয়া গিয়াছে; এবং কি ব্রাহ্মণ কি অপর জাতীয় সকল লোকের মধ্যেই ব্রাহ্মবিবাহের অর্থাৎ পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা সমধিক পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রদেশেই বরকর্ত্তারা পণের নিমিত্ত জিদ করিয়া থাকেন। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি, অনেকের সংস্কার এইরূপ যে, কুলীন মৌলিক ভেদটী কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। তাহা নয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কান্যকুব্জদিগের এবং বিহার প্রদেশীয় মৈথিলদিগের মধ্যেও বাঙ্গালারই অনুরূপ কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যেখানে কুলীন মৌলিক ভেদ, সেইখানে আপনার অপেক্ষা বড় ঘরে কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত ইচ্ছাটী প্রবল হইয়া

থাকে, এবং যেখানে ঐ ইচ্ছা প্রবলা, সেইখানেই বরকর্ত্তার কুলমর্য্যাদা-স্বরূপ তাঁহাকে পণ দিতে হয়।

পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণের প্রকৃত মূল এই। কিন্তু আজি কালি ঐ মূল গাছের উপর একটা কলম লাগিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কন্যাকর্ত্তার স্থানে যে পণের জন্য পীড়াপীড়ি হয়, তাহা কেবল কুলমর্য্যাদা বলিয়া নয়। কুলের মান দিন দিন খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পণের হার দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এই—অর্থকরী ইংরাজীবিদ্যার সমাদর বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানেরা কুলীন-সন্তানদিগের স্থান গ্রহণ করিতেছেন—কুলীন সন্তানদিগের ন্যায় তাঁহারা বহুবিবাহ করেন না; প্রত্যুত পত্নীর ভরণ পোষণ করেন, সুতরাং তাঁহাদের আদর বেশী—আবার তাঁহাদের সংখ্যা কুলীন সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প সুতরাং তাঁহাদের দরও খুব বেশী। দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার অপেক্ষা বিবাহযোগ্য ইউনিবর্সিটী সন্তানের সংখ্যা চিরকালই অনেক কম থাকিবে—প্রত্যুত ঐ ন্যূনতা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং বরের দর বাড়িতেই থাকিবে, কদাপি কম হইবে না। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে, যেখানে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথাই প্রচলিত, সে সকল স্থানেও আজি কালি ইউনিবর্সিটী সন্তানদিগকে আর বড় একটা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইতেছে না। তাঁহারা দানে কন্যা পাইতেছেন। কিছুকাল পরে তাঁহারাও আমাদের মত পণ না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিবেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সদ্বংশজাত এবং সুশিক্ষিত বরপাত্রের দর বাড়িতেই থাকিবে। সুতরাং ঐ দর কমাইবার জন্য যতই বাগাড়ম্বর হউক তাহাতে কোন বিশেষ ফললাভ হইবার নহে। যেখানে বংশমর্য্যাদা স্বীকৃত যেখানে উচ্চ বংশে কন্যা দিবার ইচ্ছা, যেখানে গুণের গৌরব, সেইখানেই ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হইবে, এবং পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তটী স্থির নিশ্চয় বুঝিলে সুবোধ ব্যক্তি কন্যার বিবাহে পণ দিতে হয় বলিয়া আর কাঁদা কাটা করিবেন না। তিনি আপনার কন্যার বিবাহের নিমিত্ত কিরূপে যত্নশীল হইবেন, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। ঐ ব্যাপারে সংস্কারের চেষ্টা যে অপেক্ষাচেষ্টা তাহার অধিক প্রমাণের

প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সংস্কারকবর্গের পথ-প্রদর্শক ইংরাজেরা কন্যার বিবাহে যথেষ্ট ধন ব্যয় করেন নাচ গান ভোজাদিতে করেন, বস্ত্রালঙ্কারাদিতে করেন—আর যৌতুকদান বিশেষ রূপই করেন।

আমার বিবেচনায়, পিতা আপনার পুত্র অপেক্ষা জামাতা যাহাতে রূপে, গুণে, কুলে, শীলে উৎকৃষ্ট বই অপকৃষ্ট না হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে পাপভাগী হয়েন। রূপ শব্দে সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্য দুইই বুঝিতে হইবে—গুণের মধ্যে বিদ্যাবত্তা অবশ্যই ধরা যাইবে। কুল দেশীয় চিরপ্রচলিত অর্থে—বংশমর্য্যাদা, বিদেশীয় অর্থে—ধনশালিতা, এই উভয় অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর শীল—দেশীয় অর্থে লওয়াই ভাল—যাহাতে নম্রতা, সৌজন্য, গুরুভক্তি, সদাচার বুঝায়—উহার আধুনিক অর্থ—অবিনয় বা তেজস্বিতা, রূঢ়তা বা সত্যবাদিতা, স্বদেশীয়ের প্রতি দাম্ভিকতা এবং বিদেশীয়ের সমীপে চাটুকারিতা—এই সকল অর্থে না ধরাই ভাল। কিন্তু কন্যার পিতা যতই চেষ্টা করুন—উল্লিখিত সমস্ত গুণসমন্বিত এবং সমস্ত দোষবিবর্জ্জিত সর্ব্বতোভাবে মনোমত পাত্র কখনই পাইবেন না। এই জন্য একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। কন্যার জন্য যে পাত্রটীকে দেখিবেন, সেটীকে সর্ব্ব বিষয়ে আপনার পুত্রের সহিত তুলনা করিয়া লইবেন—পুত্র না থাকে ভ্রাতুষ্পুত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিবেন। কেহই তুলনাযোগ্য আপনাদিগের বংশধর না থাকে আপনার নিজের সহিতই তুলনা করিয়া বুঝিবেন—পাত্রটী উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট। এইরূপে উৎকর্ষের একটী সীমা না করিয়া লইলে আপনার কন্যা কাহাকেও দিয়া মনের ক্ষোভ মিটে না। আর অনেক স্থলে বিসদৃশ বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হওয়াতে পরিণামে উভয় কুটুম্বের পক্ষে ক্লেশজনক এবং কন্যাজামাতা উভয়েরই ধর্ম্ম ব্যাঘাতক হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কন্যাদান স-ঘরে এবং সমান ঘরে করাই বিধেয়—এই জন্য আপনার পুত্রের সহিত তুলনা করিয়াই বরপাত্রের নির্ব্বাচন করিবে—কিছু উচ্চ অবশ্যই লইবে, কিন্তু খুব উচ্চে হাত বাড়াইবে না।

কিন্তু আজি কালি কন্যার দায়ে একবারে নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছায় খুব উচ্চ দেখিয়াই লোকের কন্যাদানে প্রবৃত্তি হইতেছে। বরপাত্রের দর বাড়িয়া উঠিবার সেটীও একটী অবান্তর কারণ। কিন্তু খুব উচ্চ ঘরে কন্যা দেওয়ায় নিজের এবং কন্যার উভয়েরই অনাদর হয়। আবার, খুব নীচ ঘরে দিলেও অন্য প্রকারে সেই ফলই ফলে। নীচ ঘরের লোকেরা মনে করে কন্যার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি যাই করুন, আর যতই করুন, তাঁহারা অনাদর করিতেছেন, এবং তাই ভাবিয়া তাঁহারা আত্মগৌরব হানির শঙ্কায় আপনারাই সমধিক পরিমাণে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব কন্যার বিবাহ সমান ঘরেই দিবে—ছোটতে ত যাবেই না—কিন্তু বড়র দিকেও বড় বাড়াবাড়ি করিবে না।

আর একটী বিষয় নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রূপ, গুণ, কুল শীল প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে আপনার পুত্রাদির সহিত বরপাত্রের তুলনা করিতে হয়, তাহার মধ্যে কোন ইতর বিশেষ করা যায় কি না। কার্য্য কালে অবশ্যই করিতে হয়। আমার মতে শীল বা চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা বড়, গুণ তাহারই নীচে, রূপ তাহার নীচে এবং কুল সকলের নীচে ধরিলেও চলিবে—অধিক দোষ হইবে না। আজি কালি কিন্তু কুলের এক ভাগ যে অর্থশালিতা তাহারই প্রতি লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়া আছে। তাহা যে অকারণ বা অন্যায্য তাহা নহে, তবে অধিক ধনবত্তার প্রতি দৃষ্টি করিবার ততটা প্রয়োজন নাই—মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। আরও একটী কথা বলি। পিতা কন্যাকে আপনার শক্তির অনুসারে ধনরত্নসমন্বিতা করিয়া দান করিবেন—যদি পারেন কন্যাকে কিছু বিষয় দিবেন—বরপক্ষের পীড়াপীড়ির প্রতীক্ষা করিবেন না। যদি এরূপ চেষ্টা করেন, তবে বরকর্ত্তা যে টাকার নিমিত্ত দাওয়া করিয়া থাকেন তাহাও কতকটা কমিয়া যাইবে। বরকর্ত্তার যে দাওয়া কমিবে, তাহার কারণ শুদ্ধ তাঁহার চক্ষুলজ্জা নহে। ঐ দাওয়ার মূলে একটী প্রকৃত তথ্য আছে। কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে কিছু সম্পত্তি দান করিলে দাওয়ার ঐ মূলটীই আর থাকিবে না। দাওয়ার প্রকৃত মূলটীই এই—নির্ণীতঃ কন্যাসন্তানদিগেরও পিতৃধনে কতক অধিকার আছে;

আমাদিগের ব্যবহারশাস্ত্রে ঐ নৈসর্গিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু নৈসর্গিক শক্তি সকলের মূর্দ্ধিবর্ত্তী। বরকর্ত্তা জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সেই নৈসর্গিক বলে বলীয়ান। কন্যাকে কিছু সম্পত্তি প্রদান করিলেই ঐ শক্তির পূজা হইয়া যায়, তিনি আর বরকর্ত্তার সহকারিণী হইয়া থাকেন না। এই জন্যই তাঁহার পণের দাওয়া কমিয়া যায়। পূর্ব্বকালের গোষ্ঠীপতিরা কন্যাজামাতাকে ভূ সম্পত্তি দান করিতেন, এই জন্য তাঁহারা কুলীন সন্তানদিগকে জোর করিয়া আনিলেও বরকর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উচ্চবাচ্য করিতে পারিতেন না।

আমাদিগের দেশে যেমন কন্যার বিবাহকে অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে করে, পুত্রের বিবাহকে সেরূপ মনে করে না। পুত্রের বিবাহে ভদ্রবংশীয়দিগের পণ লাগে না—পুত্র বিবাহিত হইলেও তাহার সুখ দুঃখ কতকটা পিতামাতারই আয়ত্তাধীন থাকে—পুত্রবধূকে আপনাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়া যায়। আর দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় বৌ মনে না ধরিলে ছেলের আবার বে দেবো, এরূপ ভাবও একটু মনে মনে সঞ্চিত থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কার্য্যতঃ বহুবিবাহ প্রথা অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে, যখন ক্রমে ক্রমে কন্যাকাল উত্তীর্ণ করিয়া লোকে কন্যার বিবাহ দিতেছে, যখন বিজাতীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে পুত্র এবং পুত্রবধূর বশ্যভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে, তখন পুত্রের বিবাহ দেওয়া কন্যার বিবাহের ন্যায় দায় বলিয়া গণ্য না হউক, উহাতেও যে অনেকটা বিবেচনা, সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তাহা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ একটু ভাবিয়া দেখিলেই নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, পুত্রের বিবাহ বিবেচনা করিয়া দিতে না পারিলে একেবারে তোমার বংশের মধ্যে দুরপনেয় দোষ প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব পুত্রের বিবাহ দেওয়াও কেবল হাসিখেলার ব্যাপার নহে। আজ কালি পুত্রের পিতা কেবল আপনার পণের দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। টাকার লোভে কেমন একটাকে যে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ছেলের গলায় বান্ধিয়া দিতেছেন, তাহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন না। এরূপ করায় কি পুত্রের প্রতি অতি কঠোর অত্যাচার করা হয় না? তাই বলি, পুত্রের বিবাহ দিয়া অধিক টাকা লাভ করিব, এরূপ লোভ

পরিত্যাগ কর, এবং পুত্রবধূটী কিরূপ হইলে তোমার কুললক্ষ্মী হইয়া উঠিবে, তাহারই বিশেষরূপ চিন্তা কর। বিশেষ করিয়া দেখ।

(১) কন্যাটী সুন্দরী কি না, অর্থাৎ তোমার পুত্র কন্যাদিগের অপেক্ষা তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব অধিক কি না।

(২) কন্যাটীর স্বভাব নম্র এবং উদার কি না। রূপ দেখিয়াই স্বভাবের অনেকটা বুঝা যায়। তাহাকে কিছু কথা কহাইয়া ও সমবয়স্কাদিগের সহিত তাহার ব্যবহার কিরূপ তাহা শুনিয়াও অনেক বুঝা যাইতে পারে।

(৩) কন্যার পিতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মশীল এবং বিদ্যাবান ছিলেন কি না।

(৪) কন্যার মাতা সাধুশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্মে দক্ষা কি না। এই চারিটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পর টাকা কড়ির দিকে দৃষ্টি করিলে তত হানি নাই। কিন্তু কন্যাটী যদি ঐ সকল বিষয়ই ভাল হয়, তবে পুত্রের সুখ এবং বংশের উন্নতি, এই উভয় দিক দেখিয়া পুত্রার্থে তাদৃশী কন্যারত্নকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। আর যদি গ্রহণ করাই স্থির হইল, তবে টাকা কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করা বড়ই নীচতা জানিবে। ফল কথা, পুত্রের বিবাহে শুদ্ধ পাওনার দিক না দেখিয়া তাহার ভাবি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বংশের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়।

বিবাহ ব্যাপারটী ইহ পারলৌকিক সকল প্রকার সুখ দুঃখের সহিত অতি ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ। ইহাতে সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক সমস্ত নীতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজনই আছে। অদ্যাপি পৃথিবীর কোন দেশের বৈবাহিক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভিনিবেশ হয় নাই—তাহা হইলে মনুষ্যজাতির যে কতদূর উন্নতি হইত, তাহা যে সকল স্থলে ঐ তথ্যের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োগ হইতে পাইয়াছে, তত্তৎস্থলের উৎকর্ষ দর্শনেই অনুমিত হইতে পারে। ইউরোপ খণ্ডের অনেকানেক দেশে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে পশুজনন কার্য্যটী একটী প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য আজি কালি ইংলণ্ডের ঘোড়া, গোরু, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি পশুগুলি অপর সকল দেশীয় ঘোড়া গোরু প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের জলবায়ু ঐ সকল জন্তুর পক্ষে

বিশেষ উপকারী নয়। কিন্তু তাহা না হইলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুযায়ী কার্য্যদ্বারা ঐ সকল পশুর বংশ ক্রমে ক্রমে সমূহ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিয়াছে—জলবায়ুর দোষে উহার অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই।

কিন্তু ততদূর জানিয়া শুনিয়া নরনারীর দাম্পত্য সম্বন্ধের সঙ্ঘটন এখন ইউরোপেও হয় নাই। আর এতদ্দেশে রাশি, গণ, নক্ষত্র এবং শারীর লক্ষণ প্রভৃতির বিচারপূর্ব্বক যাহা হইত, তাহার যৌক্তিকতাবোধটী বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি বলিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের বৈবাহিক ব্যাপারটা যে পরিমাণে বৈজ্ঞানিক নীতির বিরুদ্ধ হইতে পারিত, বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকায় উহা এখনও ততদূর বিকৃত হয় নাই। নচেৎ অপরাপর প্রাচীন জাতীয়দিগের ন্যায় এতদিনে আমাদেরও বিনাশ সাধন হইয়া যাইত। যদি এখনও আমরা উৎসাহযুক্ত হইয়া আপনাদের বৈবাহিক কার্য্যটীতে ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথাসম্ভব প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে অধঃপাত নিবারণের এবং ভাবি উৎকর্ষ সাধনের বীজ বপন করা হইতে পারে। এই সম্বন্ধে দুই একটী স্থূল কথা বলিয়া নিরস্ত হইব।

(১) পরস্পর অতি বিসদৃশরূপ দম্পতীর মিলনে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে না। [২] পাত্র পাত্রীতে একই অঙ্গের দোষ থাকা ভাল নয়। তাহাতে সন্তান অপকৃষ্ট হয়। শারীর গুণের মিলনে সন্তান ভাল হয়।

[৩] উল্লিখিত দুইটী নিয়ম বর এবং কন্যা উভয়ের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত যত খাটিবে ততই ভাল।

[৪] বর এবং কন্যার ঊর্দ্ধতন এক পুরুষের মধ্যে যেন কোন সংক্রামক রোগ না থাকে।

[৫] স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অতি গাঢ়তম প্রণয় থাকিলে সন্তান ভাল হয়।

[৬] পিতা মাতার শারীরিক এবং মানসিক দোষ গুণ তাঁহাদের সন্তানে বর্ত্তে।

—:*:*:—

চতুর্বিংশ প্রবন্ধ।

জেঁয়াচ্।

এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে শব্দটী আছে, উহার কোন সংস্কৃত মূল দেখা যায় না—উহা কোন অভিধানেও নাই—কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যেও ঐ শব্দটী দেখিতে পাই নাই। আমার বোধ হয়, এই আধুনিক শব্দটী বঙ্গভাষার মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। এখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই—কিন্তু ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

জেঁয়াচ্—অর্থে জীববৎসা স্ত্রী। যে প্রসূতির প্রথম সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তাহাকেই 'জেঁয়াচ্' বলে। এই আধুনিক শব্দের সৃষ্টি কি হেতু হইল? নূতন পদার্থ উপস্থিত হইলেই তাহার নামকরণ হইয়া নূতন শব্দের উৎপত্তি হয়। জেঁয়াচ কি একটী অসামান্য নূতন বস্তু? পূর্ব্ব কালে 'মৃতবৎসা' বা 'মড়ুঞ্চে শব্দের প্রচলন ছিল। তখন মৃতবৎসারাই নূতন বস্তু ছিলেন—এখন বুঝি জেঁয়াচেরাই সেইরূপ নূতন বস্তু হইয়াছেন? আমার বোধ হয় যে, প্রধানতঃ ইদানী বঙ্গদেশ মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এবং বালাবিবাহ প্রথার যে যৎকিঞ্চিৎ দোষ আছে, তাহা সংশোধন করিয়া চলিবার চেষ্টা না হওয়াতেই এই দুর্ঘটনাটী ঘটিয়াছে।

আধুনিক জেঁয়াচ্ শব্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! শুনা আছে, য়িহুদীজাতির আরাধ্য দেবতা কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তজ্জাতীয় প্রথমজাত সমস্ত সন্তানকে এক রাত্রি মধ্যে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতিও কি কোন দেবতার তাদৃশ অভিসম্পাত পড়িয়াছে যে, এতদ্দেশজাত অধিকসংখ্যক প্রথমজাত সন্তান রক্ষা পাইতেছে না—অকালে কাল কবলগ্রস্ত হইতেছে?

পঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি হিন্দু কি মুসলমান কোন জাতীয় লোকের মধ্যেই 'জেঁয়াচ্' শব্দের প্রতিরূপ কোন শব্দ প্রচলিত নাই। কিন্তু বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ জেঁয়াচ্ শব্দ জন্মিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গবাসী

মুসলমানদিগের মধ্যে 'আকড়' শব্দটীর সৃষ্টি হইয়াছে। যে মুসলমান জাতীয়া প্রসূতির প্রথম সন্তান জীবিত থাকে, তাহাকে 'আকড়' [অকর্ষ্ট?] বলে। বঙ্গদেশের মধ্যে কেন এই ব্যাপার উপস্থিত হইল?

প্রথম সন্তানের মৃত্যু সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। অপত্যবিয়োগ যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর নাই বলিলেও চলে। যাহার সন্তান-বিয়োগ হইয়াছে, তাহারই হৃদয় ক্ষত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম সন্তানের বিয়োগ যন্ত্রণা কিছু বিশেষ যন্ত্রণা। প্রথম সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যে বাৎসল্যভাব জন্মে তাহা অতি অপূর্ব্ব। বাৎসল্যভাবের সহিত প্রথম পরিচয় এবং ঐ ভাবের অভিনব সুখোপলব্ধি প্রথমজাত সন্তানকে লইয়াই হয়। প্রথম সন্তানের প্রতি মমতা অতি প্রগাঢ়। প্রথম সন্তানটী নিতান্তই নিজস্ব। যম ঐ নিজস্বের লোপ করিয়া মমতার ভ্রম ঘুচাইয়া দিলে একেবারে আকাশ হইতে রসাতলে পড়িতে হয়। তাহার পর আর যত সন্তান জন্মে কাহার প্রতি আর তেমন মমতা জন্মে না। সন্তান সত্য সত্যই আপনার নয়, এই ভাব চিরজাগরূক হইয়া উঠে; তাহাদিগের সকলেরই উপর যমের ভাগ আছে জানিয়া আর পূর্ব্বের মত গাঢ় মমতা জন্মিতে পায় না। উহারা নিজস্ব নহে—অন্যের গচ্ছিত ধন—নাড় চাড়, কিন্তু আপনার বলিয়া মনে করিও না। অথবা উহারা ত থাকিবেই না—তবে রেখে যেতে পারিলে হয়, মনোমধ্যে নিরন্তর এই ভাব উদিত থাকিয়া আপনার জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দেয়। আমাদিগের মধ্যে যে ঔদাসীন্য, মানসিক দুর্ব্বলতা এবং অধ্যবসায়বিহীনতা দৃষ্ট হয়, তাহার অন্যতম কারণ আমাদিগের প্রথমজাত সন্তানগুলির অকালমৃত্যুর প্রাচুর্য্য।

যৌবনকালে বিবাহ হইল, সন্তান জন্মিল, কার্য্যতৎপরতা অবশ্যই জন্মিবে। প্রিয়তম পুত্র এবং প্রিয়তমা ভার্য্যাকে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত স্বতঃই প্রবলতর ইচ্ছা হইবে। যাহাদিগের কোন পাছুটান নাই, তাহাদিগের অপেক্ষা পুত্রকলত্রবান ব্যক্তির সহস্র গুণে সাবধানতা এবং পরিণামদর্শিতা সমুদ্ভূত হইবে। শুদ্ধ আপনার জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগের পরিশ্রমশালিতার উত্তেজক সাক্ষাৎ স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহার স্ত্রী পুত্র আছে, তাঁহার পরি-

শ্রমোন্মুখতার হেতু স্বার্থ এবং পরার্থ উভয় সম্মিলিত। তিনি অবশ্যই অধিকতর পরিশ্রম করিতে পারিবেন।

তদ্ভিন্ন আশ্রমী ব্যক্তি পরিশ্রমক্লান্ত হইলে অতি সহজেই শরীর এবং মনের ক্লান্তি দূর করিতে পারেন। তিনি পুত্রকলত্রাদি লইয়া কিয়ৎক্ষণ যাপন করিলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ শক্তি প্রাপ্ত হন। আশ্রমবিহীন ব্যক্তির ক্লান্তি দূর করিবার তেমন সহজ উপায় কিছুই নাই। কার্য্যপরিবর্ত্ত অথবা কার্য্যবিরামে মাত্র তাঁহার উপায়।

এত সুবিধা সত্ত্বেও আমাদিগের যুবাপুরুষগণ শ্রমবিমুখ, অধ্যবসায়শূন্য, কার্য্যতৎপরতাবিহীন ও অপর দেশীয় বৃদ্ধ লোকদিগের অপেক্ষাও সমধিক নিস্তেজ এবং নির্জ্জীব হইয়া আছেন। আমার বোধ এই যে, ইহাঁদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই প্রথমজাত সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য অল্প বয়স হইতেই ইহাঁদিগের হৃদয়কন্দরে স্ব স্ব জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মে। পৃথিবীর কিছুই কিছু নয়, এই বোধটী অকালে উদিত হয়, এবং সেই জন্যই ইহাঁরা যৌবনাবস্থায় বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ দেশের স্ত্রীলোকেরাও যে, অতি শীঘ্র প্রাচীন অবস্থা প্রাপ্ত হন, উল্লিখিত দুর্ঘটনাই তাহার একটী মুখ্য কারণ। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের নাম 'সধবা"—তাহার দ্বিতীয়ই 'জেঁয়াচ্'। আমার 'জেঁয়াচ্' নাম ঘুচিয়াছে, ঈশ্বর করুন, যেন অপর নামটী থাকিতে থাকিতেই যাইতে পারি" —পূর্ণ যৌবনা বঙ্গমহিলাদিগের মুখে ঐরূপ কথা অসাধারণ নহে।

—(*)—

পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ।

—•(০)•—

নিরপত্যতা।

বিবাহ হইলেই গৃহাশ্রমে প্রবেশ হয়—প্রণয় সঞ্চার হইলেই দম্পতীর স্বার্থপরতার সংস্কার আরম্ভ হয়। কিন্তু স্বার্থপরতার সংস্কারকি?—পরার্থে উহার বিস্তৃতি। যতক্ষণ ঐ বিস্তৃতি হইতে থাকে ততক্ষণই সংস্কার হইতে থাকে। বিস্তৃতি স্থগিত হইলেই সংস্কারও স্থগিত হয়। যতক্ষণই তোমার স্বার্থ আর কাহার স্বার্থের সহিত সম্মিলিত হইতে যাইতেছে, ততক্ষণই তোমার স্বার্থের সংস্কার হইতেছে, যখন মিলিয়া গেল—দুই স্বার্থে এক স্বার্থ হইল, তাহার পর আর স্বার্থের বিস্তৃতিও হইল না—সংস্কারও হইতে পারিল না। এই জন্যই বলিলাম যে, দম্পতীর প্রণয়ে তাহাদিগের স্বার্থ-সংস্কারের আরম্ভ মাত্র হয়। দম্পতীর পরস্পর আকর্ষণ এত প্রবল যে, ঐ আকর্ষণ প্রভাবে দুইটী জীবন অতি অল্পকালের মধ্যেই দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়া সম্মিলিত এক জীবনের ন্যায় হইয়া উঠে। উহাদিগের মধ্যে স্বার্থ পরার্থ বোধের অবসর লুপ্তপ্রায় হয়, অথবা প্রকৃতিভেদে যতদূর লুপ্ত হইবার তাহা হইয়া ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া পড়ে। ফলকথা, বাহ্য জগতে যেরূপ অন্তর্জগতেও তাই। দ্রব্যের প্রকৃতি ভেদে কোথাও যোগাকর্ষণ, কোথাও বা রাসায়নিক আকর্ষণ. কোথাও দুইটী আত্মার নৈকট্য সম্বন্ধমাত্র—কোথাও বা দুইটীতে মিলিয়া একটী অপূর্ব্ব বস্তু।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে আমার আর একটী কথা মনে পড়িল। অনেক দিন হইতে আমার সংস্কার হইয়া আছে যে, দম্পতীর পরস্পর সম্মিলনের পরিমাণ এবং প্রকারভেদ প্রায়ই তাহাদিগের সন্তানের আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। যদি তাহাদিগের সম্মিলনের প্রকৃতি বাহ্যজগতের যোগাকর্ষণের অনুরূপ হয়, তবে সন্তানে কখন পিতার আকার প্রকার কখন বা মাতার আকার প্রকার অধিক পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, অথবা পিতৃবংশীয় কিম্বা মাতৃবংশীয় পূর্ব্বগত কোন পুরুষ বা স্ত্রীর ভাব ধারণ করে। যদি দম্পতীর সম্মিলন বাহ্যজগতের রাসায়নিক সম্বন্ধের অনুরূপ হয়, তবে প্রতি

সন্তানেই উহাদিগের উভয়ের আকার প্রকার অথবা তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আকার প্রকার পরস্পর সম্মিলিত ভাবাপন্ন হইয়া দৃষ্ট হয়। আমার এই সংস্কারটী এত দৃঢ়সম্বদ্ধ নয় যে, উহাকে আমি অব্যভিচারী তথ্য বলিয়া মনে করিতে পারি—কিন্তু এই ভাবটী প্রথমে যখন আমার মনে উঠিয়াছিল, তাহার পর আমি যত দেখিয়াছি বা পড়িয়াছি * তাহাতে ইহা অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হয় নাই।

যাহা হউক, সন্তান জন্মিলে যে দম্পতীর প্রণয় দৃঢ়তর হয়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দশ সহস্রের মধ্যে দুই চারিটী নিতান্ত পশুধর্ম্মা ভিন্ন এই কথা অপর সকলের পক্ষেই খাটে। সন্তান জন্মিলে পিতা মাতার একীভূত স্বার্থপরতা আবার বিস্তৃত এবং সুসংস্কৃত হইতে থাকে। কি করিলে ছেলে ভাল থাকিবে, কি করিলে সে ভাল হইবে, কেমন উপায় করিতে পারিলে তাহার অবস্থা আপনাদিগের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে এই সকল চিন্তা আসিয়া পিতা মাতার হৃদয়কে আশ্রয় করে। তাঁহারা আপনাদের সুখের দিকে আর বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না—স্বার্থপরতার পুনঃসংস্কার হইয়া উহা পরার্থপরতার উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করে। সন্তান এইরূপে পিতা মাতার জীবনের সংস্কারক হয়। বাপ মা সন্তানের জন্য যে কত শত করেন, শাস্ত্রে এবং লোকের মুখে তাহারই ভূয়োভূয়ঃ ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সন্তান যে পিতা মাতার অশেষ উপকার করে, তাহা শাস্ত্রের ইঙ্গিত মাত্রে উক্ত হইয়াছে; কোথাও সুবিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সন্তান পিতা মাতার নিরয়-ত্রাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডদানাদি দ্বারা। আমার বিবেচনা এই পরকালে যাহা কিছু হয়, তাহার সূচনা ইহকাল হইতে হওয়া চাই †। সন্তান ইহলোক হইতেই নিরয়ত্রাণের কোন উপায় করিয়া দেয়

* অয়ং ন কেবলমস্মৎ সংবাদিন্যাকৃতিঃ—
অপি জনকস্য তায়াস্তচ্চ তচ্চানুরূপং
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণ্যোন্নেয়মস্তি।
নমু পুনরিব তস্মে গোচরীভূতমঙ্কো
রভিনবশতপত্রশ্রীমদাস্যাং প্রিয়ায়াঃ।

† যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। সন্তান দ্বারা যে পিতা মাতার স্বার্থের সংস্করণ হয় তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু অপত্য কর্ত্তৃক আরব্ধ সংস্করণ-কার্য্য অল্পকাল মধ্যে নিবৃত্ত হয় না। উহা সন্তানের পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত চলিতে পারে —ফলতঃ যত দিন পিতা মাতা নিজ সন্তানের জীবনকে আপনাদিগেরই জীবনের অনুবৃত্তি মাত্র বোধ না করেন, তত দিন সন্তান দ্বারা স্বার্থপরতার সংস্কার হইতে থাকে। কিন্তু সন্তানের জীবনকে আপনাদিগের জীবনের অনুবৃত্তি ভাবিয়া সন্তানকে ঠিক আপনাদিগেরই মত করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিলে সন্তানের নিজের বৃত্তি সকলের সঙ্কোচসাধন করা হয়, তেমন স্থলে পিতা মাতার স্বার্থপরতার সংস্কারে ব্যাঘাত জন্মে। সন্তানের জ্ঞানোন্মেষ হইবামাত্র পিতা মাতার বোধ হইতে থাকে যে, তাঁহারা নিজে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সন্তানও সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইবে, আপনারা নিশ্চেষ্ট হইলে সন্তানের অবস্থার উৎকর্ষসাধন হইবে না। বস্তুতঃ সন্তান পালন করিতে করিতেই শিক্ষাপদ্ধতির যে কত নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হয়, মানবহৃদয়ের যে কত অপরিজ্ঞাত তথ্য পরিজ্ঞাত হয়, কার্য্যের বিঘ্নবৈষম্য সমুদায় উৎসাহশক্তির উত্তেজনায় যে কিরূপ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। একটী উদাহরণ দিতেছি। প্রথম সন্তানের জন্ম হইলে কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষা শিশুপালন এবং চিকিৎসাবিধান এমন উত্তমরূপে শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, অনেক সময়ে কৃতবিদ্য চিকিৎসকেরা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং তাঁহার উপদেশ পাইয়া কৃতকার্য্য হইত। ছেলেটী দুর্ব্বল ছিল। ক্রমে তাহার শরীর সুস্থ এবং সবল হইল। তাহার শিক্ষা কার্য্যের বিধান করিতে করিতে শিক্ষা পদ্ধতির সমুদায় সূত্র পিতার আয়ত্ত হইয়া গেল। ছেলেটীকে বিলক্ষণ মেধাবী এবং বুদ্ধিমান্ দেখিয়া পিতার ইচ্ছা হইল ইউরোপে প্রেরণ করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবেন, তজ্জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা জন্মিল এবং স্ত্রী পুরুষে মিতব্যয়িতা শিখিলেন।

ঐ ব্যক্তির একটী কন্যা হইল। কন্যাটী বাড়িতে লাগিল—লেখা পড়ায় মনোযোগ প্রদর্শন করিতে লাগিল—বুদ্ধি এবং সুশীলতায় উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। পিতা কন্যাকে তদুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু ধনবান নহেন বলিয়া পাছে সুপাত্র সংযোজন না হয়, এইরূপ ভয়

হইতে লাগিল। তিনি ধনবৃদ্ধির উপায় করিতে না পারিয়া ভাবিলেন যদি পাঁচ জনে আমাকে ভাল বলিয়া জানে, তবে মেয়ের বিবাহের নিমিত্ত ভাল ছেলে যুটিতে পারিবে। এই ভাবিয়া তিনি যশোলিপ্সু হইলেন।

উহাঁর আর একটী পুত্র হইল। পুত্রটী অতি সুন্দর। প্রাচীন-সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ কোন মহাপুরুষ ছেলেটীকে দেখিয়া বলিলেন, এ ছেলেটী অতি ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, সদয়স্বভাব এবং বহুলোক পালক হইবে। ঐ কথায় অনায়াসে পিতা মাতার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহারা আত্মগৌরব-সম্পন্ন হইলেন এবং ওরূপ পুত্রের বাপ মায়ের উচ্চপ্রকৃতিক হওয়া আবশ্যক বোধ করিয়া আপনারা উন্নতিপরায়ণ হইলেন।

ঐ ব্যক্তির আর একটী পুত্র হইল। সেটী যখন চারি পাঁচ বৎসরের তখন তিনি একদিন তাঁহার মনিবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মনিব বলিয়া ফেলিলেন, তোমার যত দূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—আর কি হইবে? ইংরাজ জাতীয় মনিবের ঐ হৃদয়শূন্য বিরস বাক্য যেমন কাণে গেল অমনি হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—ছেলেটীকে মনে পড়ায় প্রজ্বলিত ক্রোধের দমন হইল এবং মুখ হইতে এমন ভাবে যুক্তি পরম্পরা নির্গত হইল যে মনিব একেবারে মুষ্টিমধ্যে আসিলেন—প্রদত্ত পরামর্শ সমস্ত শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলেন এবং ঐ ব্যক্তির উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক প্রীতিভাজন সন্তান আলস্য, নিশ্চেষ্টতা, নিরুৎসাহতা, অপ্রযত্ন, অসমীক্ষ্যকারিতা প্রভৃতি নিরয় হইতে পিতা মাতাকে বিমুক্ত করে এবং সেই জন্যই সন্তানকে নরকত্রাতা বলা যায়।

যে দম্পতীর সন্তান না জন্মিল, তাঁহাদিগের প্রণয় বর্দ্ধিত, বিস্তৃত এবং উচ্চতর সংস্কারপূত হইতে পারে না; অসমীক্ষ্যকারিতা দোষ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইলে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নই করিতে হয়; অধ্যবসায় এবং উৎসাহশীলতা অল্পকালেই স্তিমিততেজ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নিরয় দশা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? অসামান্য ঔদার্য্য এবং দূরদর্শিতা ও ধীরতাসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার উপায় আপনিই করিয়া লইবেন—নিজ নৈসর্গিক অর্থাৎ পিতা মাতার পুণ্যের বলেই তিনি তরিয়া যাইবেন, অপর

সাধারণ লোকের পক্ষে নিরপত্যতাজনিত দোষ অতিক্রম করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই জন্যই বিশেষ দুরূহ যে, মনুষ্য রাগদ্বেষাদি ভাব দ্বারা যত পরিচালিত হয়, বুদ্ধিদ্বারা তত পরিচালিত হয় না; বুদ্ধি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চায়, তাহা অপেক্ষা রাগদ্বেষাদি ভাব যে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চায়, তৎপ্রতি সমধিক আগ্রহ জন্মে। নিরপত্যতা নিবন্ধন এই এই দোষ জন্মিতে পারে, অতএব সেই সকল দোষ যাহাতে না হইতে পায় এমন করিয়া চলিব, এরূপ অল্প লোকেই বুঝিতে পারে, এবং যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারাও সকলে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দোষ অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয়ের দোষ নিবারণ করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু লোকে বাহ্য অবলম্বনদ্বারা উভয় স্থলেই দোষের প্রতীকার চেষ্টা করিয়া থাকে। চক্ষু দুর্ব্বল হইলে চসমা লওয়া হয়, কর্ণ দুর্ব্বল হইলে স্পীকিংট্রম্পেট ব্যবহৃত হয়, পা খোঁড়া হইলে লাঠি ধরা হয়। মানসিক দুর্ব্বলতার হেতু উপস্থিত হইলেও ঐ প্রকারই করিয়া থাকে; অর্থাৎ চসমা, স্পীকিংট্রম্পেট এবং লাঠি ধরার ন্যায় নিরপত্যেরা পোষ্যপুত্র লয়, কিম্বা বিড়াল কুকুর ময়না পোষে—অথবা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহার সেবায় রত হয়। তাহাও মন্দ নয়। ইহাতেও কতকদূর হইতে পারে—এবং সেই জন্যই লোকে করে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, নিরপত্যতা হইতে কি কি দোষ জন্মে, তাহা বুঝিয়া মনে মনে চেষ্টা করিয়া সেই সেই দোষের প্রতিবিধান করিতে পারিলেই ভাল হয়—বাহ্য অবলম্বন গ্রহণে তেমন উত্তম হয় না।

সাধারণ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে নিরপত্যতা এমনি দুর্ভাগ্য যে, কিছুতেই উহার সম্যক্ প্রতিবিধানের সম্ভাবনা নাই। ছেলে হয়ে যাওয়ার চেয়ে ছেলে না হওয়া ভাল, যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্রীর বাক্য শুনিয়া কি মনে করিবেন? গ্রন্থকর্ত্রী বলেন, "চিরান্ধ হওয়া অপেক্ষা একবার মাত্র সূর্য্যের মুখ দেখিয়া অন্ধ হওয়া ভাল।" আমার অনেক ছেলে মেয়ে হইয়া গিয়াছে তথাপি একবারও মনে হয় না যে, তাহারা না হইলে ভাল হইত। যাহার সন্তান হইয়া যায় সে অন্যের ছেলেকে পাইলে আপনার করিয়া লইতে পারে।

—:*:*:*:—

ষড়্‌বিংশ প্রবন্ধ।

সন্তান পালন।

সংসারাশ্রমীদিগের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের চরম ফল তাঁহাদিগের সন্তানে বিদ্যমান থাকে। জ্ঞানচর্য্যা, ধর্ম্মচর্য্যা, পতি পত্নী প্রেম, পিতৃ মাতৃ সেবা, কুটুম্বতা, জ্ঞাতিত্ব, লৌকিকতা, মিতাহার, মিতাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, দাতৃত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সংসারাশ্রমের বিহিত ভাব, সকলেরই ফল সেই আশ্রমসম্ভূত এবং সেই আশ্রম-পালিত সন্তানে দৃষ্ট হয়। এই জন্যই সন্তান ভাল হইলে মাতাপিতার পুণ্য সূচিত হয়, সন্তান মন্দ হইলে তাঁহাদের অপুণ্য সূচিত হয়। যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহাদিগের পার্থিব পরলোকে (অর্থাৎ সন্তানে) ঊর্দ্ধগতি, যাহারা পুণ্যশালী নয়, তাহাদিগের পার্থিব পরলোকে (অর্থাৎ সন্তানে) অধোগতি। উল্লিখিত নিয়মের কদাচিৎ ব্যভিচার হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন—নিয়মটীকে সাধারণতঃ অব্যভিচারী বলিয়াই মনে করা ভাল।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই হৃদয়ে ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি সমধিক আস্থা। পরকালের নিমিত্তই আমাদিগের সব। হিন্দু জাতীয়েরা আহার বিহার পরিচ্ছদাদিতে অপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা যে অল্প-যত্ন, হিন্দু জাতীয়দিগের সকল কার্য্যেই যে ঈশ্বরের স্মরণ এবং সকল কর্ম্ম ফলেরই ঈশ্বরে সমর্পণ, নিষ্কামতাই যে হিন্দুদিগের একান্ত শিক্ষণীয়, পারলৌকিক সদ্গতি সাধনার্থ হিন্দুদিগের মধ্যে যে কঠোর তপশ্চরণ এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন, এ সমুদয়ের একমাত্র কারণ হিন্দুদিগের পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস এবং নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ইহলৌকিক সুখ অপেক্ষা পারলৌকিক সুখের প্রতি অধিকতর লালসা। এটী হিন্দুজাতির দোষ নহে—পরম গুণ। বর্ত্তমান সুখৈশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা যাঁহারা ভাবী সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি অধিকতর লোলুপ, তাঁহাদিগের মধ্যে পশুধর্ম্ম অপেক্ষা মনুষ্যধর্ম্মই প্রবলতর।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রকৃতি এরূপ উচ্চ হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে যে কতকগুলি কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ উচ্চ প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্বস্থলে সাধিত হইতেছে না। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় পরকালের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত ইহলৌকিক বা পার্থিব পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং অনেক সময়ে অতীন্দ্রিয় পারলৌকিক উন্নতির প্রকৃতপথেও পদার্পণ করিতে পারিতেছেন না। পরলোক ইহলোকের পরিণাম মাত্র—শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়থাই সিদ্ধ এই তথাটী কদাপি ভুলিতে নাই। সকলেরই অন্তঃকরণে এই তথাটীকে জাগরূক রাখা আবশ্যক যে, সন্তানদিগকে উৎকৃষ্টতর দেহমনঃসম্পন্ন করিয়া যাইতে না পারিলে কোন নরনারীর পারলৌকিক উদ্ধগতি সম্পাদিত হইতে পারে না। 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং"—পুত্রের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবে এটী বিধিবাক্য; সন্তান বাৎসল্যের পরিচায়ক স্বরূপাখ্যান মাত্র নয়। কিন্তু শুদ্ধ ইচ্ছা করিলেই ত হইবে না; যাহাতে পুত্র তোমাকে পরাজয় করিতে পারে, তাহার উপায় তোমাকে করিয়া দিতে হইবে।

প্রথমতঃ পুত্রের শরীর যাহাতে নীরোগ, পটু এবং বলিষ্ঠ হয়, তাহা করিতে হইবে। তজ্জন্য সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বকাল হইতে আপনাদিগের শরীর নীরোগ, শুচি এবং সক্ষম করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। সুতরাং মিতাচার, মিতাহার, পরিচ্ছন্নতা ব্যায়ামচর্য্যা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইল। পিতৃ মাতৃ শরীরে অপক্ক রস ক্লেদাদি থাকিলে তাহা সন্তানের শরীরে সংক্রমিত হইয়া তাহাকেও রুগ্নদেহ করে। পিতৃ মাতৃ শরীর শুচি এবং সবল হইলে তজ্জাত সন্তানের দেহও নীরোগ এবং বলশালী হয়। একটী পুরাতন গল্প বলি—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভিরাম গোস্বামী নামে একজন যোঢ়াসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। যোঢ়াসিদ্ধেরা একপ্রকার দেবাধিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁহারা যাহাদিগকে প্রণাম করেন, যদি তাহাদিগের শরীরে দৈবশক্তির আবির্ভাব না থাকে, তাহা হইলে প্রণাম করিবামাত্র তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সন্তান জন্মিলে, অভিরাম একদা গুরুদর্শনে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, "অভিরাম! আমার একটী পুত্র হইয়াছে।" অভিরাম;

ঠাকুর পুত্র দর্শনে গমন করিলেন, এবং সূতিকাগারের দ্বার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে প্রণাম করিলেন। শিশুটী তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এই রূপ তিন চারি বার হইলে মহাপ্রভু তিন বর্ষের নিমিত্ত স্ত্রীসহবাস পরিহার-পূর্ব্বক অনেকগুলি যোগের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং মন্ত্রসিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সন্তানোৎপাদন করিলেন। আবার অভিরাম আসিলেন—আবার ঠাকুরপুত্রকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু এবারে শিশুটীর কোন হানিই হইল না; প্রত্যুত শিশুটী পদোত্তলনপূর্ব্বক যেন পিতৃশিষ্যকে আশীর্ব্বাদ প্রদানের ইঙ্গিত প্রকাশ করিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ঐ সন্তানটীই পরে বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হইয়া সমস্ত বঙ্গভূমিতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাবল্য সংস্থাপন করেন। এই গল্পে একটি প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে।

আমার কোন কোন আত্মীয়ার পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইতেছে শুনিয়া আমি তাঁহাদিগের স্বামিদিগকে পরামর্শ দিয়াছি যেন পুনর্গর্ভধারণের কাল বিলম্বিত হয়। কালবিলম্বে গর্ভস্রাব দোষ সারিয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয়, যদি একটী সন্তান জন্মিবার ৪।৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ না হয়, তবে প্রসূতির শরীর ক্ষয় হয় না, এবং সূতিকাগৃহেও এত অধিক সন্তানের অকাল মৃত্যু সংঘটন হয় না।

গাঢ়তম প্রণয় সম্বদ্ধ দম্পতীর সন্তান সুষ্ঠুশরীর এবং সুষ্ঠুমনা হইয়া থাকে। এই জন্য স্ত্রী পুরুষে পরস্পর কলহ বিসম্বাদ সর্ব্বদা পরিহার্য্য—বিশেষতঃ যখন গর্ভ ধারণ হইয়া গিয়াছে, তখন গর্ভিণীর মনে কোন প্রকার উদ্বেগ জন্মাইতে নাই।

ফলকথা, সন্তানোৎপাদন এবং সন্তানের পালন সম্বন্ধে অনেক নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সে সমুদায়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করাও এই প্রবন্ধে সম্ভবে না। স্থূল কথা এই—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে হইবে। আপনারা সুস্থশরীর না হইলে সন্তান সুস্থশরীর হইবে না, আপনারা অকৃত্রিম ধর্ম্মশীল না হইলে সন্তানও ধর্ম্মশীল হইবে না; আপনারা বিদ্যাচর্চ্চায় উন্মুখ না হইলে সন্তানের বিদ্যানুরাগ জন্মিবে না; আপনারা মিতব্যয়ী না হইলে সন্তানকে সম্পত্তিশালী করিতে পারিবে না। সমুদায় ধর্ম্মাচারের বীজ কোথায়—ইহার অনুসন্ধানে বহুদেশের

ধর্ম্ম-বীজ। কেহ বলেন, অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতেই মনুষ্যগণ ধর্ম্ম বীজ লাভ করেন। কেহ বলেন, পরোপকার ভিন্ন ধর্ম্ম বীজ হয় না। কাহার কাহার মতে অধিকসংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণে সুখ যাহাতে সাধিত হয়, তাদৃশ কার্য্যই ধর্ম্ম কার্য্য। এবম্প্রকার বিবিধ মতবাদের যেটীকে অবলম্বন করা যাউক, কার্য্যকালে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আবার বিচার এবং যুক্তিসংগ্রহ করিতে হয়। আমি বলি, সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে একটী অপেক্ষাকৃত সহজ নিয়ম বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে—কোন এক বিষয়ে নহে—সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা কর—ধর্ম্মসাধন হইবে। মোটামুটি সমুদায় ধর্ম্মচর্য্যা ঐ এক ভিত্তিমূলে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরেও দেখ, যাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা উন্নতিশীল মানবজীবনের সার্থকতা সাধন করেন। তাঁহাদের ইহলোক পরলোক উভয় লোকই রক্ষিত হয়; যাঁহারা তাহা না পারেন, তাঁহাদের ইহলোকে মনস্তাপ এবং পরলোকে অধোগতি।

সপ্তবিংশ প্রবন্ধ।

—০(০)০—

শিক্ষা-ভিত্তি।

সন্তান সন্ততিকে লেখা পড়া শিখাইতে হয় এই বোধটী এক্ষণকার প্রায় সকল লোকেরই মনে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেও যে এ দেশে ঐরূপ বোধ না ছিল, কিম্বা এক্ষণকার অপেক্ষ কম ছিল, তাহা নহে। তবে পূর্ব্বকার গতানুগতিক লোকের ঐ বোধ অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রখর ছিল; এক্ষণে স্বচিন্তা বা উদরচিন্তা অথবা অভিনব শিক্ষা দ্বারা প্রণোদিত নব্যদিগের ঐ বোধটী অপেক্ষাকৃত প্রখর এবং সতেজ হইয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরের ছেলের হাতে খড়ি দাও, তাহাকে পাঠশালায় পাঠাও, পাঠ অভ্যাস করাও—না করে "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ" বচনার্থ স্মরণ করিয়া যাহা করিতে হয় কর। যাহা করা উচিত সন্তানকে চলিয়া দাও—যাহা না করা উচিত তাহাও বলিয়া দাও—বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—উচিত না করিলে মার—অনুচিত করিলেও মার। তাহা করিলেই শিক্ষা নীতির পদ্ধতি জ্ঞান এবং তাহার মুখ্য অনুষ্ঠান হইল।

নব্যকালে ঐ পদ্ধতি দূষ্য হইয়াছে, এখন ছেলের হাতে খড়ি দিতেই হয় না; এখন তাহাকে ফাঁকি জুঁকি দিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়, ছেলে যেন টের না পায় যে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে—অথচ শিখিয়া ফেলে। ইউরোপে কোথাও কোথাও নিয়ম হইয়াছে যে, ছেলেকে যদি পর কীয় ভাষা শিখাইতে হয়, তবে ঐ পরকীয় ভাষা কহিতে পারে, এমন চাকর বা চাকরাণী তাহার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে উহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে ছেলে তাহাদিগের ভাষাটী শিখিয়া ফেলিবে। কোন দ্রব্যের গুণ, ধর্ম্ম ব্যবহারাদি শিখাইতে হইলে কথায় বলিয়া দিলে হইবে না। সেই দ্রব্য আনিয়া ছেলেকে দিতে হইবে, সে ব্যবহারে আনিয়া তাহার গুণাদি বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিবে এবং স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়া

হইবে। ভাষা এবং বাহ্য পদার্থ শিক্ষার সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানোৎপাদনের জন্যও ঐ প্রণালী অবলম্বনের কতক চেষ্টা হইয়াছে। কোন সুবিখ্যাত নামা ইংরাজ তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আদ্যোপান্ত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছেলেকে বিধি বা নিষেধ মুখে কিছু না শিখাইয়া যাহাতে সকল বিষয় সে ঠেকিয়া শিখে এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ কথা খুব পাকা কথা, তাহার সন্দেহ নাই—ঠেকে শিখিলে শিক্ষা যেমন বদ্ধমূল হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব উল্লিখিত গ্রন্থকার যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, সম্ভবমত তদনুসারে চলিবার চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু বিধি নিষেধ দ্বারা শিক্ষা দানের কোন স্থলই কি নাই? মানব-প্রকৃতিতে কি ভূয়োদর্শন ভিন্ন জ্ঞানলাভের আর কোন পন্থাই নাই?—ঠেকে শেখা বা ভূয়োদর্শন দ্বারা শেখা—একথার তাৎপর্য্য সুখ দুঃখ ভোগ দ্বারা শিক্ষা লাভ করা। ছেলে একটী কাজ করিল—যথা দীপ-শিখায় হাত দিল—তাহার হস্তে তাপ লাগিল, তাহার দুঃখ হইল, সে বুঝিল যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে অতএব আগুনে হাত দিতে নাই। যদি পৃথিবীর সকল ব্যাপারই ঐরূপ হইত অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই তজ্জনিত দুঃখ সুখের ভোগ হইত, তাহা হইলেই ঐরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারিত। কিন্তু পৃথিবীর অধিক ব্যাপারই ওরূপ নহে। অনেকস্থলেই সুখ দুঃখ কালব্যবধানে সংঘটিত হয়। ছেলে মিষ্টান্ন খাইল—খাইতে বেশ লাগিল—তাদৃশ দ্রব্য ভোজনের সুখই তাহার মনকে আকর্ষণ করিল। দুই চারি দিন পরে তাহার পীড়া হইল। শিশু সেই মিষ্টান্ন ভোজনের সহিত তাহার পীড়ার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল না। তাহাকে ঐ সম্বন্ধ বুঝাইয়া না দিলে তাহার কোন শিক্ষা-লাভই হইবে না। অতএব বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বুঝা-ইয়া দিলে যে শিক্ষা হয়, তাহার মূল ঠেকে শেখা নহে, তাহার মূল শিশুর বিশ্বাস মাত্র। অতএব বিশ্বাসকেও শিক্ষার একটী স্বতন্ত্র ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা বিশ্বাসের উপর শিক্ষার সোপান স্থাপন করিতে একান্ত নারাজ, তাঁহাদিগের সকল কাজ ত প্রকৃত প্রস্তাবে চলেই

না, প্রত্যুত তাঁহাদিগের বৃথা চেষ্টাদ্বারা শিক্ষা-প্রণালীর কতক অঙ্গভঙ্গ হইয়া যায় মাত্র।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের নিদান খুঁজিতে খুঁজিতে যেখানেই উপস্থিত হওয়া যাউক, উহা শুদ্ধ সুখ দুঃখের বিচারের মধ্যে পাওয়া যায় না। উহা সকলেই আপন আপন হৃদয়ের মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বীজ প্রথমে কিরূপে উপ্ত হয়, যদিও তাহা না বলিতে পারা যায়, উহা কিরূপে প্রকট হইয়া উঠে, তাহা একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। একটী প্রকৃত বিবরণ বলি—কোন গৃহস্থের বাটীতে দুই জনে সময়ে সময়ে সতরঞ্চ খেলিতেন। তাঁহাদিগের একজনের একটী দেড় বৎসর বয়সের বালিকা ঐ স্থানে বসিয়া থাকিত। সে সতরঞ্চের 'বল' লইবার জন্য হাত বাড়াইলেই তাহার পিতা প্রসারিত হস্তটী ধরিয়া বলিতেন—"হাত দিও না"। কিছু দিন এইরূপ হইলে এক দিন বালিকাটী খেলার কাছে বসিয়া আছে, দক্ষিণ হস্তটী 'বল' লইতে প্রসারিত করিয়া বাম হস্তে আপনার প্রসারিত হস্তকে ধারণ করিল এবং আপনিই আপনাকে পুনঃ পুনঃ বলিল, "হাত দিও না"। এই ব্যাপারটীতে কি বুঝায়? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা হৃদয়শালী পুরুষের যেরূপে অভ্যুত্থান হয়, এই ব্যাপার কি তাহাই স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে না? বালিকাটী যেন একেই দুইটী ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছে—তাহার এক জন সতরঞ্চের বল গ্রহণ করিতে উদ্যত, অপরে তাহাকে নিবারণ করিতেছে। যে নিবারণ করিতেছে, সে তাহারই হৃদয় মুকুরস্থ পিতার প্রতিবিম্ব।

অতএব বিধিনিষেধ দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদ্রেক বিধান করা একান্ত আবশ্যক। তাহা করিলেই সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে—কেবল দুঃখ সুখ বিচারের উপর কর্ত্তব্য বোধের সংস্থাপন কখনই কার্য্যকালে দৃঢ় থাকে না—নিষ্কাম ধর্ম্ম সেবায় প্রবৃত্তি দেয় না—এবং বিধি প্রতিপালন করাই যে পরম ধর্ম্ম তাহার জ্ঞান জন্মায় না—কর্ত্তব্যবোধের ভিত্তি ওরূপে সংকুচিত করিলে হিন্দুধর্ম্ম যে তাদৃশ জ্ঞানের অত্যুচ্চসোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে।

——(*)——

অষ্টাবিংশ প্রবন্ধ।

——০(০)০——

সন্তানের শিক্ষা।

কথায় বলে ছেলেকে মানুষ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, ঐ কাজটী কোন পিতা মাতার সাধ্যায়ত্ত নয়, এবং কেহ তজ্জন্য চেষ্টাও করে না। ইংরাজ আপনার ছেলেকে ইংরাজ করিবারই চেষ্টা করেন, এবং তাহাই করিতে পারেন। চীনীয় আপন সন্তানকে চীনীয় করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনাপন জাতির বিশেষ ধর্ম্ম এবং গুণের দ্বারাই স্বীয় বংশধরদিগকে বিভূষিত করিতে চাহেন—কেহই মনুষ্য সাধারণ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তানের পালন এবং শিক্ষাসম্পাদন করেন না। তবে যে সাধারণ মনুষ্য-ধর্ম্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে, জাত্যনুযায়িনী শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম্ম সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যশিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব সকল দেশেরই শিক্ষা-প্রণালী মনুষ্যসাধারণ ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ফলকথা, তাহাই হইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

তাহাই হইতে পারে এই জন্য যে, মনুষ্য মাত্রেরই মন পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের সংস্কার এবং আপনাদিগের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার সমস্তের সমবায়ে সংগঠিত হয়; সংস্কার, সজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে আইসে; প্রত্যক্ষী-ভূত ব্যাপারের সমধিক ভাবও সজাতীয় জনগণের কার্য্যকলাপ। এই জন্য জাতীয় ভাব পরিহার করা মানবের অসাধ্য। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যেমন উড্ডয়ন হয় না—জল ছাড়িয়া যেমন সন্তরণ সম্ভবে না—ত্বকুসীমার বহির্ভাগে যেমন স্পর্শজ্ঞান হইতে পারে না—তেমনি জাতীয়-ভাব পরিশূন্য হইয়া কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠানও মনুষ্যকর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে না।

তদ্ভিন্ন, সমাজের হিতাহিত লইয়াই সমাজান্তর্গত মনুজগণের হিতাহিত। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমাজের হিতাহিত এক নয়। বর্ব্বর, অর্দ্ধসভ্য, পূর্ণ সভ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের হিতাহিত অনেকাংশেই পরস্পর বিভিন্ন। বিজিত এবং বিজেতা, দুর্ব্বল এবং সবল, দৃঢ় এবং শিথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের হিতাহিতও এক নয়। অভ্যুদয়োন্মুখ এবং পতনপ্রবণ জাতির হিতাহিতও এক নয়। সুতরাং সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানও কাজেই ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক।

সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। আমরা বাঙ্গালী—আমাদিগের সমাজ যে ভাবাপন্ন তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? এইটী সুপরিস্ফুটরূপে অবধারিত করিয়া আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজনসাধনে সক্ষম হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষা দান। মনুষ্যত্ব সাধন মস্ত কথা। মনুষ্যত্ব যে কি এবং উহা যে কি নয়, বা কি হইতে পারে না, তাহা এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহই স্পষ্টরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারেন নাই। অতএব কিরূপ হইলে ছেলেটী প্রকৃত মনুষ্য হইবে, তাহা না ভাবিতে গিয়া কিরূপ হইলে ছেলেটী সমাজের অভাব মোচনে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। আমি তাদৃশ চিন্তাসম্ভূত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী দুর্ব্বলশরীর। অতএব ছেলের শরীর সবল করিবার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদিগের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়ামচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতা মাতার কার্য্য।

(২) বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যদিও স্বভাবতঃ কোন জাতীয় লোকের অপেক্ষা হীনতেজ নয়, তথাপি শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়গণ বহুস্থলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধিতে অক্ষম হইয়া থাকে। দর্শনাদি দ্বারা দূরতা, নৈকট্য, সংখ্যা, ভাব প্রভৃতির অববোধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায়ই ঠিক হয় না। অতএব বাল্যাবধি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতা মাতার কার্য্য।

(৩) বাঙ্গালীর স্মৃতি শক্তি অতীব প্রখরা। যাঁহারা বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঐ কথা স্বীকার করেন; কিন্তু বলেন, ইহাদের ধীশক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি তেমন অধিক নয়। নিন্দকদিগের সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতি একটী স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে। মনোবৃত্তি মাত্রেরই কারণ-শক্তির নাম স্মৃতি—অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। সুতরাং স্মৃতিকে প্রখরা বলিলে মনোবৃত্তি মাত্রেই তেজস্বিনী বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি তেজস্বিনী বলিয়াই শিক্ষার একটী দোষ জন্মে। ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট না হইলেও বাঙ্গালীর মন সেগুলি গ্রহণ করিয়া রাখে—একেবারে পরিত্যাগ করে না, তাহাতে কার্য্যকালে ক্ষতি হয়, এবং কৃতিসামর্থ্যও ন্যূন হইয়া পড়ে। এই জন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখাইবার সময় যাহাতে ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট হয়, তজ্জন্য কি শিক্ষক, কি পিতা মাতা, সকলেরই যত্ন করা বিধেয়।

(৪) অন্যান্য মনোবৃত্তি যেমন প্রবলা, বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা এবং কল্পনা শক্তিও তদনুরূপ। তদ্ভিন্ন, শরীরের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বাঙ্গালী ভীরুস্বভাব। এই দুই এবং অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীর ছেলের অনৃতবাদিতা দোষ জন্মিতে পারে। যাহাতে তাদৃশ দোষ না জন্মে, তজ্জন্য পিতা মাতার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়। সত্যই টেঁকে, মিথ্যা কখন টেঁকে না, এই তথ্যটি সর্ব্বদা সন্তানের মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক।

(৫) বাঙ্গালী প্রবলতর জাতীয়দিগের পদ মর্দ্দিত হইয়া ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যাইতেছে। অতএব আশার বৈফল্য বশতঃ সন্তানের ভবিষ্যতে যতই ক্লেশ হউক, পিতা মাতার কর্ত্তব্য তাহাকে উচ্চাশয়সম্পন্ন করেন। যেমন সান্নিপাতিক বিকারপ্রাপ্ত রোগীর পক্ষে ধাতু উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়, তেমনি বাঙ্গালীর মনে উচ্চ আশার উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। দুবেলা দুমুটা খেতে পেলেই হইল, এবম্বিধ বাক্য সন্তানের কর্ণগোচর হইতে দিতে নাই।

(৬) বঙ্গদেশের বায়ু সজল এবং উষ্ণ; বাঙ্গালীর শরীরও দুর্ব্বল;

পিতা মাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল, তাঁহাদিগের ও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়; একবার খুব হয়, আবার কিছুই থাকে না। এরূপ অনিয়মে দুর্ব্বল শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে এরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সয় বয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে।

(৭) এক্ষণকার বাঙ্গালী নিস্তেজ। নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে। ঈর্ষ্যা দোষটী সত্বর যাইবার নয়; তবে উহার বাণ ফিরাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ঈর্ষ্যা যাহাতে সজাতীয়ের প্রতি না জন্মে, অন্য জাতীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৮) বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি অযথারূপে প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষ সাধনের একটী প্রধানতম পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। অতএব বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি স্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরাজী পড়িবে, তখন ইংরাজী গ্রন্থে কোন উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে তাহার অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(৯) বাঙ্গালীর সহানুভূতি নিজ সমাজের মধ্যে তেমন অধিক হয় না। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর প্রশংসায় যথোচিত পরিতৃপ্ত অথবা বাঙ্গালীর তিরস্কারে তাদৃশ ক্লিষ্ট হইতেছে না। ইংরাজের প্রশংসা এবং ইংরাজের নিন্দাই বাঙ্গালীকে যেন বেশী লাগে। এটী সাংঘাতিক দোষ। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে বোধ হয়, ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় কিয়ৎপরিমাণে প্রবর্ত্তিত করা অর্থাৎ কিছু

(১০) দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি। আমাদিগের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবল প্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে; আমাদিগের মধ্যে গান তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইকর্গস্ হইতে হইবে; কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না।

বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটী গল্প বলি। এক খানি জাহাজে একজন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারি জন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। একদিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" অপর একজন বলিল, "তবে এ কথা কাপ্তেনকে বলনা কেন?" সে উত্তর করিল—"সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন—তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়ে পড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে?" কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামি বটে—কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতি কালেও ঐরূপ পাগলামি ছিল; রামায়ণ ও মহাভারতপাঠীদিগের তাহা অবিদিত নাই। যে দিনে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্ব্বার জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভ দিন।

বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। এই জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট

দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ হইতে চায় না। অন্য জাতীয়েরা বশ হয়, এবং তাহাই হইয়া আছে। বশ্যতা ভক্তিমূলক—ভক্তি শৈশবে শিক্ষণীয়, এবং পিতা মাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটীকে অঙ্কুরিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে পারেন। যে বাঙ্গালী পিতা মাতাকে ভয় ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, সে বাঙ্গালী নেতারও বশীভূত হইতে পারিবে। যে বাঙ্গালী ছেলেবেলায় পিতা মাতাকে মান্য করিতে শিখে নাই, সে দুই চারিখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া বা লোকের মুখে দুই একটী ইংরাজী মতবাদ শুনিয়া বাবাকে মূর্খজ্ঞান করিবে, এবং বাবার সজাতীয় বাঙ্গালী মাত্রকেই তাচ্ছিল্য করিয়া একটী প্রকাণ্ড বিচারু হইয়া উঠিবে।

—:*:*: —

ঊনত্রিংশ প্রবন্ধ।

গৃহ-শূন্যতা।

স্ত্রীবিয়োগ হইলেই 'গৃহ শূন্য' বলে। এ কথা কেন বলে? সত্য সত্যই ত স্ত্রীবিয়োগ হইলেই একবারে গৃহটী শূন্য হয় না। ছেলে মেয়ে, ভাই ভগিনী, বাপ মা, সকল থাকিতেও ত মানুষের স্ত্রীবিয়োগ হইতে পারে? তবে গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা সার পদার্থটী যায় বলিয়াই কি লোকে কলত্রবিয়োগ শোকটীকে বাড়াইয়া ঐ কথা বলে? আমার বোধ হয় তাহা নহে। স্ত্রীবিয়োগ হইলে বাস্তবিকই গৃহটী শূন্য হয়, অর্থাৎ গৃহটি শূন্য হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিয়াই চলা উচিত হয়। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বলিতে স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নাই। মা বল, আর ছেলে বল, ইহাঁদিগেরও তুমি ভিন্ন অন্য টান থাকে; কিন্তু স্ত্রীর তোমাকে লইয়াই সব।—তোমারও স্ত্রীকে লইয়াই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আমোদ, প্রমোদ, সমুদায়। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন যে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে আর সংসারাশ্রমে থাকিতে নাই—বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করা বিধেয়। স্ত্রী গেলে আর ঘরে থাকিও না—বনে যাও তপশ্চরণ কর।

কিন্তু এখন আর বনে যাওয়া পোষায় না। বনও পূর্ব্বের মত অধিক এবং ঘন ঘন নাই। শরীরের অভ্যাসও পূর্ব্বের মত নাই, এবং ধর্ম্মকার্য্যের প্রকৃতিও এখন পূর্ব্ব হইতে ঈষৎ ভিন্নরূপে উপলব্ধ হইতেছে। এ সকল পরিবর্ত্ত হইলেও আমার বিবেচনায় শাস্ত্রোক্ত উপদেশের মূল তাৎপর্য্যের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় নাই—শূন্য গৃহে থাকিতে নাই—ধর্ম্ম কার্য্যে অবশিষ্ট জীবিতকাল যাপন করা কর্ত্তব্য।

গৃহ-শূন্য ব্যক্তি সংসার লইয়া থাকুন, দেখিতে পাইবেন ক্রমে ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মহানি হইয়া আসিবে। তিনি যাহাকে বড়ই আপনার বলিয়া মনে করিতেন, দেখিবেন তাঁহার অধিকতর আপনার অপর কেহ আছে। তাঁহার ব্যথিত, বিচ্ছিন্ন, বিদগ্ধ হৃদয় হইতে তিনি যাহাদিগের উপর স্নেহ

বর্ষণ করিবেন, তাহারা কেহই পূর্ণমাত্রায় ঐ স্নেহের প্রতিদানে সমর্থ হইবে না। তিনি আপনার প্রীতিসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে উপহার দিবেন, তাহারা কেহই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিবে না। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দানে তাহাদিগের কাহারও অধিকার নাই।

এরূপ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ কি সরস থাকিবে? তাঁহার মন কি তিক্ত হইয়া উঠিবে না? অবশ্যই নীরস এবং তিক্ত হইবে। তিনি ক্রমে ক্রমে কঠিনহৃদয়, স্বার্থপর অথবা বিরক্তচিত্ত এবং ক্রোধন-স্বভাব হইয়া উঠিবেন। তবে গৃহশূন্য ব্যক্তির গৃহাশ্রমে থাকা কিরূপে ধর্ম্মোন্নতির অনুকূল হইবে? আর যাহা ধর্ম্মোন্নতির অনুকূল নহে, তাহা কিপ্রকারেই বা সুখের কারণ হইতে পারে? ফলতঃ গৃহশূন্য ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকা ধর্ম্মহানির এবং অসুখের কারণ। যিনি শূন্য গৃহে থাকেন, তাঁহার কার্য্যকলাপেরও অনেক বিপর্য্যয় ঘটে। কার্য্যমাত্রেই কিছু কটুতা এবং কিছু মধুরতার প্রয়োজন। ভয় এবং মৈত্র উভয় সম্মিলিত না হইলে কাহাকেও দিয়া ভাল করিয়া কোন কাজ করান যায় না; এবং কটুতা ও মধুরতা, ভয় ও মৈত্র, পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ পদার্থ যে, উহাদিগের একত্র সন্নিবেশ কিঞ্চিৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াই করিতে হয়। যত দিন দুইজন আছ একজন ভয়ের এবং একজন প্রীতির আধার স্বরূপ থাকিয়া অতি সুচারুরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পার। কিন্তু একজন গেলে অপর এক জনকেই বিভিন্ন দুইটী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। সেটী ধারণ করা কিছু সহজ ব্যাপার নয়—এবং সহজ নয় বলিয়াই কাজ করা কঠিন হইয়া উঠে।

তদ্ভিন্ন, কার্য্য সঙ্কোচের আরও একটি কারণ উপস্থিত হয়। মনে কর, তুমি বাটীর কর্ত্তা—তুমি সংসারটীর কেন্দ্রস্বরূপ—তোমাকে বেষ্টন করিয়াই সকলে যথাস্থানে অবস্থিত আছে। এমন সময়ে তুমি গৃহিণীকে হারাইলে। অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার কর্ত্তৃত্ব আর অক্ষুণ্ণ নাই। তুমি সংসারের কেন্দ্রীভূত থাকিতে পার না। সমস্ত পরিধিটী সঞ্চালিত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে—তুমি স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়াছ। তবুও কি কেন্দ্র হইয়া থাকিতে চাও? থাক দিন কতকের মধ্যেই দেখিতে পাইবে, তোমার কথার আর তেমন বল নাই। সকলেই কথা শুনিবে—যা

বলিবে তাই করিবে; কিন্তু পূর্ব্বে তোমার আজ্ঞা যেমন ঈশ্বরের আজ্ঞার ন্যায় সর্ব্বদোষপরিশূন্য মঙ্গলময় বলিয়া বোধ হইত, এখন আর তেমন হইবে না। ঐ আজ্ঞা দোষগুণে মিশ্রিত, বিচারসহ হইয়া পড়িয়াছে। "বাবার আর মনের ঠিক্ নাই; যা বলেন তা ত করিতে হইবেই, কিন্তু ওরূপে না বলিয়া যদি এইরূপে বলিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।" পরিজনের মনের ভাব এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখিলেও কি আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করিতে বা করাইতে ইচ্ছা থাকে? যদি কার্য্যের ইচ্ছাই সঙ্কুচিত হইল তবে আর একাগ্রচিত্ত হইয়া কিরূপে কার্য্যব্যাপৃত থাকিবে? যদি কার্য্যব্যাপৃত না থাকিলে তবে জীবনের সুখই বা কিসে রহিল?

গৃহশূন্য ব্যক্তির যে সামান্য ভোগসুখের ব্যাঘাত হয়, তাহা বলিবার অপেক্ষা করে না। তথাপি একটী উদাহরণ দিয়া স্পষ্টরূপে দেখাইতেছি। খাওয়ার প্রধান সুখ কি? অতি সুস্বাদ দ্রব্যেরও গলাধঃকরণ হইয়া গেলে আর স্বাদ বোধ থাকে না। আর উদরপূর্ত্তির সুখ দ্রব্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না; অপর একজন তোমার ভোজনতৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত হইতেছে, এই বোধ হইতে ভোজনের প্রধান সুখ জন্মে। স্ত্রী গেলে ঘর সে সুখ থাকে না। ছেলে, মেয়ে, ভগিনী প্রভৃতি পরিজনেরা খাওয়া দেখেন, খাওয়ার কাছে বসেন, কিন্তু খাওয়া দেখিয়া আপনারা সুখী হইবেন বলিয়া তাঁহারা খাওয়ার কাছে আইসেন না। তাঁহারা ভালমানুষী করিয়া তোমাকে খাওয়াইতে আইসেন। তাঁহারা যেমন ভালমানুষি করিয়া আইসেন তুমিও তাঁহাদিগের সমীপে সন্তোষপ্রকাশ কর। ইহাকে ভাল মানুষির কাটাকাটি হয়, দয়ার এবং কৃতজ্ঞতার আদান প্রদান চলে। তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, তুমিও তাঁহাদিগের উপর অধিক ভার দিতে অনিচ্ছুক হও। তুমি আর খাবার ফরমাইস্ কর না, অথবা যদি কর, অন্যের নাম করিয়াই কর। নিজের খাবার কথা বলা বড় লজ্জাকর। কলত্রবিহীন গৃহীরা বড়ই নিমন্ত্রণপটু। তাঁহারা সর্ব্বদাই নিমন্ত্রণ করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে ভাল বাসেন, এবং তাহা করিয়া বাটীর ঝি বৌকে বড়ই জ্বালাতন করেন। পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ করিয়া

খাওয়াইবার অন্য কারণও আছে। কিন্তু যে কারণের উল্লেখ করা গেল, তাহা যে একবারেই নাই, তাহাও নহে।

না বলিতে বলিতে আগে হইতে মন বুঝিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা সেই একজনের বই আর কাহার নাই। "তোমার মনে রহিল এই—কিছুই ফুটিয়া বলিবে না—আমি কেমন করিয়া বুঝিব"—এ কথা বলা সকলের পক্ষেই খাটে—কেবল স্ত্রীর পক্ষে খাটে না। স্ত্রীকে মন বুঝিতেই হইবে। মন না বুঝিতে পারিলে স্ত্রীর ত্রুটি ধরা যাইতে পারে; এবং স্ত্রীও স্বয়ং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হন। অপর কাহার পক্ষে মন না বুঝিতে পারা ত্রুটি নয়।

অনেকগুলি কৃতী সুসন্তানের পিতা কিঞ্চিৎ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "—মহাশয়! ছেলেদের কোন দোষ নাই। তাহারা নিতান্ত আজ্ঞাবহ। যদি বলি, তবে বাঘের দুধ আনিয়া যোগায়। কিন্তু আমি যে অনেক কথা বলি না, বলিতে পারি না, তাহারা এইটী বুঝে না।" ঠিক কথা। অনেক কথাই বলা যায় না, এবং বলিতে বলিতে বুঝিয়া লইতে পারে, এমন লোক একজন বই হয় না। এ অবস্থায় গৃহবাসে আমোদ কি?"

তবে কি করিব? ঘরে থাকিতে নাই—অথচ বনে গিয়া তপ জপ করিবার কাল গিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। অবস্থা-ভেদে এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে, যতদূর পার, সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাক। আর সংসারের অন্তর্ভূত একজন হইয়া থাকিও না। উপদেশ, পরামর্শ, সাহায্য দান মাত্র করিয়া নিবৃত্ত হও। কেহ অন্যায্য ব্যবহার করিলে বিরক্ত হইয়া তাহার দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হইও না। কাজটী ভাল হয় নাই, এবং কি জন্য ভাল নাই এই মাত্র বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হও। বীতরাগ এবং ফলকামনাবিহীন হইয়া যতদূর পার কর। ছেলের পীড়া হইয়াছে শুনিলে প্রতিবিধানার্থ যাহা আবশ্যক বোধ হয় বলিয়া পাঠাও। প্রয়োজন হয়, স্বয়ং তাহার নিকটে যাও, চিকিৎসা করাও, কিন্তু আরোগ্যলাভ হইলে আর ক্ষণমাত্র তাহার নিকটে থাকিও না। পূর্ব্বার যেমন দূরে ছিলে, তেমনি থাক। সংসারের সহিত এতাবন্মাত্র সম্পর্ক রাখ। তাহার

ভিতরে থাকিয়া আর কখনও সুখী হইতে পারিবে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিও না। এইরূপে থাকিতে পারিলে বনে না গিয়াও বানপ্রস্থাশ্রমের শুভফল ফলিতে পারে। পরিজনের প্রতি অভিমানী হইতে হইবে না, মন যথাসম্ভব সরস থাকিবে, এবং ক্রমে ক্রমে মনের উদারতা সম্বর্দ্ধিত হইবারও উপক্রম হইবে।

মনুষ্যের মন স্নেহবিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না। বেঁচে থাকিলেই ভাল বাসিতে হয়; অন্যের সহিত সম্বদ্ধ হইতে হয়। প্রতিকা সজীব থাকিলেই আকর্ষ বাহির করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া একবার পবিত্র প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহার মন নিতান্তই কোমল পদার্থ হইয়া আছে। সে মন প্রণয়পদার্থের সৃষ্টি না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

কিন্তু সেই সৃষ্টির ব্যাঘাতক দুইটী কারণ আছে। এক, যাহা কিছু তাঁহার প্রীতির পাত্র হইবার নিমিত্ত সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই অনিত্য, অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া উপলব্ধ হওয়াতে তৎপ্রতি আস্থার ত্রুটি জন্মে। আস্থার অভাবে প্রীতি জন্মিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, অভিমান। "আমি যতই কেন স্নেহ করি না, ও ব্যক্তি তাহার সম্যক্ প্রতিদান করিতে পারিবে না—তবে আমারই বা স্নেহ করিয়া কাজ কি? এই ভাবটীও প্রীতিসঞ্চারের ব্যাঘাতক।

যে স্থলে ঐরূপ অনাস্থা এবং অভিমান জন্মিতে না পারিবে, যথায় ক্ষণভঙ্গুরতা অথবা অকৃতজ্ঞতার সন্দেহ না উঠিবে, এমন স্থলে স্নেহ সঞ্চারিত হইবার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

গৃহশূন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে স্বদেশবাৎসল্যই বল, আর ঈশ্বরপরায়ণতাই বল, এইরূপ ভাব বিলক্ষণ প্রবল হইতে পারে। এখনকার কালে যাঁহার ঐরূপ হইল, তিনিই গৃহশূন্য হইয়া প্রকৃত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিংশ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ

—"And such was she"—'সে স্ত্রীও এমনি ছিল,' অর্থাৎ 'যে স্ত্রী গিয়াছে সে তোমারই মত বা ইহাঁরই মত ছিল"—এ কথা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয়, সাহেবেরা বলিতে পারেন। তাঁহাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, দেহ এবং মন যেমন হইবার তেমনি হইয়া থাকিয়া উঠিলে তাহারা স্বচ্ছন্দ করিয়া বিবাহ করেন, অতএব তাঁহারা যেমন একটী দেখিয়াছিলেন, আবার তেমন একটী দেখিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের আর 'সেও এমনি ছিল' একথা বলিবার যো নাই। 'তুমি বা হানি ঠিক তাহার মত'—আমি কাহাকে এ কথা বলিব? আর কেহ কি আমার নিজের হাতে গড়া, গায়ে মাখা, মনে ধরা জিনিস্? আমরা ছেলেবেলা দুজনে মিশেছিলাম, আমি তাঁহাকে আমার মনের মত করে তুলেছিলাম, নিজেও তাঁহার মনের মত হইয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং সে যাহা ছিল, তাহার নিজেরই মত, আর আমার মনের মত। অপর কেহ আর তেমন থাকিতে পারে না। আর কেহ তাহার চেয়ে ভাল থাকে, থাকুক, কিন্তু তেমন থাকিবে কেমন করে?

শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়টী বুঝিতেন। এই জন্য যে স্থলে তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রণয়, অথচ, একাধিক দারপরিগ্রহ বর্ণন করিতে হইয়াছে, সেই স্থলে একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা নায়ক নায়িকার মনে এই ভাবের কল্পনা করিয়া দিয়াছেন যে, "সেই মরে এই হইয়াছে।" দক্ষকন্যা সতীই হিমালয় কন্যা উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহাদেব এরূপ বুঝিয়াই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। ব্রজেশ্বরী রাধিকা রুক্মিণী দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহাই জানিয়াছিলেন। রতি দেবীও প্রদ্যুম্নকে পুনরুজ্জীবিত মদন বলিয়া জানিতেন। ত কোন বন্ধু একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রথমা

দ্বিতীয়া হইয়া জন্মিয়াছে, ভাবিতে পারিলে আমার সুখ হইত।" যথার্থ কথা। তেমন ভালবাসা দুইবার হয় না—দুই জনের উপরেও তেমন হয় না। যে ভালবেসেছে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বেদবাক্যটী বুঝিয়াছে এই জন্য অদ্বৈতবাদী পবিত্রমনা ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ অসম্ভবপর।

যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার, তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই ত আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবে দুইবার বিবাহ করিলে মহা সঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুইয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত জন্মিবে, পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে কোমতের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই একাধিকবার বিবাহ করিবে না। আমাদিগের শাস্ত্রেও বলে, প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না।

একটী প্রকৃত বিবরণ বলি। আমার যে বন্ধুর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একজন বিজ্ঞ এবং বিশুদ্ধমনা পুরুষ। তিনি এই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পত্নীর যে দিন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হয়, সেই রাত্রি তিনি একাকী শয়ন করিয়া পূর্ব্ব পত্নীর ধ্যান করেন। দ্বিতীয়ার শয়নাগারে গমন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্পূজিতা সর্ব্বতোভাবে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা এবং যথোচিতরূপ সমাদৃতা হইয়াও, বৎসরের মধ্যে যে ঐ এক রাত্রি তাদৃশ ব্যবহার হয়, তজ্জন্য নিতান্ত অভিমানিনী হইয়া থাকেন। এত অভিমানিনী হন যে, ঐ সময়ে অধীরা হইয়া স্পষ্টই বলেন, 'যদি তাঁহাকে ভুলিতেই পারিবে না, তবে আমাকে বিবাহ করিলে কেন? ঐ অভিমানিনীর অভিমান কি অন্যায্য? আমার মতে অন্যায্য নয়। বিনা সম্যক্ অধিকারে প্রণয় প্রবৃত্তির পরিতোষ নাই।

কিন্তু যাঁহারা এক স্ত্রীর বিয়োগ হইলে আর বিবাহ না করেন, তাঁহাদেরই যে কি সুখ হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। আমার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন পিতৃঠাকুরের ভোজনপাত্রে দুই ভাগ অন্ন ব্যঞ্জন দিতে হইত। তিনি ভোজন করিতে বসিতেন। কিন্তু নিজ ভাগও সমগ্র গ্রহণ করিতে পারিতেন না। চক্ষু ছল ছল করিত—শোকাবেগে উদর পূর্ণ হইয়া উঠিত। মাতৃদেবীর লোকান্তর গমনের পর পিতৃঠাকুর পঞ্চবিংশতি বর্ষ জীবিত ছিলেন। বরাবরই ঐরূপ দেখিয়াছি। তবে কালেও ত শোকের হ্রাস হয় না? পিতৃঠাকুর যে দিন দেহত্যাগ করেন, সেই দিন বলিয়াছিলেন, "আমাকে গঙ্গাযাত্রা করাও—সে, এতদিনের পর আমাকে লইতে আসিতেছে—আমি তাহাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি।" পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পিতৃঠাকুরের সম্পূর্ণ বিশ্বাসই ছিল। তথাপি তাঁহার উল্লিখিত বাক্যের মধ্যে 'এত দিনের পর' 'আবার দেখিতে পাইয়াছি' এই গুলি থাকাতে কি বুঝায়?—তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত বিয়োগযন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীত হয়। অতএব দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে অসুখ, এবং অপবিত্রতা;—অপরিগ্রহে অসুখ মাত্র; সুখ কোন পক্ষেই নাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির।

তবে সুখ কিসে হইতে পারে, তাহা কোন সময়ে যেরূপ মনে উঠিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। শিকার করিবার বাই হইয়াছিল। ছিটে গুলি পোরা বন্দুক হাতে করিয়া পাখী মারিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটা পুষ্করিণীর ধারে একটী গাছের একটী ডালে দুইটী পাখী কাছাকাছি বসিয়া আছে। বন্দুক তুলিয়া খাড়া করিতেছি, এমন সময়ে ঐ দুইটী পাখীর একটী উড়িয়া গেল, অপরটী কিছুক্ষণ ছিল। কিন্তু বন্দুক ছুড়িতে পারিলাম না। একই ফাইয়রে যদি দুইটীই মারিতে পারিতাম, তাহা হইলেই মারিতাম। মনে মনে যমরাজকে বলিলাম আমাদের দুইজনকেও যেন একবারে মারেন। যদি যম সেই প্রার্থনা শুনিতেন তাহা হইলেই সুখ হইত।

—:*:*:—

একত্রিংশ প্রবন্ধ।

—০(০)০—

বহু বিবাহ।

ইহার পূর্ব্বগত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে এই প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবে। যখন এক স্ত্রী গতাসু হইলেও অপর দারপরিগ্রহ অবৈধ, তখন এক পত্নী বিদ্যমান থাকিতে অপর স্ত্রীর পাণিগ্রহণের কথা উল্লেখ করিতেই পারা যায় না। বাস্তবিক তাহাই বটে। তথাপি ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে দোষ কি?

এক পুরুষকে কি একাধিক স্ত্রী ভাল বাসিতে পারে না?—পারে। এক পুরুষ কি একাধিক স্ত্রীকে ভাল বাসিতে পারে না?—তাহাও পারে, কিন্তু এই যে ভালবাসা এ তেমন ভালবাসা নয়।

বাস্তবিক, ভালবাসার ক্রম আছে—বিলক্ষণ ইতর বিশেষ আছে। ভালবাসা এমন আছে, যাহার জন্য সব ছাড়া যায়—যাহাকে ভালবাসি তাহার ভালর জন্য তাহাকেও ছাড়িতে পারি, এই ভাল বাসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট! ঐ পবিত্র প্রণয়াগ্নিতে স্বার্থপরতার পূর্ণাহুতি হইয়া যায়—আত্মবিলোপ জন্মে। তাহার সুখেই আমার সুখ নয়—তাহার সুখই সুখ। যুধিষ্ঠির স্বর্গে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে এই ভালবাসার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার যাবতীয় পুণ্যরাশি একটি ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সেণ্টপলও এই ভালবাসার প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, আমার পিতা মাতা প্রভৃতির উদ্ধারের নিমিত্ত আমি স্বয়ং নিরয়গামী হই।" আর এক প্রকার ভালবাসা আছে, যাহার জন্য আর সব ছাড়িতে পারি কেবল তাহাকে ছাড়িতে পারি না। এ ভালবাসা পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। তথাপি বড় সামান্য পদার্থ নয়। ইহা সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব। সন্ন্যাসী হওয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া যাওয়া, গঞ্জনা লাঞ্ছনা অপমানকে তৃণজ্ঞান করা, এই সকল ব্যাপার এইরূপ ভালবাসা হইতে ঘটে। আর

একরূপ ভালবাসা আছে, যাহাতে কিছুই বিসর্জ্জন দিবার ইচ্ছা, আপনা হইতে মনে উঠে না, কিন্তু কোনরূপে কেহ মনে উঠাইয়া দিলে কিছুতেই অসম্মত হই না। অন্যের জন্য টাকা খরচ করা, পরিশ্রম স্বীকার করা, এইরূপ ভালবাসার সাধারণ স্থল। অপর একরূপ ভালবাসা আছে, তাহাতে যাহাকে ভালবাসি তাহাকে না পাইলে ক্ষোভ মিটে না, ফাঁক ঘুচে না, নিজের সুখ পূর্ণ হয় না। এইটী সর্ব্বনিকৃষ্ট—ইহা প্রবৃত্তির উত্তেজক মাত্র। কিন্তু ইহাও ভালবাসা, সুতরাং ভাল জিনিস। তবে ইহাতে স্বার্থের প্রথম সংস্কার মাত্র হয়—স্বার্থকে পরার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে—স্বার্থকে বিস্তৃত করে। স্থূল স্থূল এই চারি প্রকার প্রণয়ের মধ্যে যে নর নারী প্রথম দুই প্রকারের ভুক্তভোগী, তাঁহাদিগের পক্ষে দ্বিতীয় পরিণয়, কি বহুবিবাহ, কোনটীই সঙ্গত নয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার প্রণয়ের স্থলে দ্বিতীয় পরিণয় ত চলেই—বহুবিবাহও অসাধ্য হয় না।

ফলতঃ ধর্ম্মচর্চ্চায় যেরূপ, প্রণয়চর্চ্চাতেও সেইরূপ—অধিকারিভেদে ব্যবস্থা ভেদ। সকল মানব মানবী অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা না পারে, তাহাদিগের পক্ষে প্রণয়ের উচ্চোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করা অসাধ্যপ্রায় হয়। এই জন্য একাধিক পরিণয় ধর্ম্মব্যাঘাতক। যাঁহার একাধিক বিবাহ হয়, তাঁহাকে প্রায় চিরজীবনই প্রণয়োন্নতির নিম্নবর্ত্তী সোপানে অবস্থিতি করিতে হয়। তাঁহার স্বার্থপরতার সম্যক্ সংশোধন হয় না। তিনি যাবজ্জীবন পশ্বাচারী থাকেন, কখন বীর এবং দিব্যভাবের অধিকারী হয়েন না।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি না। আর একটী বিষয় বিচার্য্য আছে। জগতের একটী অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড এই যে, ইহার ব্যাপার সকলই পরস্পর সংশ্লিষ্ট—এক হইতে অপরে পরিণত—কিছুই সম্যক্ স্বতন্ত্র নহে। যাহা অতি উচ্চ, তাহাও, নীচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভূত নয়। দেখ, মনুষ্যে অবুঢ় জড় পদার্থের ধর্ম্ম, উদ্ভিদের ধর্ম্ম, পশুর ধর্ম্ম, এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম, এই চারিটী ধর্ম্মই একত্র মিলিত। পশুতে, জড় ধর্ম্ম, উদ্ভিদ্ ধর্ম্ম, এবং পশুধর্ম্মের সমাবেশ—কেবল মনুষ্যত্ব নাই। উদ্ভিদে, জড়ধর্ম্ম এবং উদ্ভিদ ধর্ম্ম, দুইটীই থাকে—উপরের দুইটীরই অভাব।

জড়ে জড়ত্বমাত্র বিদ্যমান থাকে। ফলতঃ জগতের সর্ব্ব বিষয়েই এইরূপ। উৎকৃষ্টের অভ্যন্তরে নিকৃষ্টের অবস্থান। আমাদিগের মনোভাবও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। প্রণয়ের যে চারিটী প্রকারভেদ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তন্মধ্যেও এই নিয়ম বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বোচ্চ প্রণয় ভাবের অভ্যন্তরে অপর তিনটী ভাবই আছে। তৃতীয়ের অভ্যন্তরে নিম্নের দুইটী। দ্বিতীয়ের অভ্যন্তরে তাহার নীচেরটী, এইরূপ।

উল্লিখিত তথ্যের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে প্রণয় পদার্থের যথার্থ প্রকৃতির অবরোধ হয় না, প্রণয় পরীক্ষায় নানাপ্রকার ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, এবং প্রণয়িদিগের পরস্পর ব্যবহারেও দোষ এবং মনে মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে।

আমার বোধ হয় যে, একত্বের মধ্যে অনেকত্বের সমাবেশ করিবার প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্য্যের একটী প্রধান উপাদান অনেকত্ব। একই সূর্য্য প্রতিদিন উঠিতেছেন, প্রতিদিন অস্ত গমন করিতেছেন। কিন্তু দুই দিনের শোভা ঠিক সমান নয়। মানস আকাশের সূর্য্যকেও তাহাই করিতে হয়—এক, অথচ এক নয় হইতে হয়। গায়ত্রী দেবী তিন সন্ধ্যায় তিন রূপ ধারণ করেন—একরূপে ধ্যানগম্যা হয়েন না। চির দিন একই রকম, সকল বিষয়েই সমান ভাব, সকল কথাতেই এক ঘেয়ে উত্তর কখন ভাল লাগে না। নিতান্ত 'মাটির মানুষদিগের' স্বামী বশ হয় না—নিতান্ত ধমাট বাঁধা পুরুষেরাও কামিনীদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন না।

যে পুরুষ এক আপনাতে এবং আপনার এক পত্নীতে অনেকত্বের সমাবেশ করিতে না পারেন, তিনি পবিত্র প্রণয়বীজের যথাযোগ্য পোষণে অশক্ত। তাঁহার বৃক্ষের মূলেই কীট লাগিয়া থাকে—গাছটী কখন সথোচিতরূপে বাড়িতে পায় না—এবং পরিণামে হয়ত বিতৃষ্ণারূপ ফলোৎপাদন করে।

—:*:*:—

দ্বাত্রিংশ প্রবন্ধ।

বৈধব্য-ব্রত।

যখন পুরুষদিগের পক্ষেই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ধর্ম্মব্যাবহিত, তখন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দ্বিতীয় পরিণয় অবিধেয়, সে কথা বলিবার অপেক্ষা করে না। যে যে কারণে পুরুষদিগের দ্বিতীয় বার বিবাহ অনুচিত, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সে সকল কথাই খাটে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয় পরিণয়ে কতকগুলি বিশেষ দোষ আছে। কিন্তু আমি ও সকল বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমি বলিয়াছি যে, পুরুষেরও দ্বিতীয় বার বিবাহ করা অনুচিত।—আমি বলিয়াছি যে, গৃহশূন্য ব্যক্তি স্বদেশবৎসলরূপেই হউক, আর ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াই হউক, তপশ্চরণ করিবেন। এখন দেশের এবং সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বিধবা কি করিবে, আর পরিবারের অপর সকল লোকেই বা বিধবার প্রতি কি ভাবে চলিবে আমি সেই কথাই কিছু বলিব।

বৈধব্য একটী মহৎ ব্রত। ব্রতটী পরার্থে আত্মোৎসর্গ; আত্মোৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়—কেহ জেনেশুনে করেন, কেহ না বুঝিয়া করেন, কেহ অল্পমাত্রায় করেন, কেহ অধিক মাত্রায় করেন—কিন্তু সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। তবে অন্যের পক্ষে এই ব্রতের শিক্ষা এবং ইহার পালন ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য ইহার ক্লেশানুভব অল্প হয়—স্থলবিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে চাপিয়া পড়ে, এই জন্য সে বিকল হইয়া যায়। এত বিকল হয় যে, সে যে একটী মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল তাহা বুঝিতেই পারে না—সে বুঝে "আমি জন্মের মত গেলুম"। বাস্তবিক সে নিজের পক্ষে জন্মের মতই যায়। সে একেবারেই উদাসীনী, সর্ব্বত্যাগিনী, ব্রহ্মচারিণী হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী উদাসীন ব্যক্তিদিগের প্রতি মনুষ্যসাধারণের মনের ভাব কি হয়? সকল মনুষ্যই সংসারবিরাগীদিগের প্রতি ভক্তিক্রম ভক্তি

এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিধবাও তদ্রূপ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্রী। তবে একটী কথা আছে। যাঁহারা জ্ঞানপথাবলম্বী হইয়া সংসারের প্রতি একান্ত তিতিক্ষা বশতঃ সংসারত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের মানসিক বল এবং দৃঢ়তার প্রতি যতটা ভক্তি হয়, যাঁহারা সাংসারিক দুঃখে পরিতপ্ত ও দৈব দুর্ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন, তাঁহাদের প্রতি ততটা প্রগাঢ় এবং বিশুদ্ধ ভক্তি হয় না—তাঁহাদের প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহার সহিত অনেকটা দয়াও মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি জানি, ৺কাশীধামে একটী অতি পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ আছেন, যিনি প্রথমে শুদ্ধ দৈব বিড়ম্বনা বশতঃই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশাতেই পুত্রকলত্র গতাসু হইয়াছিল। তিনি সেই দুঃখেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে যোগ্যভ্যাস এবং অন্যান্য তপশ্চরণদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রতি অগাধ প্রীতিসম্পন্ন, অতি সদালাপী, মধুরভাষী এবং পরোপকার-পরায়ণ হইয়া সকলের প্রীতি, ভক্তি এবং বিশ্বাসভাজন আছেন। ঐ মহাপুরুষই বিধবাদিগের আদর্শস্থলীয়। তাঁহার ন্যায় দৈববিড়ম্বনা নিবন্ধন সন্ন্যাসাশ্রমগ্রস্ত বিধবারও কর্ত্তব্য, আত্মদান এবং পরোপকার ব্রত পালন-দ্বারা আপনাকে তেমনি শুচি, শান্ত এবং সুখী করিয়া তুলেন।

যে পরিবারে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, সে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই যেন বিধবার প্রকৃত অবস্থা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত না হয়েন। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষ সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, বিধবা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছে। দৈববিড়ম্বনা কর্ত্তৃক সেই কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়াছে, অতএব সে একান্ত দয়ার পাত্রী। অমন উচ্চ ব্রত ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহাকে বিশেষরূপেই ভক্তি করিতে হইবে। বিধবার প্রতি এই মিশ্রভাব অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, তাহার তপস্যার বিঘ্ন অল্পই হইবে, তাহার অশন বসন জন্য অনেকটা ক্লেশ ন্যূন হইবে এবং তাহার হৃদয়ে আত্মগৌরবের প্রাবল্য যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে অমনি শম দমাদি ব্যাপার সুকর হইয়া উঠিবে।

পরিবারস্থিত বিধবার পালনে প্রত্যেক [illegible]

হইলে চলিবে না। বিধবারা যে ব্রতের ব্রতী হইয়া পড়ে তাহাতে বয়স এবং অবস্থাভেদে তাহাদিগের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, এবং তাহাদিগের সুপালনার্থ বিভিন্নরূপ ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়। এক প্রাচীন বা প্রৌঢ়া সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দিবে—তীর্থাদি দর্শনের অভিলাষ সম্পন্ন করিতে দিবে—ইহাঁদিগের সহিত বিনা পরামর্শে সাংসারিক বন্দোবস্ত করিবে না—এবং ইহাঁদিগকে যাহা কিছু বলিতে হইবে তাহা বাটীর কর্ত্তা নিজেই বলিবেন—ঝি বৌয়ের মুখ দিয়া কদাপি বলিবেন না। বিধবা মাতাকে স্ত্রীর মুখ দিয়া কিছু বলিতে গিয়া অনেক যুবা মাতৃস্নেহ হারাইয়াছেন। এই সকল বিধবার সন্তানেরা যাহাতে বাটীর সমবয়স্ক এবং সমবয়স্কা অপরাপর পুত্র কন্যার সহিত দৃঢ়রূপে সৌহার্দ্দিবন্ধনে সম্বদ্ধ হয়, প্রথম হইতেই তাহার উপায় করিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয়, যুবতী সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে নিজ সন্তানের যত্নে যত ইচ্ছা সময় ক্ষেপণ করিতে দিবে, কিন্তু ঐ সন্তানের সমবয়স্ক অথবা তাহার হইতে কিছু অল্পবয়স্ক বাটীর অন্য ছেলেও যাহাতে ঐ যত্নের ফলভাগী হয়, বিশেষ চেষ্টাপূর্ব্বক তাহারও উপায় বিধান করিবে। বিধবার হৃদয় যেন স্নেহ বিস্তার করিবার পথ পায়, যেন কোন মতেই ঐ স্নেহরাশি অল্পমাত্র স্থানে বদ্ধ থাকিয়া দূষিত না হয়, এবং বিধবার হৃদয়ে আত্মপর বোধটী উত্তেজিত করিয়া ঈর্ষ্যা দ্বেষাদির প্রভাবে তাহার প্রকৃত ব্রতভঙ্গ না করে। বিধবা যাহাতে বাটীর সকল ছেলেকেই ভালবাসে, তাহা করিতে না পারিলে, তাহার প্রতি উচিত ব্যবহারের ত্রুটি হইতেছে বুঝিতে হইবে। তৃতীয়, নিঃসন্তানা বালবিধবা—ইহাঁদিগের প্রতিপালন, শুদ্ধ ভাত কাপড়ের প্রতিপালন নয়, ইহাঁদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন, অতি কঠিনতম ব্যাপার। এই জন্য বিশেষ কঠিন যে, ইহাঁদিগের বাল্যের সাহজিক স্বার্থপরতার অতি প্রধান সংস্কার দুইটী বাকী রহিয়া গিয়াছে—উহা পতি প্রেমাগ্নিতে দ্রবীভূত হইয়া কখন পুত্রান্তরে বিস্তৃত হয় নাই—সন্তান বাৎসল্যরসে পরিষিক্ত হইয়া কাহাকেও নাড়ীছেঁড়া ধনরূপে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাঁদিগের মন উদার না হইয়া ক্ষুদ্র, প্রীতিপূর্ণ না হইয়া শুষ্ক এবং

সদয় না হইয়া ঈর্ষ্যাপ্রবণ হইয়া পড়িবার বড়ই সম্ভাবনা। তবে একটী ভরসা আছে। এতদ্দেশের সদ্বংশজাতা বালিকাগণের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রগাঢ় ভক্তিবীজ উপ্ত হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ ভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, শাস্ত্র শাসনে ভক্তি, ইহাদিগের যেন সহজাত ধর্ম্ম। তাহারই উপর অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়, এবং বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতে পারিলে, ঐ ভক্তিবীজ হইতেই অতি বিপুল প্রীতির উদ্গম হইয়া ইহাদিগের জীবনক্ষেত্রকে সরস, শীতল এবং আত্মপর উভয়ের সুখপ্রদ করিয়া তুলিতে পারে। যেরূপে সতর্ক হইয়া চলিলে, বালবিধবার সুপালন হয়, তাহার কয়েকটী নিয়ম বলিতেছি।

(১) বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে, কর্ত্তা স্বয়ং ইহাদিগের আহারের নিয়ম করিয়া দিবেন। এত দুগ্ধ, এই ফল, এইরূপ অন্ন ব্যঞ্জন, বিধবার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যেমন দেবতার নামে যে দ্রব্যাদি সমাহৃত হয়, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও খাওয়াইতে নাই, তেমনি বিধবার নিমিত্ত যাহা বাটীর কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও প্রদান করিতে নাই।

(২) বিধবার শয়ন দুই একটী শিশু সন্তানের সমভিব্যাহারে করাইবে। বিধবাকে ছেলেদের আবদার সহাইবে।

(৩) বিধবাকে সাংসারিক কার্য্যে বিশিষ্টরূপে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। শুদ্ধ অনুজ্ঞা দ্বারা নয়, বিধবাকে সধবা স্ত্রীলোকদিগের গৃহকার্য্যের সহকারিণী করিয়া দিবে।

(৪) যদি পার, বিধবাকে সংস্কৃত শিখাইবে—অন্ততঃ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনাইবে; এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করাইবে।

(৫) বিধবাকে ব্রতাদি করিতে দিবে—নিজে তাহা করিতে বলিবে না, কিন্তু করিতে চাহিলেই করিতে দিবে এবং ব্রতাদির উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করিবে না। শরীরের খাটুনি তাহার, টাকা তোমার। বাটীর সধবা স্ত্রীলোকেরা যেন ঐ সকল ব্রত অথবা তদনুরূপ ব্রত করিতে না পারেন, এবং তাঁহাদের ব্রতাদি উদ্‌যাপনে যেন স্বল্পতর ব্যয় এবং অনধিক আড়ম্বর হয়।

(৬) বিধবাকে কোন অনুজ্ঞা করিতে হইলে কর্ত্তা তাহা স্বয়ং করিবেন—স্ত্রী, কন্যা, কিম্বা পুত্রবধূ প্রভৃতি অপর কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা করিবেন না। কিন্তু অনুজ্ঞা যেন সত্য সত্যই কর্ত্তার নিজের হয়, অর্থাৎ নিজেই দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন অনুজ্ঞা করেন—গৃহিণী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং স্বয়ং তাঁহারই মুখস্বরূপ না হয়েন। নিতান্ত স্ত্রৈণ কর্ত্তার দ্বারা বিধবার সুপালন প্রায়ই ভালরূপ হইয়া উঠে না।

উল্লিখিত নিয়মগুলি বুঝি পূর্ব্বক পালিত হইলে বালবিধবার যে কিরূপ ধর্ম্মোন্নতি সংসাধিত হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন। বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি, অভ্যাগত, কুটুম্ব, স্বজনদিগকে খাওয়াইতে ভাল বাসে, স্বয়ং সবল এবং সুষ্ঠুশরীরী হয়, এবং ঈর্ষ্যাদি দোষ পরিশূন্য হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাটীতে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে বাটীতে একটী জীবন্ত দেবী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যে পরিবার মধ্যে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রীপুরুষেরা নিরন্তর ঋষি চরিত্রের দ্রষ্টা এবং ফলভোক্তা। তাহারা "পরার্থজীবন" ব্যাপারটী কি, তাহা শুদ্ধ মুখে বলে না, এবং পুস্তকে পড়ে না—ইহার জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।

যখন মদ্যসেবী মাংসাহারী ইউরোপীয়দিগের কন্যাগণও ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে চির কৌমার ব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিতেছে, তখন অত্যুদার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্য পবিত্র আর্য্যবংশোদ্ভবা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য পালন না হইবার কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ প্রবন্ধ।

—০(০)০—

চির-কৌমার।

মানুষ গৃহাশ্রমী হইবে, দার পরিগ্রহ করিবে, পরিবার পরিবৃত হইয়া থাকিবে—ইহাই সাধারণ নিত্যধর্ম্ম এবং সেই নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই পারিবারিক প্রবন্ধগুলি বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহাশ্রমী হইয়াও অর্থাৎ সংসার মধ্যে থাকিয়াও বিনা দার পরিগ্রহে থাকা একান্ত অসাধ্য অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে। বিবাহ করা এবং পরিবার প্রতিপালন করা দিন দিন অধিকতর অর্থসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। গৃহী হইতে গেলেই বিবাহ করিতে হয়, এই যে প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহা কালগতিকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। অকুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা অনেকেই বিবাহ করিবার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারেন না—এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবার যে ধর্ম্মপ্রথা ছিল, সেই প্রথারও সমাদর ন্যূন হইয়া আসিতেছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের মধ্যে বড় লোক এবং ছোট লোক অনেকেই বিবাহ করেন না, বা করিতে পারেন না, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া নবোরা অনেকে বিবাহ করা না করা নিজ ইচ্ছাধীন ব্যাপার, অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার কার্য্য নহে—এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব পারিবারিক প্রবন্ধের শেষ ভাগে চির-কৌমার বিষয়ক বিচার নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

আমার বিবেচনায় চির-কৌমার ব্রত ধারণ করিবার যোগ্য নরনারী পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পারিবারিক ধর্ম্মের সুপালন দ্বারা যে সকল পূর্ব্ব পুরুষের শরীর ও মন সুসংযত হইয়াছে, তাদৃশ পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণ যে সকল সন্তানে সম্যক্ অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহারাই চির কৌমার ব্রত ধারণে অধিকারী হইতে পারেন। এই প্রকার লোকের কাম প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, এবং অন্তঃকরণ পরার্থ চিন্তাপূত হইয়া থাকে। কালে যে এ প্রকার মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না, আমি এরূপ মনে করি না—প্রত্যুত আমি দেখিয়া আসিতেছি, যে, ঐ দুইটী লক্ষ-

পের মধ্যে যেখানে একটী থাকে, অপরটীও প্রায়ই সেইখানে থাকে। কাম প্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা এবং পরার্থ পূত-চিত্ততা অনেক স্থলেই একাধারে বিদ্যমান হয়।

তদ্ভিন্ন, আমার দৃঢ় প্রতীতি এইরূপ যে, জীব সংখ্যার এবং আহার-সামগ্রীর বৃদ্ধির নিয়ম এক্ষণে যেরূপ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে চলিতেছে, কালে মনুষ্যেরা আপনাদিগের মধ্যে ঐ নিয়ম সেরূপ নিরপেক্ষ ভাবে চলিতে দিবে না; পরস্পর সাপেক্ষ করিয়া লইবে। এক্ষণে মানব সংখ্যার বৃদ্ধি যে ক্রমানুসারে হয়, আহার সামগ্রীর বৃদ্ধি সে ক্রমানুসারে হয় না, তাহাতেই অনেক স্থলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি দুর্ঘটনা সমস্ত ঘটিয়া থাকে। সমাজে এই প্রাকৃতিক তথ্য যত অধিক পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইবে, সেই তথ্য জ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া বৈবাহিক ব্যবস্থার যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এবং ঐ সকল ব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে প্রতিপালিত হইবে, ততই এমন সকল সন্তান জন্মিবে, যাহাদের কামপ্রবৃত্তি সহজেই দুর্ব্বলা এবং পরার্থপ্রবণতা বলবতী। যখন আমার প্রতীতি এবং অভিলাষ এইরূপ, তখন যে আমি চির-কৌমার অবস্থার পক্ষপাতী বই কদাপি তাহার বিরোধী হইতে পারি না, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে আমি এই বলি, যে সে ব্যক্তি এই ব্রত পালনের অধিকারী নহে। সাধারণ ইংরাজদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বিবাহ করে না, তাহার একমাত্র কারণ তাহারা সাংসারিক ধর্ম্ম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চায় না অথবা তাহার স্ত্রী পুত্র পালনের ভারে আক্রান্ত হইতে নারাজ। তাহারা একমাত্র স্বার্থপরবশ হইয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। আমি তাদৃশ চির-কৌমারের একান্ত বিদ্বেষ্টা।

যদি কাহার চির-কৌমার ব্রত ধারণের প্রকৃত অভিলাষ হয়, তবে কয়েকটী বিষয় বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক তাঁহার বুঝিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, তিনি আপনার দেহকে সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবেন কি না? দেহ অবিশুদ্ধ হইয়া গেলেও যে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ থাকিতে পারে এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া অবিধেয়। দেহ এবং মনকে বিভিন্ন পদার্থ না ভাবিয়া বাহ্য ও আন্তর এই বিভিন্ন প্রত্যক্ষের

বিষয়ীভূত বলিয়া উহারা একই পদার্থের বিবিধ আভাস মাত্র, ইহাই মনে করা ভাল। পশুধর্ম্মের আচরণে যে দিব্যাচারের ব্যভিচার হয় না—অথবা সংগোপনে বিগর্হিত ব্যবহারের অনুষ্ঠানে যে আত্মগ্লানি জন্মে না এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনই প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে। অতএব এই সকল কথার তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া কেহ চির-কৌমার ব্রতের অধিকারী বটেন কি না তাহা তাঁহাকে স্বয়ংই অবধারণ করিয়া লইতে হয়। যদি এই সকল কথার বিচারপূর্ব্বক কেহ কৌমারব্রত ধারণ করেন, এবং পরে বুঝিতে পারেন যে, তিনি ব্রত পালনে অশক্ত, তাহা হইলে তাঁহার ব্রত ত্যাগ করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য; তাহাতে সঙ্কল্পভঙ্গজন্য দোষ হইবে বটে, কিন্তু সে দোষ কপটাচার অপেক্ষা অল্প দোষ; তাহাতে অসারল্য এবং কপটতার বৃদ্ধি এবং সমুদায় বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির বিকৃতি হয় না; সঙ্কল্পভঙ্গহেতুক চরিত্রের দুর্ব্বলতা মাত্র জন্মে।

চির-কৌমার ব্রতাভিলাষীর আর একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক—তিনি সম্যক্‌রূপে ব্যাজশূন্য প্রীতি দান, অর্থাৎ প্রতিদান না পাইয়াও প্রীতি দান করিতে পারেন কি না। আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করি, অতএব মঙ্গলময় ঈশ্বর অবশ্যই আমার মঙ্গল করিবেন, এরূপ ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে চির কৌমার ব্রত পালন অসাধ্য ব্যাপার। ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহই করুন, আর নিগ্রহই করুন, আমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মে আমি তাঁহাতে অনুরক্ত থাকিব—তাঁহার নিগ্রহেও আমার অনুরাগ বাড়িবে—যাঁহার মনে এরূপ আত্মগৌরব আত্মপ্রতীতি এবং অসীম প্রেম বিদ্যমান আছে, অথবা বিদ্যমান হইবার উপক্রম হইয়া আছে——তিনিই চির কৌমার ব্রত ধারণের প্রকৃত অধিকারী। তিনি স্ববন্ধু, স্বকুল, স্বজাতি, স্বদেশ সমুদয় মনুষ্য বা সমস্ত জীবহিতার্থে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারেন। ভীষ্মদেব, শুকদেব প্রভৃতি তেজস্বী বিশুদ্ধাত্মারা ঐরূপ লোক ছিলেন। তেমন তেজস্বিতার এবং পবিত্রতার আধার হইতে পারিব বলিয়া যিনি আপনাকে মনে করিতে পারেন, তিনিই চির-কৌমার ব্রত ধারণের যোগ্য পাত্র।

ব্রতের অধিকারী কেহই নাই—আমি পাকতঃ এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছি। আমি মনুজবর্গের ক্রমোন্নতিশীলতায় একান্ত বিশ্বাসবান্—আমার স্বপ্নেও বোধ হয় না যে, ভীষ্মদেবের ন্যায় তেজস্বী অথবা শুকদেবের ন্যায় পবিত্রতাসম্পন্ন পুরুষ আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না অথবা এইক্ষণেও বিদ্যমান নাই। ভীষ্মদেব, এবং শুকদেব কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, অথবা তাদৃশ পুরুষের পূর্ব্বে কল্পনা হইয়া গিয়াছে, ইহাই পরবর্ত্তী কালে তাদৃশ মহাত্মদিগের উৎপত্তির কারণস্বরূপ হইয়া আছে। মানুষের উন্নতি কেবলমাত্র বৈষয়িক ব্যাপারেই সম্বদ্ধ থাকে, ধর্ম্মপ্রণালীতে ব্যাপক হইতে পারে না, যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা উন্নতির বাহ্য লক্ষণ মাত্রই দেখেন, উহার প্রকৃত হেতু বুঝেন না। মনে উন্নত ভাবের প্রবেশ ও সঞ্চয় নিবন্ধন স্নায়ুমণ্ডলের এবং শারীর ধর্ম্মের উৎকর্ষ, এবং সেই উৎকর্ষের পুরুষানুক্রমিক সংক্রমণ যে মনুষ্যের উন্নতির প্রকৃত হেতু তাঁহারা এই গূঢ় তথ্যটী বুঝেন না। যখন একটী ভীষ্ম জন্মিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই দশটী ভীষ্ম, শত ভীষ্ম, সহস্র ভীষ্ম হইয়া গিয়াছেন, হইয়া আছেন, এবং হইতে পারেন।

অতএব ভীষ্ম এবং শুকদেবের নামোল্লেখ করিয়া আমি চির-কৌমার ব্রতধারণের অসাধ্যতা খ্যাপন করি নাই—সেই ব্রতধারিদিগের আদর্শ মাত্র দেখাইয়াছি। কোন্ কোন্ গুণের প্রাচুর্য্যে ঐ ব্রত সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই বলিয়াছি। ভীষ্মের নাম করিয়া অস্বার্থপরতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, ত্যাগশীলতা এবং ভক্তিমত্তার প্রয়োজন দেখাইয়াছি, এবং শুকদেবের নাম করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার এবং ঐকান্তিকতার আবশ্যকতা বলিয়াছি। প্রকৃত বীর এবং প্রকৃত জ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরাই চির-কৌমার ব্রত পালনের অধিকারী।

যে জাতীয় লোকের মধ্যে বীরভাব এবং বিদ্যানুরাগ অধিক সেই জাতিতেই চির-কৌমার ব্রতের আধিক্য হইতে পারে। কিন্তু বীজ বৃক্ষ

অতএব বাঙ্গালীর মেয়ে ছেলেদের মধ্যে যথোচিত পাত্র বিবেচনা রিয়া চির-কৌমার ব্রতধারণের পথ খুলিলে এদেশেও পুনর্ব্বার প্রকৃত বী ভাব ও বিদ্যানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে। সকল ছেলেকে এবং সকল মেয়েকেই যে উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে হয় এটী একটি মহদ্দোষ।

কোন সাধুশীলা বুদ্ধিমতী বলিয়াছিলেন,"—মেয়েটীর বিবাহ না হইলে কোন ক্ষতি হয় না; সে, তাহার ভাই ভগিনী এবং ঐ ভাই ভগিনীগণের পুত্রকন্যার প্রতি ঐকান্তিক যত্নপরায়ণা হইয়াই সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারে।"

চতুস্ত্রিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

ধর্ম্ম-চর্য্যা।

এক একটী পরিবার সমাজের এক একটী অণুবন্ধন। ঐ বিভিন্ন অণুগুলি যত প্রকার প্রবন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, তন্মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন প্রধানতম। সুতরাং কোন সমাজে যে ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত থাকে, অবিকৃত অবস্থায় সেই সমাজের অন্তর্গত প্রতি পরিবারের মধ্যেও সেই ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত থাকিবে। তাহা না থাকিলে জনগণের মধ্যে পরস্পর মমতার হ্রাস, বিদ্বেষের প্রাবল্য, অনাচারের বৃদ্ধি এবং সমাজবন্ধনের শৈথিল্য জন্মে।

এক্ষণে আমাদিগের হিন্দু সমাজের আর অবিকৃতভাব নাই। এখন সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি অনেকের সম্পূর্ণ ঐকান্তিকতা রক্ষা হইতেছে না। গোঁড়া, গণ্ডমূর্খ এবং পরম জ্ঞানী ভিন্ন অপর অনেকেরই মনে সন্দেহের এক আধটু বিষময়ভাব লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। দেশের জল বায়ু বিদূষিত হইয়া উঠিলে যেমন তদ্দেশনিবাসী সকলেরই কিছু না কিছু স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তেমনি সামাজিক ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হইলে সমাজের অন্তর্গত পরিবার মাত্রেই কিছু না কিছু দোষের সংশ্রব হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে ঐ দোষ অতিক্রম করিবার কোন উপায়ই নাই।

কিন্তু যদিও সর্ব্বতোভাবে ঐ দোষ অতিক্রম করা আমাদিগের সাধ্যাতীত, তথাপি বিচক্ষণতা সহকারে চেষ্টা করিলে যে কতক দূর না হয়, এ কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ ঐ সকল দোষ নিবারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সামাজিক ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য কতক আইনের জোরে, কতক শাসনকর্ত্তাগণের প্রভাবে, আর কতক জনসাধারণীয় মুখাপেক্ষতার বলে, যে কোনরূপে হউক, এ প্রকার সারিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পারিবারিক বন্ধনের যদি কিছু মাত্র শৈথিল্য জন্মে, তবে তজ্জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং তজ্জনিত দুঃখের প্রতীকার ইহজন্মেও হয় না, পরজন্মেও হয় না। সামাজিক ধর্ম্ম-বিপ্লবের দোষ পরিবারের মধ্যে

সংক্রামিত না হয়, তাহার উপায় কি? আমি যতদূর বুঝিয়াছি, সেই উপায়গুলিই সোদাহরণ উল্লেখ করিব।

(১) ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে চিরন্তন ধর্ম্মেই শুদ্ধ বিশ্বাসবান্ হইয়া থাকিব এরূপ মনে করিলে চলে না। বুদ্ধিবৃত্তিকে খেলাইতে হয়, এবং যুক্তি সহকারে শাস্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ করিতে হয়। নিজ পরিবারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল তর্কের প্রয়োজন নাই বটে—কিন্তু অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মব্যাপারের যৌক্তিকতা পরিবারবর্গকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উদাহরণ—

"চণ্ডীপাঠ শুনিলে পুণ্য হয়; তাহার কারণ এই যে, চণ্ডীগ্রন্থে মৃত্যু-ভয়ের প্রকৃতি এবং সেই ভয় নিবারণের একমাত্র উপায় যে, অশিনী আদ্যাশক্তিতে শ্রদ্ধা, তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে;—আজি বাটীতে চণ্ডীপাঠ হইতেছে—চল, দুই জনে গিয়া শ্রবণ করি—তোমাকে স্থূল স্থূল তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিব।" * * * "মৃত্যুভয় মহিষাসুর কত রকমে আকার পরিবর্ত্ত করিয়া আসিল, এবং যেমন একরূপ নষ্ট হইল, অমনি আর একটী রূপ ধারণ করিল, কিছুতেই একবারে গেল না; পরিশেষে তাহার দমন হইয়াই থাকিল।

(২) ধর্ম্মবিপ্লবের সময় যে কোন মতবাদ বাহির হইতে আসিবে, তাহাই গ্রহণ করা উচিত নয়। সমাজের একান্ত বিগর্হিত আচার অবশ্যই পরিবর্জ্জনীয়। উদাহরণ—

"বাপুরে! তোমাকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়া এই হইল যে, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ত্যাগ করিলে; পরে অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অপেয় পানও করিবে—যেন সে দিন পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত থাকিতে না হয়।" * * * "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম কখনই অভক্ষ্য ভোজন বা অপেয় পান করিব না—আপনার সাক্ষাতে যাহা খাইতে না পারি, এমন কোন পদার্থ আমার গলাধঃকৃত হইবে না।"

(৩) ধর্ম্মবিপ্লবে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পরস্পর বিরোধ হয়, সে সমুদায় যে ব্যাপকতর মতবাদের অন্তর্ভূত, তাহাই অবলম্বন করা অভ্যাস করিতে হয়। যতদূর পারা যায়, নিজের মনকে বিদ্বেষদূষিত হইতে দিতে নাই। উদাহরণ—

"অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা—কেবল আমাদের ধর্ম্মই সত্য।" * * * "তাও কি বলিতে আছে?—সকল ধর্ম্মেই ত ভাল মানুষ আছেন? ভাল মানুষের ধর্ম্ম সত্য বই কি মিথ্যা হইতে পারে? ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষকে ভাল করা বই ত নয়?"

(৪) ফল কথা ভক্তি এবং প্রীতি যে ধর্ম্মবীজ, এবং পূজার প্রকৃত ভাব যে একাগ্রতা, তাহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া পরিবারের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইলে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়; সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়; পরিবারবর্গকে মনোগত সন্দেহাদি ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সাহস প্রদান করিতে হয়; এবং তাহাদিগের সহায়তা অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়।

এই সকল পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ বলিয়াই হউক, কিম্বা সহিষ্ণুতার অভাব নিবন্ধনই হউক, অথবা বিবেচনার ত্রুটিবশতঃই হউক, অনেকানেক সুবোধ, শান্তপ্রকৃতিক এবং পরিবারের প্রতি বিলক্ষণ স্নেহসম্পন্ন ব্যক্তিও নিজ পরিজনকে ধর্ম্মবিপ্লবের অনিষ্টকারিতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাপন বিশ্বাসের বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যকলাপের এমত ভাবে * অনুষ্ঠান করেন, যেন দেশে ধর্ম্ম-বিপ্লব কিছুই উপস্থিত হয় নাই। 'নাই বলিলে সাপের বিষ থাকে না'—উহাঁদিগের যেন সত্য সত্যই সেই বিশ্বাস। বাস্তবিক তাহাও কি হয়? যখন দেশের জলবায়ু দূষিত হইয়াছে, তখন কি শুদ্ধ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিলেই পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে? তখন ব্যায়ামচর্য্যা, জল সংশোধন, উচ্চাবাস এবং পবিত্রাহারের সম্যক্ প্রয়োজন হয়।

যাঁহারা ঐরূপ আচার করেন, আমি তাঁহাদিগকে "ভাক্ত" 'কপট' প্রভৃতি কটু বাক্য বলিয়া গালি দিতে পারি না। তাঁহারা যে তাদৃশ অনৃতাচার নিবন্ধন দুর্ব্বলমনা হইয়া পড়িবেন, সে শঙ্কাও বড় একটা করি না। তাঁহা-

* গৃহস্বামীর কার্য্য পরিবারবর্গের অনুকরণীয়। অতএব কিছু অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ভগবান বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং"।

দিগের চরিত্র যে সারল্য পরিহার পূর্ব্বক ক্রমশঃ কুটিলতা প্রাপ্ত হইবে এ কথাতেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আমি এই বলি যে, তাঁহাদিগের অবলম্বিত উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। আমি শত শত স্থলে দেখিয়াছি, যাঁহারা পরিবারের মধ্যে অভিনব ধর্ম্মসন্দিগ্ধতার প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা সংস্কারকার্য্যে একান্ত উদ্ধত ব্যক্তি-দিগের অপেক্ষাও পারিবারিক ধর্ম্ম বিপ্লবের অনিষ্ট ভোগ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি একেবারেই ভক্তিমার্গ পরিহার করিয়াছে, এবং অভক্ষ্য ভোজন, অপেয় পান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা যে সকল আভ্যন্তরিক নিরঙ্কুশভাব সূচিত হয়, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত মনের ভাব সংগোপন করিয়া রাখেন তাঁহারা সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা অবৈধ। তাঁহারা আপনাদের জীবনকালটি এক প্রকারে কাটাইবার চেষ্টা করেন, এবং মনে করেন, সামাজিক ধর্ম্ম বিপ্লবের কোন অনিষ্টই ভোগ করিবেন না। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির নিদানভূত এবং সাংসারিক সকল সুখের আকরস্বরূপ যে নিজ সমাজ, সে যে দুঃখ পাইতে লাগিল, দিন দিন দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে লাগিল, সাংঘাতিক পীড়ায় নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, তাহার দুঃখ মোচনের, বলাধানের এবং রোগোপশমের নিমিত্ত তাঁহারা কোন কষ্টই স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা শুদ্ধ আপনা-দের সুখের নিমিত্তই নিজ নিজ পরিবারকে ধর্ম্মবিপ্লবের দোষ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিলেন। তাঁহাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি বৈফল্যে পরিণত হওয়াই উচিত, এবং তাহাই হইয়া থাকে।

প্রকৃত দোষ না থাকিলে কখনই কোন বিপ্লবের বীজ সমাজ মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। বাস্তবিক, আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মপ্রণালীতে কতকগুলি অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, অনিষ্টকর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে অনেক স্থলেই কেবল আচারের আঁটাআঁটি বাড়িয়া ধর্ম্মভাবের অন্তঃসারশূন্যতা জন্মিয়াছে; আমাদিগের জাতীয় সমুন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কতকগুলি কুসংস্কার সমাজের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল দোষ বুঝিতে

পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য যে, কায়মনোবাক্যে ঐ সকল দোষের উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। যদি বল ঐ সকল বিষয়ে যত্ন করিতে গেলেই ত পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মভেদ জন্মিবে, আমি বলি—সেটী ভ্রম। নিজে যাহারা ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া পরিবারস্থ সকলকে আপনার হিত একমত ভাবিবে, তাহাদিগকে আপনার সহায় করিয়া লও—কোন্ দোষটী পরিহার্য্য, এবং কোন্ গুণটী অনুকরণীয়, বিচক্ষণতা সহকারে এই পরিষ্কাররূপে তাহার নিরূপণ করিয়া দেও, দেখিতে পাইবে, পরিবারবর্গ সেই লক্ষণ উৎসাহ সহকারেই তোমার পদচারু পদপেক্ষ করিয়া চলিবে।

পৃথিবীতে যত পেগম্বর বা নবদেব এ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ বোধ হইবার একটী কারণ এই যে, মহম্মদ আপন পরিবারবর্গকেই সর্ব্বাগ্রে নিজ ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ পরিজনদিগের মধ্যে নিজ মতবাদ প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন—অনন্তর জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং পরিশেষে জন সাধারণের মধ্যে নিজ মতবাদ প্রচার করেন। আমি সকলকেই কিছু মহম্মদ হইতে বলিতেছি না—কিন্তু পবিত্রতা এবং প্রকৃতদর্শী ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের এটী একটী প্রকৃত লক্ষণ, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে এখন যে সকল অনুচিকীর্ষু সংস্কারকের ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় না। বহুদর্শী করাটী তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহারা বিজাতীয় রীতির পক্ষপাতী হইয়া আপনাদিগকে সজাতীয়গণের অগ্রণী বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্ব স্ব পরিজনের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমি শুনিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন স্বীয় গর্ভধারিণীর কোন আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলিয়াছিলেন—"মা! আমি কি তোমার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি? —আমি জগতের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি!!"

ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে নিজ পরিজনকে সহায় করিবার চেষ্টা করিলে প্রভূত শুভ ফল উৎপন্ন হয়; সংস্কার কার্য্যে পাদবিক্ষেপটী একটু ধীরে

দীনে রহিতে থাকে—সুতরাং প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিয়া পড়িবার সম্ভাবনাও অধিক হয় না।

সোম বুদ্ধিমতী এবং ভক্তিমতী হিন্দুমহিলার সহিত একজন খৃষ্টানীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারই উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব সমাপন করিব।

"দিদি!—তোমাদের মত লোকের আর হিন্দু থাকা সঙ্গত হয় না—তোমরা আলো পাইয়াছ, আর কেন অন্ধকারে থাক?" * * * *

"সে কি দিদি!—অন্ধকার কোথায়?—ঘরের মোর ভাঙ্গাচালা সব খোলা আছে—অন্ধকার কৈ?—বাহিরেও বড় একটা বেশী আলো নাই, তবে যথেষ্ট মোর আর খুলা আছে বটে।"

পঞ্চত্রিংশ প্রবন্ধ।

—:*:—

আচার রক্ষা।

কোন দ্রব্য, সেটী যতই কেন স্বচ্ছ হউক না, তাহার দ্বারা কিছু না কিছু আলোক সংরুদ্ধ হইবেই হইবে। এই যে আমাদের দেশে ইংরাজী বিদ্যার 'সুবিমল জ্যোতিঃ' বিকীর্ণ হইয়াছে—তাহাতেও অনেকটা সত্যের অপলাপ হইয়া দেশীয় জনগণের অপকার করিতেছে। দেখ ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমাদিগের জাতীয় আচার পদ্ধতির বিলোপসাধন হইতেছে। স্বপ্নেও মনে করিও না যে তাহাতে সমূহ হানি হইতেছে না। আচার পদ্ধতির লোপে গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছে, স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, লোক সকলের আয়ুষ্কাল খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে, এবং আত্ম-গৌরবের ত্রুটি হওয়াতে জাতিসাধারণের মধ্যে নীচানুকরণ প্রবৃত্তি বাড়িতেছে।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদিগের আচার-প্রণালী ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত হইয়া নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাল কি আমাদিগের ধর্ম্মটী ভাল, এই কথা লইয়া যথেষ্ট লড়াই চলিতেছে—তাঁহাদিগের দ্বৈতবাদ ভাল, কি আমাদের অদ্বৈতবাদ ভাল, ইহার অনেক বিচার হইতেছে। এবং সেই বিচারে আমরা যে যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সহায়তা পাইতেছি, তাঁহাদিগকেই একেবারে মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতেছি। কিন্তু আমা-দিগের আচার পদ্ধতি কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা ত আর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়া দিতে পারেন না। সুতরাং কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ কাহা-রই স্থানে এদেশের উপযুক্ত আচার শিক্ষার সুবিধা হইতেছে না।

ধন্য য়িহুদী জাতি! সেই জাতির দশা আমাদিগের অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা ত আমাদের নিজের দেশে আছি—আমরা ত এখনও সকলে একত্র হইয়া আছি—তাহাদের নিজের দেশও নাই, নিজের জাতিও নাই। তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে নানা জাতীয়ের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি তাহারা আপনাদিগের আচার প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে

এবং সেই গুণে য়িহুদীরা যে যেখে থাকুক, তাহারা তত্তদেশবাসিদিগের অপেক্ষা সুস্থশরীর দীর্ঘায়ুঃ এবং ধনশালী হইতেছে।

আচার প্রণালীটী সামান্য জিনিস নয়। আমাদিগের "কৃতবিদ্যেরা" আচার পদ্ধতির প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নিতান্তই স্বল্পদর্শিতার কাজ করিতেছেন। একজন বিশিষ্ট কৃতবিদ্যের সহিত আমার কোন সময়ে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমি। ধর্ম্মের বড় বড় কথা লইয়াই আমরা তর্ক করি—কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট যে আচার প্রণালী ছিল, তাহার গুণাগুণ কিছুই বিচার করি না, এটী আমাদের একটী ভ্রম।

তিনি। আচার প্রণালী লইয়া আর কি বিচার করা যাইবে? ওগুলি ত যাজক সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত ব্যাপার বই আর কিছুই নহে।

আমি। আচার প্রণালী যে যাজকবর্গেরই মনঃকল্পিত বস্তু, তাহা আমার বোধ হয় না। প্রকৃতির সম্যক্ পর্য্যালোচনা দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল জ্ঞানবর্গের বোধগম্য হয়, আচার পদ্ধতিতে তাহাই নিবদ্ধ হইয়া থাকে। আচার পদ্ধতি সাক্ষাৎ প্রকৃতির আদেশ।

তিনি। প্রকৃতির আদেশ কি তাহা জানিবার নিমিত্ত কোন শাস্ত্রপদ্ধতি শিখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বোধ হয় না। কারণ প্রকৃতির আদেশগুলি অতি স্পষ্টাক্ষরেই প্রকৃতির সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অন্যান্য জীবদিগের গো, মহিষ, বিড়াল, কুক্কুরাদির কোন আচার পদ্ধতি শিখিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

আমি। তাহা সত্য বটে—কিন্তু সেই জন্যই পশু পক্ষাদির মধ্যে বিধ্বংসের প্রকৃতির নিয়মটী অতি বলবদ্রূপে কার্য্যকারী। কত কত প্রকার পশু পক্ষী পৃথিবীতে জন্মিয়া একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষ সেই যে অতি প্রাচীনকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই অবধি আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। পশু পক্ষ্যাদি পৃথিবীর দেশ বিশেষে এবং কাল বিশেষে অবস্থিতি করিতে পারে—মানুষ সর্ব্বস্থানে সকল সময়ে থাকিতে সমর্থ। তাহার কারণ, মানুষ দেশভেদে এবং কালভেদে আপনার আচার ভিন্ন করিয়া লইতে পারে।

তিনি। তবে কি মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মই যথেষ্ট নয়?

আমি। মানুষের পক্ষে মনুষ্য প্রকৃতির যে নিয়ম তাহা যথেষ্ট—কিন্তু পশু প্রকৃতির নিয়ম মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তিনি। আমরা ভোজনাদি ব্যাপারে মনুষ্যপ্রকৃতি কি পশু প্রকৃতি হইতে ভিন্ন?

আমি। ভিন্ন বৈ কি?—পশুদের প্রকৃতিতে পরিপাকশক্তিটা অত্যন্ত বলবতী। মনুষ্য প্রকৃতিতে তাহা তেমন বর্ব্বরভাব ধারণ করে নাই, অন্যান্য শক্তি-বিশেষ, মনুষ্যের প্রকৃতিতে কার্য্য করিবার যথেষ্টরোধ অতি সূক্ষ্ম সীমায় অতিক্রম করিয়া চলে, এবং মনুষ্যের বাহ্যপ্রকৃতি এবং তদ্ভাব তাহা এবং শিক্ষা-প্রণালী থাকাতে একজন অপর ব্যক্তিকে আপনার অভিভূত করিতে পারে—এই সকল কারণে মনুষ্য প্রকৃতি পশু প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তুমিও যেমন প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বল, আমিও তাই বলি, তবে মনুষ্যের পক্ষে বলিতে হইলে আমি বলি, মনুষ্য প্রকৃতির অনুসরণ কর। প্রত্যবায় শাস্ত্রকারেরাও দোষ দেন নাই যত, অর্থাৎ পরিণামদর্শী মনুষ্য-প্রকৃতির অনুসরণ করাইবার জন্য, আহার পদ্ধতির প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য প্রকৃতির অনুসরণ করিতে গেলেই পরিণামদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার সমাবেশ করিতে হয়। হয়ত যেটী ভাল লাগিল, খাইতে প্রবৃত্তি হইল, অমনি তাহাই করিতে গেলে চলে না। এই জন্যই আচার শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদিগের দেশের কথা ধর এখানে যে, এখানে এমন কতকগুলি পীড়া হয়, যাহা ইউরোপে হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সে সকল পীড়ার নাম পর্য্যন্ত নাই। এখানে এমন অনেকটি দ্রব্যের বিধান আছে, যাহার অনুষ্ঠানে ঐ পীড়াগুলির দোষ বৃদ্ধি হইতে পায় না। সে দ্রব্যগুলি আমাদিগেরই পরিপাকশক্তির নির্দিষ্ট। সেগুলি খাওয়া কি আবশ্যক নয়? তত করিতে গেলেই উপবাসাদির ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু ওরূপ ক্লেশ স্বীকার পশু প্রকৃতির বিরুদ্ধ। মূল কথা, প্রেয়ঃ এবং শ্রেয় উভয়ের একটী চিরন্তন ভেদ আছে *—আচার্য্য

* "অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃশ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উপ্রেয়ো বৃণীতে॥ কঠোপনিষৎ।

পদ্ধতি সেই ভেদ অবগত হইয়া কোনটি শ্রেয় বা হইয়াও শ্রেয়ঃ, তাহা বিধিবাক্য দ্বারা দেখাইয়া দেয়। * * *

মতভাদ লইয়া ঝগড়া করার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিতে পারে। কিন্তু দেশের প্রকৃতানুযায়ী আচার রক্ষা করায় শরীর দৃঢ়, মন সবল এবং গৃহ পবিত্র থাকে

* * * * *

"বৌ মা সাবিত্রী ব্রত করিতে চাহেন—কিন্তু কোলে ছোট ছেলে—সাবিত্রী ব্রত করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়, তাহা ত সহিবে না?" * * "ঠিক কথা—সাবিত্রী যখন ব্রত করিয়াছিলেন, তখন ত তাঁহার বিবাহ মাত্র হইয়াছিল—ছেলে হয় নাই—বৌ মা জন্মাষ্টমীর ব্রত করেন—আমার মানা নাই। তবে সাবিত্রী ব্রতের বদলে প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে স্বামীর মঙ্গল চিন্তনপূর্বক জল গ্রহণ করুন।—মা প্রত্যহ বাবার পাদোদক খাইতেন, জান ত! সাবিত্রী ব্রতের বদলে সেই মহাব্রত"। * * *

"তুমি একাদশীর ব্রত কর শুনিয়া সে দিন উমেশের স্ত্রী বড়ই আশ্চর্য্য মানিল—বলিল, এত ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও উনি একাদশী করেন—আর আমার ভাই বৎসর কয়েক মাত্র পড়িয়াই একেবারে সাহেব হইয়াছে—কিছুই মানে না"। * * * "একাদশীর ব্রত করা কাহার কাহার পক্ষে বড় ভাল। যাহাদের শরীরে বাত শ্লেষ্মাধিক্যের কোন লক্ষণ থাকে, তাহারা এই ব্রতের বিশেষ উপকার বুঝিতে পারে।" * * * "শ্যামাচরণের মা বিধবা। অত বয়স হইয়াছে—কিন্তু সকলের হাতেই খায়।" * * "ওটা ভাল নয়। যাহারা বিশিষ্টরূপ শুদ্ধাচারে থাকিতে চায়, তাহাদের মার তার হাতে খাওয়া উচিত নয়। সামান্য স্পর্শদোষই খুব দোষ—তাহাতে এক জনের শরীরের পীড়া এবং প্রকৃতির দোষ অন্যের শরীরে যাইতে পারে। পাকস্পর্শ দোষ তাহা অপেক্ষাও অতি গুরুতর দোষ—কি আশ্চর্য্য! ইংরাজেরা সামান্য স্পর্শদোষটা খুব মানে, কিন্তু মার তার হাতে খায়—ওরা হাড়ি মেথরের হাতেও খায়।"

—:*:—

ষট্‌ত্রিংশ প্রবন্ধ।

—:*::*:—

গৃহে ধর্ম্মাধিকরণ।

এক একটী পরিবার এক একটি রাজ্য। তবে রাজকার্য্যে বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে হয় এবং অভ্যন্তরেও শান্তি সংস্থাপন করিতে হয়। পরিবারের কর্ত্তাকে বহিশত্রু লইয়া ততটা মারামারি করিতে হয় না। চোর, তস্কর, সাহসিক ফেরেব্বাজ প্রভৃতিরও দৌরাত্ম্য হইতে সমাজ শাসন এবং তাহারই প্রতিভূস্বরূপ রাজশাসন, পরিবাররূপ রাজ্য-গুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু পরিবারের আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা গৃহস্বামীর ত কর্ত্তব্য—উহাতে সামাজিক শাসনের বা রাজশাসনের বড় একটা হাত নাই। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া, মেয়েয় মেয়েয় ঝগড়া, ছেলেয় বুড়োয় ঝগড়া, শাশুড়ি বৌয়ে ঝগড়া,—এই সকল কাণ্ডে গৃহের আভ্যন্তরিক শান্তির সর্ব্বদাই ব্যাঘাত হয়। অতএব ঐ সকল কষ্টকর ব্যাপার যাহাতে আদবেই হইতে না পায় এবং অধিক না হইতে পায়, হইলে সত্বর নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং সমধিক পরিমাণে অশুভ ফল প্রসব না করে, তাহার জন্য যত্নবান এবং সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

পারিবারিক শান্তিরক্ষার মূলসূত্রও যাহা, সামাজিক শান্তিরক্ষার মূল সূত্রও তাহাই—কৃত্রিম অপক্ষপাতিতা। যে পরিবারের কর্ত্তা বিনা পক্ষ-পাতে ঝগড়া থামাইতে পারেন এবং দোষীর তিরস্কার ও নির্দ্দোষীর পুরস্কার করিতে পারেন, তিনি পরিজনদিগকে শান্তিসুখে রাখিয়া শুদ্ধ আপনি সুখী হইতে পারেন এমত নহে, তিনি পরিবারবর্গের মধ্যে ধর্ম্মের সকল বীজই বপন করিয়া আপনার জীবদ্দশা সফল করিতে পারেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, বিনয় কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ, সকলেরই মূলে ন্যায়ানুগামিতা থাকা আবশ্যক। পরিবারের মধ্যে সেই ন্যায়ানু-গামিতার অভাব হইলে সমাজেও উহার অভাব হইবে এবং সত্যনিষ্ঠার ও শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়াতে সমাজও হীনবল হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের এই দুঃস্থ অধঃপতিত দেশে ক্ষমা, দানশীলতা প্রভৃতি কোমল সদ্‌গুণ সকলের যত গৌরব, ন্যায়পরতা, সত্যাচার, বাঙ্‌নিষ্ঠা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কঠোর সদ্‌গুণ সকলের গৌরব তেমন অধিক নহে। কিন্তু যেমন স্ত্রী পুরুষের মিলনেই সংসারের উৎপত্তি এবং সুখ তেমনি ঐ কোমল এবং কঠোর উভয় প্রকার গুণের মিলনেই সৎকার্য্যের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম। কোমল গুণগুলি কঠোর গুণগুলির অভাবে প্রকৃত পক্ষে থাকিতে পারে না। এই জন্য অনেক স্থলেই আমাদিগের দয়া বাক্য মাত্রে, ক্ষমা অশক্তিতে, এবং দানশীলতা কেবলমাত্র মনে মনে থাকিয়া যায়—উহারা ক্রমেই বন্ধ্যা হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে উভয় কঠিন এবং কোমল সদ্‌গুণ সকলের যথাযথ সাধন হইতে পারে। কেবল মাত্র পারিবারিক কার্য্যের প্রতি একটু নিবিষ্টমনা হইতে হয়। প্রাচীনেরা যেমন 'দূরহউক গে আর পারি না' বলিয়া ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আলস্য সুখভোগ করেন, তেমন করিলে হয় না, এবং নব্যেরা যেমন এ সকল আমাদিগের সামাজিক নিয়মের দোষ বলিয়া আত্ম সমাজকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাহা করিলেও চলে না, পারিবারিক সকল কার্য্যেই বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হয়। পরিবার এমন কোন অলৌকিক যন্ত্র নয় যে বিনা যত্নে উহা আপনা হইতে অবিকল চলিয়া যাইবে, এবং আপনা হইতেই সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম প্রসব করিতে থাকিবে।

ছেলের ছেলের ঝগড়া—ঐ কি এত সামান্য ব্যাপার যে তুমি ঐ ঝগড়ার নিদান কিছুই বুঝিবে না, উহার ক্রম কিরূপ, তাহা দেখিবে না এবং উহার চরম ফল কি হইবে, তাহা ভাবিবে না? ছেলেদের ঝগড়ার নিদান প্রধানতঃ তিনটী,—(১) উহাদিগের অসীম স্বার্থপরতা, (২) প্রহার করায় ও কামড়ানয় এবং আঁচড়ানয় উহাদিগের স্নায়ু এবং পেশী সঞ্চালন জন্য সুখানুভূতি, (৩) উহাদিগের আপনাপন পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি বয়োধিকদিগের পরস্পর আন্তরিক বিদ্বেষভাবের অনুকরণ। এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটী কারণ হইতে যে সকল বিবাদ, বিসম্বাদ, মারামারি, পেটাপেটি জন্মে, সেগুলি ছেলেরা একটু বড় হইয়া উঠিলে, তাহাদের কিছু জ্ঞান জন্মিলে, প্রায়

আপনা হইতেই কমিয়া যায়। শৈশব হইতে যে ভগিনীর বিবাহের প্রকৃত চেষ্টা করিতে পারিবে ছেলেদের স্বভাব বিশেষরূপেই ভাল হয়—কিন্তু মা পারিলেও নিতান্ত অধিক ক্ষতি হয় না। কিন্তু তৃতীয় বারণ হইতে যে সকল বিবাদের উদ্রেক হয়, সে গুলিকে মূলেই দমন করা আবশ্যক। ঐ সকল বিবাদ প্রায়ই অন্তঃপুরদিগের মধ্যে হয় না। খুড়তুতা, জেঠতুতা, মামাতুতা পিসতুতা প্রভৃতি জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভাই ভগিনীদের মধ্যে সংঘটন হইয়া থাকে। যখন ঐরূপ বিবাদ দূরঃ হইতেছে দেখিবে, অথবা ক্রীড়াস্থলে বিভিন্ন সোদরবর্গ বিভিন্ন দলস্থ হইয়া খেলা করিতেছে দেখিতে পাইবে, তখনই নিশ্চয় জানিও যে নরিবারের অজ্ঞাতসারে অপ্রকটরূপ বিদ্বেষবৃদ্ধি জন্মিয়া আছে। যখন তাহা ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব, তাহা না হইয়া সহোদরীর ভাব প্রকাশক হইবে, একটু আড়ি বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, বুঝিতে হয়। তখন আর মুহূর্ত মাত্র উদাসীন থাকিও না। ছেলেদের ঝগড়া হইলেই, কেন হৌক হইলেই, তাহার অনুসন্ধান করা চাই; এবং একেবারে পক্ষপাত পরিশূন্য চিত্তে যে ছেলেটী দোষী সপ্রমাণ হইবে, তাহাকে অবশ্য তাহার দণ্ড দেওয়া চাই। বয়সের বিশেষে দণ্ডের ন্যূনাতিরেক হইবে, কেহ বা সামান্য অনাদর পাইবে, কেহ বা বহুতাড়ি খাইবে, কেহ বা মার খাইবে। দণ্ডটী কেহ এমন মনে করে যে, বাটীর ছেলে, চাকর, ঝিয়ারী সকলেই দোষীর নিন্দা করিয়া দণ্ডের উচিতা ঘোষণা করে। যে বাটীতে বহোদর বিদ্বেষের অধিক সম্ভাবনা, সে বাটীতে যদি বড়টী ছোটটীর গীড়ন করে তবে অন্তর্ভূত পক্ষপাতিতাদোষ ঘটিত হয়। ছেলেদের বাপ অথবা মা কিম্বা উভয়েই দোষ ছেলেতে অধিক তাহাকেও অল্প ভাল বাসেন, ইহাই বুঝা যায়। সে বিবাদও পূর্বাহ্নে অতি সত্বর নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক, এবং দণ্ডও পূর্বাহ্নে হওয়া উচিত। বাপ মা ছেলেদের অতি পক্ষপাত করিয়া থাকেন, এ কথা প্রকাশ করিয়া না বলাই অধিক ভাল দেখায়।

বরঞ্চ স্ত্রীলোকদিগের কাহার কথা বাটীর কর্তাকে না শুনিতে হইলেই ভাল হয়। কারণ সকল কথা কর্তার শোনা উচিত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষপাতিতা মূল হইয়া যায়। কিন্তু যদি গৃহিণী বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী এবং পক্ষপাতপরিশূন্যা হয়েন, তাহা হইলেই কর্তার না শুনা, বরং

তাঁহাকে অবশ্যই শুনিতে হয় এবং ঠিক বিচার করিয়া নিন্দা, ভৎর্সনা, দুঃখপ্রকাশ এবং ক্রোধপ্রকাশের দ্বারা দণ্ডদান করিতে হয়।

ছেলের বুড়ায় ঝকড়া—যে বাটীতে ইহা হয়, অর্থাৎ যুবক যুবতীরা বৃদ্ধ বৃদ্ধার সহিত ঝকড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাঁহাদিগের কথায় রুক্ষ উত্তর প্রদান করেন, সে বাটী অতি জঘন্য। সে বাটীতে ধর্ম্মের মূল বীজ যে ভক্তি তাহারই একান্ত অভাব। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন বাটীর কর্ত্তৃত্ব তোমার হাতে পড়িয়া থাকে, তবে কি করিবে, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচারপূর্ব্বক যুবক যুবতীর দোষ হইলে তাহাদিগের সম্ভবমত কঠিন দণ্ড দিবে, বৃদ্ধ বৃদ্ধার দোষ হইয়া থাকিলে, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবে. বৃদ্ধ বৃদ্ধার অ-ভমানের ভয় করিবে না, অবুঝ অপরাপর লোকদিগেরও নিন্দার ভয় করিবে না। কিন্তু আপনি যে উচিত বিধান করিয়াছ, তাহাও কাহার নিকটে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইবে না—বয়োধিকদিগের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে থাকিবে এবং তদ্বিষয়ে অল্প কথাই কহিবে। কিন্তু আর একটী কথা আছে। যদি বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নিতান্ত বয়োধিকতাবশতঃ অথবা পীড়াবশতঃ বাস্তবিক ক্ষীণবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকেন, তবে যে যুবক বা যুবতী তাঁহাদিগের প্রতি রুক্ষ উত্তর দান করিয়াছে, সেই প্রকৃত দোষভাগী। সে স্থলে তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান উচিত হইবে।

বয়সের এবং সম্পর্কের গৌরব রক্ষা করিয়া চলা আমাদিগের জাতীয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। পরিবারের মধ্যে এই ধর্ম্মটীর সম্যক্ পালন হওয়া আবশ্যক। ঐ মর্য্যাদাটী রক্ষা করিয়াও গৃহ বিবাদের মীমাংসায় পক্ষপাতশূন্য বিচার হইতে পারে—প্রত্যুত ঐ মর্য্যাদা রক্ষা করিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে পক্ষপাতশূন্য বিচার হয়।

বিধবা শাশুড়ী তাঁহার পুত্রবধূর সহিত যে ঝকড়া করেন, তাহা থামানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। একটী উদাহরণ দিতেছি। "মা! আজ অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বকিতেছিলে কেন?—বাহিরবাটী হইতে শুনা যাইতেছিল যে"। * * "সাধে চেঁচাই! বৌ যে খুব চোপা করিতে শিখিয়াছে, কোন কথাই ত আর শুনিতে চায় না" * * * "কি কথা শুনে নাই।" * * * "তোর আর সে সকল খবরে কাজ কি?" * * * "আমার কাজ

আছে বই কি মা?—এই দেখ বাড়ীর ভিতরে অত গোলমাল—সেটা কি ভাল? লোকে নিন্দা করিবে যে। আর দেখ, বিবাদে অনেক দোষ হয়, ছেলে পিলে খারাপ হয়, খাওয়া দাওয়া মন্দ হয়, সংসারে মনের সুখ থাকে না—আর ঘর লক্ষ্মীছাড়া হয়।" * * "বটে!! থাক্ তোর ঘরের লক্ষ্মী নিয়ে তুই থাক্—আমার যেম্‌নে দুই চক্ষু যায় আমি চলিয়া যাইব —হা বিধাতা! আমার কপালে এই ছিল * * *" "মা!—আমি আর এখন এখানে থাকিব না। বাহিরে যাই। খাবার সময়ে ডাকিলে আসিব। কিন্তু বাহির হইতে যেন চেঁচাচেঁচি শুনিতে না পাই।"

* * * * * *

"মা! ভাত খাইতে ডাকিলে আসিলাম—কি হইয়াছিল, এখন বল।" * * * "আর সে কথায় কাজ নাই—হবে আবার কি?—তুই খা, খা" * * * "তাই বল বেটি! কেবল চেঁচিয়ে হাট করেছিলি। আর যারা সব আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিল, সবাই ঐ গোল শুনে আমাদের বাড়ীর নিন্দা করে গেল। বলিল তোর মা! বৌকে দেখিতে পারে না।" "তা বলবে বই কি?—ওদের বাড়ীতে বুঝি কোন চেঁচাচেঁচি হয় না?" * * * "হয় হউক্‌গে মা! কিন্তু আমাদের বাড়ীতে হবে না।" * * "তুই খা খা—আর ওসব কথায় কাজ নেই।"

* * * * *

"আজি সকালবেলা মা তোমাকে বক্‌ছিলেন। কেন বক্‌ছিলেন তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না—তুমি কোন কথার জবাব দেও নাই ত।" "না" * * * "লক্ষ্মী আমার।" * * * "কেন মা! আজি তোমার বৌ অত কাঁদিতেছে কেন। আমি ঘরে যাইয়াই দেখিলাম বড়ই কাঁদিতেছে, কি হইয়াছে? * * তুমি জান, আমি উহাকে এমন সকল বিষয়ে কখন কিছু জিজ্ঞাসা করি না, আর আপনা হইতেও কখন কিছু বলে না। * * * তুমি বল তোমার বৌ অত কাঁদছে কেন? * * * বলিবে না? তবে (ভগিনী) উমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানি—এমন সকল কাণ্ডে চুপ করিয়া থাকা ভাল নয়।—"উমা!—কি হয়েছিল রে!—বৌ অত কাঁদচে কেন?" উমা বলিল "মা আজ বৌকে বড় শক্ত গালাগালি দিয়াছেন—

ভাইখাকী বলিয়াছেন।" * * * "মা! আমার একটী কথা শুন—তুমি গালিটী মনের সহিত দাও নাই বটে—কারণ তুমি আমার শ্যালাদের বেশ ভালবাস, কিন্তু কথাটা শুনিতে বড়ই কটু। ভেবে দেখ তোমার মেয়ের শাশুড়ী যদি তাহাকে ভাইখাকি বলিয়া গালি দেয়, তবে তোমার মনটী কেমন হয়?—ভাল কাজ কর নাই বাছা!—এ রকম করিলে বড়ই নিন্দা হবে—আর অকারণে মনে নির্ঘাত দুঃখ দেওয়া—তা কি ছেলের, কি মেয়ের, কি পড়সীর, কি বৌয়ের, বড়ই পাপ।" * * * *

যে বাটীতে শাশুড়ী বৌয়ের মধ্যে ঐরূপ ন্যায় রক্ষিত হইয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে সেই বাটী নির্ব্বিবাদ শান্তিময় নিকেতন হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী মাত্রেই বলিত, কোন শাশুড়ী বৌকে অমন আপনার পেটের মেয়ের মত ভালবাসিতে পারে না!

আর একটী বাটীর কথা বলি। এ বাটীতেও বিধবা মা, ছেলে কর্ত্তা। ছেলে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, মাতৃভক্তি করিতে হয় শুনিয়াছেন, মায়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলাই পরম ধর্ম্ম স্থির করিয়া লইয়াছেন। মা বলিলেন —'বাবা!—আমার হাড় ভাজা ভাজা হইল। তুমি এমন সোণার চাঁদ, তোমার কপালে এমন একটা পেঁচা যুটিল। আমিও তোমার সংসার লইয়া সুখী হইব বলিয়া যে আশা করিয়াছিলাম, সে সব নিষ্ফল হইল। বাবা! তুই আর একটী বে কর—আমি বৌ নিয়ে ঘরকন্না করিয়া সুখী হই।" ছেলে চুপ করিয়া রহিলেন—বলিলেন না যে, এই বিবাহ তাঁহার পিতা দিয়া গিয়াছেন—ঐ পত্নী ত্যাগ করায় সেই পিতার অবমাননা করা হয়—মনে করিলেন না যে, স্ত্রী কি দোষ করিয়াছে, তাঁহার মায়ের মনে ধরে নাই এই বই ত নয়, তাহার জন্য কি নিরপরাধিনী একবারে ভাসিয়া যাইবে, ভাবিলেন না যে পত্নী সেই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা, কোথা তাহাকে হৃষ্টচিত্ত ও সুস্থ রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য, না তাহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। মাস কয়েকের মধ্যে মাতৃভক্ত পুত্র দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ করিয়া সসত্ত্বা প্রথমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই অবধি মায়ের আস্বা বড়ই বাড়িয়া গেল—ছেলে তাঁহার কথায় সকল কাজই করিতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি নানা প্রকার ফাই ফরমাইস করিতে লাগিলেন—নিজেও

একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া দাঁড়াইলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাতা পুত্রের মুখ দেখাদেখি রহিল না, দুই জনের অন্ন পৃথক্ এবং আবাস বাটী পৃথক্ হইল—বড় টানে সব ছিঁড়ে গেল। দ্বিতীয় পত্নী কোথায় গেলেন তাহার ঠিকানা হইল না। প্রথমাই গৃহলক্ষ্মী এবং কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন।

ফলকথা, মাতৃভক্তিই বল আর যাহাই বল, ন্যায়ানুগামিতার সহিত থাকিলেই সব রক্ষা পায়। উহাই ধর্ম্ম—উহাই সকলকে ধারণ করে। অতএব পারিবারের মধ্যে ন্যায়পরতার একটী উচ্চতম আসন স্থাপন করিয়া রাখ।

— :*::*:—

সপ্তত্রিংশ প্রবন্ধ।

—•(০)•—

গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা।

আমাদিগের সমাজ মধ্যে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যাইতেছে, যাহা পারিবারিক ব্যবস্থারও অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া অনেকটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতেছে। সদ্বিবেচক গৃহস্থের কর্ত্তব্য যতদূর পারেন, ঐ দোষের প্রতিবিধান করিয়া চলিবেন। যে সামাজিক পরিবর্ত্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি, অল্প কথায় বলিতে গেলে তাহাকে বাবুয়ানা বা চৈকণ্য-লালসা বলা যায়। আমাদের দেশে একপ্রকার চিক্কণাই বা বাহ্যবাবুয়ানা বড়ই বাড়িতেছে এবং বাড়িয়া সর্ব্বনাশের উপক্রম করিতেছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা দেশের ধন কম হইয়া যাইতেছে—পূর্ব্বে যাহারা দোল দুর্গোৎসব করিত, তাহারা অনেকে এক্ষণে নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে, প্রতিদিন দুই বেলা দুই বার পেট ভরিয়া খাইতে পায় এমন লোকের সংখ্যা বর্ষে বর্ষে ন্যূন হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে যে ব্যবসায় বাণিজ্য দেশীয়দিগের হস্তগত ছিল, তাহা ক্রমেই বিদেশীয়দিগের আয়ত্ত হইয়া পড়িতেছে, পূর্ব্বে যাহারা হাজার, দশ হাজার, লক্ষ টাকা প্রতিবর্ষে সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহারা এক্ষণে আর সঞ্চয়ের মুখ দেখিতে পায় না, ঋণদায়ে জড়িত হইতেছে, যে সকল প্রদেশে ভদ্র লোকেরা নিত্য পুরি রুটি খাইত, তাহারা এখন কেবল ভাত খাইতেছে। কিন্তু দেশের দৈন্যদশার এই সকল লক্ষণ সত্ত্বেও দেশীয় লোকের মধ্যে এক রকম চিক্কণাইয়ের চাইল প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে।

এইরূপ হইবার কারণ দুইটী। এক ইংরাজদিগের অনুকৃতি। দ্বিতীয় ইংরাজদিগের প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদের বহুল বিস্তার। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা বলিলেন—"আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র দল ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন করিবে; অতএব বাবুয়ানা ভক্ত ভারতবর্ষীয়দিগের চক্ষে যাহাতে উহাদের গৌরবের ত্রুটি না হয়, এমত দৌলতমন্ত এবং খোসপোষাকী হইয়া উহাদিগের চলা উচিত।" এই বলিয়া তাঁহারা সিবিলিয়ান দলের এমনি বেতন বৃদ্ধি করিলেন যে, পৃথিবীর কোন দেশে কস্মিন্ কালে রাজকর্ম্মচারীদিগের অমন বড় বেতন

আর হয় নাই। এখন দিন দিন বর্দ্ধিতদারিদ্র্য ভারতবর্ষীয়েরা আর সিবিলিয়ানদিগের বাবুয়ানাকে হাত বাড়াইয়া নাগাইল পায় না। এখন যত বড় বাড়ী, তেজী ঘোড়া, সকলই সিবিলিয়ানদিগের; তাঁহাদের নিজের হইলেও তাঁহাদের, আর দেশীয় রাজা রাজড়াদিগের হইলেও, তাঁহাদের। ইংরাজদিগের এই ভয়ানক নবাবী দেখিয়া দেশীয়েরা তাহার অনুকরণ চেষ্টা করিতেছে। যে দুই জন, দশ জন পারিতেছে, তাহারা বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, সাজ, লেবাস, পোষাক সকলই ইংরাজী ধরণের করিতেছে; আর মধ্যবিত্তেরা যেন তেন প্রকারেণ কোঠা বাড়ী, অফিস যান গাড়ী, কোন এক রকম ঘড়ি, পাণ্টালুন, কোট, ক্যাপ এবং চুরোটের চেষ্টা দেখিতেছে। ছোট লোকেরাও ঠিক ইহাদের লেজ ধরিয়া যাইতেছে—পেটের ভাত থাক্ আর নাই থাক্, একটু ওয়াসারওয়ালা ধুতি এবং পিরাণ পরিতেছে, এবং পেট ভরিয়া মুড়ি মুড়কি জলখাবার না খাইয়া এক পয়সায় জিলাপি বা এক পয়সার বরফ জিহ্বাগ্রে দিয়া বাবুয়ানা করিতেছে! এ সকল হওয়াতে কোন কোন অর্থশাস্ত্রিকদিগের মতে বড়ই উপকার! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে উপকার কিছুই নাই।* তবে দেশে ধনাগম থাকিলে কথঞ্চিৎ ইহা সহ্য হইতে পারে, মাথা পড়িতে হয় না। কিন্তু দরিদ্রের কতো বাবুয়ানা বড়ই সাংঘাতিক। শরীরের শোণিত বৃদ্ধির সহিত চৈতন্যের বৃদ্ধি হইলে স্বাস্থ্য বুঝা যায়, শোণিত লাঘবের সহিত যে চৈতন্য জন্মে সেটী মারাত্মক জ্বরোগ। আমাদের সমাজ মধ্যে এই রোগের সঞ্চার হওয়াতে পারিবারিক প্রণালীর মধ্যেও অনেকটা দোষ প্রবেশ করিয়াছে। আমরা ইংরাজ মাত্রকেই খুব খোসপোষাকী বাবু হইয়া বেড়াইতে দেখিতে পাই। উহাঁরা স্বদেশে কি ভাবে থাকেন তাহার কিছুই জানিতে পারি না। সুতরাং যে এক অনুকরণ শক্তি আমরা খাটাইয়া থাকি, পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে, আমাদিগের সে শক্তিটীও আর পূর্ণমাত্রায় খাটিতে পায় না। আমরা কেহই স্বচক্ষে দেখিতে পাই না, ইংরাজেরা কিরূপে আপনাদিগের গৃহকার্য্য সকল

* "Luxury supports a state as the hangman's rope supports a criminal" Laveleye.

নির্ব্বাহ করেন। আমরা দেখিতে পাই না যে, উহাঁরা স্ত্রী সুরুষে নিত্য নৈমিত্তিক খরচের খাতা রাখেন—উহাঁদের বিবিরাও ঘর ঝাঁইট দেন—রসুই করেন—বাসন মাজেন—কাপড় কাচেন—কাচিয়া ইস্তিরী করেন—ছুঁচের কাজত করেনই—আর পল্লীগ্রামে মেয়েমর্দ্দে, ক্ষেত্রে খাটেন—গোয়াল কাড়েন। এ সকল ব্যাপার আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন যে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রন্ধনাগারে গিয়া নিত্য কি কি ব্যঞ্জন পাক হইবে স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং রন্ধন কার্য্যের কতকটা সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ করেন? কয়জন জানেন যে, উহাঁর কন্যা এলিস্ একজন বড় কুলীনের ঘরে বিবাহিতা হইয়া অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন তিন চারিটী ছেলের মা হইয়াও একটী মাত্র বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন অপর পরিচারিকা রাখিতে পারেন নাই? একটি দুগ্ধবতী গাভী রাখিতে পারিলে তাঁহার ছেলেগুলির পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ যুটিত, তাঁহার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। রাজ-কুমারী এলিস্ স্বহস্তেই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ যে তিনিই দুঃখিনী হইয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ করিতেন, তাহা নহে। ইউরোপখণ্ডের সকল দেশের কি গৃহস্থ, কি বড় মানুষ, সকল ঘরের স্ত্রীলোকেরাই স্ব স্ব হস্তে এবং স্ব স্ব শরীরের বল প্রয়োগে আপনাপন গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। উহাঁদের দাস দাসীর সংখ্যা তত অধিক নয়, এবং এখনও ঘর ঝাঁইট প্রভৃতি গৃহকার্য্যগুলি বাষ্পীয় যন্ত্র-যোগে সম্পন্ন হয় না।

ইংরাজদিগের দেখাদেখি বাহ্য আড়ম্বর এবং চৈক্কণ্যের প্রতি লালসা হওয়ায়, ইংরাজদিগের স্বদেশের ব্যবহার কিরূপ তাহা অপরিজ্ঞাত থাকায়, ইংরাজদিগের গৃহকার্য্যের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা না জানায়, আর ইংরাজ-দিগের মৌখিক সাম্যবাদে উন্মত্ত হওয়ায়, আমাদিগের অপরাপর যে সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহার ত ইয়ত্তা নাই—গৃহাভ্যন্তরে বড়ই বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে। ছেলেরা ইংরাজি শিখিয়া সাহেব হইলেন। মেয়েরা ইংরাজি না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল। যে বাটিতে মাসে একশত টাকা আসিল, সে বাটির স্ত্রীলোকেরা আর ভাত রান্ধেন, ঘর ঝাঁইট দেয় না, বিছানা

শুকায় না তোলে না, পাতে না, বাটনা বাটে না, কুটনা কুটে মাত্র আর সব কাজ চাকর চাকরাণীতে করে—উহাঁরা বহি পড়েন, কার্পেট বুনেন তাস খেলেন! ফল কি হয়? গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া খারাপ হয় শরীর মাটী হইয়া যায়—যে সকল সন্তান প্রসূত হয় তাহারা ক্ষুদাকার, স্বল্পবল, রুগ্নদেহ হইয়া জন্মে, সর্ব্বদাই পীড়িত হয়, স্বল্পায়ুঃ হইয়া থাকে, অথবা অকালেই চলিয়া যায়।

দেশে অনেক রকম সংস্কারের আন্দোলন হইতেছে, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার উল্লেখ ত সর্ব্বদাই হইতেছে—কিন্তু অযথা অনুকরণজাত এই সমূহ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের যে মহতী শিক্ষাটুকু ছিল, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না কখন যে শুনিতে পাওয়া যাইবে তাহা বলিয়াও বোধ হয় না। তবে যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছেন, যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজ পরিবারের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিয়া থাকেন এবং এদেশে সেই বিবরণ প্রচলিত করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধি হওয়াতে কতকটা উপকার দর্শিতে পারে। যতদিন তাহা না হইতেছে এবং ইংরাজের যথাযথ অনুকরণের পথ প্রকাশ না হইতেছে, অন্ততঃ সেই পর্য্যন্ত একটু স্থির থাকিয়া গৃহকার্য্যের পূর্ব্ব প্রচলিত দেশীয় ব্যবস্থাগুলি রক্ষা করাই বিধেয়। এখনকার দিনে সেই ব্যবস্থা রক্ষার এবং প্রণালীয়নের জন্য যে সকল সদুপায় করা যাইতে পারে নিম্নে তাহারই কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) গৃহকর্ত্তা যদি বৃদ্ধ না হয়েন, তবে প্রতিদিন স্বহস্তে কতকটা গৃহ-কার্য্য করিবেন।

(২) বাটীতে ছুতার এবং রাজমিস্ত্রির অত্যাবশ্যক দুই চারিটী যন্ত্র থাকিবে। গৃহোপকরণের এবং গৃহের ছোট খাট মেরামতগুলি, বাটীর প্রৌঢ় পুরুষেরা স্ব স্ব হস্তেই সম্পন্ন করিতে শিখিবেন এবং করিবেন।

(৩) গৃহ কার্য্যের পরিমাণ বুঝিয়া ঐ কার্য্যের কতকটা, বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে বিভাজিত করিয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ যদি বাটীতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প এবং খাবার লোকের সংখ্যা অধিক হয়, তবে বেতনগ্রাহী

পাচককে পাক কার্য্যের ভার দিবার প্রয়োজন হইবে বটে, কিন্তু তথাপি কতকটা কাজ বাটীর স্ত্রীলোকদিগের হাতেই থাকিবে। স্ত্রীলোকেরা ঘর ঝাঁইট, বাটনাবাটা, বাসন মাজা প্রভৃতি সকল কাজই কিছু কিছু করিবেন। চাকর চাকরাণীর সংখ্যা বাড়াইবে না—স্ত্রীলোকেরা যতটুকু পারেন না, কেবল সেই টুকু করিবার জন্য বেতনগ্রাহী লোক থাকিবে।

(৪) প্রত্যেক বেতনগ্রাহীর কাজ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; যদি সেই নির্দ্দিষ্ট কাজ অপেক্ষা কাহাকেও কিছু অধিক বা বিশেষ ফরমাইস করিতে হয়, তাহা গৃহকর্ত্রী ভিন্ন অপর কোন স্ত্রী পুরুষ কেহই করিতে পারিবেন না।

(৫) বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া গৃহকর্ত্রীর ভার। তিনি উহাদিগের শরীরের অবস্থা এবং বয়স বিবেচনা করিয়া কার্য্যের ভার দিবেন এবং যত দূর পারেন একই কাজ একজনকে নিত্য দিবেন না।

(৬) গৃহকর্ত্রীর নিজের কাজ—সব। তিনি গোয়াল ঘরে গিয়া দেখিলেন, গাভী গোবরের উপর দাঁড়াইয়া আছে। অমনি স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া লইবেন। ঠাকুর ঘরে গিয়া দেখিলেন শ্বেত চন্দন ঘষা হইয়াছে, রক্তচন্দন ঘষা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ স্বয়ং রক্তচন্দন ঘষিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিবেন। তিনি বাটনার কাছে গিয়া হরিদ্রাবাটা একটু হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, বেশ বাটা হয় নাই একটু খিচ আছে। অমনি স্বয়ং বসিয়া বাটিয়া দিবেন। কুটনার কাছে গিয়া দেখিলেন, আলুগুলা বড় ডাগর ডাগর হইয়াছে, ঝোলের যোগ্য হইয়াছে, ডালনার যোগ্য হয় নাই। তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে খানকতক কুটিয়া দেখাইয়া দিবেন। পাকগৃহে গিয়া দেখিবেন, দুই তিনটা ব্যঞ্জন চড়িয়াছে—একটা উনানে কিছুই চড়ে নাই। সেটীতে একটা ব্যঞ্জন স্বয়ং রাঁধিবেন। সব ঘরে বেড়াইবেন—যে ঘর সুপরিষ্কৃত হয় নাই, যাহার বিছানা বালিস নোঙরা, অমনি তাহাকে ডাকিয়া যথোচিত আদেশ প্রদান করিবেন। কর্ত্তা গৃহকর্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তাহার মধ্যে কার্পেট বুনা, হার্ম্মোনিয়ম বাজান, বহি পড়ার এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পড়াইবারও সময় নিরূপিত থাকিবে।

(৭) অন্তর্বাটীর ভোজনে বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পরিবেশন করিবেন, এবং গৃহস্বামিনী স্বয়ং অথবা স্থলবিশেষে অপর কেহ কথা-প্রসঙ্গে বলিবেন কে কোন্ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছে।

(৮) গৃহিণী দেখিবেন যেন খাওয়া হইয়া গেলেই স্থান পরিষ্কৃত হয়, পাতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহা লইয়া কাকে ডবাডবি না করে, এবং যাহারা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে তাহারা উহা লইয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য একটী কথা আছে। আমি যে ভাবে গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি, সে ভাবে চলিতে গেলে একটী দূরদর্শী শাসন কর্ত্তার ন্যায় কিছু কঠোর হইয়া চলিতে হয়। তোমার অর্থাগম এরূপ যে, তুমি বিনা ক্লেশে দুই চারিটী অধিক চাকর চাকরাণী এবং দুই একটী অতিরিক্ত পাচক পাচিকা রাখিতে পার। হয় ত, তোমার ঘোড়া গাড়ী আছে, তাহাতে সহিস, কোচম্যান, ঘেষেড়া প্রভৃতি বেতনভোগী নিযুক্ত রহিয়াছে। এ সকল সত্ত্বেও বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করাইলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। সেই অসন্তোষ নিবারণের উপায়, তাঁহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াই হইতে পারে, কতকটা তুমি নিজে কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কাজ নিয়ত নির্ব্বাহ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও হইতে পারে, কতকটা বেতনভোগীর সংখ্যা অল্প করাতে যে টাকা বাঁচিবে সেই টাকা ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে ব্যয় করিলে হইতে পারে, আর কতকটা ঐ টাকা হইতে উহাদিগের অলঙ্কারাদি পুরস্কার প্রদানের দ্বারাও হইতে পারে। সকল বাটীতে ইহার সকল উপায় খাটিবে না। যে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের যেমন শীল এবং শিক্ষা, সে বাটীতে ইহার কোন উপায় অধিক, কোনটী অল্প কার্য্যকারী হইবে, এবং কোনটি বা অকিঞ্চিৎকর হইবে। শেষের উপায়টি সর্ব্বনিকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার একটী গুণ আছে—উহা অতি সত্বরে প্রতিবেশিনীদিগের মনে লাগিবে এবং তাহা হইলে তাঁহাদিগের বাটীতেও তোমার বাটীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

—•(০)•—

অষ্টত্রিংশ প্রবন্ধ।

কাজ করা।

অনেক কালের কথা মনে হইল—আমার সমাধ্যায়ী কোন ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন—"ও হে! যদি সত্য সত্যই ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে চাও, তবে, আমি যেমন করিয়াছি তেমনি কর—ইংরাজি পড়, ইংরাজি লেখ, ইংরাজিতে কথা কহ, ইংরাজিতে চিন্তা কর এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতেও শিখ।" যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তিনি, আমরা যে শ্রেণীতে পড়িতাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। আমি ইংরাজি বহি পড়িতাম এবং ইংরাজিতেই পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহার সহিত, ইংরাজিতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজিতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত কখনই চেষ্টা করি নাই—প্রত্যুত যদি চিন্তাকালীন পাপড়ি ভাঙ্গা ইংরাজি গৎ মনে হইতেছে জানিতে পারিতাম—তৎক্ষণাৎ নিজ মাতৃভাষায় সেই ভাবগুলির পুনরালোচনা করিয়া বুঝিতাম, ভাবগুলি যথাযথ কি না। এইরূপ করায় ইংরাজিতে চিন্তা করা এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখা আমার ভাগ্যে কখনই ঘটে নাই।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজকর্ম্ম ইংরাজিতেই করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে চিন্তন অভ্যাস না করায় ইংরাজি লেখায় আমার বড়ই কষ্টানুভব হইত, এবং যাহা ইংরাজিতে লিখিলাম তাহা বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহাতে অনর্থক শব্দবিন্যাস রহিল কি না, কোন কথা যেরূপে লিখিলাম সেই কথা তদপেক্ষা সংক্ষেপে এবং বিশদরূপে লেখা যায় কি না, এই সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিতে হইত—সুতরাং ইংরাজি লেখা আমার তেমন শীঘ্র সরিত না। অন্যে, এমন কি আমা হইতে যাঁহারা অল্প ইংরাজি জানেন তাঁহারাও যত শীঘ্র ইংরাজি লিখিয়া যাইতে পারেন, আমি কখনই তাহা পারি নাই। ইংরাজি লিখিতে আমার বিলম্ব হয়, এবং কাগজে অনেক কাট কুট হয়।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজ কর্ম্মই ইংরাজীতে করিতে হইয়াছে, অনেক বড় বড় চিঠি এবং রিপোর্ট ইংরাজিতে লিখিতে হইয়াছে, প্রতিদিন গড়ে ৫০।৬০ খানি পত্রের জবাব ইংরাজীতে দিতে হইয়াছে, এবং অন্যের লিখিত ইংরাজির দোষ সংশোধন করিয়া অনেক স্থলেই লইতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শীঘ্র শীঘ্র ইংরাজী লিখিতে পারি না। ইংরাজিতে চিন্তা করিবার অনভ্যাস রূপ মহৎ অন্তরায় সত্ত্বেও যেমনরূপে ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম, এবং ঐ সকল কাজ ভাল করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা লাভও করিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে অপর একটী কথা বলিয়া রাখি। আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যিনি যখন আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, যতই কেন কাজ হাতে থাকুক না, আমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহাদের সহিত বসিয়া বাক্যালাপ করিতাম। অনেক কাজ পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্কতা বা চাঞ্চল্যপ্রদর্শন করিতাম না। তাঁহাদের কাহাকেও পাইলে কাজ কর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া গিয়া আলাপ করিতাম। তাঁহারা জানিতেন, এত কাজ থাকিতেও যে ওরূপে সময়াতিপাত করিতে পারি তাহার কারণ কার্য্যে লঘুহস্ততা।

ফলকথা, তাহা নহে। আদৌ কোন বিষয়েই আমার ক্ষিপ্রকারিতা গুণ নাই। ক্রমে বহুকালের অভ্যাস বশতঃ কোন কোন বিষয়ে একটু লঘুহস্ততা জন্মিয়াছে বটে—কিন্তু সে সামান্য বিষয়ে এবং অতি সামান্য মাত্রায়, এবং ইংরাজি লেখায় কিছুমাত্র নহে।

তবে ইংরাজিতে এত কাজ কেমন করিয়া করিতাম? কাজে অনেক সময় দিতাম। এত সময় কোথা হইতে পাইতাম? এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথাও বলিবার পূর্ব্বে আর কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি। আমি কাজ কর্ম্মে বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। আমি কখনই মনে করিতাম না যে পরের কাজ করিতেছি। যাহা করিতেছি, তাহা আপনারই কাজ। কৈফিয়ৎ দিতে হইলে পাছে পরের কাজ বোধ হইয়া যায় এবং আনন্দের ত্রুটি হয়, এইজন্য যাহাতে কৈফিয়ৎ দিতে না হয়, এমন করিয়াই

কাজ করিতাম। ইংরাজ মনিবের কাছে কাজ করিয়া মনের এই ভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। উহাঁরা প্রায়ই দেশীয় লোকের মনের তাদৃশ ভাব রক্ষা করিতে দেন না। এতই মনিবানা ফলান যে, কাজটী তাঁহাদিগের, আমরা তাঁহাদিগেরই অনুজ্ঞাপালক চাকর মাত্র, এই ভাবটী ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঐ বিষয়ে সাবধান হইতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই হউক, অথবা শুভাদৃষ্ট বশতঃই হউক, আমি কখন ঐরূপ দুর্ভাগ্যে পড়ি নাই। আমার কাজ চিরকালই আমার নিজের কাজ এবং স্বদেশের কাজ ছিল।

আর একটী কথা এই। বাল্যাবধি আমার সংস্কার যে, ভোগে প্রকৃত সুখ নাই কর্ম্ম সম্পাদন করাতেই সুখ। কেমন করিয়া এই সংস্কার হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র মনে পড়ে, পিতৃঠাকুর আমার পঠদ্দশায় সর্ব্বদা বলিতেন "ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ" আর আমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর, দীক্ষাগ্রহণ হইলে প্রতি প্রত্যূষে অন্ততঃ একবার করিয়া শুনাইতেন "যৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং" আমার দৃঢ় বিশ্বাসও তাই, একাগ্রচিত্তে কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত পরিশ্রম করাই প্রকৃত পূজা। এখন কাজ করিবার নিমিত্ত আমার সময় সংগ্রহ কিরূপে হইত তাহা বলি।

(১) আমি দ্রব্যাদি সমস্ত এবং কাগজ পত্রাদি বেশ গুছাইয়া রাখিতে জানি—কাগজটী, কলমটী, কালির দোয়াতটী এবং যে সকল পত্রের উত্তর লিখিতে হইবে, সে গুলি যথাস্থানেই থাকে—ও গুলি খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার সময় যায় না।

(২) আমি ইংরাজি পুস্তকাদিতে যাহা যাহা পড়িতাম, মনে মনে তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদ না করিয়া ছাড়িতাম না। সুতরাং কোন্ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করা বিধেয়, তাহার অনেকটা আমার স্থির থাকিত। অভিমতি স্থির করিবার নিমিত্ত আমার অল্প সময়ই যাইত। কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন, ইংরাজী বহিগুলিতে এত শব্দের আধিক্য এবং পৌনরুক্তের বাহুল্য যে, মাতৃভাষায় তাহাদিগের মানসিক অনুবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে একবার ঝাড়িয়া না লইলে তুঁষের ভাগ অধিক এবং তণ্ডুলের

ভাগ নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। ফলতঃ মাতৃভাষায় অনুবাদরূপ সূর্প দ্বারা ইংরাজি গ্রন্থগুলিকে ঝাড়িয়া লইবার পরামর্শ আমি সকল ইংরাজী পাঠককেই দিতেছি।

(৩) আমি কখনই ইংরাজির শব্দবিন্যাস-পারিপাট্য লিখিবার জন্য ভাল ভাল ইংরাজী শব্দ বা ইংরাজি গৎ অভ্যাস করি নাই। ইহাতে উপকার কি অনুপকার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তবে ইংরাজি শব্দবিন্যাসের উপর কিছুমাত্র নেসা না থাকায় কাজের সময়, অর্থাৎ পত্রাদি লিখিবার সময়, শব্দ খুঁজিতে আমার অল্প সময়ই যাইত, এ কথা বলিতে পারি।

উপরের (২) এবং (৩) চিহ্নিত কথাগুলির দ্বারা আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিষয়ে কি বলিতে বা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া লওয়ার পক্ষে অভ্যস্ত ইংরাজি শব্দ এবং ইংরাজি গৎরূপ যে বিষম অন্তরায় আছে আমার সে অন্তরায় ছিল না, এবং সেই জন্য মতলব স্থির করিতে অল্প সময়ই যাইত। কেমন করিয়া মতলবটী প্রকাশ করিব—ইহা লইয়াই যত কষ্ট এবং যত মারামারি। সেই মারামারি করিবার সময়, অনেকটা নিদ্রা হইতে কতকটা ভোজন হইতে এবং এক আধটুকু পরিজনদিগের সহিত আলাপের কাল হইতে, সংগ্রহ করিতাম। তদ্ভিন্ন, আমাকে ত ঘরের কোন খুঁটি নাটি লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, সে জন্যও অনেকটা সময় পাইতাম। এইরূপে সময়ের সংগ্রহ করিয়া ধীরে সুস্থে বসিয়া আস্তে আস্তে ইংরাজী লিখিতাম—কি লিখিতাম তাহা মনে মনে আর একজন হইয়া, প্রায়ই নিজের প্রতিপক্ষ পক্ষ হইয়া, পড়িতাম। সেই কল্পিত প্রতিপক্ষের চক্ষু দিয়া ভুল ধরিতাম—আপনার চক্ষু দিয়া ভুল সুধরাইতাম—যথেষ্ট কাটকুট হইত—কোন কোন পত্রাদি ফিরাইয়া ফিরাইয়া দুই তিন বার করিয়া লিখিতে হইত।

একবার কোন সুদূর স্থানে গিয়াছিলাম। বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি কাগজপত্র জমা হইয়া আছে। ওমনি কাগজগুলি লইয়া বসিলাম। পড়িতে পড়িতে যেগুলির জবাব তদ্দণ্ডে দেওয়া যাইতে পারে বোধ হইল, সেগুলির একটী স্বতন্ত্র তাড়া করিলাম, যেগুলির উত্তর বিশেষ

ভাবিয়া অথবা অন্য কাগজ পত্র দেখিয়া দিতে হইবে বোধ হইল, তাহার দ্বিতীয় তাড়াবন্দি করিলাম। প্রথম গুলির উত্তর লিখিলাম। যতক্ষণ সে কাজটী শেষ না হইল, ততক্ষণ উঠিলাম না। "অনেক বেলা হইয়াছে —খাওয়া দাওয়ার পর কাগজ পত্র লইয়া বসিলেই ভাল হয়।" "তা ত হয় কিন্তু ঐ কাগজের মোট বিদায় না হইলে ত খাইতে বসিয়াও কোন সুখ হইবে না"—বাটীর ভিতরে এরূপ কথোপকথন প্রায়ই শুনিতে পাইতাম।

"আজি বিকালে অমুকের আসিবার সম্ভাবনা আছে; কতকটা কাজ বাকি রহিয়াছে, না সারিয়া রাখিলে কথোপকথনের সুখোপভোগ হইবে না; তোমারও যদি কোন কাজ বাকি থাকে তাহা এই সময়ে সারিয়া লও।" * * "রাত দুপুরে বসে ও কি হচ্চে?—খাওয়া নাই, ঘুম নাই—অসুখ করিবে।" "না অসুখ হবে না, আমি ত একবার ঘুমাইয়াছিলাম। আর এইটা না লিখিলেই নয়—কালি না পাঠাইতে পারিলে"—"কি হবে?" "একটু বাহাদুরির ত্রুটি"—"হউক গে"! সে রাত্রিতে কিছুই লেখা হইল না সত্য, কিন্তু অন্যান্য রাত্রিতে হইত।

—:*::*:—

উনচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

——(*)——

একান্নবর্ত্তিতা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং বিহার প্রদেশে মিতাক্ষরানুযায়ী এবং বাঙ্গালায় দায়ভাগানুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত। মিতাক্ষরায় এবং দায়ভাগে একটী অতি গুরুতর বিষয় লইয়াই মতভেদ আছে। মিতাক্ষরায় পৈতৃক ধন সম্পত্তিতে জাতাজাত সমস্ত সন্তান সন্ততির এক এক প্রকার স্বত্ব স্বীকৃত হয়। দায়ভাগে ওরূপ স্বত্ব স্বীকৃত হয় না—দায়ভাগের মতে ধনসম্পত্তিতে পিতারই নির্ব্যূঢ় স্বত্ব—তিনি স্বেচ্ছাতঃ উহার দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ব্যবহারিক স্মৃতিশাস্ত্র দুইটীতে এরূপ প্রভেদ কি জন্য জন্মিয়াছে, তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত কোন একটী মীমাংসা করিতে পারা যায় না। তবে মোটামুটি এরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাণিজ্যবৃত্তির বাহুল্যে ধন সম্পত্তির বিভাগানুকূল ব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে, এবং বাঙ্গালা প্রদেশে সুনব্যা নদী সকলের প্রাচুর্য্যবশতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং বেহার প্রদেশ অপেক্ষায় এখানে বহুকাল হইতে বণিক্‌-বৃত্তির অধিক সুবিধা এবং প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিয়াছে। আজি কালি এ দেশের সমস্ত ব্যবসায় ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হইয়া গেলেও; ও সকল প্রদেশের অপেক্ষা বাঙ্গালায় বণিকবৃত্ত পরায়ণ দেশীয় লোকের সংখ্যা অধিক। এই তথ্যের সহিত আমাদিগের দায়ভাগের ব্যবস্থার, কার্য্য-কারণরূপ কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে বাঙ্গালীর ব্যবস্থাশাস্ত্র ঐরূপ হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের সুবিধা হইয়াছে এবং তাহা হওয়াতে ভাই ভাই পৃথগন্ন হইবারও প্রথা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে অধিক প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যেও পৃথগন্ন হওয়ায় যে লোক-নিন্দা না হয় এমত নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে এবং বিহারে উহার যত নিন্দা এবং অন্তরায়, বাঙ্গালায় তত নয়। বস্তুতঃ দায়ভাগকার মনুসংহিতার একটী বচন * ধরিয়া অতি স্পষ্টাক্ষরেই

---

* এবং সহবসেযুর্ব্বা পৃথগ বা ধর্ম্মকাম্যয়া।
পৃথগ বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক ক্রিয়া॥

পৃথগন্ন হইয়া থাকিবার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রদেশীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এই একপ্রকার প্রশংসারূপ উত্তেজনা সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা পৃথগন্ন হইতে ইচ্ছা করেন না, এবং পৃথগন্নবর্ত্তী পরিবারের নিন্দা করিয়া থাকেন। এরূপ হইবার কারণ—আর যাহাই থাকুক, এতদ্দেশীয় জনগণের দারিদ্র্য দশা যে একটী তাহার মধ্যে মুখ্য, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ হয় না। যদি বাঙ্গালীদের প্রতি পরিবারে একজনমাত্র কৃতী এবং উপায়ক্ষম না হইয়া অনেকেই কৃতী এবং উপায়ক্ষম হইত, তাহাহইলে পৃথগন্ন হইয়া থাকিতে কষ্ট অল্প হইত; দায়ভাগকার যেরূপ কহিয়াছেন সেরূপ ধর্ম্ম্য কার্য্যেরও আধিক্য হইত, এবং পৃথগন্নবর্ত্তিতা, পরিবারের সম্পত্তিশালিতা এবং বলবত্তার পরিচায়ক বলিয়া নিন্দনীয় না হইয়া বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ পৈতৃক ধনবিভাগের সৌকর্য্য, সকল ভাইগুলির কিছু কিছু উপার্জ্জনক্ষমতা, তাঁহাদিগের পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার অধিকার—এগুলি দেশের মঙ্গল এবং উন্নতির পক্ষে অতীব প্রার্থনীয়। এই সকল ভাবিয়া আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকে পৃথগন্নবর্ত্তিতার নিন্দা না করিয়া বরং তাহার প্রশংসাই করিতে শিখে।

কিন্তু একান্নবর্ত্তিতারও অনেকটা গুণ আছে। কৃষিপ্রধান দেশে এবং দরিদ্রতার বাহুল্যে যে, একান্নবর্ত্তিতার একান্ত প্রয়োজন এবং অবশ্যম্ভাবিতা আছে, সে কথার কোন উল্লেখ না করিয়াও, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অনেকানেক ধর্ম্মভাবের বিশেষ উন্মেষ এবং সংরক্ষণ হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রধানের নিকট বশ্যতা অতি বড় গুণ। ইহা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষিত হয়। পরার্থে নিজের উপার্জ্জিত ধনাংশের নিয়োগে যে স্বার্থসঙ্কোচের অভ্যাস হয়, সেটীও সামান্য গুণ নহে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে এই গুণটীরও অভ্যাস হয়। ফলতঃ বশ্যতা, ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি অনেকানেক মূল ধর্ম্মের শিক্ষা একান্নবর্ত্তিতার ফল, এবং ঐ সকল ফল জন্মে বলিয়াই আমাদিগের দেশে উহার একটা প্রশংসা হইয়া আসিয়াছে।

ঐ প্রশংসার অভ্যন্তরে আরও একটী প্রবল কারণ থাকিতে পারে। এ দেশে পরিবার সমস্ত একান্নবর্ত্তী বলিয়া লাইফ ইনস্যুরান্স বা জীবন-

বীমার প্রয়োজন নাই। 'পুয়র ল' বা দরিদ্র পালন আইনেরও আবশ্যকতা হয় নাই। অথবা এরূপেও বলা যায় যে ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত ঐ সকল ব্যবস্থার অভাবে এদেশে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার না থাকিত তবে দুঃখ কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। পরিবার সমস্তের একান্নবর্ত্তিতা এদেশে উল্লিখিত ব্যবস্থা সকলের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সংসাধিত করিয়া দেয়।

তবেই দেখা গেল যে, পৃথগন্নবর্ত্তিতার শুভ ফল কতকগুলি এবং একান্নবর্ত্তিতারও শুভ ফল অপর কতকগুলি। উভয় প্রকার শুভ ফলের একত্র সমাবেশ করিতে পারিলেই ভাল হয়। এবং আমার বোধে যদি বিজাতীয় রীতি নীতির প্রাদুর্ভাব বশতঃ আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্মভাবের ত্রুটি না হয়, তবে উল্লিখিত দ্বিবিধ শুভ ফলের একত্র সমাবেশ হইতে পারে। বিশেষতঃ যখন দেশ এত দরিদ্র এবং দেশের জনগণও একান্নবর্ত্তিতার পক্ষপাতী তখন জাতীয় ধর্ম্মভাবের সংরক্ষণপূর্ব্বক একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকাই বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। যেরূপে একান্নবর্ত্তিতা রক্ষা করা যাইতে পারে, এবং তাহার অশুভ ফল অধিক পরিমাণে প্রসূত না হইয়া শুভ ফলই অধিক হয়, তাহার উপায়—

প্রথমতঃ—সুস্থকায় ব্যক্তিমাত্রেরই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা উচিত। একজনকে অপর একজনের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে নাই।

দ্বিতীয়তঃ—আপনাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বাটীর কর্ত্তা করিয়া মান্য করা এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী হইয়া চলা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—যাহা কর্ত্তৃক যাহা উপার্জ্জিত হইবে, তৎ সমুদায় কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ—কর্ত্তার উচিত (১) সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা। (২) খরচ পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখা। (৩) সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হওয়া।

এই নিয়মগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালিত হইলেই ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে কাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে আরও একটী নিয়ম রক্ষা করিলেই হয়। সে নিয়মটী—

পঞ্চমতঃ—পারিবারিক সমস্ত ব্যয় সমাধা করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে,

তাহা আয়ের অনুসারে ভ্রাতৃগণের নিজ নিজ বিশেষ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রাম, হরি এবং কৃষ্ণ তিন ভাই—রামের বার্ষিক আয় ৩ হাজার, হরির ৪ হাজার এবং কৃষ্ণের ২ হাজার, সর্ব্বশুদ্ধ ৯ হাজার। ইহাদিগের বাটীর বার্ষিক ব্যয় ৪ হাজার, সুতরাং ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ৫ হাজার। ঐ পাঁচ হাজারের মধ্যে—

(১) ৯: ৫:: ৩: $১\frac{৬}{৯}$ = $১\frac{২}{৩}$ হাজার, রামের নিজ সম্পত্তি।

(২) ৯: ৫:: ৪: $২\frac{৭}{৯}$ = $২\frac{৪}{৯}$ হাজার, হরির নিজ সম্পত্তি।

(৩) ৯: ৫:: ২: $১\frac{৭}{৯}$ হাজার, কৃষ্ণের নিজ সম্পত্তি।

যে পরিবারে আর্য্যধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি মর্য্যাদা অধিক, সে পরিবারে উল্লিখিত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলেই সকল দিক বজায় থাকিবে—একান্নবর্ত্তিতার সমস্ত শুভফল ফলিবে, এবং পরবর্ত্তী পুরুষদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের স্থল অল্প হইবে।

কিন্তু একটী কথা আছে। এটী ধর্ম্মবৃদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থা। ইহাকে সম্যক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে অপর একটী বিষয়ে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কোন ভাইয়ের উচিত নয় যে, আপনার আয় অন্যাপেক্ষায় নিতান্ত ন্যূন থাকিতে আপনার পরিবারের (স্ত্রী সন্তানাদির) সংখ্যা সম্বর্দ্ধিত অথবা নিজ খরচ পত্রের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেন। তাহা করিতে গেলেই তিনি নিজ ভার অন্যের উপর ক্ষেপণ করিয়া গলগ্রাহিতা দোষেই দূষিত হইলেন।

"আমাদের এই দরিদ্র দেশে কোন ব্যক্তিরই কুড়ে, অকর্ম্মণ্য এবং উপার্জ্জনে অক্ষম হওয়া উচিত নহে।" * * * "তবে যদি কেহ টাকা রোজগার করিতে না পারে সে কি মারা যাইবে?" * * * "তার মারা পড়িয়া কাজ নাই—কিন্তু সন্তানাদি উৎপন্ন করিয়া অন্যের বোঝা ভারি করায় তাহার অধিকার নাই।—ভিখারীকে ব্রহ্মচারী হইতে হয়।" * * * "তাই মনে করিয়াই কি যত দিন চাকরী না হইয়াছিল নিজ হাতে কাঠ-চেলা করিতে আর বাহিরে থাকিতে?" * * * "হতে পারে যে এমনি একটা কিছু মনে উঠিয়াছিল।"

———(*)———

চত্বারিংশ প্রবন্ধ।

অর্থ সঞ্চয়।

আমাদিগের দেশ বড়ই দরিদ্র। ইহা যে কত দরিদ্র, তাহা অনেকেই মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারেন না। 'ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে' 'দেশের উন্নতি হইতেছে'—ইংরাজদিগের এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া কৃতবিদ্যেরা শুক পক্ষীর ন্যায় ঐ শব্দগুলির উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছেন। 'ঊনবিংশ শতাব্দী'ও ইংরাজের—'উন্নতি' ও ইংরাজের; ঐ সকল উক্তির সহিত তোমার আমার কোন সম্পর্ক নাই। যত কাল যায় সকল জাতীয়েরই উন্নতি হয়, ইতিহাস এমন কথা বলে না। যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালকের দেহ পুষ্ট হইতে থাকে বটে, কিন্তু বর্ষীয়ান্‌দিগের তাহা হয় না—তেমনি ইংরাজের উন্নতি ঊনবিংশশতাব্দীতে হইতেছে বলিয়া আমাদিগেরও সে উন্নতি হইতেছে না—আমাদের অবনতিই হইতেছে।

সমাজের অবনতির চিহ্ন অনেকগুলি *—এবং সকলগুলিই দারিদ্র্যের সূচক, অতএব এক দারিদ্র্যকেই অবনতির লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৮৮০ অব্দে ব্রিটন দ্বীপে প্রতি ব্যক্তির গড়ে বার্ষিক আয় ৩৩০, ফ্রান্সে ২৯০, পোর্টুগালে ৮০, তুরস্কে ৪০, এবং ভারতবর্ষে ২৭ টাকা বই নয়। ঐ সকল দেশের মধ্যে কোনটার সম্বন্ধেই এমন কথা কেহ বলেন না যে, সেখানকার লোকেরা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, এখানকার পাঁচ কোটী লোক, অর্থাৎ সমস্ত জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে।

এই বুভুক্ষাপীড়িত নিরন্ন দেশে দানধর্ম্মের বড়ই সমাদর। এখানকার লোকেরা যেন শুষ্ককণ্ঠ চাতকপক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বিন্দুপাতের প্রত্যাশা করিয়া থাকে এবং কথঞ্চিৎ কোথা হইতে কণামাত্র প্রাপ্ত হইলেই

---

* জন্মসংস্কার বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণঃ।
হ্রাস দর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাং॥

আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠে। এ দেশে দান ধর্ম্মের যে এতটা প্রশংসা, তাহার কতকটা ঐ চাতক পক্ষীদের সহর্ষ কল কল ধ্বনি।

কিন্তু সকলটা তাহাই নয়। এতদ্দেশীয় জনগণের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবও ঐ প্রশংসার কতক কারণ। এদেশের লোকের হৃদয়ে পরকালে শ্রদ্ধা এত দৃঢ় যে, ইহাঁরা ইহলৌকিক কার্য্যকলাপকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরই জ্ঞান করিয়া থাকেন। পৃথিবী ত চিরকালের বাসভূমি নয়—সাংসারিক সুখ দুখ ত অধিক কাল স্থায়ী হয় না—অতএব পার্থিব বিভব সঞ্চয় করিতে গিয়া অনর্থ কষ্ট পাইবার আবশ্যক কি; যদি কাহারও দান করিবার ক্ষমতা হইয়া থাকে, সে হাতের সুখে এবং মনের আনন্দে দান করিয়া লউক; লোকে যশ গাহিবে, পরকালেও দিব্য গতি হইবে; যকের ন্যায় টাকার পুটুলি চৌকী দিয়া কি জন্য থাকিব? চক্ষু মুদিলে ত কেহ কাহার নয়—কোথায় বা পুত্র—কোথায় বা কলত্র!

তবে কি আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ মমতা অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা ন্যূন? তাহা ত কোন ক্রমেই নহে। তবে সেই স্নেহ মমতা বিবেচনার দোষে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকারী হইতে পায় না। যেমন "লাইফ ইনস্যুর" করা থাকিলে, কাহার কাহার মিতব্যয়িতা কমিয়া যায়, সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে বাসনিবন্ধন আমাদিগেরও এক প্রকার "লাইফ ইনস্যুর" হইয়া থাকে, এবং আমরা খরচপত্রের তত আঁটা আঁটি করিয়া চলিতে শিখি না। যদি মরে যাই, রোজগারী দাদা অথবা ভাই আছেন, অবশ্যই আমার কন্যাদের বিবাহ, আমার পুত্রদিগের শিক্ষা এবং আমার পরিবারের ভাত কাপড় দিবেন। এই ভাবটী কোথাও পরিস্ফুট, কোথাও অপরিস্ফুটরূপে আমাদিগের অনেকেরই মনে থাকে। এই জন্য কন্যা পুত্র কলত্রাদির প্রতি সমূহ স্নেহবান্ হইয়াও এতদ্দেশীয় জনগণের পক্ষে সঞ্চয়শীলতা অপেক্ষা ব্যয়শীলতাই সমধিক প্রশংসার বস্তু হইয়াছে। সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থাতে স্ত্রী পুত্রাদির মোটা ভাত কাপড়ের ঠিকানা রহিল—শাস্ত্রের শাসন স্থূল দৃষ্টিতে, ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের প্রতি অধিকতর আস্থা জন্মাইয়া দিল, এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সমাজ নিরন্তর দানধর্ম্মের প্রতি উত্তেজনা করিতে লাগিল; এই সকল

কারণে আর্য্যসন্তান অপরাপর জাতি সমূহ অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয় সংযমশীল, আসব ব্যবহার বিবর্জ্জিত, শান্তস্বভাব এবং পরিণামদর্শী হইয়াও ক্রমে ক্রমে সঞ্চয়শীলতা গুণ পরিহার করিতেছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, কেহ বহু বৎসর ধরিয়া ৪।৫ শত টাকা মাহিনা পাইয়াও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য চাঁদার খাতা বাহির হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, কোন আয়বান ব্যক্তি একখানি প্রকাণ্ড বসতবাটীর কতকদূর প্রস্তুত করিয়া মৃত হইলে তাঁহার ছেলেদিগকে ঐ বাটীর ইট কাঠ বেচিয়া খাইতে হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, খুব সচ্ছল পুরুষ যাই গেলেন, অমনি দেনার দায়ে তাঁহার ঘটী, বাটী, স্ত্রীর খোঁপা বাঁধিবার দড়ি গাছিটী পর্য্যন্ত, নিলামে উঠে। এই জন্যই প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই—"অমুকের অত আয়, কিন্তু সঞ্চয় এক কড়াও নাই"—"অমুক স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াও দান করিয়া থাকেন"—"অমুক যাহা পান, তাহাই খরচ করিয়া ফেলেন—বলেন. ছেলেদের জন্য কিছু না রাখাই ভাল; ধনবানের পুত্রেরা প্রায়ই মন্দলোক এবং অকর্ম্মণ্য লোক হয়।"

আমার বিবেচনায় অমিতব্যয়িতার প্রশংসাবাদ সমাজের মঙ্গলকর নহে, যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থ ধর্ম্মের অনুকূলাচরণ নহে, এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালীর প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধের সূচক নহে।

দানধর্ম্মের প্রশংসায় যদি অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যায়, তবে দান করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই ন্যূন হইয়া যায়; আত্মসংযম, ভবিষ্যদ্দর্শন, উপায়োদ্ভাবন প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। কৃপণদিগের অনেক দুঃখ এবং অনেক দোষ ঘটে। কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী, অবিলাসী এবং বাঙ্‌নিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে খরচে লোকেরা প্রায়ই বিলাসী এবং অনেক স্থলে অনৃতবাদী হইয়া পড়ে। যে সমাজে শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন, তাহাতে কৃপণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল, খরচে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল নয়। এতদ্দেশীয় যতগুলি সমাজের কথা আমি জানি তাহার মধ্যে মাড়বারী জৈনদিগের প্রণালীই অতি

উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহারা সচরাচর অতি দীন দরিদ্রের ভাবেই থাকে—উহাদিগের স্ত্রীলোকেরাও স্বহস্তে সকল গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। উহাদিগের মধ্যে মোটা কাপড় পরিতে, জলে ভিজিতে, পায়ে চলিতে, ক্রোড়পতিরও অপমান নাই। উহারা যে ব্যবসায়ে হাত দেয়, তাহাতেই সফলতা লাভ করে। উহারা সহজে কেহ কিছু চাহিলে দেয় না। কিন্তু এমন মাড়বারী বণিক্ নাই বলিলেই হয়, যাহাঁর সহায়তাবলে আর দুই তিনটী মাড়বারী নিরন্ন দশা হইতে উত্থিত হইয়া সচ্ছল অবস্থাপন্ন না হইয়াছে। ইহাঁরা দানধর্ম্ম এবং সঞ্চয়শীলতা দুইটীকে মিলাইতে জানেন, ইহাঁদের ঘরে লক্ষ্মী পুরুষানুক্রমে থাকেন। তবে আজি কালি দেখিতে পাই যে, উহাঁদিগের মধ্যেও সংসর্গ দোষ সংক্রামিত হইয়া কোন কোন মাড়বারী বণিকের পুত্র বিলাসী, অমিতাচারী এবং লক্ষ্মীছাড়া হইতেছে।

গৃহস্থকে যে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়, এ কথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেই বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক বেকন্ বলিয়াছেন, যত আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক সঞ্চয় করিবে। ইংরাজ জাতীয়েরা খুব উন্নতিশীল। উহাদের প্রাচীন দার্শনিক যে বিধি দিয়া গিয়াছেন, নব্য ইংরাজেরা তাহা অপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। এ দেশের ম্যাজিষ্ট্রেট বা কমিশনর প্রভৃতি কোন কোন ইংরাজ এমনি সঞ্চয়শীল যে, তাঁহাদের মাসিক বেতন ২।৩ হাজার টাকা হইতে ১ শত, ১॥০ শত, —বড় জোর ২ শত মাত্র—খরচ করেন। আমি স্বদেশীয়দিগকে অতদূর করিতে বলি না। আমি স্বদেশীয়দিগকে বলি, তোমাদের শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে, তোমরা সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন * ভবিষ্যৎ কালের জন্য আয়ের সিকি রাখিবে অর্দ্ধেকে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিবে, আর এক আনা ধার দিয়া সুদে

* পাদেন তস্য পারত্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয় মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকং তথা॥
পাদস্যার্দ্ধার্দ্ধ মর্থস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এব মারভতঃ পুংস শ্চার্থঃ সাফল্য মৃচ্ছতি॥

যাড়াইবে। ভগবান মনু বলিয়াছেন, † তিন বৎসর খরচের যোগ্য অথবা এক বৎসরের যোগ্য, তিনদিনের যোগ্য, অন্ততঃ এক দিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে। বাস্তবিক সকল লোকের পক্ষে সম পরিমাণ সঞ্চয় সম্ভবে না। যে ব্যক্তির আয় প্রতি পলে ১০ টাকা (যথা ভাণ্ডারবেল্‌টের) তাহার প্রতি পলে খরচ ৫ টাকা হয় না—তাহার সঞ্চয় অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক হয়। যে কমিশনর সাহেবের বেতন ত্রিশ দিনে তিন হাজার টাকা তাঁহার দৈনিক আয় ১০০ টাকা, খরচ বড় জোর ৬।৭ টাকা মাত্র; সুতরাং সঞ্চয় অর্দ্ধেকের অনেক বেশী হয়। কিন্তু এক জন মুন্সেফ, কি ডেপুটী, কি মাষ্টার যাঁহার বেতন তিন শত টাকা, তাঁহার কাচ্চা বাচ্চা এত তাঁহার উপর জ্ঞাতি কুটুম্বের ভার এত এবং তাঁহার বাসা খরচ এবং ঘর খরচ ভুয়ে জড়িয়ে এত যে, তিনি কোনমতেই তিন শতের ভিতর হইতে দুই শত খরচ না করিয়া চালাইতে পারেন না—২০।২৫ টাকায় আমলা, মুহুরি বা মাষ্টার আপনার পরিজনের মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করিতেই বিব্রত, তিনি ঐ সামান্য আয় হইতে অর্দ্ধেক বা সিকি কেমন করিয়া বাঁচাইবেন? তাহার পর, ধর দোকানদার এবং কারিগর, ইহাদেরও আয় ১০।১৫ টাকা, তাহা হইতে খরচ পত্র করিয়া কত বাঁচাইবে?—আর যাহারা মজুরদার তাহাদিগের ত দিনের আয় হইতে দিনেই সঙ্কুলান হয় না। অতএব যত আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশ বা সিকি বাঁচাইবে, বলিয়া যে উপদেশ, তাহা জন সাধারণের প্রতি খাটে না। এই জন্যই বোধ হয়, মনুসংহিতায় ওরূপ কোন নিয়ম বলিয়া দেওয়া হয় নাই—কেহ বা তিন বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিবে; কেহ বা একদিনের আহারের উপযুক্ত সঞ্চয় করিবে। আমিও তাহাই বলি—সকলকেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে; যে দিন আনে, সে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে; যে মাসে আনে সে প্রতি মাসে, সঞ্চয় করিবে; যে বর্ষে আনে, সে প্রতি বর্ষে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় সকলকেই করিতে হইবে। আর এ একটী নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে,

† কুশূল-ধান্যকো বাস্যাৎ, কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যহৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা॥

খরচের শেষ ভাগে নয়। মনে কর, তুমি আজ দুই সের চাউল মজুরি পাইয়াছ; উহা হইতে কিছুই রাখিতে পার না, রান্না হইলে সকল ভাতগুলি ফুরাইয়া যাইতে পারে। তবু এক মুঠা চাউল ঐ কলসিটাতে রাখিয়া দাও—বাকী চাউল রন্ধন হউক। আর তুমি মাসে দশটী টাকা পাও, খরচে কুলায় না; তবু দুই আনা পয়সা কোন মহাজনের কাছে গচ্ছিতরূপে কিম্বা সেবিংবেঙ্কে রাখিয়া বাকী হইতে খরচ চালাও। এইরূপে যে যাহা রাখিতে পারিবে, তাহা আগেই রাখিয়া দিবে। আর একটী নিয়ম আছে। যাহা সঞ্চিত হইল পার্য্যমাণে তাহা ভাঙ্গিয়া খরচ করিও না। সঞ্চিত অর্থকে কদাপি নিজের মনে করিতে নাই। বাস্তবিক উটী কাহার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব নহে। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ, তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে—তুমি যাহা সঞ্চয় করিতেছ, তাহাতেও উহাদের অংশ আছে। তুমি সঞ্চয়ের ধন যদি পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন খরচ করিয়া ফেল, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে। এই জন্য ধর্ম্মশীল ব্যক্তির চক্ষে সম্মিলিত পরিবারের অবস্থা অমিতব্যয়িতার প্রতিকূলরূপেই প্রতীত হয়।

সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গৃহস্থলোকের পক্ষে নিম্নবর্ত্তী নিয়ম কয়েকটী যত্নপূর্ব্বক পালনীয়—

(১) সকলকেই কিছু সঞ্চয় করিতে হয়।

(২) সঞ্চয় করা খরচের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, খরচের পরে নয়।

(৩) সঞ্চিত ধন হইতে সহজে খরচ করিতে নাই।

(৪) যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না।

(৫) যাহা ক্রয় করিবে তাহা নগদ মূল্য দিয়া কিনিবে, ধারে কিনিবে না।

(৬) আয় ব্যয়ের একটী হিসাব নিজ হাতেই রাখিবে।

একচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

—•(০)•—

চিনিতে পারিলেন না।

আমার সমাধ্যায়িদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন বিষয় অধিক পরিমাণে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন। রাজারাম যে ইতিহাস গ্রন্থখানি একবার পড়িত, তাহার বর্ণিত ঘটনাবলীর তারিখগুলি প্রায় সকলই তাহার মনে থাকিত—মধুসূদন যে বহি পড়িত, তাহার ভাল ভাল পদবিন্যাস কখনই ভুলিত না—বঙ্কবিহারী যাহা পড়িত, তাহার যেন একখানি ছবি আপনার মনে উঠাইয়া লইত—পুস্তকের কেমন স্থানে কোন কথা আছে তাহা বেশ বলিতে পারিত, এবং কোথায় কিরূপে কোন ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল তাহাও অবিকল বর্ণন করিতে পারিত। এরূপ দেখিয়া তখন মনে করিতাম যে, যাহার যে দিকে অভিরুচি, তাহার স্মৃতিশক্তি সেই দিকে বিশেষ কার্য্যকারিণী হয়। এখনও তাই মনে করি—কিন্তু একটু ভিন্নরূপে। এখন বিভিন্ন ব্যক্তির কি জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিরুচি জন্মে, তাহারও যেন একটী কারণ দেখিতে পাই বলিয়া বোধ হয়। এখন জানিয়াছি যে, চিন্তন মননাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা যেই হউক, তাহার কারণ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কমূল হইতে স্নায়ুরূপ শাখা সমস্ত নির্গত হইয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্বরূপ পত্র পুষ্পে পরিণত হইয়া আছে। ঐ স্নায়ুরূপ শাখাগুলি যেটী যেমন পুষ্ট এবং সবল তাহার সীমান্ত দেশে বিকসিত পত্র পুষ্পরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি পুষ্ট বা সবল হয়। পক্ষান্তরে সবল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যেমন সুখের অনুভব হয়, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় তেমন সুখ বোধ হয় না। এই জন্য যাহার যে ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়ের অবলম্বনরূপ স্নায়ু প্রবল, তাহার সেই স্নায়ুর কার্য্যে সুখানুভূতি অধিক—এবং তাহাতে অভিরুচি হয়। যাহার শ্রাবণস্নায়ু ভাল, শব্দ সকল তাহার মস্তিষ্কে নীত হইয়া বিশেষ সুখকর ব্যাপার জন্মায়—যাহার দর্শন স্নায়ু উত্তম, তাহার চক্ষুতে দৃষ্ট বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে,

মস্তিষ্কে তাহার প্রতিবিম্বজাত কার্য্য বিশেষ সুখের হেতু হইয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই এইরূপ হয়। স্নায়ুগুলির পুষ্টতার ইতরবিশেষ হইবার কারণ—অধিক পরিমাণেই পৈতৃক, এবং কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষার ইতরবিশেষ। যাঁহার পিতার শ্রবণ স্নায়ু ভাল নয়, তাঁহার নিজেরও ঐ স্নায়ু ভাল না হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু তিনি যদি ঐ স্নায়ুর বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যাদি শিক্ষা করেন, তবে পৈতৃক দোষ কতক শুধরাইয়া যায়, এবং হয় ত তাঁহার পুত্র অপেক্ষাকৃত সবল শ্রবণ স্নায়ু পাইয়া জন্মগ্রহণ করে। ফলতঃ এ বিষয়ে "প্রারব্ধ" এবং পুরুষকারের" এই মর্য্যাদা নিরূপিত হইয়া আছে, এবং শিক্ষার ফল চিরস্থায়ী হইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়াতে উৎকর্ষ লাভের পথও উন্মুক্ত রহিয়াছে।

ও কথা এই পর্য্যন্ত থাকুক। সকল লোকের সকল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় স্নায়ু সমান সবল হয় না, এবং এক ব্যক্তিরও সকল ইন্দ্রিয় এবং তন্মূলক স্নায়ু সমান হয় না। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে অভিরুচি, এবং এক ব্যক্তিরও কোন এক বিষয়ে যেমন অভিরুচি অন্য বিষয়ে তেমন নয়। কিন্তু এই কারণে যে শুদ্ধ অভিরুচিরই ভেদ হয়, তাহা নহে। মজ্জিকশক্তিরও যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্কশক্তির নামই স্মৃতি। এই জন্যই দেখা যায় যে কেহ কোন বিষয় অধিক বা অল্প স্মরণ রাখিতে পারে।

চক্ষু, এবং ত্বক্ উভয় ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত কার্য্য দ্বারা দ্রব্যের আকৃতি জ্ঞান হয়। পরে শুদ্ধ চক্ষুদ্বারাও উহা হইয়া থাকে। চক্ষুস্নায়ুর মূলে যে মস্তিষ্ক ভাগ আছে, তাহার দ্বারাই আকৃতির সংস্মৃতি হইয়া থাকে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। চক্ষু চক্ষুস্নায়ু, অথবা সেই স্নায়ুর মূলস্থিত মস্তিষ্কভাগ ইহাদিগের কোন একটীতে বা দুইটীতে কিম্বা সকলগুলিতে দৌর্ব্বল্যের কোন হেতু থাকিলে দ্রব্যের আকৃতি গ্রহণ সহজে হয় না, এবং আকৃতি গ্রহণ হইয়াও তাহার ধারণা তেমন দৃঢ় হইতে পারে না।

আমার শরীরে কোথাও ঐরূপ কোন দোষ আছে বোধ হয়। দ্রব্যের আকৃতির ধারণায় আমার বিলম্ব হয় কি না, বলিতে পারি না কিন্তু;

আকৃতির স্মরণশক্তি আমার বড়ই অল্প। ছেলে বেলায় যদি কোন নূতন পথ দিয়া আমাকে কেহ লইয়া যাইত, আমি পথ চিনিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। বহুবার একটী দ্রব্য দেখিয়াও তাহার আকার প্রকার ভুলিয়া যাইতাম, কিন্তু তাহার নাম এবং তৎসম্বন্ধী কোন কথা শুনিলে সেই সকল কথা বেশ মনে থাকিত। বেশ মনে পড়িতেছে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় বাবা আমাকে লইয়া সময়ে সময়ে একটী বাগানে যাইতেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন গাছ ও তাহাদের পাতা, ফুল, ফল দেখাইয়া গাছের নাম বলিয়া দিতেন। যে নামটী একবার শুনিতাম, তাহা মনে থাকিত; কিন্তু যদি দুই প্রকার বৃক্ষের বা পত্রের বা পুষ্পের কতকটা সাদৃশ্য থাকিত, তাহা হইলেই আর ঠিকঠাক নাম বলিতে পারিতাম না, প্রায়ই গোলমাল করিয়া ফেলিতাম।

বয়স বৃদ্ধির সহিত ঐ দোষ কতকটা কমিয়া গিয়াছে, এখন আর তেমন স্থূল বিষয়ে ভুল হয় না। কিন্তু তবুও অনেক সময়ে ভুল হয় এবং তজ্জন্য বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইতে হয়। * * 'তুমি মকরের সঙ্গে একটী কথাও কহিলে না কেন? তুমি কথা কহিলে না বলিয়া ও রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।" * * "ঐ যে বসিয়াছিল, ঐ কি মকর?" * * "তা নয় ত আর কে? এই সে দিন ওর সঙ্গে অত কথা কহিলে, আজ একবারে চিনিতে পারিলে না—ওর কিন্তু বড়ই দুঃখ হবে।" * * * "ছেলেকে ছবি আঁকিতে শিখাইবার ইচ্ছা হইল কেন?"—কোন আত্মীয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলাম—"নিজের আকৃতি গ্রহণ এবং ধারণাশক্তি কম; ছেলের সেই দোষটা না হয়, এই জন্য উহাকে দুই তিন বৎসর ছবি আঁকিতে শিখাইব।" "তোমার আকৃতি গ্রহণ এবং ধারণাশক্তি কম। এ ত কখনই মনে করি নাই—তুমি নানা স্থানে বেড়াও, অনেক লোকের সহিত আলাপ পরিচয় কর—কেহ কি কখন বলিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পার নাই?—আকৃতি গ্রহণ এবং স্মরণ ক্ষমতা অল্প হইলে অবশ্যই ওরূপ কথা উঠিত।" "আমি প্রায়ই মানুষ চিনিতে পারি না—কিন্তু তাহা না পারাতে বড়ই বিষম হয় জানিয়া ঐ দোষের একটী প্রতিবিধানের উপায় করিয়া রাখিয়াছি। যেখানে যাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয়, একখানি বহিতে

তাঁহার নামাদি টুকিয়া রাখি এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার যাইতে হইলে ঐ বহিখানি দেখিয়া নামাদির পুনরালোচনা করিয়া লই। এই তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে এখানে যাহার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সমুদায় আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি—তাই ঐ যে ভবানী বাবু এবং শ্রীনাথ বাবু আসিলেন, অনায়াসে তাঁহাদের নাম লইয়া কথোপকথন করিতে পারিলাম।" "তবে ত দেখিতেছি লোকে যে অমুক আমাকে চিনিতে পারিলেন না বলিয়া অভিমান করে সেটী বড় অন্যায্য অভিমান!" "কিছু অন্যায় বটে — আমার সম্বন্ধে ত খুবই অন্যায্য, তাহার সন্দেহ নাই— এবং আমার মত যে চোক থাকিতেও কাণা লোক অনেক আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই সে দিন অমুক সাহেব আমার পুত্রের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে অমুক স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তোমার বাপ আমাকে চিনিতে পারিলেন নাই।" "তাই ত, তুমি এত সাবধান হইয়াও ঐ চিনিতে পারিলেন না' অভিমানটির হাত এড়াইতে পার নাই?" * * * "অনেকটাই পারিয়াছি।"

দ্বিচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

মৃত্যু ঘটনা।

সংসারে থাকিতে গেলেই কখন না কখন মৃত্যুঘটনা দর্শন করিতে হয়—সুহৃদ্‌বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। এরূপ দুর্ঘটনা অনিবার্য্য—এ দুঃখ দূরীকরণ একমাত্র উপায় কালাত্যয়।

আমার অদৃষ্টে এ দুর্ঘটনা ভোগ অনেকবারই ঘটিয়াছে। আমি অপঘাতে স্বজনের মৃত্যুঘটনা দেখিয়াছি—আমি চিকিৎসার দোষেও প্রীতিভাজনদিগকে হারাইয়াছি—আমি অচিকিৎসা ব্যাধি পীড়ায় প্রিয়জনের বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছি—আমার কোন কোন সুহৃজ্জন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণশক্তি হইয়া পঞ্চত্বে মিলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া নিরন্তর মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছি—আমার প্রিয়তমকে হঠাৎকারে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছি, এবং বজ্রাহতবৎ চেতনাশূন্য হইয়াছি। আমার নিবারণ সত্ত্বেও পরিবারবর্গের অমনোযোগিতায় শিশুদিগকে পীড়িত এবং বিনষ্ট হইতে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়াছি। আমি অনেক দিন মরিয়া বাঁচিয়া আছি—মৃত্যু অনেকরূপেই আমাকে দেখা দিয়াছে।

কিন্তু আমার ঐ সকল দুর্ঘটনার বর্ণন করিয়া কাহাকেও কষ্ট দিবার ইচ্ছা নাই। সংসার শ্রমে থাকিয়া যে কোন স্ত্রী পুরুষ যখন কোন যমযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইবেন, তাঁহাদিগকে আমি কয়েকটী উপদেশমাত্র প্রদান করিব। (১) তাঁহারা যেন আপনাদের দুঃখের অবস্থায় নিজ পরিচিত অপরাপর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহারা ঐ প্রকার যাতনা পাইয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ করেন (২) যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে যদি তাঁহার অপেক্ষা অধিক অথবা সমান পরিমাণে অপর কেহ পরিতপ্ত হইয়া থাকে, তবে যেন সেই ব্যক্তির সান্ত্বনা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন তাহাতে নিজের দুঃখ ন্যূন হইবে এবং শাস্ত্রের আদেশও প্রতিপালিত হইবে। (৩) পুত্রশোকে তাহার গর্ভধারিণীর বা জনকের দুঃখ, পত্নীবিয়োগে

পুত্র কন্যাদিগের দুঃখ এবং নিরাশ্রয়তা, মাতৃবিয়োগে পিতার কষ্ট, বন্ধু-বিয়োগে বন্ধুর পরিবারবর্গের কাতরতা—এই সকল দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাসাধ্য সেই সকল দুঃখে সহানুভূতি করাই বিধেয়। তাহা করিতে গেলেই যাহার বিয়োগ যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছ, তাহারই প্রতি-নিধিত্ব পাইবে। (৪) নিজের দুঃখের প্রতি অধিক মনে নিবেশ [illegible] কর্ত্তব্যসাধন হইবে না। দুঃখের ভারই বাড়িবে, অস্থির [illegible], অযৌক্তিক, অধর্ম্ম্য এবং অশাস্ত্রীয় অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিবে।

—(*)—

ত্রিচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

— :*::*: —

ডাক্তার দেখান।

আমার বাটীতে যখন যে ডাক্তার দেখিতেন, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত পরামর্শপূর্ব্বক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ হইবার মূল কারণ এই যে, বাটীর সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করা আমি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে গণ্য করিতাম এবং ডাক্তারকে আপনারই প্রতিনিধি বলিয়া জানিতাম। এরূপ মনে করিয়া চলাতে, বাটীর কাহার পীড়া হইলে আপনাকে স্বচক্ষে তাহার শরীরের অবস্থা দর্শন করিতে হইত, স্বহস্তে তাহার কতকটা সেব শুশ্রূষা করিতে হইত, সুতরাং পীড়ার ভাবগতিক নিষ্টমনে বুঝিবার প্রয়োজন এবং সুযোগ হইত। ডাক্তারেরাও ক্রমে ক্রমে বুঝিয়াছিলেন যে, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পীড়ার প্রকৃত লক্ষণাদি তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারেন। এই জন্য আমার বাটীর চিকিৎসক ডাক্তারেরা আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত বলিয়াই মনে করিতেন।

কোন সময় আমার বাটীর চিকিৎসক কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, এবং একটী বালকের অতি কঠিন জ্বর বিকার রোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অগত্যা একজন ইংরাজ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে হইল। তিনি আসিয়া ছেলেটীকে দেখিলেন, এবং ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। আমার অভ্যাস, ডাক্তারকে পীড়ার অবস্থা এবং ঔষধ প্রয়োগের ফল জিজ্ঞাসা করা। সেই পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ ইহাঁকেও জিজ্ঞাসা করিলাম —রোগটীর প্রকৃতি কি—এবং যে ঔষধের ব্যবস্থা হইল, তাহার সেবনে কি ফল হইবে। ইংরাজটী প্রথমতঃ একটু অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিলেন, পরে আমার মুখাবয়বে বিশিষ্ট কষ্টের লক্ষণ দেখিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, একটু কোমল স্বরে বলিলেন, "পরে বলিব"।

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রটী দাওয়াইখানায় পাঠাইয়া ঔষধ আনাইলাম। আনাইয়া ঔষধের এক মাত্রা স্বয়ং খাইলাম, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ঔষধের অর্দ্ধমাত্রা ছেলেটীকে খাও-

যাইলাম। নিবারসানে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। রোগীর নাড়ি দেখিলেন, ঘড়ী বাহির করিলেন, আবার নাড়ি দেখিলেন—মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কয়বার শৌচ হইয়াছে। আমি বলিলাম পাঁচ বার। "পাঁচ বার!!—প্রতিবারে ভেদ অধিক হইয়াছিল কি?"। "সর্ব্ব শুদ্ধ দুই সের এক ছটাক"। "দুই সের এক ছটাক!—ভেদের ওজন কেমন করিয়া এত ঠিক জানিলে?" "আমি মাপিয়াছিলাম—ঐ যে শরাব রহিয়াছে দেখিতেছেন, ঐরূপ শরাবে, মল গ্রহণ করাইয়া ঐ তৌল বাড়িতে ওজন করিয়া দেখিয়াছি।" ডাক্তার সাহেব একটু গম্ভীরমুখ হইলেন—এবং রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"ভেদ হওয়াতে মন্দ হয় নাই, অনেকটা দোষ বাহির হইয়া গিয়াছে—এক্ষণে অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিব"। * * * "ভেদ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইলে কি ভাল হইত?" * * "না ইহাতেই একটু দুর্ব্বল হইয়াছে—আর অধিক হওয়ার প্রয়োজন নাই"। * * * "তবে যে পূর্ণমাত্রায় ঔষধ না খাওয়াইয়া অর্দ্ধ মাত্রায় খাওয়াইয়াছি, তাহা ভালই হইয়াছে"? * * * "কি বলিলে?" * * * "এই ঔষধের শিশি দেখুন—আমি চারি বার ঔষধ খাওয়াইয়াছি—কিন্তু তিন মাত্রার অধিক ফুরায় নাই। ঐ তিন মাত্রার এক মাত্রা আমি স্বয়ং খাইয়াছি, অপর দুই মাত্রা অর্দ্ধেক করিয়া দিয়া চারি বারে ছেলেকে খাওয়াইয়াছি।" * * * "তুমি আপনি খাইলে কেন?" * * * "ঔষধের বীর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য।" "বীর্য্য কি বুঝিলে?" * * * "আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার জোলাপ হইল, প্রস্রাব বেগে নির্গত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল—আমার শরীরে এত দূর করিল দেখিয়া বালককে অল্প মাত্রায় ঔষধ দিলাম।" ডাক্তার সাহেব নতশির হইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিলেন, আমি সেই সময়ে বলিলাম, "আমার পত্নী বালকটীর নিকটেই সমস্ত দিন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বালকটী ছয় ঘণ্টার মধ্যে আট বার কাসিয়াছে। উহার কি ফুস্‌ফুসে বা শ্বাস-নালীতে দোষ হইয়াছে?"।—ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "এ প্রকার জ্বর একেবারে না হউক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কিছু না কিছু আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু উদ্বেগের কোন কারণ

উপস্থিত হয় নাই—আর আজি অবধি যে ঔষধের ব্যবস্থা করিব অগ্রেই তাহার ফল আপনাকে বলিয়া যাইব"। ডাক্তার সাহেব যে সময়ে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার বাটির চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন—'আমি তাহাই করিয়া থাকি—উনি স্বচক্ষে সকল দেখেন—স্বহস্তে রোগীকে ঔষধ খাওয়ান, এবং তাহার সেবা করেন; উহাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া উহাঁর বাটীতে চিকিৎসা করায় চিকিৎসার বিশেষ সুবিধাই হয়। বিশেষতঃ উনি ত আপনার একটি মত বাহির করিয়া বাহাদুরী করিতে যান না? উহাঁর মনের কথা এই—চিকিৎসক স্বয়ং সমুদায় দেখুন, আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা শুনুন, তাহার পর ব্যবস্থা করুন—এবং সেই ব্যবস্থার ফল কি হইবে মনে করেন আমাকে বলিয়া যাউন।—এমন লোকের সহিত পরামর্শ করাই বিধেয়।" ডাক্তার সাহেব বলিলেন "আমি এ পর্য্যন্ত কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী কাহারও ঘরে কোথাও রোগীর সেবায় এত যত্ন ও মনোযোগ দেখি নাই—তুমি যেরূপ বলিলে এখানে সেই রূপেই কাজ করা উচিত। ডাক্তার সাহেব খুব সজোরে সেকহ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন এবং যত দিন বাঁচিয়াছিলেন আমার প্রতি বিশিষ্ট অনুকূল দৃষ্টিই করিতেন।

— :*::*: —

চতুশ্চত্বারিংশ প্রস্তাব।

—•(০)•—

রোগীর সেবা।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ মমতা কম—স্বার্থপরতা বেশী—আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল হয়, সে বাটীর অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

(১) সে বাটীতে গৃহোপকরণের মধ্যে এমন কতক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয়।—যথা জল গরমের কেটল, ফ্লানেল এবং মলমল কাপড়ের টুকরা থল দাঁটি, হামানদিস্তা, মেজর গ্লাস, উষ্ণ জলে না ফাটিয়া যায় এমন বোতল, ডাল নিক্তি, সোর্ণা, বেডপ্যান, ক্লিনিকাল থার্ম্মোমেটর এবং ঔষধের একটী বাক্স বা আলমারি।

(২) সে বাটীতে কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহার কোন পীড়া হইলে তাহা যতই সামান্য হউক, বাটীর কর্ত্তা তাহার তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

(৩) সে বাটীতে যদি কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়, তবে বাটীর ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার জন্য বিশিষ্টরূপে আদিষ্ট হয়।

(৪) অধিক পীড়ায়, সমস্ত বাটী উপশান্তভাব ধারণ করে—কেহই কাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় না—কেহই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে না—বাটীর কুতবিদ্যেরাও সাহেবী চাইলে মস্ মস্ করিয়া চলেন না—ছেলেরাও আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলে।

(৫) রোগীর নিকটে থাকিবার জন্য, পাহারা বদলের ন্যায়, দিবারাত্রির মধ্যে পারিবারিক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নিয়োগ হইয়া যায়। যাহারা সেবায় নিযুক্ত হয়, অপরে তাহাদিগের তাৎকালিক করণীয় গৃহকার্য্য সমস্ত আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লয় এবং সমস্ত গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে—বাসনের ঠন ঠন নি, গৃহোপকরণের হুড়হুড় নি, কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

(৬) রোগীর পথ্য এবং ঔষধ যথাসময়ে প্রদত্ত হইতে থাকে তাড়াতাড়িও নাই বিলম্বও নাই—বিন্দুমাত্রে কোন বিপর্য্যয় নাই। বাটীর অনেকেই রোগীকে পথ্যাদি প্রদান কার্য্যে সক্ষম হয়।

(৭) রোগের লক্ষণ দেখা এবং চিকিৎসককে তাহা অবগত করান পরিবারের মধ্যে অনেকের সাধ্য হইয়া থাকে।

(৮) রোগের চিকিৎসায় ব্যয়কুণ্ঠতার নামগন্ধও থাকে না।

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কতদূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের টাকা এক এবং মন এক হইয়া যায়। আমি স্বচক্ষে পীড়িতাবস্থ ইংরাজের সেবা এবং চিকিৎসা দেখিয়াছি। পীড়িত ব্যক্তির পত্নী যদি একটু রাত্রি জাগরণ করিলেন, যদি ঠিক সময়ে স্বয়ং হাজিরা না খাইলেন, তবেই তাঁহার ঢি ঢি প্রশংসা হইল। পীড়িতের ভ্রাতা যদি তাঁহার বাটীতে আসিলেন এবং ভ্রাতা কেমন আছেন, পরিচারককে দিনের মধ্যে দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে পীড়াসম্বন্ধীয় দুই একটা কথা কহিলেন, তাহা হইলেই তিনি ভ্রাতৃকর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিলেন। প্রতিবেশী ইংরাজ যদি বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া নিজ নামাঙ্কিত কার্ড রাখিয়া গেলেন, তাহা হইলেই সামাজিক নিয়ম রক্ষার দায় হইতে খোলসা হইলেন। এই বিদেশে ত ইংরাজদিগের পীড়ার সময় বেতনভোগী খানসামা প্রভৃতি দ্বারা যতদূর সেবা হইবার তাহাই হইয়া থাকে। উহাঁদিগের স্বদেশেও পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও বড় একটা কিছু করিতে হয় না। বেতনগ্রাহিণী ধাত্রী অথবা দয়াবতী উদাসিনীগণ মুখ্যতঃ উহাঁদিগের রোগের সেবা করিয়া থাকে।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। আস্তবলে যদি একটা ঘোড়া পীড়িত হইয়া পড়ে তবে আস্তবলের সকল ঘোড়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে—গোশালায় একটা গোরু রুগ্ন হইয়া পড়িলে আর যে গোরু তাহাকে দেখিতে পায় সেই উঁৎ লেজ করিয়া দৌড়াইতে চায়—কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, টিয়া, চটক প্রভৃতি সকল পশু পক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়া তাহার গা

ঝাড়িয়া বা চাটিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব পীড়িতের শুশ্রূষা পাশবধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। যে মনুষ্য জাতির মধ্যে পাশব ভাব অল্প, সেই জাতীয় ব্যক্তি পীড়িতের সেবায় তত অধিক যত্নশীল হইয়া থাকে। অতএব রোগ সেবা সম্বন্ধে ইংরাজের রীতি আমাদিগের অনুকরণীয় নহে।

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এই জন্য এমন ভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল তার যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিল—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে না কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শয়িত—তুমি রাত্রি দিন তাহার মলিন মুখ মণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীর পাত করিতেছ। যদি শিশু তোমার দুধ খায়—তবে তোমার শোকবিহ্বল হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে, তুমি অধীরা হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্যরূপ বিষপান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন কচি নয়—তোমার ক্রন্দনের, হা হুতাশের, উপবাসের এবং অনিদ্রার, প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটী নষ্ট করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা

থাকিতেন পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য কৌতুক বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে আমি তাহার পীড়ায় কিছুই ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেরও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে—অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্দ্দয় এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্য পরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর, শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুলবুলে লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদাই এ পাশ ও পাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চলদৃষ্টি হইতে হয়। তাঁহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ণমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয়, তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না—রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্মপ্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয়, এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও না; যদি করিতে হয়, বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই

পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিসটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটী কপালে দিতে হইবে—ঠিক একটুকু চাপিয়া বা আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে.—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হয়েন।

পরিজনগণ উল্লিখিত ভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহার বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটী হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে—এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগী ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা, এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ তাঁহারা ছেলের গু মুতে ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশ পালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মল মূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণ বটে, এবং তাহা করিতেও নাই, কিন্তু এ স্থলে ঘৃণা প্রদর্শন হইতেছে না, কেবল মাত্র সংস্রব দোষ নিবারণের উপায় বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর ডাগরদিগের পীড়া ছোটদিগকে যত ধরে, ছোটর পীড়া ডাগরকে তত ধরে না। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়াও সংক্রামকধর্ম্মী

পঞ্চচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

ভোজনাদি।

পারিবারিক যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে ভোজন একটী প্রধান কার্য্য। ভোজনের ব্যবস্থা অনেকটা বিচার করিয়া করিতে হয়। এই কার্য্যেও দিব্য ভাব আনিতে হয়; বস্তুতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ইহাই নিত্য যজ্ঞ, এবং গৃহাশ্রমী যাবতীয় ব্যক্তি এই যজ্ঞের পূর্ণাধিকারী।

এই নিত্যযজ্ঞের দেবতাগণ শরীরী, সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান, সন্তোষা সন্তোষ প্রকাশে সক্ষম এবং বাধ্য। অশরীরী দেবতারা, নিবেদিত হোম নৈবেদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করিলেন কি না, বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ভোজনরূপ নিত্যযজ্ঞ যাহাদের প্রীত্যর্থ উৎসৃষ্ট হয়, তাঁহারা উহার দোষ গুণ বলিয়া দিতে পারেন।

গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য তিনি গৃহপ্রস্তুত যে খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিবেন, যেন অবশ্য অবশ্য তাহার দোষ গুণ বলিয়া দেন। তিনি যদি না বলেন তবে কখনই তাঁহার বাটীর রান্না ভাল হইবে না। এ বিষয়ে আমার অতি আত্মীয় কোন এক ব্যক্তির সহিত এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আপনার বাটীর রান্না উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই—যদি কখন একটী ব্যঞ্জন কিঞ্চিন্মাত্র স্বাদুহীন হয়, আপনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যঞ্জনটীর যে দোষ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন। আমি ওরূপ করিতে পারি না। বৌ, ঝি, গৃহিণী প্রভৃতি যাহারা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হয় তাহারা কতটা পরিশ্রম করে স্মরণ করুন; উহারা যতদূর সাধ্য তাহা ত করে—উহাদের কার্য্যে প্রশংসা না করা কি একটু নৈষ্ঠুর্য্য নয়? আমাকে যা দেয়, আমি তাহাই ভাল বলিয়া খাই। আমি বলিলাম—আমার প্রণালীতে একটু নৈষ্ঠুর্য্য আছে বই কি?—কিন্তু শিক্ষা প্রদান কাজটা যে বিষয়েই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে একটু কঠোরতা থাকেই থাকে। যদি বাটীর রান্না ভাল করিতে চাও, তবে ঐ কঠোরতা প্রয়োগে অত ভীত হইও না। যে কাজ

করিব, তাহা ভাল করিয়া করিব, এ সংস্কারটি নিজের থাকা ভাল, আর পরিবারের মধ্যেও উহা বদ্ধমূল করা আবশ্যক। উহা একটী ধর্ম্মবীজ।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই যে, যে বাটীর রান্না ভাল নয়, সে বাটীও ভাল নয়; অর্থাৎ সে বাটীর স্ত্রী পুরুষদিগের যজ্ঞ করা অভ্যস্ত হয় নাই—তাহারা কিছু অলস প্রকৃতিক, কিছু অযত্নপর, কিছু সুখ্যাতিবিমুখ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুখ দুঃখ বোধে কিছু অনুভূতি শূন্য হইয়া থাকে। যে বাটীর রান্না ভাল অর্থাৎ যে বাটীতে নিত্যযজ্ঞের ব্যাপার পরিপাটীরূপে অভ্যস্ত, সে বাটীর নৈমিত্তিক যজ্ঞও, অর্থাৎ অতিথিসৎকার, ব্রাহ্মণসজ্জনের ভোজনাদি, অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়।

রান্না ভাল করিবার উপায় গৃহস্বামীর শিক্ষাদানে প্রবণতা। তাহাতেই অনেকটা হয়, কিন্তু যদি রন্ধন বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার কিছু ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। পুরুষের নিকট রন্ধন বিষয়ে শিক্ষা পাইতে হইলে স্ত্রীলোকেরা বড়ই লজ্জিতা হয়, তাহারা সত্বরেই সযত্ন হইয়া আপনারা উত্তমরূপে রন্ধন করিতে শিখে। যে বাটীর কর্ত্তা বাটীর রন্ধনকার্য্যের প্রতি মনোযোগী, কিরূপে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে হয়, বলিয়া দিতে পারেন, সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্য্যটিকে গৌরবসূচক মনে করে, এবং তাহার উৎকর্ষ এবং পারিপাট্য সাধন করিতে পারেন।

বাটীর রন্ধন ভাল হইবার আর একটী অন্তরায় আছে। সেটীও বাটীর কর্ত্তাকে যত্ন করিয়া নিবারণ করিতে হয়। রন্ধনের দ্রব্য সামগ্রী ভাল হওয়া চাই। যজ্ঞীয় দ্রব্য অতি যত্নপূর্ব্বক আহরণ করা বিধেয়। আজি কালি কিন্তু এতই ভেজাল দেওয়া অভ্যাস হইয়া পড়িতেছে যে বিনা ক্লেশে ভাল জিনিষ আয়ত্ত হইয়া উঠে না। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধাদি প্রায়ই ভাল পাওয়া যায় না। আনাজ তরকারীও যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া না কিনিলে ভাল মিলে না। অতএব দ্রব্যাহরণ সম্বন্ধে কর্ত্তার দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

দেশাচার এই যে, রন্ধন কার্য্য শুচি হইয়া করিতে হয়। যজ্ঞীয় দ্রব্য শুচি হইয়া প্রস্তুত করা শাস্ত্রের আদেশ। স্নান করিয়া অথবা হাত পা মুখ ধুইয়া এবং কাপড় ছাড়িয়া রন্ধনশালায় যাইতে হয়। ইহাতে রন্ধন কার্য্যের প্রতি বিশেষ একটী শ্রদ্ধা জন্মে, এবং রন্ধনও ভাল হয়। আর্য্যেতর জাতি-

দিগের রন্ধনকার্য্যে আর যত গুণ থাকুক, উহার শুচিতা রক্ষায় নিমিত্ত কোন যত্নই থাকে না। অতি বড় ইংরাজেরও বাবুর্চ্চিখানায় প্রবেশ করিবামাত্র ঘৃণা জন্মে। পাচকদিগের হস্ত, পদ, মুখ, বস্ত্রাদি সাতিশয় ক্লিন্ন, ঘরের দুর্গন্ধ অসহ্য, ভোজন পাত্রাদি পরিষ্কার করিবার প্রণালী অতি জঘন্য। খাদ্য সামগ্রী সকল রন্ধনশালায় প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলে পর, তবে পরিবেষ্টৃগণ ফিটফাট হয় এবং দ্রব্যাদি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রে অন্নকে প্রজাপতি এবং ব্রহ্ম বলিয়াছেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়েই উহার সম্যক্ পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

ইংরাজদিগের ভোজন প্রণালী হইতে আমাদিগের শিক্ষণীয় অধিক কিছুই নাই। উঁহারা নিত্য মাংস্যভোজী। ইংরাজেরা যত মাংস খান, অপর কোন ইউরোপীয় জাতীয়েরা অত মাংস খায় না। এদেশে অত মাংস খাওয়া সহ্য হয় না। ইংরাজেরা তীব্র সুরা পানে অনুরক্ত। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে উহাঁরা যত তীব্র সুরা সেবন করিতেন, এখন আর তত করেন না। আমাদিগের দেশে সুরা সেবনে আয়ুঃশেষ হয়। ইংরাজেরা পচা মাংস এবং পচা মাছ খাইয়া থাকেন—মাংস এবং মৎস্য কিছু না পচাইয়া উহাঁরা প্রায়ই খান না, আমাদের শাস্ত্রে টাটকা বই পচা খাইতে একেবারে নিষিদ্ধ। ইংরাজেরা চিনের বাসন এবং কাচের গ্লাস বাটী ব্যবহার করেন। ঐগুলি বেশ ঝক্‌ঝকে জিনিস। ভাবিয়া দেখিলে ও গুলি কৃত্রিম প্রস্তর। আমার বোধ হয় যে দেশাচার ঐ সকল পাত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে দিবে। তবে ওগুলি দেশীয় কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইলেই ভাল হয়। ইংরাজেরা টেবিল পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া খান। উহাঁদের খাদ্য সামগ্রী অধিকাংশই শুষ্ক। কিন্তু যখন কোন ঝোল কিম্বা তরকারি খান, তখন পাছে কাপড় নোঙরা হয় এই ভয়ে শরীরের সম্মুখভাগটা একটী তোয়ালে রুমাল দিয়া ঢাকেন—তখন চেয়ারে বসার শোভাটা আর তত চিত্ত আকর্ষণ করে না আমাদের খাবার জিনিস অধিকাংশই সরস এবং সজল, এবং এদেশে তাহাই হওয়া চাই। সুতরাং আমাদের পক্ষে টেবিলে বসায় বিশেষ সুবিধা নাই।

[illegible]

ব্যবহারটিও মন্দ বলিয়া আমার বোধ হয় না। প্রত্যুত, ঐ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়াই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তবে আমাদিগের ভোজনে কাঁটা ছুরি নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজেরা স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করেন। আমার বিবেচনায় ঐ প্রথা ভাল নয়। উহাতে স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হয়। তবে যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্তি এবং প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন করা শাস্ত্রীয়। অতএব ভোজনকালে বাটীর স্ত্রীলোকেরা নিকটে বসিয়া খাওয়াইবেন, এবং বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পরিবেশন করিবেন। পরিবেশন হাতে করিয়া করিতে নাই। যজ্ঞীয় হোমাদি যেমন শ্রুবের দ্বারা প্রদান করিবার বিধি, পরিবেশনও সেইরূপ চামচ, হাতা, বাটী প্রভৃতির দ্বারা করিতে হয়। শিশুগণ নিকটে বসিয়া খাইবে। নিত্য ভোজনের এইরূপ ব্যবস্থা হইলে খাওয়া তাড়াতাড়ি হয় না, খাওয়ার মধ্যে অনেক কথা বার্ত্তা গল্প গুজব হয়, হাসি তামাসাও আইসে, রাক্ষস ভাব থাকে না, মুখের বিকৃতি এবং শব্দ হয় না, ভোজনপাত্র নোঙরা হয় না, অঙ্গুলির দুই পর্ব্বের অধিক খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হয় না, এবং কতকটা পথ্যাপথ্যের বিচার করিয়াও চলিতে হয়।

পথ্যাপথ্য বিচার ইংরাজী গ্রন্থ সকল হইতে কতকটা হইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত হয় না। উহাঁদের বিচারপ্রণালী রাসায়নিক শাস্ত্রসম্মত, প্রকৃত প্রস্তাবে শারীর শাস্ত্র জ্ঞান সমুদ্ভূত নয়। উহাঁদিগের মধ্যে একজন পণ্ডিত দেখিলেন, গোধূমে এত অমুক পদার্থ, এত তুমুক পদার্থ, এত ফলনা পদার্থ আছে, আর একজন দেখিলেন, তণ্ডুলে ঐ ঐ পদার্থের এত এত অংশ আছে, আর একজন দুগ্ধের, আর একজন মাংসের, ঐরূপ মূল সকল বাহির করিলেন। কিন্তু ঐ প্রণালীতে বাস্তবিক পথ্যাপথ্য নিরূপণ হয় না। প্রথমতঃ ঐ প্রণালীর পরীক্ষা বিধান বড়ই দুরূহ। অতি বিখ্যাত পণ্ডিত দিগেরও দুই জনের মত ঠিক এক হয় না। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের পাক যন্ত্রস্থ হইয়া খাদ্য সামগ্রীর যেরূপ বিশ্লেষণ হয়, এবং তাহা হইতে শরীর পোষণোপযোগী যে সকল গুণ জন্মে, সামান্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উহাদিগের সে সকল গুণ জানিতে পারা যায় না। তৃতীয়তঃ এতদ্দেশজাত এবং প্রচলিত খাদ্য সামগ্রী সকল ইউরোপজাত খাদ্য সামগ্রী হইতে কতকটা ভিন্ন। এই জন্যও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা বিধান হইতে আমাদিগের সকল খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ জানিবার যো নাই। ফল কথা,

যেমন ঔষধের গুণাগুণ ঔষধ খাইয়াই প্রকৃতরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণও যাঁহারা তাহা খাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থতঃ জানিতে পারেন। আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতেই পথ্যাপথ্য বিচারপূর্ব্বক যে সময়ে যাহা খাইতে বিধি আছে তাহা খাইবে, যাহার বিধিও নাই : নিষেধও নাই, তাহাও খাইবে, আর যাহা খাইতে নিষিদ্ধ তাহা খাইবে না *।

পথ্যসেবী হওয়া একটী ব্রত। যাঁহাদিগের এই ব্রত বাল্যাবধি অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা রোগযন্ত্রণা হইতে অনেকটা মুক্ত থাকেন, দীর্ঘায়ুঃ হয়েন,

---

* ১। গ্রীষ্ম পথ্যাপথ্য।—পুরাতন চাউল, পুরাতন গোধূম, পুরাতন যব, কৃষ্ণমুগের দাইল। জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস। যবের শক্তু (ছাতু) শীতল জলে খুব তরল করিয়া গোলা। দুগ্ধ, গব্য বা মাহিষ (চিনি মিশ্রিত) কলা, কিসমিস, কাঁটাল, আম্র। লঘুপাক, স্বাদু, স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) প্রস্তুত দ্রব্য। নির্ম্মল লঘু শীতল জল। দিবানিদ্রা। পাথার বাতাস।

২। বর্ষা পথ্যাপথ্য।—পুরাতন চাউল, গোধূম, যব, সোণামুগের দাইল। শুষ্ক দেশবাসী পশু পক্ষ্যাদির মাংস। মাংসরস। লঘু আহার। দিব্যান্তঃ (আকাশের জল)। সিদ্ধ জল। উচ্চস্থানে শয়ন। ঠাণ্ডা বাতাস, দিবা নিদ্রা, নদীজল এবং অধিক জলীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ।

৩। শরৎ পথ্যাপথ্য। চাউল, গোধূম, সোণামুগ, ছোলার দাইল। মরুদেশীয় পশু পক্ষীর মাংস। মাংস রস। ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, ইক্ষু, আমলকী, পটোল। অংশূদক, অর্থাৎ যে জলে সূর্য্য এবং চন্দ্রকিরণ বিশেষরূপেই লাগিয়াছে। পিত্ত প্রকোপ জনক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৪।৫। হেমন্ত শিশির পথ্যাপথ্য।—গোধূম—তজ্জাত পিষ্টকাদি, ক্ষীর এবং ইক্ষুরসজাত দ্রব্যাদি, বসাবহুল দ্রব্যাদি, আনুপ পশু পক্ষীর মাংস, বিলেশয় জন্তুর মাংস, স্নেহপূর্ণ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য। উষ্ণগৃহে বাস। অতি শীতল জল নিষিদ্ধ। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

৬। বসন্ত পথ্যাপথ্য।—বিশিষ্টরূপ ব্যায়াম, বিশিষ্টরূপ উদ্বর্ত্তন এবং স্নান। পুরাতন গোধূম, যব, চাউল। জাঙ্গল মাংস। ঘৃত, মধুর পানা, শুঁঠ মিশ্রিত সরবত। তিক্ত, কটু, কষায়াদি দ্রব্যের বিশিষ্ট সেবন। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

এবং চিরকাল কর্ম্মক্ষম শরীর ধারণের সুখভোগ করিতে পারেন। যাঁহারা মনে করেন যে, পথ্যসেবীদিগের ভোজনসুখ অল্প, তাঁহারা ভ্রান্ত। পথ্য-সেবীদিগকে যে নিতান্ত পুতু পুতু করিয়া খাইতে হয়, অথবা বিস্বাদ সামগ্রী খাইতে হয়, তাহা নহে। প্রকৃত পথ্যের একটী বিশেষ গুণ আছে। উহা স্বল্প মাত্র অভ্যাসে অতিশয় সুস্বাদু হইয়া উঠে। উহার গ্রহণে ভোজন-সুখ এবং আনন্দ অধিক হয়। উহা পুষ্টও করে এবং হৃষ্টও করে। আর একটী কথা আছে। সকল লোকের পক্ষে সকল সময়ে পথ্যাহার এক প্রকার হয় না। ধাতুভেদে এবং কার্য্যভেদে পথ্যের ভেদ হয়। এক ব্যক্তির পক্ষেও সকল সময়ে একই পথ্য হয় না। যাঁহারা বহুকাল পথ্য-সেবী, তাঁহারা কোন সময়ে কি খাইলে ভাল থাকিবেন, তাহা সংস্কারগুণেই বুঝিয়া লইতে পারেন।

আহার গ্রহণ উদরপূর্ণ করিয়া করিতে নাই। পরন্তু পথ্যসেবীদিগের প্রায়ই অতিভোজন দোষ ঘটে না। তাঁহারা ভোজনের গূঢ়তম সর্ব্বাঙ্গীন সুখের এতই পক্ষপাতী হইয়া থাকেন যে, স্থূল রসনার তৃপ্তিতে তাঁহাদের সম্যক্ সুখানুভব হয় না।

দৈহিক কার্য্যমাত্রেরই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। আহার গ্রহণের পক্ষেও সেই নিয়ম। ব্রতচারীদিগের কথা ভিন্ন। কিন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ লোকের ভোজনকাল চারিটী। এক, প্রাতে; দ্বিতীয়, মধ্যাহ্নে; তৃতীয় সায়ংকালে; চতুর্থ রাত্রি এক প্রহরের পর। কিন্তু চাকুরির দায়ে আর স্কুলের দায়ে আজি কালি ঐ সকল সময়ের খুব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। প্রাতরাশ আর মাধ্যাহ্নিক ভোজন মিলিয়া গিয়া সহর অঞ্চলে বেলা নয়টায় ভাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিক রাত্রি করিয়া আহার করা ভাল নয়। কারণ আহার গ্রহণের পর আড়াই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা জাগিয়া থাকা উচিত; অধিক রাত্রিতে আহার করিলে ঐ নিয়ম পালন হয় না—সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা হয়।

ইংরাজেরা ভোজনের পর তাম্বুল চর্ব্বণ করেন না। প্রত্যুত তাম্বুল চর্ব্বণটা রোমন্থকদিগের যাবর কাটার সহিত তুলনা করেন, এবং তাহা করায় নব্যেরা আর তাম্বুল চর্ব্বণে সাহস করিতে পারেন না। কিন্তু ভাত, রুটি প্রভৃতি শস্যভুক্‌দিগের পক্ষে পান খাওয় সুব্যবস্থা। অতএব ভোজ-

ন্তে উত্তমরূপে আচমন করিয়া দুই চারিটা পান খাইবে, এবং তাহার পর আবার ভাল করিয়া পুনরাচমন করিবে। শাস্ত্রেরও বিধি এই।

ভোজন সম্বন্ধে আর একটা বড় মোটা রকম ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। নব্যেরা যে কারণেই হউক যেন মনে করেন, নিদ্রাবস্থায় আহারের পরিপাক জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা ভাল হয়, এবং সেই জন্য তাঁহারা রাত্রির আহারটাই গুরুতর করিয়া থাকেন। বাস্তবিক নিদ্রাবস্থায় সকল স্নায়ুশক্তিই দুর্ব্বল থাকে—তখন কোন শারীরিক কার্য্যই সতেজে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, আহার পরিপাকও সত্বরে হয় না। এই জন্য দিবার আহার অপেক্ষা রাত্রির আহার গুরুতর করিতে নাই। কিন্তু আজি কালি মাংস এবং পোলাও খাবার ব্যবস্থাটা রাত্রিকালেই করা হইয়া থাকে।

সুস্থ এবং সবল শরীর ব্যক্তির পক্ষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান একটু প্রত্যূষে হওয়াই ভাল। শয্যা হইতে উঠিয়াই মলত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি শরীরের নির্ম্মলতাসাধক কার্য্যগুলির অভ্যাস করা উচিত। তাহার পরেই ব্যায়াম করিবে—যথা ডন্, মুদ্গর, ওঠবোস্ প্রভৃতি। একেবারে অধিক ব্যায়াম করিবে—যথা ডন্, মুদ্গর, ওঠবোস্ প্রভৃতি। একেবারে অধিক ব্যায়াম করা ভাল নয়—কিন্তু অল্পে অল্পে উহা কতকদূর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া যাইতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। আমাদিগের দেশে ব্যায়ামচর্য্যার প্রকৃত কাল প্রাতঃকাল। কিন্তু ইংরাজী স্কুল ও কলেজের ছেলেরা অনেকেই সায়াহ্নে ব্যায়ামচর্য্যায় আদিষ্ট হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও ব্যায়ামচর্য্যা আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ব্যায়াম কার্য্যে শরীরের কোমলতা নষ্ট হয়, সে সকল কার্য্য তাঁহাদের পক্ষে বিধেয় নহে। নিয়মিতরূপে গৃহকার্য্য করিলেও অনেকটা ব্যায়ামের কাজ হইয়া যায়। উদূখলে বা ঢেঁকিতে চাউল কাঁড়ায়, যাঁতায় কলাই ভাঙ্গায়, ঘরদ্বার ঝাঁইট দেওয়ায়, বাটনা বাটায় বিলক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম হইয়া থাকে। সময় বিশেষে এবং শরীরের অবস্থা বিশেষে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কি ব্যায়াম, কি অপর কোন অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম সকলই নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

—•(০)•—

শয়ন এবং নিদ্রাদি।

কতকটা সময় বিশ্রামের জন্য না পাইলে শরীর টিকে না। কিন্তু বিশ্রামেরও অনেকটা ইতর বিশেষ আছে। যে দৌড়িতেছে বা অনেকক্ষণ ধরিয়া পাদচারণ করিতেছে, সে স্থির হইয়া বসিলে বা শুইলেই বিশ্রাম লাভ করে। যে হস্তচালন দ্বারা কাঠের রেঁদা করিতেছে বা কাপড় বুনিতেছে, ঐ ঐ কার্য্য হইতে ক্ষণকালের জন্য হাত গুড়াইয়া রাখিলেই তাহার শ্রমজনিতক্লান্তি দূর হয়—অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন জন্য যে পরিশ্রম, তাহা সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিলেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অভ্যন্তরবর্ত্তী যে স্নায়ুমণ্ডল তাহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিদ্রা ব্যতীত আর কিছুতেই হয় না। যে ব্যক্তি যত অধিক কাজ করে অর্থাৎ নড়ে চড়ে, এবং চিন্তা করে, তাহার তত অধিক নিদ্রার প্রয়োজন হয়। শিশুরা অধিক চঞ্চল, এবং উহাদের স্নায়ুমণ্ডলে কার্য্য অধিক হয়, এই জন্য উহারা অধিক নিদ্রা যায়। বৃদ্ধের নড়াচড়া কম, মস্তিষ্ককার্য্যও অনধিক অথবা পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ অনধিকরূপেই প্রতীয়মান, এই জন্যই বৃদ্ধের নিদ্রা অল্প। কিন্তু এই কথার ভিতরে আর একটী কথা আছে। নড়া চড়া যত বাড়াইবে, ততই যে নিদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, সে কথা ঠিক নয়। যেমন ব্যায়াম অধিক করিলে ক্ষুধা অধিক হয় এবং পরিপাক শক্তি বাড়িয়া উঠে, এ কথার একটী সীমা আছে, তেমনি অধিক নড়িলে চড়িলে নিদ্রা অধিক হয়, এ কথারও একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। আমি দেখিয়াছি, অতিরিক্ত ব্যায়ামের পর ক্ষুধাবৃদ্ধির কথা দূরে থাকুক, একবারে আহার মাত্র গ্রহণে অরুচি জন্মিয়া যায় এবং পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি না হইয়া উহার হ্রাস হইয়া পড়ে, সেইরূপ অতিরিক্ত চলা ফেরা করায় এবং অতিরিক্ত চিন্তনে বা মস্তিষ্ক চালনে একেবারেই নিদ্রা আইসে না—অনিদ্রাই একটী রোগ হইয়া দাঁড়ায়। শরীর পোষণ এবং পালনের

পক্ষে ব্যায়ামাদি পরিমিতরূপ হওয়াই আবশ্যক, এবং ঐ পরিমাণ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন।

সুনিদ্রার নিমিত্ত যেমন পরিমিতরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন, তেমনি কতকগুলি বাহ্য বন্দোবস্তের আবশ্যকতা আছে। প্রথমতঃ শয়নের ঘর। এটী শীতল হইবে এবং ইহাতে বায়ু ও আলোকের উত্তম প্রবেশ থাকিবে। কিন্তু শয়নের এবং নিদ্রার সময় অধিক আলোক বা বায়ুর সমাগম অবৈধ। শয্যা হইতে কিছু দূরে বায়ু সঞ্চালনের পথ অনবরুদ্ধ থাকিবে, এবং কেরোসিনের কিম্বা গ্যাসের কটকটে আলো ঘরের ভিতর জ্বলিবে না। পত্র পুষ্পাদিও ঘরে থাকিবে না। ঘরটী যত খোলসা থাকে ততই ভাল; কিন্তু উহাতে আর যাহা কিছু থাকুক বা না থাকুক, কোন খাদ্য সামগ্রী উহাতে রাখিতে নাই। খাদ্য সামগ্রী রাখিলেই তাহার গন্ধে বায়ু দূষিত এবং পিপীলিকা মাছি এবং মশার উপদ্রব অধিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শয্যা। শয্যা পরিষ্কার এবং কোমল হইবে। কিন্তু অতি কোমল শয্যা ভাল নয়। এক ঘরে একটি শয্যা থাকাই উচিত। যদি পতি পত্নীর দুইটী শয্যাই এক ঘরে রাখিতে হয়, তথাপি ঐ শয্যা দুইটী ঘরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে থাকিবে। এক শয্যায় শয়ান হইয়া দুই জনের নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। ছেলেদের বিছানাগুলি পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী ঘরে হওয়াই আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, স্ত্রী-সংসর্গ। য়িহুদীদিগের শাস্ত্রে ঋতু বিরত হইবার কাল পাঁচ দিন ধরিয়াছে। সেই পাঁচ দিনের পর আর সাত দিন বাদ দিয়া স্নান এবং স্বামী শয্যা গমন তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধি। এই নিয়ম যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা এক্ষণে সকলেরই অবধারিত হইয়াছে। য়িহুদী জাতির সন্তানের অকাল মৃত্যু অপর সকল জাতির অপেক্ষা অল্প হয়। আমাদিগের মধ্যে তিন রাত্রি অতীত করিবার ব্যবস্থা *। বিজ্ঞান দ্বারা এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে অনুমান মাত্র এই যে, সামান্যতঃ রজঃসংযমের পূর্ব্বে যদি সংসর্গ হয়, তবে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি পীড়া সংঘটন হইতে পারে।

* স্নানের ব্যবস্থা চতুর্থ দিনেই আছে। কিন্তু ব্যক্তিভেদে ঐ ব্যবস্থা ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। রজঃসংযত হইয়া গেলেই স্নান করা উচিত, তাহার পূর্ব্বে স্নান করা অবৈধ।

গর্ভগ্রহণ এবং গর্ভদানের প্রশস্ত কাল রাত্রি ভোজনের ৩ ঘণ্টা ৩৷৷০ ঘণ্টার পর। উদরে আহার্য্য দ্রব্য অপক্ক থাকিতে স্ত্রী সংসর্গ নিষেধ। স্ত্রী পুরুষ কাহারও শরীরে কোন গ্লানি থাকিলেও স্ত্রী সংসর্গ নিষেধ। আর দিবাভাগে স্ত্রী সংসর্গ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দিবা সংসর্গে সমূহ দোষ হয় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ আছে। *

পর্ব্বাহে—অর্থাৎ পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীতেও স্ত্রী সংসর্গ নিষেধ। এই শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপোষক কয়েকটী যুক্তি আছে বলিয়াই আমার বোধ হয়। কিন্তু সকল যুক্তির উল্লেখ না করিয়া এ স্থলে কেবল একটী মাত্রের উল্লেখ করিব। স্ত্রী পুরুষ অন্যোন্যের অভিলাষ পূরণেচ্ছায় অনেক সময়ে পরস্পর সংসর্গী হইয়া থাকেন। উভয়ের মনে, এই যে পরার্থবোধটী জন্মিয়া প্রবৃত্তির উত্তেজক হয়, তাহা অনেক সময়েই ভ্রমমূলক। কিন্তু ঐ ভ্রম সহজে ভাঙ্গে না। সুতরাং বিধি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নিবৃত্তি অভ্যাস করাই ভাল। শাস্ত্রে সেই বিধির সৃষ্টি করিয়া দিয়া স্ত্রীপুরুষকে অতি ধর্ম্ম্য এবং হিতজনক পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। ফলকথা, রেতঃক্ষত্রে আয়ুক্ষয় হয় বলিয়া ভগবান ব্যাসদেব হইতে নব্য দার্শনিক প্রবর ডারউইন সাহেব পর্য্যন্ত সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি—সুতরাং মাসের মধ্যে যত রাত্রি বিনা সংসর্গে যায় ততই ভাল। রুগ্ন, দুর্ব্বল ক্ষীণজীবী মনুষ্যদিগের মধ্যেই আসঙ্গলিপ্সা অধিক বলবতী হইয়া থাকে—বিশিষ্ট সবলকায় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কামাতুর্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প হয়।

অজাতরজাকুমারীগমন অতি মহাপাতক। গর্ভিণী স্ত্রীগমনেরও সমূহ দোষ। আমি শুনিয়াছি, কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রী সংসর্গ হইতে একান্ত নিবৃত্ত থাকিলে, বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মে। এটী সম্পূর্ণ মিছা কথা। যদি মনে কাম ভাবের উদ্রেক হইলে তাহার দমন না করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তাতেই অনুরক্ত হও, এবং ক্রমে ক্রমে উহাকে অতি বর্দ্ধিত করিয়া তুল, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ দুই এক স্থলে পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, নচেৎ কেবল মাত্র সংসর্গবিরতিতে কোন পীড়াই হয় না; প্রত্যুত শরীর দৃঢ় হয়, শীতাতপের দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা জন্মে, পরিশ্রমশক্তি বাড়ে, রোগের আক্রমণ

* প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবারাত্যা সংযুজ্যন্তে। প্রশ্নোপনিষৎ।

জন্ম হয়, এবং আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইয়া উঠে। দারত্যাগী দেবব্রত ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন, রুগ্নদেহ হয়েন নাই।

আমি কয়েকটী সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আদিষ্ট এবং অনুরুদ্ধ হইয়া এই সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম। যাঁহারা আমাকে ইহা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, কোন পিতা মাতা আপনাপন পুত্র কন্যাদিগকে এই সকল তথ্য শিখাইয়া দেন না। প্রতি স্ত্রী পুরুষকেই এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আপনাপন অভিজ্ঞতা বলে সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাদিগের সংগ্রহ করিতে করিতে জীবিত কাল অতিবাহিত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী স্ত্রী পুরুষকে আবার নূতন করিয়া শিখিতে হয়। তাঁহারা বলেন, হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ে যে বিশেষ উপদেশ আছে, তাহা ঐ সকল শাস্ত্রের আলোচনা অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, আর কেহই জানিতে পারে না। এবং কর্ত্তা গৃহিণীরাও এই সকল তথ্যকে অবশ্য প্রতিপাল্য বিধিস্বরূপে না জানাতে, যুবক, যুবতীরা কিছুই শিখিতে পারে না। এই যে, দেশের মধ্যে এত রোগের বৃদ্ধি, তাহার কতকটা কারণ যেমন দৈন্য দশা, আচারের বিপর্য্যয়, উদরান্নের জন্য কঠোর চিন্তা, আপনাপন ভাবি বিষয় অতি ভীষণ শঙ্কা, তেমনি কতকটা দাম্পত্য নিয়ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা।

আমার পত্নী আমাকে কোন সময়ে বলিয়াছিলেন—"এই সকল কথা ছেলেদিগকে শিখাইতে পারিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম—"ক্রমে ক্রমে সকল কথাই তাহাদিগকে বলিব, না বলায় অনেক দোষ হয়" * * "দোষ হয় বই কি—না জেনেও আগুনে হাত দিলে ত হাত পুড়ে"। * * "ঠিক কথা! আমি অবশ্যই বলিব—তুমি দেখিবে আমাদের ছেলের ছেলে হইলে সে আমাদের সাক্ষাতে সচ্ছন্দে তাহাকে কোলে পিঠে করিতে এবং তাহার আদর করিতে পারিবে—লজ্জিত হইবে না।" * * * "ছেলেরা বাপ মায়ের সমক্ষে আপনাদের ছেলের আদর করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করে" * * * "বাপ মায়েরা বরাবর এমন ভাবেই চলিয়া থাকেন যে, ছেলেকে মনে করিতে হয়, তাহার ছেলে হওয়া একটা ভারী দোষের কথা!"

সপ্তচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

—•(০)•—

দলাদলি।

প্রত্যেক পরিবার এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একটি বৃহত্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেই বৃহত্তর রাজ্যের নাম সমাজ। অতএব সমাজের শাসন মানিয়া তাহার অঙ্গীভূত পরিবারগুলিকে চলিতে হয়। যে সকল দেশে রাজায় এবং সমাজে ভিন্ন ভাব নাই, প্রত্যুত রাজা এবং তাঁহার প্রতিনিধি রাজপুরুষেরাই সমাজের নেতা এবং রক্ষিতা, সে সকল দেশের রাজশাসন ভিন্ন একটি সমাজশাসন থাকে। কিন্তু সেখানে রাজশাসনে এবং সমাজশাসনে ব্যাপ্য ব্যাপক ভেদ মাত্র দেখা যায়। সেখানে রাজশাসন যে যে বিষয় গ্রহণ করে, সমাজশাসন সেগুলিকে ত গ্রহণ করেই, তদ্ভিন্ন অপর অনেকানেক ব্যাপারেও সমাজ শাসনের হস্ত বিস্তৃত হয়। চুরির নিষেধ রাজশাসন হইতেও হয়, আর সমাজ শাসন হইতেও হয়। কিন্তু 'এই এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিবে' ইত্যাদি কথা সমাজ শাসনের মুখে শুনা যায়, রাজশাসন এমন সকল বিষয়ে বিশেষ বিমুখ বলেন না। বস্তুতঃ রাজশাসন অপেক্ষা সমাজের শাসন অধিকতর ব্যাপক। কিন্তু তাহা হইলেও এই বঙ্গদেশে সমাজ শাসনের গৌরব বড় অল্প নহে। যে দেশে রাজায় এবং সমাজে ভিন্ন ভাব সে দেশে রাজা এবং রাজপুরুষেরা সমাজের রক্ষিতা এবং নেতা না হইয়া তাহার প্রতি উদাসীন বা তাচ্ছিল্য অথবা ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ সম্পন্ন, সেখানে সমাজ শাসনের বল কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সমাজ শাসন কুণ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ জাতীয় ভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়, জনগণের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতির ন্যূনতা জন্মে এবং ধর্ম্মবুদ্ধির মূল অশক্ত হইয়া পড়ে।

আমাদের এই পরাধীন দেশে এখন ঐরূপ হইতেছে। আমাদের রাজা ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী; এবং অনেকস্থলেই আমাদের সামাজিক নিয়মের এবং শাসনের বিদ্বেষ্টা। কোন অপরাধের জন্য কাহার ধোপা নাপিত হুঁকা বন্ধ করা, তাহাকে একঘরিয়া করা প্রভৃতি সামাজিক শাস-

নের সহিত রাজপুরুষেরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না। বরং যাহার প্রতি ঐরূপ সমাজ শাসন বিহিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি যদি রাজদ্বারে যাইয়া নালিশ করে তবে কোনরূপে দণ্ডবিধি আইনের মধ্যে ফেলিয়া উক্তরূপ সামাজিক শাসন বিধানকারী সমাজের নেতৃবর্গকে দণ্ডিত করিতে পারা যায় কি না, সেই দিকেই যেন প্রথমে রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি যায় বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। "আক্রমণ" "ভয় প্রদর্শন" "মিথ্যাপবাদ রটন" প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধে ইংরাজী দণ্ডবিধি আইনের ধারাগুলি এমনি দূরব্যাপী যে কাহাকেও সমাজ শাসনে শাসিত করিবে অথচ দণ্ডবিধি আইনের এইরূপ কোন একটি ধারার মধ্যে পড়িয়া দণ্ডনীয় হইবে না, এরূপ হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে যদি সমগ্র সমাজের লোক একজোট হয়, যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে অপরাধীর প্রতি সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে, অপরাধীর সহিত সমাজস্থ সকলের বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করত সমাজ শাসন অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে। মনে কর কোন ব্যক্তি কোন গৃহস্থের বয়স্থা বিধবা কন্যাকে কুপথগামিনী করিল। ইংরাজী আইন ত উহাকে দোষ বলিয়াই ধরিবে না। হিন্দু সমাজের চক্ষে অপরাধ কিন্তু বড় গুরুতর! অপরাধীকে এক ঘরিয়া করিয়া দণ্ড দিবার চেষ্টা হইল। যদি গ্রামশুদ্ধ—দেশশুদ্ধ হিন্দুর মনে এই অপরাধের উপর প্রকৃত হিন্দু সন্তানোচিত বিদ্বেষ বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে অপরাধী নিজ গ্রামে, এমন কি দেশের মধ্যে কুত্রাপি দাস দাসী আত্মীয় স্বজন বন্ধু পাইবে না। তখন অগত্যা তাহাকে সমাজের পায়ে পড়িয়া সমাজ কর্ত্তৃক বিহিত হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তাদিরূপ শারীরিক ও আর্থিক দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে এবং সেই দণ্ডের দৃষ্টান্তে অপরেও অনেকটা আত্মসংযম শিক্ষা করিবে—ওরূপ অপরাধ করিতে আর সাহসী হইবে না। কিন্তু ফলে আর এখন সেরূপ হয় না। দেশমধ্যে ধর্ম্মভাবের ন্যূনতা ঘটায় অপরাধী ব্যক্তিকে আর আজ কাল একক হইয়া পড়িতে হয় না। অর্থবল থাকিলে অথবা সমাজের নেতাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষভাব আছে কৌশলপূর্ব্বক

বিশিষ্টরূপে তাহার উদ্রেক করিয়া ফেলিতে পারিলে, সকল অপরাধী ব্যক্তিই একটা দলাদলি বাধাইয়া ফেলিতে পারে।

(১) "উনি এক ঘরে কর্ব্বেন বলেছেন, কেন উনি সমাজের ষোল আনা নাকি! আমিও ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দু দশ টাকা দিয়া থাকি; আমারও লোক বল আছে। দেখি ওঁর দলেই বা কজন হয়, আমার দলেই বা কজন থাকে।" (২) "তুমি যখন আমার কাছে আসিয়া পড়িয়াছ তখন তোমার কোন চিন্তা নাই। দেখি কাহার সাধ্য তোমাকে একঘরে করে। আপনার বেলা এক রকম, অপরের বেলা অন্য নিয়ম! আহা! কি সাধু পুরুষ রে! নিজের দোষগুলি একবার স্মরণ করিয়া দেখুন না। নিজের ভাগিনেয়ের চরিত্র স্মরণ করুন না" (৩)—তোমাকে এক ঘরে করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে? কাল যার বাপ গামছা কাঁধে ক'রে বাজার ক'রে মাসে আড়াই টাকা রোজগার করিত, আজ ঠিকেদারীর চুরীতে তার কিছু টাকা হয়েছে ব'লে সে যা ইচ্ছা তাই করবে নাকি? শর্ম্মা বেঁচে থাক্তে ত তা হচ্চে না। এখনও মগের মুল্লুক হয় নাই!"—এরূপ কথার প্রয়োগ এবং তদনুরূপ ব্যবহার অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়!

সমাজ মধ্যে ধনলোভ এবং ঈর্ষা বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া অধর্ম্মের প্রতি লোকের ঘৃণা কম হইয়া পড়াতেই এদেশে সমাজের শাসন ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দলাদলিরও প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। অপরাধীর পক্ষ গ্রহণ করিতে কাহারও আর লজ্জাবোধ বা সঙ্কোচ হইতেছে না। সমাজের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা আর তত পরকালের ভয় করেন না; দূরদর্শন অভাবে সমাজে নৈতিক শাসনের জন্যও তাঁহারা আর তত একাগ্র নহেন। সুতরাং সমাজের এক অংশ দুষ্টের দমন ইচ্ছা করিলে অপর এক অংশ আগ্রহসহকারে অপরাধীর সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়! দলাদলি একবার প্রকৃত প্রস্তাবে বাধিয়া গেলে স্বপক্ষীয় দুষ্টের পালনই যেন পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। দলাদলির আক্রোশে এতটা ধর্ম্ম লোপ হয় যে তজ্জন্য কোথাও কোথাও জ্ঞাতিদিগের মধ্যে অশৌচগ্রহণ এবং একত্রে ঘাট কামান প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মানুযায়ী দেশব্যাপী প্রথা সকলেরও ব্যতিক্রম হইয়া নৈতিক অবনতির অতি শোচনীয় অবস্থার

সূচিত করে। অথচ ঐ দলাদলির মধ্যে কোন দুষ্টের দমনের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এখন অধিকাংশ দলাদলিই বিষয় সম্পত্তি লইয়া অথবা শুধু ধনগর্ব্বিত জ্ঞাতিদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যাসম্ভূত মনান্তর হেতু গ্রামের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক দলবন্ধন মাত্র। এই প্রকার দলাদলি একান্তই ধর্ম্মহানি কর। সাধারণ মানুষ্যকে খাটি রাখিবার জন্য সামাজিক শাসন একান্তই প্রয়োজনীয়। এবং পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে দলাদলি ঘটিলে সামাজিক শাসনের কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণেই নষ্ট হয়। মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি দমন জন্য সামাজিক শাসন ইংরাজদিগের মধ্যেও কমিতেছে বটে, কিন্তু এখনও বেশ প্রবল আছে। এক সময়ে উহাঁরা ধর্ম্মমতবাদ সম্বন্ধেও সমাজের শাসন প্রয়োগ করিতেন। রোমান কাথলিকেরা এবং প্রোটেষ্টাণ্টেরা উভয়েই সমাজ মধ্যে প্রতিপক্ষীয় মতাবলম্বীদিগের স্থান দিতে চাহিতেন না —সকলেই কাথলিক হয় বা সকলেই প্রোটেষ্টাণ্ট হয়, বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সেরূপ চেষ্টা করিতেন। কাথলিকে এবং প্রোটেষ্টাণ্টে বিবাহাদি এমন কি আহারাদি পর্য্যন্ত সমাজশাসনে বন্ধ ছিল। কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনীর গর্ভজাত সন্তান ইংলণ্ডের রাজাসন পাইবে না আজও সেই প্রাচীনকালের দলাদলি প্রসূত ব্যবস্থা প্রবল রহিয়াছে। এখন মতবাদাদি সম্বন্ধে উহাঁদের মধ্যে সামাজিক শাসন ওরূপ প্রকট নাই বটে, কিন্তু আচার ব্যবহার বেশ ভূষা সম্বন্ধে শাসন খুবই আছে। অনেক গুরুতর নৈতিক দোষকে ইংরাজেরা সামাজিক দোষ বলিয়াই ধরেন না বটে, এবং অনেক সময়ে স্বজাতীয়ের পক্ষপাতিতা জন্য সমস্ত নীতির উপর পদাঘাত করাই উহাঁরা উচিত মনে করেন বটে, কিন্তু যাহা উহাঁদের সমাজ মধ্যে দোষ বলিয়া স্থির আছে, তজ্জন্য সামাজিক শাসন বেশ দৃঢ়রূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্যর চার্লস ডিলকি, পার্ণেল প্রভৃতি বিশিষ্টরূপ উচ্চপদস্থদিগের চরিত্র সম্বন্ধীয় অপরাধ ইংরাজ সমাজে মার্জ্জনীয় বোধ হয় নাই; এবং সমাজের শাসনে উভয়ে অনেকটা উপযুক্তরূপেই কষ্ট পাইয়াছেন। ন্যায়ান্যায় নির্ব্বিশেষে সকল অবস্থায় ইংরাজের পক্ষসমর্থন না করিলে উহাঁরা আপনাদের মধ্যে সামাজিক দণ্ড প্রয়োগ করেন এবং সেই দণ্ডের প্রয়োগ হইলে উহাঁদের সমাজে কি ধরণে কার্য্য চাল তাহা

লর্ড রিপনের ইলবার্ট বিল, জষ্টিস হোয়াইট কৃত ইংরাজহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড এবং লর্ড লিটনের ফুলার মিনিট সম্বন্ধে দেশীয় ইংরাজদিগের ব্যবহার এবং ঐ দণ্ডের ভয়ে কি হয় তাহা ডিফেন্স আসোসিয়েশন, নানাস্থানে ইউরোপীয় অপরাধী সম্বন্ধে ইউরোপীয় জুরীদিগের বিচার ও ইংরাজ সদস্য নির্ব্বাচন সমিতি সমূহের ব্যবহারাদি স্মরণ করিলেই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। উহাঁরাও এক ঘরে করেন—সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অভিনন্দনাদি করেন না, "ক্লাবে" লয়েন না। এদেশে ইংরাজ রাজপুরুষেরা অনেকটা প্রকাশ্য ভাবেই আপনাদের মধ্যে সামাজিক দণ্ড প্রয়োগে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং উহাঁদের সমাজের একেবারে অপ্রতিহত ক্ষমতা! তবে দুষ্টাচারের বিরুদ্ধে ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ কম হয়, "দল ছাড়াই" উহাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অপরাধ বলিয়া গণ্য।

একটি কথা এই যে, সহর অঞ্চলে পরস্পরের কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ একেবারে ওদাসীন্য জন্মিতেছে তাহা কোন অংশেই হিতকর নহে। ইহা অপেক্ষা পল্লীগ্রামের দলাদলিও ভাল। উহা সমাজের ভগ্নাবস্থার দ্যোতক। সহরের ব্যাপার সমাজের একেবারে অস্তিত্ব লোপের সূচনা করে! দলাদলিতে তবুও কতকটা শাসন থাকে; সুতরাং লোকের কতকটা চক্ষুলজ্জাও থাকিয়া যায়। প্রকাশ্য আন্দোলন উপেক্ষা করিবার উপযোগী নির্লজ্জতা ত আর সকলের নাই; এবং সকল অপরাধীর জন্যই ত বহু অর্থ ব্যয়ে দলাদলির সৃষ্টি হয় না। সেই জন্য দলাদলি সত্ত্বে এখনও পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে অপরাধীর প্রকৃত শাসন হয়।

ষোল আনা সমাজ লইয়া একমাত্র দল এবং দুষ্টাচারের শাসনে সমস্ত সামাজিক বল প্রযুক্ত—এই অবস্থাই একান্ত প্রার্থনীয়। দলাদলির প্রাবল্যে ক্ষমতাপন্ন অপরাধীর সুবিধা এবং নিরীহ ভদ্রলোকদিগের কষ্ট হয় এজন্য উহা বড়ই মন্দ জিনিস! সমাজের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে সামান্য ঈর্ষ্যাদ্বেষ জনিত দলাদলির পোষণ দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য অশান্তির অবার্থ বীজ বপন করেন। দলাদলিপ্রধান গ্রামে পারিবারিক শাসন ও ভ্রাতৃবাৎসল্যাদি

গুণ কমিয়া যায়। "ঘরে আগুন দিব, বহিঃশত্রুকে বা ভিন্নজাতীয় লোককে —বাড়ীর অংশ বেচিব"—এ সকল দুষ্প্রবৃত্তির মূল দলাদলি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে ইহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের কারণ। অভিমান ছাড়িয়া বিনীত হইয়া এমন কি সাধারণে যাহাকে প্রথম প্রথম হীনতা বলিবে—তাহাও স্বীকার করিয়া দলাদলি মিটাইয়া ফেলা উচিত। যিনি তাহা করিতে পারেন তিনিই মহৎ। সাধারণে তাঁহাকে অবশেষে মহৎ বলিয়া জানিবে। আমরা জানি কোন গ্রামে দুই দল ছিল। একদলের যিনি প্রধান তিনি অপর দলের প্রত্যেক লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া বলিলেন যে, কর্ত্তাদের আমল হইতে আমাদের মধ্যে দুই দল চলিয়া আসিতেছে। আপনারা ভিন্ন গ্রাম ভুক্তদিগের দলে। কিন্তু কি জন্য তখন দলাদলি হইয়াছিল এখন তাহা অনেকের জানাও নাই। আমরা এখন এক গ্রামে দুই দল হইয়া থাকি কেন?"—বলা বাহুল্য যে সে গ্রামে আর দলাদলি নাই।

আর এক ব্যক্তি গ্রামের মধ্যে কোন দলাদলিতেই যোগ দিতেন না। তাঁহার সহিত যাঁহাদের ভোজ্যান্নতা ছিল তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি বাধিলেও তিনি সকলের সহিতই পূর্ব্বের মত সম্বন্ধ রাখিতেন। তিনি সকল দলেই যাইতেন। সকল দলের লোকই তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। তিনি দলাদলির বাহিরেই রহিলেন। দলাদলিতে ঢুকিতে না চাহিলে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে দলাদলিতে সহজে পড়িতে হয় না। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি কখন মিউনিসিপাল ইলেক্‌শনে কাহার জন্য "ভোট" দেন নাই। তিনি বলিতেন—"আমাদের নিজেদের দলাদলিতেই যথেষ্ট সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আর বিলাতী দলাদলির আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই।"

অন্য বর্ণের দলাদলি নিজেদের মধ্যেও অনেকে জানেন। বিলাত ফেরতদিগকে লইয়া এখন একটা দলাদলির প্রধান কারণ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে বিলাত ফেরত বৈদ্য, কায়স্থ, তিলিকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হয়। সেটা যে কতটা মূর্খতা তাহার বর্ণনা করা যায় না। কোন বৈদ্য বা কায়স্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিবে তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দলাদলি কেন হয়? যদি বৈদ্য এবং

পারিবারিক প্রবন্ধ।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

মনুসংহিতা।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

সপ্তম সংস্করণ।

চুঁচুড়া।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কায়স্থ সমাজের কতক অংশও তাহাকে জাতিতে লয় এবং সে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি করে, তবে আর সে পতিত থাকিবে কেন? উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে—এবং প্রকৃতরূপে দীনতা স্বীকার করিলে সমাজের কর্ত্তব্য অপরাধের মার্জ্জনা করা। "মার্জ্জনা নাই" এরূপ অহিন্দু ভাব পোষণ করিতে নাই।

এইরূপ বুঝিয়া চলিলে সমাজের নেতৃবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেক দলাদলি মিটাইয়া এবং সকল দলাদলির তীব্রতা অনেকটা কমাইয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন ঘটিয়া উঠে যে একটা না একটা দলে না পড়িয়া সাধারণের বাঁচিবার উপায় নাই। কোন দলে যাইব না মনে করিলেও আত্মীয় কুটুম্বদিগের দলাদলি ক্রমে নিজের উপর আসিয়া পড়ে। আজকাল লোকের নীচতাও এত অধিক হইয়াছে যে যজমানেরা অন্যায় কার্য্যে নিজ নিজ পুরোহিতদিগের মত পাইবার প্রার্থনা করিতে সাহস করে এবং তাহা ন্যায়ান্যায় নির্ব্বিশেষে অনেকস্থলে পাইয়াও থাকে! পুরোহিতদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চ্চার ত্রুটি এবং সামান্য ধনলোভই এই শোচনীয় অবস্থার মূল। অনেকে অধীন, অনুগত, প্রজা এবং খাতক দিগকে বলপূর্ব্বক দলাদলির মধ্যে ফেলে। এমন কি দলাদলির পাণ্ডারা একস্থানে পুরুষানুক্রমিক কোন দেব মন্দিরের পূজারীকেও সুধু দলাদলির খাতিরে হৃতসত্ব করিতে ভীত হয় নাই। এ সকল অধর্ম্ম ও অত্যাচারের ভিতরে প্রত্যেক পরিবারের কি কর্ত্তব্য? ধীরভাবে উৎপীড়ন সহ্য ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। সকল অবস্থাতেই ন্যায়পক্ষে দৃঢ় থাকা ভিন্ন অন্য কোন উপদেশই গ্রহণ করিতে নাই। উহাতে ঐহিক কিছু কষ্ট হইলেও পরকালের উপকার হয় এবং পরিবার মধ্যে বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ দ্বারা ইহকালেও পুত্রাদির চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে যে মহৎ উপকার আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

———:::০:::———

—:*:—

পঞ্চাশোর্দ্ধ্বে বনং ব্রজেৎ

পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে পর লোকের গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া উচিত। এই শাস্ত্রীয় উপদেশের তাৎপর্য্য একটু ভাবিয়া বুঝিতে হয়। প্রথম কথা এই যে, পঞ্চাশৎ বৎসর শব্দটী এস্থলে গৌণার্থেই গৃহীত। উহা শরীরের একটি অবস্থা বিশেষকে জানায়, বয়সের বৎসর-সংখ্যামাত্রকে বুঝায় না। যে অবস্থায় শরীরের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির পর যে সাম্যাবস্থা হয়, তাহারও শেষ হইয়া জরা বা বার্দ্ধক্যের স্থিরতর প্রবৃত্তি হয়—পঞ্চাশৎ বৎসর শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য সেই অবস্থা। সচরাচর পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়া গেলেই এদেশে শরীরের সেই অবস্থা দাঁড়ায়। শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য এরূপে না বুঝিলে অনেক স্থানেই দোষ পড়ে। সকলের শরীর সমান নয়—কাহারও ৬০।৬৫ বৎসরেও শরীর বিলক্ষণ শক্ত থাকে—কাহারও আবার ৪০।৪৫ বর্ষেই বার্দ্ধক্য দশা প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়—পরিবারের বা স্বজনের বা সমাজের উপকার করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না, বস্তুতঃ সমাজ এবং স্বজনদিগের উপর একটী বোঝার মত ভার হইয়া থাকিতে হয়। উপকার করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইলেই সমাজ পরিত্যাগ করা উচিত। দ্বিতীয় কথা, বনে যাইতে হয়, এই কথাটিরও মুখ্যার্থ গৃহীত হইতে পারে না। সকল বুড়া মানুষেই বনে যাইবে, শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ হইতেই পারে না। এখন দেশে যত বন আছে, তাহাতে দেশের সকল বুড়া মানুষ ধরিতে পারে না। সকলে বনে গেলে বন আবাদ হইয়া উঠে—আর বনই থাকে না। তবে শাস্ত্রার্থ এই বুঝা গেল যে, নিজ শরীর পরোপকার সাধনে অসমর্থ হইয়া আসিলে সংসার ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকিবে, ইহাই বিধি।

এরূপ করায় সমাজকে অক্ষম অকর্ম্মণ্য লোকের ভার বহন হইতে

হওয়াতে, যাহাকে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়ার যে দোষ, তাহাও সমাজমধ্যে সংঘটিত হইতে পারে না। আর পরিবারের পক্ষে বিশেষ উপকার এই হয় যে, গুরুলোকের কথা লঙ্ঘন করিয়া কাজ করায় পরিবারস্থ লোকের যে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে তাহাও হইতে পায় না। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ অক্ষম এবং অবুঝ হইলেই যদি বাটী হইতে চলিয়া যান, তবে প্রৌঢ়েরা আপনারা বুঝিয়া সুঝিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। তুমি বুড় হইয়াছ, এখন সময় কিরূপ পড়িয়াছে তাহা ঠিক বুঝিতে পার না—আপনার পূর্ব্বকালের সংস্কার যেমন, তাহারই অনুরূপে কোন কাজটী করিতে বা না করিতে চাও—কিন্তু তোমার ছেলে মেয়েরা বেশ দেখিতেছে যে, তুমি ঐ বিষয়ে ভুল বুঝিতেছ—তুমি যে কার্য্যের আদেশ বা নিষেধ করিতেছ, তাহাতে বিলক্ষণ ধনক্ষতি অথবা মানহানি কিম্বা কার্য্যধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। তাহারা করে কি?—তুমি বাপ কিম্বা মা কিম্বা অপর কোন গুরুলোক, তোমার কথা না শুনিলে তোমার প্রকাণ্ড অভিমান হয়, তোমার কথা শুনিলে তাহাদের বড়ই ক্ষতি হয়। তোমাকে বঞ্চনা করা ব্যতিরেকে তাহাদের ত উপায়ান্তর নাই? কিন্তু তাহা করিলে কি তাহাদের কপটাচার হয় না? এবং তজ্জন্য তাহাদের স্বভাব দুষ্ট এবং তোমার প্রতি তাহাদের চিত্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায় না? অতএব যাহাদের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত চিরজীবন এত যত্ন করিয়াছ, এখন আর তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদেরই ধর্ম্মে ব্যাঘাত করিও না, তাহাদের জীবনপথের কণ্টক স্বরূপ হইও না। যাহাদের চিরভক্তির পাত্র ছিলে, তাহাদের বঞ্চনার সামগ্রী হইও না—তাহাদের গালি খাইও না। তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও। যদি নিজের জীবিকার উপায় কিছু থাকে—তাহা হইলে ত কথাই নাই; স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পার; শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মচর্চ্চা, শিষ্টালাপাদিতে অবশিষ্ট জীবিতকাল অতিবাহিত করিতে পার। যদি নিজের কিছু না থাকে, এবং পুত্রাদির প্রতিই নির্ভর করিতে হয়, তাহাদিগের উপর যত অল্প ভার দিয়া চলে তাহাই ভাল—কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার চেষ্টা কর। আপনার অবশ্য করণীয় কার্য্যগুলি নিজ হস্তে সম্পন্ন করিলে শরীর বহুকাল পটু থাকে।

অতএব স্বপাকে খাও, নিজ ব্যবহারের জলাদি স্বয়ং আহরণ কর, আপনার বাসনগুলি আপনি মাজ—বেশ থাকিবে, খরচও কম লাগিবে, ছেলেদের উপর ভার লঘু হইবে। যদি পুত্রাদি হইতে সহজে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে বরং ভিক্ষা করিয়া খাইও, তথাপি তাহাদের গলগ্রহ হইও না। কারণ গুরুলোকেরা গলগ্রহ হইয়া পড়িলে পুত্রাদির ধর্ম্মহানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আমার এই সকল কথাতেই বুঝা যাইবে যে, আমি বৃদ্ধদিগকে নির্ম্মায় হইতে অর্থাৎ পরিজনদিগের প্রতি প্রীতিমমতাপরিশূন্য হইতে বলিতেছি না। বরং প্রীতি মমতা বাড়াইতেই বলিতেছি, এবং পরিজনদিগের ধর্ম্মরক্ষার অনুকূল যে ব্যবহার, তাহারই উপদেশ দিতেছি। তুমি বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইয়াছ, নিজ বাটী হইতে পৃথক্ হইয়া থাক—পরিজনদিগকে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন অথবা তোমার অভিমানের ভয়ে তোমাকে বঞ্চনা করিতে বাধ্য করিও না। একান্ত মনে তোমার সেবা শুশ্রূষা করাতেও তাহাদিগের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা তুমি স্বতন্ত্র হইয়া থাকিলে যেমন অবিমিশ্রভাবে হইবে, তাহাদিগের মধ্যে জড়াইয়া থাকিলে তেমন বিশুদ্ধভাবে হইবে না। তুমি তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিলে তাহারা আপনাদের সুবিধা হইলেই ধীরে সুস্থে তোমার তত্ত্ব লইবে, তোমার নিকটে যাইবে, তোমার সেবা করিয়া সুখী এবং ধর্ম্মভাগী হইবে। যখন তাহারা ঘর করনার নানা জ্বালায় বিব্রত, রাজদ্বারে নালিস রুজু হওয়াতে উকীল মোক্তারদের সম্‌জাইবার জন্য উদ্বিগ্ন, সন্তান সন্ততির পীড়ায় উপশমের নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল, এমন সকল সময় তোমার সেবাও তাহাদের পক্ষে ক্লেশদায়ক। সেই ক্লেশ হইতে এবং তজ্জনিত পাপভার হইতে পরিজনকে বিমুক্ত রাখা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ফরাশিদিগের আইন অনুসারে ত্রিষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি উপার্জ্জনক্ষম হইলে পুত্রের নিকট হইতে ৵০ হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত এবং পৌত্রের নিকট হইতে তদর্দ্ধ পরিমিত খোরাকীর দাবী করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে কথা অথবা এক্ষণে এতদ্দেশ প্রচলিত ইংরাজী আইনের কথা বলিব না। সে আইনের মতে প্রসবিনী মাতারও খোর পোষের জন্য কৃতী পুত্রের বিরুদ্ধে নালিস চলিতে পারে না!

আমাদিগের সমাজ এই বিষয়ে যেরূপ অভিমতি ধারণ করে তাহাই কিছু স্পষ্টতঃ বিবৃত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কারণ, এক্ষণে অনেকানেক পরিবারের মধ্যে কৃতী সন্তানদিগের পিতৃগণকে অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং পুত্রদিগের প্রতি তাঁহারা যে ভার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভার বহনে পুত্রেরা অনেকস্থলেই উদ্বেজিত হইয়া আপনাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মপথ দেখিতে পারেন না।

কেন?—আমি উহাদের জন্য অত শত করিয়াছি, উহারা আমার জন্য কিছুই করিবে না? করিবে বই কি। কিন্তু উহারা অপর কাহার জন্য ক্লেশ পাইতেছে শুনিলে কি তোমার লাগে? তা ত লাগে না; প্রত্যুত যাহার জন্য উহারা ক্লেশ পায় তাহারই উপর তোমার ক্রোধ জন্মিয়া উঠে। তবে নিজের উপরেই একটু ক্রোধ না হয় কেন? ও কথা নয়—তুমি যখন পুত্রাদির জন্য অত শত করিয়াছ—তখন কি উহাদিগের স্থানে প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশায় করিয়াছিলে? যদি তাহা করিয়া থাক, তবে যে লোকে বলে এবং শাস্ত্রেও বলে পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ হয় না, সেটী মিথ্যা কথা। ফলে তা নয়। পিতা মাতা পুত্রাদির জন্য যাহা করেন, তাহা ঋণই নয়, এবং ঋণ নয় বলিয়া উহার পরিশোধও নাই।

—:*:*:—

সম্পূর্ণ

আচার প্রবন্ধ।



আচারাল্লভতেহ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃপ্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণং॥
অনুসংহিতা॥



৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

চুঁচুড়া
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র॥

শ্রীমান্ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তথা অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা বটুকদেব মুখোপাধ্যায় তথা রামদেব মুখোপাধ্যায় তথা অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা ভবদেব মুখোপাধ্যায় তথা গণদেব মুখোপাধ্যায় তথা কুমারদেব মুখোপাধ্যায় তথা সোমদেব মুখোপাধ্যায় তথা সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীমানেরা !

তোমরা কেহ আমার পৌত্র কেহ বা দৌহিত্র। পরম স্নেহের ভাজন। দেশীয় পরম পবিত্র সদাচার-পালন ইহ এবং পারলৌকিক হিতসাধন পক্ষে কিরূপ কার্য্যকরী তাহার জ্ঞান বিদেশীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সজ্ঞান ও সভক্তিক শাস্ত্রশিক্ষার ত্রুটিতে দেশ মধ্যে ন্যূন হইবার উপক্রম হইতেছে। শাস্ত্রজ্ঞানের ও সদাচার পালনের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই পরমধন তোমাদের মধ্যে অবিকৃতভাবে থাকিয়া যায় ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। তোমাদেরও তোমাদের ন্যায় স্বদেশীয় যুবক ও বালকবৃন্দের আচার শিক্ষার আনুকূল্যে এবং স্বজাতীয় পরম পবিত্র শাস্ত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধির সাহায্যে এই আচার প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি। তোমাদের নামে আশীর্ব্বাদী দিলাম ইতি।

চুঁচুড়া
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪।

শুভাকাঙ্ক্ষি
ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের সাহায্য লওয়া হইয়াছে—

১। ব্রতরাজ (বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞকৃত) দাক্ষিণাত্যের

২। হেমাদ্রি (সোসাইটীর ছাপা)

৩। রণবীর ব্রত রত্নাকর [কাশ্মীরের]

৪। নির্ণয় সিন্ধু

৫। ধর্ম্মসিন্ধু

৬। প্রাতিবার্ষিক পূজা কথাসংগ্রহ [রামচন্দ্র] মিথিলার

৭। রঘুনন্দন

৮। ভবদেব

৯। গোভিল গৃহ্য

১০। গুণবিষ্ণু

১১। মন্ত্র ব্রাহ্মণ

১২। ব্রতমালা

১৩। সর্ব্বসংকর্ম্ম পদ্ধতি

১৪। পঞ্জিকা :—গুজরাট, কাশ্মীর, ত্রৈলঙ্গ ও কাশীর।

১৫। কাশীতে প্রস্তুত [ভিন্নদেশীয় পণ্ডিতদিগের সাহায্যে] তালিকা

১৬। ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব

সূচীপত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	উপক্রমণিকাধ্যায়	১
২।	নিত্যাচার প্রকরণ	
	প্রথম অধ্যায়—প্রাতঃকৃত্য	২৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়—পূর্ব্বাহ্ণকৃত্য	৪৯
	তৃতীয় অধ্যায়—মধ্যাহ্ণকৃত্য	৬২
	চতুর্থ অধ্যায়—অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণ ও রাত্রিকৃত্য ...	৯২
	পঞ্চম অধ্যায়—প্রকরণের উপসংহার	১০৮
৩।	নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ	
	প্রথম অধ্যায়—প্রকরণের বিষয় নিরূপণ ...	১১৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়—সংস্কার কর্ম্ম, গার্ভসংস্কার ...	১৩২
	তৃতীয় অধ্যায়—সংস্কার কর্ম্ম, শৈশব সংস্কার ...	১৪২
	চতুর্থ অধ্যায়—সংস্কার কর্ম্ম, কৈশোর সংস্কার ...	১৪৯
	পঞ্চম অধ্যায়—সংস্কারকর্ম্ম, যৌবন সংস্কার ...	১৫৯
	ষষ্ঠ অধ্যায়—শ্রাদ্ধকৃত্য	১৭৪
	সপ্তম অধ্যায়—ব্রত পূজা পর্ব্বাদির বিষয় ...	১৮৯
৪।	পরিশিষ্ট—ব্রত পূজাদির তালিকা	২০৭

আচার প্রবন্ধ।

উপক্রমণিকাধ্যায়।

"ধর্ম্মোঽস্য মূলানি"

সদাচারের মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধি বিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য।

আপাত দর্শনে আমাদের মধ্যে এই পাঁচটী দোষই বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। (১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অন্ন-চিন্তায় বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপন পূর্ব্বের ন্যায় মনঃসংযোগ সহকারে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধির সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা জন্মিয়া যাইতেছে। (২) বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধা-হীনতা জন্মিতেছে। এখন শৈশবাবধি যে ইংরাজী বিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কিছু মাত্র উল্লেখ থাকে না; প্রত্যুত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্র-জাতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই থাকে। সুতরাং শিক্ষার কাল হইতেই লোকের মনে শাস্ত্রাচারের প্রতি

অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। (৩) এতদ্দেশে শাস্ত্রাচার-বিহীন বিজাতীয় জনগণের ভূতিদর্শনেও শাস্ত্রাচারের প্রয়োজনীয়তা বোধটী ন্যূন হইয়া পড়ে এবং ঐ বিভব-সম্পন্ন বিজাতীয়েরা কিরূপে এবং কেমন সকল বিষয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার বিচার না করিয়া মোহবশতঃ দেশীয় জনগণ আপনাদের শাস্ত্রবিরোধী ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েন।

শাস্ত্রাচার লোপের উল্লিখিত তিনটী হেতুই আগন্তুক। ওগুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও দেশে অনেকটা শাস্ত্র জ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে এবং যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োঽধিক এবং চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে। এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। যেমন মলিন বস্তুদ্বারা বলবৎ ঘর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব্ব-মলিনতা বিদূরিত হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচার মালিন্য জন্মায়, তাহারই সম্যক্ অনুশীলনে ঐ মালিন্য অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের সারবত্তা বহু পরিমাণে যুক্তিমুখেও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। পূর্ব্বে ইংরাজী পড়িয়া দেশীয় যুবকেরা যেরূপ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় কথা কহিতেন এবং ব্যবহার করিতেন, এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রায় কেহই তেমন উন্মাদগ্রস্ত হয়েন না। (৩) যে ইংরাজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট হয় যে,

ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সমানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সম্বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষাদ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। লোকের মন যে ক্রমে ক্রমে এই তথ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং ইংরাজের অযথারূপ অনুকরণ যে এদেশে অনিষ্টকর এবং নীচপ্রকৃতিকতার লক্ষণ বলিয়াই অনুভব করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। এখন ইংরাজীতে কথা কহিবার সাধ, পেণ্টেলুন্ হ্যাট পরিবার সাধ, টেবিলে বসিয়া খানা খাইবার সাধ, অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সাধ যেমন হিন্দুকালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও মধ্যে তেমন নাই। বিলাত-ফেরতদিগের মধ্যে ঐ সকল সাধ এবং বিবি লইয়া বাহিরে বেড়াইবার নূতন সাধটী সম্প্রতি বাড়িয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারের সাধটা নাই বলিলেই হয়—বোধ হয়, উহাঁদেরও সংখ্যা আর কিছু বাড়িলে ওরূপ সকল সাধই মিটিয়া যাইবে।

অতএব শাস্ত্রাচার লোপের যে তিনটী আগন্তুক কারণ এখন প্রবল হইয়াছে স্বতঃই সে তিনটী কারণের প্রাবল্য উপশমিত হইতে পারে।

কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ের যে সাহজিক দুইটী দোষের নিবারণার্থ শাস্ত্রাচারের সৃষ্টি, শুদ্ধ কাল সহকারে অথবা অন্য কোন উপায়ে সে দোষ নিবারিত হইবার নহে। সে দুইটির নিবারণ এক মাত্র শাস্ত্রাচারের অবলম্বনেই সিদ্ধ হইতে পারে।

মনুষ্যে পশু-ধর্ম্ম এবং জড়-ধর্ম্ম দুইই আছে। পশুধর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি

হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম্ম। ঐ পশু-ভাবের ন্যূনতা সাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানব আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশস্ততা, এবং শরীরের পটুতা সম্বর্দ্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছব্যবহার আর্য্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। এগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্দ্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণ-সম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।

মনুষ্যে যে জড়ধর্ম্ম আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাঁহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে। শাস্ত্রকর্ত্তৃক সমস্ত জীবিত কালের উপযোগী বিশেষ বিশেষ কার্য্যের নির্দ্দেশ হওয়াতে জড়তাপ্রাপ্তির অবসর থাকে না। আবার শাস্ত্র বিনির্দ্দিষ্ট কাজগুলি এরূপ যে, তাহাদের যথোচিত সাধনে সাধারণতঃ শরীরের বলবত্তা এবং তেজস্বিতার বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্র একবারও আমাদিগকে একান্ত আলগা হইয়া পড়িতে দেন না। যথোচিত কালে এবং যথাযোগ্য অবস্থায় আমাদিগকে আহার, বিহার, নিদ্রাদি সেবন করিতে বিধিপ্রদান করেন। কিন্তু লোভ, সুখেচ্ছা, অথবা আলস্যের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতে দেন না।

শাস্ত্রাচারের এই জড়তা-নাশক গুণটীর প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য না করিয়া ইহার স্বেচ্ছাচার নিবারণের প্রতি সমধিক দৃষ্টি করা হয়; সেই জন্য দুইটী আপত্তির উত্থাপন হইয়া থাকে।

কেহ বলেন শাস্ত্রাচার সমস্ত প্রবৃত্তির পথ একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দেন। মনুষ্যের জীবনে কিছু মাত্র তেজস্বিতা থাকিতে দেন না। মনুষ্যকে নির্জ্জীববৎ করিয়া ফেলেন। কোন শান্তশীল সুবোধ ব্যক্তি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটী শুনিতে ছিলেন——

আত্মানং রথিনংবিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তঃ ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে মুখরজ্জু, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বরূপ জানিবে। ঐ অশ্বগণ বিষয়ভোগে গতিশীল। জ্ঞানিগণ বলেন যে, ইন্দ্রিয় এবং মনের যোগে আত্মা বিষয় ভোগ করেন। যিনি জ্ঞানহীন এবং মনদ্বারা অযুক্ত, তাঁহার রথ দুষ্ট অশ্বের দ্বারা বাহিত রথের ন্যায় হয়। যিনি সুবোধ এবং মনদ্বারা সংযুক্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সদশ্ববিশিষ্ট সারথির অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে।

তিনি শ্লোকগুলি শুনিয়া বলিলেন, অশ্বেরা দুষ্ট হইলে মনরূপ প্রগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে টানিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু যদি অশ্বেরা এমনি দুর্ব্বল হইয়া যায় যে আর চলিতেই না পারে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে, তাহাত বলা হইল না।

শাস্ত্রাচারের সম্বন্ধে এইরূপ একটি ভ্রম কখন কখন হইয়া থাকে। তাহার একটী কারণ শাস্ত্রাচারের জড়তা নাশক এবং তেজস্বিতা-সাধক-গুণের প্রতি লক্ষ্য না করা। অপর কারণ, শাস্ত্রাচারের মধ্যে গৃহস্থ কর্ত্তব্যে এবং বানপ্রস্থাদির কর্ত্তব্যে যে পার্থক্য আছে, তাহার অনুধাবন না করা। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে শরীরের পীড়ন বা ক্ষয় করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বকার লোকেরা অধিক পরিমাণে শাস্ত্রাচার পালন করিতেন। তাঁহাদের আহার অধিক, বল অধিক, এবং আয়ুষ্মত্তা

অধিক ছিল—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ এখনকার শাস্ত্রাচার বিহীন অলসদিগের ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় বলহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইত না।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, শাস্ত্রীয় বিধি সকল আমাদিগকে অশেষ বন্ধনে সম্বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। উহা একেবারেই আমাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রাচার স্বাধীনতা নষ্ট করে না। উহার দ্বারা জড়তার হ্রাস হওয়াতে প্রকৃত স্বাধীনতার বৃদ্ধিই হয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এই শীতকালে যখন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, অনেকেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না. রৌদ্র প্রখর হইলে তবে উঠেন, হয়ত বিছানায় বসিয়াই তামাক এবং চা খান। সমস্ত দিন তাঁহাদের শরীরে একপ্রকার জড়তা থাকিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি পালন পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঈশ্বর স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করত স্নান করিয়া আইসেন, তাঁহাদের শীত-ভীতি থাকে না, জড়তা থাকে না, সজীবতা এবং কার্য্যক্ষমতা উদ্রিক্ত হয়, এবং সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে যায়। ঐ দুই প্রকার লোকের মধ্যে কাহারা স্বাধীন—শীতভীতেরা, না প্রাতঃস্নায়ীরা?

বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যও হয় সামান্য প্রবৃত্তির, না হয় বিধি ব্যবস্থার বশ হইয়া থাকে। এ দুয়ের মধ্যে অবিচারিত প্রবৃত্তির বশ হওয়া অপেক্ষা বিচারিত বিধির বশ হওয়াই শ্রেয়ঃ।

উপনিষদে এই কথাই সুদৃঢ়রূপে এবং রূপকালঙ্কারে উক্ত হইয়াছে। "দেবাসুরাঃ সংযেতিরে"—দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগবান ভাষ্যকার বলেন—শাস্ত্রোত্তাসিত ইন্দ্রিয়গণ দেবতা, আর স্বাভাবিক বা তমোগুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণ অসুর। উহাদিগের যুদ্ধক্ষেত্র মনুষ্য শরীর। ইন্দ্রিয় বৃত্তির তমোগুণ নির্জ্জিত হইলেই দেবতার জয় হয় অর্থাৎ শাস্ত্রাচারের ফল হয়। সেই জন্য ধর্ম্মই শাস্ত্রাচারের মূল।

"অসবঃ প্রকাণ্ডঃ"।

সদাচাররূপ মহাবৃক্ষের প্রকাণ্ড বা গুঁড়ি আয়ুঃ। অর্থাৎ সদাচার সেবনে মনুষ্যের আয়ুঃ দৃঢ় এবং দীর্ঘ হয়। আয়ুষ্মত্তার প্রধানতম লক্ষণ দ্বাদশটি বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। (১) পূর্ব্বপুরুষদিগের, বিশেষতঃ পিতা মাতার আয়ুষ্মত্তা (২) অবিকলাঙ্গ দেহ লইয়া জন্ম-গ্রহণ (৩) দুর্ঘটনার অভাব (৪) স্বাস্থ্যকর আবাস (৫) স্বাস্থ্যকর আহার (৬) উপযোগী আবরণ (৭) পরিচ্ছন্নতা (৮) মিতাহার (৯) মিতাচার (১০) নিয়মানুগামিতা (১১) দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা (১২) মনের শান্তি।

এই দ্বাদশটীর মধ্যে প্রথমের তিনটী কোন মনুষ্যের নিজের আয়ত্ত হয় না। (১) জন্মগ্রহণ জীবের স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার নহে। যে পূর্ব্ব পুরুষদিগের আয়ুঃ দীর্ঘ তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত হইব, কোন সন্তান এরূপে পিতা মাতার নির্ব্বাচন করিয়া জন্মিতে পারে না। (২) আমি দোষশূন্য শরীর লইয়া জন্মিব, বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিব না, ইহাও সন্তানের স্বেচ্ছার বিষয়ীভূত হয় না। (৩) আমার জীবিতকালের মধ্যে, বিশেষতঃ শৈশবে, কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিবে না, কিম্বা বিকলাঙ্গ করিবে না, অথবা প্রাণে নষ্ট করিবে না, তাহা সমুদায় জানিয়া, বুঝিয়া, প্রতিবিহিত করিয়া চলা স্বতঃই মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ জীবনের রক্ষা, বলাধান এবং বিস্তৃতির উল্লিখিত তিনটী হেতুকে প্রাক্তন হেতু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ঐগুলি পুরুষকারের সর্ব্বতোভাবেই অনায়ত্ত।

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের অনায়ত্ত হইলেও ধারাবাহিক পুরুষ পরম্পরায় তেমন অনায়ত্ত বলিয়া বোধ হয় না। সকল পিতা মাতাই আপনাপন শরীর সুস্থ, সবল এবং স্থায়ী করিবার নিমিত্ত কতকটা উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত সদুপায় সমস্ত পরবর্ত্তী পুরুষদিগের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া চলিলেই বংশে আয়ুষ্মত্তার সম্বর্দ্ধন

হইতে পারে। সেইরূপ চেষ্টার দ্বারাও বংশের মধ্যে বিকলাঙ্গতাজননের নিবারণ হইতে পারে; আর পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞানের বাহুল্য এবং সহানুভূতির আধিক্য থাকিলেও দুর্ঘটনাদি দোষের অনেক পরিহার হইতে পারে। অজ্ঞ এবং নির্ব্বোধ এবং বর্ব্বর লোকদিগের মধ্যে দুর্ঘটনার আধিক্যে যত মনুষ্য ও মনুষ্যশিশুর অকাল মৃত্যু হয়, বিদ্যাবান, বুদ্ধিমান এবং সুসভ্য জনগণের মধ্যে তেমন হয় না।

অতএব নিশ্চিত হইল যে, আয়ুষ্মত্তার প্রথমোক্ত তিনটী হেতু যদিও মনুষ্যবিশেষের আয়ত্তাধীন হয় না, তথাপি পুরুষপরম্পরার এবং পুরুষসমষ্টির কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত হয়। পুরুষপরম্পরা এবং পুরুষসমষ্টি এই দুইটীর সম্মিলিত একটি নাম সমাজ। অতএব আয়ুষ্মত্তার প্রাক্তনরূপ হেতুগুলি কিয়ৎ পরিমাণে সমাজের আয়ত্তাধীন।

আয়ুষ্মত্তার প্রথম তিনটি হেতুর পরবর্ত্তী দ্বিতীয় হেতুত্রয়ও শৈশবে কোন ব্যক্তির নিজের আয়ত্ত হইতে পারে না। স্বাস্থ্যকর আবাস, আহার এবং আবরণ শিশু স্বয়ং বুঝিয়া অথবা চেষ্টা করিয়া আপনার নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে পারে না। অথচ যদি শৈশব হইতে ঐ সকল বিষয়ে ত্রুটি জন্মে, তবে শরীরের দৌর্ব্বল্য, অপটুতা এবং রোগিতার সূত্রপাত হয়। পিতা মাতা ছেলেকে যেমন ঘরে রাখেন, যেরূপ আহার এবং বস্ত্র দেন, এবং দেশের ভাব যেরূপ পবিত্র বা দূষিত থাকে, বাল্যাবস্থাতে শরীরের ভাব তাহার অনুযায়ী হয়। যদি বাল্যের অভিভাবকেরা স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং সেই সকল উপায় অবলম্বনে সক্ষম হয়েন, আর যদি সামাজিক শাসনের প্রভাবে দেশ পবিত্র এবং সংক্রামক রোগ-পরিশূন্য হয়, তাহা হইলে শিশু নীরোগ থাকিয়া বর্দ্ধমান হয়, নচেৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত অথবা রুগ্নদেহ হইয়া কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। অতএব এই তিনটী বিষয়েও মনুষ্যের আয়ুষ্মত্তা পুরুষ পরম্পরার এবং পুরুষ সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের আয়ত্তাধীন।

আয়ুষ্মত্তার অপর ছয়টী হেতুর বল মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বিশেষ-রূপে কার্য্যকারী হয়। ঐ গুলিতে প্রাক্তন অথবা পরকীয় শক্তির প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত ন্যূন এবং পুরুষকারের শক্তিই বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট। পরিচ্ছন্ন থাকা, মিতাহার এবং মিতাচার হওয়া, সকল কার্য্যে নিয়মানুগামী হইয়া চলা, আপনাকে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করিয়া তোলা, এবং মনকে উদ্বেগ-শূন্য, শান্তিময় করিয়া রাখা, এই কাজগুলি মানুষ নিজের জন্য নিজেই অনেকটা করিতে পারে।

কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে পুরুষকারের প্রাধান্য আছে বলিয়া যে, উহারা একমাত্র পুরুষকারেরই অধীন, প্রাক্তন বা পরকীয় শক্তির একান্ত অনধীন, তাহা নহে। প্রথমতঃ ঐ সকল বিষয়ে যথাকালে জ্ঞান প্রাপ্তির প্রয়োজন, তাহা অন্যের স্থানে পাইতে হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্ত জ্ঞানের অপ্রমাদ, স্মরণ এবং প্রয়োগ কতক প্রাক্তন-শক্তিমত্তার এবং কতক অপরের দৃষ্টান্ত দর্শন সাপেক্ষ।

অতএব আয়ুষ্মত্তার যে বারটী বিভিন্ন হেতুর নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা ত্রিবিধ; প্রাক্তন, সামাজিক, এবং পৌরুষ। ঐ ত্রিবিধ শক্তি এরূপে পরস্পরে অনুস্যূত, যে প্রথমটী ছাড়িয়া দ্বিতীয়ের গতি নাই, এবং ঐ দুইটীকে ত্যাগ করিয়া তৃতীয়েরও গতি হইতে পারে না।

আমাদিগের শাস্ত্রোপদিষ্ট আচার পদ্ধতি ঐ ত্রিবিধ শক্তির অনুকূলরূপে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বদিক্‌দর্শী। এই জন্য যাঁহারা শুদ্ধ ইউরোপীয় শাস্ত্রাদির এক মাত্র পুরুষকার-মূলক বিচার প্রণালী হৃদ্গত করিয়াছেন এবং সেই প্রণালীর সহিত মিলাইয়া দেশীয় শাস্ত্র-পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের চক্ষে আচার কাণ্ডের অনেক কথাই অপ্রাসঙ্গিক অথবা উপধর্ম্ম-মূলক বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাঁহারা শাস্ত্রবিহিত আচার অমান্য করিয়া নানা প্রকারে দোষভাগী হয়েন। অনেকেই স্বল্পায়ু হইয়া পড়েন।

ঐ সকল লোকের পক্ষে সদাচার বিধি বুঝিবার অপর একটী ব্যাঘাতও উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাও অজ্ঞতা-মূলক। মনুষ্যের করণীয় প্রায় সকল বিষয়েই সম্ভবিতব্যতার বিচার সমধিক পরিমাণে থাকে, অব্যভিচারী তথ্যের প্রাপ্তি অতি স্বল্পস্থলেই হইতে পারে। মনুষ্যকে যাহা কিছু করিতে হয়, তাহাতে কি হওয়া সম্ভব কি বা অসম্ভব, ইহা ভাবিয়াই করিতে হয়। এইটীই হইয়া থাকে এবং ইহাই করিতে হইবে, অত্যল্প বিষয়েই এরূপ দৃঢ় উক্তির প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু বিচারের প্রণালী এরূপ হইলেও শিক্ষা-কার্য্যে সম্ভবিতব্যতার গণনা করিতে গিয়া সন্দিগ্ধতার আভাস প্রদান করিলে চলে না। যদি শিক্ষক সম্ভবিতব্যতার গণনারম্ভ করেন, তাহা হইলেই ছাত্রের হৃদয়ে শিক্ষার দৃঢ়তা ন্যূন হইয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্তের বা ফলের স্থিরতা জন্মে না। এই জন্য মূলে সম্ভবিতব্যতার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারদ্বারা যাহা সমধিক পরিমাণে সম্ভবিতব্য বলিয়া অবধারিত হয়, তাহাই ধ্রুবতথ্য বলিয়া শিক্ষিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিকে উচ্চ ছাদের উপর হইতে পড়িয়া যাইতে উন্মুখ দেখিলে "তুমি মরিয়া যাইবে" বলিয়াই তাহাকে নিবারিত করা হয়। ছাদ হইতে পড়িলেই ত সকলে মরে না, দেহের গঠন, পড়িবার ধরণ, নীচের মৃত্তিকার অবস্থা প্রভৃতির কথা ভাবিয়া "তোমার মরিবার সম্ভাবনা অধিক" এ কথা বলা হয় না।

শাস্ত্রও শিক্ষাদাতা। তিনি প্রভুর ন্যায় আদেশ করেন। তিনি পূর্ণমাত্র প্রত্যভিজ্ঞার ফলগুলিকে কার্য্যকর রূপে সুব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সুস্পষ্ট বিধি অথবা নিষেধ বাক্যের প্রয়োগ করেন। তিনি বিধি নিষেধ বাক্য প্রয়োগ সময়ে প্রাক্তন ও পুরুষকার ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ বিষয়ে সম্ভবিতব্যতা মাত্র প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না।

শাস্ত্রবিধির এই শিক্ষাদাতৃক প্রভুভাবটী স্মরণ করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই ভাবটীর স্মরণ না থাকায় মুগ্ধ আজিকার

সময়ের ইংরাজী শিক্ষিতেরাই যে কোন কোন স্থলে শাস্ত্রোক্তির অসাফল্য মনে করিয়া তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন এমত নহে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেও এবং অতি প্রধান প্রধান লোকেরাও ঐরূপ শ্রদ্ধাহীনতার দোষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বহুকালাবধি শাস্ত্রীয় বিধি সকলের অনুযায়ী তপস্যা পূর্ব্বক তাঁহার কাঙ্ক্ষিত ফললাভে বঞ্চিত হইয়া শাস্ত্র-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, রামমোহন রায়ও অনেকানেক পুরশ্চরণ এবং জপাদিদ্বারা সিদ্ধকাম না হওয়াতেই শাস্ত্রাচার পরিত্যাগী হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বুদ্ধদেব এবং রামমোহন উভয়েই যে, আপনাপন তপস্যাদির অনুরূপ ফলভাগী হইয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা স্ব স্ব কৃত তপস্যার দ্বারা বিশোধিত এবং উন্নমিত হইয়াছিলেন বলিয়াই আপনাপন মতবাদ প্রচারে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ফলাভিসন্ধান সহকারে তপস্যা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের তপস্যা রজোদোষাঘ্রাত হইয়াছিল। এই জন্য রাজসতপস্যায় যে ফল, অর্থাৎ প্রভাব, খ্যাতি এবং সম্মান বৃদ্ধি, তাহাই তাঁহাদের লাভ হইয়াছিল।—যাদৃশীভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই জন্যই শাস্ত্রে ফলাকাঙ্ক্ষার ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ—এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কথঞ্চন।

তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার; ফলে কোন অধিকার নাই।

উল্লিখিত ভগবদ্‌বাক্যের এবং শাস্ত্র বিধি মাত্রের প্রয়োগ আধ্যাত্মিক বিষয়েই করা হয়। কিন্তু সকল প্রকার কার্য্যের প্রতিই ঐ বিধি খাটে। আয়ুষ্মত্তাসম্পাদক যে সকল বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে গুলিও ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে কেবল বিধি প্রতিপালন জন্য সুপালিত হওয়া আবশ্যক। ফল খুঁজিতে গেলেই রজোগুণ পরিস্ফুট হয় এবং ফলগুলিকে বিকৃত করিয়া দেয় অথবা আদবেই ফলিতে দেয় না। কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে কএকটি ফুলের চারা দিয়া বলিয়া-

ছিলেন, এই গাছগুলি খন্ড করিয়া উহাদিগের গোড়ায় জল দিবে; উহাদিগের শিকড় মাটিতে বসিলেই দিব্য ফুল ফুটিবে। ছেলেটি পিতার আদেশ পালন করিল। কিন্তু প্রত্যহ গাছগুলিকে উপড়াইয়া দেখিতে লাগিল, গাছগুলির শিকড় বসিয়াছে কি না। ফুলের চারাগুলি অবশ্যই মরিয়া গেল। বস্তুতঃ বিধিবোধিত হইয়াই কার্য্য করিতে হয়। ঐ বালকের ন্যায় ফলান্বেষী হইতে নাই।

"কিন্তু যদি কোন ফলান্বেষণই না করিব, তবে যে বিধি প্রতিপালনে আদিষ্ট হইতেছি, তাহাই যে প্রকৃত বিধি তাহা কেমন করিয়া জানিব? আজিকালি শাস্ত্রাচারকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতেছে। কোন শিশু তাহার পিতৃক্রোড়ে উঠিয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টি করতঃ চন্দ্র দর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা! ও কি?" পিতা বলিলেন "উহার নাম চাঁদ"? সরলমনা শিশু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। জ্ঞান-বিরোধিকা সংশয়াত্মিকতা তাহার সরল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে চাঁদ শব্দটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিখিতে লাগিল। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করিত, "উহাকে কেন চাঁদ বলে? তবে পিতা তাহার প্রবোধার্থে আর কি বলিতে পারিতেন?—হয়ত ইহাই বলিতেন যে উহাকে সকলেই চাঁদ বলে। এই বলিয়া আর দুই এক জনের মুখ হইতেও 'চাঁদ' শব্দটি শিশুকে শুনাইতেন। এস্থলেও ঐ পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান হইতে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত আচারের উপকারিতা ঐ সকলের দ্বারা সমর্থিত হইয়া আছে।

কিন্তু দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হউক, আর বিদেশীয় বিজ্ঞানই হউক, আর অপর দেশীয় লোকের আচারই হউক, কেহই আমাদিগের স্মৃত্যুক্ত আচারবিধিগুলির ন্যায় সর্ব্বদিক্‌দর্শী এবং সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের উপযোগী হইতে পারে না। চিকিৎসা শাস্ত্র এবং বাহ্য-বিজ্ঞান

একদেশদর্শী। অন্যদেশীয় আচার স্থলবিশেষেই আমাদের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু উহারা কেহই শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, আচারের সকল গুণবত্তার মূল যে "অভ্যাস" তাহাতে আর্য্যশাস্ত্র ভিন্ন অপর কাহার দ্বারা আমাদিগের সুশিক্ষালাভ হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যের দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা শক্তির যে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা যোগ শাস্ত্রকারই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অপর কেহ তাহা এপর্য্যন্ত পারেন নাই। শরীরের আভ্যন্তরীণ ব্যায়াম শিক্ষায় একমাত্র যোগ শাস্ত্রেরই অধিকার।

"বিত্তানি শাখা, শ্ছদনানিকামাঃ।"

সদাচার বৃক্ষের শাখা ধন, কামনা সমস্ত উহার পত্র। সদাচার ধনবত্তার অনুকূল। ধনবত্তা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার্য্য। (১) ধনের অর্জ্জন (২) ধনের সংরক্ষণ (৩) ধনের সম্বর্দ্ধন। (১) শরীর, সুস্থ পটু এবং কার্য্যক্ষম; বুদ্ধি, বিষয় বোধে ক্ষিপ্র এবং অমোঘ; চিত্ত, স্থির এবং উৎসাহ-সম্পন্ন; এবং স্বভাব বিশ্বাস-প্রদ এবং লোকানুরাগের আকর্ষক হইলে ধনোপার্জ্জন কঠিন হয় না। সদাচার দ্বারা শরীরের, ধীশক্তির, চিত্তের এবং স্বভাবের ঐ সকল গুণ জন্মে। এই জন্য সদাচারের অভ্যাসে ধনোপার্জ্জন সহজ হয়। (২) ধনের সংরক্ষণ—ভোগেচ্ছার সংযমে, বিলাসিতার দমনে, বাহ্যাড়ম্বরের সংকোচনে এবং সমাজে ন্যায়ানুগামিতার পালনে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এইগুলিও সদাচার রক্ষা হইতে সমুদ্ভূত হয় (৩) ধনের সম্বর্দ্ধন—মিতব্যয়িতা, পরিণাম দর্শিতা এবং সমাজের সুস্থাবস্থাসাপেক্ষ এগুলিও সদাচার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত এবং সুরক্ষিত হয়। ধন বৃদ্ধির প্রসিদ্ধ উপায় যে বাণিজ্যাদি ব্যবসায় তাহাতে কৃতিত্বলাভ, সত্যনিষ্ঠা, সুবুদ্ধি এবং দূরদর্শন হইতে হয়। সদাচার ঐ তিনটিরই অনুকূল।

ধনবত্তার সহিত ধর্ম্মবত্তার যে একটু বিরোধ আছে তাহা যেন ধনবত্তার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বলিয়াই কাহার কাহার ভ্রম জন্মে। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন যে, "উষ্ট্রও যেমন সূচীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি ধনশালী ব্যক্তিও স্বর্গদ্বারে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।" সরল স্বভাব যিশু একদেশদর্শী হইয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। ঐ কথাটী সংসারের প্রতি একান্ত বৈরাগ্য প্রণোদিত। কথাটী প্রকৃত নয়। সেই জন্য তাঁহার মতানুগামী ভক্তিমান কাথলিক যাজকবর্গ আশ্রমভেদের তথ্য না বুঝিয়াও একেবারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া উঠিলেন এবং গৃহস্থেরা প্রায় কেহই কার্য্যতঃ ঐ মতনিহিত প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না, একান্ত ধনলোলুপ হইয়া রহিলেন। সর্ব্বদিক্‌দর্শী আর্য্য শাস্ত্র ওরূপ মোটা কথা বলেন নাই। তিনি ধনকে সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পরম সাত্ত্বিক যে 'দেয়' নামক ধন তাহার এই লক্ষণ বলেন—

"অপরাবাধ মক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
স্বল্পং বা বহুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে॥

অন্যের বাধা না জন্মাইয়া, স্বয়ং অধিক ক্লেশ না পাইয়া, নিজ পরিশ্রমের দ্বারা যে যে অল্প বা অধিক ধন উপার্জ্জিত হয় তাহার নাম দেয়—অর্থাৎ সেই ধনের দানেই বিশুদ্ধ দান হয়।

উল্লিখিতরূপে উপার্জ্জিত ধন পুণ্যকর্ম্মে সহকারী; সুতরাং সে ধনে ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গদ্বার অপাবৃত হইয়াই থাকে, রুদ্ধ থাকে না। শাস্ত্রে রাজস ধনের লক্ষণ আছে, যথা—

কুসীদ কৃষিবাণিজ্য শুল্কগানানুবৃত্তিভিঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ রাজসং সমুদাহৃতং॥

সুদ লইয়া কৃষি করিয়া, বাণিজ্য করিয়া শুল্ক লইয়া সংগীতাদি ব্যবসায় দ্বারা আর উপকৃত ব্যক্তির স্থানে গ্রহণ করিয়া যে ধন লব্ধ হয় তাহা রাজস ধন।

এই রাজস ধনের উপার্জ্জন সামান্যতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি নিষেধ, তবে আপৎকালে ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। তামস ধনের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ এই—

পার্শ্বিক দ্যূত চৌর্য্যাক্তি প্রতিরূপক সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জিতং বস্তু তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতং॥

পদের মাহাত্ম্যে, দ্যূতের বলে, চৌর্য্যদ্বারা, পরপীড়ন করিয়া, লোককে ভাঁড়াইয়া, সাহস কর্ম্মের দ্বারা, এবং অন্যকে ঠকাইয়া, যে ধন লব্ধ হয়, তাহার নাম কৃষ্ণ বা তামস ধন।

এই ধনের উপার্জ্জন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যদি খৃষ্টের মতানুগামী ইউরোপীয়েরা ধনের এই ত্রিবিধ ভেদ শিখিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, কমিশন প্রভৃতি নানা নামে ঘুস খাওয়া, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বাজি রাখিয়া রোজগার, বিজাতীয়ের দেশ লুণ্ঠন করা, বাণিজ্যদ্রব্যে কৃত্রিমতা করা, পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন পৃথিবীতে অনেক কম হইত। তাঁহারা শুনিলেন, ধন মাত্রই দুষ্ট। তাঁহারা ও কথা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না, কোন জাতিই পারে না; সুতরাং ধনোপার্জ্জনের জন্য যে বিশুদ্ধ পথ খুঁজিয়া লইতে হয় তাহা জানিলেন না; সাত্ত্বিক, রাজস, তামস অভেদে ধনোপার্জ্জনের জন্য পৃথিবীময় উদ্বেগ জন্মাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রাচার আমাদিগকে ওরূপ করিতে দিবেন না। এখন আপৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব সাত্ত্বিক এবং রাজস এই দুই প্রকার ধন লাভের জন্যই আমরা চেষ্টা করিলে করিতে পারি। কিন্তু তামস ধন আমাদিগের অস্পৃশ্য এবং অগ্রাহ্যই থাকিবে।

স্থূলতঃ ধনের প্রয়োজন তিন প্রকার। (১) আপনার এবং স্বজনের ভরণপোষণ, (২) ভোগাভিলাষের, তৃপ্তিসাধন, (৩) দানের দ্বারা অপরের দুঃখ মোচন। এই তিনটী প্রয়োজনের মধ্যে কোনটীই অসীম নয়। প্রত্যুত সকলগুলির সীমাই সঙ্কীর্ণ। (১) আপনার এবং অবশ্য পোষ্যদিগের নিমিত্ত মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করায় অধিক ধনের প্রয়োজন হইতে

পারে না। যদি কখন কোথাও সেই পরিমাণ ধনেরও অর্জ্জন না হয় তবে সমাজমধ্যে বিশেষ দোষই জন্মিয়াছে, এবং সে দোষের অপনয়ন চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। (২) ভোগ-সুখের সীমাও অতি দূরবর্ত্তী নহে। বিষয়ে ইন্দ্রিয় নিয়োগের দ্বারা ভোগ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ অতি শীঘ্রই উপভোগ্য গ্রহণে অশক্ত হইয়া পড়ে। অতি উপাদেয় বস্তুর ভোজন-সুখও উদর পূর্ত্তি হইলে আর কিছুমাত্র থাকে না। শুদ্ধ তাহাই নহে। ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ-শক্তি কিছু অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতেই ভোগের ত্যাগ আবশ্যক হয়। সম্পূর্ণ উদর-পূর্ত্তি পূর্ব্বেই ভোজন গ্রহণ পরিত্যাগ না করিলে, ভোজনের সুখানুভব হয় না। (৩) দানের গুণও সসীম। যে দানের দ্বারা দাতার সহানুভূতি এবং স্বচিন্তার বৃদ্ধি না হয়, সে দানে গুণ নাই। আর যে দানে [illegible] র অপকর্ষ সাধন হয় অর্থাৎ তাহার আলস্য অথবা আত্মগ্লা[illegible] দানেও প্রকৃত সুখ নাই এবং প্রকৃত উপকারিতাও নাই। [illegible]-নিষ্ঠ দানেরসীমা এইরূপে অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াই আছে। সাধারণ হিতকর কার্য্য যে দান তাহার সীমা ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত বটে কিন্তু তাহাও একান্ত অসীম নহে।

আমাদের শাস্ত্রাচার ধন-প্রয়োজনের এই সসীমত্ব উপলব্ধ করিয়াই বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। কারণ ধনের প্রয়োজন সঙ্কীর্ণ সীমায় সম্বদ্ধ হইলেও লোকের ধন তৃষ্ণাটী অতি অসীম; শাস্ত্র সাত্ত্বিক ধনোপার্জ্জনের উপায় বলিয়া দিয়া অর্জ্জন স্পৃহাটীকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন। তিনি গৃহস্থকে ধন উপার্জ্জন করিতে এবং ধন সঞ্চয় করিতে বিধি প্রদান করিয়া পরিশেষে বলেন——

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

সুখার্থী পুরুষ সন্তোষকে পরম অবলম্বন করিয়া সংযতচিত্ত হইবেন; সন্তোষই সুখের মূল তদ্বিপরীত দুঃখের মূল। অতএব সুখের জন্য ধন নয়, কারণ ভোগমাত্রেই সুখ হয় না।

ধনলোভে প্রমত্ত হইতে শাস্ত্রের নিষেধ, কামনাকে জয় করিয়া চলিতেও শাস্ত্রের উপদেশ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু নপ্রসজ্জেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিশ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ।

ইন্দ্রিয়-প্রয়োজন সকলে কামতঃ প্রসক্ত হইবে না; উহাদিগের অতি-প্রসক্তি হইতে মনের সংযম করিবে।

এই সংযমের সাধন সহকারেই প্রকৃত প্রস্তাবে সুখভোগের সম্ভাবনা। কামকে দমন করিয়া না রাখিলে কামেরই উপভোগ হয় না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামের উপভোগে কদাচিৎ কামনার শান্তি হয় না; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিলে অগ্নির বৃদ্ধিই হয়। অর্থাৎ কামের উপভোগে ভোগকামনা মাত্রেই বাড়ে, ভোগের শক্তি বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং কামনার বৃদ্ধিতে দুঃখেরই বৃদ্ধি হয়।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকারেরা কামনাকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াই ভোগের পথ মুক্ত রাখিয়াছেন, এবং ভারতবাসী আপনার সর্ব্বদিক্‌দর্শী শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী হইয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন কখন কামনারূপ পত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পুষ্প এবং ফল-পরিশূন্য হয় নাই।

"যশাংসি পুষ্পানি"।

সদাচার বৃক্ষের পুষ্প যশ। অর্থাৎ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি লোকের নিকট যশোভাগী হইয়া থাকেন। এই কথাটী স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের ন্যায় সহজেই বোধগম্য। সদাচার-সম্পন্ন-ব্যক্তি অবশ্যই জনসাধারণের নিকট প্রশংসা ভাজন হইবেন; কারণ, যে আচার ব্যবহার পালন করিয়া চলিবার নিমিত্ত সকলেই আদিষ্ট, যিনি তাহা পালন করেন, তিনি সুখ্যাতি না পাইবেন কেন? বিদ্যালয়ের যে বালকটী ভাল করিয়া পড়া শুনা করে,

সে পারিতোষিক পায়। সদাচারপরায়ণ হইলে লোকের নিকটে যে যশো-লাভ হয়, তাহা ঐ পারিতোষিকেরই সদৃশ। ইউরোপীয়েরাও বলেন যে, যাহা সাধারণের অভিমত তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিলেই সুখ্যাতি এবং না চলিলেই নিন্দা হয়। এই জন্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যদিও শাস্ত্রাচার নাই, তথাপি যে সময়ে যে আচার প্রবর্ত্তিত থাকে, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না।

কিন্তু সদাচারের পুষ্প যশ বলিয়া যে কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য আরও কিছু বিশেষ বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। দেখা যায় যে, যশের কারণ মুখ্যতঃ তিনটী—(১) অনন্যসাধারণ গুণশালিতা; (২) পরোপকার পরায়ণতা; (৩) নম্রতা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ অসাধারণ গুণশালিতাটী অধিক পরিমাণেই প্রকৃত প্রদত্ত বস্তু। উহা কোন প্রকার সাধারণ শিক্ষার আয়ত্ত হয় না। প্রত্যুত, যদি শিক্ষার তেমন দোষ থাকে, তবে উহার ব্যাঘাত হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রা-চাররূপ শিক্ষায় যে তেমন কোন দোষ নাই তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। (২) পরোপকার-প্রবণ ব্যক্তির হৃদয়ে পর-দুঃখ-কাতরতা থাকে। তাহাতে সমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি উপলব্ধ হয়। পরোপকারী ব্যক্তিকে কেহ স্বার্থপর বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তিনি সামাজিক বন্ধনের মৌলিক সূত্রেই একান্ত সম্বদ্ধ। পরোপকারী ব্যক্তি সমাজের ভক্ত, অতএব তিনি সমাজেরও প্রীতি পাত্র। "যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"। সদাচার, লোককে পর-দুঃখ কাতর এবং পরোপকার-প্রবণ করে। ইহা আতিথ্যসৎকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দানকার্য্যে উন্মুখতা জন্মায়। এই জন্য সদাচার হইতে যশের উদয় হয়। (৩) পরোপকার অপেক্ষাও নম্রতা গুণটী যশোলাভের প্রশস্ততর পথ। যিনি পরোপকার করিয়া অবিনীতভাব ধারণ করেন, আত্মশ্লাঘায় বিচেতন হয়েন, উপকৃতের আত্মগৌরব বিনষ্ট করেন, তাহার প্রতি স্বামিভাব ধারণ করেন অথবা তাহার পীড়ন করেন, তাঁহার যশ মলিন হইয়া যায়।

কিন্তু যিনি লোকের প্রতি নম্র এবং বিনয়ী হইয়া চলেন এবং আপনার দীনতা এবং অকিঞ্চনতা প্রদর্শন করেন, তিনি পরের উপকার করুন বা না করুন প্রায় লোকের প্রীতি এবং প্রশংসার ভাজন হইয়া থাকেন।

দীনভাবের প্রতি লোকের এই প্রকার অনুগ্রহ প্রবণতা দেখিয়া শঠেরা অনেক সময়েই এক প্রকার ভান্ত দীনভাব খ্যাপন করিয়া চলে। কেহ কেহ বা দারিদ্র্য কেহ বা অস্বাস্থ্য, কেহ বা অদৃষ্টচক্রের প্রতি ভীতি-খ্যাপনপূর্ব্বক আপনাদিগের আভ্যন্তরিক গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং প্রায়ই কিয়ৎ পরিমাণে লোকের অনুরাগ এবং অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আমি একটী লোককে জানিতাম, তিনি আপনার অসুস্থাবস্থার কোন সংবাদ না দিয়া কখন কাহাকেও একখানি পত্র লিখিতে পারিতেন না। অপর একজনকে জানিতাম তাঁহার ধন পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃ অতীব অসূয়াবান এবং মৎসরী ছিলেন। কিন্তু কোনরূপে না কোনরূপে আপনার একটা কষ্টের কথা না বলিয়া কখন কাহার সহিত বাক্যালাপ সমাপন করিতেন না। তিনি লোকানুগ্রহের একান্ত ভিখারী হইয়াছিলেন, এবং অনেকের স্থানেই অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ঐ প্রকার ভাণটাই দোষ। কিন্তু অকিঞ্চনতার ভাবটী মানবের অবস্থা সঙ্গত বলিয়াই তাহার ভাণও লোকের চক্ষে ভাল লাগে। সমাজের প্রতি নম্রতাই আমাদিগের মনের স্থায়িভাব হওয়া বিধেয়। আমরা অপরের নিকট জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অপরিশোধ্যরূপে ঋণী হইয়া থাকি। আমরা যাহা কেন করি না, আর যতই কেন করি না, সর্ব্বস্থলেই ঈশ্বরের ফুল ঈশ্বরকে দিয়া ঈশ্বরের পূজা করি মাত্র। অর্থাৎ সমাজ আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, আমরা তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া করি এবং তাহাই পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের উপকার সাধন করি। উহাতে নিজের গৌরবের, শ্লাঘার, বা স্বামিভাব ধারণের কোন কারণই থাকে না—প্রত্যুত অন্যের উপকার করার সুখ এবং সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়াতে

সমাজের নিকট পূর্ব্ব ঋণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই ঋণভারে নম্র হইয়া থাকাই মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী। পিতার সমীপে পুত্রের যে নম্রতা, সকল লোকেরই সমাজের নিকট সেই নম্রতা ন্যায়সঙ্গত। নম্রভাবেই সমাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকার করা হয়, এবং সেই স্বীকার নিবন্ধন ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি এবং যশই সেই নিষ্কৃতির প্রমাণ পত্র।

আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত সদাচার উল্লিখিতরূপ নম্রভাবের পোষক এবং তাহার অভ্যাস-জনক। শাস্ত্রে গৃহি-ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ঋণের পরিশোধের জন্য অথবা কৃত পাপের ক্ষালনের জন্য অনুষ্ঠেয়, ইহাই বলিয়াছেন। ঋণের পরিশোধ করায় অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করায় শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে না, কেবল মনের উদ্বেগ শান্তি হইতে পারে। আর বিধির প্রতিপালন করাই ধর্ম্মাচরণ, শাস্ত্র এই কথাও ভূয়োভূয়ঃ বলাতে বশ্যভাবের শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। এই সকল কারণে শাস্ত্রাচার বা সদাচার নম্রতার সাধক। যাহা নম্রতার সাধক তাহা অবশ্যই যশেরও প্রাপক হয়।

পরন্তু আচারবান্ অনেকানেক ব্যক্তিকে সমধিক অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক হইতে দেখা যায়। ইহাঁরা পুণ্যকর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া যেন মট্ মট্ করিয়া চলেন। বস্তুতঃ ইহাঁদিগের শাস্ত্রাচার ভাবদুষ্ট বলিয়াই ওরূপ হয়। ঐ সকল লোকে শাস্ত্রোক্ত অর্থবাদাদির প্রতি সমধিক লক্ষ্য করিয়া আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যে কেবল ঋণের পরিশোধক অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র তাহা ভাবেন না। ফলের লোভ অধিক বলিয়াই ইহাঁদের আচার রজোদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত; এই জন্য তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশ্যভাবের ন্যূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি জন্মিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সেগুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয় না এবং

তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইতে পারেন না। আমার বোধ হয় যে, ইংরাজী হইতে উহাঁরা যে "নৈতিক সাহসের" নামটী শুনিয়াছেন, তাহাতে অনেকটা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উহাঁরা বীরপ্রকৃতির ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং বীর স্বভাবসুলভ সাহস ধর্ম্মটীর বড়ই পক্ষপাতী। এই-জন্য সাহসের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহারের অপালন পূর্ব্বক দেশাচারকে তাচ্ছিল্য এবং আত্মসমাজকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়, উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে, দেশের যে সকল হিন্দুসন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরস্ক সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোকে খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করে, এবং চীন সাম্রাজ্যের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিন এবং ইউরোপীয় পুরুষেরা আপনাদের নাম এবং পরিচ্ছদ চিনীয় লোকের অনুরূপ করিয়া লয়, তাহাদেরও যেমন "নৈতিক সাহস" প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ-রাজের অধিকারকালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত——

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

নিজের ধর্ম্ম যদি বিগুণও হয় তথাপি সুন্দররূপে অনুভূত পরধর্ম্ম হইতে বহু মঙ্গলজনক। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে আচার, তাহা প্রকরণ দ্বারা সিদ্ধ। তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটী কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের বস্তু কি? জীবের সকল ভয়ের একমাত্র মূল মৃত্যুভয়। কিন্তু এস্থলে সেই মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও একটা বেশী ভয়ের বস্তু আছে বলা হইয়াছে। সেটি পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র, মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলিলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী-শিক্ষিতেরা দেখুন যে, তাঁহাদিগের দেশের পূর্ব্ব শিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অনুকরণেচ্ছা নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং "নৈতিক ভীরুতার"ই পরিচায়ক মাত্র।

যে শাস্ত্রাচার মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে ঋণের পরিশোধ বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যে শাস্ত্রাচার ঐকান্তিক বশ্যতার অভ্যাস করায়, নম্রতা এবং অকিঞ্চনতাকে চিত্তের স্থায়িভাবরূপে পরিণত করে, যে শাস্ত্রাচার মৃত্যু অপেক্ষা পাপের ভয় বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই। কীর্ত্তি এবং যশ সেই শাস্ত্রাচার বা সদাচারের ক্ষণস্থায়ী (ইহলৌকিক) শোভা এবং আনন্দদায়ক প্রসূনমাত্র।

"ফলঞ্চ পুণ্যং।"

সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য। অর্থাৎ সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যবান হয়েন। পুণ্য অর্থে পবিত্রতা—মল-শূন্যতা—নিষ্পাপতা—চিত্তশুদ্ধি—রজস্তম বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা—আসুর ভাবের নিরসন হইয়া দেব-

ভাবের অধিষ্ঠান—স্বভাবজাত পাশব প্রবৃত্তির দমন হইয়া জ্ঞানলাভের পথপ্রাপ্তি। ঐ পথের প্রাপ্তি হইলেই পুণ্য হইল।

এখন দেখিতে হইবে যে পথপ্রাপ্তির বিঘ্ন কি কি। সহজেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানলাভের পথ পাইবার পক্ষে চারিটী বিঘ্ন আছে। (১) শরীরের অপটুতা (২) বুদ্ধির জড়তা (৩) মনের চাঞ্চল্য (৪) রিপুর প্রাবল্য। শাস্ত্রাচার পালনে ঐ চারিটী দোষেরই নিবারণ হয়।

(১) শরীর অসুস্থ অপটু এবং বলহীন হইলে পুণ্য-সঞ্চয় কঠিন হয়। চিররোগীদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদাই যে শারীরিক কষ্ট অনুভব করে তদ্দ্বারা তাহাদিগের মন দূষিত হইয়া যায়। জগৎ সংসারের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি অনুকূল হইতে পারে না। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের এবং শ্রদ্ধার উৎস শুষ্ক হইয়া থাকে। রুগ্ন এবং দুর্ব্বল লোকের কার্য্য-প্রবৃত্তি এবং কার্য্যক্ষমতাও ন্যূন হয়। যাহার কার্য্য প্রবৃত্তি ও কার্য্যক্ষমতা ন্যূন সে জীবের সহিত প্রকৃতির সুখময় ঘনিষ্ঠতার অভাব হয়। যত যত অলস কুটিল এবং খল-স্বভাব লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি তাহাদের আশৈশব জীবন-বৃত্ত জানা থাকে তবে অনেক স্থলেই প্রমাণ হয় যে, ঐ সকল লোক বাল্যকালে অনেক রোগ ভোগ করিয়াছে এবং তাহাদিগের শরীর কোন প্রকার ব্যাধির আবাস হইয়া আছে। মনুষ্যের চরিত্রগত দোষের অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, অধিক স্থলেই পৈতৃক দোষ অথবা শৈশবের শারীরিক দুরবস্থাই উহার নিদানভূত। এই জন্য শরীরের পটুতা এবং সবলতা সচ্চরিত্রতা একটী প্রধানতম হেতু; এবং যাহা সচ্চরিত্রতার বা চিত্তশুদ্ধির হেতু তাহাই জ্ঞান লাভে পায় স্বরূপ। বোধ হয় এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন "নায়মাত্মা ব ।" বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ অপটু র্ব্বক তাঁহার গন্তব্য যে জ্ঞানলাভের পথ তাহাতে

শরীরে সুস্থাবস্থার সহিত ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা সর্ব্বদিক্‌দর্শী একমাত্র আর্য্যশাস্ত্রেরই বোধগম্য হইয়াছিল। "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মুলমুত্তমং। অপর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে শরীরের পটুতা রক্ষা করা ধর্ম্মোপার্জ্জন সম্বন্ধে এরূপ অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, শারীর স্বাস্থের সহিত মানসিক স্বাস্থ্যের বা ধর্ম্মভাবের অতি নিকট সম্বন্ধই আছে। কোন সময়ে একজন ইংরাজী শিক্ষিত শূদ্র সন্তান একটী ব্রাহ্মণ তনয়ের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন " আমি অপরাপর সকল গুণের অপেক্ষা ইহাঁর শারীরিক পটুতারই সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকি " ব্রাহ্মণ সন্তান ঐ বক্রোক্তির তাৎপর্য্য বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন " তোমার কৃত প্রশংসাই সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চ প্রশংসা হইল—কারণ তুমি বলিলে যে আমি এবং আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই সদাচার সম্পন্ন। " বাস্তবিক শাস্ত্রাচারের অনেকানেক নিয়মই শরীরের পটুতা সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই জন্য সদাচারের অনেক নিয়মই ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম হইতে অভিন্ন। তবে শুদ্ধ ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছি এবং শরীরের বল বাড়াইতেছি এরূপ উদ্দেশটী অদূরদর্শীর চক্ষে সমুদিত থাকিলে ক্ষণবিধ্বংসি-শরীরের প্রতি অতি যত্ন সম্ভূত হইয়া দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য ব্যায়ামচর্য্যাকেও শাস্ত্রাচাররূপে পরিণত এবং ধর্ম্মভাবে বিধৌত এবং বিশোধিত করা হইয়াছে।

(২) বুদ্ধির জড়তা নিবারণের শাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বিবিধ। এক মানসিক অপর শারীরিক। মানসিক উপায় স্মৃতি অথবা মানসিক সকল শক্তির সম্বর্দ্ধনে, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে স্বাধ্যায়াদির নিয়মিত আলোচনে শাস্ত্রচিন্তার সম্যক্‌ পরিচালনে সম্পাদিত হয়। ধী-শক্তির জ পর শারীরিক উপায় ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারে সু বিষয়েও আমাদিগের শাস্ত্র অনন্যসাধারণ। ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা মূলক

বলিয়া বোধ হয় না। অমুক অমুক দ্রব্য খাইলে বুদ্ধি মোটা হয়, একথা বলিয়া সেই সেই দ্রব্যের ভক্ষণ নিষেধ আর কোন জাতির শাস্ত্রে নাই। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এখনও অতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। অতি অর্ব্বাচীন লোকেরাই মনে করিতে পারে যে, পান ভোজনাদির সহিত বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু পূর্ণাদ্বৈতজ্ঞান-সমুদ্ভূত আর্য্যশাস্ত্রে ভক্ষিত বস্তুর গুণ ও দোষ যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও সংস্পৃষ্ট হয়, এই তথ্য চিরকালাবধি স্বীকৃত হইয়া আছে।—

"দধ্নঃ সৌম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা সঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎসর্পির্ভবতি। এবমেব খলু সৌম্যান্নস্যা শ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তন্মনোভবতি।"

হে সৌম্য! দধি মন্থন করিলে তাহার যে ভাগ অতি লঘু এবং সূক্ষ্ম তাহা ঊর্দ্ধে উঠে এবং তাহাই ঘৃত হয়। সেইরূপ, হে সৌম্য! ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষিত হইলে তাহার যে অতি লঘু সূক্ষ্ম অংশ তাহা হইতেই মন জন্মে।

(৩) মনের চাঞ্চল্য নিবারণের উপায়ও দ্বিবিধ। ধ্যান, ধারণা এবং সমাধির অভ্যাসে মনের চাঞ্চল্য অপগত হয়। আর প্রাণায়াম, ব্রতানুষ্ঠান এবং বৈধ ভক্ষ্যের গ্রহণ এবং অবৈধ ভক্ষ্যের পরিহারও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার অতি উৎকৃষ্ট উপায়। যে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়, শাস্ত্রে সেগুলির ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

(৪) রিপুর দমন, কামনার জয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা সুসিদ্ধ হয়। কাম জয়ের এবং ইন্দ্রিয় সংযমের বিধি উপদেশ এবং অনুষ্ঠানসূত্র আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপক। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারেও রিপুদমনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। কেমন সকল দ্রব্যের ভোজনে কোন্ কোন্ রিপুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় তাহার বিচারপূর্ব্বকই সাধকদিগের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। যাঁহারা ইউরোপীয় রাসায়নিক বিশ্লেষণকেই দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতেই

পারেন না যে, পূর্ব্বকালে কিরূপে দ্রব্যগুণের পরীক্ষা হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণটী অপেক্ষাকৃত স্থূল ব্যাপার। উহাতে কোন সমষ্টীভূত দ্রব্যের সম্যক্ ব্যষ্টীকরণ হয় না এবং উহার দ্বারা কোন দ্রব্য জীব শরীরে কিরূপ কার্য্য করে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝা যায় না। ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া দেখিলেই প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আমাদিগের শাস্ত্রে শরীরের পটুতাসাধন, বুদ্ধি-বৃত্তির সম্মার্জ্জন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপু সকলের সংযম সাধন করিবার গুণ বর্ণিত এবং প্রশংসিত হইয়াছে, তৎসাধনের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক, উভয় প্রকার উপায় কথিত হইয়াছে, এবং এমন সকল নিত্য ব্যবহার এবং অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া সমস্ত মানবজীবন একটী বিশুদ্ধ পদার্থ এবং প্রকৃতজ্ঞান লাভের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হয়। শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে তাহার বিধি নিষেধ বাক্য সকল রক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেই পুণ্যরূপ মহৎফলের লাভ হয়। কি সুন্দর তথ্য! ধর্ম্মরূপ বীজ হইতে শাস্ত্রাচারের উৎপত্তি সেই ধর্ম্মই পুণ্যনামে শাস্ত্রাচারের শুভময় ফল। অর্থাৎ প্রাকৃত বৃক্ষেও যেমন, এই সদাচার রূপ মহাবৃক্ষেও সেইরূপ—যাহা মূলে তাহাই ফলে।

উপক্রমণিকাধ্যায়ের উপসংহার।

পূর্ব্বগত পাঁচটি প্রবন্ধের পাঁচটী শীর্ষক যে কবিতাটীর এক এক অংশ তাহার পূর্ণক এই—

ধর্ম্মোঽস্য মূলান্যসবঃ প্রকাণ্ডো
বিত্তানি শাখা ছদনানি কামাঃ।
যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চ পুণ্যং
অসৌ সদাচার-তরুর্ম্মহীয়ান্।

এবং প্রবন্ধগুলিতে যে কয়েকটী বিষয় নির্ণীত হইয়াছে তাহার সংক্ষেপোক্তি এই—

(ক) রজোগুণ এবং তমোগুণ অর্থাৎ চাঞ্চল্যাদি এবং আলস্যাদি পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের স্বাভাবিক্য খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রোদ্ভাবিত করিবার জন্য যে অভ্যাস তাহার নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার।

(খ) সদাচার দ্বারা আয়ু যে রূপে দৃঢ় এবং বর্দ্ধিত হয়, তাহা তিন প্রকার কারণ সমষ্টির উপর নির্ভর করে। সেই তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার পুরুষ--পরম্পরাগত, আর এক প্রকার সমাজগত, অপর প্রকার পুরুষকার-নিষ্ঠ, এই জন্য আচার পদ্ধতির কালব্যাপকতা এবং দেশ ব্যাপকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণকূটের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র এবং অন্যদেশীয় আচার যে শাস্ত্রাচারের প্রতিপোষক স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহারা প্রমাণ বলিয়া যে গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ হয়।

(গ) সদাচার দ্বারা যে বিত্ত সংগ্রহের উপায় তাহা মিতাচার এবং কামনার সংযম-মূলক হয়।

(ঘ) সদাচার যে কামনার সংযম অভ্যস্ত করায় তাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ এবং ভোগ-সুখ গ্রহণে সক্ষম হইয়াই থাকে।

(ঙ) সদাচার কর্ত্তৃক স্বভাবজাত শক্তির উন্মেষ, সহানুভূতির সম্বর্দ্ধন এবং অকিঞ্চনতার শিক্ষা হইয়া যশোলাভের উপায় হয়।

(চ) সদাচার শরীরের পটুতা সাধন, বুদ্ধির সম্মার্জ্জন, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং রিপু সকলের সংযম অভ্যস্ত করাইয়া মনুজগণকে পুণ্যশীল অর্থাৎ জ্ঞানপথের পথিক করিয়া দেয়।

উপনিষদেও এই কথাগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে—যথা

"আচারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌঃ, ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিশুদ্ধৌ সর্ব্বগ্রন্থী নাং বিপ্রমোক্ষঃ।"

আচার শুদ্ধি হইতে সত্ত্ব বা জীবন শুদ্ধি হয়, সত্ত্ব শুদ্ধি হইতে নিশ্চয়াত্মিকা স্মৃতি জন্মে. স্মৃতির বা মানসিক শক্তির শুদ্ধি হইতে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি বা বন্ধনের বিশিষ্টরূপ মোচন হয়।

আচার প্রবন্ধ।

নিত্যাচার প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়

প্রাতঃকৃত্য।

দিবা রাত্রি আট প্রহরে বিভক্ত। প্রহর পরিমিত কালের অপর একটী নাম 'যাম'। তাহার অর্দ্ধাংশকে যামার্দ্ধ বলা যায়। স্মৃতি শাস্ত্রে যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধ ধরিয়াই দিনকৃত্যগুলির নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। ঘটিকা-যন্ত্রের নিয়মানুসারে দিবা রাত্রি চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকায় বিভক্ত হয়। সুতরাং এক প্রহরে তিন ঘণ্টা এবং প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ দেড় ঘটিকার সমান। এই জন্য যামার্দ্ধের করণীয় প্রতি দেড় ঘণ্টার করণীয় বলিয়াই অবধারিত।

শাস্ত্রোক্ত রাত্রির শেষযামার্দ্ধ ৪৷৷০ ঘটিকা হইতে আরব্ধ হইয়া প্রাতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত। দিবসের প্রথম যামার্দ্ধ ৬ টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত। এইরূপ পর পর বিভাগ হইয়া ষোড়শ যামার্দ্ধ রাত্রি ৪৷ টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত হয়। উল্লিখিত ষোড়শ যামার্দ্ধের প্রত্যেকটিতে যাহা যাহা করণীয় তাহা শাস্ত্রে সবিশেষ কথিত হইয়াছে। তেমন বিশেষ কথনের উদ্দেশ্য এই যে, কোন কার্য্যই বিধির প্রতি মনঃ সংযোগ ব্যতিরেকে নির্ব্বাহিত

না হয়, এই অভ্যাসের সম্যক্ সংস্থাপন করা। ঐ বিশেষ বিধি সকল শাস্ত্র দর্শন দ্বারা এবং গুরুর নিকট হইতে জানিবার প্রয়োজন। এই প্রবন্ধ মালায় অতি স্থূল স্থূল কতকগুলি কথারই উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রাতঃস্মরণীয় বিষয়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি ৪৷৷০ টার সময়ে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটীর আবৃত্তি করিতে হয়।

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি রাহু, কেতু—ইহাঁরা সকলে আমার সম্বন্ধে সুপ্রভাত বিধান করুন।

নিদ্রা ত্যাগ হইল—প্রবুদ্ধ হইলাম—যেন নূতন হইয়া জগতে আসিলাম—সুতরাং সমুদয় জগৎকে স্মরণ করিতে, সর্ব্বময়ের বিশ্বরূপটী ধ্যান করিতে আদিষ্ট হইলাম—মানুষ যে দীপ্তিমান দিব্য পদার্থের প্রত্যক্ষ দ্বারা এবং উৎপত্তি, স্থিতি, ধ্বংস ব্যাপারের পরিচিন্তন দ্বারা দেব ভাবের পরিগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল, নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পুনর্জ্জন্মার ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্বের সেই আদিম সোপানে অবস্থাপিত হইলাম। কি সুন্দর তথ্য। ধর্ম্মের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ও তাহাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট এবং বিমিশ্র সকল ভাবগুলিই যে সকলের পক্ষে সকল সময়ে বিদ্যমান থাকে, তাহা এই বিধি দ্বারা কেমন সুব্যক্ত হইল! যাঁহারা মনে করেন যে, উচ্চাধিকারীর পক্ষে ধর্ম্মের নিম্নবর্ত্তী সোপান সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহারা কি ধর্ম্মতত্ত্বের কি অপর কোন তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নবর্ত্তী সোপান সকল তাহার

ঊর্দ্ধবর্ত্তী সোপান গুলিকে ধারণ করিয়া থাকে। নিম্নের সোপান একেবারে লোপ পাইলে উপরের সোপানও থাকে না। বর্ণমালা ভুলিয়া গিয়া কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন না।

পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ স্মরণের পর যে প্রকার চিন্তার প্রয়োজন তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে কথিত হইয়াছে।

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকং॥"

প্রাতঃকালে নিজমস্তক মধ্যবর্ত্তী শুভ্র পদ্মের মধ্যে দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, প্রসন্নবদন এবং শান্ত নররূপী গুরুদেবকে তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্মরণ করিবে। দ্বিনেত্র এবং দ্বিভুজ দুইটী বিশেষণের দ্বারা, যিনি গুরু তিনি যে নবরূপধারী তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসজ্ঞকং॥

সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার করি, যাঁহার বাক্যামৃত পান দ্বারা সংসারশক্তিরূপ বিষের বিনাশ হয়।

অর্থাৎ বিশ্বরূপ চিন্তন দ্বারা যে সর্ব্বময়ের জ্ঞানলাভে পদার্পণ হইয়াছে সেই জ্ঞানই বলিয়া দিতেছে যে, মানুষকে মানুষের স্থানেই শিক্ষালাভ করিতে হয়, মানুষকেই আদর্শরূপে পাইতে হয় এবং মানুষকেই সেই সর্ব্বময়ের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হয়। ইতিহাসে ইহাই অবতারবাদ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা ধর্ম্মোন্নতিপথের একটী প্রশস্ত সোপান। যাঁহারা কথায় বলেন যে, কোন মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা এবং সর্ব্বেশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া মনে করা অবিধেয়, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত এমন মানুষ কেহ জন্মে নাই, যাহাকে নিজের জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারে হউক, অপর কোন মনুষ্যকে আপনার আদর্শ করিয়া লইতে না হইয়াছে। উহাই

জ্ঞান এবং ধর্ম্মোন্নতির এক মাত্র পথ। গুরুস্বীকার ব্যতিরেকে কোন জাতি বা ব্যক্তি ধর্ম্মশীল হইতে পারে নাই, পারিবেও না।

কিন্তু ঐ পথে কিছু দূর গমন করিতে করিতে আর একটি সোপান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সোপান প্রাপ্তি পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান।

আমি সেই দেব ভিন্ন অন্য কেহ নহি, আমিই ব্রহ্ম, আমি শোকশূন্য, আমি সচ্চিদানন্দরূপ, নিত্যমুক্তঃ আত্মভাবসম্পন্ন।

বিশ্বরূপ-জ্ঞান হইতে, গুরু স্বীকার বা অবতার বাদ, এবং তাহা হইতে আপনাকে সর্ব্বেশ্বর হইতে অভিন্ন বোধ—এগুলি অবশ্যই পর পর হইয়া আসিবে। প্রাতঃকালের স্মরণীয় শ্লোক কয়েকটীতে ইহাই ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইয়া পূর্ণাদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, এবং আপনাতে ও সর্ব্বে অভেদবুদ্ধি বশতঃ সর্ব্ব যে চৈতন্যময় তাহারও অববোধ জন্মে। কিন্তু পূর্ণে এবং অপূর্ণে, সর্ব্বে এবং অংশে, পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য নিবন্ধন দ্বৈত জ্ঞানের মূলও আছে। পরবর্ত্তী একটী প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকে অদ্বৈতভাবে সংশ্লিষ্ট যে দ্বৈতবোধ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার-যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে লোকেশ! হে চৈতন্যময়! হে আদিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণু! তোমার আজ্ঞানুসারী হইয়া তোমারই প্রীত্যর্থে এই প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি সংসার যাত্রার অনুবর্ত্তন করিব।

সর্ব্বময়ের চৈতন্য-স্বরূপতা পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে; এস্থলে তাঁহার

আজ্ঞাপালন এবং তাঁহার প্রীতি সাধনের উল্লেখ পূর্ব্বক সংসারে যে দ্বৈতভাবের প্রয়োজন, তাহার অভিব্যক্তি হইল। জীবনী শক্তির মূলই সর্ব্ব। জীব সেই সর্ব্বেরই আজ্ঞাবহন করে এবং তাঁহারই প্রীতি সাধন করে, এরূপ অধ্যাস অসঙ্গত হয় না। পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে ঐ অধ্যায়টী আরও গাঢ়তররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।

আমি ধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্তিশূন্য এবং অধর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে নিবৃত্তি বিহীন; হে হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ! তুমি আমাকে যাহাতে নিযুক্ত কর, আমি তাহাতেই নিযুক্ত হই।

এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহ কেহ বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে আছেন এবং তিনিই আমাদিগকে কখন ধর্ম্মকার্য্যে কখন বা অধর্ম্ম কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন—শ্লোকটির তাৎপর্য্য এরূপ নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, হে ঈশ্বর! তোমার আজ্ঞা পালনার্থ এবং তোমারই প্রীত্যর্থ আমি সংসার যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি, এইজন্যই এই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইল যে, তোমার আজ্ঞা এবং প্রীতি কিসে হয় তাহা হৃদয়স্থিত যে তুমি হৃষীকেশ * সেই তোমার

---

* হৃষীকেশ শব্দের আধ্যাত্মিক পক্ষে অর্থ নিম্নবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

হৃষীকানি নিয়ম্যাহং
যতঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
হৃষীকেশ ইতি খ্যাতো
নাম্না তত্রৈব সংস্থিতঃ॥

আদেশ হইতেই তাহা জানি এবং ধর্ম্মকার্য্যে যে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম কার্য্যে যে নিবৃত্তি তাহাও তোমা হইতে হয়; তাহাতে আমার কর্তৃত্ব নাই। এই নিরভিমানিতা এবং অকিঞ্চনতার খ্যাপনই শ্লোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শ্লোকটী একান্ত নিরভিমানিতারই ব্যঞ্জক। সেই অপাপবিদ্ধ, নির্লিপ্ত, সর্ব্বেশ্বরের প্রতি পাপাচরণের দোষ প্রক্ষেপ করিবার জন্য নহে।

উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকের পঠন মননাদি হইয়াগেলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির একটী অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি আছে———

"প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্ম মর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনং
অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥"

নিদ্রা ত্যাগ হইলে পুরোবর্ত্তী দিবাতে কি কি ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার চিন্তন করিবে, এবং ধর্ম্মের অবিরোধী কি কি অর্থের সাধন করিবে তাহারও চিন্তন করিবে এবং ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধী কি কি কাম সাধন করিবে, তাহারও চিন্তন করিবে। অর্থাৎ উপস্থিত দিবসের করণীয় সমুদায় ব্যাপার যতদূর সাধ্য পূর্ব্বাহ্নেই অবধারিত করিয়া লইবে। তাহার পর শয্যা হইতে নামিবে।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও আমাদের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রাতঃস্মরণীয় বিষয় গুলি যেমন যথাযথ তেমনি উচ্চ এবং পবিত্র, এবং প্রতি দিবসে ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম সাধনের উপায় এবং প্রণালী চিন্তন সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ সাধক, তথাপি নিত্য নিত্য ঐ সকল কথার আবৃত্তি এবং চিন্তন ক্রমশঃ অকিঞ্চিৎকর, মৌখিক এবং অগভীর হইয়া যাইতে পারে। এ আপত্তি

হৃষীকেশ শব্দের আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক অর্থ নিম্নবর্ত্তী ব্যুৎপত্তি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হৃষ্টা জগৎ প্রীতিকরা
রশ্ময়ো যস্য স হৃষীকেশঃ সূর্য্যঃ।

হেয়। যাহা উৎকৃষ্ট তাহার অনুষ্ঠানে অবশ্যই শুভফল জন্মে। সদনুষ্ঠানের অভ্যাসেই চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয়। তদ্ভিন্ন, মনকে জাগ্রৎভাবে রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিলে ঐ সকল উচ্চভাবনা দিন দিন গভীরতর হয় এবং দিন দিন সত্ত্বগুণের সম্বর্দ্ধক হইয়া উঠে। সত্য এবং উন্নত বস্তুর গুণই এই যে, উহা কখন পুরাতন এবং সুস্বাদশূন্য হয় না।

রাত্রিশেষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া জগতে ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ যে অনুক্রমে হইয়াছে তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ পূর্ব্বক সমস্ত দিবসের করণীয় ধর্ম্মার্থকামসাধক কার্য্যগুলি স্থূল স্থূল অবধারিত করিয়া "প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ" বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিবে এবং মুখে জল দিয়া বিন্মূত্রোৎসর্গ করিতে যাইবে। এই স্থলে স্মরণ করা আবশ্যক যে, আচার অভ্যাসের বস্তু। যে কাজ কোন এক দিন বা দুই দিন করিলাম, আর করিলাম না, তাহা আচার বলিয়া গণ্য নহে। প্রাতঃকালে বিন্মূত্র ত্যাগ করা শাস্ত্রবিহিত আচারের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট; উহা দৈনন্দিন কার্য্য এবং উহার অভ্যাস করিতে হয়।

শাস্ত্রবিধির সহিত স্বাভাবিক্যবাদীদিগের এই স্থলে একটি বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহারা বলিতে পারেন, এমন সকল বিষয়ে শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন নাই। মল মূত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন যখন শরীরধর্ম্মে স্বতঃই উত্থিত হইয়া থাকে, তখন উহার কাল নির্দ্দেশের নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়া কাজ কি? একথা অগ্রাহ্য। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের কাজও অনেক এবং তাঁহাকে অনেক কাজ অনন্যমনা হইয়া এবং অন্যান্য মনুষ্যের সহিত মিলিয়া একযোগে করিতে হয়। পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় মনুষ্যেরা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় মল মূত্রাদি ত্যাগ করিতে পারে না। এই জন্য ঐ কার্য্যের নিমিত্ত একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। দিনকৃত্যের প্রারম্ভ কালই তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। আরও একটী কথা আছে। জীব শরীরের

প্রকৃতি এই যে, চেষ্টা মাত্রেই শরীররসের শোষণ হইয়া থাকে। এই জন্য দিবাদণ্ড প্রবৃত্ত হইয়া কাজ কর্ম্মের আরম্ভ হইলে অন্ত্রগত মলের দুষ্ট রসও কিয়ৎ পরিমাণে শোষিত হইয়া প্রবহমান শোণিতের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যাঁহারা অধিক বেলায় শৌচে যান, তাঁহাদিগের মল অপেক্ষাকৃত কঠিন হয় এবং তাঁহাদিগের মুখ এবং গাত্রে প্রায়ই দুর্গন্ধ হয়। বস্তুতঃ মলের রসভাগ তাঁহাদের শরীরে শোষিত হইয়া যায়। অতএব প্রত্যুষে বিন্মূত্রত্যাগের বিধি পালন যেমন কর্ম্ম কার্য্যের সুবিধাজনক তেমনি শুচিতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল।

মনুষ্য শরীর অতি সহজেই এই অভ্যাসটী গ্রহণ করিতে পারে। অনেকানেক সুভদ্র পরিবারের প্রাচীনা গৃহিণীরা শিশুদিগকে প্রতি প্রাতঃকালে একবার শৌচার্থে বসাইয়া থাকেন। প্রথম কয়েক দিন হয় ত শৌচ হয় না। কিন্তু ধাতুভেদে সপ্তাহ কি দশ দিন কি মাসাধিক কাল ধরিয়া নিয়মিত রূপে অভ্যাস করিতে থাকিলে শৌচ নির্গমনের কালটী স্থির হইয়া উঠে। যুবা এবং প্রৌঢ়েরাও চেষ্টা করিলে ঐরূপ ফল লাভ করিতে পারেন। শরীর অভ্যাসের দাস। কোন সদভ্যাস পুরুষানুক্রমিক হইলে উহা শরীরের সহজাত হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্রেই শাস্ত্রাচারের বশীভূত হইয়া প্রত্যুষে শৌচে গিয়া থাকেন। এই আচার তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত। উহাঁদের পীড়ার সময়েও ঐ অভ্যাসটীর কার্য্যকারিতা একান্ত বিলুপ্ত হয় না এবং তাহাতে চিকিৎসার সুবিধা এবং আরোগ্য বিধানের যথেষ্ট সৌকর্য্য জন্মে।

মলমূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি শাস্ত্রাদেশ আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিব। (১) "বেগরোধোন কর্ত্তব্য"—বেগ রোধ করিবে না। (২) "বাচ্যং নিযম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাস বর্জ্জিতঃ"—কথা কহিবে না, থুথু ফেলিবে না উর্দ্ধশ্বাস ত্যাগ করিবে না। (৩) "বায্বগ্নি বিপ্রাদিত্যমপঃ পশ্যন্ তথৈবচ"—অগ্নি, সলিল, সূর্য্য, বায়ু এবং পূজ্যদিগের অভিমুখে ষ্ঠীবন এবং বিন্মূত্র ত্যাগ করিবে না;

(৪) "তিষ্ঠেন্নাতি চিরং তস্মিন্ নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ।"—যে স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে, তথায় অধিকক্ষণ থাকিবে না এবং কোন কথা কহিবে না। এই নিয়মগুলির মধ্যে প্রথমটীর দ্বারা বেগ রোধ করা নিষিদ্ধ হইল। ইহা সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্মত কথা। বেগ রোধ নিবন্ধন যে অনেকানেক কঠিন পীড়া জন্মিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিধির মূলে অন্যান্য বস্তুর সহিত গূঢ়তম স্বাস্থ্যের নিয়মও নিহিত হইয়া আছে। শরীরের ঊর্দ্ধভাগে যে সকল স্নায়ু বিদ্যমান তাহাদের পরিচালন হইলে শরীরের অধোভাগ নিহিত স্নায়ুগুলির কার্য্য মন্দীভূত হয়। স্নায়ুর কার্য্য মন্দ হইলে পেশীর কার্য্যও দুর্ব্বল হয়। কিন্তু নির্হারে বা বিন্মূত্র ত্যাগে শরীরের অধোভাগবর্ত্তী পেশী কয়েকটির বিশেষ কার্য্যকারিতাই আবশ্যক। উহাদিগের সম্যক্ কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়। অতএব শরীরের ঊর্দ্ধভাগবর্ত্তী স্নায়ুর কার্য্য যাহাতে অতিমাত্রায় না হয় তাহা করা আবশ্যক। এই জন্য অত্যুজ্জ্বল বা সচল বা সবল বস্তুর দর্শন স্পর্শনাদি এবং বাক্য কথনাদি মলমূত্র ত্যাগ কালে নিষিদ্ধ। দর্শন স্পর্শ এবং কথনাদি কার্য্যে ঊর্দ্ধগত স্নায়ুমণ্ডলের সমধিক সঞ্চালনা হয়। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, শৌচ শুদ্ধির পক্ষে ঊর্দ্ধগত ব্যাপার মাত্রেই কিছু না কিছু ব্যাঘাত জন্মায়।

বিন্মূত্র ত্যাগের স্থান শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুযায়ী হইয়া চলিলে, পথে বা পথের ধারে, পুষ্করিণীতে, পুষ্করিণীর পাড়ে, গোচারণ স্থানে, অথবা সসত্ত্ব বিল মধ্যে কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না। লোকের আবাসবাটী হইতে দূরে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া মলাদি পুতিয়া ফেলাই শাস্ত্রের বিধি। পল্লী গ্রামে এই বিধি প্রতি ব্যক্তি কর্ত্তৃক সুপালিত হইতে পারে।

মল মূত্র ত্যাগের পর শৌচবিধি পালনের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার স্থূল কথা দুইটী শ্লোকে নিবদ্ধ।

(১) বসাশুক্রমসৃঙ মজ্জামূত্রবিট কর্ণবিণ্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাস্বেদো দ্বাদশৈতে নৃনাংমলাঃ।

মনুষ্য শরীরের মল বারটী; (১) বসা (২) শুক্র (৩) অসৃক (৪) মজ্জা (৫) মূত্র (৬) বিষ্ঠা (৭) কর্ণমল, (৮) নখ (৯) শ্লেষ্মা (১০) অশ্রুজল (১১) পিঁচুটি (১২) স্বেদ।

(২) আদদীত মৃদোঽপশ্চষট্‌যু পূর্ব্বেষু শুদ্ধয়ে।
উত্তরেষুতুষট স্বদ্ভিঃ কেবলাভি র্বিশুদ্ধ্যতি॥

উল্লিখিত দ্বাদশটী মলের মধ্যে প্রথম ছয়টীর শুদ্ধির নিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল উভয়ের প্রয়োজন। শেষের ছয়টির শুদ্ধি একমাত্র পবিত্র জল দ্বারাই হয়।

অতএব শাস্ত্রানুসারে মল মূত্র ত্যাগের পর মৃৎ শৌচ এবং জল উভয় শৌচই করিতে হয়। * শুদ্ধজলশৌচমাত্র করিলে হয় না। আর যে প্রকার মৃত্তিকা লইয়া শৌচকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "বল্মীক মুষিকোদ্ধাতাং মৃদমন্তর্জলাং তথা। শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাৎ লেপসম্ভবাং" অর্থাৎ উয়ের মাটী, ইন্দুর মাটি, জলের ভিতরের মাটি অন্যের শৌচাবশিষ্ট মাটি, গৃহের লেপ সম্ভব মাটি গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ ভিজা হড়হড়ে বা কোন প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীর সম্বন্ধবিশিষ্ট না হয় সাবধানতাসহকারে এরূপ বিশুদ্ধ মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিধেয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণিশরীরে তৈলবৎ পদার্থের সংযোগ থাকেই থাকে। এই জন্য তৎসংসৃষ্ট মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে প্রশস্ত হয় না। কারণ বিষ্ঠাতেও তৈলবৎ পদার্থ পিত্তের সংযোগ আছে। সাবানের ব্যবহারও সেই জন্য অপ্রশস্ত।

---

* অনেকেরই জানা নাই যে মুসলমানদিগের শাস্ত্রে দৈনিক সকল কার্য্যের জন্যই দৃঢ়বদ্ধ নিয়মাবলী আছে। প্রস্রাব করিয়া জল লওয়া, মৃৎশৌচ হস্ত পদ প্রক্ষালনের নিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষের বিচার প্রভৃতি বিষয়ে উহাদের শাস্ত্রে অনেকটা আটা আঁটি দেখা যায়। যবনেরাও ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারপরায়ণ নয়।

ফলতঃ বিষ্ঠা এবং মূত্র শরীরের বড়ই দূষিত বস্তু। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা-শৌচ দ্বারাই উহাদিগের দোষ সম্যক্ পরিহৃত হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারে তেমন হয় না। পৃথিবীর অপর সকল লোক অপেক্ষা ভারতবাসী ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর শৌচাচার পরায়ণ! শুচিতার প্রতি এই রূপ স্থির লক্ষ্য হওয়াতে পবিত্রতার প্রতিও তাঁহাদের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া আছে।

শৌচাবসানে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আচমন। দন্তধাবনের পূর্ব্বে যে আচমন তাহা সামান্য কুল্লি মাত্র। সে আচমনের প্রকৃতি নিম্নবর্ত্তী শ্লোকটীতে পরিস্ফুট হইয়া আছে।

গঙ্গাং পুণ্যজলাং প্রাপ্য চতুর্দ্দশ বিবর্জয়েৎ।
শৌচমাচমনং কেশনির্ম্মাল্যং মলঘর্ষণং॥

পুণ্যজলা গঙ্গাতে শৌচ, আচমন, (অর্থাৎ মুখশোধককুল্লী) কেশ নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ প্রভৃতি চতুর্দ্দশকর্ম্ম ত্যাগ করিবে। শুচিতা সম্পাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আচমনের অনুষ্ঠানটী অতীব প্রশস্ত। এমন কোন বৈধ কার্য্যই নাই যাহার আদ্যন্তে আচমন করিবার বিধি নাই।

আচমনের মন্ত্রটী অতি উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পথ প্রদর্শন করে। মন্ত্রটী প্রণবের সহিত তিন বার বিষ্ণুর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সপ্রণব—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই বাক্য। "জ্ঞানিগণ বিষ্ণুর (সর্ব্বব্যাপকের) সেই বিশ্ব প্রকাশক পরমপদ (স্বরূপ) সর্ব্বদাই দর্শন করেন, যেমন আকাশে চক্ষুঃ (সূর্য্য) নিত্যই (সেই পরমপদ) দেখিয়া থাকেন। অপিচ, আচমন প্রক্রিয়াতে শরীরের আট ভাগ একে একে স্পর্শ করিতে হয় যথা——

"খং মুখং নাসিকে বায়ুং নেত্রে সূর্য্যঃ শ্রুতীদিশঃ।
প্রাণগ্রন্থিমথো নাভিং ব্রহ্মাণং হৃদয়ে স্পৃশেৎ।
রুদ্রং মূর্দ্ধ্নি মালভ্য প্রীণাত্যথ শিখামুষীন্," ॥

অর্থাৎ মুখ বিবরে আকাশ, নাসিকাদ্বয়ে বায়ু, চক্ষুতে সূর্য্য, কর্ণদ্বয়ে দিক্, নাভিদেশে প্রাণগ্রন্থি হৃদয়ে ব্রহ্মা, শিরোভাগে রুদ্র এবং শিখায়

ঋষিগণকে স্পর্শ করিয়া প্রীত করিবে। তবেই জ্ঞানী আচমন কর্ত্তার নিজ শরীরটীই যেন প্রাকৃতিক দেবদেহ বলিয়া প্রতীয়মান হইবার যোগ্য হইল এবং তিনি মূলমন্ত্রদ্বারা আকাশস্থিত চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপক সেই পরমপদ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে, চিত্তে এবং বুদ্ধিতে কোথাও আর অশুচিতার স্থান রহিল না। জগৎচক্ষু সূর্য্যের পদে অবস্থাপিত হইয়া দৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় অন্তর্মলের মুখ্য উপাদান যে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা এবং একদেশদর্শিতা তাহা অবশ্যই অপনীত হইয়া যাইবে।

বস্তুতঃ আচমন মন্ত্রের ভাবগ্রহ হইয়া তাহার অভ্যাস হইলেই শ্রুত্যুক্ত "যোসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽহমস্মি" এই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে—দ্বৈতবোধ হইতে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রবৃত্তি আরব্ধ হয়। আচমনের অভ্যাস বড়ই উন্নত বস্তু এবং তজ্জন্যই ইহার পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠানের আদেশ।

প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে দন্তধাবনের ব্যবস্থা আছে। দন্তধাবন কার্য্যে যে যে প্রকার কাষ্ঠ প্রশস্ত তাহা দুইটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

(১) তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণোবৃক্ষ গুল্মানাং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং।

তিক্ত, কষায়, কটু, সুগন্ধি, কণ্টকযুক্ত এবং শুভ্র আঠা বিশিষ্ট যে বৃক্ষ গুল্মাদি তাহাদিগের হইতে দন্ত কাষ্টিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ।
তিন্তিড়ী বেণুপৃষ্ঠঞ্চ আম্রনিম্বৌ তথৈবচ।
অপামার্গশ্চ বিল্বশ্চ অর্কশ্চোডুম্বরস্তথা।।

খদির, কদম্ব করঞ্জ, তেঁতুল, বংশপৃষ্ঠ (বাখারি), আম্র, নিম্ব, আপাঙ, বেল, আকন্দ এবং ডুমুর (ইহাদের দন্তকাষ্ঠিকা উৎকৃষ্ট)।

দন্তকাষ্ঠিকার একটী মন্ত্র আছে, যথা——

আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশু বসূনিচ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নোধেহি বনস্পতে।

হে বনস্পতে! আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশ, তেজঃ, প্রজা, পশু, ধন, ব্রহ্মজ্ঞান এবং মেধা প্রদান কর।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অসীম অনেকত্বের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদাই সেই ধ্রুব একত্বের অনুভব করিতে পারিতেন, সেই আত্মসাক্ষাৎকৃন্মহর্ষিরাই সামান্য দাঁতন কাটিও যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে অনুকূলতা করিতে পারে তাহা বুঝিতেন।

দন্তধাবন সম্বন্ধে অপর যে কয়েকটি বিধি আছে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি।

(১) শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহেঽজীর্ণ সম্ভবে।
ব্রতেচৈবোপবাসেচ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং। *

শ্রাদ্ধদিনে, জন্মদিনে, বিবাহদিনে, অজীর্ণ দোষ হইলে, ব্রতকালে এবং উপবাস কালে দন্তধাবন করিবে না।

(২) দন্তধাবনমদ্যাৎ প্রাঙ্মুখ উদঙ্‌মুখোবা।

পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে।

(৩) চতুর্দ্দশাষ্টমীচৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তিরেবচ।

(৪) পর্ব্বস্বপিতু দন্তধাবনং বর্জ্জয়েৎ।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং রবি-সংক্রান্তি—এই গুলি পর্ব্বাহ। পর্ব্বাহে দন্তকাষ্ঠিকার ব্যবহার করিবে না।

(৫) তৃণাঙ্গারকপালাশ্মবালুকায়সচর্ম্মভিঃ।
দন্তধাবনকর্ত্তারো ভবন্তি পুরুষাধমাঃ।

তৃণ, অঙ্গার, কপাল (হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গা খোলা) পাথর, বালুকা, লৌহ এবং চর্ম্ম দ্বারা দন্তধাবন করিলে পুরুষাধম হয়।

(৬) তাক্ত্বাঽনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনং।

অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গুলিদ্বারা দন্তধাবন করিবে না।

---

* মুসলমান শাস্ত্রেও উপবাসে দন্তধাবন নিষিদ্ধ।

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত শ্লোক দ্বারা ক্ষতাশৌচ হইলে যে সকল দিনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেই সকল দিনে দন্তধাবনের নিষেধ হইয়াছে, আর অজীর্ণ দোষ থাকিলেও দন্তধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে। অজীর্ণ দোষে দন্তধাবন বমনোদ্রেককারী এবং অজীর্ণের বর্দ্ধক হইতে পারে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যগ্রহ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতিসাপেক্ষ। ভারতবর্ষ যে অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত তাহাতে এদেশে উত্তর শিয়রে শয়ন করার দোষ বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন প্রায় হইয়া উঠিয়াছে; এই জন্য বোধ হয় যে, বিজ্ঞান নিজে আরও একটু বড় হইয়া উঠিলে পূর্ব্ব এবং উত্তরাস্য হইয়া দন্তধাবন করিবার উপকারিতাও বুঝিতে পারিবে *। আর পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাদি তিথির ভেদে মনুষ্যদেহে রোগ প্রবণতার ন্যূনাতিরেক হয়, ইহা বহুকালের পর ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অনুভূত হইয়াছে; সুতরাং কালক্রমে সেই বিজ্ঞান যে মনুষ্যদেহে অন্যান্য তিথ্যাদিরও প্রভাব বুঝিবে এবং তাহা বুঝিয়া তিথ্যুপযোগী অনুষ্ঠানের নিদান দেখিতে পাইবে, ইহাও অনুভবযোগ্য। পঞ্চম শ্লোকটীর দ্বারা দুইটী কথার প্রতিপত্তি হয়। এক কথা, দন্তধাবন কার্য্যে কয়েকটী বস্তু দুষ্ট; দ্বিতীয় কথা, দন্তধাবন কার্য্যটী বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে নাই। ব্রাহ্মণ শুচি হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তিনি শুচিবেয়ে হইবেন, শাস্ত্রের এরূপ উদ্দেশ্য নয়। এই জন্যই বোধ হয় দুর্ব্বল অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারাই দন্তধাবনের বিধি, তৎকার্য্যে তর্জ্জনী মধ্যমাদি বলবত্তর অঙ্গুলির নিষেধ। দাঁতন

* পৃথিবী স্বয়ং একটী বিশাল চুম্বক। ইহার চৌম্বকত্ব সকল সময়েই সকলের প্রতি কার্য্যকারী। মার্কিন দেশের চৌম্বক উদ্ভিদ্ এই পার্থিব বলের প্রভাবেই দিন রাত্রির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে পত্র গুলির মুখ ফিরাইয়া জন্মে। এই চৌম্বক বলকে অনুকূল করিবার জন্যই কি বিশেষ বিশেষ কার্য্য কালে মুখ ফিরাইবার ব্যবস্থা এবং শয়ন কালে বিশেষ বিশেষ শিয়রে শুইবার ব্যবস্থা?

কাটির প্রান্তভাগ যে স্বয়ং দন্তে চিবাইয়া থেঁত করিতে হয় না প্রস্তরাদিতে ছেঁচিয়া থেঁত করিতে হয়, ইহাও ফলবলতঃ লভ্য। অতিরিক্ত দাঁত খোঁটার স্পষ্ট নিবারণ আছে।

দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ।
ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাদ্ যত্নমুদ্ধরণে পুনঃ॥

দাঁতে কিছু লাগিলে যদি (জিহ্বাদ্বারা) না ছাড়ান যায় তবে উহা ছাড়াইবার জন্য অধিক যত্ন করিবে না, উহাকে দন্তবৎ মনে করিবে, সুতরাং উহাতে অশুচিতা জন্মিবে না।

যে পর্ব্বাহাদিতে দন্তকাষ্ঠিকার নিষেধ, তাহাতে দুই প্রকার অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। পত্রের দ্বারা দন্তধাবন করা যায়, আর দ্বাদশবার জল গণ্ডূষ গ্রহণ বা কুল্লি করিলেও হয়।

কিন্তু দিনভেদে কাষ্ঠিকা দ্বারা দন্তধাবনের বিধি নিষেধ থাকিলেও জিহ্বোল্লেখ বা জিবছোলার নিষেধ কখনই নাই। ঐ কার্য্য পত্র দ্বারা করণীয়। জিহ্বোল্লেখ কার্য্যে নিম্নলিখিত তৃণরাজদিগের অর্থাৎ তালজাতীয় বৃক্ষগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ——

গুবাকতালহিন্তালী তথা তাড়ী চ বেতসী।
খর্জ্জূর নারিকেলৌচ সপ্তৈতে তৃণরাজকাঃ॥

দন্তধাবন কালে কথা কহিতে নাই। অধিক বেলা করিয়া দন্তধাবন করাও নিষিদ্ধ। এখন দেখিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ মধ্যাহ্ন স্নান কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া দন্তধাবন করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে——

মধ্যাহ্নস্নান কালেচ যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ॥

মধ্যাহ্নস্নানকালে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করেন, পিতৃগণের সহিত দেবগণ তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া গমন করেন। অতএব প্রাতঃকালেই দন্তধাবন করিতে হয়।

শাস্ত্রানুযায়ী হইয়া চক্ষু বিধৌত করিতে হইলে মুখের ভিতরে শীতল জল রাখিয়া দুই চক্ষু ধুইতে হয়। বিনা প্রক্ষালনে এক হাতে দুই চক্ষু ধৌত করা নিষিদ্ধ। তাহাতে শুচিতার রক্ষা করা হয় না।

অশুচিতার সমূহ দোষ। শাস্ত্রের স্পষ্ট কথাই এই——

স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্মবিধিক্রিয়াঃ।
মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ।

শুচিতার একান্ত পক্ষপাতী আর্য্যশাস্ত্র যে উহার সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠানের অর্থাৎ স্নানের * প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।
লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্॥
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ॥

নিদ্রোত্থিত পুরুষ লালাস্বেদাদি সমাকীর্ণ দেহ লইয়া জপ হোমাদি কোন বৈধ কর্ম্মই স্নান না করিয়া করিবেন না। নবচ্ছিদ্র সমন্বিত শরীর অত্যন্ত অশুচি; দিবা রাত্রি ইহা হইতে কিছু না কিছু ক্ষরিত হইতেছে। প্রাতঃস্নানদ্বারা ইহার শোধন হয়।

বস্তুতঃ অনাতুর ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতি প্রাতঃস্নান করিবার আদেশ আছে। গৃহীর প্রতি দুইবার এবং অপর আশ্রমীর প্রতি তিন বার

---

* যে সকল দেশে আচার শিক্ষার শাস্ত্র নাই তথায় লোক সকল কেমন অশুচি হইয়া থাকে তাহা আমাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর। এক জন ফরাসী পণ্ডিত একটু গর্ব্ব করিয়াই বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বদেশীয়েরা গড়ে দুই বৎসরের মধ্যে একবার স্নান করে। তিনিই বলেন ইংলণ্ডবাসীরা গড়ে তিন বৎসরান্তর, জর্ম্মণেরা পাঁচ বৎসরান্তর, রুষীয়েরা ছয় বৎসরান্তর একবার স্নান করিয়া থাকে।

স্নান করিবার বিধি। তাহার প্রথম স্নানটিই প্রাতঃস্নান। অরুণোদয় উহার মুখ্যকাল। নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করতঃ দুই হস্ত দ্বারা মুখ, নাসিকা চক্ষুঃ এবং কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া তিনবার শিরোমজ্জন করিয়া লইলে এই স্নান হয়। প্রাতঃস্নানটি সংক্ষেপেই সারিতে হয়। শিরোমজ্জনের নিয়ম এই—যদি স্রোতোজল হয়, তবে যে দিক হইতে স্রোতঃ আইসে সেই মুখে ডুব দিতে হয়, যদি স্থির জল হয় বা গৃহে তোলা জল হয়, সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শিরঃস্নান করিতে হয়। স্নান কালে কথা কহিতে নাই, এবং পরণ কাপড়ে গা মাজিতে নাই।

উল্লিখিত বিধি গুলির প্রতি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্নানের দ্বারা কেবল শুচিতা সম্পাদন হয় বলিয়াই যে শাস্ত্রে স্নানের সমাদর হইয়াছে, তাহা নহে, স্নানের স্বাস্থ্যকারিতার প্রতিও সর্ব্বদিক্‌দর্শী শাস্ত্রের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে।

স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহং।
শরীরবলসন্ধানং কেশ্যমোজস্করং পরং।

স্নান পবিত্রতাজনক, আয়ুর্বর্দ্ধক, শ্রমনাশক, স্বেদনিবারক, মলাপহারক, কেশবর্দ্ধক, পরম তেজস্কর।

যে প্রকার স্নানে স্বাস্থ্যহানির অথবা অন্য কোন হানির সম্ভাবনা তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥

ভোজনের পর, কিম্বা পীড়া থাকিতে অথবা রাত্রি নয়টা হইতে তিনটার মধ্যে কিম্বা অধিক বস্ত্র পরিধান করিয়া অথবা বহুবার কিম্বা অপরিচিত জলাশয়ে স্নান করিবে না।

ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম জলাশয়ে স্নান অপ্রশস্ত।

প্রভূতে বিদ্যমানেতু উদকে সুমনোহরে।
নাল্পোদকে দ্বিজঃ স্নায়াৎ নদীঞ্চোৎসৃজ্য কৃত্রিমে॥

সুমনোহর প্রভূত জলাশয় প্রাপ্ত হইলে স্বল্পোদক জলাশয়ে স্নান করিবে না এবং নদী ত্যাগ করিয়া কোন কৃত্রিম জলাশয়ে স্নান করিবে না।

সমুদ্র জলে স্নানের যথেষ্ট প্রশংসা——

জন্মান্তরসহস্রেণ যৎ পাপং কুরুতে নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্নাত্বাক্ষারার্ণবে সকৃৎ।

স্নান সম্বন্ধে আর একটী শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্যও প্রাকৃতবুদ্ধিগম্য——

স্নাতস্য বহ্নিতোয়েন তথাচ পরবারিণা।
কায়শুদ্ধিং বিজানীয়াৎ নতু স্নানফলং লভেৎ॥

উষ্ণজলে এবং অপরকর্ত্তৃক আনীত জলে স্নান করিলে শরীর শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু স্নানের সকল ফল ফলে না, অর্থাৎ স্বয়ং জলাশয়ে গমন করিয়া শীতল জলে অবগাহন করিলেই স্নানের সমগ্র ফল লাভ হইতে পারে।

এপর্য্যন্ত অবগাহন স্নানের কথাই বলা হইল। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত স্নান সাত প্রকার, * যথা—

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

মন্ত্রবিশেষ পাঠে মান্ত্রস্নান হয়, মৃত্তিকালেপন দ্বারা ভৌমস্নান হয়, হোমাগ্নিসম্ভূত ভস্ম লেপনে আগ্নেয় স্নান হয়, গোপাদরজঃ প্রবহমান বায়ুতে বায়ব্য স্নান হয়, সাতপ বৃষ্টিপাতের দ্বারা দিব্য স্নান হয়, জলে মজ্জন করিলে বারুণ স্নান হয় এবং বিষ্ণু চিন্তনের দ্বারা মানস স্নান হয়।

যাঁহারা দিনের মধ্যে তিন সন্ধ্যায় তিন বার অথবা প্রাতে এবং মধ্যাহ্নে দুই বার অবগাহন করিতে না পারেন, তাঁহারা একাধিক বার অবগাহনের স্থলে অপর ছয় প্রকার স্নানের কোন এক প্রকারকে অনুকল্প স্বরূপ গ্রহণ

* মুসলমানেরাও ভৌমস্নান এক প্রকার স্বীকার করেন।

করিয়া থাকেন। অশক্ত এবং আতুরের পক্ষে আরও এক প্রকার স্নানানুকল্প আছে। যথা—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্ম্মিণাং।
আর্দ্রেণ বাসসাবাপি মার্জনং দৈহিকং বিদুঃ॥

কর্ম্মি-ব্যক্তি স্নানে অশক্ত হইলে মস্তক না ভিজাইয়া অথবা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া স্নানের অনুকল্প করিতে পারেন। তাহা করিলে বিধির লঙ্ঘন হয় না। আমাদের বাসভূমি বঙ্গদেশের বায়ু অতিশয় সজল। এখানে অনেকের ধাতুতেই একাধিক বার অবগাহন স্নান সহ্য না হইলেও না হইতে পারে, বোধ হয়, সেই কারণেই রুক্ষ পশ্চিম প্রদেশের অপেক্ষা এখানে দুই তিন বার অবগাহীর সংখ্যা অনেক ন্যূন। এখানে প্রাতঃস্নায়ীরা মধ্যাহ্নে স্নানে অবগাহনের অনুকল্প গ্রহণ করেন, এবং মধ্যাহ্নস্নায়ীরা প্রাতঃস্নানকালে অনুকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা প্রাতঃস্নান করেন না, তাঁহারা রাত্রিবাসত্যাগ, আচমন ও কেশ প্রসাধন * পূর্ব্বক প্রযত হইয়া মানস বা মাত্র স্নান করেন।

যাবত্ত্ব রাত্রিবাসোস্তি তাবদপ্রযতো নরঃ।
তস্মাদ্ যত্নেন তত্ত্যাজ্যমাদৌ শুদ্ধিমভীপস্তা।
আচান্তস্ততঃ কুর্য্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনং॥

---

* মুসলমানদিগের মধ্যেও কেশ প্রসাধনের শুচিতা স্বীকৃত আছে।

মাত্র স্নানের মন্ত্রটী সন্ধ্যোপাসনার অন্তর্গত মার্জ্জন মন্ত্র; অর্থ এই—

হে জল সকল! তোমরা অতি সুখদাতা, ইহকালে [প্রত্যক্ষতঃ] অন্নের উপায় কর এবং অন্তে [পরোক্ষতঃ] পরমপদার্থে সংযোজিত করিও, তোমরা [বহুত্ব হইতে একত্ব প্রাপ্তির অনুক্রমে] জননীর ন্যায় হিতকারিণী, আমাদিগকে অশিবশূন্য মঙ্গলতম রস প্রদান কর। তোমরা যে রস দ্বারা জগৎকে তৃপ্ত করিতেছ, সেই রস ["রসো বৈ সঃ"] দ্বারা [তোমরা যাহার বাহরূপ মাত্র] আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর।

যতক্ষণ রাত্রিবাস ধারণ করা থাকে ততক্ষণ শুচিতা জন্মে না; এই জন্য শুচিতাভিলাষি-ব্যক্তি (বৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার) পূর্ব্বেই রাত্রিবাস ত্যাগ করিবেন এবং আচমনের পরেই কেশ প্রসাধন করিবেন।

এইরূপে অবগাহন স্নান অথবা তদনুকল্প অপর কোন স্নান এবং রাত্রিবাসত্যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জল বা মৃত্তিকা অথবা চন্দনাদি দ্বারা তিলক করিবে এবং তাহার পর দেবতা, ঋষি, এবং (মৃত পিতৃকের পক্ষে) পিতৃ তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রধান মন্ত্র এই—

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হউক।

তর্পণ ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়। সন্ধ্যার উপাসনা অতীব পবিত্র। সমস্ত বিশ্ব, তৎস্বরূপ, তদ্ব্যাপক এবং তদতীত—

জাতমেতন্ময়া ত্বত্তো যথাপূর্ব্বমিদং জগৎ
বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতশ্চ নপরং বিদ্যতে ততঃ।

সেই তাঁহা (পরম সত্য) হইতে আমাকর্ত্তৃক এই জগৎ যথাপূর্ব্ব প্রসূত হইয়াছে। অতএব এই জগৎ বিষ্ণু, বিষ্ণুই এই জগতের কারণ এবং বিষ্ণুই ইহার আধার। তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

সেই পরমসত্যের সহিত মানবাত্মার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রগুলিতে অতি সুব্যক্ত। বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে ঐ সকল মন্ত্রের কি অক্ষরার্থ কি তাৎপর্য্যার্থ এক্ষণে অনেকের অনায়ত্ত হইয়া আছে। কার্য্য কালে স্মরণ হয় না; সুতরাং সন্ধ্যাকৃত্যের সম্যক্ ফললাভ হইতেছে না। সন্ধ্যার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

যা সন্ধ্যা সাতু গায়ত্রী দ্বিধাভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ॥

যিনি গায়ত্রী তিনিই সন্ধ্যা, একেই দ্বিধা হইয়া আছেন; যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন তিনি বিষ্ণুরই উপাসনা করেন।

নিত্য সন্ধ্যোপাসকের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমোবিপ্রস্তেজসা তপসা সদা॥
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃস তেজস্বী সন্ধ্যাপূতোহি যোদ্বিজঃ॥



দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

পূর্ব্বাহ্ন-কৃত্য।

রাত্রি ৪৷৷০ টা হইতে প্রভাতকাল ৬টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্যের সময়। তাহার পর দিনকৃত্যের আরম্ভ। *

দিনকৃত্যের প্রথম ভাগে অর্থাৎ বেলা ৬টা হইতে ৭৷৷০ টা পর্য্যন্ত প্রথম যামার্দ্ধে দেবগৃহ মার্জ্জনাদি কার্য্য, গুরু ও মঙ্গল দ্রব্য দর্শন, কেশ প্রসাধন, দর্পণে মুখদর্শন এবং পুষ্পচয়ন করিতে হয়। ৭৷৷০ টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাসের বিধি। বেদাভ্যাস পঞ্চধা বিভক্ত—(১) বেদস্বীকরণ অর্থাৎ গুরুর স্থানে শ্রবণ—(২) বেদবিচার অর্থাৎ তর্ক করিয়া আলোচনা—(৩) বেদের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি—(৪) বেদের জপ অর্থাৎ মানসচিন্তন—(৫) বেদের ধ্যান অর্থাৎ অধ্যাপন।

যে ব্রাহ্মণ যে বেদের এবং যে বেদশাখার অন্তর্গত তাহার যে দৈনন্দিন পাঠ্যভাগ বা স্বাধ্যায় তাহার অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রাদির আলোচনা করিবে না। [এক্ষণে গায়ত্রীর পাঠ ইহার অনুকল্প হইবে।] স্বাধ্যায় পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদশাখা ব্যাকরণাদি অধীত হইতে পারে।

---

* মুসলমানদিগের মধ্যে নমাজ এবং কোরাণ পাঠ প্রত্যূষেই আরম্ভ হয়।

শাস্ত্রাধ্যয়নের পক্ষে এই দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কালটি অতীব প্রশস্ত। শরীর শুচি, মনোবৃত্তি সতেজ, এবং স্নান তর্পণ সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা চিত্তের সম্যক্ ঔদার্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় শাস্ত্রালোচনায় মনঃসংযোগ অধিক হইবে, স্মৃতির বলবত্তা নিবন্ধন উত্তমরূপ স্মরণ থাকিবে, শাস্ত্রোক্ত উদার ভাবগুলি সহজেই হৃদয়ে স্থান পাইবে এবং শাস্ত্রচিন্তার ক্লেশভাব অল্প হইবে। দিবসের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগটি আর্য্য ঋষিরা বিদ্যোপার্জ্জনে ন্যস্ত করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহাদের বড়ই সমাদর ছিল। তাঁহাদের মতে বেদাভ্যাস পরম তপস্যা।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমন্তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ সবিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ যঃ॥

ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা; ষড়ঙ্গ সহিত বেদাভ্যাসকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলিয়াই জানিবে।

অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে——

দানেন তপসা যজ্ঞৈরুপবাসৈর্ব্রতৈস্তথা।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি বিদ্যয়া যামবাপ্নুয়াৎ॥

বিদ্যা দ্বারা যে সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ উপবাস, ব্রত, কাহার দ্বারা সে সদ্গতি লাভ হয় না। ফলতঃ বিদ্যা মাত্রেই আদরণীয়। যাহা কিছু হইতে বেদার্থ অধিগত হওয়া যায়, তাহারই গৌরব করিতে হয়।

সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈ যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃস্মৃতঃ॥

কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কি দেশ প্রচলিত ভাষা, যে উপায়েই হউক, যিনি শিষ্যকে বেদানুরূপ শিক্ষা প্রদান করেন তিনিই গুরু। অতএব দেশভাষাদির সাক্ষাৎ পাঠনা অথবা তাহাতে গ্রন্থরচনা দ্বারা লোককে শিক্ষা দান করা, এই দ্বিতীয় যামার্দ্ধের বিধিবোধিত অনুষ্ঠানের মধ্যেই গণ্য।

গ্রন্থ বিরচন যেরূপ বিহিত কার্য্য, গ্রন্থের লিখন এবং বিতরণও সেইরূপ জ্ঞান চর্চ্চার অনুকূল ব্যাপার বলিয়া বিলক্ষণ প্রশংসনীয়।

ইতিহাসপুরাণানি লিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতিদ্বিগুণীকৃতং॥

যিনি ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ লিখিয়া [বা ছাপাইয়া] দান করেন তাঁহার ব্রহ্ম [বেদ] দানের দ্বিগুণ পুণ্য হয়।

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার দান অত্যাবশ্যক। শ্রুতি বলিতেছেন—

যোঽহরহরধীতাবিদ্যামর্থিভ্যো ন প্রযচ্ছেৎ স কার্য্যহা স্যাৎ শ্রেয়সো দ্বারমাবৃণুয়াৎ।

যিনি অহরহ বিদ্যাভ্যাস করিয়া বিদ্যার্থীকে না দান করেন, তিনি কার্য্য ব্যাঘাতক, তিনি মঙ্গলের দ্বার রুদ্ধ করেন।

বিদ্যার আদান প্রদান সম্বন্ধীয় কয়েকটী আর্য্যনীতি জ্ঞাতব্য।

(১) যো গুরুং পূজয়েন্নিত্যং তস্য বিদ্যা প্রসীদতি।
তৎপ্রসাদেন যস্মাৎ স প্রাপ্নোতি সর্ব্বসম্পদঃ॥

যে ব্যক্তি নিত্য গুরুপূজা করে তাহার প্রতি বিদ্যা প্রসন্না হয়েন; গুরুর অনুগ্রহেই সকল সম্পদের (হেতুভূত বিদ্যার) লাভ হয়।

(২) বিস্মরেচ্চ তথামৌঢ্যাৎ যোঽপিশাস্ত্রমনুত্তমং।
স যাতি নরকংঘোরং অক্ষয়ং ভীমদর্শনং॥

মূর্খতাবশতঃ যে ব্যক্তি শাস্ত্র শিখিয়া ভুলিয়া যায় তাহার ঘোর ভীম-দর্শন অক্ষয় নরক প্রাপ্তি হয়।

(৩) যশ্চবিদ্যামাসাদ্য তয়াজীবেন্নতস্য পরলোকে ফলপ্রদা ভবতি যশ্চ বিদ্যায়া পরেষাং যশোহন্তি।

বিদ্যালাভ করিয়া যিনি তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন [ছাত্র পড়াইয়া তাহার স্থানে বেতন গ্রহণ করেন] তাঁহার পরলোকে কোন ফল-প্রাপ্তি হয় না, আর যিনি অন্যের যশ নষ্ট করেন তাঁহারও পরলোকে ফল হয় না।

(৪) উপাধ্যায়স্য যোবৃত্তিং দত্ত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।
কিন্নদত্তং ভবেত্তেন ধর্ম্মকামার্থমিচ্ছতা।

ত্রিবর্গসাধনের অভিলাষী যিনি অধ্যাপকের বৃত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনি কি না দেন।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধে শাস্ত্রালোচনা করিয়া তৃতীয় যামার্দ্ধে অর্থাৎ ৯টা হইতে ১০৷৷০ টা পর্য্যন্ত পোষ্যবর্গের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাধন চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বকাল হইতে এখনকার কালে আমাদের অবস্থা কতই ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে! তখন দেড় ঘণ্টাকালমাত্র যত্ন করিলেই পর্য্যাপ্ত অর্থ চিন্তা হইত, এখন যেন অষ্ট প্রহর ঐ চিন্তা করিলেও কুলায় না। যখন ধনবত্তা ছিল, তখন লোভ ছিল না, আর এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও বড় কিছু হয় না, তথাপি ভোগ সুখেচ্ছা এবং ধন লোভ দিন দিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। তখন নিজের জন্য কিছুই করিতে নাই এইরূপ শিক্ষা ছিল, এখন নিজের জন্য বই আর কাহার জন্য কিছু করিতে নাই, এই শিক্ষা প্রবলা হইতেছে।

শাস্ত্র বলেন——

স জীবতি বরশ্চৈকো বহুভি র্যোপজীব্যতি
জীবন্তোমৃতকাশ্চান্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ।

যে শ্রেষ্ঠপুরুষ অনেকের উপজীব্য হইয়া থাকেন, তিনিই জীবিত, যে কেবল আপনার উদর পূরণ করে সে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত।

অবশ্যপোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্যই ব্রাহ্মণগৃহীর অর্থচিন্তা। অবশ্যপোষ্য বলিলে বুঝায়—

মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনা সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

মাতা পিতা, গুরু, ভার্য্যা, সন্তান, দরিদ্র, আশ্রিত লোক, অভ্যাগত, অতিথি, [সাগ্নিকের] অগ্নি ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া অভিহিত।

পোষ্যবর্গের মধ্যে শাস্ত্রে একটি বিশেষ কথা আছে—

বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ সাধ্বীভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ পিতামাতা, সাধ্বী স্ত্রী এবং শিশু সন্তান ইহাদিগকে শত অকার্য্য [নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য] করিয়াও প্রতিপালন করিবে।

পোষ্যবর্গের পালনার্থ ব্রাহ্মণ, বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণের মুখ্যবৃত্তি—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥
ষণ্ণান্তু কর্ম্মণাং মধ্যে ত্রীণিকর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য। ঐ ছয়টির মধ্যে তিনটি তাঁহার জীবিকা—যাজন, অধ্যাপন এবং সৎপ্রতিগ্রহ।

অন্যের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য এবং কুষীদ গ্রহণ কার্য্য চালাইয়াও ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, আর আপৎকালে স্বয়ংও ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন।

কুষীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীতাস্বয়ংকৃতং।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ॥

কুষীদ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

বহবো বর্ত্তনোপায়া ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং কুষীদমধিকং বিদুঃ॥

ঋষিরা জীবিকার অনেক উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কুষীদ গ্রহণই উৎকৃষ্ট।

জীবিকার জন্য ভৃতি স্বীকারও নিষিদ্ধ নহে।

উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে॥

বাণিজ্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

সদ্যঃ পততি লৌহেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যাহেণ শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥

লৌহ, লাক্ষা, লবণ এবং দুগ্ধ এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিলে ব্রাহ্মণ তিন দিনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কুষ্ঠলে বনভূমিতে এবং সমুদ্রতীরে ব্রাহ্মণের গমন নিবারণ করা এবং দুগ্ধের ব্যবসায় করিলে যদি লোভ বৃদ্ধি হইয়া বাছুরের প্রতি অত্যাচার হয় তাহার নিবারণ করা, উল্লিখিত বিধির তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শূদ্রের পক্ষেও কতকগুলি দ্রব্যের ব্যবসায় দোষাবহ।

বিক্রয়ং সর্ব্ব বস্তূনাং কুর্ব্বন্ শূদ্রো ন দোষভাক্।
মধু, চর্ম্ম, সুরাং লাক্ষাং ত্যক্ত্বা মাংসঞ্চ পঞ্চমং॥

মধু, চর্ম্ম, সুরা, লাক্ষা এবং মাংস এই পাঁচটি দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া শূদ্র অপর সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিতে পারে। বোধ হয় এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় হিংসাবহুলাদি দোষবিশিষ্ট বলিয়া ব্যাধ, কিরাত, শবরাদি বন্য এবং পাহাড়িয়া প্রভৃতি অন্ত্যজ লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যই ঐ বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল।

কৃষি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং ব্রহ্মঘাতিনাং॥

[যদি সমস্ত দিন] চারি, জোড়া হেলিয়ার দ্বারা হল চালান হয়, তবে ধর্ম্মহল হয়, তিন জোড়ার দ্বারা জীবিকার্থীর হল হয়, দুই জোড়ার দ্বারা নিষ্ঠুরের এবং এক জোড়ার দ্বারা ব্রহ্মহত্যাকারীর হল হয়।

উপার্জ্জিত ধনের রক্ষণ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধেও শাস্ত্রের বিধি আছে—

পাদেন তস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেনচাত্মভরণং নিত্য নৈমিত্তিকন্তথা॥

পাদস্যার্দ্ধার্দ্ধ মর্থস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমারভতঃ পুংসশ্চার্থঃ সাফল্য মৃচ্ছতি॥

যাহা অর্জ্জিত হইবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সিকি ভাগ পারলৌকিক হিতসাধনে বিনিযুক্ত করিবেন. অর্দ্ধভাগ দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন সহকারে আত্মপোষণ করিবেন, বাকী সিকি ভাগের অর্দ্ধের অর্দ্ধ মূলধনে সংযুক্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে চলিলে অর্থের সাফল্য হয়।

কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র যে ধন সঞ্চয়াদির বিধি প্রদান করেন তাহা লোক সকলকে বিলাস-প্রবণ করিবার জন্য নয়, মুখ্যতঃ ক্রিয়াবান করিবার জন্য।

ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃসর্ব্বা যত্নস্তস্যার্জ্জনে মতঃ।
রক্ষণং বর্দ্ধনং ভোগ, ইতিতত্র বিধিক্রমাৎ॥

ক্রিয়া মাত্রেই ধনের প্রয়োজন, এই জন্যই ধনের অর্জ্জন করিতে হয় এবং তজ্জন্যই ধন রক্ষণের, বর্দ্ধনের এবং ভোগের যথাক্রমে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

রাত্রির শেষ যামার্দ্ধে দিবসের প্রাতঃকৃত্য, প্রথমযামার্দ্ধে পুষ্পচয়নাদি, দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস এবং তৃতীয় যামার্দ্ধে পোষ্যদিগের পালনার্থ অর্থসাধন করিবার নিয়ম। তাহার পর চতুর্থ যামার্দ্ধে অর্থাৎ বেলা ১০॥টা হইতে ১২॥টা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন স্নান, তর্পণ এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাপূজাদি করিবার ব্যবস্থা।

প্রাতঃ স্নান যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিতে হয়, মধ্যাহ্ন স্নান সেই প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইবে। অর্থাৎ অকৃত্রিম জলে, স্রোতের প্রতিমুখে, পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া পরিধেয় বস্ত্র এবং গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র এই দুইটি মাত্র বস্ত্র লইয়া, নাভিদেশ পর্য্যন্ত মজ্জিত করিয়া, নাসিকাদি দ্বার রুদ্ধ করতঃ বারত্রয় শিরোমজ্জন করিবে। প্রাতঃস্নান হইতে মধ্যাহ্ন স্নানের বিশেষ এই যে, প্রাতঃস্নানে তৈলাভ্যঙ্গের কথা নাই।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপ সমংতৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ

প্রাতঃস্নানে, ব্রতের এবং শ্রাদ্ধের দিনে, দ্বাদশীতে এবং গ্রহণে তৈল মাখিলে সদ্য মাখার দোষ হয়, অতএব ঐ সকল সময়ে তৈল মাখিবে না।

তৈল মাখিবার নিয়ম শরীরের নীচের দিক হইতে উপরের দিকে। কারণ মাথায় মাখা তৈলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা অন্যান্য অঙ্গলেপ নিষিদ্ধ যথা—

শিরোভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ।
পর্ব্বদিনে [চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা,
এবং রবিসংক্রান্তির দিনে] তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠী এবং নবমীতে মস্তকে এবং পর্ব্বসন্ধিগুলিতে তৈল দিতে নাই। তৈলাভ্যঙ্গে বারদোষও ধরা হয়। রবিবারে এবং মঙ্গলবারে তৈল ব্যবহার দোষাবহ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তৈল ব্যবহারের যথেষ্ট গুণ কীর্ত্তন আছে।

অভ্যঙ্গ মাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥

তৈলাভ্যঙ্গের দ্বারা জরা শ্রম এবং বাত দোষ নিবারিত হয়, অতএব নিত্য অভ্যঙ্গাচরণ করিবে। মস্তকে, কর্ণে এবং পাদে বিশেষ করিয়াই তৈল দিবে।

শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, তৈলাভ্যঙ্গের প্রতি যে যে নিষেধ বাক্য আছে, তাহা-তিলোৎপন্ন তৈলকে লক্ষ্য করে, অন্য তৈলকে লক্ষ্য করে না—

তৈলাভ্যঙ্গনিষেধেতু তিলতৈলং নিষিধ্যতে।
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং॥
অদুষ্টঃ পক্ক তৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ॥

তৈলাভ্যঙ্গের যে নিষেধ, সে নিষেধ তিল তৈলেরই প্রতি। ঘৃত, সার্ষপ তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল আর পক্কতৈল, ইহাদিগের নিত্য ব্যবহার অদুষ্ট। তবে শরীর কফদোষ জন্মিলে, কিম্বা [স্নানাদি দ্বারা] শুদ্ধিলাভের পর, দোষ থাকিলে তৈল মাখিবে না।

বর্জ্যোভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্তৈঃ কৃতসংশুদ্ধাজীর্ণিভিঃ।

ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশ অত্যন্ত শীত প্রধান। সেখানকার লোকেরা গায়ের কাপড় খুলিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য ঐ সকল দেশে কি ভৈষজ্য তৈলের কি অন্য কোন তৈলের ব্যবহার প্রচলন হয় নাই। সুতরাং ইংরাজেরা তৈল মাখেন না।

এই বিষয়ে এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া তৈলের ব্যবহার ছাড়িয়া দিতেছেন সেটী বৈধ অনুকরণ নহে; তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের কতকটা হানি হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বকালে গ্রীক রোমীয় এবং ঈহুদী প্রভৃতি জাতীয় দিগের মধ্যে তৈলের এবং বেসনের (দাইলচুর্ণের) ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এখনও অনেকানেক লোকের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র সাবানই তৈলের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ সাবানে তৈল বা বসা প্রভৃতি তৈলবৎপদার্থ এবং ক্ষার-মৃত্তিকা দুইই থাকে, উহাদিগের একত্রযোগ নিত্য প্রয়োগ তাদৃশ তৃপ্তিকর বা স্বাস্থ্যকর না হইবারই সম্ভাবনা। অধিক দিন শুদ্ধ তৈল মাখিয়া এবং কোন কোন দিন মৃত্তিকা বা ভস্ম মাখিয়া স্নান করা যেমন শাস্ত্রাচার রক্ষার তেমনি স্বাস্থ্যরক্ষারও অনুকূল। শাস্ত্রেও মৃল্লেপ এবং ভস্মলেপের বিধি আছে। বিশুদ্ধ মৃত্তিকার লেপে বিস্ফোটক, ব্রণ, ঘামাছি প্রভৃতি ত্বক্ সম্বন্ধীয় সমস্ত রোগের বিশেষ প্রতিকার হয় দেখিয়াছি। কুষ্ঠের পর্য্যন্ত উপশম হয় শুনিয়াছি।

তৈলাভ্যঙ্গের পর অবগাহন বা বারুণ স্নান এবং তাহার পর (জলাদি দ্বারা) তিলক এবং তাহার পর তর্পণ করিয়া আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ এবং তদনন্তর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতে হয়। বৈধকর্ম্মকালে পরিহিত বস্ত্র সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

স্বয়ং ধৌতেন কর্ত্তব্যাঃক্রিয়াধর্ম্ম্যা বিপশ্চিতাঃ।
নচ রাজকধৌতেন নচাধৌতেন কর্হিচিৎ॥
পুত্রমিত্রকলত্রেণ স্বজ্ঞাতিবান্ধবেন চ।
দাসবর্গেণ যদ্ধৌতংতৎপবিত্রমিতি স্থিতিঃ॥

পণ্ডিতেরা ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদনের বস্ত্রাদি আপনারাই ধৌত করিয়া লয়েন, ধোপার ধোয়া অথবা অধোয়া কাপড় কখন ব্যবহার করেন না; কিন্তু পুত্র, মিত্র, পত্নী, জ্ঞাতি, বান্ধব এবং দাসের দ্বারা ধৌত বস্ত্র শুচি বলিয়া গ্রাহ্য।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতে কয়েকটী মন্ত্র এবং ধ্যান প্রাতঃ সন্ধ্যা হইতে ভিন্ন, নচেৎ সে সন্ধ্যারও যে যে অঙ্গ এবং অনুষ্ঠান মধ্যাহ্ন সন্ধ্যারও তাহাই। তর্পণের এবং সন্ধ্যার অবসানে ব্রহ্মযজ্ঞ নামে একটী অনুষ্ঠান আছে। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন তাঁহারা ইহাকে সন্ধ্যারই অঙ্গস্বরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা অপর কাহারও অঙ্গীভূত নয়। ইহার উপাদান স্বাধ্যায় পাঠ [অনুকল্পে গায়ত্রী পাঠ] এবং চারি বেদের চারিটী মন্ত্রের জপ। তাহার ঋক্‌বেদীয় প্রথমটীতে অগ্নির, যজুর্বেদীয় দ্বিতীয়টীতে বায়ুর সামবেদীয় তৃতীয়টিতে অগ্নির এবং অথর্ব্ববেদীয় চতুর্থটীতে জলের আবাহন এবং স্তব করা হয়। ব্রহ্মযজ্ঞের পর দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। দেবপূজার মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গে অথবা বাণলিঙ্গে মহাদেবের পূজা, এবং শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপূজার এবং [গৃহীতদিগের পক্ষে] কুলদেবতার বা ইষ্ট দেবতার পূজাই প্রধান।

দেব পূজার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রধান প্রধান কথা বলা যাইতেছে।

পঞ্চ দেবতার পূজাই মুখ্য পূজা। সেই পঞ্চদেবতার পূজা এবং তাহার ক্রম একটি শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়া আছে—

আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যমন্তেচ কুলদেবতাং॥

সূর্য্য, গণেশ, দেবী, রুদ্র, বিষ্ণু ও নাম শিব কুলদেবতার পূজা যথাক্রমে করিতে হয়।

দেবগৃহটী এবং পূজোপকরণগুলি যতদূ[illegible]রিষ্কার, এবং সুব্যবস্থিত করিয়া পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়—এই কা[illegible] দেবগৃহের অর্চ্চন শব্দে উক্ত হইয়াছে।

ততোগৃহার্চ্চনং কুর্য্যাৎ।

দেব পূজার দ্রব্য সমস্ত স্বয়ং অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়।

সমিৎপুষ্পকুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্ পতত্যধঃ॥

সমিৎ (হোমের কাষ্ঠ) পুষ্প, কুশাদি, ব্রাহ্মণ স্বয়ং আহরণ করিবেন; শূদ্র দ্বারা অথবা ক্রয় করিয়া আনিয়া কর্ম্ম করিলে অধঃপতন হয়।

লোককে শুচি করা যেমন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, লোককে নিরলস এবং কর্ম্মঠ এবং সদা কার্য্যে অবহিত করিয়া রাখাও তেমনি উহার উদ্দেশ্য—এই জন্য অনেকানেক কাজ নিজের হাতে করিবার জন্য বিধি প্রদত্ত হইয়া আছে। যে-বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বৈধকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, তাহা স্বহস্তে ধৌত করিবার মুখ্য বিধি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু পূজাকালে এই সকল বাহ্য আড়ম্বর আছে বলিয়া উহা যে কেবল আড়ম্বরময় পদার্থ তাহা মনে করিতে নাই। পূজকের বাহ্য এবং অন্তর ভাব কেমন হওয়া আবশ্যক, তাহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

শুচিঃ সুবস্ত্রধৃক্ প্রজ্ঞো মৌনী ধ্যানপরায়ণঃ।
গতকামভয়দ্বন্দ্বো রাগমাৎসর্য্যবর্জ্জিতঃ।
আত্মানং পূজয়িত্বাতু সুগন্ধি সিতবাসসা।
দেবান্ পূজয়েৎ।

পূজার প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি কিরূপ সামান্য গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হইবে তাহাও বর্ণিত আছে।

ক্ষমা শৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া।
আর্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।

দেবপূজা ব্যাপার কিছুমাত্র অর্থব্যয় ব্যতিরেকে শুদ্ধ জল দান দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু গৃহীর পক্ষে সে প্রণালীর দেবপূজা প্রশস্ত নয়।

অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধৈর্ধূপৈঃপ্রদীপকৈঃ।
গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাং॥

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ গৃহে অন্ন, পুষ্প, গন্ধদ্রব্য এবং ধূপদীপাদি দিয়া গৃহ-দেবতার পূজা করিবেন। তাহা হইলেই যে সুগৃহস্থের পূজা প্রকোষ্ঠটি সমুদায় বাটীর আদর্শ হইবে ইহা সহজেই বুঝা যায়।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চতুর্থ যামার্দ্ধের কৃত্যগুলি বিবিধপ্রকারের; দেড় ঘণ্টার মধ্যে যে, ঐগুলি সম্পন্ন হইতে পারে না, এমত নহে। অভ্যস্ত হইলে পূর্ণ দেড় ঘণ্টা সময়ও লাগে না। এখন কথা হইতেছে এই, অর্থ চিন্তন এবং তৎসংগ্রহের কাল বলিয়া যে তৃতীয় যামার্দ্ধটী নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অনেকের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হয় না—বিশেষতঃ নগরবাসী চাকুরিয়া লোকের পক্ষে তৃতীয় যামার্দ্ধের কৃত্যই পরবর্ত্তী যামার্দ্ধ গুলির করণীয় সমস্ত ব্যাপারকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এখন চাকুরিয়াদিগকে ৯টা হইতে ১০॥ টার ভিতরেই আহারাদি শেষ করিয়া চাকুরীস্থানে গিয়া হাজির হইতে হয়। এই জন্য তাঁহারা অনেকেই তৃতীয় যামার্দ্ধ হইতেই আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং দেব পূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এক যামার্দ্ধকৃত্য অন্য যামার্দ্ধে নির্ব্বাহিত হইলে তেমন

কোন দোষ হয় না। বস্তুতঃ স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন মীমাংসা করিয়াছেন—"অত্রাপ্রত্যাখ্যেয় কর্ম্মানুরোধেন প্রধানকালাদন্যত্রাপি কালান্তরে কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি।" যে কার্য্যের প্রত্যাখ্যান করা যায় না এমন কার্য্যের অনুরোধে মুখ্য কাল ত্যাগ করিয়া গৌণ কালেও বৈধকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যাঁহারা স্বধর্ম্মানুরত পুরুষ, ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বাহ করায় তাঁহারা সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে—

"ন সন্ধ্যা পূজনৈর্লোকে বাধাতে কর্ম্ম কিঞ্চন"।

সন্ধ্যা বন্দন এবং পূজাদির জন্য লোকের কার্য্য ক্ষতি হয় না।

বাস্তবিক এখন কাজের জন্য সন্ধ্যাপূজাদির ব্যাঘাত হইতেছে না। যাহা হইতেছে তাহা—

নাস্তিক্যাদথবালস্যাৎ।



তৃতীয় অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

পূর্ব্বাহ্ন-কৃত্য।

দেবপূজার অবসানে পঞ্চম যামার্দ্ধের (১২টা হইতে ১॥০ টা পর্য্যন্ত সময়ের) কার্য্যারম্ভ হইবে। এই যামার্দ্ধের কার্য্য অনেকগুলি—যথা হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথি সেবন, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাস দান, ভোজন। উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে।

(১) হোম। এখন এদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়াছে। নিত্যহোমীও অতি অল্পসংখ্যক। কিন্তু নিত্য হোমের অনুষ্ঠান বৃহৎ বা জটিল নয়। ইহার আহুতির সংখ্যাও অল্প এবং আহবনীয় পদার্থও দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নহে।

গৃহমেধিনো যদশনীয়ং তস্য
হোমাবলয়শ্চ স্ব স্ব পুষ্টিসংযুক্তাঃ।

গৃহীর খাদ্যও যাহা তাঁহার হবনীয় পোষণকারী পদার্থ তাহাই হইবে।

ক্ষুদ্রতম মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জলেও জলের আহুতি হোমকার্য্যের স্থানীয় হয়।

জুহুয়াদম্বুনাপিচ।

এমন স্বল্পায়াসসাধ্য অনুষ্ঠানটির লোপ হওয়া ভাল হয় নাই।

(২) বৈশ্বদেব। সমষ্টিভাবে যাহা বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত ব্যষ্টিভাবে তাহাই বিশ্বদেব নামে আখ্যাত। বৈশ্বদেবের পূজা সপ্রণব বিশ্বদেবায় নমঃ মাত্র বলিলেই হয়।

সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্ত্তব্যো বলিকর্ম্ম চ।
অনশ্নতাপি কর্ত্তব্যমন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ॥

সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে বৈশ্বদেবের [পূজা ও আহুতি] এবং বলিকর্ম্ম করিবে, ভোজন না করিয়াই করিবে অন্যথা পাপী হইবে।

(৩) বলি। বলিকর্ম্মে বিশ্বব্যাপক সমস্ত প্রাণিগণকে অন্ন দান করিতে হয়।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ
প্রেতাঃ পিশাচা স্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং॥
পিপীলিকা কীটপতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবন্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা নপিতা ন বন্ধু র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েন্নং ভুবিদত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রাঃ পাপযোনয়ঃ॥

অর্থাৎ দেবতা মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গ বৃক্ষাদি এবং বান্ধব বিহীন এবং পতিত ও পাপী সকলেই আমার প্রদত্ত এই অন্ন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং মুদিত হউক।

এই সর্ব্বভূতময় বলি প্রদানের একটী অপূর্ব্ব হেতুবাদ আছে—

ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ।
শ্ব চণ্ডাল বিহঙ্গানাং ভুবিদদ্যাত্ততো নরঃ॥

যেহেতু গৃহস্থ সকলের আশ্রয় অতএব সকলকে না খাওয়াইয়া আপনি খাইতে পারেন না। তিনি বলিপ্রদান কালে মনে মনে ভাবিবেন এবং বলিবেন

ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায় ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং

ভূত সমূহের স্বরূপ স্বয়ং বিষ্ণুর প্রতিরূপ আমি সমস্ত প্রাতিবর্গের পালনার্থ এই অন্নদান করিতেছি।

ভারতবাসীর শাস্ত্রশিক্ষিত নিত্য বলি অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বজীবে দয়ার এবং পরার্থপরতার অভ্যাস যেরূপ সাধিত হয় তাহা অন্য জাতীয়দিগের কল্পনাশক্তিরও অগোচর। পুরুষানুক্রমিক এইরূপ অনুষ্ঠান সকলের ফলেই ভারতবাসী অপর সকল জাতীয়ের অপেক্ষা অহিংসক দয়ালু ও পরার্থজীবী হইয়া আছেন। এরূপ অনুষ্ঠানের লোপ হওয়া ভাল নয়।

(৪) অতিথি। বলির সমাধান করিয়া অতিথি সৎকার ভারতবাসীর নিত্যকর্ম্ম।

প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তেসোতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥

প্রিয় হউক দ্বেষ্য হউক মূর্খ হউক পণ্ডিত হউক বৈশ্বদেবক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি প্রাপ্ত হইবে সে সাক্ষাৎ, স্বর্গপ্রদ।

অতিথি মাত্রেই গৃহীর পূজ্য এবং আদরণীয়।

হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী॥

গৃহী অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলিয়াই মানিবে

অতিথির পরিচয় গ্রহণ চেষ্টা করিতে নিষেধ আছে—

দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি।

দেশ নাম কুল বিদ্যা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া যিনি অন্ন দেন তিনি অন্ন দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগমন করেন না। এখন দেশমধ্যে কুশিক্ষার প্রভাব হওয়াতে কেহ কেহ অসম্পূর্ণ ও একান্ত স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অতিথি ও ভিক্ষুকের অনাদর করিতে শিখিতেছেন। ঐরূপ কার্য্য একান্ত শাস্ত্রবিগর্হিত এবং আমাদের জাতীয় স্বভাবের বিরুদ্ধ।

(৫) নিত্যশ্রাদ্ধ। আর্য্যশাস্ত্র জনগণকে ধর্ম্মশীল করিবার নিমিত্ত যে অশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতি জাগরূক করা একটী প্রধানতম উপায়। এই জন্য পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মারক শ্রাদ্ধকার্য্য বর্ষে বর্ষে করিবার যেমন একটী প্রথা প্রচলিত আছে, তেমনি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে এবং মাসে মাসে এবং প্রতিদিনও করিবার ব্যবস্থা আছে। দৈনিক বা নিত্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান অতি সামান্য হইলেও ক্ষতি নাই। এই শ্রাদ্ধে ভোজ্যোৎসর্গ অথবা পিণ্ডদান কিম্বা বিশ্বদেবাদির আবাহন এবং বলি প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয় না। ষট্ পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় তিন এবং মাতামহ পক্ষীয় তিন পুরুষকে স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন বিসর্জ্জন করিলেই হয়, একটু জল দিলেও চলে।

অশক্তাবুদকেন তু।

(৬) গোগ্রাস। ভৌত বলি অর্থাৎ সাধারণতঃ জীবদিগকে আহার দানের পরেও গোজাতির সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিবার জন্য গোগ্রাস দানের বিধি—

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

ইহাই গোগ্রাস দানের মন্ত্র এবং মন্ত্রেই সৌরভেয়ী বা সুরভিকন্যা গাভীর প্রতি ভারতবাসীর ভক্তি প্রকাশ।

(৭) ভোজন। ভোজনটাই পঞ্চম যামার্দ্ধের সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহদ্ব্যাপার। এই যামার্দ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট হোম, বৈশ্বদেব, বলি, অতিথিসেবা, নিত্যশ্রাদ্ধ এবং গোগ্রাস দান। এই সমস্ত কার্য্যেই যেন গৃহীকে শেষভাগের অনুষ্ঠেয় ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্যতা বিশিষ্ট করে। মুখ্যবিধি হইল যজ্ঞাশী হইতে হয়, অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ ভোজন করিতে হয়। আবার বিধি হইল, পঞ্চযজ্ঞান্নং হাপয়েৎ, অর্থাৎ পাঁচটী যজ্ঞ অবশ্য করণীয়, তৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইল—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো, বলি র্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং॥

অধ্যাপন, ব্রহ্মযজ্ঞ. তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি পূজা নরযজ্ঞ। তবেই এই পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহিত না করিলে গৃহস্থাশ্রমীর ভোজন গ্রহণে শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয় না।

কিন্তু ভোজন গ্রহণে অধিকার হইলেই যেমন তেমন করিয়া অথবা যাহা তাহা খাইতে নাই। আর্য্য ঋষিরা মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গই বিধিবোধিত করিয়া পবিত্র এবং পাশব ভাব পরিচ্যুত করিতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহারা গৃহীকে উপদেশ দিলেন—

(১) ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জয়েৎ। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর বৃথা পাক বর্জন করিবে।

তাহার পর বলিলেন—

(২) তথা সুবাসিনী রোগিগর্ভিণী বৃদ্ধ বালকান্
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী।

নবোঢ়া, রোগী, গর্ভিণী, বৃদ্ধ এবং বালককে সংস্কৃতান্ন দ্বারা ভোজন করাইয়া গৃহী তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিবেন।

আরও নিয়ম হইল—

প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত শুচিঃপীঠমধিষ্ঠিতঃ।
বিশুদ্ধবদন প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ॥

পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিবে, শুচিপীঠে বসিবে, মুখ পরিষ্কার থাকিবে এবং প্রীতিপূর্ণ হইবে, বিদিঙ্মুখে অর্থাৎ কোণাকোণি হইয়াও বসিবে না।

অপর নিয়ম এই—

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাস্থিতঃ।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্যমেষা পঞ্চার্দ্রতা মতা॥

শরীরের পাঁচটী ভাগ অগ্রে আর্দ্র করিয়া পূর্ব্বমুখে মৌন হইয়া ভোজন করিতে বসিবে; দুই হাত দুই পা এবং মুখ এই পাঁচ ভাগ।

ভোজন কালে মৌনী হওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিধি। ইউরোপীয়-দিগের ব্যবহার ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন কথোপকথন করিতে করিতে ভোজন করিলে পরিপাকাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই মুখের লালা নিঃস্রাব কম হইয়া জিহ্বা শুষ্ক হয়; এই জন্য বোধ হয় তাঁহাদের ঘন ঘন জল বা মদ্যপান করিতে হয়। লালা শুষ্ক হওয়া এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে জল খাওয়া পরিপাক ক্রিয়ার অনুকূল নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে মাংস পরিপাক করিতে লালার প্রয়োজন তত বেশী হয় না; এজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাংসভুক্ জন্তুরাও ভোজন কালে গর গর করিয়া শব্দ করে; উদ্ভিজ্জভোজিগণ তাহা না করিয়া নিঃশব্দেই ভোজন করিয়া থাকে।

পঙ্‌ক্তির বিচারেও বিশেষ কড়াকড়ি আছে—

অপ্যেকপঙ্‌ক্ত্যা নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
ভস্মতৃণজলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্‌ক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ।

স্বজনদিগের সহিতও এক পঙ্‌ক্তি হইয়া ভোজন করিবে না। [হোমসঞ্জাত] ভস্ম অথবা তৃণ অথবা জলের অঙ্ক দিয়া পঙ্‌ক্তিভেদ করিবে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জল রেখার উপর পঞ্চ গুঁড়ির বিন্যাস দ্বারা পঙ্‌ক্তিভেদের চিহ্নগুলি বিশিষ্টরূপ শোভন করা হয়।

ভোজনের পাত্র রাখিবার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘ্বাসনান্বিতঃ।
চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ মণ্ডলঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকং।
কর্ত্তব্যমানুপূর্ব্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলং॥

[গোময়দ্বারা] উপলিপ্ত সম এবং শুচিস্থানে লঘু আসনে উপবিষ্ট হইবে এবং চতুরস্র বা ত্রিকোণ অথবা গোল কিম্বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া আনুপূর্ব্বিকক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ভোজন করিবে।

ভোজনপাত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা আছে—

ভাঙ্গা কাঁসার পাত্রে খাইতে নাই। শূদ্রাদির ভোজনের দ্বারা অপবিত্রীকৃত পাত্রে, তাম্রপাত্রে, সমল পাত্রে, পলাস পাত্রে, পদ্ম পাত্রে, আকন্দ পত্রে, কদলী পত্রের পৃষ্ঠে, লৌহ পাত্রে, হস্তে বা বস্ত্রে রাখিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ। স্বর্ণের, রৌপ্যের, প্রস্তরের এবং স্ফাটিকের ভোজ্য পাত্রই উৎকৃষ্ট। কাচ এবং পোর্সিলেন এবং কড়িকোটা এই তিনটীকেই বরং কৃত্রিম স্ফাটীক বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং উহাদিগের নির্ম্মাণ স্বদেশ মধ্যে প্রচরূপ হইলে আমাদের সমাজে ক্রমশঃ উহাদিগের ব্যবহার বৃদ্ধি হিতকর হইবে বলিয়াই মনে করা যায়।

ভক্ষ্যদ্রব্য সম্মুখস্থ হইলে মনের ভাব কিরূপ হওয়া বিধেয়—

পূজয়েদশনং নিত্যং চাদ্যাচ্ছৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসিদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥

ভক্ষ্যদ্রব্যের নিত্য সমাদর করিবে, তাহার নিন্দা করিবে না দেখিয়া হৃষ্ট হইবে এবং সর্ব্বতোভাবে আনন্দ যুক্ত হইবে।

অনন্তর পঞ্চ বাহ্য বায়ুর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া গণ্ডূষ গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্ব্বায়ু পঞ্চের আহুতি দিয়া উৎসর্গীকৃত অন্ন অল্পে অল্পে অঙ্গুলির পর্ব্ব মাত্র দিয়া বাক্‌যত হইয়া ভক্ষণ করিবে।

ভক্ষ-দ্রব্য সম্বন্ধে নিয়ম এই—

প্রাগ্‌দ্রবং পুরুষোঽশ্নন্ বৈ মধ্যেচ কঠিনানি চ।
পুনরন্তে দ্রবাশী তু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি॥

প্রথমে দ্রব্য দ্রব্য খাইবে মধ্যে কঠিন দ্রব্য খাইবে এবং শেষে আবার দ্রব দ্রব্য খাইবে—এরূপ করিলে বলের এবং স্বাস্থ্যের হানি হইবে না।

কোন্ রস কখন খাইতে হয় তাহাও উক্ত হইয়াছে—

অশ্নীয়াত্তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসং।
লবণাম্লৌ তথামধ্যে কটূতিক্তাদিকং তথা॥

তন্মনস্ক হইয়া প্রথমে মধুর রস খাইবে, তাহার পর লবণ এবং অম্লরস এবং শেষ ভাগে কটু এবং তিক্তরস।

বঙ্গদেশে ভোজনের উল্লিখিত ক্রম রক্ষা হয় না। এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালীর অবলম্বন হইয়া প্রথমে তিক্ত, পরে কটু, তাহার পর লবণ অম্ল, এবং সর্ব্বশেষে মধুর রস গ্রহণ করা হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রাদেশের ব্রাহ্মণেরা উল্লিখিত শাস্ত্রমতানুবর্ত্তী হইয়া চলেন।

ভোজনের প্রারম্ভে যেমন জল গণ্ডূষ লইবার বিধি, ভোজনাবসানেও সেই রূপ জলগণ্ডূষ লইবার বিধি আছে। অমৃতরূপ জল ভক্ষ্য দ্রব্যের পিধান এবং আস্তরণ। অর্থাৎ ভক্ষিত দ্রব্যের আসনও জল এবং তাহার আবরণও জল।

ভোজন বিষয়ক স্থূল স্থূল কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করা হইল কিন্তু সর্ব্বদিক্‌দর্শী আর্য্যশাস্ত্র ভোজন ব্যাপারের সহিত দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের একান্ত ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধ করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতায় ত্রিবিধ আহারের উল্লেখ আছে—সাত্ত্বিক আহার, রাজস আহার ও তামস আহার। এইত্রিবিধ আহার ভেদ মানসিক ভাবেরও কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং

সরস, স্নিগ্ধ, সসার ও মনোরম আহারই সাত্ত্বিক আহার। অধিক কটু অম্ল লবণ উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণবীর্য্য রুক্ষবীর্য্য ও উগ্রবীর্য্য আহার রাজস আহার। শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত অসার দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য

আহারই তামস আহার। সাত্ত্বিক আহারে পরমায়ুঃ, বল, উৎসাহ, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধন করে। রাজস আহার দুঃখ, শোক ও রোগাদির হেতু সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরই প্রিয়। রাজস আহারে রাজস প্রকৃতি ব্যক্তিরই অভিরুচি এবং তামস স্বভাব ব্যক্তিরই তামস আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

ভোজনের দোষ বা অন্নদোষ তিন প্রকারের হইতে পারে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহা (১) কুপথ্য সেবন হইলে পীড়াজনক হইয়া হয়, (২) শাস্ত্র-নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণে পাপ জনক হইয়া হয়, (৩) নিষিদ্ধ এবং পীড়াজনক উভয় দোষ বিশিষ্ট দ্রব্যের ভক্ষণ হইতেও হয়। এই তিন প্রকার দোষের নিবারণ করিয়া মনুষ্য ভোজন কার্য্যে আপনার হিতসাধন চেষ্টা করিবেন ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ নিত্যমাত্মহিতেষু চ॥

যেমন স্বাধ্যায়ে (বেদপাঠে) নিত্যই উদ্‌যুক্ত থাকিতে হয়, তেমনি [ভোজন ব্যাপার] আপনার হিতসাধনে নিত্য উদ্‌যুক্ত থাকিতে হয়।

এই জন্য পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া ভোজন করিবার বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ বিধিগুলি প্রণয়নে ধাতুভেদ ঋতুভেদ এবং শরীরের অবস্থাভেদে যে পথ্যাপথ্যের ভেদ হয় তাহা অতি সুপ্রণালীপূর্ব্বক বিচারিত হইয়াছে। ধাতুর বিচারে বলা হইয়াছে মনুষ্যের ধাতু অবিমিশ্র হয় না। সকল শরীরেই বায়ু পিত্ত কফ এই দোষত্রয়ের মিশ্রণ আছে, তন্মধ্যে যাহার শরীরে যেটীর বাহুল্য তাহাকে সেই ধাতুর লোক বলা যায়। কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ঐ ধাতু লক্ষণ সকল বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত এই বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। নব্যদল বায়ু, পিত্ত, কফের নাম শুনিলেই হাসিয়া উড়াইয়া দেন। বস্তুতঃ ঐ শব্দগুলির দ্বারা শরীরের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বুঝায় মাত্র। ঐগুলি পারিভাষিক শব্দ। উহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের কোন হেতুই নাই। মোটামুটি বলিতে গেলে ইংরাজিতে যাহা nervous

সংস্কৃতে তাহাই বায়ু, ইংরাজীতে যাহা Billous সংস্কৃতে তাহাই পিত্ত, আর ইংরাজীতে যাহা Lymphatic সংস্কৃতে তাহাই কফ নামে অভিহিত। বায়ু প্রকৃতি লোকের লক্ষণ এই—

কৃশো রুক্ষোঽল্পকেশশ্চ চলচিত্তোঽনবস্থিতঃ।
বহুবাক্যমতঃ স্বপ্নে বাতপ্রকৃতিকোনরঃ॥

কৃশ, রুক্ষ, স্বল্পকেশ, অস্থিরচিত্ত, নিদ্রাকালে বহু কথনশীল এমন লোকের বায়ুপ্রধান ধাতু

অকালপলিতোগৌরঃ প্রস্বেদী কোপনো বুধঃ।
স্বপ্নদীপ্তিমতপ্রেক্ষী পিত্তপ্রকৃতিরুচ্যতে॥

অকালপলিত, গৌরবর্ণ, ঘর্ম্মালু; ক্রোধী, বুদ্ধিমান, স্বপ্নে দীপ্তিদর্শন শীল এমন লোকের ধাতু পিত্ত প্রধান।

স্থিরচিত্তঃ সুবদ্ধাঙ্গঃ স্বপ্নলঃ স্নিগ্ধমূর্দ্ধজঃ।
স্বপ্নেজলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ॥

স্থিরচিত্ত, দৃঢ়কায়, নিদ্রালু, প্রশস্তকেশ, স্বপ্নে জলাশয় দর্শনশীল এমন লোকের ধাতু কফ প্রধান।

এই সকল লক্ষণের মিশ্রণে দ্বিদোষাত্মজ ত্রিদোষাত্মজ ধাতু জন্মে। আহার এবং পানীয় এরূপে ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে যে ব্যক্তির যে প্রাকৃতিক দোষ, সে দোষের বৃদ্ধি না হইয়া ধাতুর সমতা জন্মে।

পানাহারাদয়োযস্য বিরুদ্ধা প্রকৃতেরপি।
সুখিত্বায়োপ কল্পান্তে তৎসাম্যমিতিকথ্যতে।

যাহার পান এবং আহার তাহার প্রকৃতির [ধাতুগত দোষের] বিরুদ্ধ হয়, তাহারই সুখিত্ব এবং ধাতু সাম্য জন্মে।

বিভিন্ন ধাতুর লোকের ক্ষুধার প্রকৃতির ইতরবিশেষ আছে।

মন্দস্তীক্ষ্ণোতি বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎ সাম্যাৎ জঠরোনলঃ॥

জঠরানল চারি প্রকার, মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম এবং সম; কফ, পিত্ত এবং বায়ুর আধিক্যে যথাক্রমে ঐ তিন প্রকার হয়, এবং কাহার বিশেষ আধিক্য না থাকিলে সম হয়।

ধাতু বিচারের পর মনুষ্য শরীরের বিভিন্ন ধাতুর সহিত ষড়্‌ঋতুর বা বার মাসের সম্বন্ধ বিচারিত হইয়া এতদ্দেশীয়দিগের সূক্ষ্মদর্শী-প্রত্যভিজ্ঞার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নির্ণীত হইয়াছে। হেমন্ত এবং শিশিরে বায়ু কুপিত; বসন্তে শ্লেষ্মা কুপিত; গ্রীষ্মে পিত্ত কুপিত; বর্ষাতে বায়ু, পিত্ত, কফ, তিনই কুপিত; শরৎকালে পিত্ত কুপিত।

ধাতু এবং ঋতুর প্রকৃতি বুঝাইয়া লোক সকলকে আপনাপন ভক্ষ্য বিচার কার্য্যে অধিকতর সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্রে রসাদির স্থূল স্থূল গুণ এবং কোন ধাতুর সহিত কোন রসের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) মধুর—প্রীতিজনক, বলকর, বীর্য্য বৃদ্ধিকর, জীবিত্বকর, বাতঘ্ন।

(২) অম্ল—অত্যন্ত রুচিকর, রসনার উদ্বেগকর, রক্ত মাংস বৃদ্ধিকর ক্লেদন (পুয়াদি) বৃদ্ধিকর, পাচক, কফবৃদ্ধিকর।

(৩) লবণ—রেচক, পাচক, পিত্ত বৃদ্ধিকর।

(৪) তিক্ত—পিত্ত, কফ, চর্ম্মরোগ এবং জ্বর নাশক, দীপন, পাচন কণ্ডু ও ক্রিমিনাশক।

(৫) কষায়—শোষক, [রসনাশক] বায়ুবৃদ্ধিকর, শ্লেষ্মনাশক।

(৬) কটু—অগ্ন্যুদ্দীপক, শ্লেষ্মনাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর।

(ক) উষ্ণ—পিত্তকর, বীর্য্যকর, লঘু, বাতশ্লেষ্ম দোষনাশক।

(খ) শীতল—পিত্তনাশক, বলকর, কফ বাতকর, গুরু।

ধাতু এবং সময় বুঝিয়া বিভিন্ন রসের প্রয়োগ করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়।

ঋতুভেদে পথ্যাপথ্যের নির্দ্দেশ আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় বা চিকিৎসাশাস্ত্রকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া পথ্যাপথ্য বিষয়ক বিধিগুলির সৃষ্টি।

(১।২) হেমন্তে এবং শিশিরে বায়ু কুপিত হয়। [তাহার প্রশমনার্থ] মিষ্ট অম্ল এবং লবণ রস ব্যবহার্য্য। নয়দা মাংস ইক্ষুরসের এবং ক্ষীরের বিকৃতি এবং নবান্ন ও উপকারী। রৌদ্র সন্তাপ এবং অগ্নিসন্তাপ লাগাইবে, শৌচকালে উষ্ণজল ব্যবহার করিবে, পাদত্রাণ দ্বারা পাদদ্বয় আবৃত রাখিবে, এবং উষ্ণ ও কোমলস্পর্শ শয্যায় শয়ন করিবে।

(৩) বসন্তে শ্লেষ্মা কুপিত, অগ্নি মন্দ হয়। এই ঋতুতে অগ্ন্যুদ্দীপক ক্রিয়া করিবে, ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে, বিশেষ করিয়া গাত্র পরিষ্কার রাখিবে, নস্য গ্রহণ করিবে, পুরাতন যব, গোধুম, মধু এবং জাঙ্গল মাংস সুপথ্য। দিবানিদ্রা পরিহার করিবে।

(৪) গ্রীষ্মকালে পিত্ত কুপিত হয়। এ সময়ে স্বাদু, শীতল, দ্রব স্নিগ্ধ, শর্করা সংযুক্ত পানীয় এবং দুগ্ধের সহিত যুক্ত শাল্যন্ন ভোজন করিলে গ্রীষ্মদোষ লাঘব হয়। মধ্যাহ্নকালে বায়ু সঞ্চার স্থলে নিদ্রা যাইবে। লবণ অম্ল কটু এবং উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ এবং ব্যায়াম ন্যূন করিবে।

(৫) বর্ষাকালে ভূবাষ্পোদ্গম এবং মেঘ নিস্যন্দ উভয় কারণ উপস্থিত হইয়া জলের দোষ জন্মে এবং জঠরাগ্নির তেজ মন্দীভূত হয়। তাহাতে বায়ু, পিত্ত কফ দোষত্রয়েরই প্রকোপ জন্মে। এই সময়ে অগ্নিসম্বর্দ্ধক লঘুপাক দ্রব্য, যথা পুরাতন চাউল, জাঙ্গল মাংসের ক্বাথ, মুগের দাইল, এবং পরিষ্কার কূপোদক ব্যবহার করিবে, অধিক পরিশ্রম, দিবানিদ্রা এবং রৌদ্র সেবা ত্যাগ করিবে।

(৬) শরৎকালে পিত্ত কুপিত হয়। এসময়ে মিষ্ট তিক্ত কষায় রস উপকারী। ইক্ষু শাল্যন্ন মুদ্‌গ এবং সরোবর জল পথ্য। তুষার ক্ষার অতিতৃপ্তি, দধি, তৈল, বসা আতপ তীক্ষ্ণার দিবানিদ্রা এবং পশ্চিম বায়ু বর্জনীয়।

এইরূপে বিভিন্ন ঋতুতে খাদ্যের এবং ব্যবহার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়া পরে বলা হইয়াছে।

নিত্যং সর্ব্বরসাস্বাদ্যং স্বস্বাধিক্যা বৃতাবৃতৌ।

প্রতি দিবসেই সকল রসের স্বাদগ্রহণ করিবে তবে যে ঋতুতে যে রসের বিধি সেই ঋতুতে সেই রসের আধিক্য হইবে।

বস্তুতঃ

তচ্চনিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেন প্রবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ॥

নিত্য [তাদৃশ পথ্যের] প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে স্বাস্থ্যের রক্ষা হয়, এবং যে বিকৃতি জন্মে নাই তাহাও জন্মিতে না পায়।

যদি কোন ইংরাজী চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে গোলযোগেই পড়িতে হয় এবং ব্যবসায়ী ডাক্তারদিগের সহায়তা লইয়াও তেমন কিছু স্থির করিতে পারা যায় না। চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বকার ইংরাজি চিকিৎসাগ্রন্থে মনুষ্যদিগের ধাতুভেদের কোন কথাই পাওয়া যায় না, তখন ধাতুভেদ ব্যাপারটা আদবেই মানা হইত না! এখন যদিও ধাতুভেদ স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি দ্রব্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলই ইউরোপীয় চিকিৎসাগ্রন্থে লিখিত হইয়া থাকে। সে সকল ফলের উপলব্ধি দ্বারা পথ্যাপথ্য বিচারের বিশেষ কোন সাহায্যই হয় না। ডাক্তারেরাও এইমাত্র বুঝেন যে, যে দ্রব্যে যবক্ষারজান যত অধিক সে দ্রব্য তত বলবর্দ্ধক, আর যাহাতে স্নেহভাগ যত বেশী সে দ্রব্য তত দুষ্পচ। কিন্তু যবক্ষারজানবহুল এবং স্নেহবহুল অনেকানেক দ্রব্যই আছে, তাহাদের কোনটী মনুষ্য-শরীরে সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং কেমন সময়ে আর কেমন অবস্থায় শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী বা অনুপকারী হয়, ডাক্তারি বইগুলি এমত সকল কথার কোন ধার ধারে না! শীতপ্রধান দেশবাসী প্রভূত দৈহিক বলে বলীয়ান, প্রদীপ্ত জঠরাগ্নি বিশিষ্ট স্থূলেন্দ্রিয় সম্পন্ন, সূক্ষ্মদর্শনে হীনশক্তি এমন লোক সকলের মধ্যে প্রণীত চিকিৎসাশাস্ত্র এবং তৎশাস্ত্র শিক্ষিত তজ্জাতীয় ভিষকেরা কখনই ধাতু, ঋতু, শরীরের ভাব এবং অবস্থা ও দ্রব্যের স্বভাব বুঝিয়া পথ্যাপথ্য

পথ্য বিচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন———

নহ্যনববুদ্ধ [দ্রব্য] স্বভাবাঃ ভিষজঃ স্বস্থানুবৃত্তিং রোগ নিগ্রহঞ্চ কর্ত্তুং সমর্থাঃ।

কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্রব্যগুণ যেরূপে লিখিত হইয়াছে তাহা যেমন প্রকৃত অভিজ্ঞতামূলক, শুদ্ধ রাসায়নিক বিশ্লেষণমূলক নয়, তেমনি প্রয়োগে সুকর এবং ফলে সাতিশয় কার্য্যকারী।

শাস্ত্রে ভারতবাসীর প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধাতুর এবং ঋতুর এবং অবস্থার বিচারপূর্ব্বক ঐ সকল খাদ্য সামগ্রীর ব্যবহার করিতে পারিলে, অতি সুন্দর রূপেই স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) ধান্যাদি।

(১ হৈমন্তিক ধান্য—ঈষদ্বায়ু এবং কফ বর্দ্ধক, স্থায়ী, স্বল্পশুক্র বর্দ্ধক মধুর রস।

(ক) নূতন ঐ—কফকর, স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু।

(খ) পুরাতন ঐ—রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক।

(২) বোরো ধান্য—মধুর এবং অম্লরস, পিত্তবর্দ্ধক, গুরুপাক।

(৩) গ্রীষ্ম এবং শরদুৎপন্ন ধান্য—রুক্ষ, পিত্তকর, গুরু।

(৪) শ্যামা—শোষক, রুক্ষ, বাতল, শ্লেষ্মা এবং পিত্তনাশক।

(৫) যব—কষায়, মধুর, স্নিগ্ধ, (পাকে) কটু, কফঘ্ন, পিত্তঘ্ন।

(৬) গোধুম—মধুর, গুরু, বল্য, স্থির, শুক্রপ্রদ, বাত এবং পিত্তনাশক, শ্লেষ্মকর, মল শোধক।

(ক) খই—ছর্দ্দি (বমনরোগ) তৃষ্ণা, অতিসার, মেহ, মেদ, কফ, কাশ, পিত্ত এই সকল দোষের উপশম করে; আগ্নেয়, লঘুপাক। [পথ্যবিচারে খৈ পরিত্যক্ত হইয়া যে সাগু, বার্লি, আরারুট, টেপিওকা

প্রভৃতির সমাদর হইয়াছে তাহা একটী বিড়ম্বনার লক্ষণ। মুড়ি, চিড়ে, শিঙ্গাড়া, যব, গোধুম, পুরাতন চাউল প্রভৃতি অতি সুলভ দেশীয় দ্রব্যজাত হইতে কি রোগীর পথ্য, কি সুস্থ প্রৌঢ় এবং বালক বালিকার জল খাবার দ্রব্য, সকলই সচ্ছন্দে প্রস্তুত হয়। তথাপি বিলাতের বাসী এবং রসায়নোত্থ দ্রব্য মিশ্রিত বিষকুট, লজেঞ্জস প্রভৃতি অসংখ্য কৃত্রিম এবং দুষ্ট খাদ্যের প্রতি দেশীয়দিগের সাংঘাতিক লোভ এবং ভক্তি প্রতীয়মান হইতেছে।]

(৭) শিম্বি—(নানা বর্ণের) কৃষ্ণ। (শুভ্রবর্ণের) উৎকৃষ্ট।

(৮) দাইল—[সাধারণতঃ] (পাকে) মধুর, বল্য, পিত্তনাশক।

(ক) মুগ—(হরিত, পীত,) কষায়, মধুর, শীতল, পিত্ত শ্লেষ্ম-নাশক, অনধিক বায়ুকর, চাক্ষুষ্য।

(খ) মশূর (রক্ত)—সংগ্রাহী, বলবর্দ্ধক। মশূর (পীত)—কৃমিকর।

(গ) মাষ—প্রচুর বায়ুজনক, স্নিগ্ধ, মেহ, মাংস কফপ্রদ।

(ঘ) অড়হর—কফ পিত্তনাশক।

(ঙ) ছোলা—শীত, মধুর, বাতল, কফ, রক্ত পিত্তনাশক, পুংস্বনাশক।

(৯) সর্ষপ—কটু, বাতনাশক, উষ্ণ।

(১০) তিল (কৃষ্ণতিলই উৎকৃষ্ট)—গুরুপাক, মেধা-বৃদ্ধিকর, কৃচ্য, গ্রাহী, কেশ্য।

স্নিগ্ধ বল্যোঽল্প মূত্রোষ্ণো ব্রণলেপহিতশ্চ সঃ।
সমাধুর্য্যা ত্তথোষ্ণাচ্চ স্নেহাচ্চানিল নাশনঃ।
কষায়ভাবান্মাধুর্য্যাত্তিক্ত ত্বাচ্চাপি পিত্তহা।
ঔষ্ণ্যাৎকষায় ভাবাচ্চতিক্তত্বচ্চ কফেহিতঃ।

তিল—স্নিগ্ধ, বল্য, মূত্রলাঘবকারী, উষ্ণ, ব্রণলেপে উপকারী, মধুর, উষ্ণ এবং স্নেহগুণে বায়ুনাশক, কষায় এবং তিক্ত বলিয়া পিত্তনাশক এবং উষ্ণ, কষায় এবং তিক্ত বলিয়া কফ দোষ নিবারক।

(২) শাকাদি।

(১) পটোল—ফল ত্রিদোষনাশক; উহার পাতা পিত্তনাশক, ডাঁটা কফনাশক, এবং মূল বিরেচক।

(২) বাস্তূক—(বেতো শাক) পাকে লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক, [যবক্ষার যোগে] কৃমিনাশক, শুক্রল।

(৩) ব্রাহ্মী—মেধা আয়ু স্মৃতি-বর্দ্ধিনী, জরাদোষ নিবারিণী, কফপিত্ত নাশিনী এবং স্বরশক্তির বৃদ্ধিকরী।

(৪) নিম্ব—পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, ব্রণ, কুষ্ঠ এই সমস্ত দোষ এবং হৃল্লাস নিবারক;

(৫) মূলা—গুরু, কোষ্ঠ বদ্ধকর, ত্রিদোষকারী, [কিন্তু সিদ্ধ হইলে] পিত্তকারী, কফ এবং বায়ুনাশক।

(৬) পালঙ্কশাক—কফ এবং পিত্তনাশক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক।

(৭) নটিয়া শাক—মধুর, শীতল, অজীর্ণকারী, পিত্তনাশক, গুরু।

(৮) শুশ্নি শাক—ধারক, ত্রিদোষ নাশক, গাত্রজ্বালা নিবারক।

(৭) শাক সম্বন্ধে সাধারণতঃ উক্ত হইয়াছে——

শাকেষু সর্ব্বে নিবসন্তি রোগা রোগোহি দেহস্য বিনাশহেতুঃ।
তস্মাদ্বুধৈঃ শাক বিবর্জ্জনঞ্চ কার্য্যং তথান্নেষু ত এবদোষাঃ।

স্নিগ্ধং নিষ্পীড়িতরসং স্নেহাক্তঞ্চ প্রশস্যতে।
সর্ব্বশাক মচক্ষুষ্য মজাজ্যেয় মমৈথুনং।
ঋতে পটোলবাস্তূক কাকমাচী পুনর্নবাঃ॥

শাকে সকল রোগ নিবাস করে, রোগ হইতেই দেহের বিনাশ হয়; এই জন্য বুদ্ধিমানেরা শাক বর্জ্জন করিবেন এবং অন্নেরও ঐ প্রকার দোষ বলিয়া অন্নও বর্জ্জন করিবেন। কিন্তু শাকের জল গালিয়া স্নেহের সহিত সুপক্ক হইলে শাকের দোষ যায়। পটোল, বাস্তুক, কাকমাচী এবং পুনর্নবা ছাড়া সকল শাকই চক্ষুর এবং শুক্রের বলনাশক।

(৩) তরকারির ফলাদি।

(১) [দেশী] (বাল) কুষ্মাণ্ড—পিত্তহর, (মধ্যম) কুষ্মাণ্ড—কফ নাশক, (পক্ক) কুষ্মাণ্ড—লঘু, উষ্ণ, দীপন, বস্তি শোধক, সর্ব্বদোষহর হৃদ্য, পথ্য। কুষ্মাণ্ড নালিকা (ডাঁটা)—গুরু, বাত এবং কফ-নাশিনী।

(২) অলাবু—শীতল, গুরু, মধুর, পিত্তনাশক. বাতশ্লেষ্মকর, কফ-নাশক।

(৩) কারবেল্ল (করোলা, উচ্ছে)—কফ এবং পিত্তনাশক।

(৪) ঝিঙ্গা—কফ-পিত্তঘ্ন, গুরু, মলবর্দ্ধক, বাতবর্দ্ধক।

(৫) ওল—দীপন, কফঘ্ন, কোষ্ঠ শুদ্ধিকর, লঘু, অর্শরোগে উপকারী

(৬) মানকচু—স্বাদু, শীতল, গুরু, শোথহর, কটু।

(৭) কচ্চী (কচু)—আম-বাত-জনক, গুরু, পিত্তল।

(৮) কদলীমূল—এঁটে এবং থোড়—বলকারী, গুরু, বাত-পিত্ত হর।

(৯) মোচা—কফনাশক, কৃমিনাশক, কুষ্ঠ-প্লীহাজ্বর হর, দীপক, মলশোধক।

(১০) বার্ত্তাকু—তরকারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বার্ত্তাকুরেষা গুণ সপ্তযুক্তা।
বহ্নিপ্রদা মারুত নাশিনী চ।
শুক্রপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চ।
হৃল্লাস কাশারুচি নাশিনী চ।
সাবালা কফ পিত্তঘ্না।
পক্কারুক্ষাচ পিত্তলা।
সদাফলা ত্রিদোষঘ্না।
রক্ত পিত্ত প্রণাশিনী।

(৪) লবণাদি।

১) সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক, ধাতু পোষক, চাক্ষুষ্য, দীপক, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘু, রেচক।

(২)—হরিদ্রা কফ, বাত শোথ গাত্র কণ্ডু ব্রণ নষ্ট করে রক্ত পরিষ্কার করে।

(৩)—হিঙ্গু, তীক্ষ্ণ, অজীর্ণ নাশক পাচক, কফ ও বায়ু নাশক, কটু শূলনাশক উষ্ণ লঘু!

(৪) এলাইচ (বড়)—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কফ, বায়ু ও শুক্ররোধ নাশক।

(ছোট)—মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শ, শ্বাস, কাশ, কফে উপকারী।

(৫) আদা— কফ, বাত, আম, মলবদ্ধ, শূলনাশক, আগ্নেয়; ধাতু পোষক।

(৬) লবঙ্গ—আধ্মান ও শূল নাশক, দীপক, লঘু, উষ্ণ।

(৭) মরিচ (শুষ্ক)—আগ্নেয়, রুক্ষ, লঘু, শুক্রক্ষয়কর।

(৮) ধন্যা (শুষ্ক)—কফ; বায়ু, দাহ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা নাশক।

(৯) কুমুদ, উৎপল এবং পদ্মের নাল বায়ুনাশক, কষায়, পিত্তঘ্ন, (পাকে) মধুর।

(১০) তৈল—কষায়, অম্ল, বল্য, রুক্ষ, দীপক, উষ্ণ, পিত্তল।

(ক) মাংস (সাধারণতঃ)—বাতহর, বল্য, বৃষ্য, প্রীণন, (মাংস-বর্দ্ধক) গুরু।

(খ) মৎস্য (সাধারণতঃ)—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, মধুর, কফপিত্ত বর্দ্ধক। ক্ষুদ্র মৎস্য—লঘু, গ্রাহী, গ্রহিণী রোগে উপকারী।

(৫) সাধারণ ফলাদি।

(১) দাড়িম্ব—হৃদ্য, অম্ল, উষ্ণ, বাতঘ্ন গ্রাহী, দীপন, বৃষ্য, কষায়, মধুর, কফ-পিত্ত বিরোধী।

(২) আম্র (কচি) রক্তপিত্তকর, (মাজারি) পিত্তল, (পক্ক) বর্ণকর, রুচা, মাংস শুক্র এবং বলবর্দ্ধক, বাতনাশক, হৃদ্য, গুরু, অগ্নিদীপক। (পেষী—আমসী) কষায়, উষ্ণ, ভেদিনী, কফ বাত নাশক।

(৩) কণ্টাফল (কাঁঠাল) মধুর, কষায়, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, শ্লেষ্ম, এবং শুক্রবর্দ্ধক।

(৪) কদলী—মধুর, হৃদ্য, কষায়, অম্ল, শীতল, রক্তপিত্ত নাশক, রুচ্য, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরু।

(৫) নারাঙ্গা লেবু—হৃদ্য, অম্ল; অগ্ন্যুদ্দীপক, কাশ শ্বাস এবং অরুচি নাশক, তৃষ্ণানিবারক, কোষ্ঠশোধক।

(৬) লেবু—(পাতি, কাগজি)—মধুর, অম্ল, পিত্তকর, গুরু, সুগন্ধি দুর্জ্জর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ, বায়ু, তৃষ্ণা, শূল, ছর্দ্দি, এবং শ্বাস নিবারক।

(৭) তেঁতুল—(কাঁচা) বাতঘ্ন, কফপিত্তকারী, (পাকা) অগ্ন্যুদ্দীপক, রুক্ষ, স্বল্প উষ্ণ, কফ বাত নাশক।

(৮) আমড়া—মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মাল, শীত, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী (মলবদ্ধকর)।

(৯) বিল্ব—(কচি) কষায়, উষ্ণ, পাচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, তিক্ত, কটু, বাত এবং কফ নাশক, মল সংগ্রাহী; (পাকা) সুগন্ধি, মধুর, দুষ্পচ; গ্রাহী; (পেষী—বেলশুণ্ঠী) কফ, বাত, আম এবং শূলনাশিনী।

(১০) নারিকেল—গুরু, পিত্তঘ্ন, স্বাদু, শীতল, বল এবং মাসপ্রদ, (কোমল) পিত্তজ্বর এবং পিত্তনাশক। তৃষ্ণা এবং দাহ নাশক।

(১১) পিয়ারা—অম্ল, মধুর, সারক।

(১২) পানিফল—শীতল, ধারক, গুরু, পিত্তকর।

(১৩) কেশুর—শুক্রল, বাতপিত্তহর, শীতল।

(১৪) ইক্ষু—রক্তপিত্ত নাশক, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, কফবর্দ্ধক। (পাকে) মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রল।

(১৫) গুড় (পুরাতন) বাতঘ্ন, রক্ত পরিষ্কারক, পিত্তঘ্ন, মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্যতম, চাক্ষুষ্য, বাতপিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ।

(১৬) শর্করা—পিত্তনাশক, ছর্দিনাশক, শীতল, ব্রণ শোধনকর।

(১৭) হরীতকী—ঋতুভেদে সৈন্ধবলবণ, চিনি, শুঁঠ, পিপুল, মধু,

গুড়, প্রভৃতির সহিত বর্ষা হইতে পর পর ঋতুতে ব্যবহার করিলে সকল দোষ নাশক।

সিদ্ধঃ পথ শর্করা শুণ্ঠী কণামধু গুড়ৈঃক্রমাৎ,
বর্ষাদিষ্বভয়াসেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

(১৮) আমলকী—

হরীতকী সমংধাত্রী ফলং কিন্তু বিশেষতঃ।
রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নং।
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ
কফং রুক্ষ কষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ॥

ধাত্রীফলের (আমলকীর) গুণ হরীতকীর সমান, বিশেষ এই যে ধাত্রী রক্তপিত্ত এবং প্রমেহনাশিনী, বীর্য্য আয়ুর্বৃদ্ধিকরী অম্লত্ব হেতু বাতঘ্নী; মাধুর্য্য এবং শৈত্য হেতু পিত্তঘ্নী এবং অক্ষত্ব ও কষায়ত্ব হেতু কফঘ্নী অর্থাৎ ধাত্রীত্রিদোষনাশিনী।

(৬) জলাদি।

জলের সাতটী গুণ থাকা আবশ্যক। উহা স্বচ্ছ, লঘু, শীতল, সুগন্ধি (দুর্গন্ধহীন ভাল মাটির জল) সংসৃষ্ট রস (স্বয়ং স্বাদবিহীন) ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারক হইবে। [যে জলে বিশিষ্টরূপে সূর্য্য কিরণ সংলগ্ন না হয় অথবা যাহা বায়ু বিশোধিত হয় না তাদৃশ ("শশি-সূর্য্যকিরণানিলৈরজুষ্ট") জল সুপরিষ্কৃত হইলেও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে। এই জন্য পাইপের জলও সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।]

উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত পবিত্র জলই যথার্থতঃ শরীরের উপকারী। [সোডা ওয়াটর লেমনেড জিঞ্জরেড প্রভৃতি ক্ষারাদিযুক্ত পানীয় অনুপকারী বই উপকারী নহে।]

সিদ্ধ জল—কাশ, শ্বাস, জ্বর, কফ, বাত, আম, অজীর্ণ, এই সকল

দোষের নিবারক। ইহা অল্প পরিমাণে বস্তি শোধক এবং পিত্তজনক। অরুচি, প্রমেহ, শ্বয়থু (শোথ) ক্ষয়, মন্দাগ্নি, নেত্ররোগ, ব্রণ, মধুমেহ, এই সকল দোষ থাকিলে জল পান অল্প করিতে হয়।

ডাব—নারিকেলের জল বৃষ্য, স্বাদু, গুরু, পিত্তনাশক; বিশেষতঃ রক্তবর্ণ নারিকেলের জল পিত্তদোষজনিত রোগ মাত্রের শান্তিকারক। ঝুনার জল কোষ্ঠ বদ্ধ করে এবং ভার।

(৭) দুগ্ধাদি

(১) গোদুগ্ধ—জীবন, বল্য, রক্তপিত্ত নাশক, বায়ু নাশক, আয়ুর্বর্দ্ধক পুষ্টিকর, রসায়ন।

[ইউরোপীয়েরা জাহাজে করিয়া সমুদ্রে গতিবিধি করেন। এই জন্য পর্য্যুষিত দ্রব্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত। উঁহারা জাহাজে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়েন না, সেই জন্যই সুইস-মিল্ক ও মিল্ক পাউডার প্রভৃতি কৃত্রিম পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এদেশের অনুকরণপ্রিয় ইংরাজী শিক্ষিতেরা ঘরে থাকিয়াও ছেলেদের সুইস-মিল্ক খাওয়াইতে ব্যস্ত!]

(২) মহিষ-দুগ্ধ—মধুর, অতি শীতল, গুরু, নিদ্রাকারক, অগ্নিমান্দ্যকর, (শৃতোষ্ণ) কফ বাতঘ্ন, (শৃতশীত) পিত্তনাশক।

(৩) ছাগদুগ্ধ—মধুর, শীতল, গ্রাহী, দীপন, বাতপিত্ত এবং ক্ষয়কাশ নাশক।

(৪) সলবণ দুগ্ধ, ছেঁড়া দুগ্ধ, বি-বৎসার দুগ্ধ, এবং বাল বৎসার দুগ্ধ বর্জ্জনীয়। বাল বৎসার অর্থাৎ প্রসবের দশ দিনের ভিতর, দুগ্ধ গ্রহণ করিতে নাই।

(৮) দধ্যাদি।

(১) গব্যদধি—বাতঘ্ন, স্নিগ্ধ, (পাকে) দীপক, বলবর্দ্ধক।

(২) মাহিষদধি—অতি স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত প্রসাদক (পাকে) মধুর

বৃষ্য, গুরু, কফ বৃদ্ধিকর। দধি অত্যন্ত অম্ল হইলে রক্তের দোষ জন্মায় এবং কফ ও পিত্ত দোষ জন্মায়।

(৩) ঘোল (নির্জ্জল) পিত্তঘ্ন, বাতঘ্ন, কফবর্দ্ধক।

(৪) তক্র—(সিকি জল) লঘু, কষায়, অম্ল, দীপন। সৈন্ধব সহ বাতঘ্ন, শর্করা সহিত পিত্তঘ্ন এবং ত্রিকটুর ও ক্ষারের সহিত কফঘ্ন।

(৫) গব্যঘৃত—চাক্ষুষ্য, বলবর্দ্ধক, (পাকে) মধুর, শীতল বাতপিত্ত নাশক। "আয়ুর্বৈ ঘৃতং"।

(৬) মাহিষঘৃত—স্বাদু, মধুর, শীতল, গুরু, বাতপিত্ত ও রক্তপিত্ত, নাশক, কফ-বর্দ্ধক।

বিরুদ্ধ ভোজ্য।

(১) গ্রাম্যপশুর মাংস, অনূপজ অধিক জলযুক্ত দেশজাত মাংস, সর্ব্বপ্রকার মৎস্য, মাষকলাই, গুড়, মুলা ও সজিনার শাক, এবং দুগ্ধ পরস্পর সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইবে।

(২) ঘৃত, মধু এবং মাংসের সহিত মূলার পাক বর্জ্জিত হইবে।

(৩) ইক্ষু বিকারের সহিত এবং মধুর সহিত মৎস্যের পাক বর্জ্জিত হইবে।

(৪) জুড়ান ভাত পুনরুষ্ণীকৃত হইলে পরিত্যজ্য হইবে।

(৫) দধির, তক্রের, দুগ্ধের বা তাল ফলের সহিত একত্রে মিশাইয়া কদলী ফল খাইবে না।

(৬) পাকা মাদার ফল কখন দুগ্ধের সংস্রবে খাইবে না।

(৭) আমড়া, গোঁড়ালেবু, মাদার ফল, করমচা, মোচা, কামরাঙ্গা, কুল, চালিতা, জাম, কতবেল, তেঁতুল, আকরোট, কাঁটাল, নারিকেল, দাড়িম, আমলকী এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব ও অদ্রব অম্ল দুগ্ধের সহিত বিরুদ্ধ।

(৮) মধু উষ্ণ করিয়া খাইতে নাই।

(৯) কাংস্যপাত্রে দশ দিন ঘৃত থাকিলে তাহা খাইবে না।

ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত গুণদোষাদি বিবৃত করিয়া এবং তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, অপথ্য ভোজন এবং বিরুদ্ধ ভোজন জনিত দোষ, বিরেচন, বমন, শয়ন এবং [পরবর্ত্তী] হিতভোজনের গুণে * শমতা প্রাপ্ত হইতে পারে ; বিশেষতঃ তরুণ বয়স্ক অথবা ব্যায়ামশীল † কিম্বা

---

* কয়েকটি অনুকূল ভক্ষ্যের উদাহরণ।

নারিকেল ও তালশাঁসের—(অনুকূল) তণ্ডুলোৎপন্ন। আম্রের—দুগ্ধ। ঘৃতের—লেবুর রস, জামের রস, অম্লরস ফল। মোচার—ঘৃত। গোধূমের—কাঁকড়ি। নারঙ্গার—গুড়। মৎস্যের—আম্র (কাঁচা)। মধুর—তৈল। কাঁঠালের—কদলী। চাউলের—দুগ্ধ (পাতলা)। তালের বকুল। ভাজাপিঠার—সিদ্ধ পিঠা, ভাত। পায়সের—মুদ্গশূপ। করলা মূলা, লাউ, পুই, পালঙ্গ, পটোল, নটিয়ার—শ্বেত সর্ষপ। মটর, কেশুর, খেজুরিয়া গুড়ের—আদা। ওলের—গুড়। জামের—লবণ। খিচড়ীর—সৈন্ধব। দধির—লবণ ও জল।

† ব্যায়াম সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। কুস্তি করা, মুগুর ভাঁজা, পদব্রজে ভ্রমণ, সন্তরণ প্রভৃতিই এ দেশের উপযোগী ব্যায়াম। বয়স ও শরীরের অবস্থাভেদে ব্যায়ামের বিভিন্নতা করিতে হয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামে রোগোৎপত্তি হয়। তদ্ভিন্ন একাদশীর উপবাস করিলে দশমী হইতে তিন দিন ব্যায়াম করিতে নাই।

ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং
স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যতমঃ স্মৃতঃ
সর্ব্বেষ্বৃতুষু সর্ব্বৈর্হি শূরৈরাত্মহিতার্থিভিঃ।
শক্ত্যর্দ্ধেনতু কর্ত্তব্যো ব্যায়ামো হন্ত্যতো ব্যথাঃ॥
কুক্ষি ললাট গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে
শক্ত্যর্দ্ধং তদ্বিজানীয়াদায়তোচ্ছ্বাস মে ব চ

বলবান এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের শরীরে ঐ দোষ বহু স্থলে যেন অকিঞ্চিৎকর হইয়াই যায়। কিন্তু সে সকল দ্রব্যের ভোজন স্মৃতি শাস্ত্রের নিষিদ্ধ, সেই নিষিদ্ধ ভোজনের দ্বারা যে পাপ জন্মে, তাহা ঐ রূপে বিতথ-প্রায় হয় না।

শাস্ত্রের এই কথাটী একটু যত্ন করিয়া বুঝিতে হয়। বালক এবং নির্ব্বোধ লোকে মনে করে, খাবার সামগ্রী খাইলাম, তাহাতে যদি কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে আবার কি দোষ হইবে? বিশেষতঃ সর্ব্বভুক ইউরোপীয়দিগের মধ্যে একটী কিম্বদন্তী এই যে, 'যাহা মুখের ভিতরে যায় তাহাতে পাপ হয় না, যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়া আইসে (অর্থাৎ বাক্যাদি) তাহাতেই পাপ হইতে পারে'। এটা প্রকৃত কথা নয়, বালকের ন্যায় স্বল্পদর্শীর কথা। অন্ন দোষ হইতে রোগ ছাড়া অতি গুরুতর দোষও হইতে পারে। আহারের দোষ গুণে মনুষ্যের স্বভাবের পরিবর্ত্ত ঘটিয়া থাকে। প্রত্যুত শরীর যন্ত্রে পাক-ক্রিয়ার দ্বারা মথিত হইয়াই যখন অন্তঃকরণাদি সংঘটিত হয়, তখন আহার্য্যের গুণ দোষ যে, অন্তঃকরণ বৃত্তিতে সংক্রামিত হইবে, ইহা

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
ব্যায়ামং কুর্ব্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপিভোজনং।
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে॥
ন চ ব্যায়ামসদৃশমন্যৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং।
ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যং মর্দ্দয়ন্ত্যরয়োবলাৎ॥
ন চৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি॥
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী শোষী কাসীশ্বাগীক্ষতাতুরঃ।
ভুক্তবান স্ত্রীষুচ ক্ষীণো ব্যায়ামং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
বাতপিত্তাময়ী বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ সংত্যজেৎ॥

স্বতঃসিদ্ধ। আহারের দোষগুণ এক পুরুষ হইতে তৎপরবর্ত্তী পুরুষেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্র এই অদৃষ্ট দ্বার দোষের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া সত্বগুণ বিরোধী কতকগুলি দ্রব্যের ভোজন দ্বিজাতির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন।

লশুনংগৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং করকানিচ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং অমেধ্যপ্রভবানিচ॥

রসুন, গাজোর, পিয়াঁজ এবং ছত্রাক আর অমেধ্য [যথা বিষ্ঠাদি] জাত দ্রব্য সকল দ্বিজাতির অভক্ষ্য।

ইন্দ্রিয়ের অতি তৃপ্তিকর দ্রব্যাদির সম্বন্ধেও শাস্ত্রের সনির্ব্বন্ধ বিধি এই যে, তাদৃশ দ্রব্য দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া কদাপি খাইতে নাই।

বৃথা কৃষর সংযাব পায়সা পূপমেবচ।
অনুপাকৃত মাংসানি দেবান্নানিহবীংষিচ॥

[কেবল আত্মপ্রীতির উদ্দেশে প্রস্তুত] কৃষর [তিল তণ্ডুল সম্পক্ক দ্রব্য] অথবা সংযাব [ঘৃত, ক্ষীর, গুড়, গোধূমাদি চূর্ণ সম্পক্কদ্রব্য] কিম্বা পায়স অথবা পিষ্টক খাইবে না, আর অসংস্কৃত (দেবতাকে অনিবেদিত) মাংস, দেবান্ন, (দেবতার নৈবেদ্য) এবং হবিও [খাইবে না]।

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি অধিক রুচিকর এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর। দেবতা এবং অতিথির জন্য প্রস্তুত করা হইলে, উহারা লালসার উদ্রেক করিয়া প্রকৃতির ক্ষুদ্রতা সাধন করিতে পারে না। এই জন্য দেবতা এবং অতিথির উদ্দেশে প্রস্তুত করিবার বিশেষ বিধি।

আরও কয়েকটী দ্রব্যের নিষেধ আছে। প্রসবের পর দশ দিনের মধ্যে গোরুর, উষ্ট্রের, গর্দ্দভাদি এক-সফের, মেষীর, মহিষীর, ছাগীর এবং সন্ধিনী (বৃষের জন্য ইচ্ছাবতী) গোরুর এবং মৃতবৎসা অথবা দূরস্থবৎসা গোরুর দুগ্ধ খাইতে নাই।

এই সকল নিষেধের মূলে পথ্যের বিচার আছে, আর আহারে সাত্বিকতা রক্ষার উপায়ও আছে। কারণ, তাদৃশাবস্থায় গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ

পান করা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পীড়া জনক, ও চিত্তের অপকর্ষ জনক, এবং সে দুগ্ধ গ্রহণ করা পরম্পরাসম্বন্ধে স্বল্পবয়া বৎসাদির প্রতি নৃশংসতা ব্যঞ্জক।

কালবশে বিকৃতি প্রাপ্ত যাবতীয় বস্তুর ভক্ষণ নিষিদ্ধ। বিকৃত প্রাপ্ত দ্রব্য ভাক্ষত হইলে সত্ত্বগুণের বাধক এবং তমোগুণের বর্দ্ধক হয়। এই জন্য দধি এবং দধি-সম্ভব দ্রব্যাদি ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার শুক্তই অভক্ষ্য। যে মধুররস দ্রব্য কালবশে অম্লরস হয়, তাহাকে শুক্ত বলে; যথা সির্কা, বিনিগার, কাঞ্জিকা প্রভৃতি। পুষ্প, মূল, কন্দ, ফল প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত শুক্ত, যদি মত্ততাজনক না হয়, তবেই ভক্ষণীয়।

দিবসের মধ্যে দুইবার ভোজন করিবে না। যদি একাধিক বার খাইতে হয়, তবে ফল মূলাদি খাইবে।

"দিবা পুনর্ভুঞ্জীত চান্যত্র ফলমূলয়োঃ।"

আরও কয়েক প্রকার দূষিতান্ন আছে, যথা মত্ত, ক্রুদ্ধ প্রভৃতির অন্ন, আতুর ব্যক্তির অন্ন, বিদ্বানের জুগুপ্সিত অন্ন, ক্রুরের অন্ন, শত্রুর অন্ন, পিশুনান্ন, মিথ্যাবাদীর অন্ন, ঘুষ্টান্ন, (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া দেওয়া অন্ন), গণান্ন (বারএয়ারির অন্ন), অবজ্ঞাদত্ত অন্ন, বাক্‌দুষ্ট এবং ভাবদুষ্ট অন্ন, ভ্রূণঘ্নী স্ত্রীকর্ত্তৃক দৃষ্টান্ন, চোরের অন্ন, গায়কের অন্ন, ছুতরের অন্ন, ব্যাধের অন্ন, স্ত্রীজিতের অন্ন, পায়ে মাড়ান অন্ন, রজস্বলা কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন, গণিকার অন্ন, ভুক্তোচ্ছিষ্টান্ন, উচ্ছিষ্টভোজীর অন্ন, সূতিকান্ন, জননাশৌচান্ন, পতিতের অন্ন, অবক্ষুতান্ন (যাহার উপর হাঁচিয়াছে), মরণাশৌচান্ন, ব্যভিচারিণীর অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন, কেশ কীট সংস্পৃষ্ট অন্ন।

উল্লিখিত সমুদায় নিষেধের মূলে এই কয়েকটী কথা আছে বোধ হয়—উদ্বেগজনক অথবা সন্দেহ জনক, অথবা বিরাগ জনক অথবা ঘৃণা-জনক, অথবা অশুচিতা জনক অথবা দাতার ক্লেশজনক কিম্বা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অপকারী এমন ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ওরূপ ভোজনে চিত্তের মালিন্য জন্মে।

মাস, তিথি, বারাদিতে যে কতকগুলি ভোজন নিষিদ্ধ তৎসমুদায়ের কোন যুক্তি প্রাকৃত বুদ্ধিতে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। তবে শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি অমান্য করা ভাল নয়। ঐরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

শয়নে অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত শ্বেতশিম্বী, পটোল, বরবটী, কদম্ব, কলমী শাক, বেগুণ, কতবেল খাইবে না। কার্ত্তিক মাসে মৎস্য মাংস ভক্ষণ উচিত নয়। কার্ত্তিকের শুক্ল পক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত "বকপঞ্চক"। ঐ কয়েকদিন মৎস্য মাংস আহার একান্ত নিষিদ্ধ। ভাদ্র মাসে অলাবু এবং মাঘ মাসে মূলা খাইতে নাই। সংক্রান্তির দিনে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী (ব্যাকুড়) তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুম্বী (লাউ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বি, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই এবং মাংস, পঞ্চদশীতে (অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়) মাংস। উল্লিখিত তিথিতে উল্লিখিত দ্রব্যগুলির ভোজন নিষিদ্ধ।

রবিবারে মাষকলাই, আমিষ মাংস, মসুর, নিম আদা এবং রাঙ্গা শাক খাইবে না। মঙ্গলবারেও মাংস খাইতে নাই।

তাল, শ্বেতবর্ণের হইলে, অলাবু বর্ত্তুলাকার গোল হইলে, বার্ত্তাকী কুন্দ পুষ্পবৎ শ্বেত হইলে, আর শ্বেত কুসুম্ভ শাক, শ্বেত কলম্বী খাইবে না। স্ত্রীলোক কখনই মাংস খাইবে না।

ভোজনের নিষেধক এই সমস্ত বিধি সত্ত্বেও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
জঙ্গমং স্থাবরং চৈব সর্ব্বং প্রাণস্যভোজনং॥

সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি সমুদয়কেই প্রাণের অন্নরূপে সৃষ্ট করিয়াছেন, কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলই জীবের ভক্ষ্য।

অর্থাৎ আহারের তাদৃশ অভাব হইলে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতে হয় না। প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সকল দ্রব্যই খাইতে পারে।

ভোজন করিবার সময়ে আপনার অভীষ্ট-দেবতাকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিতে হয়। আপনি যাহা খাইবে আপনার দেবতাকে তাহাই নিবেদন করিতে পারে।

যদন্নঃ পুরুষো রাজন তদন্না স্তস্য দেবতাঃ।

অন্নের পরিবেশন সম্বন্ধে একটী বিধি এই—

লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈব চ।
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ॥

লবণ, বা ব্যঞ্জন, ঘৃত, তৈল, লেহ্য, পেয় কিছুই হাতে করিয়া পরিবেশন করিলে খাইবে না।

এস্থলে ব্যঞ্জনাদির পরিবেশন পরিশুদ্ধরূপে না হইলে যে বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণার উদ্রেক হইয়া চিত্তের অপ্রশস্ততা জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হইয়াছে।

যো ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যশ্চভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্‌মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরং॥

মাথায় কাপড় বান্ধিয়া, অথবা বিদিঙ্‌মুখ হইয়া কিম্বা পায়ে জুতা রাখিয়া যে ভোজন করে, সে আসুর ব্যবহার করে। সাত্ত্বিকতার বিরোধী ঐ সকল ব্যবহার রজোগুণের সম্বর্দ্ধক, এই জন্য নিবারিত।

অনারোগ্যমনায়ুষ্য মস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।

অতিভোজন দোষে শরীর নীরোগ হয় না, আয়ুর খর্ব্বতা হয়, স্বর্গপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হয়, উহা অপবিত্র, লোকের বিদ্বেষজনক, অতএব অতিভোজন ত্যাগ করিবে।

অতিভোজনটা অতি নীচ, এবং অপবিত্র ব্যবহার। উহা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়ীভূত। এই জন্য দৃঢ়রূপে নিবারিত হইল।

ভোজন শেষ হইলে আর আচমনের বিলম্ব করিবে না। উত্তমরূপে আচমন করিবে।

ভুক্ত্বাচামেদ্ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েন্মুখ হস্তৌচ মৃদ্ভির্ঘর্ষণৈরপি॥

ভোজনাবসানে বিধিপূর্ব্বক আচমন করিবে; প্রয়োজন বোধ হইলে মুখ এবং হস্তে মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা ঘর্ষণপূর্ব্বক শোধন করিবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুখের ও হস্তের এবং পরম্পরা সম্বন্ধে মনের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ বিধান হইয়াছে।

কিন্তু আচমন করা হইলেই যে শুচিতা সম্পাদিত হয়, তাহা নহে। গৃহের মধ্যে যে সগড়ী পড়িয়া থাকিবে শাস্ত্র তাহার নিষেধ করিয়াছেন।

আচান্তোহপ্যশুচিস্তাবৎ যাবৎ পাত্র মনুদ্ধৃতং।
উদ্ধৃত্যাপ্য শুচিস্তাবৎ যাবন্নোচ্ছিষ্ট মার্জ্জনং॥

আচমন সমাপন হইলেও ভোজন পাত্রের উদ্ধরণ না হইলে সম্যক্ শুচিতা জন্মে না, আর ভোজনপাত্রের উদ্ধরণ হইলেও যতক্ষণ উচ্ছিষ্টের মার্জন না হয় ততক্ষণ শুচিতা জন্মে না। উল্লিখিত নিয়মের পালন নিবন্ধন গৃহস্থের ঘরে সগড়ী ব্যাড় ব্যাড় করিতে পায় না, যেমন খাওয়া হইয়া যায় অমনি পাত্র উঠাইয়া ফেলে এবং স্থান পরিষ্কৃত করে; গৃহাদি দুর্গন্ধ হয় না, কাকে. কুকুরে, বিড়ালে, উচ্ছিষ্টান্ন এখানে সেখানে ফেলিতে পায় না। আজ কাল অনেক বাড়ীতে রাত্রের উচ্ছিষ্ট পাত্র পরদিন মার্জ্জিত হয়। উহা অহিন্দু ব্যবহার।

তাম্বুল ভক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

পর্ণমূলে ভবেদ্ব্যাধিং পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণং পর্ণং হরেদায়ুঃ শিরা বুদ্ধিপ্রণাশিনী॥

পানের মূলে ব্যাধি জন্মে, পানের ডগায় পাপ জন্মে, পচাপানে আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং পানের শিরা বুদ্ধিনাশ করে। এই বিধির প্রভাবে পানের মূল এবং অগ্রভাগ এবং শিরাটী বাদ দিয়া পান সাজিবার রীতি দেশে

প্রচলিত হইয়া আছে। পানের সকল শিরাও বাদ দেওয়া কোন কোন সুগৃহস্থের অভ্যস্ত। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই বিধি সুপরিপালিত হয়। তাম্বুল ভক্ষণ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া 'অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ'—বিশেষ ক্লেশ ব্যতিরেকে যে সকল কার্য্য করা যায় সাধারণে তাহাই করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণ এবং রাত্রিকৃত্য।

আহারের পর সুস্থ এবং প্রশান্তচিত্ত হইয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক ষষ্ঠ, সপ্তমাদি যামার্দ্ধকৃত্যে প্রবৃত্ত হইবে। ঐ যামার্দ্ধগুলিতে উদ্বেগশূন্য হইয়া চিত্তের প্রসাদজনক এবং ধর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বর্দ্ধক ক্রিয়া সকলে মন দিতে হয়।

এখন অনেকানেক ব্রাহ্মণ সন্তান উপবীত গ্রহণকালের আজ্ঞা (মা দিবা স্বাপ্সীঃ=দিনে ঘুমাইবে না) বিস্মৃত হইয়া ভোজনাবসানে শয়ন-গমনে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

দিবাস্বপ্নং ন কুর্ব্বীত স্ত্রিয়ঞ্চৈব পরিত্যজেৎ।
আয়ুঃক্ষীণা দিবানিদ্রা দিবাস্ত্রী পুণ্যনাশিনী॥

দিবাতে নিদ্রা যাইবে না—স্ত্রীসংসর্গ করিবে না; দিবানিদ্রা আয়ুঃক্ষয় করে এবং দিবাকালের স্ত্রীসংসর্গে পুণ্য নাশ হয়।

কিন্তু দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না বলিয়া যে, সময়টা ক্রীড়াদি ব্যসনে বৃথা নষ্ট করিবে, এমত নহে। ব্রাহ্মণের পক্ষে তাস, পাশা, কড়িখেলা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া অবৈধ।

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥

পূর্ব্বকালে, দ্যূত অনেক শত্রুতা জন্মাইয়াছে; অতএব আমোদ করিয়াও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্যূত সেবা করিবেন না।

আর্য্যশাস্ত্র কোন ক্রমেই দ্যূতাদি ক্রীড়ার প্রশ্রয় প্রদান করিতে পারেন না। আর্য্যশাস্ত্র সর্ব্বদাই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিতান্ত এবং দৃঢ়তার শিক্ষা-দানে যত্নবান এবং সর্ব্বত্র সত্ত্বগুণের পক্ষপাতী। দ্যূতাদি অদৃষ্ট-পরীক্ষক ব্যাপারের আলোচনায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচারের অভ্যাস ন্যূন হইয়া পড়ে এবং অকিঞ্চৎকর বিষয়ে আগ্রহ বর্দ্ধিত হওয়াতে তমোগুণের পোষণ হয়। এই জন্য ভোজনের পর যাহা করণীয় তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চাভ্যসেৎ।
বৃথাবিবাদরাক্যানি পরীবাদঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

ইতিহাস পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অভ্যাস করিবে আর বৃথা কলহ এবং পরনিন্দার আলোচনা পরিত্যাগ করিবে।

অনন্তর দিনের [illegible] ভ্রমণার্থ বাহিরে যাইবে এবং লোকজনের

একরূপ, ইহাদিগের অনুষ্ঠানও তেমন বিভিন্নপ্রকার নয়। "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" এই বৈদিক বিধির অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দন করিতে হয়। সন্ধ্যাবন্দন কার্য্যের উদ্দেশ্য অতি গুরুতর না হইলে উহার অভ্যাসের জন্য এত নির্বন্ধাতিশয্য হইত না এবং উহার একটী মাত্রা বা অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিধি থাকিত না। সে উদ্দেশ্য কি এবং কত গুরু তাহা বুঝা উচিত।

সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রগুলির প্রতি সামান্য দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ঐ মন্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি বৈদিক ঋক্ অপর কতকগুলি পৌরাণিক-ধ্যানাদি আছে। যদি কিছু মনোযোগ সহকারে দেখা যায় তবে বোধ হয় যে ঋক্‌গুলির এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়াই পৌরাণিক মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থই উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর অনুস্যূত। যদি তাদৃশ গুরুর কৃপা[illegible] সাত্ত্বিক দৃষ্টিলাভ

ঐ প্রকার অস্বর্গ্য এবং অমূলক ব্যাখ্যা পরিহার পূর্ব্বক প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, যে স্তবত্রিতয়ের সমবায়ে সন্ধ্যাবন্দনার সংঘটন হইয়াছে, তাহাদিগের একবাক্যতা দ্বারা যে প্রকৃত এবং পরিশুদ্ধ তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয় তাহাই আমাদিগের জ্ঞাতব্য।

ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদের সন্ধ্যোপাসনা অবিকল এক না হইলেও স্থূলতঃ এক। যজুর্ব্বেদীয় এবং সামবেদীয় সন্ধ্যার পরস্পর প্রভেদ অল্প; ঋগবেদীয় সন্ধ্যার সহিত উহাদিগের উভয়েরই কিছু অধিক পার্থক্য। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার মধ্যে ঋকের সংখ্যা অধিক, সাম এবং যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় বিশেষতঃ সামে সেই সেই স্থলে "নমোঽস্তু" মন্ত্রের পাঠ।

অতএব যে মন্ত্রাদি তিন বেদের [illegible]তই সাধারণরূপে পাওয়া যায়, সেইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়ের [illegible]ল্লেখ করিতেছে বলিয়া স্থূল স্থূল তাৎপর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্ধ্যা[illegible]নের ঋণাচারে কি জন্য এত সমাদৃত তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা। সন্ধ্যাবন্দনটী যে [illegible]

সন্ধ্যোপাসনার উ[illegible]ব। [illegible]। প্র[illegible]চনে অতি সুস্পষ্টরূপেই কথিত হইয়া আছে [illegible]সের একটী লোরণ এবং [illegible]র অনুক্রমে নাভিদেশে সৃষ্টিকর্ত্তা [illegible]পশালন। বিষ্ণুর ধ্যান এবং ললাটদেশে সংহারকর্ত্তা শম্ভু তৃতীয়, উল্লিখিত ক্রিয়া এবং ধ্যান সহকৃত এই তাৎপর্য্যার্থে মন্ত্রপাঠ যে, "সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মকর্ত্তৃক দীপ্যমান রহিয়াছে"। এ স্থলেও দেখা যায় যে, প্রাণায়ামের প্রথম অঙ্গে ক্রিয়াশক্তির, দ্বিতীয় অঙ্গে ইচ্ছাশক্তির এবং তৃতীয় অঙ্গে জ্ঞান-শক্তির বিশেষ বিকাশ হইতেছে। প্রাণায়াম প্রক্রিয়াদ্বারা শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বিশ্বরূপ বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের অভিন্নতা প্রতিপাদন হইয়া পাপের বিলোপ সাধন হইতেছে।

উন্মেষ তিন প্রকারে লক্ষিত হয়—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা যে পাপ বিনষ্ট হইবার কথা, তাহার অনুকূলে কোন্ কোন্ শক্তি কিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে?

(১) সন্ধ্যার প্রথম অর্থাৎ স্নানমন্ত্রটীতে জলের নিকট যেমন বাহ্যমল তেমনি অন্তর্মল অর্থাৎ পাপ হইতে বিধৌত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এইরূপে ইচ্ছাসমন্বিত স্নান ক্রিয়ায় ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি উভয় শক্তিরই কার্য্যকারিতা প্রতিপন্ন হইয়া আছে। কিন্তু এই বিষয়ে ঐ শক্তিদ্বয়ের ঊর্দ্ধবর্ত্তী এবং অগ্রবর্ত্তী জ্ঞান শক্তিরও বিদ্যমানতা আছে। ঐ স্নান মন্ত্রের সহযোগী পাপ মার্জ্জন মন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে, যে জল শরীরের মলিনতা ক্ষালন করে, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সেই জলই শরীরের পোষণ করে এবং সৃষ্টি ব্যাপারে সেই জলই প্রথম সৃষ্ট বস্তু। সেই জল যে পরম শিবতম রসের প্রতিরূপ তাহাতে আমাদিগকে [illegible] করণে সমর্থ। অতএব স্নান মন্ত্রে ক্রিয়া, ইচ্ছা [illegible] সংযোজিত শক্তিই পাপক্ষালনে নিযুক্ত।

সন্ধ্যার দ্বিতীয় [illegible] নত্বাতু পুণ্ডরীকাক্ষং উপাত্তাধ[illegible]য়ে দ্বিতীয়, ব্রহ্মবর্চ্চস কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে॥

পুণ্ডরীকাক্ষকে নমস্কার করিয়া অর্জ্জিত পাপের শান্তির এবং ব্রহ্মতেজ লাভের নিমিত্ত প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিতেছি।

প্রাতঃসন্ধ্যার বিশেষ উল্লেখ থাকায় যে, অপর দুইটী সন্ধ্যাকে বুঝায় না, এমত নহে। শাস্ত্রমতে সন্ধ্যাবন্দনার উদ্দেশ্য দুইটী। এক, উপাত্ত অর্থাৎ সমুৎপন্ন পাপের নাশ, অপর, ব্রহ্মতেজের লাভ।

এখন প্রথম উদ্দেশ্য ধরিয়াই দেখা যাউক! কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে তদনুকূলে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। শক্তির

ইহার পর আচমন প্রকরণ। এই প্রকরণে করতলে জলগ্রহণ করিয়া তাহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ পূর্ব্বক অবশিষ্টাংশ মস্তকে সিঞ্চন করিতে হয়। ইহাতে ক্রিয়াশক্তি প্রকটিত হয়। অনন্তর পূর্ব্বকৃত সন্ধ্যোপাসনা হইতে উপস্থিত সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত শরীর এবং মন দ্বারা যদি কোন পাপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের বিনাশের জন্য মন্ত্র দ্বারা যে তীব্র অভিলাষের থ্যাপন তাহা ইচ্ছাশক্তির কার্য্য। আর (প্রাতঃসন্ধ্যায়) বাহ্যজগতের সূর্য্য স্থানীয় হৃদয়স্থ অন্তর্জ্যোতিতে, (মধ্যাহ্ণ সন্ধ্যায়) দেহ এবং দেহীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোধ পূর্ব্বক জলেতে, (সায়ং সন্ধ্যায়) পরমাত্মার সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিতে পাপের আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই ভাবগুলি জ্ঞানশক্তি সমুদ্ভূত। অতএব আচমন ব্যাপারেও ত্রিবিধ শক্তির সমাবেশে পাপ নাশকতা সিদ্ধ।

সন্ধ্যোপাসনায় পাপ[illegible] ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞান-

কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধির ব্যাঘাতক। ইচ্ছাশক্তির ন্যূনতায় ক্রিয়াশক্তিরও লাঘব হয়। কারণ উহারা উভয়েই রজোগুণাত্মক। যেখানে ইচ্ছা কম, সেখানে কার্য্যও কম হয়। ফলতঃ ব্রহ্মবর্চ্চস প্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানশক্তিরই মুখ্য অধিকার। সন্ধ্যোপাসনার যে দুইটী মুখ্য প্রকরণ বিচার করিতে এখনও বাকী আছে, সে দুইটীতেই জ্ঞানশক্তির কার্য্যকারিতা বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত। জ্ঞান বলিলে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সমুদ্ভূত পদার্থগ্রহ বুঝিতে হয় না, ভাববৃত্তির বিষয়ীভূত বস্তুগ্রহও বুঝিতে হয়। পদার্থের সংকলন বিকলনাদি দ্বারা তথ্যোপলব্ধি যেমন জ্ঞানের অঙ্গ, সৌন্দর্য্যবোধ, বিস্ময়, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি উচ্চ এবং পবিত্র ভাবগুলিদ্বারা চিত্তের প্রসার এবং উদারতা সাধনও তেমনি জ্ঞানের অঙ্গীভূত ব্যাপার।

সূর্য্যোপস্থান বলিয়া সন্ধ্যার যে ঋক্ বা মন্ত্র আছে তাহার প্রথমটী উদ্যদ্দিনমণির দর্শনে জীবময় জগতে [illegible] উচ্ছ সিত হয়, সেই

বিধি। গায়ত্রীর জপে কোন প্রার্থনা নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ নাই কোন অপরাধ স্বীকার নাই কোন দীনতা খ্যাপন নাই। শুদ্ধ এই কথা বলা আছে যে, যে ব্রহ্মতেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক আমরা সেই তেজের ধ্যান করি।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের অভেদ দর্শনে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া অভিমানের লোপ হয় এবং যে সূর্য্যজ্যোতি জগতের জীবন তাহাই নিজ আত্মারূপে অবস্থিত, ইহা নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা দ্বারা বুঝিতে পারিলেই "যোসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽহমস্মি" অথবা "তত্ত্বমসি" এই বোধ দৃঢ় হয়—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা করিতে তদাত্মতা প্রাপ্তি হয়। এবং সেই একমাত্র পথেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ লাভ করিতে পারেন। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে এই জ্ঞানের পথে পদার্পণ হয় বলিয়া উহার এত গৌরব এবং গায়ত্রীজপ যে সন্ধ্যাকৃত্যের শিরোভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট তাহার কারণ উহা "ব্রহ্ম চিন্তা" মাত্র।

সন্ধ্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ বিধি "মন্ত্রার্থজ্ঞানে যতিতব্যং"। মন্ত্রের অর্থগ্রহ করিবার জন্য যত্ন করিবে। যদি সন্ধ্যা বন্দনার প্রকৃত অর্থের বোধ বিলুপ্ত প্রায় না হইত তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানেরই কখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মতি হইতে পারিত না।

সন্ধ্যোপাসনা নিত্যক্রিয়া। কিন্তু ইহারও ফল কথিত হইয়াছে যথা—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংযতব্রতাঃ
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥

সায়ং সন্ধ্যা পশ্চিমাভিমুখ বা বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া করিতে হয় এবং সম্মুখ আকাশে তারকা দর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রীর জপ করিতে হয়।

রাত্রির প্রথম যামে অর্থাৎ ৬টা হইতে ৯টার মধ্যে দিবাকৃত সমস্ত কার্য্যের আলোচনা করিয়া যে যে বৈধকার্য্য প্রমাদতঃ অকৃত হইয়া আছে, সেগুলির সম্পাদন করিবে।

দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানিচ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

দিবার নির্দ্দিষ্ট যে সকল কার্য্য প্রমাদপ্রযুক্ত [বিস্মৃতি অথবা কোন বিপজ্জনক কারণে] না করা হইয়াছে তৎসমুদায় রাত্রির প্রথম যামে নির্ব্বাহ করিবে।

এই বিধিটী থাকাতে বর্ত্তমান আপৎকালে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, দেবপূজা, তর্পণ, হোম, বৈশ্বদেব, বলি, নিত্য শ্রাদ্ধ, অতিথি সৎকার এবং গোগ্রাস দান, এই সকল কার্য্য চাকুরিয়া ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। কেহ কেহ মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা তর্পণ প্রভৃতি প্রাতঃসন্ধ্যাদির সহিত এক যোগেই নির্ব্বাহিত করিয়া থাকেন ; কিন্তু অপর কার্য্যগুলি প্রায়ই অননুষ্ঠিত থাকিয়া যায়। সেইগুলি রাত্রির প্রথম যামে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে নিত্যকর্ম্মের লঙ্ঘন হয় না।

বস্তুতঃ নিত্যাচারের সকল অনুষ্ঠান যাহাতে যথাকালে অনুষ্ঠিত হয়, অন্ততঃ গৌণকালেও অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য শাস্ত্রের বিশেষ যত্নই আছে। অনুষ্ঠানের দ্বারাই শিক্ষণীয় বিষয়ের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হয়। বোধ হয় এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে অনুষ্ঠানের অপরিসীম গৌরব। অনুষ্ঠানে যাহা কার্য্য থাকে বলিয়া ইহা দ্বারা স্নায়ু এবং পেশী মণ্ডলের তত্তৎকার্য্যোপযোগী বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থায় সৌকর্য্য জন্মে এবং তজ্জন্য সকল শিক্ষা এবং সংস্কারের দৃঢ়তা এবং স্থিরতা সংসাধিত হয়। আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় যেন অনুষ্ঠান মাত্রেরই প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাদাতৃ ইউরোপীয়গণ যে বিবিধ ব্যাপারেই 'ড্রিল' বা অঙ্গসঞ্চালন করাইয়া থাকেন তাহা নিরন্তর দেখিয়াও উহাই যে অনুষ্ঠানাঙ্গ এই তথ্যটী বুঝিতে পারেন না। অনুষ্ঠানের একটী মুখ্য অঙ্গ— মুদ্রা। অগষ্ট কোমটীও মুদ্রার মাহাত্ম্য বুঝিয়া শিষ্য সম্প্রদায়কে 'উপুড় হস্তরূপ' দান-মুদ্রার অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বহুকাল যাবৎ অনুষ্ঠানের অনুসরণ দ্বারা অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে উচ্চ অধিকারীকে বাহ্য অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধমানস-কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবার জন্য শাস্ত্রে মানস ক্রিয়ার ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হয়। মানসস্নান মানস পূজা এবংমানসজপ—তিনই বাহ্য স্নানে বাহ্য পূজা ও বাহ্য জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই শাস্ত্রে এই গভীর তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে।

(১) শৌচ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥

সমূহ গঙ্গাজল, পর্ব্বত প্রমাণ মৃত্তিকা এবং আমরণ স্নান, কিছুতেই ভাবদুষ্ট ব্যক্তির শুচিতা সম্পাদন করে না।

(২) স্নান সম্বন্ধে বায়ব্য স্নানকেই অপর সকল স্নান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরে উক্ত হইয়াছে—

বায়ব্যাৎ মানসঞ্চেহ সর্ব্বস্নানাৎ পরং বরং।
মর্ত্ত্যশ্চেৎ মানসস্নাতঃ সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥

বায়বস্নান হইতেও মানস স্নান উৎকৃষ্ট; মনুষ্য মানসস্নাত হইলে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন।

(৩) যজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

যাবন্ত, কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃপ্রদিষ্টানি তপাংসি চ।
সর্ব্বেতে জপযজ্ঞস্য কলাংনার্হন্তি ষোড়শীং॥
মাহাত্ম্যংবাচিকস্যৈতৎজপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং।
তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ॥

যত প্রকার কর্ম্মযজ্ঞ এবং তপস্যার বিধি আছে তাহারা সকল জপরূপ যজ্ঞের এক কলামাত্রও নহে, বাচিক জপের মাহাত্ম্য এইরূপ; তাহার শতগুণ উপাংশু জপের (ঠোঁট পড়িবে মাত্র, শব্দ শুনা যাইবে না) এইরূপ জপের) এবং মানস জপের মাহাত্ম্য তাহার সহস্রগুণ।

মানস জপের সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ কথা আছে—

অশুচির্বা শুচির্বাপিগচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণোর্যিদ্বান্ মনসৈব সমভ্যসেৎ॥

অশুচি হউক বা শুচি হউক, এক স্থানে স্থির হইয়াই হউক বা চলিতে চলিতে হউক অথবা নিদ্রাকৃষ্ট হইয়াই হউক বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই মন্ত্রের মানসজপ করিতে পারেন।

(৪) পূজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

বাহ্যা পূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ।
অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা॥
বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্জ্ঞানং নজায়তে।
জাতে জ্ঞানেচ দেবেশি দেবতামূর্ত্তিভাবনা॥

গুরুর আজ্ঞানুসারে বাহ্য পূজা করিবে। মানস পূজা বা অন্তর্যাগ সকল পূজা হইতে অতি উৎকৃষ্ট। যাবৎকাল জ্ঞানোদয় না হয় তাবৎকাল বাহ্য পূজা করিবে; জ্ঞান জন্মিলে হে দেবেশি! দেবতার মূর্ত্তি ভাবনামাত্র করিবে।

এতএব আর্য্যশাস্ত্র যে বাহ্য অনুষ্ঠান অপেক্ষা মানস কার্য্যেরই সমধিক প্রাধান্য স্বীকার করেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রত্যুত নিত্যাচার প্রকরণে যতগুলি দৈবানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তৎ সমুদায়ই মানস কার্য্যের দ্বারা সম্যক্ অনুকল্পিত হইতে পারে। গৌতম ঋষির একটী বচন এই—

যদাঽসমর্থস্তদামনসা সমগ্রমাচারমনুপালয়েৎ।

কার্য্যতঃ না পারিলে সমুদায় আচার মনে মনেই নির্ব্বাহিত করিবে।

অতএব অনুষ্ঠান সহকৃত হউক অথবা শুদ্ধ মানস মাত্রে হউক যে যে পূর্ব্বকৃত্যের বাদ পড়িয়াছে রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে তৎসমুদয় নির্ব্বাহ করিয়া তদনন্তর রাত্রি ভোজনের পূর্ব্বকৃত্য স্বরূপ বৈশ্বদেব,

বলি এবং অতিথিসৎকার করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। দিবার অতিথির অপেক্ষায় রাত্রির অতিথির গৌরব অধিক।

রাত্রির আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের দুইটী আদেশ আছে। প্রথম আদেশ এই যে, রাত্রি ভোজনে অতি তৃপ্তি পরিহার করিবে, অর্থাৎ রাত্রিতে খুব পেট ভরিয়া খাইবে না।

দেখিতে পাই, ইংরাজেরাও যেন এই বিধানটা মানেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়েরা প্রায়ই মানেন না। ইহাঁদের একটী ভ্রম সংস্কার আছে যে, নিদ্রাযোগে আহারের পরিপাক ভাল হয়; এই জন্য রাত্রির আহারটাই গুরুতর করিয়া ফেলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নিদ্রার সময় আহারের পরিপাক বিলম্বিত হইয়া থাকে; ইউরোপীয় ডাক্তরেরাও এই মতের সমর্থন করেন। ফলতঃ শাস্ত্রের বিধি মানিয়া রাত্রির ভোজনটা অতি তৃপ্তিকর না করাই ভাল।

রাত্রিভোজনের সম্বন্ধে শাস্ত্রের দ্বিতীয় আদেশ এই যে, রাত্রিভোজনের পর একটু বিলম্ব করিয়া শয়ন করিতে হইবে। খাইবার পরক্ষণেই শয়ন করায় আহারের পরিপাক ভাল হয় না। ইউরোপীয় ডাক্তার-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও ঐ কথা বলেন। তবে উহাঁদিগের মতে যত অধিকক্ষণ বিলম্ব করিবার কথা, শাস্ত্রে তাহা নয়। শাস্ত্রের আদেশানুসারে ভৃত্যবর্গকে তাহাদের রাত্রিতে করণীয় ব্যাপার সম্বন্ধে আদেশ প্রদান এবং কতকগুলি মন্ত্র এবং সূক্ত পাঠ করিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা।

শয্যা সম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রোক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাংমলিনাং নচ।
নচ জন্তুময়ীং শয্যামধিগচ্ছেদনাস্তৃতাং॥
ন শুক্রেণাপবিত্রে চ নতৃণে নচ ভূতলে।
তুলিকায়াং তথা বস্ত্রে শয্যাভাবে স্বপেদ্গৃহী।
স্বপেন্ন পট্টবস্ত্রেচ কলঙ্কি কম্বলে॥

ছোট, ভগ্ন, উচ্চাবচ, মলিন. জন্তুময়, আস্তরণশূন্য, অপবিত্র বিছানায়, বা তৃণের উপর, খালি মাটিতে, পট্টবস্ত্রে কিম্বা দাগী কম্বলে শুইবে না। শয্যার অভাবে ভূমিতে কার্পাশ বস্ত্র বিছাইয়া গৃহী শয়ন করিতে পারে।

শুচৌদেশে বিবিক্তেষু গোময়েনোপলিপ্তকে।
প্রাগুদক্ প্লবনেচৈব সন্বিশেত্ত সদাবুধঃ।
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।
বৈদিকৈর্গারুড়ৈ র্মন্ত্রৈরক্ষাং কৃত্বাস্বপেত্ততঃ॥

অসংলগ্নভাবে (অর্থাৎ প্রাচীর আসবাব প্রভৃতিতে বিছানা ঠেকিয়া না থাকে এরূপে) গোময়লিপ্ত (কিন্তু ভিজা নয় এরূপ) শুচি স্থানে, জলপূর্ণ কুম্ভশিয়রে রাখিয়া * এবং বৈদিক গারুড় মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শয়ন করিবে।

ধান্যগোবিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি।
নচাপিভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃস্বয়ং॥
আর্দ্রবাসা ননগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ।

ধান্য, গরু, ব্রাহ্মণ, দেবতার উপরিতলে. ভগ্ন বা অশুচি শয্যায়, বা স্বয়ং অশুচি থাকিয়া, আর্দ্রবাস, নগ্নবাস, কিম্বা উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না।

ত্রিদোষ শমনী খট্টা তুলী বাত কফাপহা।
ভুশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাশ্রনাশিনী।
সুশয্যা শয়নং হৃদ্যং পুষ্টিনিদ্রা ধৃতিপ্রদং।
শ্রমানিলহরং বৃষ্যং বিপরীতমতোন্যথা॥

---

* ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের মতেও ইহা উপকারী। তিনি বলিবেন যে রুদ্ধগৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিলে গৃহস্থিত অনেক প্রকারের দুষ্ট গ্যাস ঐ জলে গুলিয়া যায় এবং গৃহস্থিত বায়ু অনেকটা পরিশুদ্ধ হয়। ঐরূপে রক্ষিত জলটা খারাপ হইয়া যায় বলিয়া শয়নগৃহে পানীয় জল রাখা উচিত নয়।

খাট বা তক্তাপোষের উপরের শয্যা ত্রিদোষনাশিনী। তুলার শয্যা বাত বা কফনাশিনী। ভূমিশয্যা বাত বৃদ্ধিকরী, রুক্ষ, পিত্ত এবং চক্ষের জলনাশিনী। সুশয্যাশয়ন তৃপ্তি, পুষ্টি, নিদ্রা এবং ধৈর্য্যপ্রদ, শ্রম এবং বায়ুনাশক, বল বর্দ্ধক। কুশয্যাশয়নের ফল উহার বিপরীত।

রাত্রিকৃত্য বিধির মধ্যে দারোপগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি আছে। তাহার মুখ্য কথাগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

(১) পরদারব্রতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা।
মৃতোনরকমভ্যেতি হীয়তে হ্যস্যাপিচায়ুষঃ॥

পরদার রতি উভয় লোকে ভীতিপ্রদা; ইহলোকে আয়ুক্ষয়করী, মৃত্যুর পর নরকপ্রাপিনী।

(২) ইতিমত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধব্রজেৎ।

ইহা জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি স্বভার্য্যায় ঋতুকালে সংসর্গ করিবে।

(৩) ষোড়শর্ত্তু নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ॥

[মাসিক] রজো দর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি স্ত্রীদিগের ঋতুকাল [গর্ভধারণ যোগ্যকাল] ইহার মধ্যে যুগ্ম (ষোড়া) রাত্রিতে সহবাস করিবে।

(৪) ষষ্ঠাষ্টমীমমাবস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশী।
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মমপ্রিয়াং।

অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী, [এবং রবি-সংক্রান্তি] এই সকল তিথ্যাদিতে মৈথুন সেবা করিবে না।

[এতদ্ভিন্ন কয়েকটি নক্ষত্র এবং বারেরও নিষেধ আছে]

(৫) চতুর্থী প্রভৃত্যুত্তরোত্তরা প্রজা নিশ্রেয়সার্থং।

[রজোদর্শনের] চতুর্থ দিন হইতে যত পর দিনে গর্ভাধান হইবে, সন্তান ততই মঙ্গলের নিমিত্ত হইবে।

(৬) রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রীরজস্বলা।

রজস্বলা স্ত্রী স্রাব নিবৃত্ত হইয়া গেলে স্নান করিয়া সাধ্বী [গর্ভ ধারণ

যোগ্যা] হয়। অর্থাৎ রজস্রাব নিবৃত্ত না হইলে স্নান করা এবং স্বামী সহবাস করা বিহিত নয়।

উল্লিখিত পঞ্চম এবং ষষ্ঠবিধি দুইটীর উল্লঙ্ঘন জন্য এক্ষণে অপকৃষ্ট এবং স্বল্পায়ু সন্তানের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়াছে। য়িহুদী জাতির মধ্যে তাহাদিগের শাস্ত্রাদেশ যে, নবম দিনের পর স্ত্রীসংসর্গ করিতে হয়। ইহা অতি সুপালিত হওয়াতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রে উহাদের সন্তানেরা সবল ও পুষ্টদেহ এবং আয়ুষ্মান্ হয়।

(৭) ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ যাবৎ পুত্রো নজায়তে।

যতদিন পুত্র জন্ম না হয় তাবৎকালেই ঋতুকালে স্ত্রী গমনের কর্ত্তাবতা বুঝিবে। তাহার পরে যদিও স্ত্রীর কামনা তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ অপর সময়েও সহবাস করিতে পারেন, কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রী সহবাস অপ্রশস্ত।

আর্য্যশাস্ত্র গৃহস্থের উৎকৃষ্ট সন্তান জনন পক্ষে বিশেষ যত্নবান হইয়াও কাহার সন্তান সংখ্যা অধিক হউক এরূপ অভিমতি প্রকাশ করেন না।

যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেনচানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কালজানিতরান্ বিদুঃ॥

যাহার জন্ম হইলে [পিতৃ] ঋণের শোধ হয় এবং আনন্ত্যপ্রাপ্তি [বংশ রক্ষা] হয় সেই [জ্যেষ্ঠ] পুত্রই ধর্ম্মজ পুত্র অপর সকলে কামজ পুত্র।

শাস্ত্রকারদিগের মত মূলতঃ এইরূপ হইলেও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, মানুষের যতগুলি সন্তান হয় প্রায় তাহার অর্দ্ধেকই শৈশবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্য মহাভারতের সময়েই উক্ত হইয়াছে—

এক পুত্রোহ্যপুত্রোমে মতঃ কৌরবনন্দন।

ইহাতেই একাধিক পুত্র জননের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

বহু পুত্র জনন সম্বন্ধীয় যে অপর ব্যবস্থা পুরাণাদি হইতে প্রাপ্ত

হওয়া যায় তাহা বহু পুত্র জননের প্রশংসার জন্য নহে, অন্যান্য বিষয়ের অর্থবাদ মাত্র।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ৺ গয়াধামের মাহাত্ম্য খ্যাপন করাই বচনটির উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যথাযোগ্য ঋতুর লক্ষণ বুঝিয়া গর্ভাধানের ব্যবস্থা সম্যক্ প্রকারে সংরক্ষিত হইলে এবং প্রাজাপত্যাদি বৈদিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, পিতৃমাতৃ শরীরের ও মনের ভাব এরূপ পরিশুদ্ধ হয় যে, সহজাত দোষ জন্য সন্তানের অকালমৃত্যু খুবই কম হয়। সুতরাং বংশ রক্ষার নিমিত্ত সমধিক সন্তান জননের প্রয়োজন হয় না।

রজোগুণাবলম্বী ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে বলিয়াছেন যে, লোকের ভোগ বাসনা বৃদ্ধি হইলে তাহারা আর বিবাহ করিতে চাহে না, কারণ বিবাহ হইলেই বংশ বৃদ্ধি হইয়া গৃহস্বামীর ব্যয়বাহুল্য হয় এবং তিনি অনেক ভোগ সুখে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। এইজন্য বিলাসিতা বৃদ্ধিতে সমাজের লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখে। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি নিবারণের উদ্দেশে বিলাসিতা বৃদ্ধিরূপ অতি অনিষ্টকর উপায় অবলম্বন করেন নাই—বিবাহ দ্বারা বংশ রক্ষার উপায় বিধান করিয়া অযথারূপে বংশবৃদ্ধির নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বস্থলেই আর্য্য শাস্ত্রের দৃষ্টি যেমন সুদূরগত, তদনুষ্ঠিত প্রণালীও তেমনি অতীব পরিশুদ্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়।

নিত্যাচার প্রকরণ।

প্রকরণের উপসংহার।

শাস্ত্রবিহিত নিত্যাচারের যে কথাগুলি পূর্ব্বগত কয়েকটি অধ্যায়ে (১) প্রাতঃকৃত্য (২) পূর্ব্বাহ্নকৃত্য (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য এবং (৪) অপরাহ্নাদি কৃত্য শীর্ষকের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শরীর এবং মনের শুচিতা এবং স্বাস্থ্য সম্পাদনপূর্ব্বক (১) ইন্দ্রিয় তর্পণের একান্ত পরিহার (২) সম্যক্ অবধানতা এবং আত্মসংযমের দৃঢ় অভ্যাস (৩) পরার্থৈকজীবিতা (৪) পাপক্ষালন-শীলতা (৫) বিশ্বজনীন-প্রীতি প্রভৃতি অত্যুন্নত গুণ সকলের স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা করাই নিত্যাচার পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতি শাস্ত্রশীল এবং পবিত্রতা ও মুক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উদ্ভূত, তাঁহাদিগের দ্বারা পূর্ণ বা অপূর্ণ মাত্রায় অনুসৃত, এবং তাঁহাদিগের চরিত্রে সম্যক্ বা অসম্যক্ পরিমাণে ফলিত হইয়া আছে।

ভারতবাসী অপরাপর বর্ণের লোকেরাও, যাঁহারা যতদূর পারিয়াছেন, এই আচার পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়া এবং তাহার যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া কষ্টসহ, ধৈর্য্যশীল এবং ধর্ম্মভীরু হইয়াছেন। কারণ ব্রাহ্মণাচারই সকল ভারতবাসীর পক্ষে সদাচারের আদর্শ স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট।

আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্মশাসন বা ধর্ম্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে এই "আদর্শ নির্দ্দেশ" ব্যাপারটী একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। সকল ধর্ম্মেই (১) পাপের ভীতিজনক তিরস্কার এবং (২) পুণ্যের

প্ররোচনাত্মক পুরস্কার সম্বন্ধে অনেকানেক কথাই থাকে। তদ্ভিন্ন, (৩) লোকের অনুকরণোপযোগী আদর্শ চরিত্রেরও পূর্ণ বা অপূর্ণ, অল্প বা অধিক সংখ্যক চিত্র থাকে, আর (৪) তাদৃশ চরিত্র সংঘটনের উপায়-গুলিও বিধি নিষেধাদি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অভিব্যক্ত করা থাকে। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত অঙ্গচতুষ্টয় পূর্ণমাত্রাতেই বিদ্যমান। কিন্তু ইহাতে "আদর্শ নির্দ্দেশ" অঙ্গটী বিশিষ্টরূপেই সবল এবং সুপরিস্ফুট।

ভারতবর্ষ মূলতঃ একারণাত্মক লোকের নিবাসভূমি নহে। এই জন্য এখানে "অধিকারী ভেদ" রূপ সরল তথ্যের স্বীকার সহজেই হইয়াছে এবং তৎসহই "আদর্শ নির্দ্দেশনার" পরিস্ফুটতা জন্মিয়াছে। এখানকার বিভিন্ন বর্ণের সকল লোকের পক্ষে একোদ্যমে একই উচ্চতম ধর্ম্ম আদর্শের সম্যক্ গ্রহণ সম্ভাবিত হইতে পারে না। সকল দেশের পক্ষেই এই কথা কিয়ৎপরিমাণে খাটে। কারণ, সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবৃত্তির সহজাতভেদ থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে মনুষ্য দিগের মধ্যে আকারগত যত পার্থক্য আর কোথাও তেমন নয়, আর ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারেরা যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর সকল লোকেরই প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তেমন আর কোথাও কখন হয় নাই। এ বিষয়ে বেদ-বাক্যই (অথর্ব্বসংহিতায়) স্পষ্টতঃ এইরূপ—

"প্রিয়ং মাকৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মাকৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উত আর্য্যে॥"

শুদ্ধ ব্রাহ্মণের অথবা ক্ষত্রিয়ের প্রিয় [সাধন] করিও না, শূদ্র এবং বৈশ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রিয় [সাধন] করিও।

অপরাপর ধর্ম্মপ্রণালী একই প্রকার শিক্ষার ভার এক দেশের সকল লোকের স্কন্ধে আরোপণ করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন নাই—পৃথিবীর সকল লোকের স্কন্ধে একই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ এবং কঠিন ভাবই সহানুভূতির চিহ্ন বলিয়াই উদ্‌ঘোষিত হইতেছে!

পূর্ণ সহানুভূতি প্রণোদিত আর্য্যশাস্ত্রকে সর্ব্বাপেক্ষায় উচ্চাধিকার ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত সম্যক্ পবিত্রতার সাধক একটী উৎকৃষ্ট আচার পদ্ধতির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে এবং তদনন্তর নিকৃষ্টাধিকারী অপরাপর লোকদিগকেও স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণদিগেরই অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতে হইয়াছে।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

এতদ্দেশজাত [ব্রহ্মাবর্ত্ত জাত] ব্রাহ্মণদিগের স্থান হইতে পৃথিবীর (ভারতবর্ষের) সকল লোকে আপনাপন চরিত্র শিক্ষা করিবেন।

এরূপ করাতে ফল যে অতি উৎকৃষ্টই হইয়াছে তাহা যিনি আধুনিক দুষ্ট সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া স্বচিন্তার অবলম্বনপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশের অপেক্ষা স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের প্রসাদে বাঙ্গালাতে স্মার্ত্তাচার অধিকতর প্রবল হইয়া আছে। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণেতর জাতীয়েরা বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের তুলনায় সমধিক পরিমাণেই ব্রাহ্মণাচারের অনুকরণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সমধিক পরিমাণে শুচি, পাবত্র এবং শ্রী ও বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া যেমন আশ্রম চতুষ্টয়ের এবং পৌরাণিক, মন্ত্রাদির তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সমস্ত সংস্কারেরও অধিকারী হইয়াছেন।

বস্তুতঃ এইরূপ হইবারই কথা। সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ বিবর্জ্জিত কোন কল্পিত বা পূর্ব্বযুগজাত পুরুষ বিশেষের প্রকৃতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিলে যদিও লোকের সমক্ষে একটী আদর্শ চিত্র প্রদান করা হয়, কিন্তু তাহা করিলেই তদনুকরণে লোকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না। আদর্শ পুরুষ প্রকৃত জনগণের সমক্ষে তাহাদের অনুকরণ শক্তির একান্ত অতীতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই জন্য কতক গুলি জীবন্ত মনুষ্যের প্রকৃতিতে তাদৃশ আদর্শ পুরুষের ছায়া প্রতিফলিত করা আবশ্যক। তাহা করিতে না পারিলে অনুকরণ প্রবৃত্তির উদ্রেক

দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্যে সম্যক্ ফললাভ হয় না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই সেই জীবন্ত আদর্শ হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মো রত্যর্থমেবচ।
অহোরাত্রশ্চ পুণ্যার্থং তংদেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

যিনি ধর্ম্মের জন্যই জীবন ধারণ করেন, একমাত্র ধর্ম্মেই যাঁহার আনন্দানুভব হয়, এবং ধর্ম্ম সাধনেই যাঁহার দিন রাত্রি অতিবাহিত হয়, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

ক্ষমা দয়াচ বিজ্ঞানং সত্যঞ্চৈব দমঃসমঃ।
অধ্যাত্মং নিত্যতা জ্ঞানং এতদ্ব্রাহ্মণলক্ষণং॥

ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান, সত্য, দম, অধ্যাত্ম, এবং নিত্যজ্ঞান, এই সকল ব্রাহ্মণলক্ষণ।

ব্রাহ্মণের আচার সম্বন্ধে (শিবপুরাণে) বিধিও আছে যে, ব্রাহ্মণ সুখাদি প্রার্থী হইবেন না।

ব্রাহ্মণো মুক্তিকামী স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানং সদাভ্যসেৎ॥

ব্রাহ্মণ মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানের চিন্তন করিবেন।

এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট অনেকানেক ব্রাহ্মণকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অতএব তাদৃশ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের সন্দেহ আছে, তাঁহারা যদি কিছুকালের জন্য সন্দিগ্ধচিত্ততা পরিত্যাগ করিয়া এবং ধনের প্রার্থী হইলেই কেহ এদেশে নীচ হয় না, এই তথ্য স্মরণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের সহিত সভক্তিক আলাপ করেন, তাহা হইলেই সন্দেহমুক্ত হইয়া সুখী হইতে পারিবেন। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় এবং মুসলমান রাজাদিগের সময়ে, ভাল ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক ছিল, এখন অল্প হইয়াছে; সেই পূর্ব্বকালে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প ছিল, এখন অধিক হইয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রের এই অনন্যসাধারণ ভাব অর্থাৎ অতি প্রবলরূপ আদর্শ-নির্দ্দেশ-প্রবণতা সুপরিস্ফুটরূপে না বুঝায়, যেমন ইহাকে পক্ষপাত দোষে

দূষিত বলিয়া নিন্দা করা হয়, তেমনি ইহার বিধি নিষেধগুলির যথাযথ তাৎপর্য্য বোধেও অনেকটা প্রমাদ জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা শেষোক্ত কথাটী বিশদ করিব। (১) শাস্ত্রে উক্ত হইল যে, শূদ্র আপনার নিমিত্ত ধন সঞ্চয় না করিয়া দ্বিজাতির সেবায় রত হইবে। এই বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শীভূত শূদ্রজাতীয় পুরুষ দ্বিজাতির সেবানিরত হইবে; তাহা না হইলে তাঁহার ত্রুটি হইবে, কিন্তু দণ্ডার্হতা জন্মিবে না। উল্লিখিত শাস্ত্রোক্তির সময়েও দেশমধ্যে যে, শূদ্রজাতীয় রাজা, জমীদার প্রভৃতি আঢ্যলোক সকল ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) শাস্ত্রোক্তি হইল, ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিবেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আদর্শীভূত ব্রাহ্মণ (যথা বশিষ্ঠাদি ক্রোধ পরবশ হইবেন না, হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যের ত্রুটী হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের লোপ হইবে না। পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিদিগের মধ্যেও ক্রোধপরবশ ব্যক্তি (যথা দুর্ব্বাসা ভৃগুরামাদি) ছিলেন। (৩) শাস্ত্র বলিলেন ব্রাহ্মণ কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। কিন্তু পূর্ব্বকালে অনেকানেক ব্রাহ্মণ অপকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতেন।

মনুসংহিতার কয়েকটী শ্লোকের সংগ্রহ হইতে জানা যায়।—

সমুদ্রযায়ী সোমসা বিক্রেতা তৈলিকশ্চযঃ।
ধনুঃশরাণাং কর্ত্তাচ দ্যূতবৃত্তিশ্চ যোভবেৎ॥
তন্ত্রাখোষ্ট্র দমকঃ পক্ষিণাং যশ্চপোষকঃ।
শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবীচ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ॥
ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ শূদ্রবৃত্তিশ্চ যঃ পুনঃ।
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্॥

অতএব এখনকার কালেই যে ব্রাহ্মণেরা নীচ বৃত্তি হইয়াছেন তাহা নহে। তখনও তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ প্রবৃত্তি এবং উচ্চ নীচ বৃত্তি ছিল। আর্য্য শাস্ত্রের এই 'আদর্শ নির্দ্দেশনার" রীতি না বুঝিতে পারিয়া এবং এক্ষণে দেশের মধ্যে সেই আদর্শ হইতে অনেকানেক ত্রুটী

দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে লোকে আর শাস্ত্রের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলে না; অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্য শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা সকল বড়ই শিথিল ভাবে সম্বদ্ধ, ইহার কোথাও একটু দৃঢ়বন্ধন নাই।

যাঁহারা ঐ সকল কথা বলেন, আর্য্য শাস্ত্রের বিচার প্রণালী তাঁহাদের চক্ষে পরিস্ফুট হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্র মনুষ্যকে উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সমস্ত উৎসাহ প্রদান করিয়া এবং তাহার প্রকৃত পথগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দিয়া এই বলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদর্শিত পথে যতদূর যাইতে পারিবে সেই পরিমাণেই সে ব্যক্তি উৎকর্ষলাভ করিবে। ভারতবর্ষে লোকাচার শাস্ত্রাচার হইতে তেমন পৃথগ্‌ভূত নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রাচারই লোকাচারের নিয়ামক। কোন প্রদেশে বা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রাচারের যে অংশ বা যত দূর সেই প্রদেশের বা সম্প্রদায়ের লোকেরা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তাহাই তাহাদের লোকাচার বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ লোকাচারের মধ্যে কোথাও কোথাও বিদেশীয়ের অনুকরণ প্রসূত কোথাও বা প্রাদেশিক ব্যবহার জাত কিছু কিছু বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু স্থূলতঃ এবং মূলতঃ সকলই শাস্ত্রাচার, সেই জন্য "দেশাচারোপি শাস্ত্রম্।" শাস্ত্র হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

কেবলং বেদমাশ্রিত্য কঃ করোতি বিনির্ণয়ং।
বলবান্ লৌকিকো বেদাৎ লোকাচারশ্চ কস্ত্যজেৎ॥

আর্য্য শাস্ত্র আদর্শ নির্দ্দেশের দ্বারাই লোকের শিক্ষা সাধন করেন। কেহ আদর্শের অবিকল অনুরূপ না হইলেই একেবারে তাহার প্রত্যাখ্যান করেন না। এই তথ্যের অবগতি হইলে অনেকটা ভ্রম প্রমাদের নিরসন হয় এবং লোকে বহু পরিমাণে আশ্বস্ত এবং শঙ্কাশূন্য হইয়া গন্তব্য পথে স্থিরলক্ষ্য হইয়া চলিতে পারে। যদিও অনেকানেক বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে তথাপি একেবারে শাস্ত্রের ক্রোড়-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি

নাই, হৃদয়ে এরূপ প্রতীতি জন্মিলে সাহসের স্ফূর্ত্তি হয় এবং শাস্ত্রকে সহস্র সহস্র অপরাধের ক্ষমাকারী কৃপালু পিতার অপেক্ষাও অধিকতর করুণাময়রূপে প্রাপ্ত হইয়া সংসারার্ণবে অনেকটা ভীতিশূন্য হওয়া যায়। যিনি আর্য্য শাস্ত্রকে এইরূপ দয়াময় ভাবে প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভক্তি স্থাপন করিবেন তিনি দিন দিন ইহাঁর প্রতিপাদিত বিধিগুলির প্রতিপালনে যত্নবান হইবেন। তিনি দিব্য চক্ষেই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সকল বিধি পালনের ফলে তিনি অশেষ মঙ্গলের আস্পদ হইতেছেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ লঘু এবং পটু হইবে এবং মনোমধ্যে অশান্তিময় তীক্ষ্ণ ভাবের পরিবর্ত্তে শান্তিময় মধুর ভাব উপস্থিত হইবে। তাঁহার ধীরতা, সহিষ্ণুতা এবং বিমৃষ্যকারিতা বর্দ্ধিত হইবে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতে পারিবেন যে তিনি স্বয়ং কোন না কোন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং তাহা জানিয়া প্রত্যেকে সাবধান সতর্ক এবং কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইবেন। প্রতিবেশীদিগের প্রতি তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য বাড়িবে, স্বজাতীয় লোকের মুখাপেক্ষতা সতেজ হইবে এবং সমুদায় সমাজের প্রতি সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে।

শাস্ত্রাচার পালনে যে এই সকল শুভময় ফল ফলে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু ফল প্রাপ্তির জন্য অধীর হইয়া অধিক তাড়াতাড়ি করিলে ফললাভের সম্বন্ধেই ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। তাদৃশ অধীরতায় রজোগুণের এতাদৃশ উৎকট প্রাদুর্ভাব হয় যে তজ্জন্য সাত্ত্বিক ফলের বিকৃতি জন্মিয়া যায়। বিশেষতঃ আচার সম্বন্ধে অভ্যাসের একান্ত প্রয়োজনীয়তা; সুতরাং ব্যস্তভাবে ফলান্বেষী হইলে প্রকৃত অভ্যাসের অবসর হয় না।

কিন্তু শাস্ত্রাচারের গুণ নিজ শরীরাদিতে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার জন্য যদিও কাহার কাহার অভিলাষ হইতে পারে তথাপি উহা

বিচার করিয়া বুঝিতেই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের এক প্রকার সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, আর্য্য শাস্ত্রাচারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং একান্ত সেই আচার বর্জ্জিত ইউরোপীয় জাতীয়েরাই এখন আর্য্যাচার সম্পন্ন লোকদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। আর তাঁহারা নিজেরা অনেকটা শাস্ত্রাচার বিহীন হইয়া মনে করেন যে, তাঁহাদের তেমন কোন অপকর্ষ প্রাপ্তি হয় নাই অতএব তাঁহাদের মতে শাস্ত্রাচার তেমন অতি প্রয়োজনীয় বস্তু নয়।

এই দুইটি কথার উত্তর দান আবশ্যক। প্রথম কথা, আর্য্যাচার বিহীন কোন কোন জাতি আর্য্যাচার সম্পন্ন লোকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট— আমি আদৌ এই কথার যথার্থ্য স্বীকার করি না। আমার বিবেচনায় সকল দিক দেখিয়া বুঝিলে পৃথিবীর কোন জাতিকেই ভারতবাসী আর্য্যদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলা যায় না। আমার বোধে, ধর্ম্ম একটি কাল্পনিক কৃত্রিম বস্তু নয়। মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে, দুষ্টবুদ্ধি কৌরবেরা সাধুশীল পাণ্ডবদিগের অনেক পীড়ন করিয়া পরিশেষে আপনারাই বিনষ্ট হইয়াছিল এবং পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমি ভাবি, যদি তাহা না হইয়া মহাভারতে ইহাই লিখিত হইত যে পাণ্ডবেরা যাবজ্জীবন দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাতবাস করিতে করিতেই মরিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইলেও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের সাধুতার কিছু ত্রুটি হইত না এবং দুর্য্যোধনাদির দুষ্টতার কিছু ন্যূনতা হইত না। সকল দিক দেখিলে অতি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হইবে যে ভারতবাসিগণ পৃথিবীর মধ্যে পাণ্ডব স্থানীয় হইয়া আছেন। ইহাঁরা কষ্ট পাইতেছেন, হয়ত মরিয়া যাইবেন তথাপি সাধু। অতএব ইহলৌকিক ফলাফল দেখিয়াই কে উচ্চ, কে নীচ, কে সাধু, কে অসাধু, কে ভাল, কে মন্দ, তাহার বিচার করা ঠিক নহে। ভারতবাসী আর্য্যের মধ্যে দয়া, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি

সদ্‌গুণ পৃথিবীর অন্য সকল জাতীয় লোকের অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক, এবং ঐ সকল সদ্‌গুণের আধিক্য আর্য্য শাস্ত্রাচারেরই ফল। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রাচার অতি উৎকৃষ্ট বস্তু এবং ইহার পরিত্যাগে আমাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। এখন যে পরিমাণে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রাচারের পরিত্যাগ হইতেছে সেই পরিমাণেই উৎকর্ষের লাঘব এবং অপকর্ষের বৃদ্ধি হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্ত্রাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেহ কেহ ততটা অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, মনে করেন না। যেমন উৎকর্ষও একোদ্যমে হইতে পারে না, তেমনি অপকর্ষও একোদ্যমে হইতে পারে না। আর্য্যাচারপূত পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণে, আর্য্য সমাজের মধ্যে অবস্থিতি নিবন্ধন, আর্য্য গ্রন্থাদি প্রদত্ত উচ্চতম আদর্শের প্রভাবে, আর্য্যাচার ত্যাগের অনেক দোষই তিরোহিত হইয়া থাকে। অপকর্ষের পূর্ণ পরিমাণ প্রথম পুরুষেই দেখা দেয় না।

এই সকল কথা নব্যদলেরও কাহার কাহার মনে লাগিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই সম্যক্‌ মনঃপূত হইবে না। তাঁহারা বলিবেন ভারতবাসীর কি কোন ত্রুটিই নাই এবং যে ত্রুটি আছে তাহা কি শাস্ত্রাচারের অনুশীলনেই মার্জ্জিত হইতে পারে।

এই কথার উত্তরে আমি বলি যে, ভারতবাসীর ত্রুটি আছে, কিন্তু তাহা আচারসম্ভূত নহে। এক্ষণে বক্তব্য এই মাত্র যে, ভারতবাসী শাস্ত্রাচার না মানিয়া চলিলে তাঁহার নিজ সমাজের প্রতি সহানুভূতি আরও ন্যূন হইবে, এবং তাহা হইলেই তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। ধর্ম্মভাব বিনষ্ট হইলে আর কখন কোন ত্রুটির মার্জ্জনা হইবে না—ক্রমে পূর্ণগ্রাস হইয়া যাইবে, মুক্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না।

অতএব আর্য্যশাস্ত্র আদর্শ নির্দ্দেশের দ্বারা সদাচার শিক্ষার সরল উপায় উদ্ভাবনা করিয়া, এবং পৃথিবীর অপর সকল জাতির অপেক্ষা

উৎকৃষ্টতর আদর্শ প্রদান করিয়া, এবং ভারতবাসীর পক্ষে একান্ত উপযোগী হইয়া, এবং নিজ সামাজিক সহানুভূতি রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া, আমাদিগের সকলের প্রেম এবং ভক্তিসহকারে গ্রহণীয়, পালনীয় এবং পূজনীয়।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রকরণের বিষয় নিরূপণ।

নিমিত্ত শব্দের অর্থ হেতু। কোন হেতুর অবলম্বনে বা উদ্দেশ্যে যে সকল অনুষ্ঠান করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা নৈমিত্তিকাচারের অন্তর্গত; অর্থাৎ দৈনন্দিন ভিন্ন যে সকল শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্ম, সময়-বিশেষে অনুষ্ঠেয়, সে গুলিকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা যায়।

নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলির নাম সংস্কার, কতকগুলির নাম পূজা, কতকগুলির নাম ব্রত, কতকগুলির নাম শ্রাদ্ধ এবং কতকগুলির নাম সাধন। সংস্কার কার্য্যগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা আদিষ্ট এবং ঐ গুলিতে বৈদিক মন্ত্রাদির প্রয়োগ থাকে। পূজাগুলিও অধিকাংশ স্মৃতিশাস্ত্রের আদিষ্ট এবং পৌরাণিক মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পাদিত। প্রচলিত ব্রতগুলিও স্মৃতি এবং পুরাণ-মূলক। সাধন কার্য্যগুলি প্রায় সকলই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত। তন্ত্র-শাস্ত্রের উপদিষ্ট কয়েকটী পূজাও এতদ্দেশে প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বকালে বেদ মন্ত্রাদির দ্বারা যে বিবিধ যাগ যজ্ঞ নিষ্পাদিত হইত তাহাদের অনেকগুলিই সাক্ষাৎসম্বন্ধে এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন বিলুপ্ত হইয়াছে যে, বিশিষ্ট যত্ন করিয়াও তাহাদিগের পূর্ব্বরূপে পুনঃ প্রচালনের কোন সম্ভাবনা হয় না। বস্তুতঃ সেগুলি এত অসামান্যিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে যে, তাহাদের পুনরুদ্ধার চেষ্টা অবৈধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন মহাভারতোক্ত রাজা জন্মেজয়ের অনুষ্ঠিত অশ্ব-

মেধ যজ্ঞ সেই রাজার পক্ষে দোষাবহ হইয়াছিল সেইরূপ বঙ্গীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুষ্ঠিত বাজপেয় যজ্ঞ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিত গঙ্গাধরের অনুষ্ঠিত আথর্ব্বণিক অভিচারও অনুষ্ঠাতৃদিগের পক্ষেই হানিকর হইয়াছিল বলিয়া প্রথিত আছে। পুনা প্রদেশে হর্গ্ সাহেব যে বৈদিক সোম যাগের বিধান করিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখ যোগ্যই নহে।

যাহা হউক প্রাচীন বৈদিক যাগযজ্ঞের পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নাই। বেদবিদ্যাই ভূরি পরিমাণে ন্যূন হইয়া গিয়াছে। এখন ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে বেদের পঠন পাঠনাদি হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায় সে সকল স্থানেও সাধারণতঃ বৈদিক মন্ত্রাদির অর্থবোধ এবং অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ার প্রতি তেমন যত্ন হয় না—স্বর সংযোগাদি সহকারে বৈদিক সংহিতাদির কোন কোন অংশ গীত বা পঠিত হয় মাত্র। সম্প্রতি এতদ্দেশ মধ্যে বেদের প্রচার কিছু বাড়িয়াছে বটে। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজের যত্নে বাঙ্গালা ভাষাতেও বেদের ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল চেষ্টার ফলে বেদবিদ্যার বিস্তৃতি হইলেও বৈদিক ক্রিয়া কলাপের যে পুনরুদ্ধার হইবে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যে সুবহু পরিমাণেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে সাগ্নিক ভাবের একান্ত স্বল্পতা হওয়াতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। আহিতাগ্নিকদিগের ক্রিয়াকলাপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখ ছিল। অগ্নির রক্ষাই ত একটী অতি প্রধান অনুষ্ঠান। সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই অগ্নি পূজার প্রয়োজন। অগ্নিই দেবতাদিগের অগ্রণী। অগ্নিই দেবতাদিগের মুখ, সাগ্নিকতার লোপ হওয়াতে অনেকটা অনুকল্পের প্রবেশ হইয়াছে। কিন্তু অনুকল্পের সমধিক প্রবেশে যে মুখ্য ব্যাপারের অনেক ত্রুটি এবং অঙ্গহানি হয়, তাহা স্বীকার করিয়াই মহাকবি ভবভূতির উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়—

কিন্ত্বনুষ্ঠাননিত্যত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যমপকর্ষতি।
শঙ্কটাহাহিতাগ্নীনাং প্রত্যবায়ৈ র্গৃহস্থতা॥

আহিতাগ্নিকদিগের পক্ষে গৃহস্থধর্ম্ম বড়ই শঙ্কটাবহ, কারণ অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব হেতু কিছু মাত্র স্বাতন্ত্র্যের অবলম্বনেই প্রত্যবায় জন্মিয়া অপকর্ষতা সাধন করে।

অতএব সাগ্নিকদিগের পক্ষে অনুষ্ঠের নিত্য এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিশেষ আধিক্যই ছিল। তদ্ভিন্ন যে সকল বৈদিক ক্রিয়া এখনও প্রচলিত আছে তাহার মধ্যেও অনেকানেক স্থলে সাগ্নিকদিগের সম্বন্ধে সাধারণ অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রোচ্চারণের অতিরিক্ত অপর কতকগুলি কার্য্য অনুষ্ঠেয় এবং অপর কতকগুলি মন্ত্র পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, দেখা যায়। সুতরাং সাগ্নিকতায় ক্রিয়ার আধিক্য এবং নিরগ্নিকতায় ক্রিয়ার ন্যূনতা সহজেই উপলব্ধ হয়।

সাগ্নিকতার ন্যূনতায় যেমন বৈদিক কর্ম্মের খর্ব্বতা প্রতীত হয়, বেদের শাখা লোপে সে প্রতীতি আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে। চারিটী বেদের শাখা সমষ্টি ১১৩০ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সামবেদের শাখা এক হাজার কিন্তু সেই হাজারের মধ্যে তিনটী শাখা * বই বর্ত্তমান নাই। যজুর্ব্বেদের শাখা এক শত, তাহার পাঁচটি মাত্র বিদ্যমান আছে শুনা যায়। ঋগ্বেদের শাখা একবিংশতি, তাহার আটটী মাত্র আছে, এবং অথর্ব্ববেদের শাখা নয়টী, তাহার একটীও বিদ্যমান নাই। অতএব বেদশাখা ১১৩০ এর মধ্যে বর্ত্তমান ২৬টী মাত্র! বিভিন্ন বৈদিক শাখার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন ছিল। সুতরাং এত গুলি শাখার লোপে অর্থাৎ পরস্পর অন্তর্নিবেশে অনেক ক্রিয়াই লোপ

* (১) কৌথুমী—গুর্জ্জর এবং বঙ্গে।
(২) জৈমিনী—কর্ণাটে।
(৩) নারায়ণী—মহারাষ্ট্রে।

হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে * কিন্তু বেদবিদ্যার ন্যূনতা এবং সাগ্নিকতার খর্ব্বতা এবং বেদ শাখার বিলোপ হইলেও আর্য্যকৃত্যের সারভূত সংস্কার যে কার্য্যগুলি সেই প্রাচীন কালে অনুষ্ঠিত হইত, তাহারা এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং সেগুলির অনুষ্ঠান সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপক হইয়াই আছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে যে সকল বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, এ প্রবন্ধে সে সকলের কথা কিছুই বলা যাইতে পারিবে না। কিন্তু বৈদিক-কার্য্যের মধ্যে প্রধান প্রধান সংস্কার কার্য্যগুলি এই প্রকরণের বর্ণনীয় হইবে।

বেদবিদ্যার এবং বৈদিক ক্রিয়ার যে পরিমাণে লোপ হইয়া গিয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রের লোপ সে পরিমাণে হয় নাই। বিংশতি মূল স্মৃতিগ্রন্থ সকলই পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন শ্রুতির সহিত স্মৃতির সম্মিলনকারী কয়েকটী 'সূত্রগ্রন্থ'ও বর্ত্তমান আছে। আর আর্য্য ক্রিয়া সকলের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে উপদেশ দিবার উপযোগী বিভিন্নবেদী ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার্য্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রন্থও আছে।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক শাস্ত্রসমূহের বিলোপ হইয়া গেলে কোন স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মনে করা একটি প্রকাণ্ড ভ্রম। বেদমূল হইতেই স্মৃতির উদ্গম। শ্রুতি ছাড়া স্মৃতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াগুলিও বেদোক্ত ক্রিয়া হইতে উদ্গত। কখন কোন দেশে কোন কালে এক প্রকার ধর্ম্মক্রিয়ার সম্যক্ বিলোপ হইয়া কোন নূতন প্রণালীর ক্রিয়াকাণ্ডের আবির্ভাব হয় নাই। এমন কি, যেখানে একেবারে লোকের পূর্ব্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, সে সকল দেশেও ওরূপ হয় নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের কর্ত্তৃক পরিগৃহীত অনেকানেক পূর্ব্ব প্রাচীন

* কৌলক চরণব্যূহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রোমীয়দিগের পর্ব্বাদির অনুসরণসঞ্জাত। আরবে মুসলমানেরা শুদ্ধ কাবা মসজিদটীর গৌরব রক্ষা করিয়াই যে আরবের প্রাচীন তীর্থাদির মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন এমত নহে, এক্ষণকার রমজানাদি ব্রতোপবাস মহম্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপার। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মে এবং চীনে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা দেশ ছাড়া হইয়াও এ দেশের পর্ব্বগুলি সমুদায় ছাড়িতে পারে নাই। যখন ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকাণ্ডের আয়ুষ্মত্তা সর্ব্বত্রেই এত দৃঢ় তখন কি কেবল ভারতবর্ষেই উহাদিগের এত ক্ষীণ জীবন হইয়াছিল যে, এখানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে উঠিয়া গিয়া নূতনবিধ স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান হইয়াছে? তাহা নয়। নব্য সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ভক্ত বৈদিকবর্গের হঠবাদ শ্রদ্ধার বস্তু নহে। স্মার্ত্তক্রিয়াগুলি বৈদিক ক্রিয়া হইতেই উঠিয়াছে—উহারা মূল বেদ বৃক্ষেরই তেউড়ের স্বরূপ। স্মৃতির প্রামাণ্য ভট্টকারিকায় উক্ত হইয়াছে—

বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমাণত্বাৎ তৎপরিগ্রহদার্ঢ্যতঃ।
সংভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং বেদমূলতা॥

বেদজ্ঞদিগের দ্বারা স্মর্য্যমাণতা এবং বেদোক্ত কার্য্যের দৃঢ়তার সাধকতা এবং বেদমূলতার সম্ভাবনা বোধ হেতু স্মৃতি শাস্ত্রের বেদমূলতা প্রমাণ হয়।

পুরাণশাস্ত্রও অধিকাংশ জীবিত আছে, বলা যায়। অষ্টাদশ খানি পুরাণের শ্লোকসমষ্টি চারি লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যদিও তৎসমুদায় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তথাপি অধিকাংশই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পুরাণোক্ত ক্রিয়াকলাপও যে বেদমূলের বহির্ভূত নয়, স্মার্ত্তক্রিয়াসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে অনুভূত হইবে. আর পুরাণের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও জানা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে বুঝা যায় যে, ব্যাসদেবের আটাইশটি নাম অর্থাৎ আটাইশ জন ঋষি ব্যাসোপাধিদ্বারা প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা

সকলেই বেদার্থ প্রকাশের জন্য পুরাণের সৃষ্টি করেন। অতএব পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপকেও বেদমূলক বলিতে হয়। পুরাণের প্রমাণস্বরূপ মৎস্য পুরাণের এই বচনটী গ্রহণ করা যাইতে পারে—

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরং॥

সকল শাস্ত্রের আদিতে ব্রহ্মা পুরাণশাস্ত্রের স্মরণ করেন। ইহা বেদময় পবিত্র এবং শতকোটি বিস্তর।

বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের পরস্পর বিভেদ এবং অভেদ কিরূপ তাহা একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তনীয়। বেদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, বিরাট শরীরের নিশ্বাস * স্বরূপ যে মৌলিক সত্যসমূহ তাহা বিভিন্ন ঋষিগণ কর্তৃক অগ্নিতে, জলেতে, আকাশে, বায়ুতে, প্রাণীতে এবং ঐতিহাসিক ব্যাপারসমূহে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং লোকব্যবহারে, মন্ত্রস্বরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ মন্ত্র সমষ্টি বেদের মুখ্যতম ভাগ। কোন্ সময়ে বা কাহার কর্তৃক ঐ মন্ত্রসমূহের সংগ্রহ বা সমষ্টি প্রস্তুত হয় তাহার কোন বিবরণ নাই। এই মাত্র কথিত আছে যে, সমুদায় মন্ত্রের এবং তাহাদিগের প্রয়োগের সম্যক্ অভ্যাস এক একটী ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে দেখিয়া ভগবান ব্যাসদেব বেদমন্ত্র সমষ্টির চারি ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন। ব্যাসশিষ্যেরা আবার নিজ শিষ্যদিগের মধ্যে ঐ চারি ভাগের শাখা ভেদ করিয়া শিক্ষা করাইয়াছিলেন। অতএব বেদগুলি যদিও বিভিন্ন শাখায় বিভাজিত হইয়া পরস্পর অবান্তর ভেদ-বিশিষ্ট হইয়াছে তথাপি মূলতঃ এক এবং অভিন্ন।

---

*অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ।

বেদের এই স্বতঃ প্রমাণাত্মক ভাবটী বুঝিতে পারিলে বাহ্যবিজ্ঞানাদির সহিত বেদের বিরোধ হইতে পারে না তাহা স্বতঃসিদ্ধ হয়। এই জন্যই দার্শনিকেরা কেহ কেহ ঈশ্বর-পুরুষ স্বীকার না করিয়াও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারিয়াছেন।

স্মৃতির একতা সম্বন্ধেও অবিকল ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত হয়। স্মৃতি-সংহিতাগুলি যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিবদ্ধ হইয়াছিল তথাপি তাহারা সকলেই শ্রুতিমূলক বলিয়া একই প্রণালীতে নিবদ্ধ এবং একই লক্ষ্যের উদ্দেশে পরিচালিত। তদ্ভিন্ন তাহারা সকলেই একমাত্র মনুসংহিতার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রাধান্য স্বীকার করায় কখনই কার্য্যতঃ বিভিন্ন মত হইতে পারে না।

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

মনুসংহিতার বিপরীতার্থ বোধক স্মৃতি প্রশস্ত নহে। পুরাণদিগের মধ্যে যে আখ্যায়িকার ভেদ, নামাদির ভেদ, অথবা স্থূল দৃষ্টিতে মতেরও ভেদ দেখা যায়, বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিলে ঐ গুলি তেমন মারাত্মকভেদ বলিয়া বোধ হইবে না। আখ্যান, উপাখ্যান এবং কল্পশুদ্ধি নামক পুরাণের ত্রিবিধ উপাদান। তাহার মধ্যে উপাখ্যান ভাগ লোকপরম্পরা বিশ্রুত বিবরণ মাত্র, সুতরাং তাহা প্রদেশভেদে, কালভেদে এবং ব্যক্তি ভেদে অবশ্যই ভিন্ন হইবে—উহারা ভিন্ন না হইলেই কথঞ্চিৎ সন্দেহের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত। অতএব পুরাণ অনেক হইয়াও এক।

এইরূপে অনেকত্বের মধ্যে একত্বদর্শনই আর্য্যজাতির শাস্ত্রসিদ্ধ এবং স্বভাবসিদ্ধ এবং তাহাই অতি বিশদ করিয়া প্রদর্শনের জন্যই যেন উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ঋষিরা বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা স্থূলতঃ তাঁহারাই স্মৃতিসংহিতাকার এবং প্রায়শঃ তাঁহারাই ব্যাসরূপে পুরাণরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এরূপ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, বৈদিক এবং স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বিধি ব্যবস্থাকে পরস্পর অনুস্যূত এবং মূলতঃ অভিন্ন বলিয়াই ভাবিতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের এবং ধর্ম্মসাধনের সকল উপদেশই এই অভেদ জ্ঞানের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার-বিহিতং কর্ম্ম কেবলং।
সেবিতব্যঞ্চ তুর্ব্বৈর্বিদ্ভিঃ কেশবং সদা॥

চতুর্বর্ণের মধ্যে সদাচার ঈশ্বরসেবাপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই শ্রুতি স্মৃতি এবং সদাচার বিহিত সকল আচারই পালন করিবেন।

ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত আদেশ। এই আদেশের অনুগামী হইয়া চলিলে কোন প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ বিদ্যমান আছে মনে করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হয়েন সেই হঠকারীদিগের আশু প্রতিবোধের নিমিত্তও উপায় উদ্ভাবিত আছে। মনু বলিয়া দিয়াছেন যে, বিদ্বান্ এবং সদাচার এবং রাগ বিদ্বেষ বিরহিত মহাত্মাদিগের স্থানে শুনিয়া এবং তাঁহাদিগের আচার দেখিয়া আচরণ করিবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে. সমীপবর্ত্তী সদ্ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবে *। মহাভারতে ভগবান বেদব্যাস ও শাস্ত্রাদির মধ্যে মতভেদ আছে, যুধিষ্ঠিরের মুখদ্বারা ইহা যেন স্বীকার করিয়াই সাধারণ জনগণের পক্ষে ধর্ম্ম মীমাংসার চরম উপায় যে, মহাত্মাদিগের পথানুসরণ তাহা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যদ্বারা সুব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। অতএব নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বাক্য এই যে, যদিও শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও কোথাও মতভেদ এবং বিবরণভেদ স্থূল দৃষ্টিতে লক্ষিত হয় তথাপি বিদ্যা এবং সাধুতা সম্পন্ন মহাজনেরা মীমাংসা পূর্ব্বক শাস্ত্রের যথার্থ সূক্ষ্মতাৎপর্য্য বুঝিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত করিয়া চলিতে পারেন।

কিন্তু বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণ সকলে একবাক্য হইয়া এই তথ্যের অভিব্যক্তি করিলেও নব্যসম্প্রদায়ের বুদ্ধি এমনই বিপথগামী হইয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিবেন না—ধর্ম্মবিচারে

---

* অথ যদি তে ধর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা স্যাৎ যে তত্র ব্রাহ্মণা সমাগদর্শিনঃ যুক্তা আযুক্তা অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃস্যুঃ যথাতে তত্র বর্ত্তেরন্ তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ।

আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী হইয়া চলিবেন, কাহার পরামর্শ লইবেন না এবং কোন শাসন মানিবেন না। সামান্য বিষয় সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া ব্যবহারাজীবদিগের স্থানে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং শরীর রক্ষার্থ ডাক্তার ডাকিয়া ডাক্তারি ঔষধ সেবন-রূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, কিন্তু বিষয়সম্পত্তি হইতে সহস্রগুণে মহামূল্য এবং নশ্বর পুরুষশরীর হইতেও সহস্রগুণে প্রিয়তর যে ধর্ম্ম পদার্থ তাহাতে যথেচ্ছাচার করিবেন। আপন এবং চিকিৎসার অপেক্ষা ধর্ম্ম বস্তুটী যে কত উচ্চতম এবং কঠিনতম তাহার ইয়ত্তা হয় না। ধর্ম্মের কঠিনতা সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গংপথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥

কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের মতে ধর্ম্মতত্ত্বের আবিষ্কার অতি অনায়াসসাধ্য সহজ ব্যাপার হইয়াই দাঁড়াইয়াছে!

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ধর্ম্মপথ স্থির করা এতই কঠিন, তবে ধর্ম্মবিষয়েই ইংরাজী শিক্ষিত লোকে এত স্বেচ্ছাচারী হইতে চায় কেন এবং হয়ই বা কেন? এ কথার সম্পূর্ণ প্রত্যুত্তর দিতে হইলে যে নানা বিষয় লইয়া বিচার করিতে হয় তাহা এস্থলের অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে; এই জন্য শুদ্ধ ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় যে ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া আছেন, তাহারই আংশিক উল্লেখ করিয়া নিবৃত্ত হইব। ইংরাজী শিক্ষায় ধর্ম্মের প্রকৃতি সুপরিস্ফুট হয় না। ইউরোপীয় সাহিত্যের মূলে যে কিছু ধর্ম্মভাব আছে তাহা প্রায় সমস্তই খৃষ্টীয় উক্তি কতিপয় হইতে উদ্গত। ঐ উক্তির একটি এই যে, ঈশ্বর অনন্তকালের জন্য পাপীদিগকে নরকে প্রেরণ করেন এবং পুণ্যবানদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়া দেন। এই উক্তির যৌক্তিকতার বিচার হইবার অবসর হয় না। উহা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক ইংরাজী পুস্তক পাঠের সহিত ক্রমে ক্রমে মনোমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া গিয়া তদন-

স্তর অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর ন্যায় একটি বিচার প্রণালীর উদ্ভাবন করে। সে বিচারটী এইরূপ—ঈশ্বর স্বেচ্ছাতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সৃষ্ট হইতে চাহি নাই, অথচ আমাদিগের এক প্রকার কার্য্যের জন্য অনন্ত কালের নিমিত্ত নিরয়গামী করিবেন, আর অন্য প্রকার কার্য্যের জন্য অনন্তকালের নিমিত্ত স্বর্গ প্রদান করিবেন। এমন স্থলে, কেমন কার্য্যের জন্য নরকের এবং কেমন কার্য্যের জন্য স্বর্গের বিধান হইবে, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়াই নির্দ্দেশ করা উচিত। ঈশ্বর অবশ্যই সেই উচিত কার্য্যটী করিয়াছেন। অতএব আমরা অবশ্যই অতি অক্লেশে এবং বিনা উপদেশে পাপপুণ্যের ভেদ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়া আছি। কি পাপ এবং কি পুণ্য ইহা জানিবার জন্য কাহারও উপাসনা বা কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল বিচার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বিচারে একান্ত নিরঙ্কুশ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা ভাবেন, ধর্ম্মের বিচার দুরূহ হইলে চলিবে কেন? এই মহান্ অতথ্য বোধটী তাঁহাদের হৃদয়ে তথ্যরূপে বিরাজিত হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের কাঠিন্য অনুভব করিতে চাহেন না এবং শিক্ষাদাতৃত্ব স্বরূপ ধর্ম্মের যে সুমহান্ ভাব তাহাও বুঝিতে পারেন না।

ইংরাজীতে কৃতবিদ্য অতি শিষ্ট যুবাদিগেরও অবস্থা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত প্রকৃত বিবরণটী হইতে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। একটী কৃতবিদ্য সাধুশীল যুবা পুরুষ কখন কখন অবিমৃষ্যকারিতা এবং পরুষ ব্যবহার দোষে দূষিত হইতেন। ওরূপ করায় যে দোষ হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইলে তিনি অতি সরল ভাবেই বলিলেন—"আমি সদ্বংশজাত, সৎশিক্ষা প্রাপ্ত এবং সদাশয় ব্যক্তি বলিয়াই আপনাকে জানি, সুতরাং আমার কৃত কার্য্য যে সৎ বই অসৎ হইতে পারে তাহা কখন মনেও করিতাম না—যাহা মনে আসিত অমনি

তাহাই করিতাম। এখন বুঝিলাম। এখন বুঝিলাম যে, শুদ্ধ সংস্কার অথবা ভাব মাত্রের বেগে চালিত হইলে পদে পদে পদস্খলন হয়—প্রকৃত ধর্ম্ম পথে যাইতে হইলে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিতে হয় এবং গুরুর ও গুরুকল্প শাস্ত্রের হাত ধরিয়াই যাইতে হয়।" যদি কখন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোমধ্যে সাধারণতঃ এই ভাব জন্মে তাহা হইলেই তাঁহারা প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিবেন এবং শাস্ত্রাদির ক্রিয়াকলাপের সমাদর এবং গৌরব করিতেও শিখিবেন।

কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে কেবল নব্য সম্প্রদায়ের মনেই গোলযোগ উপস্থিত হইয়া আছে, এমত নহে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে, শাস্ত্রে অভেদ বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহাও বলা যায় না। সাম্প্রদায়িক ভেদ জ্ঞান এবং স্বার্থানুসরণ প্রবণতা এক্ষণে বড়ই প্রবল হইয়াছে। অমুক স্মৃতি কিছু নয়, অমুক পুরাণ কিছু নয়, অমুক দেবতার উপাসনায় মুক্তিলাভ হয় না, অমুক ব্রতের ফল ইহলোকেই পর্য্যবসিত হয়—এইরূপ কথা সকল প্রাচীন সম্প্রদায়ের মুখে মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের পরস্পর মনান্তরতা, বিদ্বেষ এবং অনিষ্ট চেষ্টাও উপস্থিত হইয়া এই হীনাবস্থ সমাজকে অন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন করিয়া হীনতর করিতেছে, দেখা যায়। কিন্তু এখন আর হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিবার সময় নাই—এখন আমাদের সাধারণ বিদ্বেষ্টা অনেক উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের প্রবোধ দিবার জন্য আপনাদিগের সকলকে এক হইয়া চলিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদিগের পরস্পর ভেদ অতি অল্প। প্রকৃত বোদ্ধার চক্ষে কিছু মাত্র নাই বলিলেই হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবশতঃ যে কেহ কোন শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন না, ইহা উচিত নহে। শাস্ত্রীয় সকল কার্য্যই তদধিকারী মাত্রেরই করণীয়।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে আর এক প্রকার মতভেদের উল্লেখ হইয়া থাকে। যুগভেদে ক্রিয়ার ভেদ হয়।

ধ্যানং পরংকৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধ্বরঃ।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু র্দানমেকং কলৌযুগে॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতঃ ফলং।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

উভয় শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সত্যযুগে ধ্যানের প্রাধান্য, ত্রেতায় জ্ঞান এবং যজ্ঞের প্রাধান্য, দ্বাপরে সেবার এবং যজ্ঞের প্রাধান্য এবং কলিযুগে দান ধর্ম্মের এবং হরি সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য। এইরূপে বিভিন্ন যুগে কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ইহাই উক্ত হইয়াছে। এই কলি যুগে দান এবং কীর্ত্তন ভিন্ন অপর কোন ক্রিয়া করণীয় নহে, শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নয়।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ যাঁহারা সংসারবিরাগী, ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহাদের আর একটী ভ্রম হইয়া থাকে। জ্ঞানকাণ্ডে শাস্ত্রে কর্ম্মের হেয়তা দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, কর্ম্মকাণ্ডটা সমস্তই অপকর্ষ সাধক। শুদ্ধ ভক্তি অথবা জ্ঞানের সাধনই মুক্তির উপায়। কিন্তু গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে এই ভ্রমের নিরসন করা হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগ অর্থে কর্ম্মের স্বরূপ ত্যাগ নহে, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ মাত্র।

যজ্ঞোদানং তপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।

যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম কদাপি ত্যাজ্য নহে। সেগুলি অবশ্য করণীয়।

শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যতগুলি প্রভেদের উল্লেখ করা হইল তাহা কি নব্যসম্প্রদায়ের হঠকারিতামূলক, কি প্রাচীন সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভেদবুদ্ধিমূলক, কি শাস্ত্রার্থ বোধে অসামর্থ্যমূলক, সকলগুলিই অকিঞ্চিৎকর এবং অনিষ্টকর। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রভেদ সম্বন্ধে সেরূপ বলা যায় না। এ ভেদটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণাত্মকতা হইতেই জন্মে, সুতরাং এক প্রকার অপরিহার্য্য এবং অনিবার্য্য। কি বেদ, কি

স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কেহই সাত্ত্বিক রাজস এবং তামস ভেদশূন্য নহে। বেদের মধ্যে কোন বেদ সাত্ত্বিক, স্মৃতির মধ্যে কোন স্মৃতি সাত্ত্বিক এবং পুরাণের মধ্যে কোন পুরাণ সাত্ত্বিক। এইরূপ উহাদিগেরও রাজস এবং তামস ভেদ আছে।

যখন শাস্ত্রেই এইরূপ ভেদ আছে, তখন শাস্ত্রাদিষ্ট ক্রিয়াদিগের মধ্যেও যে ঐ প্রকার ভেদ আছে তাহা বলা বাহুল্য। কোন ক্রিয়া সাত্ত্বিক, কোন ক্রিয়া রাজস এবং কোন ক্রিয়া তামস; আর মনুষ্যের স্বভাবেও সাত্ত্বিক, রাজস, তামসভেদ আছে। অতএব কোন ব্যক্তি যে কোন শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রতি অধিক অনুরক্ত এবং অপর ক্রিয়ার প্রতি অল্প অনুরক্ত হইবেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। যিনি যে স্বভাবের লোক তিনি আপন স্বভাবানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী হইবেন। সাত্ত্বিক পুরুষ সাত্ত্বিক ক্রিয়া ভাল বাসিবেন, রাজস পুরুষ রাজস কার্য্য ভাল বাসিবেন এবং তামস পুরুষের তামস ক্রিয়াতেই প্রীতি জন্মিবে।

উল্লিখিত নৈসর্গিক ভেদ সম্বন্ধেও বলা যায় যে, রাজস এবং তামস ক্রিয়াগুলিতে সামান্য স্বার্থসিদ্ধির উপায় থাকে। এই জন্য রাজস এবং তামস ক্রিয়া মাত্রেই কাম্যক্রিয়া হয়। সুতরাং যদি কাম্যক্রিয়ার পরিহার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ রাজস এবং তামস ক্রিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে।

বস্তুতঃ নৈমিত্তিক কর্ম্ম দুই প্রকার। এক, নিত্য নৈমিত্তিক; অপর, কাম্য-নৈমিত্তিক। নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অকরণে দোষ হয়, কাম্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অকরণে প্রত্যবায় হয় না। এই প্রকরণে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ারই সংক্ষেপ বিবৃতি হইবে। কাম্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি নর নারীগণের বাসনার ন্যায় অতি বিচিত্র এবং বহু পল্লবিত। উহারা নিকৃষ্ট অধিকারীদিগকে সংযমাদি শিখাইয়া এবং তাহাদের চিত্তশুদ্ধি বিধান করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে। কিন্তু উহারা

উচ্চাধিকারীদিগের বিষয় হয় না এবং শাস্ত্রেও উহাদিগের তাদৃশ গৌরব প্রখ্যাপিত নাই। সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী ব্রাহ্মণেরা ও ঐ সকল কাম্যকর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি জানিতাম তাদৃশ কোন মহাপুরুষের একমাত্র পুত্রের অতি কঠিন পীড়ায় তাহার আরোগ্য বিধানার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি তদনুষ্ঠানে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—" দেবতাকে ডাক্তার বৈদ্যের কার্য্য করিবার নিমিত্ত আবাহন করিতে পারি না। এরূপ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে দেবতার নিকট সাহায্য পাইবার প্রার্থনা, অথবা দেশের জলকষ্ট বা অন্নকষ্ট নিবারণের প্রার্থনা, অথবা মারীভয় নিবারণের প্রার্থনা, প্রত্যুত কোন প্রকার কামনা পূরণের প্রার্থনাই উচিত বা প্রশংসনীয় নহে। তাঁহারা কোন বাসনা প্রণোদিত হইয়া দেবার্চ্চনা অথবা ব্রত সাধনের অনুকূল নহেন। আর্য্যশাস্ত্রেরও অভিমতি ঐরূপ। পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল প্রতাপান্বিত দৈত্য, দানব, অসুর রাক্ষসাদির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই কেহ বা রজোগুণের কেহ বা তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার স্থানে বরপ্রাপ্ত কাম্যসাধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, একটীও সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতার নিষ্কাম উপাসক বলিয়া বর্ণিত নহে। কিন্তু তাদৃশ উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা, ফলশ্রুতি বা অর্থবাদ প্রাকৃত জনগণের ক্রিয়া কাণ্ডে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্তই উল্লিখিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, নিতান্ত অল্পবুদ্ধি এবং পরোক্ষদৃষ্টিবিহীন জনগণের পক্ষে বিস্পষ্ট অধর্ম্মাচরণ দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভের চেষ্টা করা অপেক্ষা দেবোদ্দেশে কার্য্য সাধন করা বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট। লুট-পাট এবং চুরি ডাকাইতি করিয়া ধন লাভের চেষ্টা অপেক্ষা যোগিনী সাধনদ্বারা ধনী হইবার চেষ্টা অনেকাংশে ভাল। সাধারণতঃ গৃহস্থের পক্ষে পরোপকারাদিরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যসাধনমূলক কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন দোষ হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। কিন্তু উচ্চাধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রাদিষ্ট পথে শাস্ত্রাদিষ্টকালে শাস্ত্রাদিষ্ট কার্য্যানুষ্ঠান করা অর্থাৎ বিধি

প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম্য কার্য্য। কামনাসিদ্ধির জন্য মানুষিক যত্ন করিয়াই নিবৃত্ত হওয়া উচিত। তজ্জন্য দৈবীশক্তির চালন চেষ্টা অবৈধ এবং অপকর্ষ সাধক।

পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি সকলের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভাক্ত বৈদিকতার এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অনুবর্ত্তন পরিহারপূর্ব্বক কামনাশূন্য হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক ক্রিয়া দেশে প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠান যথাশক্তি করা আবশ্যক।

ফলকথা, উহারা মূল বৈদিক ক্রিয়াগুলিরই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঐগুলি কোন না কোনরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সার্ব্বভৌমিক লক্ষণে লক্ষিত এবং আর্য্য মতবাদের ভিত্তিকল্প যে সর্ব্বেশ্বর প্রতীতি তাহাতেই ঘনিষ্ঠরূপে সংসৃষ্ট। অতএব প্রচলিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিকে এই প্রকরণের মধ্যে স্থান দেওয়া হইবে।

সাধন—মুখ্যতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের বিষয়। মূলতন্ত্র সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃষষ্টি এবং সেই চতুঃষষ্টি তন্ত্রের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন তন্ত্রেরই সম্যক্ লোপ হয় নাই তবে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় এমত প্রচলিত তন্ত্রের সংখ্যা চতুর্বিংশতির অধিক হইবে, বোধ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রটী বঙ্গদেশেরই বিশেষ আদরের বস্তু। ইহাতে বঙ্গাক্ষরের রূপ নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহার পবিত্রতা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ইহাতে অথর্ব্ববেদভাগের অভিচার ষট্কর্ম্মরূপে পরিণত, যোগশাস্ত্রের হঠ এবং রাজ উভয়বিধ যোগ সম্যক্ প্রকারে বিস্তৃত এবং সাঙ্খ্য ও বেদান্ত উভয় দর্শন মীমাংসিত এবং পবিত্রভাবে মিলিত হওয়াতে তন্ত্রশাস্ত্র যে অতি কঠিন হইয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এই শাস্ত্র প্রকৃতরূপে শিক্ষিত এবং যথাযথ সমাচরিত হইলে শরীরের পটুতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং ইচ্ছা শক্তির তেজস্বিতা এরূপে সম্বর্দ্ধিত হয় যে, মনুষ্য হৃদয়ে পশুভাব সর্ব্বতোভাবে বিগত এবং বীর ও দিব্যভাবের অধিষ্ঠান হইয়া উঠে। এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

শ্রুতি স্মৃতিবিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রয়ে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥

উল্লিখিত শ্লোকটী হইতে কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী পূজার প্রাধান্য বুঝিতে হয় মাত্র। ইহার দ্বারা স্মৃত্যুক্তাদি বিধানের নিষেধ বুঝায় না। তন্ত্রে পারিভাষিক শব্দের একান্ত বাহুল্য নিবন্ধন ইহা অত্যন্ত দুরূহ, দুর্জ্ঞেয়, এবং গুরূপদেশসাপেক্ষ। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং প্রয়োগাদি প্রতি ব্যক্তিকে নিজ নিজ গুরুর স্থানে শিক্ষা করিতে হয়। ইহার সাধন প্রণালীও অতি গুহ্য—সাধারণতঃ প্রকাশ্য নয়। এজন্য এই প্রকরণে তান্ত্রিক সাধন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা যাইতে পারিবে না।



নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সংস্কার—গর্ভসংস্কার।

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

একখানি ছবি যেমন চিত্রকরের তুলিকার পৌনঃপুনিকস্পর্শে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমন্বিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তেমনি বিধিপূর্ব্বক সংস্কারকর্ম্মের ভূয়ঃ প্রয়োগে ব্রাহ্মণ্য গুণের পূর্ণ উন্মেষ হয়।

দৃষ্টান্তটী অতি সুন্দর! চিত্রকর তাহার মনোগত আদর্শটী প্রথমে স্থূলভাবে অঙ্কন করে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সেই চিত্রের উপর যেমন আপনার তুলিকার চালনা করিতে থাকে, অমনি তাহার হৃদয়গত আদর্শটি অল্পে অল্পে সুব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ।
সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে॥"

জন্মদ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কার দ্বারাই [আর্য্যশাস্ত্রের আদর্শীভূত] দ্বিজ হয়।

সংস্কার কার্য্য সামান্যতঃ দশবিধ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—যথা (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন, (১০) বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী শৈশবাবস্থার সংস্কার; তৃতীয় দুইটী কিশোরাবস্থার সংস্কার এবং চতুর্থ দুইটী যৌবনাবস্থার সংস্কার। অতএব প্রসিদ্ধ দশবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রৌঢ়াবস্থার

এবং বৃদ্ধাবস্থার সংস্কারের কোন উল্লেখই নাই। বস্তুতঃ প্রৌঢ়াবস্থাদির আচরণীয় অপর আটত্রিশটী অনুষ্ঠান আছে।* সেগুলি যদিও কখন কখন সংস্কার নামে উক্ত হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা যাগ কিম্বা পূজা অথবা ব্রত নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। অতএব সেগুলির কোন কথা এস্থলে উত্থাপন করা যাইবে না। এখানে সংস্কার বলিতে পূর্ব্বোল্লিখিত দশবিধ অনুষ্ঠানই বুঝা যাইবে।

ঐ দশবিধ অনুষ্ঠান এখনও এতদ্দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু রাজধানী অঞ্চলে বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে এবং সংস্রবদোষে এবং রজোগুণের আধিক্যে এবং ঐহিকতার আতিশয্যে ক্রমশঃ প্রথম চারিটির প্রচলন অনেক ন্যূন হইয়া গিয়াছে; পঞ্চম এবং ষষ্ঠটী সম্মিলিত হইয়া দুইটিতে একটীর ন্যায় হইয়াছে; এবং সপ্তম, অষ্টম ও নবম মিশ্রিতপ্রায় হইয়া একোদ্যমে সাধিত হইতেছে। দশমটী অক্ষুণ্ণপ্রায় রহিয়াছে। সংস্কার কার্য্যগুলি স্থলবিশেষে এইরূপে বিকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও কোথাও লুপ্ত হয় নাই। আমার বিবেচনায় সংস্কার কার্য্যগুলির লোপ হওয়া ভাল নয়। আর্য্যশাস্ত্রকে আর্য্যশরীরে আর্য্যগুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া আর্য্যের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত দশবিধ সংস্কার শুদ্ধ ব্রাহ্মণের নয়, কেবল দ্বিজাতীয়েরও নয়, শূদ্রদিগেরও, উপনয়ন ভিন্ন অপর নয়টীতে,

* বেদব্রত	৪টী
পঞ্চ যজ্ঞ	৫টী
পাক যজ্ঞ	৭টী
হবির্যজ্ঞ	৭টী
সোমযজ্ঞ	৭টী
	৩০

গুণ ৮টী যথা—(১) দয়া, (২) ক্ষান্তি, (৩) অনসূয়া, ৪) শৌচ, (৫) অনায়াস, (৬) সুমঙ্গল, (৭) অকার্পণ্য, (৮) অস্পৃহা।

সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শূদ্রকৃত্যে বৈদিক মন্ত্রগুলি পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণের দ্বারা পঠিত হইবে মাত্র। সংস্কারকার্য্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই কয়েকটী পূর্ব্বাভাস প্রদত্ত হইল। এক্ষণে তাহার একটী বিশেষ অনুষ্ঠানের সংক্ষেপে বিবৃতি করা যাইবে।

(১) গর্ভাধান—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সংস্কারকার্য্যের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্য গুণের আধান। সেই উচ্চতম উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে আর্য্যশাস্ত্র বেদমূল হইতে অর্থাৎ গভীরতম বিজ্ঞানমূল হইতে অবধারণ করিলেন যে, পিতৃ মাতৃ শরীরে দোষ থাকিলে তাহা সন্তানে সংক্রামিত হয়। এই প্রকৃত তথ্যের অবধারণ করিয়া গর্ভাধান এবং গর্ভগ্রহণযোগ্যতা এবং তদুপযোগী কাল নির্ণয় পূর্ব্বক সন্তান জনন সময়েও পিতামাতার মন যাহাতে একান্ত পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরবশ না হইয়া পবিত্র সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয় আর্য্যশাস্ত্র তজ্জন্য গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গর্ভাধানকালে পতি পত্নীকে কয়েকটী মন্ত্রার্থজ্ঞাপন করিবেন, যথা—

[পরম ব্যাপক] বিষ্ণু গর্ভগ্রহণের স্থান দান করুন, [দেব শিল্পী] ত্বষ্টা রূপের সম্মিশ্রণ করুন, [অব্যর্থ সেক] প্রজাপতি সিঞ্চন করুন এবং [সৃষ্টিকর্ত্তা] বিধাতা তোমার গর্ভের সংগঠন করুন [চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যার চন্দ্রকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী] সিনীবালী তোমার গর্ভাধান করুন [প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী] সরস্বতী দেবী তোমার গর্ভধান করুন, প্রস্ফুটিত পদ্ম মালাধারী অশ্বিনীকুমার [যাঁহাদের অধিষ্ঠানে সঞ্জাত সন্তান সর্ব্বদা দেবতাদিগের দ্বারা অভ্যুদিত, স্বভাবতঃ বিনীত, সত্ত্বগুণযুত, সম্পদান্বিত, স্ত্রীদিগের বিভূষণ স্বরূপ এবং আত্মানন্দ বিশিষ্ট হয়] সেই দেবতাদ্বয় তোমার গর্ভাধান করুন।" *

এইরূপ উন্নত, পবিত্র, আনন্দপূর্ণ, সর্ব্বশুভলক্ষণোদ্দীপক ভাবসমূহ সহকারে সমুৎপাদিত সন্তান যে, দিব্যভাবাপন্ন এবং সর্ব্ব প্রকারে সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মিবে তাহা বেদ এবং বিজ্ঞান উভয়মতে অতি সম্ভবপর।

---

* ঐ সময়ে ভাবিবার বাক্য বৃহদারণ্যকে আছে।

যাঁহারা মন্ত্র দুইটীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং উচ্চতম কবিত্বের এবং শাস্ত্রের পরম তথ্য, সর্ব্বে সর্ব্বাত্মকা প্রতীতি, এই সমস্তের একত্র সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত না হইবেন তাঁহাদিগকে কোন কথাই বলিবার নাই। যাঁহারা মন্ত্রের ভাবগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিপ্রণোদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বন্ধ সহকারে বলি, তাঁহারা যেন কখনই আপনাদিগের বংশে গর্ভাধান সংস্কারটির লোপ হইতে না দেন। তাঁহাদিগের জন্য একটী কথাও বলিয়া দেওয়া যায় যে, বর্ত্তমান রাজব্যবস্থার দ্বারা সম্প্রতি দারোপগমের বয়োনির্দ্ধারণ হইলেও গর্ভাধান সংস্কার নির্ব্বিঘ্নে পালনীয় হইতে পারে। কারণ রাজব্যবস্থা প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া স্থলবিশেষে গর্ভাধান সংস্কারের বিলম্ব করিয়া দিয়াছে মাত্র, সংস্কারের নিষেধ বা নিবারণ করে নাই। এমন স্থলে বিলম্ব নিবন্ধন অধিকারীর কোন প্রত্যবায় হইতে পারে না। প্রত্যুত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দ্বিরাগমনের অপভ্রষ্ট "গোয়ানা" নামক যে প্রথা প্রচলিত আছে এবং দুই পুরুষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশেও যাহা প্রচলিত ছিল তদনুসারে চলিলে গর্ভাধান সংস্কারের কালটী সহজেই বিলম্বিত হয়। অতএব অধুনা যে "ধুলাপায়ে দিন" করিবার অনিষ্টকরী প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে সেই আধুনিক রীতির নিবর্ত্তন করিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। আমাদের অতি প্রাচীন এবং প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রে যাহা কথিত আছে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহার অন্যথা হইতে পারে না। সুশ্রুত বলেন—

ঊন ষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিং
যদাধত্তেপুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থং স বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরংজীবেৎ জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

পঁচিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ যদি ষোড়ষবর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করে, তবে সেই গর্ভ মাতৃ-উদরেই বিপন্ন হয়; অথবা যদি

ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, তবে দীর্ঘজীবী হয় না, অথবা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। এই জন্য অত্যন্ত বালা-স্ত্রীতে গর্ভাধান করিবে না।

গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্যে নিজ কুলের বৃদ্ধি হয়; সেই জন্য ওরূপ কার্য্যমাত্রেই পূর্ব্ব পুরুষের, অর্থাৎ যাঁহাদিগের কুলবর্দ্ধন হইবে তাঁহাদের সভক্তিক স্মরণ করা পুণ্যময় আর্য্যশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব-পুরুষের সভক্তিক স্মরণ শ্রাদ্ধকৃত্য দ্বারা সম্যক্ সাধিত হয়। এই জন্য সংস্কার কার্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ শ্রাদ্ধ। এবং ঐ সকল শ্রাদ্ধে বৃদ্ধি সূচিত হয় বলিয়া উহাদিগকে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বলে। এবং মঙ্গলের প্রবর্ত্তক বা, প্রধান পূর্ব্বপুরুষদিগকে নান্দীমুখ বলা যায় বলিয়া সংস্কারাঙ্গ শ্রাদ্ধগুলিকেও নান্দীমুখশ্রাদ্ধ বলে।

গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারের নাম পুংসবন এবং তৃতীয় সংস্কারের নাম সীমন্তোন্নয়ন। এই দুইটী সংস্কার গর্ভরক্ষার পক্ষে উপযোগী করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। মানবীর গর্ভ বিনষ্ট হইবার দুইটী সময় অতি প্রবল। একটী গর্ভ গ্রহণের তিন হইতে চারি মাসের মধ্যে, অপর ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে। অতএব ঐ দুইটী সময়ে বিশেষ সাবধান হইয়াই গর্ভিণীর পালন করা আবশ্যক। শাস্ত্রে ঐ দুইটী সময়ে দুইটী সংস্কারের ব্যবস্থা আছে।

(২) পুংসবন।—তন্মধ্যে প্রথম সংস্কার পুংসবনটী গর্ভ গ্রহণের তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যে নির্ব্বাহ করিতে হয়। পুংসবন শব্দের অর্থ পুত্র সন্তানের জনন। গর্ভাশয়স্থিত ভ্রূণ পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে, তাহা চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত নিশ্চয় হয় না; কারণ সামান্যতঃ চতুর্থ মাসের পূর্ব্বে স্ত্রী পুং চিহ্ন জন্মে না অতএব স্ত্রী পুং চিহ্ন প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই পুংসবন সংস্কার করিবার বিধি। সাধারণতঃ সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই কন্যার অপেক্ষা পুত্রের গৌরব অধিক করেন; বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীগণ সমধিক পরিমাণে পুত্রাভিলাষিণী হইয়া থাকেন; সুতরাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এবং মাঙ্গলিক হোমাদি নির্ব্বাহপূর্ব্বক যখন পতি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গর্ভিণীকে বলেন—

"মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয় পুরুষ, অগ্নি এবং বায়ু ইহাঁরাও পুরুষ, তোমার উদরে পুরুষেরই আবির্ভাব হইয়াছে"—সেই সময়ে গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে। সেই আনন্দে ঐ সময়ের আত্যন্তিক বমনাদি জনিত অবসাদ এবং ভীতি ও অলসাদি জনিত বিষণ্ণভাব অপগত হয়, এবং গর্ভপোষণের বল যেন পুনঃ সঞ্চারিত হইয়া উঠে। পুংসবনে দুইটী বটের ফল, মাসকলায় এবং যবের সহিত গর্ভিণীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুঁকাইবার ব্যবস্থা আছে। ঐ দ্রব্যগুলিতে গর্ভ রক্ষার শক্তি আছে কি না, বলিতে পারি না; তবে সুশ্রুত গ্রন্থে ন্যগ্রোধের বা বটের যোনিদোষনাশকতার উল্লেখ আছে।

সীমন্তোন্নয়ন।—গর্ভ রক্ষার উপযোগী দ্বিতীয় সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। ইহা গর্ভ গ্রহণের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সম্পাদ্য। ইহার মূল ক্রিয়াটি গর্ভিণীর সীমন্ত বা সিঁতি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে গর্ভিণী স্ত্রী আর শৃঙ্গারবেশে ভূষিতা, কিম্বা সুগন্ধাদি বাসিতা, অথবা পুষ্প মালাদিধারিণী এবং স্বামী সহবাসিনী হয়েন না।

সীমন্তোন্নয়ন কার্য্যটী পুংসবনের পর সন্তান প্রসব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট শুভক্ষণে করণীয় এবং পুংসবনের পর যত সত্বরে সম্পাদিত হয় ততই ভাল। * কিন্তু গর্ভের ছয় মাস হইতে আট মাসের মধ্যে ইহা সচরাচর নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এবং চরুপাকাদি নির্ব্বাহিত করিয়া পতি এক বৃন্তস্থিত পক্ক যজ্ঞডুম্বর দুইটী এবং অপরাপর কয়েকটী মাঙ্গলিক দ্রব্য গর্ভিণীর গলদেশে পট্টসূত্র দ্বারা লম্বিত করতঃ প্রথমে যে মন্ত্রটী শুনাইয়া থাকেন তাহার অর্থ এই—

---

* কদাচিৎ প্রসবের পরেও যে সীমন্তোন্নয়নের আদেশ আছে তাহা মুখ্যতঃ সংস্কারটীর দৃঢ়তা জ্ঞাপক। কারণ, তখন তদ্দ্বারা উহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি নাই। তবে সন্তানোৎপত্তির পরেও যে দারোপগম বিলম্বিত হওয়া উচিত, সেই তথ্যটী সূচিত হয় বলিয়া শাস্ত্রাদেশের যৌক্তিকতা স্পষ্টীকৃত হয়।

"তুমি এই উর্জ্জস্বল [উড়ুম্বর] বৃক্ষ হইতে উর্জ্জস্বলফলযুক্তা হও। হে বনস্পতে! যেমন পর্ণের পর পর্ণের উৎপত্তি হইয়া সমৃদ্ধি জন্মে তেমনি ইহাঁতে পুত্ররূপ পরম ধন উৎপন্ন হউক।"

তাহার পর কুশগুচ্ছ (পিঞ্জলী) দ্বারা গর্ভিণীর সীমন্তভাগের কেশ উন্নীত করা হয়।

অনন্তর পতি শরকাষ্ঠিকার দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করত বলেন—"যে শর দ্বারা প্রজাপতি [কশ্যপ (মদ্য বা জলপানকারী)—নভোমণ্ডল]। দেবমাতা অদিতির [অখণ্ড পৃথিবীর] সৌভাগ্য সম্পাদনার্থ [চক্রবাড় রেখাস্বরূপ] সীমন্তোন্নয়ন করিয়াছিলেন, সেই শরের দ্বারা আমি গর্ভিণীর সীমন্তোন্নয়ন করিয়া ইহাঁর পুত্র পৌত্রাদিকে আপনাপন জরাবস্থা পর্য্যন্ত দীর্ঘজীবী করিতেছি।"

অনন্তর নলিকার দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করত পতি বলেন—"শোভন-স্তুতি দ্বারা আমি সুন্দরী পৌর্ণমাসীকে [গর্ভাধানে সিনীবালী অর্থাৎ অমাবস্যার অন্তর্নিবিষ্ট চন্দ্রকলার আবাহন হইয়াছিল, এখন গর্ভ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব রাকা পৌর্ণমাসীর আহ্বান হইতেছে] আহ্বান করি—তিনি আমাদিগের শোভন বাক্য শুনিয়া অবধারণ করুন এবং অচ্ছিদ্যমান সূচীকর্ম্ম দ্বারা পুত্র পৌত্রাদি জনন ব্যাপার অনুস্যূত করুন এবং প্রভূতদাতৃশ্রেষ্ঠ এক পুত্র প্রদান করুন।"

"হে পৌর্ণমাসি! তোমার যে শোভন বুদ্ধি যদ্দ্বারা যজমানকে ঐশ্বর্য্য যুক্ত কর, সেই বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে অদ্য আমাদের সমীপাগত হও; হে সুভগে! আমাদিগকে সহস্রপোষী সুত প্রদান কর।"

পরিশেষে পতি সঘৃত চরু প্রদর্শন করিয়া গর্ভিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন—"তুমি কি দেখিতেছ?" এবং তাহাকে বলাইবেন—আমি প্রজা দেখিতেছি, গো মহিষাদি ধন দেখিতেছি এবং পতির দীর্ঘায়ুঃ দেখিতেছি।"

কি ক্ষোভের বিষয় যে, এমন প্রীতি এবং আনন্দবর্দ্ধক এবং

সুদৃষ্টি প্রদায়ক পবিত্র কার্য্যগুলি আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ দীনাবস্থ হইয়াছে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রীয় কার্য্যকলাপের বিলোপে ইহা যেমন হীনাবস্থ হইতেছে, তেমন আর কিছুতেই নহে।

গর্ভাবস্থায় এই যে তিনটী সংস্কার উল্লিখিত হইল, কাহার কাহার মতে সেইগুলি একবার মাত্র করিলেই হয়। কিন্তু কাহার কাহার মতে ঐ সংস্কারগুলি প্রতি গর্ভেই করণীয়। সংস্কারগুলি দ্বারা যে অত্যুদার ভাবপরম্পরা পতি পত্নীর হৃদ্গত হইয়া যায় তাহা আর কখনই বিস্মৃত অথবা তুচ্ছীকৃত হইতে পারে না, এই জন্য সংস্কারগুলি একবার নির্ব্বাহিত হইলেই যাবজ্জীবনের নিমিত্ত নির্ব্বাহিত হইল মনে করাও যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের অনেক ঘরে তিনটী গার্ভসংস্কারকেই একবার মাত্র করিয়া নিবৃত্ত হওয়া হয়। কিন্তু বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল স্মার্ত্তগ্রন্থ প্রচলিত, সে গুলিতে যেন প্রতিবারেই সংস্কারগুলি নির্ব্বাহিত করিবার ব্যবস্থা প্রবলতর বলিয়া বোধ হয়।

"কেচিদ্গর্ভস্থ সংস্কারান্ প্রতিগর্ভং প্রযঞ্জতে।"

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:০:—

সংস্কার কর্ম্ম—শৈশবসংস্কার।

নিতান্ত শৈশবাবস্থায় জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া কোন শক্তিরই উন্মেষ হয় না। সদ্যোজাত সন্তান কিছু জানে না, কিছু চাহে না, কিছু করে না। এই জন্য শিশুর সংস্কার পুরুষ সংস্কারের ন্যায় না হইয়া কিয়ৎপরিমাণে দ্রব্যসংস্কারের সদৃশ হইয়া থাকে—অর্থাৎ কতকটা তাহার শরীর শোধনে নিবদ্ধ এবং কতকটা তাহার প্রতি পিতা মাতা প্রভৃতির যত্নের উদ্ভাবনে এবং পরিচালনে পর্য্যবসিত। শৈশব-সংস্কার তিনটীর উল্লিখিত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে।

১। জাতকর্ম্ম—শৈশবের প্রথম সংস্কারের নাম জাতকর্ম্ম। ইহা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নির্ব্বাহ করিতে হয়। কার্য্যটী এই—পিতা প্রথমে যব এবং ব্রীহি চূর্ণ দ্বারা, অনন্তর স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট মধু এবং ঘৃত লইয়া সদ্যোজাত সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করিবেন। ঐ সময়ের উচ্চার্য্য মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

"এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইনিই আয়ুঃ, ইনিই অমৃত—তোমার ঐ সকল লাভ হউক। মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন। পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন। সদসস্পতি [বৃহস্পতি [ইন্দ্রের আশ্চর্য্যরূপ প্রিয়পাত্র এবং ইন্দ্রের অভীষ্টার্থ সাধক এবং মেধার প্রদাতা, তাঁহাকেও প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে মেধা দান করুন।"

মন্ত্রের প্রথম ভাগে একটী বৈদিক বা গভীরতম বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকাশ। পরবর্ত্তিভাগ হইতে পিতা মাতা এবং গোষ্ঠীবর্গ সকলেই বুঝিতে পারেন যে ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে ধনাদির নিমিত্ত প্রার্থনা নাই আর আয়ুর প্রার্থনা একবার মাত্র—কিন্তু মেধা বা ধারণাশক্তি বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা বারম্বার। অতএব ব্রাহ্মণ সন্তানের পালন যে উদ্দেশে হওয়া আবশ্যক তাহা এই প্রথম সংস্কার হইতেই সূচিত হইল।

এই সংস্কারে সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধু প্রদত্ত হয়ল এবং যব ও ব্রীহি চুর্ণ স্পৃষ্ট হইল। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধু মধুর অনেক গুণ—(১) স্বর্ণ বায়ু দোষের দমন করে, প্রস্রাব পরিষ্কার করে, এবং রক্তের ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকিলে সেই দোষের উপশম করে (২) ঘৃত শরীরে তাপের বৃদ্ধি করে, বল রক্ষা করে এবং শৌচ পরিষ্কার করে (৩) মুখে মুখে লালার সঞ্চার করে, পিত্তকোষের ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে, এবং কফ দোষের দমন করে—অর্থাৎ সংস্কারটির দ্বারা বায়ু দোষের উপশান্তি, গলনালী ও উদর এবং অন্ত্রের সরসতা সম্পাদন, মলমূত্রের নিঃসারণ এবং কফের ন্যূনতা সাধিত করিবার উপায় হয়। সদ্যোজাত শিশুর সম্বন্ধে এরূপ ঔষধ কল্প দ্রব্যের প্রয়োগ কি জন্য হয় তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। প্রসবের যন্ত্রণা নিবন্ধন সদ্যোজাত শিশুর রক্তের ঊর্দ্ধগতি হইয়াছে; তাহার শরীরে কফের দোষ অধিক এবং তাহার অন্ত্রমধ্যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মল সঞ্চিত থাকে; সেই মল নিঃসৃত না হইলে অনেক প্রকার পীড়া জন্মে। এই জন্য ডাক্তার সাহেবেরাও সদ্যোজাত শিশুদিগের সম্বন্ধে মধুমিশ্রিত এরণ্ড তৈলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। স্বর্ণঘৃষ্ট মধু ঘৃতমিশ্রিত মধুমিশ্রিত এরণ্ড তৈলের অপেক্ষা যে সমধিক দিক্‌দর্শী এবং সমধিক উপকারী তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। দেশীয় ব্যবস্থায় বায়ু দমনের এবং ঊর্দ্ধগভাব নিবারণের যে উপায়টী আছে, সাহেবী ব্যবস্থায় সেটী নাই।

ফলতঃ স্বর্ণ ঘৃষ্ট ঘৃত মধু শিশুদিগের জিহ্বাতে প্রদান করিবার অতি বিশদ লৌকিক যুক্তিই দেখা যায়। কিন্তু যব ব্রীহিদ্বারা জিহ্বাস্পৃষ্ট করিবার তেমন কোন যুক্তি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু না পারিলেও এমন স্থলে শাস্ত্রের চরণে সভক্তিক প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করাই বিধেয় বলিয়া মনে করি। এই সংস্কারের দ্বারা উপপাতকের অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ-শরীরজ কতক দোষের নাশ হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রাদেশ বুঝিবার একটু বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়া আছে। শাস্ত্র বলিলেন যে, জাতমাত্র সন্তানের জাতকর্ম্ম করিবে—অর্থাৎ তাহার জিহ্বাতে উল্লিখিত দ্রব্য সকল দিবে; তাহার নাড়ী, ছেদের পূর্ব্বেই ঐ কার্য্য করিবে। কিন্তু জাত-কর্ম্মটী একটি সংস্কার সুতরাং নান্দী-মুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ উহার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যদি পিতাকে ঐ সংস্কারাঙ্গ শ্রাদ্ধ সমাপন করিতে হয়, তবে নাড়ীচ্ছেদের অনেক বিলম্ব হইয়া যায় এবং ছেলেটী সেই বিলম্বহেতু মারা পড়িতেও পারে। পরন্তু সুশ্রুতের সে ব্যবস্থা নাড়ী-চ্ছেদের পরেই জাতকর্ম্ম করা, কিন্তু সে ব্যবস্থাও সমীচীন বোধ হয় না; কারণ নাড়ীচ্ছেদ হইলেই ক্ষতাশৌচ হয় এবং সেই অশৌচা-বস্থায় কোন সংস্কারকার্য্যই চলিতে পারে না। এই সকল কচকচির জন্য কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অশৌচান্তে জাতকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যথা, দায়ভাগ টীকায়—

জাতঃ প্রাণবিয়োগাপত্ত্যা জাতেষ্ট্যা অশৌচান্তেকর্ত্তব্যতা

জাত-সন্তানের প্রাণবিয়োগরূপ আপত্তি নিবন্ধন অশৌচান্তে জাতেষ্টি কার্য্যের কর্ত্তব্যতা।

কিন্তু সংস্কারটীকে ওরূপ অসময়ে অর্থাৎ দশ দিনের পর টানিয়া আনিলে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে একেবারেই অসিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। এই জন্য এক্ষণে কোন কোন

বহুদর্শী বিবেচক পণ্ডিত যে কার্য্য প্রণালীর অনুসরণ করেন তাহাই সমীচীন বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণীয় হওয়া উচিত। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে—

"অঙ্গত্বেপি চ কালস্য ন ত্যাগোঽন্যাঙ্গবৎ কুতঃ
অনুপাদেয়রূপত্বাৎ কালে কর্ম্ম বিধীয়তে।"

যে স্থলে কাল শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অঙ্গ, তথায় উহার অনুপাদেয়তা নিবন্ধন অপর সকল অঙ্গের ন্যায় উহার ত্যাগ হইতে পারে না, যথাকালেই ক্রিয়ার নির্ব্বাহ হওয়া আবশ্যক।

অতএব পূর্ব্ব হইতেই স্বর্ণ, ঘৃত, মধু, এবং কষ্টিপাথর ঠিক করিয়া রাখিয়া প্রসবের পরক্ষণেই কিছু মাত্র কালাতায় না করিয়া নাড়ী-চ্ছেদের পূর্ব্বেই জাত সন্তানের জিহ্বায় স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত-মধু প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। অঙ্গহানির ভয়ে মুখ্য কর্ম্মের অপলাপ করিতে নাই।

(২) নামকরণ—শৈশবের দ্বিতীয় সংস্কারের নাম, নামকরণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ রাত্রি গত হইলে তাহার নাম রাখিতে হয়। দশ রাত্রি বাদ দিবার কারণ অতি সুস্পষ্ট। আঁতুড়ে যত ছেলে মরে তাহার প্রায় বার আনা ভাগ প্রথম দশ রাত্রির মধ্যেই মারা যায়। এই জন্যই, বোধ হয়, প্রথম দশ রাত্রির মধ্যে নামকরণ ত্যাগ করা হইয়াছে। কোন বস্তুর নামকরণ হইলেই তৎসম্বন্ধে মনের এক প্রকার দৃঢ়তা জন্মিয়া যায়। যদি সদ্যোজাত শিশু অকালে চলিয়া যায় তবে তাহার বিষয়ে চিন্তা করিবার এবং শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটীই একটী অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব প্রথম দশ রাত্রির মধ্যে শিশুর নাম রাখিবার ব্যবস্থা নাই। প্রত্যুত দশ রাত্রি অথবা শত রাত্রি কিম্বা বৎসর পূর্ণ হইলে পর, নাম রাখিবার ব্যবস্থা আছে। এখন অন্নপ্রাশন সংস্কারের সহিত যে নাম রাখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয় নয়। প্রত্যুত দেশে শৈশব মৃত্যুর

সংখ্যা যে প্রকার অতি ভীষণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে ঐ গৌণ-কল্পের অবলম্বনই এই দুঃসময়ের উপযোগী হইয়াছে বলিতে হয়। অতএব দশরাত্রির পর নামকরণ না হইয়া অন্নপ্রাশনের সময়ে হইলেও কোন বিশেষ দোষ নাই।

নামকরণ সংস্কারে শিশুর জন্মগ্রহের এবং নক্ষত্র প্রভৃতির এবং অন্যান্য দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিয়া এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া পিতা যেরূপে উহার নাম বলিয়া দিবেন তাহা নিম্নবর্ত্তী মন্ত্রার্থ দৃষ্টে বোধ হইবে। মাতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া পিতার বামভাগে আসীনা হইবেন এবং পিতা সন্তানকে বলিবেন—

"কে তুমি?—কোন জাতীয় তুমি—এই যে তুমি, তুমি অমৃত অর্থাৎ অবিনাশ্য। হে অমৃত! তুমি সূর্য্য সম্বন্ধীয় মাসে প্রবেশ কর। হে অমৃত! সূর্য্য তোমাকে দিন হইতে দিনে সমর্পণ করান, দিন রাত্রিতে সমর্পণ করান। অহোরাত্র অর্দ্ধ মাসে সমর্পণ করান! এবং অর্দ্ধমাস পূর্ণমাসে প্রবেশ করান! এবং মাস ঋতুতে প্রবেশ করান! আর ঋতু সম্বৎসর, আর সম্বৎসরে জরাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূর্ণ আয়ুতে [অর্থাৎ শতবর্ষে] প্রবেশ করান!

এই মন্ত্রে জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া সন্তানের পালনে যে কেমন সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া চলিতে হয় তাহা কেমন সুন্দররূপে প্রকাশিত হইল! ইহাতে পিতা মাতার মনে সন্তান পালন সম্বন্ধে অবশ্যই শুভফল ফলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর নিজের পক্ষে কি হইল? একথার উত্তরে শাস্ত্র বলেন যে, তাহার জাতি ভ্রংশকর দোষের অর্থাৎ যে দোষের জন্য জাতি বুঝিতে না পারা যায় সেই দোষের, অপনোদন হইল। কারণ বিভিন্ন জাতীয় সন্তানের বিভিন্নরূপ নাম করণের ব্যবস্থা আছে—যথা (১) ব্রাহ্মণের পক্ষে 'দেবশর্ম্মা' (২) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'ত্রাতৃবর্ম্মা' বৈশ্যের পক্ষে "ভূতিগুপ্ত দত্ত" এবং শূদ্রের পক্ষে "দাস"।

(৩) অন্নপ্রাশন—শৈশবাবস্থার তৃতীয় সংস্কারের নাম অন্নপ্রাশন। পুত্র সন্তানের পক্ষে এই সংস্কার ছয় বা আট মাসে করণীয়। কন্যা সন্তানের পক্ষে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে কর্ত্তব্য। অন্নপ্রাশনের জন্য বিশেষ লক্ষণে লক্ষিত শুভ দিন নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অনন্তর বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পিতা সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া বলিবেন, মাতা তাঁহার বামভাগে উপবিষ্টা হইবেন এবং পিতা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিয়া সন্তানের মুখে অন্নদান করিবেন। মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই—

অন্নই এক আচ্ছাদক অর্থাৎ রক্ষক। অন্নই সকল জীবকে রক্ষা করে। অন্নবিশিষ্ট অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্যক্তিরাই শ্রী, তন্মধ্যে প্রধান বিরোচন (সূর্য্য) অন্নদ্বারা আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্ব অন্নরসের প্রধান ঘৃত এবং তিনিই তেজঃ এবং সম্পৎ, তৎকামনায় হোম করিতেছি। অন্নপতি (সূর্য্য) আরোগ্যকর এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর অন্নবল প্রদান করুন এবং অন্নপ্রদাতার তারণ করুন। আমাদের চতুষ্পদা বস্থায় (যুগ্মকভাবে) এবং দ্বিপদাবস্থায় (অযুগ্মকভাবে) মঙ্গল প্রদান করুন। তাহার পরে পিতা স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত মধু লইয়া সন্তানের জিহ্বা সংলগ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে মাতৃক্রোড়ে অর্পণ করিবেন।

শাস্ত্র বলেন যে অন্নপ্রাশন সংস্কারের দ্বারা শিশুর সঙ্করীকরণ দোষের খণ্ডন হয়। সঙ্করীকরণ দোষের লক্ষণ খাদ্যাখাদ্য বিচার রাহিত্য। অন্নপ্রাশন সংস্কারে মনুষ্য শিশুর খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

এখনও অন্নপ্রাশন সংস্কারটী লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যুত উহাতে অনেকানেক নূতন নূতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে। এখন একটা কথা উঠিয়াছে যে, সন্তানের অন্ন ভোজন পিতা মাতাকে চক্ষে দেখিতে নাই। মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তদভাবে অপর লোককে। এরূপ হওয়ায় বিশেষ কোন দোষ হয় না। কারণ অন্নপ্রাশন কার্য্য প্রাতনিধি দ্বারাও চলিতে পারে। সুতরাং মাতুলই যেন পিতার প্রতি-নিধি হইয়াই কার্য্য করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এমন কি বিহার

প্রদেশেও মাতুলের দ্বারা অন্নপ্রাশনের রীতি নাই। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বঙ্গভূমিতে গোষ্ঠীপতি ব্রাহ্মণেরা দৌহিত্র সন্তানদিগের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করত ক্রমশঃ এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

নিষ্ক্রমণ —যে তিনটী শৈশব সংস্কারের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল, তদ্ভিন্ন আর একটী সংস্কার আছে। তাহাকে নিষ্ক্রমণ বলে। উহা জন্ম দিন হইতে তৃতীয়, শুক্ল পক্ষের তৃতীয়াতে করণীয়। প্রথম বারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি সহকারে এই সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার পর সন্তানের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি শুক্ল- তৃতীয়াতেই করিতে হয়। সংস্কারের মন্ত্রার্থ এই—

"হে চন্দ্র! তোমার শোভনালোকে আলোকিত এবং সন্তানের আনন্দজনক অন্তর্মধ্যে আত্মার স্থান নিহিত আছে। সেই ব্রহ্মকে আমি জানি এবং মানি। আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় কোন অঘ প্রাপ্ত না হই। যাহা পৃথিবীর অমৃত এবং দ্যুলোকে চন্দ্রের মধ্যে আশ্রিত, আমি তাহা জানি। আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় কোন ব্যসন প্রাপ্ত না হই।

"চন্দ্রের মধ্যে যে, কৃষ্ণবর্ণ কাজল (শোককালিমা) তাহা পৃথিবী হৃদয়েও আছে· তাহা আমি জানি এবং দেখিতেছি। পুত্র সম্বন্ধীয় শোক জন্য যেন আমাকে রোদন করিতে না হয়।

মন্ত্রগুলিতে আত্মার বিভুত্ব, পুত্রের নিমিত্ত পিতার আন্তরিক ব্যাকুলতা এবং শোকের মলিনতা যে ভূলোক এবং দ্যুলোক — সর্ব্বলোক ব্যাপক এই বিশ্বাস· অতি সুন্দররূপে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা আপনার জন্যই প্রার্থনা জানাইতেছেন। এইজন্য এই কার্য্যটী অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় গৌরবান্বিত নহে। নিষ্ক্রমণ ব্যাপারটীকে পৌষ্টিক বা পুষ্টিসাধক সংস্কার বলে এবং এইটী মুখ্য সংস্কারের মধ্যে গণ্য হয় না।

—:০:—

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

—*:*:*—

চতুর্থ অধ্যায়।

—:০:—

সংস্কার কর্ম্ম—কৈশোর সংস্কার।

যে দুইটি সংস্কারকে কৈশোর বলা হইয়াছে তাহার একটী বাল্যে এবং অপরটী কিশোরাবস্থায় নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে ঐ দুই টিকেই একোদ্যমে কৈশোর কালে নির্ব্বাহিত করা হইয়া থাকে।

১। চূড়াকরণ—উল্লিখিত দুইটী সংস্কারের মধ্যে প্রথমটীর নাম চূড়াকরণ। এই সংস্কারের মুখ্যকাল শিশুর তৃতীয় বৎসর। কিন্তু এক বৎসর, কি পাঁচ বৎসর প্রভৃতি অপরাপর অযুগ্ম বৎসরেও চূড়াকরণ করা যাইতে পারে। চূড়াকরণের প্রধান কার্য্য কেশ মুণ্ডন। গর্ভাবস্থায় যে কেশ জন্মে তাহা নিঃশেষে ফেলিয়া দিয়া চূড়াকরণের দ্বারা শিশুকে শিক্ষা এবং সংস্কারের পাত্রীভূত করা হয়। এই জন্য বলা যায় যে, চূড়াকরণের দ্বারা অপাত্রী-করণ দোষের অপনয়ন হয়।

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং হোমাদি নির্ব্বাহ করিয়া সূর্য্যের ধ্যান করত পুরোহিত নাপিতের প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং যে মন্ত্রের উচ্চারণ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

'যে সুধিতি বা ক্ষুরের দ্বারা পুষা (সূর্য্য) বৃহস্পতির কেশ মুণ্ডন [রশ্মিজাল সংযত] করিয়াছিলেন, যে সুধিতি দ্বারা বায়ু ইন্দ্রের [মেঘ বাহনের] কেশমুণ্ডন [মেঘের দূরীকরণ] করিয়াছিলেন, ব্রহ্মরূপী সেই সুধিতি দ্বারা তোমার কেশ মুণ্ডন করিতেছি—তোমার আয়ুঃ, বল এবং তেজঃ বর্দ্ধিত হউক। যমদগ্নির [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরা অথবা

মধ্য খগোলস্থিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তুমি প্রাপ্ত হও। কশ্যপের [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরা, অথবা উত্তর খগোলস্থিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক। অগস্ত্যের [ঋষির বাল্য, যৌবন, জরা অথবা দক্ষিণ খগোলস্থিত নক্ষত্র বিশেষের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক। দেবতাদিগের [দ্যুতিমান নক্ষত্র সাধারণের] আয়ু ত্রিতয় [উদয়, ভোগ, অস্ত] তোমার প্রাপ্তি হউক।"

স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, সংস্কারটী শৈশব কালের বলিয়া ইহাতে দ্রব্য সংস্কারের লক্ষণ যেমন সুস্পষ্ট, পুরুষ-সংস্কারের লক্ষণ তেমন পরিস্ফুট নয়। কিন্তু তাহা হইলেও শিশুরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটী যে বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ তাহার স্পষ্ট সূচনাই এই মন্ত্র মধ্যে নিহিত হইয়াছে।

২। উপনয়ন—এইটীই প্রকৃত প্রস্তাবে কৈশোর সংস্কার। এই সংস্কারের দ্বারা দ্বিজাতীয় বালক জ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষাচার্য্যের সমীপে নীত হয়েন। শাস্ত্রের বিধি এই যে, ব্রাহ্মণকুমার পঞ্চমবর্ষ বয়স হইতে ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই সংস্কারের অধিকারী থাকেন। ক্ষত্রিয় ষষ্ঠ হইতে দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্য অষ্টমবর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত। শূদ্রের এই সংস্কারটীতে অধিকার নাই।

উপনয়ন সংস্কারে যথাবিধি শ্রাদ্ধ এবং হোমকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া অনেকানেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত এবং অনেকানেক মন্ত্রের উচ্চারণ হয়। একে একে স্থূলতঃ সেই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য এবং অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইবে।

একটী মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হয়—"আমি [দ্বিজাতীয় বালক] উপনয়নরূপ ব্রতের আচরণ করিব তাহা তোমাকে [অগ্নিকে] নিবেদন করিতেছি, * * ঐ ব্রতের দ্বারা অধ্যয়নরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিব। আমি অনৃত বচন হইতে পৃথক হইব এবং সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইব, আমার যথেষ্টাচারিতা অপগত হইবে এবং নিয়তাচারিতা জন্মিবে।"

বায়ু দেবতাকে, সূর্য্য দেবতাকে, চন্দ্র দেবতাকে, এবং ইন্দ্র দেবতাকেও অবিকল ঐ কথাগুলি বলা হওয়াতে কথাগুলির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া ওগুলির তাৎপর্য্য হৃদ্গত হইয়া যায়। উপনয়ন সংস্কারের উদ্দেশ্য সত্য জ্ঞান এবং সদাচারলাভ, অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের সারাৎসার বস্তুর প্রাপ্তি। আর্য্যশাস্ত্র তাহার যেরূপ পথ দেখাইয়াছেন, তাহাতে সমস্ত শিক্ষাকার্য্যের প্রণালী অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে আচার্য্য শিষ্যের প্রতি (সূর্য্য জ্ঞানে) দৃষ্টি করতঃ বলেন, "হে পঞ্চদেব! তোমরা এই সুন্দর মানবকে (ক্ষুদ্র মনুষ্যটীকে) আমার সহিত মিলাইয়া দাও। আমরা যেন উভয়ে উভয়ের সহিত বিনা বিঘ্নে সম্মিলিত হইতে পারি।" গুরু শিষ্যের পরস্পর সম্যক্ সম্মিলনই যে শিক্ষাকার্য্যের প্রথম এবং প্রধান অনুষ্ঠান তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাহার পর মানবক আচার্য্যকে বলেন—"আমি ব্রহ্মচারী (অর্থাৎ মৈথুননিবৃত্তিশীল) হইয়া আছি, অতএব আমাকে উপনীত করুন, আপনার সমীপে লউন।" মৈথুন নিবৃত্তি যে শিক্ষা গ্রহণ সময়ের অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তখন আচার্য্য মানবকের নামাদি (এবং জন্ম গোত্রাদি) জিজ্ঞাসা করেন।

পরে মানবক আপনার নামাদি (অর্থাৎ নিজ নাম পিতৃ নাম পিতামহের নাম, এবং গোত্রাদি) বলিলে আচার্য্য মানবককে সমীপস্থ করিয়া (আহুত অগ্নি এবং আপনার মধ্যভাগে অবস্থিত করিয়া) উভয়েই স্ব স্ব হস্তে [তৃপ্তিসূচক] উদকাঞ্জলি গ্রহণ করেন এবং আচার্য্য তাঁহার শিষ্যটীকে আপনার সহিত মিলাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া উভয়ে উদকাঞ্জলি [একই স্থানে] ত্যাগ করেন। তাহাতে জলের সহিত যেমন জল মিশে শিষ্যও যেন সেইরূপে গুরুর সহিত মিশেন এই অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হয়। পরে আচার্য্য নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করেন। শিষ্য মনে করেন [অর্থাৎ মনে করিতে শিক্ষিত হয়েন] যে, তিনি [জগৎ প্রসবিতা] সূর্য্য, [স্বাস্থ্য

সাধনকারী] অশ্বিনী কুমার এবং [পোষণকারী] পূষণ দেবতা ইহাদিগের হস্ত দ্বারাই ধৃত হইয়াছেন। আচার্য্যই তাহা হইলে যে, তাঁহার পক্ষে জননিতা, স্বাস্থ্যবিধায়ক এবং পোষণকারী স্বরূপ হইয়াছেন, এই বোধটী জন্মিবে,। অনন্তর আচার্য্য বলেন—"অগ্নি, সবিতা এবং অর্য্যমা [পিতৃদেব] ইহাঁরা পূর্ব্বেই তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্নি দেবই তোমার আচার্য্য; আমার তুমি অতি প্রিয়কারী মিত্র। এক্ষণে তুমি সূর্য্যের আবর্ত্তনের অনুরূপ করিয়া আমাকে পরিবর্ত্তন করত অবস্থিতি কর"। শিষ্য আচার্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে আচার্য্য তাহার নাভি (জীবমর্ম্ম স্থান) স্পর্শ করিয়া বলিবেন—"হে নাভে! তুমি বিস্রস্ত হইও না, স্থির থাক। হে অন্তক! এই ব্রহ্মচারীটীকে তোমাকে অর্পণ করিলাম। (নাভির উর্দ্ধভাগ স্পর্শ পূর্ব্বক) হে অভূমি। (বায়ু), (বাম ভাগ স্পর্শ করিয়া) হে সূর্য্য! (বক্ষঃস্থলস্পর্শ করিয়া) হে অগ্নে! (দক্ষিণ অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক) হে প্রজাপতে!—এই রূপে প্রত্যেককে বলেন, এইটী আমার, তোমাকে দিলাম, এটী যেন জরা মরণাদি কোন দোষ প্রাপ্ত না হয়।" তাহার পরে আচার্য্য বলেন—'তুমি ব্রহ্মচারী হইয়াছ, সমিধ আহরণ করিবে, মন্ত্র সহকারে জলপান করিবে। [ঋকবেদীয়দিগের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি আচার ঘটিত কথা আছে, যথা মৃত্তিকা শৌচ করিবে ইত্যাদি, কয়েকটী নিত্যকর্ম্মের আদেশ, যথা গুরু শুশ্রূষা করিবে, দিবাতে নিদ্রা যাইবে না ইত্যাদি] ব্রহ্মচারী ঐ সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিবেন।

অনন্তর ব্রহ্মচারী প্রকৃত ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিবে। অঙ্গের বলয়াদি অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমন্ত্রক মেখলাধারণ যজ্ঞোপবীত ধারণ অজিন ধারণ এবং গায়ত্রী পাঠ গ্রহণ করিবে। গায়ত্রী পাঠ গ্রহণের রীতি এই—প্রথমে ব্যাহৃতিত্রয় ছাড়িয়া ত্রিপাদ গায়ত্রীর এক পাদ পড়িবে তাহার পর দ্বিতীয় পাদের সহিত প্রথম পাদ অনন্তর প্রথম দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয় পাদ পড়িয়া শেষে ব্যাহৃতি তিনটী সংযুক্ত

করিয়া পাঠ করিবে। বালকদিগকে শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করাইবার এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। গায়ত্রী পাঠের পর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিবেন, ভিক্ষোপার্জ্জিত দ্রব্য সমুদায় গুরুকে নিবেদন করিবেন এবং তদনন্তর গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন। পূর্ব্বকালে এই প্রণালীক্রমে বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাস এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন হইত। এখন নগরাদিতে ইংরাজী শিক্ষার বাহুল্য হইয়া ছাত্রবর্গের পক্ষে গুরুগৃহে বাস উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু যে যে পল্লীগ্রামে টোলের অধ্যাপনা প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানে গুরু শিষ্যের পরস্পর সম্মিলন নষ্ট হয় নাই। তথায় যথেষ্ট গুরুভক্তি এবং শিষ্যানুরাগ বিদ্যমান আছে। ইংরাজী স্কুল কলেজেই ঐ সকল গুণ একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

উল্লিখিত সংস্কার কার্য্যগুলির অভ্যন্তরে কত অশেষ তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। (১) গুরু এবং শিষ্য উভয়েই উদকাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন এবং পরস্পর সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা সহকারে উদকাঞ্জলিদ্বয় নিক্ষেপ করিলেন। জলে জল যেমন মিশে গুরুশিষ্যের সম্মিলন তেমনি ঘনিষ্ঠ করিবার উপদেশ সূচিত হইল। (২) গুরু শিষ্যের হস্তধারণ করিয়া যে ভাবটী শিষ্যের মনে প্রকটিত করিলেন, তাহাতে তিনিই যেন শিষ্যের পিতৃত্ব, স্বাস্থ্যবিধায়কত্ব এবং পোষ্টৃত্ব আপনাতে গ্রহণ করিলেন। (৩) কিন্তু গুরু আপনাতে ঐ সকল অধিকার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অভিমানী হইলেন না; শিষ্যের প্রকৃত গুরু যে অগ্নিদেব তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিলেন এবং শিষ্যকে আপনার প্রিয়কারী মিত্র বলিয়াই জানিলেন। গুরুর হৃদয় শিষ্যের প্রতি যেরূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ (ক) সম্মিলন প্রবণ (খ) পিতৃতুল্যরূপ এবং (গ) নিরভিমান মিত্রভাবাপন্ন তাহা সংস্কারের প্রথম ভাগে প্রকটিত হইল। তাহার পর শিষ্যের কর্ত্তব্য যে গুরুকে আবর্ত্তন করিয়াই অবস্থিতি করা তাহা তৎকর্ত্তৃক সূর্য্যের

আবর্ত্তনানুকরণ দ্বারা প্রকাশিত হইল। আরও প্রকাশিত হইল যে, শিষ্যটী যেমন সূর্য্যস্থানীয় [সূর্য্যের একটী নামই 'বেদোদয়'] তেমনি গুরুও সূর্য্যের আবর্ত্তনীয় বিশ্বমূর্ত্তি স্বয়ং! সেই বিশ্বরূপ গুরু শিষ্যশরীরে বিশ্বস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া (ক) নাভিদেশে যমকে (খ) নাভির ঊর্দ্ধ-ভাগে বায়ুকে (গ) বামভাগে হৃৎপিণ্ডস্থানে সূর্য্যকে (ঘ) মধ্যভাগে কুসফুস প্রদেশে অগ্নিকে এবং (ঙ) দক্ষিণভাগে প্রজাপতিকে স্থাপন করিলেন—অর্থাৎ শিষ্যের দেহই সমস্ত ব্রহ্মদেহ হইল; তাহা হইলেই সংস্কার পূর্ণ হইয়া গেল। এখন মানবক ব্রহ্মচারী হইলেন এবং শাস্ত্র-দিষ্ট ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ এবং ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বেদের মধ্যে কতকগুলি ঔপনিষদ বাক্যকে মহাবাক্য বলে যথা, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি; কিন্তু ঐ গুলির অপেক্ষাও মহত্তর এবং সূক্ষ্মতর তথ্যব্যঞ্জক একটী বাক্য আছে—"সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং"। সেই মহাবাক্যই সর্ব্বোচ্চ উপনয়ন সংস্কারের ভিত্তি। ইহা দ্বিজাতীয় ক্ষুদ্র শিশুটীকে বিশ্বরূপত্বপ্রাপ্ত করে, তাহাকে আপনাতে সেই বিশ্বরূপের ধ্যান এবং ধারণা মিশাইয়া তাহা হইতেই সমস্ত তপস্যা প্রণালীর আবিষ্কার করে এবং সোঽহং জ্ঞানের সম্যক্ অনুভূতি দ্বারা অভিমানের লোপ এবং জীবের মুক্তি সাধনের পথ দেখাইয়া দেয়।

৩। সমাবর্ত্তন। এখন গুরুকুলে বাস নাই। গুরুর নিকট শাস্ত্র-শিক্ষার পূর্ব্বরীতি নাই। সেই রীতিক্রমে কয়েক বৎসর শাস্ত্র শিক্ষা হইলে গুরুগৃহ হইতে নিজগৃহে আসিবার পূর্ব্বে গৃহস্থধর্ম্মের পালনোপযোগী গুণাবলীর স্মরণরূপ যে সমাবর্ত্তন নামক সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হইত তাহা এখন ঐ উপনয়নের দিনেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। উহার প্রণালী এই—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং অগ্নিস্থাপন ও হোম করিয়া (১) অগ্নিকে বলা হয়—হে অগ্নে! উপনয়নের সময় আমি তোমার আনুকূল্যে যে ব্রতাচরণ করিব বলিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়া আমি

অধ্যয়ন লক্ষণরূপ সমৃদ্ধি এবং সত্যস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছি। বায়ু-দেবতা প্রজাপতি দেবতা প্রভৃতিকেও ঐরূপ বলা হয়। (২) আচার্য্য সমীপে সুগন্ধি জলের অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বলা হয়—জলে অনুপ্রবিষ্ট গোহ্য উপগোহ্য, মরুক, মনোহা, খল, বিরুজ, তনুদূষি [এই কুলদূষণ বা শরীরদূষণ *] দোষ সকল আমি ত্যাগ করিলাম, জল আমার স্নান যোগ্য হইল। (৩) জলের যে ঘোর ক্রূর অশান্ত দোষ †—তাহাও ত্যাগ করিলাম। (৪) উহাতে যে রুচিকর এবং দীপ্তিকর অগ্নি ‡ তাহাই গ্রহণ করিলাম এবং তদ্দ্বারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিলাম। তাহাতে যশঃ, তেজঃ, ব্রহ্মবর্চ্চস্, বল, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, দাঢ্য, অন্নাদি, ধন-সমৃদ্ধি, কান্তি এবং সম্মান লাভ হইবে। (৫) হে অশ্বিনীকুমার

---

* গোহ্য উপগোহ্যাদি আট প্রকার অগ্নিপদবাচ্য জলের দোষ আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিম্নোদ্ধৃত আটটি দোষের আধ্যাত্মিক রূপ হইলেও হইতে পারে—

কীটমূত্রপুরীষাস্ত শবকোথ প্রদূষিতং।
তৃণপর্ণোৎকরযুতং কলুষং বিষসংযুতং॥

† ঘোর, ক্রূর এবং অশান্তদোষের তাৎপর্য্য গুরুত্ব কফজনকতা, এবং ব্যাপারতা নামক আয়ুর্ব্বেদোক্ত দোষের অধ্যাত্মরূপ হইলেও হইতে পারে।

‡ আয়ুর্ব্বেদ মতে উৎকৃষ্ট জলের লক্ষণ এই—

নির্গন্ধমব্যক্তরসং ভৃষ্ণাঘ্নং শুচি শীতলং।
স্বচ্ছং লঘুচ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে।।

বেদবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট গোহ্যাদি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় সামশ্রমী মহাশয় বেদভেদে পাঠভেদাদির উদ্ধরণ পূর্ব্বক ভাব প্রকাশ ও চরকোক্ত নিম্নলিখিত জলের দোষকে গোহ্যাদি পদবাচ্য করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মহাদোষকরান্যষ্টাবিমানিতু বিশেষতঃ।
উচ্চৈর্ভাষং রথক্ষোভমতিচঙ্ক্রমণাশনে।
অজীর্ণাহিতভোজ্যেচ দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনং॥"
"হীনাতিমিথ্যাযোগেন বিদ্যতে তৎপুনস্ত্রিধা"

তোমরা যে কর্ম্মের দ্বারা অপুণ্যানাম্নী স্ত্রীর হিংসা করিয়াছ, এবং যাহার দ্বারা সুরাকে পণ্ডিত করিয়াছ, আর যাহার দ্বারা অক্ষক্রীড়াকে পরিত্যাজ্য করিয়াছ, এবং যে শোভন কর্ম্মের দ্বারা এই মহতী পৃথিবীকে অভিষিঞ্চিত করিয়াছ, সেই পবিত্র যশের ভাগী করিয়া আমাকে অভিষিক্ত কর।"

তাহার পর ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করিয়া সূর্য্যের প্রতি বলেন—"উদীয়মান আদিত্য অতিশয় দীপ্যমান দেবগণের সহিত [এবং প্রাতরাগত, মধ্যাহ্নাগত এবং সায়ংকালাগত হোমীয় দেবতাদিগের সহিত অবস্থিতি করুন। তাঁহারা যেমন [দশ জনের, শত জনের ও সহস্র জনের] ভরণকর্ত্তা আমাকেও তেমনি [দশ জনের, শত জনের, সহস্র জনের] ভরণকর্ত্তা করুন। আমি আদিত্যের সকাশে অর্থিরূপে উপগত হইতেছি ; তিনি অভিমত ফলদান দ্বারা আমার অনুকূল হউন। হে সূর্য্য! আমার পাপরূপ অনিষ্টকে ত্যাগ করাও। তুমি ত্রৈলোক্যের চক্ষুঃ এবং প্রতিব্যক্তির দর্শন-শক্তিও তুমি। চন্দ্র, ওষধি এবং ব্রাহ্মণের রাজা, তাঁহাকে তুমি বর্দ্ধিত কর। আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমার প্রতি প্রতিকূল হইও না।"

ইহার পর মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মেখলা মোচন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সুন্দর যজ্ঞোপবীত, মাল্য, উপানহ এবং বাঁশের দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

অনন্তর সপরিষদ আচার্য্যকে দর্শনপূর্ব্বক যে মন্ত্র পাঠ করেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

"সর্ব্বলোকবল্লভ যক্ষের (পূজোর) ন্যায় আমি যেন তোমাদের চক্ষুর প্রিয় হই— * * হে জিহ্বে। কখন কিছু ভুলিও না : আমাকে সর্ব্বদা শোভন বাক্য বলাইও। তুমি ওষ্ঠদ্বারা আবৃত এবং তুমি নকুলী [চঞ্চলস্বভাবা] ; তুমি দন্তদ্বারা পরিমিত না থাকিলে কখন কখন বজ্রবৎ হইয়া থাক।"

ব্রহ্মচারী আচার্য্য কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে গমন করিবেন।

গৃহস্থকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক জলের শোধন করিতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই আছে। দূষিত জলের ব্যবহার একান্ত পরিত্যাজ্য। পবিত্র জলের ব্যবহার গৃহস্থের একটী প্রধান পুণ্যলক্ষণ। দুষ্টা স্ত্রী এবং সুরা এবং অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন ও গৃহস্থধর্ম্মের অত্যন্ত ব্যাঘাতক, আর অনেকের পোষণ এবং জগতের সুখ শান্তির সম্বর্দ্ধন চেষ্টাই গৃহস্থের উচ্চ ধর্ম্ম। এই সকল তথ্যের উপলব্ধি পূর্ব্বক গৃহস্থ স্বয়ং লোকরঞ্জক এবং সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী এবং মিতভাষী হইবার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। কেমন সংক্ষেপে গৃহস্থ ধর্ম্মের সমস্ত সার কথাগুলি সমাবর্ত্তন সংস্কারের মধ্যে সুন্দররূপে বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে!

কর্ণবেধ—। উপনয়ন সংস্কারের সহিত যে চূড়াকরণের এবং সমাবর্ত্তনের মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। তদ্ভিন্ন, ইহাদের সহিত আরও একটা ব্যাপারের বিসদৃশ সংযোগ সাধন হইয়াছে। ঐ ব্যাপারের নাম কর্ণবেধ। এখন এদেশে উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া প্রথমে চূড়াকরণ নির্ব্বাহিত হয়, পরে নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের কর্ণবেধ করাইয়া তাহার উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে। কর্ণবেধ করায় যে ক্ষতাশৌচ নিবন্ধন উপনয়ন সংস্কারের বিঘ্ন হয় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই হয় না। বলা হয় যে, সঙ্কল্প করিয়া একবার কার্য্যারম্ভ করিলে কোন অশৌচ নিবন্ধন আরব্ধ কার্য্যের ক্ষতি হয় না। কারণ একটী বচন আছে—

ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥

কিন্তু উল্লিখিত বচনের এমন উদ্দেশ্য নয় যে, জানিয়া শুনিয়া আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচ উৎপাদন করিলে সে অশৌচ শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইবে না।

বস্তুতঃ, কি দক্ষিণাঞ্চল কি পশ্চিমাঞ্চল কোথাও এই কর্ণবেধ ব্যাপারটা

উপনয়নের অঙ্গীভূত নহে। বঙ্গদেশেরও মৈমনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে উপনয়নের সময়ে কর্ণবেধ করা হয় না। কেবল বঙ্গের মধ্যভাগেরই কয়েকটী জেলায় এই দুষ্টাচার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

কর্ণবেধটা কোন সংস্কারই নহে। কর্ণবেধে কোন মন্ত্রপাঠ নাই। কর্ণবেধ কার্য্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টী বচন পাওয়া যায় যথা—

কর্ণরন্ধ্রেরবেশ্ছায়া ন বিশেদগ্রজন্মনঃ।
তংদৃষ্ট্বা বিলয়ংযান্তি পুণ্যৌঘাশ্চ পুরাতনাঃ॥

যে ব্রাহ্মণের কর্ণরন্ধ্রে সূর্য্যের বিম্ব প্রবেশ না করে তাহাকে দর্শন করিলে পূর্ব্বপুণ্যসমূহ নষ্ট হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র শুষিরৌ কর্ণৌ ন ভবতো যদি।
তস্মৈ শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং দত্তঞ্চেদাসুরং ভবেৎ।

যদি কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট না হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হইলে সেই শ্রাদ্ধ আসুর শ্রাদ্ধ হয়।

কোন কোন অনার্য্যরীতিও যে আর্য্যাচারে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কর্ণবেধ ব্যাপারটা তাহার একটা দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাণে গহনা পরিধার উদ্দেশ্যেই কর্ণবেধের সৃষ্টি এবং পাহাড়িয়া অনার্য্যদিগের অনুকরণেই কর্ণের ছিদ্র বৃহৎ করিবার বিধান।

যাহাই হউক, কর্ণবেধ কার্য্যটী উচিতরূপে নির্ব্বাহিত হইলে উহা কোনরূপ পৌষ্টিক কর্ম্মের মধ্যে ধর্ত্তব্য হইতে পারে। অতএব কর্ণবেধ শিশুর বর্ষপরিমিত বয়সের মধ্যে নির্ব্বাহিত করিয়া এবং চূড়াকরণ ব্যাপারটিও তাহার তৃতীয়বর্ষে সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বোচ্চসংস্কার উপনয়নকে সাবসর এবং নির্ব্বিঘ্ন করা উচিত। সমাবর্ত্তন সংস্কারের সময় বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিলেই ভাল হয়।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

—*:*:*—

পঞ্চম অধ্যায়।

—:০:—

সংস্কার কর্ম্ম—যৌবন সংস্কার।

বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটী নিয়ম এই যে, আকর্ষণ প্রভাবে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহদ্বস্তুর সমীপস্থ হয়। স্থূল জড় পদার্থ সম্বন্ধীয় এই নিয়মটী যেন মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়েও খাটে। এই যে সংস্কার কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে, ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, মুখ্য সংস্কার উপনয়নটী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গৌণসংস্কার চূড়াকরণকে এবং পরবর্ত্তিকালের গৌণ সংস্কার সমাবর্ত্তনকে আপনার নিকটে টানিয়া লইয়াছে। এইরূপ হওয়াতে বিবাহই যৌবনাবস্থার একমাত্র সংস্কার হইয়া রহিয়াছে। এই সংস্কারে চতুর্ব্বর্ণের এবং সঙ্করজাতীয় লোকদিগেরও অধিকার আছে।

কিন্তু সকল প্রকার বিবাহই যে, শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতে পারে তাহা নহে। মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের কথা শুনা যায়, যথা—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এবং পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে অষ্টমটী অতি অধম।

উল্লিখিত আট প্রকারের মধ্যে আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কোন শাস্ত্রীয় সংস্কারের লক্ষণ নাই। সংস্কার লক্ষণ আর্ষ,

প্রাজাপত্য দৈব এবং ব্রাহ্ম বিবাহেই বিদ্যমান এবং তাহার মধ্যে পূর্ণ সংস্কার লক্ষণে লক্ষিত একমাত্র ব্রাহ্মবিবাহই এখন সমস্ত ভারতবর্ষে সমাদৃত এবং বিবাহের আদর্শরূপ বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়া আছে।

ব্রাহ্মাদি চারিটী সংস্কার-সাধক বিবাহের লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুত শীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত করিয়া জ্ঞানবান্ এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে স্বয়ং আহ্বানপূর্ব্বক দান করাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলে।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবংধর্ম্মং প্রচক্ষতে।

যজ্ঞকারী ঋত্বিক্‌কে সালঙ্কৃতা কন্যার দান দৈব বিবাহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায়ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষোধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥

বর-পাত্রের স্থানে একটী বা দুইটী গোমিথুন গ্রহণ করিয়া [তৎসহ] কন্যার দানকে আর্ষ বিবাহ বলে।

সহোভৌ চরতাংধর্ম্মমিতিবাচানুভাষ্যচ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যোবিধিঃস্মৃতঃ॥

উভয়ে একযোগে ধর্ম্মাচরণ কর এই কথা বলিয়া অর্চ্চিতকন্যার দানকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

উল্লিখিত চারি প্রকার অবিশুদ্ধ বিবাহ রীতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত থাকিলেও কালক্রমে সেই সকল বিবাহ রীতির লোপ হইয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-রীতিই প্রচলিত হইয়াছে। এই রীতি ব্রাহ্মণের রীতি বলিয়া আদর্শরূপে সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতনিবাসী আদিম লোকদিগের মধ্যে এবং মুসলমান প্রভৃতি আর্য্যেতর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের

মধ্যে, এবং অনেকানেক অন্ত্যজ বর্ণের মধ্যে, আর কোন কোন প্রত্যন্ত প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে, যদিও ব্রাহ্মবিবাহের রীতি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সকল লোকের মধ্যেই এই রীতি পূর্ণ-মাত্রায় প্রচলিত হইয়া আছে এবং অপর সকলের মধ্যেও (তুর্কের) এবং আচারের আকারে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মবিবাহরীতি প্রচলিত। যথায় ব্রাহ্মণেরা বৈশ্য শূদ্রাদির পরিগৃহীত আসুর বিবাহরীতি (অর্থাৎ কন্যা বিক্রয়ের রীতি) কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানেও বাহিরে ব্রাহ্মরীতির অনুসারেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সংস্কার মাত্রের সাধারণ অঙ্গ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং অধিবাস ভিন্ন, ব্রাহ্ম-বিবাহের প্রধান অঙ্গ তিনটী, অর্হণা বা অর্চ্চনা, কন্যাদান, এবং পাণিগ্রহণ।

অর্হণা——। ব্রাহ্মবিবাহে পাত্রের প্রতি যেরূপ ভক্তি এবং আড়ম্বর সহকারে পূজা করিবার বিধি আছে, যজ্ঞকারী প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌দিগেরও অর্চ্চনা করিবার সেই রীতি। শাস্ত্রীয় বচনও আছে "আচার্য্য ঋত্বিক্ স্নাতকো রাজা বিবাহঃ প্রিয়োতিথিশ্চ অর্হণীয়াঃ"। বোধ হয় 'দৈব' নামক বিবাহ প্রণালীতে ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান করিবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাই যেন ব্রাহ্মবিবাহের এই ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ইহার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ দৈব রীতিই যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এমত নহে; যেন আর্ষবিবাহ রীতিও কতকটা ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আর্ষরীতি এই যে, কন্যার পিতা বরপাত্রের স্থানে এক বা দুই গোমিথুন লইয়া তৎসহ কন্যাকে বরপাত্রে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্ম-বিবাহের এই অর্হণা ভাগে শাস্ত্রে আছে যে, একটী গোরু বিবাহ স্থলে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। বরপাত্র পূজা গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহে ব্রতী হইয়া সেই গোরুটীকে পাশমুক্ত করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্ষ-বিবাহের গোমিথুনটী কন্যার সম্পত্তি হইত এবং জামাতাকে সেই গোরু লইয়া যাইতে হইত। ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্নিবিষ্ট এই গোমোচন ব্যাপার

সেই পূর্ব্বকৃত্যেরই স্মারক হইয়া আছে এবং সেই জন্যই বিবাহের 'মধুপর্ক' দানে পশুর বধ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশ হইতে এই গোমোচন ব্যবহারটী একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এখন বিবাহস্থলে উপস্থিত নাপিত 'গো' শব্দের উচ্চারণ করিতেও যথাযথরূপে শিক্ষিত হয় না—সে "গৌর" "গৌর" বলিয়া চীৎকার করে এবং অপণ্ডিত শ্রোতৃবর্গ উহা নবদ্বীপাবির্ভূত মহাপ্রভুর নামোচ্চারণরূপ মঙ্গলধ্বনি বলিয়াই বুঝিয়া থাকে! ফলতঃ ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের লক্ষণ—ঢেলা মারা, গ্রামভেটী; গান্ধর্ব্ব বিবাহের লক্ষণ—শুভদৃষ্টি এবং স্ত্রী আচার এবং বাসর জাগরণ; আসুর বিবাহের লক্ষণ—পিতৃপক্ষ হইতে কন্যার জন্য গহনাদি গ্রহণের চেষ্টা—(যদি হয়); আর্ষবিবাহের লক্ষণ—নাপিত কর্ত্তৃক গৌর নামের উচ্চারণ; এবং দৈবের লক্ষণ—বরপাত্রের ঋত্বিক্ সদৃশ পূজা। এই সকল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইতে হয়। জগতে কি দ্রব্য-পদার্থ, কি ভাব-পদার্থ, কাহারই বিনাশ নাই এবং ভাব-সমুদ্ভূত আচার ব্যবহারাদিরও বিনাশ হয় না, পরিবর্ত্তমাত্র হয়।

কন্যাদান——। ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ মনে করেন যে, মনুষ্যসমাজের আদিম বর্ব্বর দশায় স্ত্রীলোকেরা কুলপতির দাসীরূপে গণ্য হইত অর্থাৎ কন্যারা পিতার দাসী বা সম্পত্তি ছিল। এই জন্য বিবাহকালে পিতৃকর্ত্তৃক কন্যার দান হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল এবং সেই জন্য সকল দেশেই কন্যাদান বিবাহের একটী অঙ্গ হইয়া আছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে, এ বিচারটী ঠিক নয়, তাহা একটী কথাতেই প্রমাণ হইয়া যায়। আমাদের প্রাচীন সংহিতার একটী বচনার্থ এই যে, যদি পিতা অথবা অপর কোন অভিভাবক বয়স্থা কন্যার দান বিষয়ে অবহেলা করেন, তবে কন্যা স্বেচ্ছাতঃ আপনাকে দান করিতে পারে। কন্যা যদি কাহারও দাসীরূপ সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাহার প্রতি ওরূপ স্বেচ্ছাচারের আদেশ থাকিতে পারিত না। প্রাচীন রোমীয়দিগের মতে কন্যাসন্তানের প্রকৃত দাসীভাবই ছিল; এই জন্য তাহারা কোনক্রমেই স্বয়ম্বরা হইতে

পারিত না। নব্য ইউরোপীয় গ্রন্থাদিতে ঐ রোমীয় প্রণালীকেই জাগতিক সাধারণ প্রণালী অনুমান করা হইয়াছে। আমাদের নব্যেরাও তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে দাস দাসী রাখিবার রীতি খুবই প্রবল। কিন্তু উহাঁদের মধ্যে কন্যাদানের প্রথা প্রচলিত নহে। অতএব ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিৎদিগের বিচার প্রণালীতে অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি এরং উভয় দোষই আছে। বস্তুতঃ যখন পিতা, পুত্র কন্যাদির প্রতি অন্যথাচরণ করিলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা আছে, তখন ভারতবর্ষে কন্যাদির প্রতি দাসীভাবের আরোপ নিতান্ত ভ্রম প্রসূত।

কন্যাদান প্রথাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বকালের দাসীভাবের স্মারক নয়, উহা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার এবং তজ্জন্য অস্বতন্ত্রতার অভিব্যঞ্জক এবং সেই জন্যই উহা প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এমন কি স্বৈরাচারের মূর্ত্তিমান অবতারস্বরূপ প্রাচীন জর্ম্মণদিগের মধ্যেও বিবাহ ব্যাপারের একটী অঙ্গ হইয়া আছে। মানুষ কোন অবস্থাতেই ঠিক পশুবৎ হয় না। এই জন্য মানবসমাজ মাত্রেই স্ত্রীলোক আপনি আপনাকে পুরুষসংসৃষ্ট করিতে লজ্জাবোধ করে। তাই অন্যে তাহার হইয়া তাহাকে পুরুষে সম্প্রদান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে সবর্ণা স্ত্রীতে কখনই দাসীভাবের আরোপ হয় নাই, তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বাধ্যায়ে দ্রৌপদীর দ্যূতপণ-ব্যাপারে বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়া আছে। মনুসংহিতাতেও সবর্ণাস্ত্রী বিবাহেই "সংস্কারের" উল্লেখ দেখা যায় এবং কন্যাদান ব্যাপারটী সংস্কার কার্য্যেরই অঙ্গীভূত। অতএব কন্যাদানের প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া কন্যার দাসীভাব বুঝিতে হয় না। নব্যদিগের প্রবোধের নিমিত্ত ইহাও বক্তব্য যে, ইউরোপীয় বিবাহেও কন্যাদানের একটী অভিনয় হইয়া থাকে।

কিন্তু ইউরোপীয় কন্যাদান যেরূপ দানের অভিনয় মাত্র, ব্রাহ্মবিবাহের দান সেরূপ অভিনয় মাত্র নহে। এ দানে সামান্য দ্রব্যদানের যে

যে লক্ষণ সে সমুদায় লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় আছে। সামান্য দানকার্য্যের লক্ষণ—(১) দাতার শুচিত্ব (২) দেয় দ্রব্যের অর্পণ (৩) তাহার নামোল্লেখ (৪) দেয় দ্রব্যের প্রতি উৎসর্গবোধক জলত্যাগ বা প্রোক্ষণ (৫) গ্রহীতার উল্লেখ (৬) গ্রহীতার স্বীকার। এই সকল দানাঙ্গগুলিই কন্যাদানে বিদ্যমান থাকে, এবং সর্ব্বশেষে গ্রহীতা কামস্তুতি পাঠপূর্ব্বক যেমন অন্যান্য দান গ্রহণও স্বীকার করেন, তেমনি কন্যাদানের গ্রহণও স্বীকার করিয়া থাকেন। বিবাহকার্য্যে কামস্তুতি শব্দটী শুনিলে উহা যেন কন্যার পত্নীত্ব রূপে গ্রহণ বুঝায় বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। কামস্তুতিরূপ মন্ত্রটির তাৎপর্য্য এই—

"এইটী" [প্রাপ্ত দ্রব্যটী] কাহার? কে কাহাকে দিল? কামই কামকে দিয়াছে। কামই দাতা। কামই প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে [সৃষ্টির আদিম সৃষ্ট পদার্থে] প্রবিষ্ট হইয়াছে। কামের সহায়েই আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম! এইটী [প্রাপ্তবস্তুটী] তোমারই।"

স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, উল্লিখিত স্তুতি স্ত্রীঘটিত সামান্য ভৌতিক কামের স্তুতি নহে। ব্রহ্মহৃদয়োত্থ সিসৃক্ষারূপ যে কাম আদিমসৃষ্ট বস্তু জল হইতে সমুদায় সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে এবং রজোগুণের উদ্রেক করাইয়া ভেদবুদ্ধির মূলস্বরূপে এককে অনেক করিয়াছে সেই কামই স্বয়ং দাতা এবং স্বয়ং গ্রহীতা হইয়াছে—এ স্তুতিটী সেই "অনাদি বাসনার" বা আধ্যাত্মিক কামের।

বরপাত্র কামস্তুতি পাঠ করিলে কন্যার দান এবং গ্রহণ শেষ হইল। দানের লক্ষণ দাতার স্বত্বের ধ্বংস এবং গ্রহীতার স্বত্বের উৎপত্তি। কন্যাতে পিতার যেরূপ স্বত্ব ছিল, তাহা নষ্ট হইল। পিতার অধিকার কন্যার পালনে, তাহার শিক্ষাসম্পাদনে এবং তাহার শ্রমের যথেচ্ছ বিনিয়োগে। কন্যার গ্রহীতারও ঐ সকল স্বত্ব জন্মিল। তিনি উহার পালন করিবেন, উহাকে শিখাইবেন এবং উহাকে নিজ গৃহকর্ম্মে খাটাইতে পারিবেন। কিন্তু ঐ কন্যার সহিত পতি-পত্নী ব্যবহার করায় ঐ দান কোন

অধিকার প্রদান করিতে পারে না। তাহার জন্য অপর একটী অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় এবং সেই অনুষ্ঠানটীর নাম পাণিগ্রহণ।

পাণিগ্রহণ—এই অনুষ্ঠানের অনেকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। সেই গুলির উল্লেখ করিলে আর্য্যদিগের প্রাচীন রীতি নীতি অনেকটা বুঝা যায়, এবং বিবাহ সংস্কারেরও সারভূত কথা সকল প্রকটিত হয়, এই জন্য সংক্ষেপতঃ সেগুলির বর্ণনা করিব।

প্রথমে যথাযোগ্য স্থানে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অগ্নি স্থাপন করিয়া এক জন এক কলস জল লইয়া এবং অপর এক জন একটী প্রতোদ লইয়া থাকিবে। এক খানি সূর্পতে চারি অঞ্জলি খই এবং শমীপত্র মিশ্রিত থাকিবে এবং এক খানি বেনার পাতের চেটাই প্রস্তুত থাকিবে, এবং একটী শিলা এবং শিলাপুত্র (লোড়া) রক্ষিত হইবে। অনন্তর কন্যাকে কোন সধবা ভাগ্যবতী স্ত্রীর দ্বারা উত্তম রূপে সম্মার্জ্জিতা এবং স্নাতা করিয়া বর তাহাকে আহত অর্থাৎ নূতন ধৌত শুভ্র সদৃশ সূক্ষ্ম বস্ত্র দুই খানি, শাটি এবং উত্তরীয়, পরিধান করাইবেন। বস্ত্র পরিধাপনের সময়ে বরপাত্র স্নেহ এবং সমাদর সহকারে যে মন্ত্রটী পাঠ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

(১) এই বসন প্রস্তুতকারিণী দেবীরা * জরাবস্থা পর্য্যন্ত সানন্দচিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র পরিধাপন করেন। হে আয়ুষ্মতি! তুমি বস্ত্র পরিধান কর।

(২) হে বস্ত্র পরিধাপয়িত্রী দেবীগণ! তোমরা আশীর্ব্বাদদ্বারা এই কন্যার পরমায়ু বৃদ্ধি কর। হে আর্য্যে! তুমি তেজস্বিনী হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাক এবং ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ কর।

এই রূপে কন্যার প্রতি স্নেহ, শুভাকাঙ্ক্ষা এবং সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বর পাত্র মনে মনে যে মন্ত্র পাঠ করিবেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

---

* অধিষ্ঠাতার কল্পনা করা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্রের সুস্পষ্ট রীতি।

(৩) চন্দ্র, এই কন্যাটীকে গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি আমাকে দিলেন, ধন এবং পুত্রও [ইহা হইতে] পাইব।*

এস্থলে স্নেহবান বরপাত্রের হৃদয়ে যেন কন্যাটীর রূপের উদয় হইয়া উঠিতেছে এবং সাংসারিক ধর্ম্ম পালনের অবশ্যম্ভাবী শুভফল সমূহের অনুভূতি জন্মিতেছে। ঐ সময়ে কন্যা যেনার পাতে প্রস্তুত কট (চেটাই) খানিকে পদদ্বারা ঘর্ষণ করত টানিয়া আনিবে। তাহার পঠিত অথবা তাহার হইয়া বরপাত্রের পঠিত মন্ত্রার্থ এই—

(৪) আমার পতি আমার জন্য সেই পথ প্রস্তুত করুন, যে কল্যাণময় বিঘ্নশূন্য পথদ্বারা আমি পতিলোক [অর্থাৎ ইহ পরলোকে পতির স্থান] প্রাপ্ত হই।

তাহার পর কন্যা বর উভয়ে একই কটে উপবিষ্ট হইবেন এবং বর কন্যার দক্ষিণ স্কন্ধে হাত দিয়া থাকিবেন এবং বর অগ্নিতে ছয়টি আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন অর্থাৎ উভয়েই যে আহুতি প্রদানরূপ একই ধর্ম্ম্য কার্য্য

---

* ইদানীং এই গৃহ্যসূত্রোক্ত মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যগ্রহ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ হইয়াছে বলিয়া যে একটী পৌরাণিক শ্লোকে ইহার অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, কাশীখণ্ড হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

কন্যাংভুংক্তে রজঃকালে হ্যগ্নিঃ শশীচ লোমদর্শনে
স্তনোদ্ভেদেতু গন্ধর্ব্ব স্তৎপ্রাগেব প্রদীয়তে।

রজঃকালে অগ্নি [অভিলাষরূপে], লোমদর্শন কালে চন্দ্র [সৌন্দর্য্যরূপে] স্তনোদ্ভেদ কালে গন্ধর্ব্ব [সুস্বর এবং গতি-বৈচিত্র্যরূপে]—কন্যাকে ভোগ করেন। এই জন্য এই সকল ঘটনার পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে।

বৈবাহিক বিধিটি কেমন পরিষ্কার কবিত্বের উপরেই সংস্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বোত্তম আর্য্য শাস্ত্রই যেমন এক পক্ষে দার্শনিক মতবাদের সহিত সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত ধ্যান, পূজা নীতি এবং অনুষ্ঠান প্রণালীর স্থাপনা করেন, তেমনি পক্ষান্তরে কবি হৃদয়োত্থ সুকুমার ভাবুকতাকেও সাংসারিক কার্য্যকলাপের ভিত্তি করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কবিত্বের মূলে "অনৃত" এই ভাব আর্য্য সম্মানিত নহে।

করিবেন। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষকে যে সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তাহা প্রাজাপত্য বিবাহে উপদেশ মাত্রে ছিল, ব্রাহ্ম বিবাহে তাহা কার্য্যেও নির্ব্বাহিত হইল। অতএব অন্যান্যরূপ বিবাহের ন্যায় প্রাজাপত্য প্রণালীও ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

আজ্যাহুতির মন্ত্রগুলি এই—

(১) দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি আগমন করুন। তিনি এই কন্যার ভবিষ্যৎ সন্ততিদিগকে মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত রাখুন এবং রাজা করুন (আবরণ দেবতা) এমন্ত অনুমতি করুন যে, এই স্ত্রী যেন পুত্রসম্বন্ধীয় ব্যসনাকৃষ্ট না হয়।

(২) ইহাঁকে গার্হপত্যাগ্নি রক্ষা করিতে থাকুন, ইহাঁর পুত্রেরা যেন জরাকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; ইনি যেন জীবৎপুত্র থাকিয়া পতির সহিত বাস করেন, এবং যেন সৎপুত্রজনিত আনন্দ উপভোগ করেন।

(৩) হে কন্যে! দ্যুলোক তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন, বায়ু এবং অশ্বিনীকুমার তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, তোমার স্তন্যপায়ী পুত্র দিগকে সবিতা রক্ষা করুন, তোমার বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর-ভাগ বৃহস্পতি রক্ষা করুন এবং তোমার পাদাগ্র প্রভৃতি শরীর ভাগ বিশ্বদেবা দেবগণেরা রক্ষা করুন।

(৪) হে কন্যে! রাত্রিকালে তোমার গৃহে যেন ক্রন্দনের শব্দ না উঠে। তোমার শত্রুগৃহেই তাহাদের স্ত্রীগণেরা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করে। রোদনদ্বারা তোমাকে যেন অন্তঃপুরবাসীদিগকে পীড়িত করিতে না হয়। তুমি সধবা থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে পুত্রাদি লইয়া পতিগৃহে সুখে বাস কর।

(৫) বন্ধ্যাত্ব এবং মৃতবৎসাত্ব প্রভৃতি মৃত্যুপাশ রূপ দোষ সকল তোমার মস্তক হইতে মালা উন্মোচনের ন্যায় উন্মুক্ত করিয়া শত্রুবর্গের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম।

(৬) মৃত্যু পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করুন। অমরভাব নিকটগামী হউন। হে মৃত্যো! প্রেত লোকের পথ লক্ষ্য করিয়া পরাঙ্মুখ হও! উৎকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তি বিশিষ্ট [সন্তান] তোমার নিকট প্রার্থনা করি। (যে সদ্যোজাত শিশুর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি সবল তাহার মস্তিষ্ক ও যে সতেজ হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।) আমার পুত্রদিগকে হিংসা করিও না।

উল্লিখিত ছয়টি আহুতি প্রদান শেষ হইলে কন্যা শিলাখণ্ডের উপর একটি পদার্পণ করিয়া লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন এবং বরপাত্র তাঁহাকে বলিবেন—

(১) এই শিলাখণ্ডে আরোহণ কর। তুমি এই শিলার ন্যায় দৃঢ় এবং অবিচলভাবে অবস্থিতি কর। শত্রুর পীড়ন কর এবং কখন শত্রুকর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইও না।

(২) এই নারী অগ্নিতে খই দিয়া বলিতেছেন, আমার পতি দীর্ঘ জীবী হউন, শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকুন এবং আমার জ্ঞাতিগণ বর্দ্ধিত হউন।

(১) হে কন্যে! বিষ্ণু অন্নলাভের জন্য এক পদ অতিক্রম করাইলেন (২) বললাভের জন্য দ্বিতীয়; (৩) পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্য কার্য্যের জন্য তৃতীয়, (৪) সৌখ্যের জন্য চতুর্থ; (৫) পশুলাভের জন্য পঞ্চম। (৬) ধনরক্ষার জন্য ষষ্ঠ; (৭) ঋত্বিক্ লাভের জন্য সপ্তম।

স্বামীসহ সপ্তপদ গমনকারিণী স্ত্রী বিষ্ণুদেব কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন স্বামীর সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের সহায়া হইলেন। তাঁহা হইতে পুত্র জন্মিবে এই প্রার্থনাও হইয়া গিয়াছে। অতএব উভয়ের পতি-পত্নী-ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল। *

কিন্তু পতিপত্নীভাব সম্বন্ধ করিয়া দিয়াই আর্য্যশাস্ত্র নিশ্চিন্ত হইলেন না। ঐ ভাব হইতে পরস্পরের প্রতি যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় উপস্থিত হয় স্থূলতঃ তাহার নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন।

(১) হে সপ্তপদ গমনা কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হইলে। আমি তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম। আমাদিগের সুদৃঢ় সংস্থাপিত এই সখ্য যেন বিচ্ছেদকারিণীদিগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়, প্রত্যুত হিতৈষিণী-দিগের সদুপদেশ দ্বারা যেন ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

(২) হে দ্রষ্টৃবর্গ! তোমরা সকলে এই অগ্নিসমীপে আইস এবং এই বধূকে কল্যাণকারিণীরূপে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বচন দ্বারা সৌভাগ্যবতী করিয়া গমন কর

(৬) হে কন্যে! তুমি শ্বশুরে, শ্বশ্রূতে, ননন্দাতে ও দেবরে সম্রাজ্ঞী [অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে রঞ্জনকারিণী] হও।

(৭) হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অবধারণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর। তুমি একমনা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর। বৃহস্পতি (বৃহন্মনোদেব) তোমাকে আমার প্রসন্নতা সাধনার্থ নিযুক্ত করুন।

(৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩) হে কন্যে! তোমার শরীরস্থ রোমসন্ধির মূর্দ্ধপ্রদেশে, এবং পক্ষ্মে, এবং নাভিরন্ধ্রে, কেশে, দর্শনে, রোদনে, স্বভাবে ভাষণে, হসনে, দন্তমধ্যে, দন্তে, হস্তদ্বয়ে, পদদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, জননেন্দ্রিয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, অন্যান্য প্রদেশে, এবং সমস্ত শরীরে যে কোন দোষ থাকে তাহা আমি পূর্ণাহুতি এবং আজ্যাহুতি দ্বারা উপশমিত করিলাম। [অর্থাৎ স্ত্রীর সকল দোষ সংশোধন করায় স্বামীর অধিকার। স্ত্রীর যে কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে তাহা স্বামীর ক্রিয়ার দোষেই থাকিয়া যায়। এই তথ্যের ভাব স্থাপিত হইল।]

(১৪) যে প্রকারে দ্যুলোক, ভূলোক এবং দৃশ্যমান চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ এবং পর্ব্বত, ইহারা ধ্রুব (স্থির), সেইরূপ এই স্ত্রীও পতিকুলে স্থিরা হইবেন—

(১৫) অন্নরূপ পাশ ও মণিতুল্য প্রাণ সূত্রের দ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রন্থিদ্বারা হে বধূ! তোমার মন এবং হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি।

(১৬) হে বধূ! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক!

তাহার পর রথারোহণ পূর্ব্বক দম্পতী স্বগৃহে গমন করিবেন এবং যাইবার পূর্ব্বে এই কয়েকটী প্রার্থনা করিবেন।

(১) পথিমধ্যে দস্যুগণ যেন তাঁহাদের গমন জানিতে না পারে। (২) বরবধূযুক্ত গৃহে গো, অশ্ব, এবং পুত্র প্রসূত হউক, এবং সহস্র দক্ষিণক যজ্ঞ যে দেবতার প্রসাদে সম্পাদন হয়, সেই আদিত্যদেব

প্রসন্ন হউন। (৩) হে বধু! এই গৃহে তোমার ধৈর্য্য হউক, আত্মীয়-দিগের সহিত মিলন হউক, এই গৃহে রতি হউক, এবং বিশেষতঃ আমাতে ধৃতি, মিলন, এবং রতি হউক।

পতিকে পত্নীর সহিত এবং পত্নীকে পতির সহিত সর্ব্বাতোভাবে মিলাইবার, দুইটীকে একটী করিয়া তুলিবার জন্য, আর্য্যশাস্ত্র যেমন চেষ্টা পাইয়াছেন এমন আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রই করিতে পারেন নাই। "ততোবিরাড় জায়ত" এই বেদোক্তির ব্যাখ্যা পূর্ব্বক মনু বলিয়া-ছেন—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারীতস্যাং স বিরাড়মসৃজৎপ্রভুঃ।

প্রভু [ব্রহ্মা] আপনার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া অর্দ্ধে পুরুষ এবং অর্দ্ধে স্ত্রী সৃষ্টি দ্বারা বিরাটের নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অতএব বিবাহ সংস্কারের দ্বারা পূর্ব্বে বিভাজিত দুইটীর পুনর্ব্বার একী-করণ হয়। যজুর্ব্বেদীয় পাণিগ্রহণের একটী মন্ত্র এই—

আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী, তোমা বিনা আমি শূন্য। তুমি আমার লক্ষ্মী। আমি সামবেদ তুমি ঋক্‌বেদ, আমি আকাশ তুমি পৃথিবী। আমরা দুইয়ে মিলিয়াই পূর্ণ।

এই গভীরতম ভাবের ছায়া য়িহুদীদিগের শাস্ত্রেও পড়িয়াছে এবং সেই শাস্ত্র হইতে মুসলমান এবং খৃষ্টানও কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হই-য়াছে। উহারা সকলেই বলে যে, আদিম পুরুষের শরীর হইতে স্ত্রী শরীরের উৎপত্তি। অতএব বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে যে স্ত্রী পুরুষের পুনরেকীকরণ হয়, এই ভাবের আভাস উহাদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উহাদের একীকরণ ব্যাপার পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনরূপ অনুষ্ঠানে এবং চুক্তিমূলক স্বীকার বাক্যে, সুতরাং সংস্কার-মূলক নয় বলিলেই হয়। এই জন্য উহা তেমন দৃঢ় এবং চিরস্থায়ীও হয় না। আর্য্যদিগের বৈবাহিক একীকরণ প্রকৃত একীকরণ। ইহার

ফলতঃ শ্রাদ্ধ কার্য্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা-রূপ অনুষ্ঠান। সুতরাং ইহাতে ভেদ-বুদ্ধির স্থল অতীব প্রশস্ত। এই জন্য শ্রাদ্ধকৃত্যে সমষ্টীভূত বিশ্বের অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতি সাক্ষাৎ লক্ষ্য গুণীভূত, এবং ব্যষ্টীভূত বিশ্বের অর্থাৎ বিশ্বেদেবা নামক গণের প্রতি লক্ষ্য অধিক পরিস্ফুট। বিশ্বেদেবাদিগের নামগুলি শুনিলেই বুঝা যায় যে, উহারা জগতে নিহিত বাহ্যাভ্যন্তরিক দ্রব্য-শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতিরই অধিষ্ঠাতৃরূপে পরিকল্পিত। শ্রাদ্ধসম্বন্ধে ইহাঁদের সামান্য অধিকার থাকিলেও ইহাঁরা দশভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চযুগ্মকরূপে অবস্থিত, যথা—

বসুসত্যো, ক্রতুদক্ষৌ, কামকালৌ, ধুরিলোচনৌ,
পুরুরবামাদ্রবাশ্চ, বিশ্বেদেবা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ধন এবং সত্য, যজ্ঞ এবং দক্ষতা, সময় এবং ইচ্ছা, ভারগ্রাহিতা এবং পরিণাম দৃষ্টি, এবং স্থলজাত ও জলজাত দ্রব্য নিচয়, ইহাঁরাই বিশ্বেদেবা নামে পরিকীর্ত্তিত হয়েন।

এই পঞ্চযুগ্মকের অধিষ্ঠানভূত পঞ্চ প্রকার বিশেষ বিশেষ শ্রাদ্ধকৃত্যও নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—

ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দক্ষঃ, সত্যোনান্দীমুখে বসুঃ,
নৈমিত্তিকে কামকালৌ, কাম্যেচ ধুরিলোচনৌ,
পুরুরবামাদ্রবাশ্চ পার্ব্বণে সমুদাহৃতৌ।

ইষ্টি শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষের, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসু এবং সত্যের, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধে কাম এবং কালের, কাম্যশ্রাদ্ধে ধুরি এবং লোচনের, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পুরুরবা এবং মাদ্রবসের বিশেষ অধিকার উক্ত হইয়াছে।

বিশ্বেদেবাগণের আবাহন মন্ত্রেও উহাঁদিগকে শক্তিস্বরূপতা স্পষ্টোক্তি-ধানে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

আগচ্ছন্তু মহাভাগাঃ বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ।
যে যত্রবিহিতা শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে॥

হে মহাভাগ! হে মহাবল! বিশ্বেদেবাগণ আপনারা আগমন করুন

এবং শ্রাদ্ধের যে স্থলে যিনি বিহিত হইয়াছেন তিনি তথায় অবহিত হইয়া অবস্থিত হউন।

বিশ্বেদেবাগণ শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃ শক্তি সমূহ। ইহাঁরা শ্রাদ্ধ কৃত্যে স্থূলতঃ করণরূপেই আহূত এবং পূজিত হয়েন। কিন্তু ইহাঁরা শ্রাদ্ধ কৃত্যে সর্ব্ব প্রধানরূপে পূজার্হ নহেন। শ্রাদ্ধের প্রধানতম উদ্দেশ্য পিতৃগণ। ইহাঁরা বসু, রুদ্র এবং আদিত্যরূপে পূজনীয়। ইহাঁদিগের ধ্যান যথা—

প্রসন্নবদনা সৌম্যা বরদং শক্তিপাণয়ঃ।
পদ্মাসনস্থা দ্বিভুজা বসবোষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥

প্রসন্ন বদন, সৌম্যমূর্ত্তি, বরদাতৃভাব, শক্তিহস্ত, পদ্মাসনাসীন, দ্বিভুজ, —অষ্টবসু।

করেত্রিশূলিনোকায় দক্ষিণে চাক্ষমালিনঃ।
একাদশ প্রকর্ত্তব্যা রুদ্রাস্ত্র্যক্ষেন্দু মৌলয়ঃ॥

বামকরে ত্রিশূল, দক্ষিণকরে অক্ষমালা, ত্রিনয়ন, চন্দ্রচুড়- একাদশ রুদ্র।

পদ্মাসনস্থাদ্বিভুজা পদ্ম গর্ভাঙ্গকান্তয়ঃ।
করাদি স্কন্ধ পর্য্যন্তং নালপঙ্কজধারিণঃ।
ইন্দ্রাদ্যা দ্বাদশাদিত্যা স্তেজোমণ্ডলমধ্যগাঃ॥

পদ্মাসনস্থ, দ্বিভুজ, পদ্মগর্ভকান্তি, স্কন্ধ পর্য্যন্ত উন্নত পদ্মনালধারী, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, ইন্দ্র প্রভৃতি—দ্বাদশ আদিত্য।

এই একত্রিংশৎ শ্রাদ্ধদেবতারা সপত্নীক। পত্নীগণ ইহাঁদের অন্তর্নিবিষ্টরূপেই ধ্যেয়। আর মানব দেহধারী পূর্ব্বপুরুষেরাও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া ইহাদিগেরই অন্যতমরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। পিতা বসুরূপে পিতামহ রুদ্ররূপে, এবং প্রপিতামহাদি আদিত্যরূপে চিন্তনীয়।

পিতৃগণের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে। এইজন্য আমাদের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন। আমাদের অমাবস্যা পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন এবং সেই জন্য অমাবস্যা তিথিই পিতৃগণকে ভোজন প্রদান করিবার অর্থাৎ শ্রাদ্ধের মুখ্যকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

শ্রাদ্ধে করণাধিষ্ঠাতৃ বিশ্বেদেবাগণ এবং মুখ্য পূজাপাত্র পিতৃগণ ভিন্ন আরও কয়েকটী দেবতার পূজা আছে; যথা—(১) বাস্তুপুরুষ অর্থাৎ যে বাটীতে শ্রাদ্ধ হয় সেই বাটীর অধিষ্ঠাতৃদেব (২) যজ্ঞেশ্বর অর্থাৎ যজ্ঞমাত্রের অধিষ্ঠাতৃ নারায়ণদেব (৩) ভূস্বামী পিতৃগণ অর্থাৎ যে ভূমিতে শ্রাদ্ধ হয় সেই ভূমির স্বামীর পিতৃপুরুষরূপ দেব (৪) সগঙ্গ দেশে (অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভজাত দেশে) গঙ্গাদেবীর—ইহাঁদিগের প্রত্যেকের পূজা করিয়া এক একটী ভোজ্য দান করিতে হয়।

এই অনুষ্ঠানগুলির পরে শ্রাদ্ধ করিবার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃত-শ্রাদ্ধ কার্য্যের আরম্ভ। ঐ কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগকে ভোজন দান। মৃত ব্যক্তিকে ভোজন দান প্রতিনিধি গ্রহণ দ্বারাই হইতে পারে। অতএব শ্রাদ্ধে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিনিধি গ্রহণ করাই সর্ব্ব প্রধান অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বকালে বিদ্যা, চরিত্র এবং আচারপূত ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বপুরুষের প্রতিনিধিস্বরূপে নিমন্ত্রিত করা হইত। এখন তেমন ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়াছে মনে করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা আর সাক্ষাৎ প্রতিভূরূপে প্রায়ই ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হয় না। কুশের দ্বারা দর্ভময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। সেই কুশময় বটুকেই আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং ভোজনাদি প্রদান করা হয় এবং তাহাকেই বাক্‌যত হইয়া থাইতে বলা হয়।

আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার শ্রাদ্ধে এবং সকল স্থানে এবং সকল অবস্থাতে দর্ভবটুর নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ খুব ভাল ছিলেন, এখন তেমন ভাল নাই, একথা স্বীকার করিলেও এখন যে কেবল দর্ভময় ব্রাহ্মণেরই নিয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ স্বীকার করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ মনে করিয়া যখন অনেকানেক ব্রাহ্মণের স্থানে দীক্ষা

অন্যত্র হয় না। শ্রাদ্ধের অর্থ শ্রদ্ধাসহকৃত দান। শ্রদ্ধার অর্থ বিশ্বাস। অতএব যদি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হয় যে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পূর্ব্ব পুরুষদিগের তৃপ্তি হইবে, তাহা হইলেই শ্রাদ্ধ-কৃত্য সম্পন্ন হইতে পারে।

কিন্তু শাস্ত্রই বা ঐ কথা কিরূপে বলিবেন? অনুমান হয় যে শাস্ত্র-সম্মত কথাগুলি এইরূপ—আত্মার বিনাশ নাই; সুতরাং দেহটা ভস্মী-ভূত হয় বলিয়া আত্মাধিষ্ঠিত পিতৃ দেবতায় তৃপ্তিগ্রহণ সামর্থ্য নষ্ট হয় না, এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে সর্ব্বের সর্ব্বাত্মকতা স্বীকার হইয়া আছে, তাহাতেই অভীষ্ট ব্রাহ্মণ ভোজনে পূর্ব্ব পুরুষের তৃপ্তি সিদ্ধি হয়।

এই স্থলে একটী প্রকৃত কথা বলি। কোন ব্যক্তি একটী বালকের প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিয়াছিলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক পুত্রনির্ব্বিশেষে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ভাগ্যবলে বালকটী বেশ এক জন কৃতী পুরুষ হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন সময়ে একটী অন্যায়াচরণ করায় আপনার সেই পূর্ব্বোপকারীর বিরাগভাজন হইয়া পড়িল। সেই বিরাগে লোকটী বড়ই ক্ষুণ্ণমনা হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া কৃতোপকারের ঋণ পরিশোধ করিবে, তজ্জন্য চিন্তাকুল হইয়াছিল। এমন সময় এক জন পরম জ্ঞানী পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং কথায় কথায় তিনি আপনার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানী পুরুষ বলিলেন—"যিনি তোমায় উপকার করিয়াছেন, তিনিও খুব সৌভাগ্যশালী পুরুষ। তিনি দুরবস্থায় পতিত হইলে তুমি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পার, এবং তোমার ঋণ শোধ হয়, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা করাতেও পাপ আছে, অতএব তুমি প্রতিনিধি গ্রহণরূপ চরমোপায় অবলম্বন কর, অর্থাৎ তুমি বাল্যকালে যেমন দীন হীন ছিলে সেইরূপ দীন হীন কাহাকেও সন্ধান করিয়া বাহির কর এবং তোমার প্রতি যেরূপ যত্ন প্রদর্শন হইয়াছিল, তুমি তাহার প্রতি সেইরূপ যত্ন প্রদর্শন কর। তাহা হইলেই তোমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন হইবে এবং

তোমার ঋণের পরিশোধ যত দূর হওয়া আবশ্যক তাহাও হইবে। সকলেই সেই একের মূর্ত্তিভেদ বইত নয়।"

"সকলেই সেই একের মূর্ত্তিভেদ বইত নয়"—অর্থাৎ "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং"। সুতরাং দেখা গেল যে, যে সমষ্টিজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আর্য্যশাস্ত্রের অন্তীভূত, শ্রাদ্ধকৃত্যের বাহ্যভাগে তাহা পূর্ণবিয়বে প্রকটিত না হইলেও শ্রাদ্ধকৃত্যের অভ্যন্তরে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা সহকারে সেই একত্ববোধটী পূর্ণমাত্রাতেই বিরাজিত রহিয়াছে।

অপর, যে যে জাতির মধ্যে পিতৃ পুরুষের স্মরণসম্ভূত শ্রাদ্ধানুরূপ কোন কৃত্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের কাহাতেও এই উচ্চতম ভাব দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষতঃ কাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পতি এবং পুত্র কন্যাদির সমাধিস্থানে গিয়া থাকেন এবং গোরের উপর পুষ্প বিক্ষেপ করেন এবং শোক করেন এবং ঈশ্বরের নিকটে অথবা সাধুদিগের নিকটে মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অক্ষয় স্বর্গ কামনা করেন। কিন্তু এই কার্য্য পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট নয়—ইহা যাঁহারা করেন তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সমাধি সমীপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং কোরাণ পাঠ করা অতি সংকার্য্য বলিয়াই প্রশংসিত এবং তাহা মৃত ব্যক্তিরও সদ্গতির পক্ষে সহায় স্বরূপে গণ্য হয়। ঐ ভাবের অবলম্বনেই মুসলমানদিগের জগদ্বিখ্যাত হর্ম্ম্যকীর্ত্তিসমূহ সংস্থাপিত হইয়া আছে।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে (চীন, জাপান এবং ব্রহ্মাদি দেশে) শ্রাদ্ধকৃত্য অতি বাহুল্যরূপেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধ, নবমাসিক শ্রাদ্ধ এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনেক প্রকার শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে এবং সে গুলিতে ভূরি দান এবং ব্রাহ্মণ, নট, ভোজন, কীর্ত্তনাদি যথেষ্ট হয়। বৌদ্ধ দেশে পিতৃ পুরুষদিগের নামে সংস্থাপিত ধর্ম্মকীর্ত্তির

অভাব নাই। কিন্তু বৌদ্ধ জাতীয়েরা কেহই মৃত ব্যক্তির প্রতিভূস্বরূপ অপর কাহাকেও কল্পনা করিয়া লয় না। তাহারা যে বস্ত্র ভোজ্যাদি দান করে তাহা সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষের জীবাত্মাকেই দান করিতেছে মনে করিয়া দান করে; যেন সেই মৃত ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছেন এবং যেন কোন অনুজ্ঞা বা উপদেশ প্রদান করিবেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে নিজের মুখচক্ষের ভাব ভঙ্গী এইরূপ করিয়া অতি বিনম্র এবং প্রযত হইয়া থাকিতে হয়।

আর্য্যের শাস্ত্রই সকল দিকে ন্যায়-সঙ্গত হইয়া চলেন। ইহাতেই "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যটী আছে। সুতরাং ইহাতেই প্রতিভূ স্বীকারের পথ সুবিস্তৃত। ইহাই শ্রাদ্ধকৃত্যে পিতৃপুরুষগণের পরোক্ষ অধিষ্ঠান প্রদান করিতে সক্ষম; ইহাই পিতৃগণকে দেবতারূপী করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ শরীরে স্থাপনা করিতে পারে।

শ্রাদ্ধকৃত্যের মন্ত্রগুলিতেও বহুত্বের সহিত একত্বের মিশ্রণ দেখা যায় অথবা একত্বের উপরে বহুত্বের আবরণ মাত্র অন্তর্ভাগে একত্বের বীজ বিশ্লিষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধকৃত্যের মধ্যে প্রধানতম পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের কতকগুলি মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ লেখা যাইতেছে।

(১) গায়ত্রী। ইহার তাৎপর্য্য অন্য প্রকরণে উক্ত হইয়াছে।

(২) "দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি—এই মন্ত্রটী অনেক বার পাঠ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই—দেবতা, পিতৃগণ, মহাযোগী সকল, স্বধা [পিতৃপত্নী] এবং স্বাহা [অগ্নিপত্নী] ইহাঁদিগকে নমস্কার করি, যেন নিত্যই এইরূপ ক্রিয়ার [পিতৃপুরুষের তৃপ্তিসাধন ক্রিয়ার] অনুষ্ঠান হয়।

(৩) "মধু বাতা" ইত্যাদি। এইটীও অনেক বার পড়িতে হয়—সমস্ত ঋতুর বায়ুগণ মধুময় হউক, নদীগণ মধুক্ষরণ করুক, ওষধি সকল মধুফল প্রদান করুক, রজনী মধুরূপ হউক, প্রাতঃকাল মধুযুক্ত হউক, পৃথিবীর রজঃ মধুময় হউক আকাশ মধুময় হউক পিতা মধুযুক্ত হউন,

অগ্নি তপ্তমন্ত্র হউন এবং এই যজ্ঞকর্ম [illegible] পিতৃপুরুষের তৃপ্তিসাধক হয়, এজন্য [illegible] থাকি।]

(৪) "অগ্নিদগ্ধা" ইত্যাদি—আমার বংশে যাঁহারা অগ্নিদানে মৃত হইয়াছেন অথবা যাঁহাদের দাহ সংস্কার হয় নাই, ভূমিতে দত্ত এই পিণ্ড দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হউন এবং তৃপ্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হউন।

(৫) "যেষাং ন মাতা" ইত্যাদি—যাঁহাদের পিতা মাতা এবং বন্ধুবর্গ অন্নদাতা কেহই বর্তমান নাই এবং যাঁহাদের অন্নসিদ্ধি নাই, পৃথিবীতে প্রদত্ত এই পিণ্ড তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখময় লোকে লইয়া যাউক।

(৬) 'বাজে বাজে" ইত্যাদি—বিশ্বমূর্তিধারী এবং অমৃত দেহ প্রাপ্ত [বিগ্রহ, এর বিগ্রহসচিত দেব শরীর বা জ্ঞানময় বস্তু, উভয়ের অবরোধ ব্যতিরেকে পূজা হয় না] পিতৃগণ এই দত্ত অন্নের রক্ষা করুন এবং যে যে সময়ে অন্ন পরিকল্পিত হয় সেই সেই সময়ে অন্নের রক্ষা করুন, আর আমাদিগের ধনাদি দ্রব্যকেও রক্ষা করুন, এবং এই অন্ন সম্বন্ধীয় মধু গ্রহণপূর্বক তৃপ্তিলাভ করুন, এবং দেবগণ যে মার্গদ্বারা গমন করেন সেই প্রসিদ্ধ পথে গমন করুন।

(৭) "আমাধাজগু" ইত্যাদি—প্রদত্ত অন্নের ফল আমাকে বার বার প্রাপ্ত হউক, এই দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপ আমাকে বার বার প্রাপ্ত হউক, এবং পিতা মাতা আমাকে প্রাপ্ত হউন, এবং পিতৃগণের রাজা সোমদেব আমাকে মুক্তি দানের নিমিত্ত প্রাপ্ত হউন।

(৮) "পৃথিবী তে পাত্রং ইত্যাদি—বিশ্বাধার পৃথিবী তোমার পাত্র এবং আকাশ তোমার আচ্ছাদন, তুমি অমৃতস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ব্রাহ্মণের মুখে তোমাকে হোম করিতেছি। [ব্রাহ্মণে বিকল্পরূপ দুই করিবার বিধি ঘটিত হইল।]

(৯) "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি—বিষ্ণু ত্রিলোকে পদক্ষেপ করিয়া

ছিলেন। তাহাতে পৃথিবীর ধূলাও তাঁহার চরণস্পৃষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে [সুতরাং সেই পার্থিব রজঃসঙ্গাত] এই ভক্ষ্য হবিও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

(১০) "যা দিব্যা আপঃ" ইত্যাদি—যে স্বর্গীয় অন্তরীক্ষ সম্ভূত সলিলসমূহ ক্ষীরের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন [শৈত্য মাধুর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াছেন] সেই পানীয় কল্যাণপ্রদ এবং আনন্দপ্রদ হইয়া ব্রাহ্মণগণের হস্তে সুখ হুত হউক।

(১১) "তিলোসি" ইত্যাদি—তুমি তিল বলিয়া বিখ্যাত। সোমদেব তোমার দেবতা। তুমি তোমার দাতার স্বর্গ প্রাপক। তুমি আমাদের পিতৃগণকে চিরকাল স্বধা [ব্রহ্মার মানসীকন্যা—পিতৃপত্নী] দ্বারা প্রীত কর।

(১২) "যবোসি" ইত্যাদি—তুমি যব বলিয়া খ্যাত, তুমি আমাদিগের কৃত্রিম শত্রুবর্গের ভেদ বিধান কর এবং সহজ শত্রুবর্গের সংহতি ন্যূন কর, আমরা তোমাকে স্বর্গগমনের নিমিত্ত, নভোগতির নিমিত্ত, পৃথিবী লাভের নিমিত্ত, উপাসনা করি। পিতৃ সদন প্রাপ্ত লোকেরা শুদ্ধিলাভ করুন। হে যব! তুমি পিতৃদিগের আশ্রয়।

(১৩) "শন্নোদেবী" ইত্যাদি—এই জল আমাদের কল্যাণ প্রদান করুন, এবং অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত; এবং কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সম্মুখবর্ত্তী হউন।

(১৪) "দাতারো" ইত্যাদি—আমাদিগের দাতৃগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, আমাদিগের জ্ঞান, স্তুতি, এবং শাস্ত্র বিশ্বাস অপগত না হউক, আমাদিগের দেয় বস্তু এবং অন্ন বহু হউক, আমরা অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকটে অনেকে যাচ্ঞা করুক, আমরা কাহারও স্থানে যাচ্ঞা না করি, অন্ন নিত্য বর্দ্ধিত হউক, দাতৃবর্গ শত বর্ষ আয়ু বিশিষ্ট হউন।

যাঁহাদিগের উদ্দেশে এই ব্রাহ্মণগুলি [প্রতিভূরূপে] কল্পিত হইয়াছেন তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হউক, এই সকল আশীর্বাদ সত্য হউক এবং পিতৃপ্রেতের প্রসন্নতা হউক।

করা যাইতে পারে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও যেন ইহা মানিতেন বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে তিনি পরমেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ পিতৃ সম্বোধন করিতে শিক্ষা দিতেন না। অতএব খৃষ্টীয় মতেও পিতৃভক্তি ঈশ্বর ভক্তির প্রতিরূপ স্বরূপ অথবা তৎশিক্ষার সোপান স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য।

(৩) আজি কালি এক সম্প্রদায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের চক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মটা যাহাই হউক, কিন্তু হিন্দুর ত্যাজ্যপুত্র বুদ্ধধর্ম্মই নীতিবিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যাত। সেই ধর্ম্মে পিতৃভক্তির স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে; বুদ্ধদেব আপন পিতারও দীক্ষাগুরু হইয়া তাঁহার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই আখ্যায়িকার দ্বারা তাঁহার জগৎগুরুত্ব প্রখ্যাপিত করিতে গিয়া বুদ্ধধর্ম্ম পিতৃভক্তিকে কতকটা খাট করিয়া ফেলিয়াছে। বৌদ্ধেরা দয়াকেই সকল ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া লইয়া থাকেন।

(৪) মুসলমান ধর্ম্মেও পিতৃভক্তির স্থান উচ্চ নয়। সমুদায় কোরাণের মধ্যে কোন একটী স্থানেও ঈশ্বরের প্রতি পিতৃ সম্বোধন অথবা পিতৃভাব ব্যক্ত হয় নাই। পেগম্বর সাহেবের স্ত্রীগণের প্রতি যদিও মাতৃভাব ব্যক্ত করা মুসলমান মাত্রের প্রতি বিধেয় বলা হইয়াছে, তথাপি পেগম্বর সাহেবকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতৃ সম্বোধন করিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ আছে। মুসলমান তাঁহার শাস্ত্রোল্লিখিত ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান হইয়া থাকিতেই শিক্ষিত—তিনি ঈশ্বরের একান্ত প্রভুভাব এবং আপনার একান্ত বশ্য ভাবেই নিময়।

(৫) আর্য্যধর্ম্মের মধ্যেও যাঁহারা ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখিতে যত্নশীল এবং শেষ বিকাশটীর আদর করিতেই উন্মুখ তাঁহারা শুনিতে পান যে সমস্ত পুরাণ, স্মৃতি এবং তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ হইয়াও নবদ্বীপাবির্ভূত মহাপ্রভুও তাঁহার বর্ত্তিত প্রণালীতে পিতৃভক্তির স্থান তেমন উচ্চে স্থাপন করেন নাই, কারণ তাঁহার অনুগামীরা বলেন যে, তিনি আবেশ-কালে বরং মাতা শচীদেবীর মস্তকে পদার্পণ

করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবলক্ষণা ভক্তির অতীত একটী মধুর ভাবের আবিষ্কার করিয়া সখিভাব অথবা পতিপত্নী প্রেমকেই ঈশ্বর প্রেমের আদর্শীভূত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাই জগদীশ্বরকে প্রাণেশ্বর বলিয়া থাকেন।

আর্য্যধর্ম্মের একাঙ্গ মাত্র এবং অন্যান্য ধর্ম্ম প্রণালীর সমস্ত লইয়া তুলনা করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে আর্য্যধর্ম্মই পূর্ণ—অপর সকল আংশিক এবং কোন কোনটি অতিভাবুকতা দোষে ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রত, পূজা, পর্ব্বাদির বিষয়।

আজ কাল সকলে ধর্ম্মের মতবাদ ও বিচার লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু ব্রত পালন দ্বারা সংযম, একাগ্রচিত্ততা, পরোক্ষদৃষ্টি দান প্রভৃতির সদভ্যাস যে ধর্ম্ম শরীরের একটি প্রধান অঙ্গ তাহা কেহ দেখেন না। সুনীতি ও সদাচার পরায়ণ হইবার এবং ঐ পথে উৎকর্ষ পাইবার জন্য ব্রত পালনের শিক্ষা মুখ্য উপায়। ব্রত = সদাচারের অভ্যাস = Discipline

এই অধ্যায়ে ব্রত, পূজাদি কৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইবে। অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় এই অধ্যায়েরও প্রধান অবলম্ব স্মার্ত্ত শিরোমণির অষ্টাবিংশ তত্ত্ব। কিন্তু স্মার্ত্ত শিরোমণির কৃত্য-তত্ত্বে যে সকল ব্রত পূজাদির উল্লেখ আছে সেগুলি কেবল আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত। এই অধ্যায়ে কিয়ৎ পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। কারণ কোন্ কোন্ ব্রত পূজাদি সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপক, তাহা জানিবার জন্য সহজেই কৌতূহল হয়; এবং এখন রেলওয়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ পরস্পর সংযোজিত হওয়ায় ঐ কৌতূহলের পূরণ পূর্ব্বাপেক্ষায় স্বল্পায়াসসাধ্য হইয়াছে। কৌতূহল পূরণের উপলক্ষে অনেকানেক প্রকৃত তথ্যেরও অবগতি এবং বিসম্বাদের মীমাংসা হইতে পারে।

দ্বাদশ মাসের যে পর্ব্বাহ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে (১) অনেকগুলি পর্ব্ব ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ সাধারণ; (২) অপর কতকগুলি একই সময়ে এবং একই অনুষ্ঠানে নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও এক বলিয়া বিবেচ্য; আর (৩) কয়েকটী কৃত্য নামে এবং অনুষ্ঠানে একরূপ হইয়া কালে বিভিন্ন হইলেও এক বলিয়া ধর্ত্তব্য।

পর্ব্বাহ তালিকার পরীক্ষায় ইহাও প্রতীতি হইবে যে, এক প্রদেশে

যাহা সামান্য কৃত্য, প্রদেশান্তরে তাহাই ব্রত, এবং অন্য প্রদেশে তাহাই আবার অতি প্রসিদ্ধ পূজা। ইংরাজী শিক্ষিতেরা যে ক্রম-বিকাশ-বাদকে ইউরোপের অভিনব আবিষ্কার মনে করিয়া পরম সমাদর করেন, পর্ব্বাহ তালিকার মধ্যেও সেই সূত্রের যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতেছে, কার্ত্তিক মাসের যে শুক্লা নবমীতে দাক্ষিণাত্যেরা স্নান দান মাত্র করেন, পঞ্জাব, কাশ্মীর এবং গুজরাট প্রদেশে সেই শুক্লা নবমীর নাম দুর্গা নবমী এবং তাহাতে উপবাসাদি করিয়া ব্রত করিতে হয়। আবার আমাদের বঙ্গদেশে ঐ শুক্লা নবমীই জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। এরূপ হইবার কারণ, দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণু-তন্ত্রতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীদিগের অপেক্ষাকৃত শক্তিতন্ত্রতা এবং বঙ্গবাসীদিগের ততোধিক শক্তি-তন্ত্রতা। কিন্তু দুর্গানবমীর সম্বন্ধে যেমন দেশভেদে উহার বিভিন্ন পরিণামের হেতু পাওয়া গেল, অপরাপর সকল কৃত্যের স্থলে পরিণতির হেতু তেমন সহজে আবিষ্কৃত হয় না। সেই সকল স্থলে শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেশকালাভিজ্ঞ মহাশয়দিগের অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আরও একটী বিষয়ে বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, এবং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি-দিগের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হওয়া উচিত। স্থূলতঃ বলা যায় যে, ধর্ম্ম্য ব্যাপার মাত্রেরই তিন প্রকার তাৎপর্য্য হইয়া থাকে। এক প্রকারকে আধ্যাত্মিক বলা যায়, অপর দুই প্রকারের নাম আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। অনেকানেক স্থলে ধর্ম্মকার্য্যগুলির এই তিন প্রকার অর্থই কার্য্যানুষ্ঠানের মন্ত্রাদিতে সুব্যক্ত থাকে। কিন্তু সর্ব্ব স্থলে সমান ভাবে থাকে না এবং শাস্ত্রশিক্ষার ন্যূনতা এবং গুরূপদেশের খর্ব্বতা নিবন্ধন, ধর্ম্মক্রিয়া সকলের যে তাৎপর্য্যগুলি অতি বিস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া নাই, সেগুলি উন্মুক্ত করিবার জন্য তেমন চেষ্টাও হয় না; সুরতাং ঐ সকল তাৎপর্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। সেগুলির যথাসাধ্য উন্মোচন চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি গুরুবাক্য

স্বরূপতঃ স্মৃতিপথারূঢ় থাকে এবং তাহা অবিকল অনুবাদ করিতে পারা যায়, তবে অবশ্যই কতক লুপ্তার্থ প্রকাশিত হইয়া কিছু ফল দর্শিতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ প্রকারে ভাবগ্রহ করা আর্য্য-শাস্ত্রেই বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সচেতন জীব শরীরের সহিত পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপারের যে সম্বন্ধ হয় তাহা সহৃদয় এবং অন্তর্দর্শনে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে উল্লিখিত ত্রিবিধ ভাবের উৎপত্তি করে। প্রথমতঃ, আত্মাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আরোপসম্ভূত সেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি জন্মিলেই উহার আধিভৌতিক ভাব উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দ্রষ্টার আত্মায় আরোপিত হইয়া উহাতে শক্তিগুণাদির অনুভব হইলে অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞান জন্মে; ইহা হইতেই আধিদৈবিক ভাবের উৎপত্তি। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শক্তি বা গুণময় রূপ দ্রষ্টার আত্মায় প্রতিভাত হইলে আধ্যাত্মিক ভাবের গ্রহণ হয়। কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা উল্লিখিত লক্ষণগুলিকে বিশদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা যাইতেছে। (১) তোমার সম্মুখে একটী পদ্মফুল রহিয়াছে। তুমি সেই পদ্মের গোলাকার, সৌগন্ধ, কোমলতাদি অনুভব করিয়া পদ্মকে যে সকল গুণের আধার জ্ঞান করিতেছ, তাহাতেই উহার আধিভৌতিক ভাব জন্মিয়াছে। তুমি যখন সেই পদ্মকে শোভার আধারস্বরূপ মনে করিয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীর অনুভব করিতেছ, তখন তোমার মনে আধিদৈবিক ভাবকে আপনার অন্তর্নিহিত করিয়া হৃদয় পদ্মে পরম পুরুষের স্থান নিরূপণ করিতেছ, তখন তোমার আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হইতেছে। (২) এখানে সেখানে অনেক স্থলেই জল দেখিয়া জলের গুণ জানিলে, আধিভৌতিক জ্ঞান জন্মিল। জল শরীরের ক্লেদ নষ্ট করে, পিপাসা অপনীত করে, মাতৃস্তন্যের ন্যায় পোষণ করে জানিয়া যখন উহাতে শক্তির আরোপণ করিলে তখন তোমার হৃদয়ে জলদেবতার আবির্ভাব হইল। অনন্তর যখন জলকে

আদিম সৃষ্ট বস্তু জানিয়া তাহার স্রষ্টাকে শিবতম রসস্বরূপে আপনাতে স্মরণ করিলে তখন জলের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ হইল। (৩) সূর্য্য লোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইতেছে জানিয়া আধিভৌতিক জ্ঞান জন্মিল। সূর্য্য শক্তি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার স্পন্দন হইতেছে জানিলে আধিদৈবিক বোধ উপস্থিত হইল। জগতের পক্ষে সূর্য্যও যাহা শরীরের পক্ষে হৃৎপিণ্ডও তাহা এবং যিনি হৃদয়াধার তিনিই জ্ঞানাধার এই প্রতীতি হইলে আধ্যাত্মিক ভাবোদয় হইল।

বস্তুতঃ সকল বিষয়গুলিই আমরা এই ত্রিবিধরূপে বুঝিতে চাই এবং তাহা না পাইলে আমাদের ক্ষোভ মিটে না। সুতরাং পরাহতাগুলির সম্বন্ধেও ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হওয়ার প্রয়োজন আছে। ঐরূপ ব্যাখ্যার পথ যেরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইবে।

(ক) জীব সমষ্টির নাম ব্রহ্মা একথা বহুকালাবধি শুনা যাইতেছে। ব্রহ্মার ধ্যানে যে যে উপাদানের সন্নিবেশ আছে সেই উপাদান গুলির অর্থবোধ করিতে পারিলেই ঐ চির প্রচলিত বাক্যের তাৎপর্য্য বোধ হইতে পারে। (১) ব্রহ্মা ঘোর রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণটী রাগের বা বাসনারবোধক। জীবে বাসনা আছে। জীবে শুদ্ধ বাসনা আছে এমত নয়। শাস্ত্র এবং দর্শন উভয়ের মতে বাসনাই জীব জনমের হেতু। অতএব রক্তবর্ণতা জীবের বোধক। (২) ব্রহ্মা চতুর্মুখ। এই চতুর্মুখ শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, যথা (অ) ভূচর, জলচর, খেচর, উভচর; (আ) জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ; (ই) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; (ঈ) ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ববেদ চতুষ্টয়। স্থলভেদে এই চারি প্রকার ব্যাখ্যাই সঙ্গত হয়। (৩) ব্রহ্মা অক্ষমালাধারী। অক্ষ * শব্দে ইন্দ্রিয়, অতএব

* অক্ষমালা।—অক্ষ শব্দে ইন্দ্রিয় না লইয়া অন্য অর্থও লওয়া যায়।

অক্ষমালা অর্থে ইন্দ্রিয় সমূহ। জীবে ইন্দ্রিয় সকল আছে। (৪) ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী। কমণ্ডলু * শব্দে জলের বিবিধরূপের সংরক্ষণ বুঝায়। বস্তুতঃ জীব শরীর জলেরই বিবিধ বিকার সম্ভূত। জলের একটী নামই জীবন। (৫) ব্রহ্মা হংস-বাহন। হংস + শব্দে নিশ্বাস প্রশ্বাস। জীব মাত্রেই নিশ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া ‡ বাঁচিয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, জীব-সমষ্টি যেমন ব্রহ্মার আধিভৌতিক ভাব তেমনি জীবের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব তাঁহার আধিদৈবিক ভাব এবং আত্মাতে যে রজোগুণাত্মক বাসনা প্রতিভাত, হয়, তাহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব।

(খ) শুনা গিয়াছে যে, মনুষ্যবুদ্ধিতে চিন্ময় পরব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর রূপই অতি সুসঙ্গত। এস্থলে বিষ্ণুর ধ্যানে যে যে উপাদানের কথা আছে, সেগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বিষ্ণু শ্যাম বর্ণ। মেঘ শূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম এবং শ্যাম বর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদদিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকারী। তদ্ভিন্ন, মেঘ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ বিশ্বপালন কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর চারি হস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি? শঙ্খ বস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ। অতএব শঙ্খ আকাশের স্থানীয়

---

* কমণ্ডলু—কস্য জলস্য মণ্ডং (মণ্ডনং) লাতি রক্ষতি ইতি কমণ্ডলু।
† হংস—হকারো বহির্যাতি সকারেন বিশেৎ পুনঃ!
‡ হংসেতি সততং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
ণ শব্দ—শব্দং গুণমাকাশং।

হইয়াছে। চক্র কলিচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা * শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্ত বিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্ত কাল, জ্ঞান এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণ মাত্র জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপ কল্পনাও হইয়াছে। তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় † শব্দে বাঙ্ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ঔপনিষদ পুরুষ বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে, আকাশ বা বিষ্ণুপদ যাঁহার আধিভৌতিকরূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।

(গ) যদি মহাদেবের ধ্যান লইয়া বিচার করা যায়, তবে প্রথমতঃ তাঁহার শুভ্রবর্ণতা লক্ষিত হয়। শ্বেতবর্ণে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বুঝায় এবং সকল বর্ণের সম্মিলন বুঝায়, অর্থাৎ উহা নির্বিকল্প এবং সাম্যাবস্থার দ্যোতক। কাহার সাম্যাবস্থা? যাহাতে বর্ণের ‡ কল্পনা হইয়াছে সেই অজীবী প্রকৃতির অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বলিতে হইবে। সেই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি ক্রিয়া নিরুদ্ধ, সুতরাং উহা মহাপ্রলয়বোধক। দ্বিতীয়তঃ শিবের হস্তস্থিত ত্রিশূলটীও কিঞ্চিৎ বিশিষ্টার্থে ঐ ভাবেরই দ্যোতক। ত্রিশূলের উপরিভাগের তিনটী ফলা অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, এবং তমোগুণ পরস্পর পৃথক্‌ভূত, অতএব উহা সৃষ্টিকালকে

* গদ্ ধাতু ভাষণ বা প্রকাশার্থে কর্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন।

† গরুত্—গৃ নিগরণে ধাতু উস প্রত্যয়যোগে গরুস পদ সাধিত হইয়াছে।

‡ বর্ণ কল্পনা—"কালো হি লোহিত শুক্লকৃষ্ণা"।

বুঝায়। কিন্তু ত্রিশূলের নিম্নভাগে ঐ তিনটি ফলা একত্রিত হইয়া আছে, অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইয়াছে। ঐ অবস্থার নামই মহা প্রলয়। অতএব মহাদেবে সৃষ্টিকাল এবং লয়-কাল উভয় কালই বুঝা যায়। তৃতীয়তঃ মহাদেবের অপর হস্তে ডমরু যন্ত্র। ডমরু বাদ্য যন্ত্র শব্দের জ্ঞাপক, সুতরাং আকাশের বোধক। চতুর্থতঃ মহাদেব ত্রিনেত্র। নেত্র তিনটী—চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, সুতরাং তিনি বিরাটরূপ। পঞ্চমতঃ মহাদেবের বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। ধর্ম্মই চির-কাল স্থায়ী, এমন কি প্রলয় কালেও স্থায়ী। এই জন্য প্রলয়ের অব-সানে পুনর্ব্বার যে সৃষ্টি হয়, তাহাতে পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মানুসারেই জীবের মধ্যে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, মহাদেবের আধিভৌতিক ভাব সৃষ্টি এবং প্রলয় সমন্বিত মহাকাল। তাঁহার আধিদৈবিক ভাব মহাকালের ধ্যানগম্য দেবরূপ, এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব সমাধি।

সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই ত্রিদেবের ধ্যান যেরূপে বর্ণিত হইয়া আছে, তাহাই একে একে বিচারিত হইয়া উহা-দিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ভাব প্রকটিত হইল। তদ্ভিন্ন ঐ বিচার দ্বারা ইহাও প্রকাশিত হইল যে, আর্য্যশাস্ত্র (১) পরব্রহ্মের রূপ কল্পনায়, চতুর্হস্ত, (১) বিরাটের রূপ কল্পনায়, ত্রিক্ষেত্র, (৩) মহাকালের রূপ কল্পনায় শুভ্রবর্ণ এবং ত্রিশূলহস্ত এবং (৪) জীবের রূপ কল্পনায় রক্তবর্ণতা ও চতুর্মুখতা প্রদান করিয়া আপ-নার অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ণিত চারিটী সূত্রের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে অনেকানেক নূতন ভাবের প্রকাশ এবং নূতন নূতন সূত্রেরও আবিষ্কার হয়। ইহাও স্মরণ রাখা আব-শ্যক যে, সকল দেবতারই ধ্যান সেই পরব্রহ্মের পূর্ণ বা অপূর্ণ বিকা-শের চেষ্টা মাত্র। সুতরাং অভ্রান্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন আর্য্যশাস্ত্র দেবতার নাম

এক রাখিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানে পরব্রহ্মের অংশ বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে করিতে পারেন যথা;—মহাদেব কোন ধ্যানে পরব্রহ্ম, কোন ধ্যানে মহাকাল, কোন ধ্যানে জীব, কোন ধ্যানে পৃথিবী বা জল স্বরূপ। এই কথায় উদাহরণ স্বরূপে অপর কয়েকটী দেবমূর্ত্তি লইয়া বিচার করা যাইতেছে।

(ঘ) কালিকাদেবীর ধ্যানে দৃষ্ট হয় যে, তিনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, গলে মুণ্ডমালা এবং হস্তে সদ্যচ্ছিন্নমুণ্ডধারিণী, অভয়া এবং বরদাত্রী, দিগম্বরী এবং মুণ্ডমালার রক্তে ভূষিতা, দুইটী শব বা বাণ ইহাঁর দুই কর্ণের ভূষণ, ইনি ঘোরদংষ্ট্রা, পীনোন্নত পয়োধরা, শবের কর সংঘাতে বিনির্ম্মিতকাঞ্চী ধারিণী, সৃক্কণীদ্বয় হইতে গলদ্রক্তা, শ্মশানালয়বাসিনী ত্রিনয়ন, মহাদেবের হৃদয়স্থিতা, চতুর্দ্দিকে শিবাগণ দ্বারা বেষ্টিতা, মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা, এবং সুখপ্রসন্ন-বদনা।

এই ধ্যানের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে, কালিকা চতুর্ভুজা, অতএব প্রথম সূত্রানুসারে ইনি মুক্তিদাত্রী পরব্রহ্মস্বরূপা; কালিকা ত্রিনয়না, অতএব দ্বিতীয় সূত্রানুসারে ইনি বিরাট্ বা বিশ্বরূপিণী; কালিকা মহাকালের হৃদয়োপরি অবস্থিতা, অতএব প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা, অর্থাৎ সৃষ্টি-রূপিণী; কালিকা রুধির চর্চ্চিতা অতএব (তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ একান্ত অপরিজ্ঞেয়া হইয়াও) চতুর্থ সূত্রানুসারে জীববোধক রক্তবর্ণ দ্বারা বিভূষিতা।

পূর্ব্ব সূত্রগুলির প্রয়োগে এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল। কিন্তু অপর কতকগুলি বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন আছে; যথা (১) মুণ্ডমালা কি? (২) হস্তধৃত সদ্যচ্ছিন্ন মস্তক কি? (৩) দুইটী কর্ণের ভূষণ শব বা বাণ দুইটী কি? (৪) জীবের করসংঘাত বিনির্ম্মিত কাঞ্চী কি? (৫) শ্মশানালয় বাস কি? এবং (৬) শিবাগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকাই বা কি?

মুণ্ডমালা অর্থে অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষরমালা। অক্ষর দ্বারা সকল

বস্তুরই নামরূপাদি লিখিত হইতে পারে, এইজন্য অক্ষরমালা সর্ব্ব দ্রব্যের স্বরূপ বলিয়া পরিগৃহীত। অতএব মুণ্ডমালা ভূষণে কালিকা দেবী যে সর্ব্বময়ী তাহাই ব্যক্ত হইল।

হস্তধৃত ছিন্নমস্তক,—অহং বোধের দ্বারা সর্ব্ব হইতে জীবের বিচ্ছিন্ন ভাব। জীব অভিমান দোষে আপনাকে সর্ব্ব হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করে; আপনাকে সর্ব্বেরই অংশমাত্র মনে করে না, কিন্তু জীব সর্ব্বকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া না থাকিলে তাহার স্থিতিই অসম্ভব হয়। জীবের সহিত সর্ব্বেশ্বরীর প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তি হইল।

দুইটী কর্ণের ভূষণ শব বা বাণ দুইটী—চন্দ্র এবং সূর্য্য। দক্ষিণা কালী দেবীকে উত্তরাভিমুখী মনে করিয়া কৃষ্ণবর্ণ আকাশ তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ কেশের স্থানীয় এবং সেই কেশদাম আলুলায়িত রহিয়াছে, মনে মনে এই চিত্র দেখিলেই বুঝিবে যে, পূর্ব্বচক্রবাড়ে পূর্ণিমার চন্দ্র এবং পশ্চিম চক্রবাড়ে অস্তগামী সূর্য্য, ইহারাই দেবীর দুই কর্ণের দুইটী বলয় স্বরূপ হইয়া আছে। ধূমাবতীর স্তোত্রে কর্ণভূষণের এইরূপ অর্থ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, যথা "বামে কর্ণে মৃগাঙ্কং প্রণয় পরিগতং দক্ষিণে সূর্য্যবিম্বং"।

শবের করসংঘাত বিনির্ম্মিত কাঞ্চী—দেবীর শরীর যে ভূতপঞ্চক কর্ত্তৃক আবৃত রহিয়াছে, এই তথ্যের জ্ঞাপক। শব * শব্দের অর্থ জল। জল পঞ্চ ভূতের স্থানীয়। অতএব সৃষ্টিকর্ত্রী কালিকার আবরণ পঞ্চভূত। ফলতঃ আমরা পঞ্চভূতের কৃতি বা গুণই দেখিতে পাই। উহার ভিতরে আদ্যাশক্তির গূঢ়ভাবে অবস্থান অনুভব দ্বারা বুঝিতে হয়।

শ্মশানালয় বাস অর্থে—পঞ্চভূত মধ্যে অবস্থিতি + অর্থাৎ ভূতপঞ্চক যথায় অবস্থিতি করে সৃষ্টি শক্তি তাহাতেই অনুপ্রবিষ্টা।

---

* শব—জল (মেদিনী)

+ শ্মশান—মহাস্থাপিচ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।

শেরতেঽত্র শবোভূত্বা শ্মশানং তত্ততোঽভবৎ॥

শিবাগণ বেষ্টিত—অর্থে সমূহ মঙ্গল * দান বিশিষ্টা।

কালিকা দেবীর রূপক ধ্যানটীর উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে যে কয়েকটী সূত্রের সঙ্কলন হয় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। (১) কৃষ্ণবর্ণতা—অপ্রতর্ক্যতা বা অপরিজ্ঞেয়তার বোধক (২) মুণ্ডমালা—বর্ণমালার স্থানীয় (৩) ছিন্নমুণ্ড—জীবের অন্ধ-স্বাতন্ত্র্যতা। (৪) দিগম্বরত্ব সর্ব্বব্যাপকত্বের জ্ঞাপক (৫) ঘোরদংষ্ট্রা—বিনাশ শক্তির বোধক, (৬) পীনোন্নত পয়োধর—পালন-পটুতা, (৭) সৃক্কণীদ্বয় হইতে গলদ্রক্তা—বিনাশ হইতেই জীবের সৃষ্টি, এই তথ্যের প্রকাশ। (৮) বিপরীত-রতাতুরা, অর্থাৎ শক্তিনিবেশ ব্যতিরেকে শুদ্ধ কাল-স্বধর্ম্মে সৃষ্টি হয় না এই তথ্যের সংস্থাপন।

আরও কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বকথিত চারিটী এবং এই আটটি সর্ব্বশুদ্ধ এই বারটী সূত্র স্মরণে যে আরও অনেকানেক দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহার প্রদর্শন এবং সূত্রপ্রয়োগের কতকটা প্রণালীও স্পষ্ট করা যাইতেছে।

(৯) তারা—দশমহাবিদ্যার প্রথমা বা আদ্যা কালিকা, দ্বিতীয়া তারা। শ্লোকাদিতে দুইটী নাম পর পর থাকে বলিয়াই যে, কালিকা প্রথমা এবং তারা দ্বিতীয়া, এমত নহে। কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি †। কথিত আছে যে, কৌষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকারূপ ধারণ করিলেন। কালিকা সর্ব্বময়ী, তারা বিশ্বময়ী ধরিত্রীরূপিণী।

তারা দেবীর ধ্যান এই—তিনি প্রত্যালীঢ়পদা, ঘোরা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, খর্ব্বা, লম্বোদরী, ভীমা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতা, নবযৌবনসম্পন্না, পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরপ্রদা, অপসব্যভুজদ্বয়ে খড়্গকর্ত্তৃ সমাযুক্তা, সব্যভুজদ্বয়ে কপালোৎপল সংযুক্তা, মস্তকে পিঙ্গোগ্রৈক

---

* শিবা—শিবং কল্যাণং ভবতি অস্যা।

† "বিনিস্থতাম্বা দেব্যোঽস্ত মাতঙ্গ্যাঃকায়তস্তদা।
ভিন্নাঞ্জননিভাকৃষ্ণা" কালিকা পুরাণ।

জটা, অক্ষোভ্যভূষিতা, ত্রিলোচনা, অলচ্চিতা মধ্যগতা, ঘোরদংষ্ট্রা, করাল-বদনা, স্বাবেশে হাস্যমুখী, ত্র্যলঙ্কার পরিহিতা, বিশ্বব্যাপকতোয়-মধ্যগত-শেষ পদ্মোপরিস্থিতা।

(১) প্রত্যালীঢ়পদা—যুদ্ধ গমনোদ্যতা। বামাদিগের বামপদ অগ্রবর্ত্তী হয়, এ কথাটী অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত।

(২) ঘোরা—অর্থাৎ ভয়ানকা। কালিকার এবং তারার মূর্ত্তিতে রুদ্র এবং ভয়ানক রসের আবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মুণ্ডমালা বিভূষিতা—ষষ্ঠ সূত্রানুসারে দেবীর বিশ্বময়িত্ব প্রখ্যাপিত হইল।

(৪) খর্ব্বা—কৌষিকী মূর্ত্তি হইতে নিঃসৃতা সুতরাং সেই সর্ব্বময়ী হইতে খর্ব্বাকার বিশিষ্টা।

(৫) লম্বোদরী—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীত্ব সূচিত হইল।

(৬) ভীমা—পূর্ব্বোক্ত "ঘোরা" শব্দের দ্বারাও এই ভীমা বা ভয়ানকা ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

(৭) ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃত—ব্যাঘ্র শব্দটী * গন্ধের উপাদান অর্থাৎ মৃত্তিকার বোধক। ধরিত্রী রূপিণী তারা মৃত্তিকাবরণে আবৃতা।

(৮) নবযৌবন সম্পন্না—ধরিত্রীর যৌবন অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং প্রসব ক্ষমতা চিরস্থায়ী।

(৯) পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতা—তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে তারার পঞ্চমুদ্রাকে পঞ্চ কপাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কপাল † অর্থে জলধর বা মেঘ, অতএব পঞ্চ কপাল বা পঞ্চ মেঘ অর্থাৎ চারি গজ এবং পর্জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ মেঘমালা।

---

* ঘ্রা গন্ধোপাদানে ইতি বি+আ+ঘ্রা ধাতু ক প্রত্যয়েন ব্যাঘ্রঃ। গন্ধবতী পৃথিবী।

† কপালঃ—কং জলং পালয়তি ধারয়তি ইতি কপালঃ মেঘ :।

(১০) চতুর্ভূজা প্রথম সূত্রানুসারে পরব্রহ্মময়ী।

(১১) লোলজিহ্বা বিনাশোন্মুখতার জ্ঞাপক।

(১২) খড়্গ, কর্ত্তৃ, কপাল, উৎপল—খড়্গ কালের, কর্ত্তৃ জ্ঞানের পানপাত্ররূপ কপাল আকাশের এবং উৎপল জীবের বোধক।

(১৩) পিঙ্গোগ্রৈক জটা—অন্য ধ্যানে এই জটার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "ধং শিখন্তি জটামেকাং" পৃথিবীর বর্ণনাতেও লিখিত হইয়াছে—"মধ্যে পৃথিব্যা মদ্রীন্দ্রোভাস্বান্ মেরু হিরণ্ময়ঃ, যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতি মুচ্ছ্রিতঃ" অতএব সুমেরুর এই শৃঙ্গই ঐ জটাস্থানীয়।

(১৪) অক্ষোভ্যা ভূষিতা,—অক্ষোভ্য * অর্থে যাহা বিচলিত হয় না অখণ্ডদণ্ডায়মান আকাশ। তাঁহার আকার সর্পের আকার। সর্প কুণ্ডলী করিয়া বৃত্তাকার হয় বলিয়া উহা আদ্যন্তরহিত অনন্তের স্থানীয়। অতএব পৃথিবীর শিরোদেশে কপাল বা মেঘ এবং তাহার উপর অনন্ত আকাশ। তারা স্বয়ং ইহার প্রতি দেব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—

"মমমৌলিস্থিতং দেবমবশ্যং পরিপূজয়েৎ"।

(১৫) ত্রিলোচনা—পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রানুসারে বিশ্বরূপিণী।

(১৬) জলচিতা মধ্যগতা—সর্ব্বদা সূর্য্যরশ্মি পরিবেষ্টিতা। পৃথিবীর ধ্যানেও তাঁহাকে "বহ্নি শুদ্ধাংশুকাধানাং" অগ্নি বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা বলা হইয়াছে।

(১৭) বিশ্বব্যাপক তোয়ান্তঃশ্বেত-পদ্মোপরিস্থিতা—পৃথিবী সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে "জলে তাং স্থাপয়ামাস পদ্মপত্রং যথাহ্রদে।"

(চ) ষোড়শী—কালী এবং তারামূর্ত্তিতে গুহ্যাতিগুহ্য সৃষ্টিশক্তিকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া ধ্যানের উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে। ষোড়শীর ধ্যানে পালন কর্ত্তৃত্বের ভাবটীই প্রধান অবলম্বন। ষোড়শীতে যেমন

---

* অক্ষোভ্য—ক্ষুভ বিলোড়নে ইতি নঞ্ পূর্ব্বক ক্ষুভ্ ধাতু য প্রত্যয়ে সিদ্ধ।

ঐশ্বর্য্যের তেমনি সৌন্দর্য্যের অতি বিপুল বিস্তার। ইহাঁরই সেবা করিয়া কামদেব স্বয়ং সৌন্দর্য্য সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ষোড়শী পাশাঙ্কুশকরা, রক্তপদ্মোপবিষ্টা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, সজ্যধনু এবং পঞ্চবাণহস্তা; অর্থাৎ চতুর্হস্তা এবং ত্রিনেত্রা ষোড়শী দেবী পরব্রহ্মময়ী এবং বিশ্বরূপিণী হইয়াও বিশিষ্টরূপে জীবের অধিষ্ঠাত্রী-রূপেই প্রদর্শিতা। সেই জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবার নিমিত্ত পাশ এবং তাহাদিগকে প্রকৃত পথে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে সজ্যধনু চক্রাকারের এবং টঙ্কারের দ্যোতক বলিয়া একাধারেই কাল এবং আকাশের বোধক হইয়াছে। পাঁচটী বাণ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞাপক।

(ছ) ভুবনেশ্বরী—ইনিও রক্তবর্ণা, চন্দ্রকিরীটিনী, তুঙ্গকুচা, নয়ন-ত্রয়যুক্তা, হাস্যমুখী বর, পাশ, অঙ্কুশ, অভয়হস্তা। অতএব ভুবনেশ্বরী দেবীও জীবাধিষ্ঠাত্রী এবং জীবের পালনকর্ত্রী। ভুবনেশ্বরী বিশ্বময়ী, আনন্দময়ী, বরদাত্রী, অভয়দাত্রী, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সংযমকারিণী এবং তাহাদিগের প্রেরয়িত্রী। ভুবনেশ্বরীতে পাশ এবং অঙ্কুশ, চক্র এবং কর্ত্তরির স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বর এবং অভয় মুদ্রা; আকাশের এবং জীবের স্থান লইয়াছে।

(জ) দেবী অন্নপূর্ণা যদিও দশমহাবিদ্যার মধ্যে নামিত নহেন তথাপি ইনিও ভুবনেশ্বরী দেবীরই মূর্ত্তিভেদ এবং মুক্তিদাত্রী পরব্রহ্মময়ীরূপে বর্ণিতা। *

অন্নপূর্ণার দুই হস্ত, তাঁহার এক হস্তে চসক বা পানপাত্র এবং অপর হস্তে দর্ব্বী বা হাতা। তাঁহার সম্মুখে চন্দ্র-শেখর এবং ত্রিনয়ন

---

* মাণিক্যরাজ্যাং প্রকৃতিং মনীন্দ্রাঃ
পদ্মাং ত্রিশক্তিং গিরমন্নপূর্ণাং
নিত্যাঞ্চ দুর্গাং ত্বরিতাং তথান্যাং
ভজামি নিত্যাং ভুবনেশ্বরীং তাং॥

মহাদেব। তিনি দেবীর স্থানে ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ভোজন করতঃ নৃত্য করিতেছেন এবং দেবী তদ্দর্শনে হাসিতেছেন।

এস্থলে দেখা যায় যে, চষক বা পানপাত্র আধারগুণবিশিষ্ট বলিয়া উহা সর্ব্বাধার আকাশের স্থানীয়, দক্কী যন্ত্রটীও পরিঘট্টন সমর্থ বলিয়া উহা মাস ঋতু প্রভৃতি কালের স্থানীয়। মহাদেবমূর্ত্তি বিরাট্‌রূপ এবং ভোজন গ্রহণ দ্বারা এবং নৃত্য বা স্পন্দনের দ্বারা জীবধর্ম্মের প্রকাশক। তদ্দর্শনে দেবীর হর্ষটী জ্ঞানের দ্যোতক।

(ঝ) দেবী ছিন্নমস্তার মূর্ত্তিটী সামান্য দৃষ্টিতে অতি বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়। তিনি আপনার মস্তক ছিন্ন করিয়া হস্তে ধরিয়া আছেন। এবং তাঁহার গলদেশ হইতে যে তিনটী রুধির ধারা নিঃসৃত হইতেছে তাহার একটী ধারা ঐ বিধৃত ছিন্নমস্তকের মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং অপর দুইটী ধারা ডাকিনী এবং বর্ণিনী নামে দেবীর দুইটী সঙ্গিনী পান করিতেছে।

ছিন্নমস্তা দেবী মহাবিদ্যার অন্তর্নিবিষ্টা। ইঁহার মন্ত্রে দীক্ষা প্রচলিত আছে। ইনি মুক্তিদাত্রী, সুতরাং পরব্রহ্মের ভাব ইঁহার মূর্ত্তিতে থাকিবে। কিন্তু ইঁহার হাত দুইটীমাত্র; তাহার একটীতে খড়্গ এবং অপরটীতে ছিন্নমুণ্ড। ছিন্নমুণ্ডটী অবশ্য ৭ম সূত্রানুসারে জীবের জ্ঞাপক এবং কর্ত্তরিটী অহংরূপ জ্ঞানের বোধক। কিন্তু কাল এবং আকাশ বোধক পদার্থ কোথায়? ডাকিনী এবং বর্ণিনীতেই সেই দুইটী বস্তু রহিয়াছে। দেবীর বামপার্শ্বস্থিতা ডাকিনী যিনি "দন্তপঙ্‌ক্তিবলাকিনী" বলিয়া বর্ণিতা তিনিই আকাশস্থানীয়া। বলাকা অর্থে উড্ডীয়মান বঙ্কশ্রেণী। দন্তপঙ্‌ক্তি বলাকার ন্যায় বলায় সেই পঙ্‌ক্তির আধার শরীরটীকে আকাশ বলা হইল। আর দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিতা মূর্ত্তি যিনি "সদা দ্বাদশবর্ষীয়া" বলিয়া বর্ণিতা তিনিই কালের স্থানীয়া। দ্বাদশবর্ষীয়া বলায় ইঁহাতে বর্ষ বা কালের নির্দ্দেশ করা হইল। ইঁহারাও দেবীর গলদেশ হইতে প্রসৃত যে রক্তধারা বা জীব-প্রবাহ তাহাতেই জীবময়ী হইয়া আছেন।

ছিন্নমস্তাদেবী রক্তবর্ণা এবং ত্রিনেত্রা অতএব জীবময়ী-বিরাট্ মূর্ত্তি। এই জন্য উনি কাম এবং রতির উপর অধিষ্ঠানভূতা। ছিন্নমস্তাতে কালিকা দেবীর হস্ত বিধৃত ছিন্ন মুণ্ডের ভাব অতি বিস্পষ্ট হইয়াছে।

দেবতাদিগের ধ্যান ব্যাখ্যার আর বাহুল্য না করিয়া যে কয়েকটী দেবতার পূজাদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত, এক্ষণে সংক্ষেপতঃ তাঁহাদের ধ্যানের স্থূলতাৎপর্য্যমাত্র নির্দ্দেশ করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি বস্তু, ক্রিয়া, ভাব প্রভৃতি সকলই দেবতাদিগের আধিভৌতিক অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

(ঞ) শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর নির্বৃতিদাতা, * ভগবদবতার নেতৃ-পুরুষ, চতুঃষষ্টি গুণযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। ইহাঁর ধ্যান, ধারণ, চিন্তাতে মানুষ সর্ব্বপ্রকার পাপবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে।

(ট) শ্রীরাধা—সম্যক্‌সিদ্ধি বা মুক্তি। ইহাঁতে পূর্ণ জ্ঞানানন্দ বিরাজমান।

(ঠ) কার্ত্তিক—স্ত্রীসম্ভোগের আধিদৈবিকরূপ।

(ড) গণেশ—ভক্ষ্যগ্রহণের আধিদৈবিকরূপ।

(ঢ) লক্ষ্মী—ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী।

(ণ) সরস্বতী—গদ্য পদ্যময় বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী।

ষষ্ঠী—জীবের ষড়্‌ভাগের অর্থাৎ শৈশব এবং কৈশোর অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি কার্ত্তিকেয়পত্নী এবং স্বামিসন্নিধানে হার ভাব কটাক্ষপূর্ণা আনন্দময়ী হইলেও শিশুসন্নিধানে ব্রহ্মচারিণী।

---

* কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চনির্বৃতি বাচকঃ ইত্যাদি
ইতি গোপালতাপনীয় টীকা॥

† ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেশ্চতুর্থ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা
পুত্র পৌত্র প্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী
সুন্দরী যুবতী রম্যা সততং ভর্ত্তুরন্তিকে
স্থানে শিশূনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী।

(ঙ) শ্রীরামচন্দ্র—যোগিগণ যাঁহার চিন্তনে আনন্দানুভব করেন। ভগবদবতার আদর্শ পুরুষ।

(খ) মহিষমর্দ্দিনী—ইঁহার ধ্যানের অবয়বীভূত বস্তুগুলির তাৎপর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া বলা যাইতেছে।

১। জটাজুটসমাযুক্তা—তারাদেবীর জটা আছে, ইঁহারও আছে। ইনি তারাপ্রভেদেরই দেবতা।

২। অতসীপুষ্প বর্ণাভা—অতসীপুষ্প পীতবর্ণ এবং পীতবর্ণও রক্তবর্ণের ন্যায় জীবের বোধক।

৩। মহিষাসুরমর্দ্দিনী—মহিষ মৃত্যুর বাহন অর্থাৎ মৃত্যুভয়। দেবী মৃত্যুভয়বারিণী।

৪। দশবাহু সমন্বিতা—দেবতাদিগের তেজঃসমষ্টি বলিয়া বর্ণিতা। দশদিকপালের অস্ত্র গ্রহণ করায় দশভুজা।

৫। অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা—সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথি দেবীর পূজার কাল। ঐ সময়ে আকাশে অর্দ্ধেন্দুই দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট বস্তুর সহিত মিল রাখিয়াই ধ্যানের প্রণয়ন হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দেবমূর্ত্তিতে আধিভৌতিক ভাব অনভিব্যক্ত থাকে না। পূজার কালটীও আশ্বিন মাস, যখন সিংহের পশ্চাতে বা পৃষ্ঠে সূর্য্যের কন্যা রাশিতে আবির্ভাব হয়।

৬। ত্রিশূল—মহাকালের বা সর্ব্বময়ের স্থানীয়।

৭। খড়্গ—খণ্ড কালের স্থানীয়।

৮। চক্র—বিষ্ণু বা ব্যাপকের স্থানীয়।

৯। বাণ এবং চাপ—বায়ুর স্থানীয়।

১০। শক্তি—অগ্নির স্থানীয়।

১১। খেটক—যমের স্থানীয়।

১২। পাশ—বরুণের স্থানীয়।

১৩। অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা—ইন্দ্রের স্থানীয়।

১৪। পরশু—বিশ্বকর্ম্মার স্থানীয়।

১৫। বিশিরস্ক মহিষ—মৃত্যু ভয়ের ছেদন।

১৬। শিরশ্ছেদোদ্ভব দানব—মৃত্যু-ভয়ের কোন একরূপ নাশে রূপান্তর প্রাপ্তি।

১৭। শূলের দ্বারা নির্ভিন্ন—মহাকালের রূপস্বরূপ "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য দ্বারাই মৃত্যু-ভয়ের প্রকৃত রূপ নাশ হয়। বস্তুতঃ ঐ মহা-বাক্যের প্রভাবেই "নজায়তে ম্রিয়তে বা" এই উপনিষদ্ তথ্যের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। দেবতাদিগের অস্ত্র শস্ত্র বৈদিক মন্ত্রাদির নামমাত্র।

১৮। নাগপাশে বেষ্টিত—অনন্ত বন্ধনে সম্বদ্ধ।

১৯। সিংহ—সম্বিদ বা পূর্ণজ্ঞান।

মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক বচন এই—

বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী সা দেবী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী।

অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সময়ে একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। দেবমূর্ত্যাদির ভৌতিক ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে যে ভাবে করা হইয়াছে উহাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নহে। পুরাণাদিতে এবং উপনিষদের অনুকারী গ্রন্থাদিতেও কোন কোন দেবমূর্ত্তির ভৌতিক ব্যাখ্যা উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে এক আধটু স্বতন্ত্র ভাবে করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা বলিতে যে কেবল উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্র তাহা নহে; ঐ সকল পুরাণাদির ব্যাখ্যা মধ্যেও পরস্পর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, উপাসকগণ যিনি যেমন ভাল বুঝিবেন তিনি আপনার হৃদয়োত্থ ভাবের সহিত সুসঙ্গত করিয়া অন্যরূপ ভৌতিক ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন। আর এক কথা এই, কাহার কাহার মতে দেবতাদিগের মূর্ত্তির ভৌতিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করায় লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া ধর্ম্মের হানি জন্মিতে পারে। যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা ভ্রম-সংস্কারের একান্ত অধীন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন, যদি দেবমূর্ত্তির আধিভৌতিক ব্যাখ্যা থাকিল, তবে আর উহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন

করিয়া থাকিবে। কিন্তু এটী প্রকৃত কথা নয়। সত্যই ব্রহ্ম। সত্য এক হইয়াও অনেক। অজ্ঞতাদি দোষনিবন্ধন দেবমূর্ত্তাদির শাস্ত্রসিদ্ধ বিবিধ ব্যাখ্যার অপলাপ হওয়াতেই এই প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কস্মিন্‌কালেও ওরূপ কথা মনে করেন নাই। তাঁহারা অধিকারী ভেদের তথা পুংমাত্রায় গ্রহণ করিয়াও চিরকালই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া আসিতেছেন এবং সেই পথে যাইবার জন্য উত্তেজনা করিতেছেন। ঋক্‌বেদেই বিভিন্ন দেবমূর্ত্তির নিদান ব্যক্ত হইয়া আছে যথা—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।
যুক্তাহস্য হরয়ঃ শতাদশ॥

পরমৈশ্বর্যশালী ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রকট হইয়াছেন; নানারূপ হইবার কারণ উপাসকের ধ্যান সৌকর্য্য। ভগবানের রূপ অনন্ত; তন্মধ্যে দশটী মুখ্য। [অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের উপাসনায় গৃহীত]

তাহার পর বেদাঙ্গ মধ্যে অনবগত শাস্ত্রার্থব্যক্তির নিন্দাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীতবেদং ন বিজানাতি যোহর্থং।"

যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ (যেহেতু বৈদিককালে বেদের অক্ষরার্থ অধিকারী মাত্রেরই জানা ছিল) পরিজ্ঞাত না হয় সে ভারবাহী খণ্ডস্থ স্বরূপ হইয়া থাকে।

ঋক্‌প্রাতিশাখ্যেও ঈশ্বরধ্যানের ক্রমপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন—

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধকরণং ন শক্নোতি, তদা পৃথিব্যাদ্যেকৈকব্যতিরেকেণ মানসমূর্ত্তাবভিপ্রকল্পয্য পূর্বং পূর্বং ধারয়ন্ তত্র হৃদয়ং স্থিরং করোতি অপরং অপরং ধারয়েৎ এবং পুরুষধ্যাননারভেত।

ভাবার্থ এই ঃ উক্ত হইয়াছে—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।

ভগবান বলিতেছেন যে, যে যে ব্যক্তি আমার যে যে শরীর শ্রদ্ধায় অর্চনা করিতে চায় আমি তাহাতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি।

ফলতঃ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত কথা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নিম্নাধিকারী আপনার অধিকারের উপযুক্ত দেব মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেই এই বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকের সিদ্ধি সৌকর্য্যার্থ।

অতএব দেবতার রূপ শাস্ত্রকর্তার কল্পনা। সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু সে কল্পনা কাহার যদৃচ্ছাসম্ভূত নয়। ঐ কল্পনার মূলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং "সর্ব্বংসর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে, সেই তথ্য প্রকট করাই এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। যদি সকল কৃত্যাদির প্রতিই এই অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় তবে অনেকানেক স্থলেই অতি অপূর্ব্ব তাৎপর্য্যের প্রকাশ হইয়া চিন্তাশীল অনুসন্ধায়ীর জ্ঞান এবং ভক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে।

পরিশিষ্ট।

ব্রত, পূজাদির তালিকা।

ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
ক্ল প্রতিপদ	ক্ষীরপ্রতিপদ	ব্রাহ্মণ	এক বৎসর প্রতি শুক্লপ্রতিপদে ব্রাহ্মণকে ক্ষীরভো করাইতে হয়। নীচজাতীয়েরা ও স্ত্রীলোকেরা উ পাইবার জন্য এই ব্রত করিতেন (অপ্রচলিত)।
তৃতীয়া	অক্ষয় তৃতীয়া	বিষ্ণু	সর্ব্বত্র প্রচলিত। কেবল কর্ণাটে ঐ পর্ব্বের 'বলরাম জয়ন্তী'। কর্ণাটবাসীরা ঐ দিনে বলরামের করিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ঐ দিনে কেবল ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবার এবং যবশ্রাদ্ধ ও জলদান ও পার্ব্বণ শ্রা করিবার বিধি আছে। চন্দনযাত্রা প্রয়োগ এই দিনে বঙ্গদেশ ও মিথিলার লোকে বলে যে এই তিথিতে যুগের উৎপত্তি, আকাশগঙ্গার হিমাচলে অবতরণ নারায়ণ কর্ত্তৃক যবের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র, শু তৈলঙ্গ ও জম্বুবাসীদিগের মতে ঐ দিনে ত্রেতা উৎপত্তি এবং পরশুরামের জন্মতিথি, উহাঁরা ঐ দিনে প রামের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান করিয়া থাকেন।

তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
প্তমী	জহ্নু সপ্তমী	গঙ্গা	কাশ্মীর ও নেপাল ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত জং বেগং হ্নুতে গোপয়তীতি জহ্নুঃ। ভগলপুর জেল যেখানে গঙ্গাগর্ভে তিনটি পাহাড় দেখা যায় তথায় জ রাজর্ষির আশ্রম ছিল।
শী	নৃসিংহ চতুর্দ্দশী	নৃসিংহরূপী বিষ্ণু	নেপাল, দ্রাবিড় ও মিথিলা ভিন্ন আর সর্ব্বত্র প্রচলিত সর্ব্বকাম প্রাপ্তি কামনায় মধ্যাহ্নে নৃসিংহের পূজা করি উপবাসী থাকিতে হয়।
	চন্দনযাত্রা ফুলদোল	বিষ্ণু	কেবল বঙ্গদেশেই হয়। দ্রাবিড়ে ও তৈলঙ্গে তিথিকে ব্যাস পূর্ণিমা বলে। ব্যাসদেবের পূজা ও দধ্যন্ন হইয়া থাকে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে কূর্ম্মজয়ন্তী বলে ঐ দিনে তথায় বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে।
ী	ত্রিলোচনাষ্টমী	শিব	বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভিন্ন আর কোথ প্রচলিত নাই। মহারাষ্ট্রে ইহার নাম শীতলাষ্টমী এ গুজরাটে কালাষ্টমী, সুতরাং ঐ দুই স্থানে এই দিনে য ক্রমে শীতলা ও শিবের পূজা হইয়া থাকে।

৯চতুর্দ্দশী সাবিত্রী চতুর্দ্দশী	সাবিত্রী সত্যবান	বাঙ্গালা, জম্বু, উৎকল ও মিথিলায় একই দিনে এই ব্রত হয়, কেবল বিশেষ এই যে, জম্বু ও মিথিলায় ইহাকে বটসাবিত্রী বলে। বটসাবিত্রী ব্রত দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, ও গুজরাট প্রদেশে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। পূজার প্রকরণ প্রায় একই।
৩শুক্লতৃতীয়া রম্ভাব্রত	হরগৌরী	বাঙ্গালা, দ্রাবিড়, জম্বু, কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গ এই কয়টী প্রদেশে প্রচলিত। এই পর্ব্বের দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ শুক্ল প্রতিপদে দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে বৌদ্ধ ও কল্কী-জয়ন্তী নামে একটী পর্ব্ব আছে। ঐ পর্ব্বোপলক্ষে বুদ্ধ ও কল্কীর পূজা এবং স্নান দানাদি কার্য্য হইয়া থাকে।
৪শুক্লচতুর্দ্দশী উমা চতুর্থী	উমা	কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত। ইহাই উমাজয়ন্তী বা উমা দেবীর জন্ম দিন। সতী দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা এই জন্ম রাশিচক্রের সর্ব্বশেষভাগে তাঁহার স্থান এবং সেই শেষভাগ হিমালয়ের ঠিক ঊর্দ্ধবর্ত্তী।
৫শুক্লষষ্ঠী আরণ্য ষষ্ঠী	ষষ্ঠী	কেবল বাঙ্গালায় এই পূজা হয়। দ্রাবিড়ে ও ত্রৈলিঙ্গে ইহার পূর্ব্ব দিনে আরণ্য-গৌরী নামে একটী পর্ব্ব আছে। উৎকলে এই ষষ্ঠীর দিনেই শীতলাষষ্ঠী। এই দিন স্ত্রী-

তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
			লোকেরা পাখা হাতে বনে যাইয়া ষষ্ঠী অথবা গৌরীর পূজা করে। এই দিনে জামাতার সমাদর অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধ। আরণ্য ষষ্ঠী ব্রত কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে মৃতবৎসার জীবৎ সন্তান হইলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতে হয়।
দশমী	দশহরা	গঙ্গা	সর্ব্বদেশে প্রচলিত। বাঙ্গালা ও উৎকলে গঙ্গা পূজার সঙ্গে মনসা পূজাও করিয়া থাকে। এই দিনে গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে এবং গঙ্গার অবতরণ এই দিনে হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হিমানী-সংঘাত দ্রবীভূত হইয়া গঙ্গায় যে জল বৃদ্ধি হয় স্থূলতঃ তাহা দশহরার সময় হইতেই হয় বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে গঙ্গার জল বৃদ্ধি যে পর্ব্বাহসূচক হইবে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। মিশরে নীল নদের জল বৃদ্ধি আরম্ভ হইলেই তথায় লোকে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়। যে স্থলে অন্য জাতীয়েরা উৎসব করে ভারত বাসীরা সেস্থলে উপবাস ও পূজা করিতে শিক্ষিত।

র্ণিমা	স্নানযাত্রা	জগন্নাথ দেবের স্নান, বিষ্ণু পূজা
দ্বিতীয়া	রথযাত্রা	জগন্নাথ দেবের রথারোহণ, বিষ্ণু পূজা
ক্ল দশমী	আশাদশমী	আশাদেবী
কৈকাদশী	শয়নৈকাদশী	বিষ্ণু

এই দিনে বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। দ্রাবিড়াদি আর সর্ব্বত্রই এই তিথিকে মন্বাদি বলে।

বাঙ্গালা, জম্বু, মহারাষ্ট্র ও উৎকলে প্রচলিত। এই দ্বিতীয়ায় বাঙ্গালায় মনোরথ দ্বিতীয়ার ব্রত হইয়া থাকে। এই ব্রতের পূজ্য দেবতা কৃষ্ণ। দ্রাবিড়ে ও ত্রৈলিঙ্গে ইহাকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কহে। রথযাত্রা যে সূর্য্যের উত্তরায়ণের সীমাপ্রাপ্তির পর দক্ষিণায়নে সঞ্চরণসূচক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে উক্ত। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। দময়ন্তী নলকে পুনর্ব্বার পাইবার জন্য এই ব্রত করিয়াছিলেন।

সর্ব্বত্র প্রচলিত। এই তিথিতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়া থাকে। দ্রাবিড়, কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ দিনে গোপদ্ম ব্রত করে; বিষ্ণু ঐ ব্রতের পূজ্য দেবতা। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই দিনে কোকিলাব্রত করিয়া থাকে; গৌরী এই ব্রতের উপাস্য দেবতা।

	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।
পঞ্চমী	নাগপঞ্চমী	অষ্টনাগসহ মনসা
ঞ্চমী	নাগপঞ্চমী	সাপ্তনাগ মনসা
া	উপাকর্ম্ম	বেদের কাণ্ডবিশেষের অধ্যয়ন এবং তদঙ্গ পূজাদি

কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।

কেবল বাঙ্গালা ও উৎকলে প্রচলিত। মিথিলায় ইহাকে মৌনীপঞ্চমী কহে। শ্রাবণের শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্ল দ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহই দাক্ষিণাত্যে একটা না একটা ব্রতানুষ্ঠানের বিধি আছে। তন্মধ্যে কোনটি প্রচলিত এবং কোনটী অপ্রচলিত। ঐ সকল ব্রতের কোনটিতে বিষ্ণু, কোনটিতে নাগ ও কোনটিতে গণেশের পূজা হইয়া থাকে। এই নাগও গণেশ পূজা উপলক্ষে সমারোহ যথেষ্ট হয়।

সর্ব্বত্র প্রচলিত। কর্ণাটে এই দিনে চিত্রনেমী নামে ব্রত এবং দ্রাবিড় ও উৎকলে ইহাকে গুরুপঞ্চমী বলে এবং গৌরী ও লক্ষ্মী পূজা করে।

বাঙ্গালা ভিন্ন সর্ব্বত্র প্রচলিত। নেপাল, জম্মু, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও মিথিলায় ঋষিতর্পণী বলিয়া এই দিনে ঋষিতর্পণ করে। মহারাষ্ট্র ও ত্রৈলিঙ্গে এই তিথিতে হয়গ্রীবের উৎপত্তি বলিয়া হয়গ্রীবের পূজা করিয়া থাকে। উৎকলে বলভদ্রের উৎপত্তি বলিয়া বলভদ্রের পূজা করে।

কৃষ্ণদ্বিতীয়া	অশূন্যশয়ন ব্রত	বিষ্ণু	বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র ও মিথিলায় প্রচলিত। দ্রাবিড় ত্রৈলিঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে ঐ ব্রতই গৌণ ভাদ্র কৃষ্ণদ্বিতীয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
ষ্টমী	জন্মাষ্টমী	শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার আবরণ বাসুদেব প্রভৃতির পূজা	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
চতুর্দ্দশী	অঘোরচতুর্দ্দশী	শিব	বাঙ্গালায় প্রচলিত। জম্বু ও কাশ্মীরে এই ব্রতের না ভদ্রকালী চতুর্দ্দশী এবং তথায় কালীর পূজা হয়। মিথিলা মহাভৈরবের পূজা হয়।
মাবস্যা	অলোকামাবস্যা	লক্ষ্মী নারায়ণ	বাঙ্গালায় প্রচলিত। নেপাল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশে উহাকে কুশোত্তলনী বলে। আমাদের দেশে ঐ দিনে কুশোত্তলন করিয়া থাকে।
কৃতৃতীয়া	হরিতালিকাব্রত	ভবানীশঙ্কর	সর্ব্বত্র প্রচলিত। দ্রাবিড়ে, ত্রৈলিঙ্গে বলরামজয়ন্তী ও স্বর্ণগৌরী এবং কর্ণাটে কেবল স্বর্ণগৌরী। উৎকলে গৌরীব্রত, মহারাষ্ট্রে এই দিনকে বরাহজয়ন্তীও বলে, মিথি লায় মন্বাদি বলে।

থ।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
তুর্থী	শিবাচতুর্থী ব্রত	শিবশিবা	এই দিনে বাঙ্গালার শিবাচতুর্থী; পঞ্জাব ও কাশ্মীরে গণেশের জন্মোৎসব; কর্ণাট, গুজরাট, তৈলঙ্গ, উৎকল, মিথিলা ও বারাণসীতে সিদ্ধিবিনায়ক ও গণেশ্বর ব্রত করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসের এই চতুর্থী ও পরবর্ত্তী কৃষ্ণাচতুর্থীকে নষ্টচন্দ্র বলে। ঐ দিনে চন্দ্রদর্শন নিষেধ।
পঞ্চমী	ঋষিপঞ্চমী	সপ্তর্ষি	সর্ব্বত্র প্রচলিত। অরুন্ধতীর সহিত সপ্তর্ষির পূজা করিতে হয়। সপ্তবর্ষসাধ্য ব্রত। ঐ দিন আলেখ্য পঞ্চমী নামে আর একটি ব্রতের বিধি আছে। ঐ ব্রতে তক্ষকাদি নাগের তুষ্টিসাধন জন্য ব্রাহ্মণের চিত্র করিয়া পূজা করিতে হয়। (উহা এক্ষণে অপ্রচলিত)
ষষ্ঠী	চপেটাষষ্ঠী	ষষ্ঠী	বাঙ্গালায় চপেটা ষষ্ঠী। মিথিলায় পর্পট ষষ্ঠী। মহারাষ্ট্রে সূর্য্য ষষ্ঠী। অন্যত্র প্রচলিত নহে।
সপ্তমী	কুক্কুটী বা ললিতাসপ্তমী	দুর্গা শিব	বাঙ্গালায় ও উৎকলে ললিতাসপ্তমী। গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে কেবল ঐ দিনে গৌরী ব্রত করিয়া থাকে। দ্রাবিড়ে ও ত্রৈলিঙ্গে অমুক্তাভরণ ব্রত—দেবকী মৃতবৎসা দোষ শান্তির জন্য ভবিষ্য পুরাণোক্ত এই ব্রত করিয়া

ষ্টমী দুর্ব্বাষ্টমী লক্ষ্মীনারায়ণ ও দুর্ব্বা

ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ঐ তিথিতে অচলাসপ্তমী, ফলসপ্ত
পুত্র সপ্তমী ও অনন্তফলসপ্তমী নামে কয়েকটী ব্রত হ
সকলগুলিতেই সূর্য্যের পূজা। অচলাসপ্তমী দাক্ষিণা
প্রচলিত আছে, অপরগুলি অপ্রচলিত।

বাঙ্গালায় দুর্ব্বাষ্টমী। কাশ্মীরে ঐ দিন হইতে চতুর্দ্দশ
মধ্যে যেদিন হউক এক দিন মহালক্ষ্মীর পূজা করি
থাকে। মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে ষষ্ঠীর দিন গৌরী
আবাহন করিয়া সপ্তমীতে পূজা করিয়া অষ্টমীতে বিসর্জ্জ
এবং তদ্ব্যতীত অন্নপূর্ণা পূজা ও মহালক্ষ্মীর যাত্রা মহাসম
রোহে করিয়া থাকে। কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ দিনে জ্যে
ব্রত এবং উৎকলে ও বাঙ্গালায় ঐ দিনকে দুর্গাষ্টমী বলি
লক্ষ্মী ও দুর্গার পূজা এবং রাধাজন্মাষ্টমী বলিয়া রাধার পূ
করিয়া থাকে। মিথিলায় ঐ দিন গোষ্ঠাষ্টমী হয় এ
মহালক্ষ্মীর কথা শ্রবণাদি হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে
দিনে জ্যেষ্ঠাব্রত করিয়া থাকে। পুত্র পৌত্রাদি লাভ কা
নায় হবিষ্যাশী হইয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জ্যেষ্ঠাদেবীর তিন দি
পূজা করিতে হয়। লক্ষ্মী সরস্বতী ও উমার স্তব মিশ্রি
হইয়া ইহাঁর স্তব।

তিথি	ব্রত বা পূজার নাম	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
নবমী	তাল নবমী	সলক্ষ্মীক নারায়ণ	কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত।
মী	দশাবতার ব্রত	দশাবতারের পূজা	কেবল দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।
াদশী	পার্শ্বপরিবর্ত্তনৈকাদশী	বিষ্ণু	সর্ব্বদেশে প্রচলিত।
দশী	শ্রবণাদ্বাদশী	বিষ্ণু	সর্ব্বদেশ প্রচলিত। মহারাষ্ট্রে বামন জয়ন্তী। গুজ-
নক্ষত্রযুক্ত)			রাট, জম্বু, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ইহাকে বামন দ্বাদশী বলিয়া এই দিনে বামন দেবের পূজা করিয়া থাকে।
তুর্দ্দশী	অনন্ত ব্রত	অনন্তদেব বিষ্ণু	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
	উমামহেশ্বর ব্রত	শিবগৌরী	দ্রাবিড় কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গে প্রচলিত।
তিপদ	অপর পক্ষ আরম্ভ	শ্রাদ্ধতর্পণাদি	প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত অপরপক্ষ। অমাবস্যা মহালয়ামাবস্যা বলিয়া উক্ত। অপরপক্ষকৃত্য সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
ক্ত	প্রতিপদ নবরাত্র্যারম্ভ	দুর্গা	প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় দিন নবরাত্র নামে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা ভিন্ন আর কোন প্রদেশে দুর্গাপ্রতিমা পূজার নিয়ম নাই, কিন্তু ঐ প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া নয় দিন যাবৎ প্রায় সর্ব্বত্রই ঘটস্থাপন, দেবীর পূজা ও চণ্ডী পাঠাদির বিধি আছে। নবরাত্রি উপলক্ষে দ্রাবিড়ে বেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুর পূজা, পঞ্চমীর দিন উপাঙ্গললিতা-

ব্রত, সপ্তমীর দিন পুস্তক-মণ্ডল ও সরস্বতীর পূজা, অষ্টমীর দিন দুর্গাষ্টমী বলিয়া দুর্গার পূজা এবং মহানবমীতে অশ্ব আয়ুধাদির পূজার বিধি আছে। নেপালে সপ্তমীর দিন পত্রিকার প্রবেশন, অষ্টমী ও নবমীর দিন মহাষ্টমী ও মহানবমীকৃত্য, দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। জম্বুতে ঐ নবরাত্রির মধ্যে সরস্বতীশয়ন বলিয়া একটী পর্ব্ব আছে। অপিচ, দুর্গাষ্টমীর দিন দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহানবমীর দিন তথায় মন্বাদি বলিয়া উক্ত হয়। পঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে এতদুপলক্ষে সরস্বতী ও দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রে ঐ সময়ে সরস্বতী ও দুর্গার পূজা এবং সরস্বতীর নিকট বলিদান ও সরস্বতীর বিসর্জ্জন হয়। মহানবমী এখানেও মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ললিতা ও বৈনায়কী ব্রত এবং মাতামহ শ্রাদ্ধের বিধি আছে। কর্ণাটে বেদাদি পাঠ, উপাঙ্গললিতাব্রত, সরস্বতী, দুর্গা ও অশ্ব আয়ুধাদির পূজা হয়। গুজরাটে মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা এবং অশ্বায়ুধাদির পূজা-বিধি আছে, অধিকন্তু বিনায়ক ও ললিতা ব্রত এবং মাতামহ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ত্রৈলিঙ্গে দুর্গা ও সরস্বতীর পূজা, উপাঙ্গ ললিতা ও স্থানবৃদ্ধি গৌরীব্রত হয়। মহানবমীকে মন্বাদি বলে এবং দুর্গাষ্টমী কালিকাষ্টমী নামে তথায় অভিহিত হইয়া থাকে। উৎকলে দুর্গা পূজা, মহাষ্টমীর দিন মহাষ্টমীব্রত এবং মহানিশায় বলিদানাদির নিয়ম আছে। মিথিলায় প্রতিপদের দিন কলস স্থাপন করিয়া দ্বিতীয়ার দিন রেমন্তের পূজা করে। ষষ্ঠীর দিন গজপূজা ও বিল্বাভিমন্ত্রণ, সপ্তমীর দিন পত্রিকা প্রবেশন, অষ্টমীর দিন মহাষ্টমী ব্রত এবং মহানবমীর দিন ত্রিশূলিনী পূজার বিধি আছে। মহানবমী এখানে মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিজয়াদশমীকৃত্য সর্ব্বত্রই আছে। দ্রাবিড়ে ঐ দিনে দ্বিদল ব্রতারম্ভ হয়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ঐ দিনকে বৌদ্ধজয়ন্তী বলে। মিথিলায় ঐ দিনে অপরাজিতা পূজা হইয়া থাকে।

তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
	কোজাগর ব্রত	লক্ষ্মী	সর্ব্বদেশ প্রচলিত। রাত্রিতে লক্ষ্মীর পূজা ও নারি-কেলোদকাদি পান করিবার বিধি। এই দিনে শক্রব্রত নামক একটি ব্রতের অনুষ্ঠানের বিধি আছে। উক্ত ব্রত এই পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া বর্ষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি কাম্য করিতে হয়। পূজ্য দেবতা ইন্দ্র। (অপ্রচলিত)।
র্দ্দশী	ভূতচতুর্দ্দশীকৃত্য	চতুর্দ্দশযম	বাঙ্গালায় এতদুপলক্ষে চতুর্দ্দশ যমের পূজা অপামার্গ ভ্রামণ, উল্কাদান, চতুর্দ্দশ শাকভোজন ও দীপদানাদি হইয়া থাকে। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট ও ত্রৈলিঙ্গে এই চতুর্দ্দশীকে নরকচতুর্দ্দশী বলে। এই দিনে তথায় যমাদির তর্পণ করা হইয়া থাকে। উৎকলে যমাদির তর্পণ ও অপামার্গভ্রামণ হয়।
া	শ্যামাপূজা	কালী	বাঙ্গালায় এই দিন দীপান্বিতাকৃত্য হয়। প্রদোষে লক্ষ্মী পূজার ব্যবস্থা আছে। এই লক্ষ্মীপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত কেবল দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে ইহার নাম ধনলক্ষ্মী পূজা।

ক্ল প্রতিপদ	দ্যূতপ্রতিপদ	বলিরাজ্ঞ	দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে এই তিথিতে বলীন্দ্র (বলিরাজার) পূজা হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট এবং গুজরাটেও বলি পূজার বিধি আছে; অধিকন্তু ঐ সকল স্থানে গোক্রীড়া বলিয়া একটি পর্ব্ব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কর্ণাটে দীপাবলী দান ও কামধেনুর পূজা এবং ত্রৈলিঙ্গে কেবল দীপাবলী দান হইয়া থাকে। নেপাল ও উৎকলে ঐ দিনে গোবর্দ্ধনপূজা হয়। জম্বু, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ঐ দিনে অন্নকূট বলিয়া একটি পর্ব্ব আছে। মিথিলায় গোক্রীড়া ও বহ্ন্যুৎথান হইয়া থাকে।
ক্লদ্বিতীয়া	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	যম, যমুনা ও চিত্রগুপ্ত	সর্ব্বত্র প্রচলিত। বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ভগিনীর পূজা করিতে হয় ও তাঁহার স্থানে আহারাদি গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দিনে পুষ্পদ্বিতীয়া নামে একটী ব্রতের বিধি আছে। উক্তব্রতে বেদজ্ঞত্ব, অরোগিতা এবং বংশবৃদ্ধি কাম নায় পুষ্পমাত্র খাইয়া অশ্বিনীকুমারের পূজা করিতে হয়। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত। বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও ত্রৈলিঙ্গে এই দ্বিতীয়াকে যমদ্বিতীয়াও কহে। উৎকলে ঐ দিনে লিঙ্গরাজ প্রভুর যাত্রা বলিয়া একটি পর্ব্ব আছে।

তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
ষ্টমী	গোষ্ঠাষ্টমী	ধেনু	দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ ও উৎকলে ঐ দিনে গো-পূজার বিধি আছে। গোরুর পূজা ও অনুগমন করিতে হয়। জম্বু পঞ্জাব, কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্রে ঐ দিনকে গোপাষ্টমী বলে।
শুক্ল নবমী	দুর্গানবমী, পিষ্টান্ন ব্রত	জগদ্ধাত্রী	বাঙ্গালা ও মিথিলায় এই পূজা প্রচলিত। নেপালে ঐ তিথিকে কুষ্মাণ্ডনবমী বলে। জম্বু, পঞ্জাব ও কাশ্মীরে 'পরিক্রমণ' বলিয়া একটি পর্ব্ব হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট গুজরাট ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ দিন কৃতযুগাদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মিথিলা, বাঙ্গালা ও উৎকলে ঐ দিনকে ত্রেতাযুগাদি বলে। মিথিলায় উক্ত নবমী অমলক নবমী ধাত্রী নবমী নামেও উক্ত হইয়া থাকে। উৎকলে দিনে অক্ষয়া নবমী ব্রত বলিয়া একটি ব্রতও হয় এ রাসযাত্রা আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে এই দিনে বিষ্ণুপূজা কুষ্মাণ্ডদান হইয়া থাকে।
শুক্লৈকাদশী	উত্থানৈকাদশী ব্রত	বিষ্ণু	এই দিন ভগবান বিষ্ণু শয়ন ত্যাগ করেন বলিয়া শা প্রসিদ্ধ। দ্রাবিড়, নেপাল ও জম্বু ভিন্ন আর প্রায় সর্ব্ব প্রচলিত। পঞ্জাবে ঐ দিনকে হরিপ্রবোধিনী এবং কাশ্মী গুজরাট ও কর্ণাটে প্রবোধিনী বলে। অধিকন্তু, ঐ দি

			পঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে ভীষ্মপঞ্চক, উৎকলে বকপঞ্চক বা ভীষ্মপঞ্চক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র গুজরাট, ত্রৈলিঙ্গ ও উৎকলে তৎপরদিনে (উত্থানদ্বাদশী দিনে) চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপ্তি হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ একাদশীর দিনে মহারাষ্ট্রে তুলসীবিবাহ প্রবোধিনী, কর্ণাটে পুষ্পবৃন্দাবনোৎসব, দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে ক্ষীরাব্ধিপূজা এবং উৎকলে উত্থানযাত্রা পর্ব্ব হয়। মিথিলায় উক্ত দিন দেবোত্থানৈকাদশী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। গুজরাটে উত্থানদ্বাদশীর দিন তুলসীবিবাহ হয়।
কচতুর্দ্দশী	পাষাণচতুর্দ্দশী ব্রত	গৌরী	বাঙ্গালায় পাষাণ চতুর্দ্দশী। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও ত্রৈলিঙ্গে বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী। শিব বা বিষ্ণুর পূজা হয়। জম্বুতে উহাকে ব্রহ্মকূর্চ্চ বলে। উৎকলে ঐ দিনে লিঙ্গরাজের উত্থান যাত্রা হইয়া থাকে।
র্ণিমা	রাসপূর্ণিমা	বিষ্ণু	বাঙ্গালা ও উৎকলে রাসযাত্রা। দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ তিথিকে ব্যাসপূর্ণিমা বলিয়া ব্যাসদেবের পূজা করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, ত্রৈলিঙ্গ ও মিথিলায় উহা মন্বাদি বলিয়া উক্ত হয়। মিথিলায় ঐ দিন সর্ব্বদেবের উত্থান দিন বলিয়া অভিহিত হইয়া

মাস ও তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
অগ্রহায়ণ শুক্লপঞ্চমী	প্রাবরণযাত্রা	বিষ্ণু	থাকে। উৎকলে ঐ দিনে রাসযাত্রা সমাপ্তি এ স্বামীমতে ধাত্রীব্রত হয়। দাক্ষিণাত্যে ঐ দিনে ত্রিপুরোৎ সব নামে মহাদেবের পূজা ও সায়ংকালে দীপদান হ
শুক্লষষ্ঠী	গুহষষ্ঠী	কার্ত্তিকেয়	কেবল বঙ্গে। দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে ঐ দিনে যাত্রা গৌরীব্রত, মহারাষ্ট্রে নাগপঞ্চমী এবং উৎকলে গুহপঞ্চমী ব্রত হয়।
" শুক্ল সপ্তমী			কেবল বঙ্গে। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট ও ত্রৈলিঙ্গে উহাকে চম্পাষষ্ঠী বলে। মহারাষ্ট্রে স্কন্দষষ্ঠীও বলিয়া থাকে।
			এই দিনের কৃত্য অনেকগুলি ব্রত অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যথা—চিত্রভানুব্রত, (অগ্নি সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা)। শৈলব্রত, সরিদ্ব্রত, মুনিব্রত (কোন অভীষ্ট শৈল, নদী বা মুনির পূজা)। বায়ুব্রত (বায়ুর পূজা)। সুগতিব্রত (ইন্দ্রের পূজা)। সপ্তমী লোকব্রত (সপ্ত-লোকের পূজা) ভাস্করব্রত (সূর্য্যের পূজা)। বহ্নিব্রত (অগ্নির পূজা)।

ক দ্বাদশী	অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত	বিষ্ণু	বঙ্গ, দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে প্রচলিত। দ্রাবিড়ে ঐ তি এবং ত্রৈলিঙ্গে তৎপরদিনকে হনুমৎ জয়ন্তী বলে। মি লায় কেশব দ্বাদশী এবং উৎকলে খঞ্জন দ্বাদশী বলে।
কৃষ্ণাষ্টমী	অষ্টকাশ্রাদ্ধ পূপাষ্টকা	পিতৃদেবতা	বঙ্গ, দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ উৎকল ও মিথিলায় প্রচলি দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ঐ তিথিকে কালষ্ট বাষ্টমী বলিয়া থাকে। উৎকল ও মিথিলায় অষ্টকাশ্রাদ্ধ পরদিন অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ এবং তৎপর দিন উৎকলে উপাষ্ট শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।
মী	অন্নপূর্ণাষ্টমীব্রত	অন্নপূর্ণা	মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। গুজরাটে দুর্গাষ্টমী, ত্রৈলি সাবিত্রী গৌরী, উৎকলে ভদ্রাষ্টমী, মিথিলায় অষ্টলক্ষণাষ্ট
পূর্ণিমা	স্নানযাত্রা	বিষ্ণু	বাঙ্গালায় ও উৎকলে।
কৃষ্ণাষ্টমী	মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ	পিতৃদেবতা	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী	রটন্তী চতুর্দ্দশী	রটন্তীকালিকাপূজা	কেবল বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত।
র্থী	বরদাচতুর্থী	গৌরী	বিনায়ক ব্রত বলিয়া এই দিনে বাঙ্গালা ও মিথি গণেশের ও বারাণসী প্রদেশে ঢুণ্টিরাজ গণেশের পূ হয়। দ্রাবিড়ে এই তিথিকে তিলচতুর্থী ও মহার কুন্দচতুর্থী বলে।

থি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
	শ্রীপঞ্চমী	সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পূজা	বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত। ত্রৈলিঙ্গে ও দ্রাবিড়ে ঐ দিনকে লক্ষ্মীপঞ্চমী বলে। অন্যত্র বসন্তপঞ্চমী বলিয়া থাকে ও বিষ্ণুর পূজা করে।
।	শীতলাষষ্ঠী	ষষ্ঠী	বঙ্গে শীতলাষষ্ঠী দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে কুমারষষ্ঠী।
্তমী	আরোগ্য সপ্তমী	সূর্য্য	বঙ্গে প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যে রথসপ্তমী (সূর্য্যের পূজা। নেপাল কাশ্মীর ও পঞ্জাবে অচলা সপ্তমী (মহাদেবে পূজা)।
মী	ভীষ্মাষ্টমী,	ভীষ্ম	ভীষ্মের তর্পণ করিতে হয়। সর্ব্বত্র প্রচলিত।
াদশী	ভৈমীএকাদশী		বাঙ্গালা, দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ, মিথিলা ও উৎকলে নাম। নেপালে ভীমা, পঞ্জাবে মোহিনী, কাশ্মীরে বো সোন্দদহু অর্থাৎ ভৈমী, জম্বুতে সুমোহিনী ভীমা, এবং ম রাষ্ট্র ও গুজরাটে জয়া। এই একাদশীর পর দিন দ্বাদশী বাঙ্গালা ও উৎকলে বরাহদ্বাদশী বলে।
	সোমব্রত	চন্দ্র	চন্দ্রের পূজা করিয়া কৃষ্ণবর্ণ গোরু দান করিতে হয় (অপ্রচলিত)।

শুক্লসপ্তমী	ত্রিগক্তি সপ্তমী	সূর্য্য	বর্ষসাধ্য। প্রথম চারি মাস উক্ত তিথিতে খাইবার বিধি। মাঝের চারিমাস গোমূত্র ও শে মাস ক্ষীর। (অপ্রচলিত)।
শুক্ল দ্বাদশী	সুগতি ব্রত	বিষ্ণু	বর্ষসাধ্য। উত্তমাগতি কামনায় একাদশীতে উ থাকিয়া দ্বাদশীর দিন বিষ্ণুপূজা করতঃ ত্রয়োদশীতে করিতে হয়। (অপ্রচলিত)। পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত বাঙ্গালা ও মিথিলায় এই দ্বাদশীকে গোবিন্দদ্ব ত্রৈলিঙ্গে ইহাকে নরসিংহ দ্বাদশী বলে।
শুক্ল ত্রয়োদশী	ত্রয়োদশী ব্রত	বিষ্ণু ও লক্ষ্মী	পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় বন্ধ্যার এই ব্রত করিবার অষ্টদল পদ্মে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা পূর্ব্বক দ্বারা কপিত্থ প্রমাণ পিণ্ড করিয়া স্বামি সহ 'যত ভূতানাং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠে উহা ভক্ষণ করিতে হয় (অপ্রচলিত)।
পূর্ণিমা	দোলযাত্রা	শ্রীকৃষ্ণ	বাঙ্গালা ও উৎকলে দোল, অন্যত্র হোলি বলিয়া প্রচলিত। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট, মিথিলায় এই দিন মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে লায় এই দিনকে কলিযুগান্তও কহে।

তিথি।	ব্রত বা পূজার নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
কৃষ্ণাষ্টমী	শাকাষ্টকা	শাকদ্বারা পিতৃপ্রাদির পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ।	বঙ্গ, দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ. উৎকল, মিথিলায় প্রচলি দ্রাবিড়; ও ত্রৈলিঙ্গে এই দিনে সীতাব্রত নামে ব্রত থাকে; মহারাষ্ট্রে ঐ দিন জানকীর জন্মদিন উপলক্ষে উ হয়। জম্বুতে এই দিনকে জানকী অষ্টমী বলে। গু ও মহারাষ্ট্রে উহাকে কালাষ্টমীও বলিয়া থাকে এবং ভৈরবের পূজা করে। কাশ্মীরে ,হোরাইঠঃহেয়ং' গৃহ পরিষ্কার করিবার দিন বলিয়া থাকে।
কৃষ্ণত্রয়োদশী	বারুণী	গঙ্গাস্নান ও দানাদি	জম্বু, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও কর্ণাট ব্যতীত আর প্রচলিত।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশী	শিবচতুর্দ্দশী	শিব	সর্ব্বত্র প্রচলিত।
প্রতিপদ	নবরাত্রি ব্রত	গৌরী (তন্ত্রোক্ত)	বাঙ্গালা প্রদেশ, উৎকল ও মিথিলা ভিন্ন আর প্রচলিত। দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে এই দিনে নিম্বফুল নামক ব্রত হইয়া থাকে।
শুক্ল দ্বিতীয়া	ব্রহ্মব্রত	ব্রহ্মা	বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের কামনায় করিতে এই দিনে প্রকৃতি পুরুষ ব্রত নামে একটি ব্রতানুষ্ঠ বিধি আছে ; উহাতে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজা করিতে উভয় ব্রতই এক্ষণে অপ্রচলিত।

পঞ্চমী	পঞ্চমহাভূত ব্রত	পঞ্চমহাভূত	দ্রাবিড় ও ত্রৈলিঙ্গে লক্ষ্মীপঞ্চমী এবং পঞ্জাব ও কাশ্মীরে ইহাকে সরস্বতী পঞ্চমী কহে। এই দিনে পঞ্চমহাভূতাত্মা বিষ্ণুর পূজা করিয়া পঞ্চমহাভূতের ব্রত করিতে হয় (অপ্রচলিত)।
সপ্তমী	বাসন্তীপূজারম্ভ	দুর্গা	কেবল বঙ্গ ও উৎকলে প্রচলিত। দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ ও কর্ণাটে এই দিন সন্তানসপ্তমী এবং পঞ্জাব কাশ্মীর জম্বুতে গঙ্গাসপ্তমী নামে অভিহিত।
অষ্টমী	অন্নপূর্ণাপূজা	অন্নপূর্ণা	বঙ্গে প্রচলিত। তথায় এবং দ্রাবিড়, কর্ণাট উৎকল ত্রৈলিঙ্গ ও মিথিলায় এই দিনকে অশোকাষ্টমী, মহারাষ্ট্রে অন্নপূর্ণাষ্টমী এবং জম্বু কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাষ্টমী বলিয়া থাকে। এই দিনে ব্রহ্মপুত্রে স্নান এবং শোক রাহিত্য কামনায় অশোক কলিকাপানের বিধি আছে।
নবমী	রামনবমী	শ্রীরামচন্দ্র	শ্রীরামচন্দ্রের পূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত।
ত্রয়োদশী	মদন ত্রয়োদশী	কন্দর্পের পূজা	বাঙ্গালা ও মিথিলায় মদনত্রয়োদশী · জম্বু, দ্রাবিড় কর্ণাট, মহীশূর, ত্রৈলিঙ্গে ইহার নাম অনঙ্গত্রয়োদশী।
া	রাসযাত্রা	বিষ্ণু	কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত; দ্রাবিড়ে এই পূর্ণিমাকে চিত্রাপূর্ণিমা এবং গুজরাটে হনুমজ্জয়ন্তী বলে ও হনুমানের পূজা করে, অন্যত্র প্রায় সর্ব্বত্র মন্বাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

তিথি।	ব্রতের নাম।	কোন্ দেবতা উপলক্ষে।	কোন্ প্রদেশে কি ভাবে চলে।
অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী	নক্তব্রত	মহাদেব	সর্ব্বদেশ প্রচলিত।
শ্রাবণের শনিবার	শনিপ্রদোষ-ব্রত	গনি	দিনে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষে শনির পূজা ম
ত্রয়োদশী			জপ ও কথা শ্রবণ। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।
মাবস্যা	সোমবত্যমাবস্যাব্রত	লক্ষ্মীনারায়ণ	দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। দ্বাদশ বর্ষ সাধ্য।
	সপ্তমীস্নাপন	রুদ্র ও সূর্য্য	মৃতবৎসার সন্তান হওয়ার পর সপ্তম মাসে অ প্রসবের পর যে কোন শুক্ল সপ্তমীতে কদলীর জলে প্র তির স্নাপন এবং তদনন্তর রক্তবর্ণ তণ্ডুল দিয়া পূজা পলাস সমিৎ ইত্যাদি দ্বারা হোম করিবার বিধি আ (অপ্রচলিত)।
একাদশী	একাদশী ব্রত	বিষ্ণু	সর্ব্বদেশ প্রচলিত। ব্রতের নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব স দেশ সাধারণ। উপবাসাশক্তের পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থ সর্ব্বত্র আছে। কেবল বঙ্গে নবদ্বীপ ও মধ্য দেশীয় সম এবং ভট্টপল্লী কলিকাতা প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় সমাজে অন্তর্ভুক্ত স্থান সমূহে বিধবার পক্ষে অনুকল্পের ব্য নাই।

সংক্রান্তিকৃত্য।

সংক্রান্তি।	ব্রত পূজা বা দান।	বিশেষ বক্তব্য।
মহাবিষুব	শক্তু ও বস্ত্রিপূর্ণ ঘটদান, প্রপাদান ও পিতাদির পার্ব্বণশ্রাদ্ধ।	প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। বাঙ্গালার দানসংক্রান্তি, সংক্রাতি ও ধর্ম্মঘট ব্রত এই দিনে আরম্ভ হইয়া থ সকলেরই পূজা দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ। এতদ্ব্যতীত

সংক্রান্তি, দাড়ির সংক্রান্তি, মধুসংক্রান্তি, এয়োসংক্রান্তি প্রভৃতি যোষিৎ প্রচলিত অনেকগুলি এই দিনে আরম্ভ হয়। ফলসংক্রান্তি বলিয়া আর একটি ব্রতও এই দিনে আরম্ভ হইয়া থ উহাতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় দানমাত্র করিতে হয়, কোনরূপ পূজা বিধি নাই। দাক্ষিণাত্যে সংক্রান্তি, লবণসংক্রান্তি, ভোগসংক্রান্তি, রূপসংক্রান্তি, তেজঃসংক্রান্তি, সৌভাগ্যসংক্রান্তি, সংক্রান্তি, মনোরথসংক্রান্তি, অশোকসংক্রান্তি (ব্যতীপাত যুক্ত হইলে) আয়ুঃসংক্রান্তি ও ধনস ব্রত হইয়া থাকে। প্রায় সকল ব্রতগুলিতেই সূর্য্যের পূজা হয় এবং দানাদির ব্যবস্থা আ প্রপাদান (জলদান) প্রধানতঃ বৈশাখে আরম্ভ হইলেও শাস্ত্রমতে উহার কাল শিবরাত্রি হইতে বর্ষার আগমন পর্য্যন্ত। নিকটে জলাশয় নাই এমন স্থানেই প্রপাদান করিতে চতুষ্পথই প্রপাদানের প্রকৃষ্ট স্থান। ইহাতে তক্রসংযুক্ত ঘবাগু, পাখা, শর্করোদক, সলব ভাগম প্রভৃতি দ্রব্য অথবা কেবলমাত্র জল দান করিলেই হয়। ব্রাহ্মণের ভস্ম চিহ্ন দিয়া পাত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

ও সংক্রান্তি।	ব্রত পূজা বা দান।	বিশেষ বক্তব্য।
ষ্ণুপদী	স্নানদানাদি	এই দিনে প্রধানতঃ গোদানের ব্যবস্থা অ দাক্ষিণাত্যে ইহার অধিকতর প্রচলন।
ড়শীতি	ঐ	প্রধানতঃ বস্ত্রান্নাদি দানেরই বিধি। দাক্ষিণা উহার সমধিক প্রচলন।
ক্ষিণায়ন	ঐ	ঘৃত ধেন্বাদি দান করিতে হয়। উক্তরূপ দ প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। অধিকন্তু এই সংক্রান্তি দিনে ধান্যসংক্রান্তি ব্রত নামে একটি আরম্ভ হইয়া থাকে।
ষ্ণুপদী	ঐ	প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে ছত্র সুবর্ণাদি দান হইয়া থ
ড়শীতি	ঐ	গৃহ বস্ত্রাদি দানেরই প্রাধান্য। প্রচলন দাক্ষিণা কিছু অধিক।
জলবিষুব	ঐ	তিল দুগ্ধাদি দান করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যেই এ দানের সমধিক প্রচলন। এই সংক্রান্তিতেও তথায় সংক্রান্তি ব্রত আরব্ধ হইতে পারে।

া বিষ্ণুপদী	ঐ	প্রধানতঃ দক্ষিণাত্যে এই দিনে দীপাদি দান বাঙ্গালায় এই সংক্রান্তি দিনে কার্ত্তিকের ব্রত এবং অন্ন সংক্রান্তি ও সর্ব্বজয়া ব্রত হইয়া থাকে। অন্নস ব্রতের পূজ্যাদেবতা সলক্ষ্মীক বিষ্ণু, সর্ব্বজয়ার গৌরী
ড়শীতি		বস্ত্রধানাদি দানের বিধি। দাক্ষিণাত্যেই উহার অধিক।
ড়রারণ	ঐ	প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে তিল ধেনু এবং শীতনাশ ইন্ধনাদি দান হইয়া থাকে। বঙ্গে ঐ দিনে এবং স্থলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মকরস্থরবি শীতবস্ত্র দানের ব্যবহার আছে। ধান্যসংক্রান্তি ব্রত এই সংক্রান্তিতেও হয়। দাক্ষিণাত্যে দেবকী ও প্রীত্যর্থ নবনীতের সহিত দধি ও মন্থানদণ্ড দানের আছে।
বিষ্ণুপদী	ঐ	ধেনুকে জল ও তৃণদান করিতে হয়। দাক্ষিণ ইহার সমধিক প্রচলন।
ণীতি	ঐ	প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে ভূমি মাল্যাদি দানের আছে।

। ব্রত।

রবিবার ব্রত

বিশেষ বক্তব্য।

এই ব্রতে ভবিষ্য পুরাণোক্ত বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ স
দ্বাদশ মাসে সূর্য্যের দ্বাদশ নামে পূজা এবং ব্রতা
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভোজনের বিধি আছে। এই বারে অ
গুলি ব্রতের বিধি আছে, তন্মধ্যে আশাদিত্য ও দ
ব্রত ব্যতীত আর সকলগুলিই অপ্রচলিত। দ্বাদশ
ব্যাপক আশাদিত্য ব্রত কুষ্ঠব্যাধি প্রশমন কামনায় ক
হয়। এই দুই ব্রতের প্রচলন দাক্ষিণাত্যেই অধিক।

সোমবার ব্রত

স্কন্দপুরাণোক্ত চতুর্দ্দশ-বর্ষব্যাপী উমামহেশ্বর
এই ব্রত গ্রহণ করিবার সময় শ্রাবণ, চৈত্র, বৈ
কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সোমবার
সোমবার মাত্রই। ইহাতে সাবিত্রী সত্যবানের উপ
সদৃশ স্কন্দ পুরাণোক্ত সীমন্তিনী ও চন্দ্রাঙ্গদ উপ
শুনিতে হয়। "এক ভক্ত সোমবার" ব্রত
মাসের অষ্টমীযুক্ত সোমবারে আরম্ভ করিতে হয়।

লবার	মঙ্গলবার ব্রত
বার	রাজরাজেশ্বর ব্রত
স্পতিবার	নরসিংহ ত্রয়োদশী ব্রত
ক্রবার	শুক্রবার ব্রত
ঘবার	শনিবার ব্রত

ণাত্যেই ইহার প্রচলন। সোমব্রত, সোমাষ্টমী ব্রত এ
বার তিথি যোগের কয়েকটী ব্রত এক্ষণে অপ্রচলিত।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা। ঋণমুক্তি কামনায় পুত্রার্থী
ধনার্থী ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহ দেবতারও পূজা করিবেন:

স্বাতী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী বুধবারে হইলে এই ব্রত
পূজ্যদেবতা মহাদেব। (অপ্রচলিত) বুধবার ব্রত ব
কোন ব্রত নাই।

ত্রয়োদশীযুক্ত বৃহস্পতিবারে এই ব্রতে নরসিংহের পূ
পূর্ণিমাযুক্ত হইলে ঈশান ব্রত। (অপ্রচলিত)।
পৌষ ও চৈত্রের শুক্লপক্ষে এই বারে লক্ষ্মীপূজা হয়।

শ্রাবণ মাসের শুক্রবারে বরদলক্ষ্মীব্রত। শুক্র
শ্রবণানক্ষত্র ও অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীযুক্ত হইলে মহাদে
পূজামূলক মহাব্রত। (অপ্রচলিত)।

শ্রাবণ মাসে শনিবারে করণীয়। শনিবারে রে
নক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমী বা চতুর্দ্দশী হইলে বিশ্বরূপ ব্র
(প্রচলিত)।

এই সকল ব্যতীত অক্ষয়া, মন্বন্তরা, যুগাদ্যা (১) প্রভৃতি এবং দশহরা যোগ (২), বারুণীযোগ (৩), মহা জ্যৈষ্ঠযোগ (৪) অর্দ্ধোদয়যোগ (৫) চূড়ামণি যোগ (৬) প্রভৃতি অনেকানেক যোগে মহাফল কামনায় গঙ্গা-স্নানের বিধি আছে। হিন্দু মাত্রেই উহা মান্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র করতোয়া (৭), প্রভৃতিতে স্নানও সর্ব্বত্র হিন্দুর মান্য।

---

(১) অক্ষয়া—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, অমাবস্যাযুক্ত সোমবার, সপ্তমীযুক্ত রবিবার, চতুর্থীযুক্ত মঙ্গলবার।

মন্বন্তরা—জ্যৈষ্ঠী, আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী, ভাদ্র ও চৈত্রের শুক্ল তৃতীয়া, আশ্বিনের শুক্ল নবমী, কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বাদশী, পৌষের শুক্লৈকাদশী, মাঘের শুক্ল সপ্তমী, ফাল্গুনের অমাবস্যা।

যুগাদ্যা—বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া, কার্ত্তিক শুক্ল নবমী, ভাদ্র কৃষ্ণত্রয়োদশী ও মাঘীপূর্ণিমা।

(২) জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী দশহরা। গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপক্ষয়। হস্তা-নক্ষত্রযুক্ত হইলে বিশিষ্টতা হয়। মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী হইলে ভগীরথ দশহরা হয়।

(৩) ফাল্গুন কৃষ্ণাত্রয়োদশী বারুণী। শতভিষাযুক্ত হইলে মহাবারুণী। শনিবারে শতভিষা ও শুভযোগ হইলে মহামহাবারুণী।

(৪) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে গুরুচন্দ্র, রোহিণীতে রবি, গুরুবারযুক্ত জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যেষ্ঠায় চন্দ্র, অনুরাধায় গুরু, কৃত্তিকায় রবি এবং অনুরাধাতে গুরুচন্দ্র, জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ নামক বর্ষে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—এই সকল হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়।

(৫) পৌষ অথবা মাঘ মাসে অমাবস্যা ব্যতীপাতযোগ, রবিবার, শ্রবণা নক্ষত্র—এই সকলের সংযোগ হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়। দিবাতেই উক্ত যোগ প্রশস্ত।

[৬] রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ অথবা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে জ্যেষ্ঠা বা মূলানক্ষত্রে যমুনার জলে স্নান বিষ্ণুদর্শন ও পিতৃপিণ্ডদানাদির বিধি আছে।

চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে বুধবার ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইলে ব্রহ্মপুত্রস্নানের এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

[৭] সৌর পৌষ সোমবারে মূলানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা হইলে নারায়ণী যোগ হয়। এই যোগে করতোয়া স্নান করিতে হয়।

(পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়ের সহিত পাঠ্য)

ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোকেরা স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে ব্রাহ্মণাচারের অনুসরণ করিয়া চলিবে, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিমত। স্ত্রীলোকেরাও কনিষ্ঠাধিকারী বলিয়া সাধারণতঃ শূদ্রদিগের ন্যায় আচার অবলম্বন করিতে আদিষ্ট। এই কথাটীর প্রতি যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কোন পক্ষপাত নিবন্ধন তাঁহাদিগের জন্য আচার পদ্ধতির সৃষ্টি হয় নাই। স্ত্রী এবং শূদ্রের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আচার ব্রাহ্মণাচার অপেক্ষা অনেকাংশে সহজ এবং স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে ব্রাহ্মণাচারের অনুসরণ করিতেও উপদিষ্ট।

(১) শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম কার্য্য দ্বিজ-শুশ্রূষা; জীবনোপায় কারুকার্য্য এবং পাক যজ্ঞেও শূদ্রের অধিকার আছে।

(২) যে শূদ্র বিশুদ্ধান্নভোজী, মদ্য মাংস ভোজনে নিবৃত্ত, দ্বিজের ভক্ত এবং বণিক্‌বৃত্তিপরায়ণ, তাহাকে সৎশূদ্র বলা যায়।

(৩) শূদ্রের দত্ত এবং শূদ্র ধন দ্বারা ক্রীত, খাদ্য সামগ্রী শূদান্নস্বরূপে দুষ্ট ; কিন্তু ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রতিগৃহীত হইলে তাহা বর্জ্জনীয় হয়।

(৪) যে শূদ্র দানপরায়ণ, ব্রতপালনশীল, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন সেরূপ শূদ্রের প্রদত্ত ভোজন গ্রহণে দোষ হয় না।

[৫] বৈদিক মন্ত্র পাঠে শূদ্রের অধিকার নাই। পৌরাণিক মন্ত্রপাঠে শূদ্রের অধিকার আছে। কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ সম্বন্ধে পৌরাণিক মন্ত্রেও শূদ্রের অধিকার নাই। শূদ্রের বৈধ কার্য্য অধিকাংশই "নমঃ" মন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়।

[৬] ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র আমান্ন দ্বারা নমস্কার মন্ত্রের সহযোগে সামান্য শ্রাদ্ধ এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

দানপ্রধানঃ শূদ্রঃস্যাদিত্যাহ ভগবান্ প্রভুঃ।
দানেন সর্ব্বকামাপ্তি র্হ্যস্য সংজায়তে যতঃ॥

শূদ্রের কর্ম্ম দান প্রধান হইবে, দানের দ্বারাই তাঁহার সকল ফল লাভ হয়।

[৭] শূদ্রের দন্তধাবন কাষ্ঠিকা চতুরঙ্গুল পরিমাণের হইবে, ব্রাহ্মণের দন্তকাষ্ঠিকার ন্যায় দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ হইবে না।

[৮] শূদ্রের তিলক গোলাকার হইবে।

বিবিধ প্রবন্ধ।

প্রথম ভাগ।

(উত্তর চরিত, রত্নাবলী এবং মৃচ্ছকটিকের সমালোচন।)

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

হুগলি

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

	বিষয় *	পৃষ্ঠা।
১।	উত্তরচরিত	১
২।	রত্নাবলী	৬৪
৩।	মৃচ্ছকটিক্	১১২

---

* এই প্রবন্ধগুলি এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

উত্তর চরিত—১২৮৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে প্রকাশিত।

রত্নাবলী—১২৮৭ সালের ৯ই আশ্বিন হইতে ৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে এবং ১২৯০ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে প্রকাশিত।

মৃচ্ছকটিক—১২৯৪ সালের ৭ই মাঘ হইতে ১১ই চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাহা অতি বৃহৎ হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমরা পুস্তকের তৃতীয় অঙ্কটী মাত্র সমালোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ঐ অঙ্কটীকেই গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের বোধে—

ভবভূতেস্তু সর্ব্বস্বমুত্তরং চরিতং কবেঃ,
তত্রাপি চ তৃতীয়োঽঙ্কশ্ছায়া যত্র প্রদর্শিতা॥

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে একটী বিষ্কম্ভক * আছে। তাহাতে তমসা ও মুরলা নামে দুই নদী প্রবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করে। মুরলা কহে, ভগবতী লোপামুদ্রা রামচন্দ্রের অবস্থা অনুভব করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি ভাবিয়াছেন,—

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশোরামস্য করুণোরসঃ॥

সীতা বিরহজনিত রামের শোক পুটপাকের ন্যায় হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, অথচ তাঁহার একান্ত গম্ভীর প্রকৃতি নিবন্ধন তদীয় অন্তঃকরণের গূঢ় কঠিন বেদনা বাহিরে কেহই কিছু জানিতে পারিতেছে না। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, তখন পথিমধ্যে সীতা-সহবাসবিশ্রম্ভসাক্ষী পঞ্চবটীর সেই সেই প্রদেশ সকল অবশ্যই তাঁহার নেত্রগোচর হইবে, তাহা হইলে রাম যতই ধীর ও গম্ভীর হউন, সে অবস্থায় কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না, পদে পদে তাঁহার বিপদ আশঙ্কনীয় হইবে। অতএব তিনি গোদাবরীকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—

বীচিবাতৈঃ শীকরক্ষোদশীতৈ
রাকর্ষদ্ভিঃ পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধান্।

---

* বৃত্তবর্ত্তিষ্যমানানাংকথাংশানাংনিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥

অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষেপে বর্ণন যেখানে হয়, তাহাকে বিষ্কম্ভক কহে।

বিবিধ প্রবন্ধ।

উত্তরচরিত।

(১)

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সমালোচনা এক্ষণে প্রায় হয় না। অনেক দিন হইল, বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিতের এক উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা তাহাই অবলম্বস্বরূপ করিয়া উত্তরচরিত বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ অভিমতি প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিষমপদব্যাখ্যাসমেত উত্তরচরিতের এক সংস্করণ করেন। তিনি ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্ব শক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত নহে।" কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তকের এক স্থলে (৩য় সংস্করণ ৬৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছিলেন, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নামনির্দ্দেশ হওয়া উচিত।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই সময়ের এই দুই প্রকার অভিমতি দেখিয়া আমরা বুঝিলাম যে,—

কালান্তরাদ্বা বয়সোঽন্তরাদ্বা
প্রায়ো ভবেদ্ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

উত্তর চরিত বৃহৎ পুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে

মোহে মোহে রামভদ্রস্য জীবং
স্বৈরং স্বৈরং প্রেষিতৈস্তর্পয়েতি ॥

হে গোদাবরি! তত্তৎসময়ে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে তুমি জলশীকর শীতল কমলকিঞ্জল্কসুরভি মন্দ মন্দ পরিচালিত তরঙ্গপবন দ্বারা তাঁহার মোহের অপনয়ন করিও। মুরলার এই কথা শুনিয়া তমসা কহিল, ভগবতী লোপামুদ্রার স্নেহ যেরূপ, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছে, কিন্তু আজি সে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতেছে না; কারণ রামচন্দ্রের মৌলিক যে সঞ্জীবনোপায়, তাহা ছায়াময়ীমূর্ত্তিস্বরূপে অদা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

পাঠকগণ জানিবেন যে, সীতার ঐ ছায়াময়ী মূর্ত্তি এই তৃতীয় অঙ্কের প্রাণ। এই অঙ্কে ছায়াময়ী সীতা তমসার সহিত, এবং রাম বনদেবী বাসন্তীর সহিত কথোপকথন করেন। সীতা, তিন জনকেই দেখিতে পান, কিন্তু তমসা ভিন্ন স্বয়ং আর কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হয়েন না। রাম নিরন্তর সীতাচিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সীতাসহবাস বিশ্বস্ত-সাক্ষী পদার্থসমূহকে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার শরীর স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন; এমন কি; এক সময়ে সীতার হস্ত ধারণ করিয়া বাসন্তীর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথচ কবির ঐ সীতা ছায়াময়ী।

এ স্থলে লোকলোচনের অদৃশ্যা রামের সহবনবিহারিণী ও আশ্বাস-প্রদায়িনী ঐ ছায়াময়ী মূর্ত্তি কিরূপ পদার্থ, তাহা বিচার্য্য বিষয় বলিয়া সহজেই উপলব্ধ হয়। অতএব তাহা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাউক। ছায়াময়ী সীতামূর্ত্তি যে একটা অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যসৃষ্টি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ওকথা বলায় অর্থবোধের কিছু অধিকা হয় না। উহা কবির কল্পনা একথা বলিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকল কাব্যেরই সারাংশ কবির কল্পিত বস্তু বই আর কিছুই নহে; এবং কোন কবির কোন কল্পিত বস্তু কোন কালে বাস্তব উপাদানের বিনাভাবে সংঘটিত

হয় নাই—হইতেও পারে না। অতএব ভবভূতির ঐ ছায়াময়ী সীতার প্রকৃত উপাদান কি, তাহা অনুসন্ধেয় হইতেছে।

পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, রামের এবং ছায়াময়ী সীতার পঞ্চবটী প্রবেশ. এবং তথা হইতে উভয়ের তিরোধান একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

যেই মুরলা বলিলেন,

"রামভদ্রোঽপ্যাগত এব তর্কয়ামি।"

রামভদ্রও আগতপ্রায় বোধ হইতেছে। অমনি তমসা উত্তর করিলেন—

পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরম্
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথৈব বনমেতি জানকী॥

যেন শরীরধারিণী বিরহব্যথা এবং করুণ রসের মূর্ত্তিস্বরূপা জানকী বনে আসিতেছেন। বিরহে তাঁহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে; এবং কবরীবন্ধন আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে।

মুরলাও দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—

"ইয়ংহি সা
কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনম্
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণোদীর্ঘশোকঃ
ম্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজইব ঘর্ম্মঃ কেতকী গর্ভপত্রম্॥

"তিনিই বটেন, আহা! শরৎকালীন উত্তাপ কেতকী পুষ্পের গর্ভস্থ পত্রদলকে যেমন ম্লান করে, সেইরূপ হৃদয়কুসুমশোষণকারী নিদারুণ দীর্ঘ শোক বন্ধন হইতে ছিন্ন নবকিসলয়ের ন্যায় ইহাঁর পাণ্ডুবর্ণ শরীরকে ম্লানিযুক্ত করিতেছে।

আবার অঙ্কের শেষে তমসা এবং বাসন্তী রাম এবং সীতার পঞ্চবটী

পরিত্যাগ সময়ে নিম্নলিখিত একই শ্লোকদ্বারা উভয়কে আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় করিতেছেন।

অবনিরমরসিন্ধুঃ সার্দ্ধমস্মদ্বিধাভিঃ
স চ কুলপতি রাদ্যশ্ছন্দসাং যঃ প্রয়োক্তা।
স চ মুনিরনুযাতারুন্ধতীকোবশিষ্ঠ-
স্ত্বয়ি বিতরতু ভদ্রং ভূয়সে মঙ্গলায়॥

পৃথিবী সুরনদী এবং অস্মদাদির ন্যায় অপরাপরে, এবং যিনি ছন্দের প্রবর্ত্তক, সেই আদ্যকুলপতি বাল্মীকি ও সেই সারুন্ধতীক বশিষ্ঠ তোমার প্রভূত মঙ্গল করুন্।

---

(২)

ভবভূতির ছায়াময়ী সীতা কিরূপ পদার্থ, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে ছায়াময়ীর এবং রামের পঞ্চবটী প্রবেশ তথায় অবস্থান এবং সেখান হইতে যাওয়া যে একই সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল, কবি তাহার স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন।

তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত প্রাথমিক কার্য্যকলাপেরও সংঘটনকাল সম্বন্ধে অপর একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। সীতা পঞ্চবটী প্রবেশমাত্রে বনদেবী বাসন্তীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন, যথা—

প্রমাদঃ প্রমাদঃ
সীতাদেব্যাঃ স্বকর কলিতৈঃ শল্লকীপল্লবাগ্রৈ
রগ্রে লোলঃ কবিকরভকো যঃ পুরা পোষিতোঽভূৎ
বধ্বা সার্দ্ধং পয়সি বিহরন্ সোঽয়মন্যেন দর্পাৎ
উদ্দামেন দ্বিরদপতিনা সম্নিপত্যাভিযুক্তঃ॥
বিপদ্ বিপদ্!

সীতাদেবীর স্বকরাবচিত নব শল্লকীপল্লবাগ্রদ্বারা যে কবি শাবক প্রাত

পালিত হইয়াছিল, এবং তাহার হস্ত হইতে সেই পল্লব গ্রহণার্থ যে লোলুপ হইত সেই করি-শাবক বধূর সহিত জল-কেলি করিতেছে, এমন সময়ে অন্য এক উচ্ছৃঙ্খল দ্বিরদপতিদ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াছে।

রামও পঞ্চবটী প্রবেশমাত্র যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই মোহের অপগমে অবিকল ঐ স্বর ও ঐ কথা অর্থাৎ "প্রমাদঃ প্রমাদঃ—"সীতা-দেব্যাঃ" ইত্যাদি শুনিতে পাইলেন।

যৎকিঞ্চিৎমাত্র অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, দুই বিভিন্ন সময়ে বাসন্তী ঐ কথাগুলি কহিয়াছিলেন, এরূপ ভাব ব্যক্ত করা কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকার উক্তি নিতান্ত উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহের ব্যঞ্জক। ঐরূপ কথা স্বভাবতঃই অনন্তরভাবে উপর্য্যুপরি উচ্চরিত হইয়া থাকে। কেহ কাহাকেও মারিতেছে বা মারিতে যাইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ নিবন্ধন লোকে "মারিলে রে মারিলে রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এক বার মাত্র "মারিলে রে" বলিয়া, তাহার দণ্ডেক পরে পুনর্ব্বার "মারিলে রে" বলে না। অতএব বাসন্তীর "প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতাদেব্যাঃ" প্রভৃতি নাটকের দুই স্থানে যে দুই বারের উক্তি আছে, তাহার মধ্যে কালাতীত হইয়াছিল, ইহা মনে করা ভ্রম। কবি নিজেও পাছে পাঠকের ঐ ভ্রম হয় তাহার সম্যক্ প্রতিবিধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, সীতা পঞ্চবটীর যে স্থানে, রামও পঞ্চবটীর সেই স্থানে ছিলেন। সীতা রামের কথা শুনিতে এবং রামকে দেখিতে পাইতেছিলেন। আবার তাহা অপেক্ষাও যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কবি সীতাদেবীর মুখ দিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাসন্তীর ঐ দুই বারের উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র কালাতিপাত হয় নাই—প্রত্যুত উহা এক-বারেরই উক্তি, এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। সীতা যখন বাসন্তীর উক্তি প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন সেই পুত্রবৎ পালিত করি-শাবকের প্রতি বিপৎপাত আশঙ্কায় একান্ত বিহ্বলা হইয়া বলেন—

অস্থট্ঠিদ পুত্তিএ করিণীএ [অস্থস্থিত পুত্রিকায়া করিণ্যা]

চিরপরিচিদাইং অক্খরাইং পঞ্চবটী দংসণেণ পুণো বি মং মন্দভাইণিং অণুরুদ্ধন্তি। হা অজ্জউত্ত। ইতি মূর্চ্ছতি।

আর্য্যপুত্র আমার সেই পুত্রকে পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্। হা বিক্ হা বিক্ অদ্য পঞ্চবটীদর্শনে সেই চিরপরিচিত কথাগুলি পুনরায় মন্দভাগিনী আমার মুখে আসিতেছে। হা আর্য্যপুত্র!

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

আবার বাসন্তীর দ্বিতীয়বৎ প্রতীয়মান ঐ উক্তির পর বলিলেন,—

কো দানিং অহিউজ্জিস্সদি

কে এক্ষণে রক্ষা করিবে?

এই দ্বিতীয় উক্তি যে প্রথম উক্তিরই উপসংহারমাত্র তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত যত্ন পাইতে হইবে না। কারণ এ বারে রাম সাক্ষাৎ রহিয়াছেন এবং তিনিও করুণা ও ঔৎসুক্য সহকারে বলিয়াছেন—

"কিং তস্য বৎসস্য"

বাছা কি হইয়াছে?

সুতরাং কে এক্ষণে রক্ষা করিবে এরূপ কথা প্রথম উক্তির উপসংহার না হইলে সঙ্গতই হইতে পারে না। বাস্তবিক সীতা পূর্ব্বে হা আর্য্যপুত্র! বলিয়া কাতর সম্বোধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কে আর রক্ষা করিবে বলিয়া বাক্য সমাপন করিয়াছেন।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সীতাদেবীর উল্লিখিত দুই উক্তির মধ্যে কালাত্যয় হয় নাই। অপিচ উহারই মধ্যে বহুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সীতা হা আর্য্যপুত্র বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলে, তমসা-কর্ত্তৃক আশ্বস্তা হইয়া যেই রামের কণ্ঠস্বর শুনিলেন, অমনি ঐ স্বর যে কাহার তাহা চিনিয়া বলিলেন,—

অম্মহে জলভরিদমেহথণিদগম্ভীর মংসলো কুদোণু এসা ভারদীণিগ্ঘোসো ভবিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তিউসসাবেদি।

জগদ্গুরু মেঘশব্দের ন্যায় গম্ভীর এবং মঙ্গল এই বাক্যধ্বনিতে আমার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল, এবং মন্দভাগিনী আমাকে ঝটিতি উচ্ছ্বাসিত করিল।

যেমন বলিলেন —

অয়ি বৎসে!

কিমবাক্তেঽসি নিনদে কুতস্তোঽপি ত্বমীদৃশী।

স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতং স্থিতা॥

যেমন মেঘের শব্দে ময়ূরী উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ কোথায় হইতে আগত এই অব্যক্ত শব্দে কেন তুমি এরূপ চকিত এবং উৎকণ্ঠিত হইলে?

সীতা কহিলেন —

ভঅবদি কিং ভণাসি অপরিপ্ফুডং ত্তি ম এউণ সরসঙ্কোএণ পচ্চভিআণিদং অচ্ছটঠো এব্ব বাহরদি।

ভগবতি! ইহা কি অপরিস্ফুট? আমি কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি, আর্য্যপুত্রই কথা কহিতেছেন।

যে অতি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর ... দাদি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার সকল অন্যের অপরিচিত হইলেও ... হিতানিবন্ধন যে প্রণয়িনীর অতিপরিচিত হইয়া থাকে, কবি ... দেখাইয়াছেন। আমরা এস্থলে ভবভূতির মানবচিত্তাভিজ্ঞতার ... কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয়, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সীতা অত স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া যদি "ভঅবদি কিংভণাসি অপরিপ্ফুডং ত্তি" ভগবতি! কি বলিলে ইহা অপরিস্ফুট? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অবনতমুখে থাকিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত—তাঁহাদিগের মতে অধিকতর রমণীয়ই হইত। কারণ

তমসা পরেই বলিতেছেন,

"অহকে হৃদয়াহ্লাদকরং সুহৃদ্বচনমাকর্ণ্য অনাস্বাদিতপূর্বমিব হৃদয়মাপ্লবতে।"

শুনিয়াছি তপস্যাকারী শূদ্রকের প্রতি দণ্ডদানার্থ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা জনস্থানে আগত হইয়াছেন।

এস্থলে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য এই, তমসার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করার কারণ কি হইতে পারে? যাহার নাম করিলে কাহারও শোক দুঃখ প্রভৃতি মনোবিকার প্রচীয়মান হইয়া উঠে, তাহার সমক্ষে লোকে স্পষ্ট করিয়া তদীয় নাম উচ্চারণ করে না, প্রয়োজন হইলে যথাসম্ভব ঘুরাইয়াই বলিয়া থাকে। তমসা সেই জন্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা যদি পূর্ব্বেই আত্মীয়তা-সূচক "আর্য্যপুত্র" বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে তমসার ঐরূপ ঘোর ফের করিয়া বলা সুসঙ্গত হয় না। তাঁহারা এ কথাও বলিয়া থাকেন। উহার পরেই সীতাও বলিয়াছিলেন —

"দিট্ঠিআ অপরিহীণরাঅধম্মো কখু সো রাজা।"

ভাগ্যক্রমে সেই রাজার রাজধর্ম্মপালনের ব্যতিক্রম হয় নাই।

তাঁহাদিগের বিবেচনায় এ স্থলে রামকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবশ্যই আন্তরিক অভিমানব্যঞ্জক; সুতরাং প্রথমে তাঁহার প্রতি আর্য্যপুত্র সম্বোধন অসঙ্গত। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কবির রচনাই সমীচীন হইয়াছে। সীতার মনোমধ্যে যতই অভিমান থাকুক, রামের প্রতি সে অভিমান কখনই স্বতঃ ব্যক্ত হয় না। অন্যের কথায় তাদৃশ অভিমানের হেতু উদ্বোধ ব্যতিরেকে তিনি নিয়তই রামপ্রেমমুগ্ধা হইয়া থাকেন। অতএব যখন প্রথমে রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাকে চিনিলেন, অমনি প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া ফেলিলেন। যাহাদের ওরূপ কোমলপ্রকৃতি অপরে তাহাদিগের হইয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্যই তমসার অ-প্রণয়ব্যঞ্জক 'ঐক্ষ্বাকো রাজা' এবং তাহার পর সীতার নিজের উক্তিতে 'রাজা'। ভবভূতি সীতার প্রকৃতি কেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সপ্তম অঙ্কে সীতার ঐ ভাব অধিকতর ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অরণ্যে পরিত্যক্তা

এবং প্রসববেদনায় কাতরা হইয়া ভাগীরথীজলে শরীর বিসর্জ্জনা করিলে পৃথিবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভাগীরথীকে বলেন,—

যুক্তমেতদ্ বা রামভদ্রস্য
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ।
নাহং ন জনকোনাগ্নির্নানুবৃত্তির্ন সন্ততিঃ॥

ইহা কি রামভদ্রের পক্ষে উচিত কার্য্য হইয়াছে ?

বাল্যে পাণিপীড়ন, আমি, জনক, অগ্নি, চিরানুবৃত্তি এবং সন্ততি এ সকলের কিছুই প্রমাণ হইল না ?

সীতা ঐ অবস্থাতেও রামের নাম শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—

হা অজ্জউত্তং সুমরাবিদক্ষি। হা ! আর্য্যপুত্রকে মনে পড়িল।

সর্ব্বংসহা পৃথিবীও কন্যার এরূপ অভিমান-শূন্যতা সহিতে পারিলেন না। ধমকাইয়া উঠিলেন,—

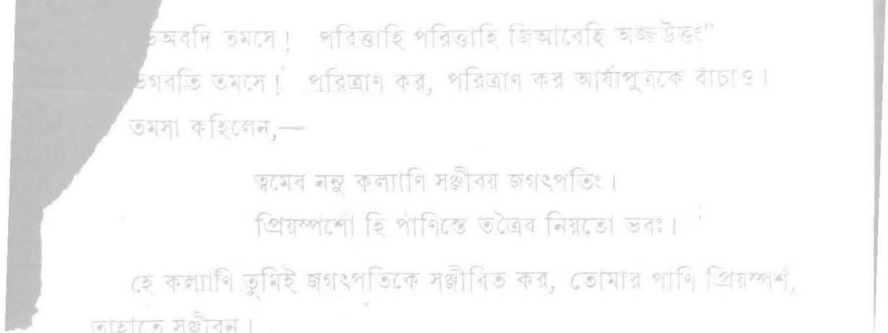
আঃ কস্তবার্য্যপুত্রঃ—
আঃ কে তোর আর্য্যপুত্র ?

সীতা অমনি জড়সড়—বলিলেন,—

জহ বা অম্বা ভণাদি
মা যা বল !

এও সেই সীতা—রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর্য্যপুত্র না বলিয়া কি থাকিতে পারে ? এবং তমসার মুখে "ঐক্ষ্বাকো রাজা" শুনিবার পর "রাআ" বলিবে না ত আর কি বলিবে ? এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অনন্তর রাম প্রিয়াসহচর হইয়া যে পঞ্চবটীতে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, তথাকার বৃক্ষ, মৃগ, গিরিনির্ঝর, কন্দর প্রভৃতি দর্শনে উদ্দীপিতবিরহশোক হইয়া হা প্রিয়ে জানকি ! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি, হা দেবি বিদেহরাজপুত্রি বলিয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ ও অধীরভাবে পতিত হইলে সীতা তমসার চরণে ধরিয়া বলিলেন,—



ভগবদি তমসে! পরিত্তাহি পরিত্তাহি জিআবেহি অজ্জউত্তং"
ভগবতি তমসে! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর আর্য্যপুত্রকে বাঁচাও।
তমসা কহিলেন,—

ত্বমেব নন্থ কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎপতিং।
প্রিয়স্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভবঃ।

হে কল্যাণি তুমিই জগৎপতিকে সঞ্জীবিত কর, তোমার পাণি প্রিয়স্পর্শ, তাহাতে সঞ্জীবন।

সীতা বলিলেন,

জং হোদু তং হোদু জহা ভঅবদী ভণাদি।
যা হয় হউক, ভগবতী যেরূপ বলিতেছেন।

এই জং হোদু তং হোদু কথাটী কি চমৎকার ভাবপূর্ণ। এতদ্দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে, অকারণপরিত্যাগজনিত গূঢ় অভিমানে এবং কোমল-প্রকৃতিসুলভ ভয়ে সীতার হৃদয় পূর্ণ ছিল। সীতা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, আমি পরিত্যক্তা পত্নী, স্বামীর শরীরস্পর্শে আমার অধিকার কি? আমি স্পর্শ করিয়াছি জানিতে পারিলে তিনি কুপিত হইতেও পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যা হইবার হউক, অর্থাৎ আমার ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হউক বলিয়া রামের শরীর স্পর্শ করিতে গেলেন। রাম সীতাকর্ত্তৃক শরীরস্পর্শমাত্রে আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইলেন। সীতা বলিলেন,

জাণে পুণোবি পচ্চাগদং বিঅ জীবিদং তেল্লোঅণাহস্স।
ত্রিলোকনাথের জীবন পুনরপি প্রত্যাগত বোধ করিতেছি।

পাঠক দেখুন, ইতঃপূর্ব্বেই তমসা রামকে জগৎপতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সীতাও তাহার অনুসরণে "তেল্লোঅণাহ" বলিলেন। তদ্ভিন্ন কবি ত্রিলোকনাথ এই শব্দটার অপর সার্থকতাও দেখাইয়াছেন।

রাম—লোকনাথ—রাজা—প্রজাপালক তমসার বাক্যে এই অংশটী

সীতার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল। তিনি আমার ভাগ্যে জং হোহু হোহু মনে করিয়া রামের জীবনোপায় সাধন করিতে গিয়াছিলে এবং তাহা করিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ হৃষ্টমনা হইয়াছিলেন।—কবি সীতাকে "কিঞ্চিৎ" হৃষ্টমনা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সীতার মনে লোকোপকারে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু আত্মসম্বন্ধে তাঁহার ঔদাস্য রহিল। রাম চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—

হন্ত ভোঃ কিমেতৎ
প্রশ্চোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥
স্পর্শঃ পুরা-পরিচিতো নিয়তং স এষ
সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ।
সন্তাপজাং সপদি যঃ প্রতিহত্য মূর্চ্ছা-
মানন্দনেন জড়তাং পুনরাতনোতি॥

আহা এ কি!

হরিচন্দনপল্লবসমূহের রসস্রাবস্বরূপ, কি নিষ্পীড়িতচন্দ্রকরকলাপের অভিষেক, কি আমার তাপিত জীবিততরুর পরিতর্পণস্বরূপ সঞ্জীবনৌষধিরস আমার হৃদয়ে প্রসিক্ত হইল।

এই যে আমার সঞ্জীবন এবং মনোমুগ্ধকর স্পর্শ, ইহা আমার পূর্ব্ব-পরিচিত, ইহা হঠাৎ সন্তাপজন্য মূর্চ্ছা বিনাশ করিয়া আনন্দদ্বারা আমাকে পুনরায় জড় করিয়া ফেলিতেছে।

সীতা শুনিলেন, এবং ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন; বলিলেন—

এত্তিঅং এব্ব দাণীং মে বহুদরং

এক্ষণে ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রাম উপবিষ্ট হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সীতা তমসাকে কহিলেন,

ভঅবদি তমসে!

ওসরন্ধা জই দাব মং পেক্খিস্সদি তদো অণভ্যাণুণ্ণাদসন্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্সদি।

ভগবতি তমসে! এস আমরা সরিয়া যাই। আমি বিনা অনুজ্ঞায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ আমার প্রতি অধিকতর কুপিত হইবেন।

রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া প্রিয়ে জানকি বলিয়া ডাকিলেন। নাটকে নির্দ্দেশ না থাকিলেও আহ্বানটী বোধ হয় উচ্চৈঃস্বরেই হইয়াছিল। সীতা একটু রাগ করিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

অজ্জউত্ত অসরিসঙ্কখু এদং বঅণং ইমস্স বৃত্তন্তস্স।

আর্য্যপুত্র' নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা—সেই সেই বৃত্তান্তের পর।

পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের উপর সীতার কোপ যে অত্যল্পক্ষণস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমের "নিশ্চয়ই অসদৃশ" এই দুইটী শব্দ মাত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। শেষের "সেই সেই বৃত্তান্তের পর"—এই কয়টী শব্দ রামকৃত অকারণ পরিত্যাগরূপ অপরাধের আবরণ;—কেবল তাহাই নহে, ঐ শব্দগুলি সীতার স্বামিত্যাগজনিত আন্তরিক লজ্জারও পরিব্যঞ্জক। তিনি বাষ্পদিগ্ধনয়নে বলিতে লাগিলেন—

অহবা কিংত্তি বজ্জমইং জন্মন্তরেসম্ভাবিদদুল্লহদংসণস্স মং এব্ব মন্দভাইণিং উদ্দিসিউ বচ্ছলস্স এবংবাদিণো অজ্জউত্তস্স উঅরি নিরণুক্কোসা ভবিস্সং।

অথবা অধিক কি! আমি বজ্রময়ী!—মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ প্রিয়ভাষী জন্মান্তরেও দুর্ল্লভদর্শন স্নেহময় আর্য্যপুত্রের উপর আমি কি নির্দ্দয় হইব।

সীতা স্বামীর প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই আপনাকে তিরস্কার করিয়া বজ্রময়ী বলিয়াছিলেন, বিরহ-বেদনায় গতপ্রাণা হয়েন নাই ভাবিয়া আপনাকে বজ্রময়ী বলেন নাই। তিনি বিগতক্রোধ হইয়া বলিলেন,—

অহং ওদস্স হিদঅং আণামি মম বিএসোত্তি।

আমি উহাঁর হৃদয় জানি এবং উনিও আমার হৃদয় জানেন।

সীতার প্রেমময় হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি যেন সেই বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই তমসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভঅবদি তমসে তহা ণিকারণপরিচ্চাইণো বি এদস্স এবংবিহেণ দংসণেণ কেরিসো বিঅ মে হিঅআণুবন্ধো ত্তি ণ আণামি।

ভগবতি তমসে ইনি অকারণে সেরূপ পরিত্যাগ করিলেও ইহাঁর এবম্বিধ দর্শনে আমার হৃদয়ের যে কিরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহা আমি জানি না।

তমসা বলিলেন,—

জানামি বৎসে জানামি,
তটস্থং নৈরাশ্যাদপিচ কলুষং বিপ্রিয়বশা-
দ্বিয়োগে দীর্ঘেঽস্মিন্ ঋটিতি ঘটনোত্তম্ভিতমিব।
প্রসন্নং সৌজন্যাদ্দয়িতকরুণৈর্গাঢ়করুণম্
দ্রবীভূতং প্রেম্না তব হৃদয়মস্মিন্ ক্ষণইব।

দীর্ঘ বিরহে তোমার হৃদয় এত দিন রাম দর্শনে নৈরাশ্য হেতু উদাসীন ছিল, এবং রামের পরিত্যাগ জন্য বিপ্রিয়বশে কলুষভাব ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে ঋটিতি রামদর্শন ঘটনায় আনন্দে যে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদীয় সৌজন্যে প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল, দয়িতের করুণ বাক্যে গাঢ় করুণ রসের আশ্রয় হইয়াছে, এবং প্রেমে একবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

এই শ্লোকে 'তটস্থ' 'কলুষ,' 'উত্তম্ভিত,' 'প্রসন্ন,' 'গাঢ়,' 'দ্রবীভূত,' এই সকল শব্দের দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, কবি নদীর সহিত সীতা-

হৃদয়ের রূপক কল্পনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রথমে নদী তমসার "আমি জানি, আমি জানি" এই বীপ্সাত্মক বাক্যে তাহার সূচনাও করিয়াছেন। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মনে এ কি ভাব হইল জানিতে পারিতেছি না। তমসা বলিলেন, বাছা তুমি জান না, কিন্তু আমি ইহার ভুক্তভোগী—আমি জানি। আমাতে দীর্ঘ কালের পর বর্ষাগম, এবং পর্ব্বতস্থ নীহারসংঘাত দ্রবীভূত হইলে ঐরূপ "হড়কা বাণ" আসিয়া থাকে। তমসা যে নদী, তাহা কবি নিজে ত ভুলেনই নাই, পাঠককেও ভুলিতে দিলেন না।

ভবভূতি আরও একটী কথা পাঠকের হৃদ্‌গত করাইতে বিস্মৃত হন নাই। নদী তমসা যেমন আপনার সাদৃশ্যে সীতার তাৎকালিক অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন, রামও সেই সময়ে স্বমুখে তাঁহার নিজের কি হইয়াছে বলিলেন। তিনি সীতাদর্শনচেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া প্রথমতঃ বলেন—

প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যেবার্দ্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ ক্বাসি নন্দিনি॥

তোমার মূর্ত্তিমান্ প্রসাদস্বরূপ স্নেহার্দ্র শীতল স্পর্শ এখনও আমাকে আর্দ্র করিতেছেন, কিন্তু হে আনন্দিনি! তুমি কোথায়?

সীতা রামের ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,—

এদে কখু দে অগাধদংসিদসিণেহসম্ভারা আনন্দণিস্সন্দিণো সুদা মএ অজ্জউত্তস্স উল্লাবা জাণং পচ্চএণ ণিক্কাকরণপরিচ্চাঅসল্লিদো বি বহুমদো মে জম্মলাহো।

আমি আর্য্যপুত্রের অগাধস্নেহসম্ভৃত আনন্দনিস্যন্দী যে সকল বিলাপ শ্রবণ করিলাম, তদ্দ্বারা অকারণপরিত্যাগজনিত শল্যে বিদ্ধ হইলেও আমার জন্মলাভ সার্থক বিবেচনা করিলাম।

আর অভিমান নাই—অকারণ পরিত্যাগজনিত শল্যবিদ্ধ হইলেও আপনার জন্মলাভ সার্থক মানিলেন। ইহার পর রাম বলিলেন,—

অথবা কুতঃ প্রিয়তমা। নূনং সঙ্কল্পাভ্যাস পাটবোৎপাদ এষ রামভদ্রস্য ভ্রমঃ।

অথবা প্রিয়তমা কোথায় ? ইহা রামের কল্পনাভ্যাসপটুতাজনিত ভ্রম।

অর্থাৎ কবি রামের মুখ দিয়াই বলিলেন যে, এই সমস্ত ব্যাপার রামের ভ্রম মাত্র, ইহার পরেই বাসন্তীর সেই উৎকণ্ঠোক্তি "প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতা দেব্যা" ইত্যাদি।

---

(৩)

তৃতীয়াঙ্কে বনদেবী বাসন্তীর প্রথমোচ্চরিত "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" এই স্থল হইতে দ্বিতীয়োচ্চরিতবৎ প্রতীয়মান "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" পর্য্যন্ত যে ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তৎসমস্ত ক্ষণকালমাত্রেই নির্ব্বাহিত, ইহা বুঝা গিয়াছে ; এবং উপসংহারে কবিও রামের মুখ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ছায়াময়ী সীতাকর্ত্তৃক রামের অঙ্গস্পর্শ রামেরই ভ্রমমাত্র। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তৃতীয় অঙ্কের ঐ ভাগটীর সহিত সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের একটী অতি বিচিত্র সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত প্রকাণ্ড বনস্পতি তাহার পত্রৈক মধ্যে প্রতিভাত থাকে, যেমন এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সুবৃহৎ সৌর জগতেরই অনুরূপ, এবং যেমন বিস্তৃত রামায়ণাদি পুরাণ তত্তৎ পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট সংক্ষিপ্ত অংশেরই বিস্তৃতিমাত্র, সেইরূপ তৃতীয়াঙ্কের এই ভাগটী সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেরই প্রতিরূপস্বরূপ। পাঠক দেখিবেন যে, সমুদায় তৃতীয়াঙ্কে যে যে কথা আছে, তৎসমুদায় এই ভাগের বিস্তৃতি বই আর কিছুই নহে। রাম যে পঞ্চবটীবনে সীতার সহিত পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, সেই বনের পূর্ব্বপরিচিত মৃগ, পক্ষী, স্থানসন্নিবেশাদি, বিশেষতঃ সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক, ময়ূর, মৃগ, কদম্ববৃক্ষাদি, এবং তাঁহাদের অধ্যুষিত সেই সেই শয়নীয় শিলাতল এবং লতাগৃহাদি দর্শনে সীতাবিরহশোক রামের অন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাঁহার একান্ত ম্লানভাব লক্ষিত হয়, তিনি অনুতাপে মুগ্ধ হন, এবং সেই মোহে প্রসন্নহৃদয়া সীতার অনুগ্রহস্পর্শ-

বিগতমন্যু সীতা যেন পুনর্জন্ম লাভ করেন। পূর্ব্ব অঙ্কেও এই কথা, এবং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেও এই কথা। অতএব তৃতীয়াঙ্কের ঐ পূর্ব্ব ভাগকে সংক্ষিপ্তাঙ্ক বা উপাঙ্ক কহা যাইতে পারে।

উপাঙ্কের প্রথমে, পোষিত করিশাবকের প্রতি রামসীতার পুত্রভাবের অঙ্কুর আছে। পাঠক দেখিবেন, ভবভূতি ঐ অঙ্কুরটী মাত্র লইয়া কি অপূর্ব্ব কবিত্বকুসুমশোভিত বনভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহাতে প্রণয়িযুগলের স্ফটিকস্বচ্ছহৃদয় পরিদৃষ্ট, এবং দুইটী হৃদয়তন্ত্রীর এক সুরে লয়সংযোগ আকর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চবটী মূর্ত্তিমতী হইয়া বাসন্তীরূপে সমাগতা হইলে রাম তাহাকে সীতার পূর্ব্বসখী বলিয়াই চিনিলেন। পঞ্চবটী রামের চক্ষে সীতাময়ী হইয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। বনদেবীর কথানুসারে রাম জটায়ু শিখরীর দক্ষিণে সীতাতীর্থদ্বারা গোদাবরীতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার পুত্রীকৃত করিশাবককে রক্ষার নিমিত্ত গমন করিলেন। গোদাবরীসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই করিশাবক শত্রুবিজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কবি তখন সীতার মুখে এই উক্তি প্রকাশ করিলেন—

"অম্মহে এরিসো এসো সো সংবুত্তো"

আহা সেটী এখন এমন হইয়াছে!

কবি রামকে দিয়াও বলাইলেন—

দেবি! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে
যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিসলয়স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎকল্যাণংবয়সি তরুণে ভাজনংতস্যজাতঃ॥

দেবি! তোমার বড় সৌভাগ্য!

অচিরজাত, মৃণাল ও পল্লববৎ কোমল দন্তপ্ররোহে শোভমান যে করি-

শাবক তোমার কর্ণপূর হইতে নবলীপত্র আকর্ষণ করিত, সেই তোমার পুত্র মদস্রাবী হস্তীকে জয় করিয়া তরুণ বয়সে যাহা শুভ, তাহার আধার হইয়াছে।

পাঠক দেখুন, সীতা যেন রামের মানসচক্ষের সম্মুখীনা—দেবী সম্বোধনপূর্ব্বক রাম যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বুঝা যাইবে যে, সীতার মুখে যে কথা, রামের মুখেও সেই কথা—সীতা "সে" বলিয়া করিশাবকের অতীতাবস্থার স্মরণ করিলেন, এবং "এমন হইয়াছে" বলিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। রামোক্ত "যেনোদ্‌গচ্ছদ্‌" ইত্যাদি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে করিশাবকের অতীতাবস্থার স্মরণ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষীভাব। অতএব সীতার উক্তি যেন রামেরই 'মন-কথা' বা কণ্ঠোক্তি মনে করিলেও করা যাইতে পারে।

আবার সীতার মুখের কথা—

অবিউত্তো দাণীং অঅং দীহাউ ইমাএ
সোম্মদংসণাএ সমং হোদু।

এক্ষণে এই দীর্ঘায়ু সৌম্যদর্শনা করিণীর সহিত অবিযুক্ত হইয়া থাকুক।

রামও বাসন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন—

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্যৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃশীকরিণাকরেণবিহিতঃকামং বিরামে পুন—
র্যৎস্নেহাদনরালনাল নলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্‌॥

দেখ দেখ, বৎস কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যও শিখিয়াছে।

ক্রীড়োৎখাত মৃণালসমূহের খণ্ড মুখে তুলিয়া দিয়া প্রস্ফুটনোন্মুখ পদ্ম-বাসিত জলদ্বারা মুখে গণ্ডূষ দিতেছে, এবং জলকণস্রাবী শুণ্ডদ্বারা পর্য্যাপ্ত-

রূপে গাত্র ধৌত করিয়া দিয়া সেকাবসানে অবক্রনাল-নলিনী-পত্র আত-পত্ররূপে ধারণ করিতেছে।

কাব্যে এমন অনেক স্থল থাকে, যেখানে কিছু বলা অপেক্ষা কিছু না বলায় বা অল্পমাত্র বলায় অধিকতর ভাব ব্যক্ত হয়। এইটী সেইরূপ একটী স্থল। করিকরভের কান্তানুবৃত্তিদর্শনে রামের বিরহ উপলক্ষ করিয়া কত কথাই বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ভবভূতি সীতার উক্তিতে করিণীর সহিত "অবিযুক্ত" থাকুক, করিকরভের প্রতি এই আশীর্ব্বচন প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহাতেই অন্যে যাহা কিছু বলিতে পারিত, তাহা সমুদয় বলা হইয়াছে—আর অন্যে যাহা বলিতে পারিত না, এমন একটু বিশেষ কথাও বলা হইয়াছে। বিবেচক পাঠক অবশ্যই ভাবিবেন যে, স্বয়ং বিরহিণী সীতা আশীর্ব্বচন মুখ্যতঃ বধূর প্রতি প্রয়োগ না করায় কবি কি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন—তিনি সীতার হৃদয়ে নিজের দুঃখানুভব অপেক্ষা রামের সহিত অধিকতর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, না ছায়াময়ীর মুখদিয়া রামেরই আর একটী কণ্ঠোক্তি ব্যক্ত করিলেন?

ভবভূতি এ স্থলে যে সকল ভাব অব্যক্ত রাখিলেন এবং পাঠকের নিজের শক্তির উপর অনুভব করিবার অধিকার দিলেন, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিবার যো নাই। কবি রামের পূর্ব্বগত দুইটী উক্তিতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সীতার মনে যে ভাব সমুদিত হইতেছে, রামের মনেও সেই সেই ভাব উঠিতেছে। কবি ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ সময়ে রামের মানস চক্ষে সীতা প্রত্যক্ষবৎ উপস্থিতা হইয়াছেন। কিন্তু কবি এই পর্য্যন্ত করিয়াই কিয়ৎক্ষণ রামের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির করিলেন না, তাঁহাকে একবারে নীরব করিয়া রাখিলেন। রাম আর বহিঃস্থ বনদেবীকে সম্বোধন করিয়া কিম্বা অন্তরস্থ সীতামূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া একটী কথাও বলিলেন না। তাদৃশভাবাপন্ন রামকে তাদৃশ বাক্‌শূন্য করিয়া রাখায়

কবি যেন পাঠককে 'মাথার দিব্য' দিয়াই ঐ সময়ে রামের মনে কি হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম তখন করিশাবকের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্য দর্শন করিয়াছেন, সেটী যে সীতার পালিত এবং তাঁহার পুত্রভাবপ্রাপ্ত, তাহা জানিয়াছেন; বহুবর্ষ পূর্ব্বে সীতা যখন তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সময়ের মূর্ত্তিও রামের মনে সমুদিত হইয়াছে—তখন রাম নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?—রামের মনে—নিজের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যের প্রথম শিক্ষা হইতে কোটি কোটি অদ্ভুত ঘটনাবলীর পর সীতার গর্ভধারণ, এবং তাঁহার গর্ভজাত সন্ততি এক্ষণে কেমন হইত, ইত্যাদিরূপ অনুস্মৃতি কি আলোড়িত হইতেছিল?—হইতেও পারে, কারণ দেখা গিয়াছে যে, সীতা এবং রাম উভয়ের মনেই একই ভাব একই সময়ে সমুদিত হইতেছিল, এবং এই সময়ে সীতা তমসাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—

অম্মং দাব এরিসো জাদো দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিকেণ কালেণ কেরিসা বিঅ হোন্তি।

এত এই প্রকার হইয়াছে, সেই কুশ লব এত কালে না জানি কিরূপ হইয়াছে।

তমসা উত্তর করিলেন,

যাদৃশোঽহং তাদৃশৌ তাবপি

এ যে প্রকার, তাহারাও সেইরূপ হইয়াছে।

তমসার এই উক্তিতে রামের অন্তরাত্মার কর্ণকুহরে এক বার আশাদেবীর সান্ত্বনাবাক্য সঞ্চার করা কি কবির ইচ্ছা?—হইতেও পারে যে, ইহার পরেই রামের মনে প্রস্তুতপুত্র সীতার ছবি অধিকতর প্রোজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি মনে মনে অনেক ভাঙ্গিতে গড়িতে ছিলেন। হয় ত একবার ভাবিলেন যে, সীতার যেমন স্বামিবিরহ, সেইরূপ পুত্রবিরহও উপস্থিত হইয়া থাকিবে; কারণ ওরূপ স্থলে ওরূপ মনে অবশ্যই অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়া থাকে। কিন্তু পরেই আবার

মনে হইয়া থাকিবে যে, পুত্র প্রসব করিয়া আমাকে না দেখাইতে পাইয়া না জানি সীতার কতই দুঃখ হইয়াছিল। সীতাও তমসাকে বলিতেছিলেন—

কিং বা মএ পঢ়মদাএ জেণ তারিসাণং মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধবলদসণপংতিসোহিদং সমুজ্জলকবোলং অণুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং নিবদ্ধকাঅসিহওঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ।

প্রসব করিয়া আমার কি হইল, যেহেতু তাদৃশ পুত্রদ্বয়ের অবিরল কোমল ধবল দশন পংক্তিতে সুশোভিত সমুজ্জল-কপোলশোভি মৃদুমধুর হাস্যে বিলসিত কাকপক্ষালঙ্কৃত অমল মুখপদ্মযুগল আর্য্যপুত্র চুম্বন করিলেন না।

যদি রাম সত্য সত্যই এরূপ ভাবিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই তাঁহার মন হইতে একবার সীতার বিরহভাব অপগত হইয়া থাকিবে। তিনি পুনর্ব্বার পুত্রক্রোড়া প্রফুল্লবদনা সীতা সহ আপনাকে সংসারী দেখিতে পাইয়া থাকিবেন। সীতাও তমসাকে কহিলেন—

এদিণা অবচ্চসংসুনয়ণেণ উস্সসিদপহুবঅণী তাণং চ পিদুণোসন্নিধাণেণ খণমেত্তং সংসারিণী কি সংবুত্তা।

অপত্যস্মরণে আমার স্তন্যক্ষরণ হইতেছে এবং সেই পুত্রদিগের পিতার সন্নিধানে থাকিয়া যেন আমি ক্ষণমাত্র সংসারিণী হইয়াছি।

ইহার পরেই কবি তমসার মুখ দিয়া সন্তান যে দম্পতীপ্রণয়ের পরম বন্ধন, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিলেন। যথা—

কিমত্রোচ্যতে পৃ প্রসবঃ খলু প্রকর্ষপর্য্যন্তঃ স্নেহস্য। পরমৈতদন্তোন্যসংশ্লেষণং পিত্রোঃ।

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি বধ্যতে॥

কি বলিব—সন্তান স্নেহের পরাকাষ্ঠা, এবং পিতামাতা পরস্পরের পরম বন্ধন।

সন্তান স্নেহের আশ্রয় প্রযুক্ত দম্পতীর অন্তঃকরণের সুখময় গ্রন্থিস্বরূপ উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে।

ফলকথা, ভবভূতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন যে, অপত্যবাৎসল্য নিবন্ধন দম্পতীর হৃদয়ে একাত্মতা জন্মে, এবং তিনি সেই ভাবেরই আনুপূর্ব্বিকক্রমে বর্ণন করিলেন।

---

(৪)

সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক দর্শনে রামের অন্তঃকরণে সীতার পূর্ব্ব মূর্ত্তির সংস্মরণ এবং বর্ত্তমান অবস্থার চিন্তা সমুদিত হইবার আভাস প্রদান পূর্ব্বক ক্ষণকালের নিমিত্ত সীতার সহিত রামের যে একাত্মতা জন্মিয়াছিল, ভবভূতি তাহা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে সেই ভাবের অপগমে ক্রমশঃ বিরহশোকেরই প্রবলতর উদ্দীপন এবং উপাঙ্কে রামের যে মলিনভাবের সূচনা আছে, তাহা উপলক্ষ করিয়া কবি অপূর্ব্ব শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

রাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর, পুনর্ব্বার বাহ্য জগতে তাঁহার অনুভূতির সঞ্চার হইল। বনদেবী বলিলেন—

ইতোঽপি দেবঃ পশ্যতু—

অতরুণমদতাণ্ডবোৎসবান্তে
স্বয়মচিরোদ্গতমুগ্ধলোলবর্হঃ।
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে
নদতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী॥

দেব! এ দিকেও অবলোকন করুন—

নবজাত-মনোহর-চঞ্চল পুচ্ছবিশিষ্ট উন্নতশিখার শোভায় মণিময়-মুকুটধারিরূপে প্রতীয়মান বধূসহায় সেই এই শিখণ্ডী মহানন্দে নৃত্যোৎসব সমাধা করিয়া কদম্ববৃক্ষে কেকারব করিতেছে।

বৎসলভাব পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় ; অপর চিত্রে ময়ূরের আসন, ময়ূরটী এবং সোণার বালা হাতে টুক্‌টুকে গোলগাল হাত দুটী মাত্র দৃষ্ট হয়।

রাম বলিতে লাগিলেন—

হন্ত তির্য্যঞ্চোঽপি পরিচয় মনুরুধ্যন্তে।
কতিপয়কুসুমোদ্গমঃ কদম্বঃ
প্রিয়তময়া পরিবর্দ্ধিতো য আসীৎ।
স্মরতি গিরিময়ূর এষ দেব্যাঃ
স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রমোদমেতি॥

হায়! তির্য্যক্ জাতিরাও পরিচয়ের অনুরোধ রাখে।

এক্ষণে যাহার কতিপয় পুষ্পোদ্গম হইয়াছে, সেই কদম্ব তরু যে প্রিয়তমাকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই গিরিময়ুর তাহা স্মরণ করিতেছে, যেহেতু আত্মীয়ের ন্যায় এই কদম্ব বৃক্ষে এ প্রমোদ লাভ করিতেছে।

পাঠক দেখুন যে, প্রোজ্জ্বলা চঞ্চদ্রূপা সীতামূর্ত্তি রামের হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেটী যেন কিঞ্চিৎ দূরগতা হইয়াছে ; এখন সীতাকে তুমি না বলিয়া প্রিয়তমা অথবা দেবী বলিয়া উদ্দেশে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, এবং যে ময়ুর পূর্ব্বপরিচয়ের অনুরোধে সীতা পরিবর্দ্ধিত কদম্ববৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহার তাদৃশ আচরণ দর্শনে রামের যেন শোকেরই উদ্রেক হইতেছে।

বনদেবী বলিলেন—

অত্র তাবদাসন পরিগ্রহং করোতু দেবঃ।
এতত্তু দেব কদলীবনমধ্যবর্ত্তি
কান্তাসখস্য শয়নীয়শিলাতলং তে।
অত্রস্থিতা তৃণমদাদ্বহুশো যদেভ্যঃ
সীতা ততো হরিণকৈর্নবিমুচ্যতে স্ম।

এই খানে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন।

যখন কান্তা তোমার সমভিব্যাহারে ছিল, তখনকার সেই এই কদলীবন-মধ্যবর্ত্তী তোমার শয়নীয় শিলাতল; এই খানে থাকিয়া সীতা এই সকল হরিণকে বহুবার তৃণ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রযুক্ত ইহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না।

রাম পূর্ব্বে সীতাসহ যে শিলাতলে শয়ান হইতেন, তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাহা দেখাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যত্র গিয়া বসিলেন, এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ নিস্তব্ধাবস্থায় রামের মনে কিরূপ ভাবনা উদিত হইতে পারে? তিনি হয় ত এরূপ ভাবিতেছিলেন যে, ইহা সেই পঞ্চবটীবন, এখান-কার এই মৃগ পক্ষী বৃক্ষাদি পূর্ব্বে কতই আনন্দ উৎপাদন করিত, এক্ষণে এ গুলি কেবল ক্লেশের কারণ হইতেছে। সেই সব থাকিতেও যেন কিছুই নাই। জীবলোকের কি উৎকট পরিবর্ত্ত!

কবি সীতার মুখ দিয়া ঐরূপ ভাবই ব্যক্ত করিলেন।

ছায়াময়ী বলিলেন,—

হদ্ধী হদ্ধী সো এব্ব অজ্জউত্তো তং এব্ব পঞ্চবটীবনং সা এব্ব পিঅসহী বাসন্তী তে এব্ব বিবিহবীসম্ভসাক্খিণো গোদাবরীকাণণুদ্দেসা তে এব্ব জাদণিব্বিসেসা মঅপক্খিপাদবা মম উণ মন্দভাইণীএ দীসমাণং বি সব্বং এব্ব এদং নত্থি; তা এরিসো জীঅলোঅস্স পরিবত্তো।

হা ধিক্, হা ধিক্ সেই এই আর্য্যপুত্র, সেই এই পঞ্চবটীবন, সেই এই প্রিয়সখী বাসন্তী, আমাদের বিবিধবিশ্রম্ভ সাক্ষী সেই এই সকল গোদা-বরী কাননপ্রদেশ, সুতনির্ব্বিশেষে পালিত সেই এই সব মৃগ পক্ষী পাদপ রহিয়াছে, কিন্তু এগুলি মন্দভাগিনী আমার দৃশ্যমান হইয়াও এক্ষণে যেন সে সব এ কিছুই নয় বোধ হইতেছে। অতএব জীবলোকের এই প্রকারই পরিবর্ত্ত!

রাম নিস্তব্ধ—জীবলোকের উৎকট পরিবর্ত্ত এবং আপনার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্ত চিন্তা করিতে করিতে নিজের শরীরে যে সকল পরিবর্ত্ত

ঘটিয়াছিল, তাহাও তাহার মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি এরূপও মনে করিয়া থাকিবেন যে, এরূপ অবস্থায় সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, অথবা অতি কষ্টেই চিনিবেন, সন্দেহ নাই।

বাসন্তীর মুখেও কবি ঐ ভাব ব্যক্ত করিতেছেন,—

সখি সীতে! কথং ন পশ্যসি রামস্যাবস্থাম্।
কুবলয়দলস্নিগ্ধৈরঙ্গৈর্দদৌ নয়নোৎসবং
সততমপি তে স্বেচ্ছাদৃশ্যো নবং নবমেব যঃ।
বিকলকরণঃ পাণ্ডুঃ সোঽয়ং শুচা পরিদুর্ব্বলঃ
কথমপি স ইত্যুন্নেতব্যস্তথাপি দৃশাং প্রিয়ঃ॥

সখি সীতে! রামের অবস্থা দেখিতেছ না? যিনি তোমার অনায়াসদৃশ্য হইলেও নীলোৎপলদলবৎ স্নিগ্ধ অঙ্গ দ্বারা তোমার নয়নে প্রতিবারই নব নব প্রীতি উৎপাদন করিতেন, সেই এই রাম, এক্ষণে এরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাণ্ডুবর্ণ ও শোকভরে দুর্ব্বল হইয়াছেন যে, তাঁহাকে সেই রাম বলিয়া অতি কষ্টে চেনা যায়; তথাপি কেমন নয়নপ্রিয়!

পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, রামের মনের যে ভাব, তাহাতে সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, যদি এরূপ কথা ঐ সময়ে তাঁহার মনে উঠিয়া থাকে, তবে সীতা কেমন চক্ষে তাঁহাকে দেখিতেছেন, এবং ঐ চক্ষুঃ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে চিত্রিত হইয়া উঠিবে। চক্ষুঃ জীবাত্মার গৃহের বাতায়নস্বরূপ; মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা যেমন চক্ষুর ভাবে প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। সীতার ভালবাসা কত, রাম তাহা জানেন, সেই সীতা তেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখিনী; এবং তিনি নিজেও তাদৃশাবস্থ। রামের প্রতি প্রযুক্ত সীতার চক্ষুঃ ক্রোধ কিম্বা অভিমান অথবা ভয় প্রকাশ করিতে পারে না; পূর্ণ নিরীহতা, প্রগাঢ় শোক এবং দৃঢ় অনুরাগই প্রকাশ করে। কবি সীতার মুখ দিয়া যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সীতার চক্ষুও সেই কথাই কয়।

সীতা। হা দেব্ব এসো মএ বিণা অহংবি এদেণ বিণ ত্তি কেন সম্ভাবিদং আসি তা মুহুত্তঅং বি জম্মান্তরাদো বিঅ লদ্ধদংসণং বাহসলিলন্তরেসু পেক্-খামি দাব বচ্ছলং অজ্জউত্তং।

হা দৈব! ইনি আমা ছাড়া এবং আমি ইহাঁ ছাড়া থাকিব, এরূপ কে সম্ভাবনা করিয়াছিল? যাহা হউক, মুহূর্ত্তের জন্য যেন জন্মান্তরে আমি ইহাঁর দর্শনলাভ করিলাম, অতএব অশ্রুজলের পতন এবং উদ্গম ইহার মধ্যবর্ত্তী অবকাশে স্নেহবান্ আর্য্যপুত্রকে একবার দেখিয়া লই।

যে চক্ষু দুটী ঐ ভাব প্রকাশ করে, সে দেখিতে কেমন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি বলিয়া দিলেন।

বিলুলিতমতিপূরৈর্বাষ্পমানন্দশোক-
প্রভবমবসৃজন্তী তৃষ্ণয়োত্তানদীর্ঘা।
স্পৃশতি হৃদয়েশং স্নেহনিস্যন্দিনী তে
ধবলবহুলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেবদৃষ্টিঃ॥

প্রবল ধারায় বিগলিত আনন্দশোকাশ্রুবর্ষণকারিণী, দর্শনলালসায় বিস্ফা-রিত এবং দীর্ঘবৎ প্রতীয়মান স্নেহস্রাবিণী অতিশয় ধবল এবং মনোহারিণী তোমার দৃষ্টি জীবিতেশ্বরকে আর্দ্রীভূত করিতেছে।

খুব শাদা ডাগর ডাগর এবং ডব্ ডবে চক্ষু। শুদ্ধ কাজল নাই বলিয়াই যে শাদা, তাহা নহে। মনের যে ভাবে চক্ষু রক্তাভ হয়, তাহার কাছেও যায় না বলিয়া চক্ষু আরও শাদা। কালিদাসও মেঘদূতে একটী বিরহিণী কামিনীর চক্ষু চিত্রিত করিয়াছেন, যথা—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঃহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥
রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসং।

রাম ঐ স্থানে বসিলেন। কিন্তু বোধ হয় কিছুতেই সীতার সেই গলদশ্রু চক্ষুঃ দুটী ভুলিতে পারিলেন না। যাহা দেখেন, তাহাই সীতা বিরহশোক প্রজ্জলিত করিয়া দেয়। এমন কি ঐ সকল স্থানে যে প্রাণপ্রতিম ভ্রাতার সহিত বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্মরণেও মনের শান্তি হইল না। তিনি বলিলেন—

করকমলবিকীর্ণৈ রম্বুনীবারশষ্পৈ
স্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রবইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদযোগ্যঃ॥

মৈথিলী, করকমলদত্ত অম্বু, নীবার এবং শষ্পদ্বারা যে সকল তরু, পক্ষী এবং কুরঙ্গদিগকে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয়দ্রবরূপ কেমন মনে এক বিকার জন্মিতেছে, যাহাকে হৃদয় পাষাণ দ্রবকারী দ্রাবক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়।

ফলতঃ, সমুদায় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল।

(৫)

রামের বিরহমালিন্যের পুনরুদ্রেক ও তজ্জন্য সমুদায় বাহ্য জগতে তাঁহার কষ্টের অনুভূতি, কবি এই সকল ভাব বর্ণন করিয়া উপাঙ্কে সূচিত অনুতাপের সবিস্তার বর্ণনাবসরে মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম তত্ত্ব সমস্ত উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন।

রাম পূর্ব্বে পঞ্চবটীবনে যখন সীতা সহ পরম সুখে বাস করেন, তখন প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাঁহার সহচর ছিলেন। অতএব সেই বনে পুনর্ব্বার আসিলে পর সীতার সংস্মরণাবসরে অবশ্যই এক আধ বার লক্ষ্মণকেও তাঁহার মনে পড়িল। বনদেবী এক বার লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ রামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাম তাহা শুনিতে পান নাই, সীতার চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। বনদেবী পুনরায় দৃঢ়তররূপে বলিলেন—

মহারাজ নন্থ পৃচ্ছামি অপি কুশলং কুমার লক্ষ্মণস্য।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করি, কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত?

রাম মনে মনে ভাবিলেন—

অয়ে! মহারাজেতি নিষ্প্রণয়মামন্ত্রণপদং সৌমিত্রিমাত্রে চ বাষ্পস্খলিতাক্ষরঃ কুশলপ্রশ্নঃ তথা মন্যে বিদিতসীতাবৃত্তান্তেয়মিতি।

অয়ে! মহারাজ! এই সম্বোধন প্রণয় শূন্য, বাষ্পগদ্গদ এই প্রশ্ন কেবল লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাতেই পর্য্যবসিত; অতএব ইনি সীতাবৃত্তান্ত অবগত আছেন, বোধ হইতেছে। পরে বলিলেন—আং কুশলং কুমারস্য—

কুমারের কুশল।

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, কবি কি সুন্দর কৌশল করিয়া এই স্থানে লক্ষ্মণের নামের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ স্থলে দেখাইতেছেন যে, রামের পক্ষে সমুদয় বাহ্য জগতের মধ্যে এক সীতা ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর যে লক্ষ্মণ, সেই লক্ষ্মণের স্মৃতিও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা তিক্ত বোধ হইয়াছে। বাস্তবিক যে দুইটী প্রীতিকর পদার্থকে পূর্ব্বে সর্ব্বদা একত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত, পরে সেই দুইটীর একটী যদি না থাকে, এমন হয়, তবে অপরটীকে ভাল আছে দেখিলেও, যেটী নাই, তাহার জন্য তীব্র শোকানুভব হয়। লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, সীতা আর নাই, এই চিন্তাটী রামের মনে উঠাইয়া দিয়া কবি রামের বিরহশোকের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, লক্ষ্মণের স্মরণে, লক্ষ্মণের দ্বারাই যে তিনি সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহাও রামের মনে উদিত করিলেন, এবং সুতরাং সেই প্রথম বিবাসন-সময়ে রাম আপনার কার্য্য যেমন পাপ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ ভাব উদিত হওয়ায় আত্মগ্লানি তাঁহার মনে উদ্বোধিত হইল। বিবাসন সময়ে রাম বলিয়াছিলেন—

হা! কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ

শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং

সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাং।

ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে

সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব।

হা কষ্ট! আমি অতি বীভৎসকর্ম্মা নৃশংস হইতেছি।

মাংসবিক্রয়-জীবীরা যেমন গৃহপালিত পক্ষীকে বিনষ্ট করে, তেমনি আমি শৈশব হইতে প্রতিপালিত সৌহার্দ্দবশতঃ একাত্মতাপ্রাপ্ত ইহাকে ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে প্রদান করিতে যাইতেছি।

বিবাসনের পূর্ব্বক্ষণে রামের বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া সীতা নিদ্রিতা ছিলেন, বিবাসন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাম আপনার সেই বাহু অপসারণ করিতে করিতে এ কথাও বলিয়াছিলেন,

অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।

শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥

হে মুগ্ধে! অশ্রুতপূর্ব্ব বীভৎস কার্য্যদ্বারা আমি চণ্ডাল হইয়াছি—আমাকে ত্যাগ কর। তুমি চন্দনভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছ।

ঐ সময়ে পৃথিবী, অগ্নি, জনক, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকেও স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

অথবা কুশ্চ তেষামহমিদানীমাহ্বানে!

তে হি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।

ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

অথবা এক্ষণে আমি তাঁহাদের আহ্বান করিবার কে? অর্থাৎ আমি তাঁহাদের আহ্বান করিবার যোগ্য নহি। আমি কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা, সেই সকল মহাত্মার নাম করিলেও বোধ হয় যেন তাঁহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিবে।

অতএব সীতাকে বিবাসিত করিয়া রাম মনে মনে জানিতেন যে, তিনি পাপকর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহার মনে সেই ভাবের উদয় মাত্রেই বন-দেবী বলিলেন—

অয়ি দেব! কিমিতি দারুণঃ খল্বসি?
ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।
ইতি মূর্চ্ছতি।

হে দেব, তুমি কি কঠিনহৃদয়!

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয় স্বরূপ, তুমি আমার নয়নের জ্যোৎস্না, তোমার স্পর্শ আমার অঙ্গের অমৃত, ইত্যাদি শত শত প্রিয়বাক্য দ্বারা যাহাকে প্রীত করিতে, সেই মুগ্ধাকেই—দূর হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

এই কবিতাটী যে কত মিষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয়, উত্তর-চরিত পাঠক এমন কেহই নাই, যাঁহার এই শ্লোকটী, অন্ততঃ ইহার প্রথম চরণ তিনটী কণ্ঠস্থ নাই। চতুর্থ চরণটীর অধিকাংশই পাদপূরণার্থ প্রস্তুত, এবং যখন কবি বাসন্তীকে মূর্চ্ছিত করিতেছেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া কেবল পাদপূরণার্থ শব্দ প্রয়োগ না করাইলেই ভাল হইত। বাসন্তী চতুর্থ চরণের "তামেব" পর্য্যন্ত বলিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলে কবিতাপূরণ রামের মুখ দিয়াই হইতে পারিত। যথা—

———বাক্যবিরতিঃ পতনঞ্চ যুক্তম্।

এই সামান্য কৌশল যে ভবভূতির অপরিজ্ঞাত ছিল, এমত নহে। তিনি বহুল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উক্তি প্রত্যুক্তিদ্বারা কবিতার পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এ স্থলে মহাকবির বিশেষ দৃষ্টি অন্য দিকেই ছিল। তিনি যে বাসন্তীকে মানুষীভাব দিয়াই সাজাইতেছিলেন, তাহা

যেন এ স্থলে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া বাসন্তী যে বনদেবী—সমুদয় প্রকৃতির প্রতিরূপস্বরূপা, এবং পাপরূপ অনৈসর্গিক কার্য্যের সমক্ষে সঙ্কুচিতা বা মূর্চ্ছাপন্না, এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাস্তবিক উৎকট দুষ্ক্রিয়া মাত্রই এমনি অনৈসর্গিক ব্যাপার যে, তাহার অনুষ্ঠাতাকে সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতে হয় যে, সমুদায় জগৎ তাহার দুষ্কৃতি জানিতে পারিতেছে এবং তাহা জানিয়া ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইতেছে। রাম অলোকসামান্যা, পরমপবিত্রা, পতিপরায়ণা, ধর্ম্মপত্নীকে বিবাসিত করিয়া অতি অনৈসর্গিক কার্য্যই করিয়াছিলেন। এই জন্য এ স্থলে বনদেবীর মূর্চ্ছা কল্পিত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, ভবভূতির মনে ঐ ভাব কিছু অধিক প্রবল হইয়াছিল এবং তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্যই তিনি বাসন্তীর মানুষীভাব বিস্মৃতকল্প হইয়াছেন। যাহা হউক, ভবভূতি অনৈসর্গিক কার্য্যকেই পাপ কার্য্য বলিয়া যেন স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন।

---

(৬)

উপাঙ্কে সূচিত রামের অনুতাপের সবিস্তর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কবি প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, সীতাবিবাসন কার্য্যটী অনৈসর্গিক অতএব পাপ-কার্য্য, রামের মনে এই ভাবের উদ্বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে মানুষের পক্ষে কিরূপ কার্য্য অনৈসর্গিক, তাহা স্পষ্টতর করিয়া দেখাইতেছেন।

বনদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মোহভঙ্গের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

তৎকিমিদমকার্য্যমনুষ্ঠিতং দেবেন ?

তবে কেন দেব! এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ?

রাম বলিলেন,

লোকো ন মৃষ্যতীতি।

লোকে মন্দ করে বা বলিবে।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—

তৎ কস্য হেতোঃ।

তাহা কিসের কারণে?

রাম বলিলেন—

স এব জানাতি কিমপি।

কি, তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

অয়ি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং

কিমযশো নমু ঘোরমতঃপরম্।

কিমভবদ্‌বিপিনে হরিণীদৃশঃ

কথয় নাথ কথং বত মন্যসে।

হে কঠিন! যশই তোমার প্রিয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অযশঃ আর কি আছে? হায়! বিপিনে মৃগনয়নার কি হইল, হে ভূপতে! তাহার কিরূপ অনুমান কর, বল।

পাঠক দেখুন যে, আজি কালি লোকে যেরূপ "সহজ জ্ঞানের" (ইনটুইষণ) দ্বারা কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ, ইহা নিশ্চয় করিয়া লইবার জল্পনা করে, এখানে সেরূপ "সহজ জ্ঞানের" কোন কথাই নাই। আবার আজি কালির প্রগল্‌ভস্বভাব নবীনদিগের মুখে এরূপও শুনা গিয়া থাকে যে, "কি ভাল, কি মন্দ, তাহা লোকের কথায় বুঝিতে হয় না" এখানে সে কথাও নাই। বোধ হয়, ভবভূতির মতে লোকে ভাল মন্দ বলিলে তাহা অগ্রাহ্য না করিয়া সে কথা সহেতুক কি অহেতুক—সেই কথা পরবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী, লোকের অভিমতির অনুরূপ কি বিরূপ হইতে পারে,—তাহা বিচার করিয়া পাপ পুণ্যের অবধারণ করাই বিধেয়।

পাঠক দেখুন যে, বনদেবী রামের যশোলিপ্সার তাদৃশ নিন্দা করিলেন না। কিন্তু যশের অভিলাষে তিনি যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে

ঘোরতর অপযশই হইয়াছে, এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অপকর্ম্মদ্বারা অযশঃ ভিন্ন প্রকৃত যশঃ হয় না। অতএব পাপ পুণ্যের বিচার লোকমুখ অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। যেহেতু লোকমুখই সাধারণতঃ সমস্ত সংসারের প্রতিরূপস্বরূপ।

বনদেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অরণ্যে পরিত্যক্তা সীতার কি দশা হইয়াছে, ভাবিয়াছিলেন কি?

রাম তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অতএব নিরাশমনেই বলিলেন—

কিমত্রমন্তব্যম্—

ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টে
স্তস্যাঃ পরিস্ফুরিতগর্ভভরালসায়াঃ।
জ্যোৎস্নাময়ীব মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্পা
ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা॥

আর কি মনে করিব——

ত্রাসযুক্ত এক বৎসর বয়স্ক কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলদৃষ্টিশালিনী, স্পন্দিত গর্ভের ভরে মন্থরা সেই সীতার জ্যোৎস্নাময়ী, কোমল এবং মনোহর মৃণাল সদৃশ দেহলতা নিশ্চয়ই শ্বাপদগণকর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

সীতার কুরঙ্গের ন্যায় বিলোল দৃষ্টি এবং মৃণালকল্প অঙ্গলতিকার অনুধ্যানে রামের মনে সীতার মূর্ত্তি স্ফুটীকৃত হওয়ায় যেন তাঁহার অস্তিত্বের প্রতীতি জাগরিত হইয়া উঠিল। কবি তাদৃশ ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্তই বোধ হয় ছায়াময়ীর মুখে এই উক্তি দিয়াছেন।

অজ্জউত্ত এসা ধরামি—

আর্য্যপুত্র এই আমি জীবিত আছি।

রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন—

হা প্রিয়ে জানকি! ক্বাসি।
হা প্রিয়ে জানকি কোথায় আছ?

নাটকে নির্দ্দেশ না থাকিলেও এই স্থলে রাম পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বিলাপ

বাক্য কহিয়া ডাক ছাড়িয়া কান্দিয়াছিলেন। কারণ ইহার পরেই কবি ছায়াময়ীর মুখে কহিলেন—

হদ্ধী হদ্ধী অজ্জউত্তো পমুক্ককণ্ঠং রুণ্ণো!

হা ধিক্ হা ধিক্ আর্য্যপুত্র মুক্তকণ্ঠে রোদন করিলেন।

কবি এ স্থলে তমসার মুখ দিয়া রামের তাৎকালিক বিলাপ এবং অনুতাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিলেন। তমসা বলিলেন—

সাম্প্রতিকমেবৈতৎ কর্ত্তব্যানি দুঃখিতৈর্দুঃখনির্ব্বাপনানি।

পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥

ইহা যুক্তই, বিলাপদ্বারাই দুঃখনির্ব্বাপণ করিতে হয়।

জলাশয়ের জলবৃদ্ধিরূপ উপদ্রব ঘটিলে তাহার জল নির্গত করিয়া দিলেই যেমন তাহার প্রতীকার হয়, সেইরূপ শোক ক্ষোভ উপস্থিত হইলে বিলাপ দ্বারাই হৃদয় শান্ত হয়।

পাঠক, তমসার দৃষ্টান্তটী দেখুন, তিনি যে জলময়ী নদী, তাহা কবির কেমন মনে রহিয়াছে।

তমসা বলিতে লাগিলেন—

বিশেষতঃ রামভদ্রস্য বহুতরপ্রকার কষ্টো জীবলোকঃ।
ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা
প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্ম্মঃ ক্লময়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভ
স্তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি নন্থ লাভো হি রুদিতম্॥

বিশেষতঃ সংসারে রামভদ্রের নানাবিধ কষ্ট। অবহিতমনে এই পৃথিবী পালনীয়; কিন্তু উত্তাপ যেমন কুসুমকে ম্লান করে, সেইরূপ প্রিয়াশোক ইহাঁর জীবনকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে। আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বিলাপের দ্বারাও শোকের শান্তি সম্ভাবিত নহে। তবে বিলাপ নিষ্ফলও নহে, যেহেতু উহাদ্বারা অদ্যাপি জীবনধারণ হইতেছে।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পাপ-কার্য্যের পর যে অনুতাপ জন্মে, তৎসম্বন্ধেও ভবভূতির মত নব্য মত হইতে ভিন্ন। ভবভূতি আর্য্যপণ্ডিত, আর্য্যপণ্ডিতদিগের মনে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার একান্ত অচ্ছেদ্য অভেদ্য স্থিরভাব অতিপূর্ব্বকালাবধি জাজ্বল্যমানরূপে প্রত্যক্ষীভূত। তাঁহারা কার্য্যকারণসম্বন্ধের কদাপি প্রকৃত উচ্ছেদ হইতে পারে, ইহা (লোকশিক্ষা বা সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে যাহাই বলুন,) মনে মনে কখনই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে কি পাপ কি পুণ্য কিছুরই ক্ষালন নাই। অনুতাপ পাপের অবশ্যম্ভাবি ফল মাত্র,—প্রায়শ্চিত্ত নহে। দুষ্কৃতির উপর অনুতাপ হইলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে আত্মার প্রকৃত ভাব, (যাহাকে আধুনিকেরা আধ্যাত্মিক জীবন কহেন) এখনও বর্ত্তমান আছে, সম্পূর্ণ বিকৃত হয় নাই। পাপের ক্ষালন হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আজি কালি পুস্তকে বক্তৃতায় কথোপকথনে সর্ব্বদাই যে অনুতাপ শব্দটীর ব্যবহার হইয়া থাকে, সেটী ইংরাজি "রিপেণ্টান্স" বা মুসলমানি "তোবা" শব্দেরই অনুবাদ মাত্র। অনেকে মনে করেন যে, রিপেণ্টান্স বা তোবা দ্বারাই খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মমতে একবারে পাপের ক্ষালন হইয়া যায়। অতএব অনুতাপদ্বারাও তাহাই হয়; অর্থাৎ পাপ-কার্য্যের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু ভবভূতি তাহা বলেন না। অতএব ভবভূতির অনুতাপ এবং নব্য অনুতাপ বিভিন্ন পদার্থ। এই জন্যই ভবভূতি তমসাকে দিয়া বলাইলেন,

"তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি নন্বু লাভো হি রুদিতম্।"

অদ্যাপি যে উচ্ছ্বাস হইতেছে, অর্থাৎ জীবনরক্ষা হইতেছে, তাহাই রোদনের লাভ।

অনুতাপের প্রকৃত ফল কি, তাহা বলিয়া দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক যে ফল, অর্থাৎ লোকের বিরাগমোচন, এবং অত্যাচরিতের মন্যুপরিহার, কবি এই তৃতীয়াঙ্কের উত্তর ভাগে তাহা কেমন সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, পরে দৃষ্ট হইবে।

(৭)

তৃতীয়াঙ্কের যে পর্য্যন্ত সমালোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, রাম এবং ছায়াময়ী সীতা উভয়ের পঞ্চবটীতে আগমন, স্থিতি ও তথা হইতে তিরোধান একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তৃতীয়াঙ্কের প্রথম ভাগে (উপাঙ্কে) বর্ণিত কার্য্যগুলি যদিও সমুদায় অঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মাত্র; তথাপি সেইগুলি ক্ষণমাত্রে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আর সবিস্তরে তৃতীয়াঙ্কের ব্যাখ্যা যে পর্য্যন্ত করা হইয়াছে, তাহাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকিবে যে, কি ছায়াময়ীর, কি বাসন্তীর, কি তমসার মুখ দিয়া কবি যখন যে উক্তি বহির করিয়াছেন, তৎসমুদয় রামের নিজেরই তত্তৎকালোচিত মনোগত ভাবের অনুরূপ কথা হইলেও হইতে পারে।

অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে, তৃতীয়াঙ্কে ছায়াময়ী রামের সহচারিণী; তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে বা মোহে যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষণকাল মধ্যেই নিষ্পন্ন; এবং তৃতীয়াঙ্কের উক্তি প্রত্যুক্তি সকল এক রামহৃদয়েরই বিলোড়নস্বরূপ এমন ভাবে আভাসিত। সুতরাং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কটী রামের বিরহমোহেরই রূপকবর্ণনায় পর্য্যবসিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইতেছে না। শোকাদি যে কোন ভাব অতি প্রবলরূপে মানবমনে অধিষ্ঠিত হইলে জড়জগৎ যে জীবিতরূপে প্রতীয়মান হয়, বাসন্তী ও তমসা বিরহশোকমুগ্ধ রামের সেই ভাবের ব্যঞ্জক। আর মৃতবন্ধুক ব্যক্তিরা যে, সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ স্বপ্নাবস্থায়, আপনাদিগের হৃদয়মধ্যেই সেই সেই বন্ধুর ইঙ্গিত পরামর্শাদি গ্রহণে কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন, ছায়াময়ী সীতা রামের প্রেমময় হৃদয়ের সেই অবস্থার পরিচায়ক। ভবভূতি ষষ্ঠ অঙ্কে এই কথা একপ্রকার অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, যথা—

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ
প্রবাসেপ্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।

জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকল্পব্যুপরমে।
কুকুলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যতইব॥

দীর্ঘ কাল একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া নির্ম্মিতাকাররূপে সম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিপ্রযুক্ত হইয়াও সান্ত্বনা প্রদান করে। কিন্তু সে প্রকার ভ্রমের নিবৃত্তি হইলে জগৎ জীর্ণারণ্যবৎ অসার প্রতীয়মান হয়। তখন হৃদয় যেন তুষাগ্নির রাশিতে দগ্ধ হইতে থাকে।

বস্তুতঃ পঞ্চবটী বনে রাম একাকী, তাঁহার সীতা-বিয়োগ-শোক উদ্দীপিত, সেই শোকের সময়ে বাহ্য জগৎ বাসন্তী তমসাদিরূপে এবং অন্তর্জগৎ ছায়াময়ী সীতারূপে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতি কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত করিতেছিল, কবি তৃতীয়াঙ্কে তাহাই দেখাইয়াছেন।

এক্ষণে অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এরূপ বর্ণনায় নাটকের কোন্ প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে তৃতীয়াঙ্কটী যে উত্তরচরিতের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সেই উত্তরচরিত নাটকের উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ প্রধানতঃ রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত—কেবল ইহার একটী কথা রামায়ণ হইতে ভিন্ন। সে কথাটী রামের সহিত সীতার পুনর্ম্মিলন। রামায়ণ প্রবন্ধে রামকর্ত্তৃক সীতার পরিত্যাগ, এবং তদনন্তর সীতার রসাতল-প্রবেশ, এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া কাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় শোক এবং ভয়ের আবির্ভাব না হয়? সীতা তেমন সাধ্বী, তেমন রামপ্রেমময়ী নায়িকা; রাম তেমন অগাধসত্ত্ব মহাপুরুষ, তেমন অনুকূল নায়ক, তথাপি তাঁহাদের সংসারযাত্রার পরিণাম যে তেমন শোচনীয় হইল, ইহা ভাবিয়া সংসারিমাত্রেরই হৃদয় ভীতি এবং সংশয়ে সমাকুল হয়। ঐরূপ ভয় এবং সংশয়ে সংসারের প্রতি গৃহী জনের অনাস্থা জন্মিতে পারে। জাতিবিশেষের ও ধর্ম্মবিশেষের প্রকৃতি অনুসারে সংসারের প্রতি তাদৃশ অনাস্থা যদিও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য না হউক, কিন্তু আর্য্যপণ্ডিতদিগের মতে তাদৃশ অনাস্থা সংসারাশ্রমের নীতির অনুগত নহে। এই জন্যই অনেকানেক

আর্য্য পণ্ডিত রামায়ণের আখ্যানে আধ্যাত্মিক ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য যে ঈশ্বরের লীলামাত্র, এই ভাব প্রকটন-পূর্ব্বক উল্লিখিত ভীতিসংশয়াদির নিরাকরণচেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবভূতি যথাসাধ্য লৌকিক ভাব রক্ষা করিয়াই উত্তরচরিতে রামসীতার পুনর্ম্মিলন সাধনপূর্ব্বক লোকের শোকসংশয়াদির উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন বোধ হয়। কবির মনের এই ভাবটি সপ্তমাঙ্কে রাম এবং লক্ষ্মণের উক্তিতে যেন প্রকাশিত দেখা যায়। সীতা রসাতলগামিনী হইলে রাম বলিলেন—

কথং বিলয় এব বৈদেহ্যাঃ সম্পন্নঃ! হা দেবি, দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা চারিত্রদেবতে! লোকান্তরং পর্য্যবসিতাসি?

ইতি মূর্চ্ছতি।

কিন্তু বৈদেহী বিলয়প্রাপ্ত হইলেন! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা দেবচরিত্রে! তুমি লোকান্তর প্রস্থান করিলে? এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

ভগবন্ বাল্মীকে! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব এষ কিং তে কাব্যার্থঃ?

ভগবন্ বাল্মীকে! পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্। এই কি তোমার কাব্যের প্রয়োজন?

লক্ষ্মণ প্রাণের দায়ে পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব বলিয়া যে চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহাই যেন রামায়ণপাঠকসাধারণের হৃদ্গত শোকের পরিচায়ক, এবং সেই শোক নিবারণের প্রার্থনা। রামায়ণ পাঠকের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, সীতার ন্যায় গৃহিণী ও রামের ন্যায় গৃহীর সংসারের অবস্থা যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহা হইলে জগতে সংসারসুখের বাসনা আর কে করিবে?—সুতরাং তাঁহাদের মতে রামায়ণের নির্ব্বহণ কার্য্য অন্যরূপ হইলে ভাল হইত। ভবভূতি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তিনি বাল্মীকির হইয়া রামসীতার পুনর্ম্মিলন সাধনপূর্ব্বক সেই শোক নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পূরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, রামসীতার পুনর্ম্মিলনের পক্ষে রূপকময় তৃতীয়াঙ্কের উপযোগিতা কতদূর।

ঐ উপযোগিতার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমতঃ একটি বৈদেশিক নাটকের উপাখ্যানাংশ গ্রহণ করিলাম। ঐ নাটকে বর্ণিত আছে,—এক রাজা তাঁহার ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা পত্নীর প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ষোড়শ বৎসর পরে তাঁহার সেই সন্দেহ যায়, এবং তখন তিনি অনুতাপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অনন্তর রাজ্ঞীর একটি পাষাণময়ী মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে যান, এবং তৎসমীপে অনেক করুণবিলাপ করেন। বস্তুতঃ ঐ মূর্ত্তিই জীবিতা রাজপত্নী স্বয়ং। তিনি স্বামীর করুণবিলাপে বিগতদুঃখা হইয়া পুনর্ব্বার স্বামীসহ মিলিতা হইয়াছিলেন।

ফলতঃ পতিকৃত গুরুতর অবমাননায় অবমানিতা পত্নীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ ঐরূপে বই যে আর কিছুতেই যাইবার নহে, ইহা সাধারণ প্রতীতি। অবমানিতা শোকবিহ্বলা স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—"আমি মরি, এবং মরিয়া দেখিতে পাই, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, তাহা হইলেই দুঃখ যায়।" যে কবি স্ত্রীলোকদিগের মনের এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝেন, তিনি বৈদেশিকই হউন, আর দেশীয়ই হউন, তাঁহাকে পরিত্যক্তা স্ত্রীর স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন সাধন করিতে হইলে স্ত্রীকে গতপ্রাণার ন্যায় প্রতীয়মান করাইয়া স্বামীর 'কান্না' শুনাইতে হয়। স্বামীর অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেমের, তদীয় দুষ্কৃতিনিবন্ধন প্রকৃত অনুতাপের এবং লোক-লজ্জা-নিবারক তাদৃশ কোন প্রকাশ্য ব্যবহারের নিদর্শন ব্যতিরেকে পরিত্যক্তা স্ত্রী, ঈষন্মাত্র আত্মগৌরব সত্ত্বে, পরিত্যাগকারী স্বামীকে পুনর্গ্রহণে সম্মতা হইতে পারেন না। সাধ্বীদিগের হৃদয়ে আত্মগৌরব অতি প্রবল ভাবেই বিরাজ করে। তাঁহারা যতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসর্জ্জনে প্রবণা ও আত্মবিলোপে সক্ষমা হউন, তাঁহাদিগের সাধ্বীতাটিই জ্বলন্ত হুতাশন-স্বরূপ। জগতীতলে সাধ্বীপ্রতিমা সীতাও সুতরাং ঐরূপ একটি অগ্নিশিখা। ভূতধাত্রী পৃথিবী এবং ত্রিলোক-

পাবনী গঙ্গাও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আবয়োরপি যৎসঙ্গাৎ পবিত্রত্বং প্রকৃষ্যতে" (যাঁহার সংসর্গ লাভে আমরাও পবিত্র হইয়াছি।) এমন সীতাকে যে রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন সাধন করিতে হইলে লোককে অবশ্যই দেখাইতে হইবে যে, রাম সীতাকে গতপ্রাণা জানিয়া তাঁহার জন্য প্রকৃত দুঃখে দুঃখী এবং নিজ দুষ্কৃতিবশতঃ প্রকৃত অনুতাপে অনুতপ্ত।

যদি অনুতাপাদি প্রকাশ ব্যতিরেকে সীতাকে আনিয়া রামের সহিত মিলান হইত, তাহা হইলে লোকের মনস্তুষ্টি হইতে পারিত না। প্রত্যুত সীতার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিত। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সপ্তমাঙ্কে কালিদাস যে ভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পুনর্মিলন সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজের মনেও যেন একটু খুঁত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দুষ্মন্ত নিজ দুষ্কৃতিজন্য অনুতাপে অনুতপ্ত হইয়া যখন বলিলেন—

প্রজাগরাৎখিলীভূত স্তস্যাঃ স্বপ্নসমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুংচিত্রগতামপি॥

নিদ্রার অভাবে স্বপ্ন সমাগম রহিত হইয়াছে, চিত্রাঙ্কিত করিয়াও তাহাকে দেখিবার উপায় নাই—কারণ নয়নবারি দৃষ্টি রোধ করে।

তখন মিশ্রকেশী বলেন—

সব্বধা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেস দুক্খং
পিঅ সহীএ পচ্চক্খং জ্জেব সহীজণস্স।

প্রিয়সখীর পরিত্যাগদুঃখ তুমি তাহার সখীর সমক্ষে সম্পূর্ণরূপেই ক্ষালন করিলে।

এখানে গূঢ় ভাবটি এই—পরিত্যক্তা শকুন্তলা নিজে দুষ্মন্তের অনুতাপ দেখিল না বটে, কিন্তু সেই জন্যই কবি যেন আপনার মনকে বুঝাইলেন—শকুন্তলা দেখিল না—তাহার সখী দেখিল ত।

আবার যখন সপ্তমাঙ্কে সপুত্রা শকুন্তলা দুষ্মন্তের সম্মুখবর্ত্তিনী, এবং পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—

অম্ব কো এসো—

মা! কে এ?

তখন শকুন্তলা উত্তর করিলেন—

ভাঅধেআইং পুচ্ছ।

ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।

উত্তরটী বড় চমৎকার-জনক। চমৎকার-জনক এই জন্য যে কবি শকুন্তলার মনের ভাব যেরূপ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রকার কথা অপেক্ষা অধিক সুসঙ্গত অপর কোন কথা মনেই আনিতে পারা যায় না। কিন্তু শকুন্তলার মনের ভাবটী কেমন? ঐ মনটী স্বতঃই প্রেমে গদ্‌গদ, অতি নম্র; কিন্তু উহা হইতে পরিত্যাগদুঃখ এবং অপমানলজ্জা অপনীত হয় নাই। কবিকে এই জন্যই দুষ্মন্তকে দিয়া শকুন্তলার পায়ে ধরাইতে হইল। যথা—

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীক মপৈতুতে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভুৎ।
প্রবলতমসামেবং প্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্য হি শঙ্কয়া॥

ইতি পাদয়োঃ পততি।

হে সুগাত্রি! হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যানদুঃখ দূর কর। কি জন্য জানি না, তখন আমার মনে প্রবল মোহ জন্মিয়াছিল। মোহান্ধ লোকদিগের শুভ বিষয়েও এই রূপ আচরণ হইয়া থাকে। অন্ধ ব্যক্তির মস্তকে পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিলেও সে সর্পাশঙ্কায় ফেলিয়া দেয়। এই বলিয়া চরণে পতিত হইলেন।

কিন্তু ইহাতেও হইল না। কবি দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবেই যে দুষ্মন্তের

বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল, তাহা শকুন্তলাকে বুঝাইয়া মহামুনি মরীচিকে দিয়া আজ্ঞা করাইলেন।

বৎস্যে! বিদিতার্থাসি তদিদানীং
সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ করণীয়ঃ।

বৎসে! সমুদয় অবগত হইলে, এক্ষণে স্বামীর প্রতি আর ক্রোধ করিও না।

রামসীতার পুনর্ম্মিলন সম্বন্ধে ভবভূতি কোন খুঁৎ রাখেন নাই। তিনি তৃতীয়াঙ্কে রামের বিরহশোক বর্ণনাবসরে রামসীতার পুনর্ম্মিলনের পথ সম্যক্ রূপেই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিলন সময়ে সপ্তমাঙ্কে অরন্ধতী সীতাকে মুর্চ্ছাপন্ন রামের নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন—

ত্বরস্ব বৎসে বৈদেহি মুঞ্চশালীনশীলতাম্।
এহি জীবয় মে বৎসং প্রিয়স্পর্শেন পাণিনা॥

বৎসে সত্বর হও লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ কর; আইস প্রিয়স্পর্শ হস্তদ্বারা আমার বাছাকে বাঁচাও।

সীতা অমনি সসম্ভ্রমে গিয়া রামের শরীর স্পর্শপূর্ব্বক বলিলেন—

সমসসসদু অজ্জউত্তো।

আর্যপুত্র সমাশ্বস্ত হও।

কিন্তু যদি তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত রামের বিলাপাদি পূর্ব্বে শ্রুত না থাকিত, তাহা হইলে ঐ কথা এবং ঐ কার্য্যটী বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত।

অতএব ভবভূতির পক্ষে সীতাকে গতপ্রাণাবস্থবৎ করিয়া রামের বিরহ-দুঃখ দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু পক্ষান্তরে সীতা একান্ত রামপ্রেমময়ী, রামের নিকট তাঁহার ক্রোধ নাই, তেজ নাই, এমন কি, প্রায় অভিমান পর্য্যন্তও নাই বলিলেই হয়। তাঁহার জীবনের জীবন পর্য্যন্ত রামরূপ মোহন মন্ত্রের বশ।

রামকৃত অত্যাচারে তাঁহার যতই দুঃখ হউক, তিনি সমুদায় আপনার ভাগ্যের দোষ বলিয়াই মনে করেন। অন্যে তাঁহার হইয়া রামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সেই বিরক্তিতে তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি হয় না। তবে তাহা হয় না বলিয়া আপনি মনে মনে একটু লজ্জিত হয়েন বটে, এবং ঐরূপ লজ্জামধ্যে হে দুর্বিভাব্য অভিমানের গুণীভূত উন্মেষ থাকে, রামের প্রতি সীতার অভিমান সেই টুকু মাত্র।

এমন কোমল অপেক্ষাও কোমল অভিমানটীকে, এমন পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্র প্রকৃতিটীকে সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবভূতিকে রাম সীতার পুনর্ম্মিলন সাধন করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের বোধে এই জন্যই ভবভূতির তৃতীয়াঙ্কের অবতারণা, এবং তাহাতে ভাগীরথীর বরপ্রাপ্তা লোকলোচনের অগোচরা ছায়াময়ী সীতার কল্পনা।

যদি ভবভূতি পূর্ব্বোল্লিখিত বৈদেশিক কবির অনুরূপ করিয়া উত্তরচরিতের নায়িকা সীতাকে নিজ প্রতিমূর্ত্তিরূপে অবস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে রামের বিলাপ শ্রবণ করাইতেন, তাহা হইলে কি ভাল হইত? সীতার গাঢ়তম প্রেমভাব এবং চিত্তের ঐকান্তিক সরলতা কি সেরূপ করিলে রক্ষা পাইত? সীতা কি অমন "সঙ সাজিয়া" বসিতে পারিতেন? সীতা কি রামকে দেখিয়াই চকিতা, উৎকণ্ঠিতা, স্বেদরোমাঞ্চপূর্ণা হইতেন না? অথবা—

"দেহু মং অত্তণো অঙ্গেসুং বিলঅং অম্বা"

মা! আমাকে নিজ অঙ্গে লীন করিয়া লও।

বলিয়া পৃথিবীতে মিলিয়া যাইতে চাহিতেন না? আর যদি সীতা ওরূপে "সঙ সাজিয়া" স্বামীর অনুরাগের এবং অনুতাপের প্রমাণ লইতে বসিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই সীতা কি আর ভবভূতির বা আমাদের সীতা থাকিতেন?

অতএব এক পক্ষে সীতাকে রামের বিলাপ ও মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখাইবার প্রয়োজন, আবার পক্ষান্তরে যদি সীতা তাহা দেখিতে পারেন, তবে তাঁহার প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—এই বৈষম্য বিবেচনা করিয়া কবি ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন। রামের হৃদয়বাসিনী সীতার সমক্ষে রাম কান্দিলেন। যথোচিত হইল—লোকে তুষ্ট হইল। সীতা সপ্তমাঙ্কে বলিয়াছেন—

জাণাদি অজ্জউত্তো সীতাদুক্খং পমজ্জিদুং।

সীতার দুঃখ কেমন করিয়া মোচন করিতে হয়, তাহা আর্য্যপুত্র জানেন।

আমরা বলি, ভবভূতিই জানিতেন, তিনি কিরূপ করিয়া বর্ণন করিলে রামের প্রতি লোকের মন্যু বিগত হইবে, এবং যে সীতা সেই সীতা থাকিয়াই রামের সহিত পুনর্ব্বার মিলিতা হইতে পারিবেন।

---

(৮)

তৃতীয়াঙ্কের উপাদান যে রামের বিরহমোহ, এবং ঐ অঙ্কের প্রণয়ন ব্যতিরেকে যে রাম সীতার পুনর্মিলন লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করা গিয়াছে। এক্ষণে রামকৃত অনুতাপের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ যে সুপ্রণালীতে ঐ পুনর্মিলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে। রাম স্বকৃত দুষ্কার্য্য নিবন্ধন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া বলিলেন,

কষ্টং ভোঃ কষ্টম্!

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দ্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

কি কষ্ট! কি কষ্ট!

গাঢ় উদ্বেগে হৃদয় দলিত হইতেছে, কিন্তু দ্বিখণ্ড হইতেছে না। শরীর অবশ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না। অন্তর্দ্দাহে তনু দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু একবারে ভস্মসাৎ হইতেছে না। মর্ম্মচ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছে, কিন্তু জীবন কর্ত্তন করিয়া ফেলিতেছে না।

ছায়াময়ীর মুখেও বাহির হইল,

এবং খেদং।

এইরূপই বটে।

রাম আপনার দুঃখ মনে করিতে করিতে অবশ্যই ভাবিয়া থাকিবেন, সীতাও অবিকল এইরূপ বিরহযাতনা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাহা ভাবুন বা না ভাবুন, কবি দেখাইলেন যে, এই অবস্থা হইতেই সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। অনন্তর যাহাদের জন্য তাঁহাদিগের এত দুঃখ, সেই পৌরজানপদদিগকে রামের মনে পড়িল, একটু ক্রোধ হইল, কিন্তু ক্রোধের ছিটা মাত্র—অভিমানই অধিক। প্রজার উপর রামের যে ক্রোধ হইতে পারে না, সে জন্য হউক বা না হউক, এখন রাম শোকে এবং অনুতাপে দগ্ধ, ক্লিষ্ট এবং মলিন; এ অবস্থায় লোকের মনে ক্রোধ অপেক্ষা অভিমানই অধিক হয়, সুতরাং ক্রোধের স্থানে অভিমান দেখা দিল। রাম বলিলেন—

হে ভবন্তঃ পৌরজানপদাঃ!

ন কিল ভবতাং স্থানং দেব্যা গৃহেঽভিমতংতত
স্তৃণমিব বনে শূন্যে ত্যক্তা ন চাপ্যনুশোচিতা।
চিরপরিচিতাস্তে তে ভাবাঃ পরিভ্রময়ন্তি মাম্
ইদমশরণৈরদ্যাপ্যেবং প্রসীদত রুদ্যতে॥

হে পৌরজানপদ মহাশয়েরা! দেবীর গৃহে অবস্থিতি তোমাদের অভিমত হয় নাই, এ জন্য শূন্য বনে তৃণের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি,

এবং ত্যাগ করিয়াও অনুশোচনা করি নাই। চিরপরিচিত এই সকল পঞ্চবটী প্রভৃতি পদার্থ নিচয় আমাকে বিকলচিত্ত করিতেছে! অতএব এখনও প্রসন্ন হও, আমি নিরুপায় ভাবে এইরূপ ক্রন্দন করি—অর্থাৎ সীতার জন্য আমি কাঁদিতেছি বলিয়া অপ্রসন্ন হইও না।

ঐ সময়ে রামের মনে আশা ভরসা কিছুই ছিল না। এখন কি তিনি ভাবিতে পারেন যে, সীতা বাঁচিয়া আছেন? তিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা।

নিশ্চয়ই শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অঙ্গলতিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

অতএব পৌরজনেরা প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দিলে তিনি সীতাকে পুনরায় ঘরে আনিবেন, এরূপ ভাব সুসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক রাম একান্ত অভিমানে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, হে পৌরগণ! আমি তোমাদের কথায় অনেক করিয়াছি, এমন যে সীতা, তাঁহাকেও তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখন তাঁহার জন্য একটু কাঁদি তোমরা অপ্রসন্ন হইও না।

রাম এরূপ বলায় সীতার মনে কি হইতে পারে? যাহাদিগের কথায় রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের প্রতি রামের ক্রোধ এবং অভিমান প্রকাশিত হওয়ায় সীতার যে অবশ্যই কিছু মনস্তুষ্টি হওয়া সম্ভব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবভূতি কি নিপুণ বুদ্ধিতেই ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন, অথবা সীতার চরিত্র বুঝিয়াছিলেন! তিনি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া এ স্থলে কোন কথাই বাহির করিলেন না। কেন করিলেন না? সীতা যে পৌরজনদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, অথবা তাহাদের প্রতি রামের বিরক্তি দেখিলে তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার কোন চিহ্ন দিবেন না বলিয়া? না রামের মন পৌরজনদিগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিতা ছায়াময়ী সুতরাং অন্তর্হিতা হইলেন, সেই জন্য?

বনদেবী রামকে অতিক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে রাম বলিলেন—

কিমত্রোচ্যতে ধৈর্য্যমিতি!

দেব্যা শূন্যস্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ।

লুপ্তং সীতেতি নামাপি ন চ রামো ন জীবতি?॥

ধৈর্য্যের কথা কি বলিতেছ? এই সীতা শূন্য জগতে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল; সীতার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রাম অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে! অর্থাৎ রামের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ধৈর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

পাঠক এ স্থলে একটি প্রকৃত বিবরণ শুনুন্। কোন মহাপুরুষ আপনার সহধর্ম্মিণী-বিযুক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যু কালে তিনি গঙ্গাতীরে সমানীত হইলে বলিয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যে চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, আজিকার চিতায় তাহা নিবিবে। ভবভূতি রামের মুখে যে কথা দিয়াছেন, তাহা এই প্রকৃত কথারই অনুরূপ।

রামের এরূপ মর্ম্মভেদী বাক্যশ্রবণে সীতার মনে সহানুভূতি অবশ্যই এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহাতে তাঁহার মনে যেন একটু ভ্রম জন্মিতেও পারে। রাম যে তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন বলিয়াই দুঃখভোগ করিতেছেন, এ ভাবটি সীতার মনে আর স্থান পাইবে না। রামও যেমন মধ্যে মধ্যে অতি দুঃখে কাতর হইয়া সীতার প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে 'নিষ্করুণে' 'কোপনে' 'চণ্ডি' প্রভৃতি নির্দ্দয়শীলতা-ব্যঞ্জক সম্বোধন করিয়া থাকেন, রামহৃদয়বাসিনী সীতা নিজেও যে কখন কখন সেইরূপ আপনার প্রতি দোষারোপ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত আমারই জন্য ইনি এত কষ্ট পাইতেছেন, ভাবিয়া কখন কখন সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানি জন্মিবে। কবি ছায়াময়ী এবং তমসার মুখ দিয়া ঐ ভাবই ব্যক্ত করিলেন। ছায়াময়ী বলিলেন—

মোহিদস্মি এদেহিং অজ্জউত্তবঅণেহিং।

আর্য্যপুত্রের এই সকল বচনে মোহিত হইতেছি।

তমসা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন—

নৈতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্দ্রাঃ শোকদারুণাঃ।
এতাস্তা মধুনোধারা শ্চ্যোতন্তি সবিষাস্ত্বয়ি॥

স্নেহার্দ্র কিন্তু দুঃসহ শোকব্যঞ্জক এই সকল কথা কেবল প্রিয় কথা নয়; এই সকল বাক্যালাপ বিষদিগ্ধ মধুধারাস্বরূপ হইয়া তোমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

রামের স্নেহবাক্য মধুর, এবং তাঁহার দুঃসহ শোকজনিত সীতাহৃদয়ের আত্মগ্লানিই বিষ।

রাম যে কত কষ্ট পাইতেছেন, তাহার বর্ণন করিয়া বলিলেন,

ময়া খলু—

যথা তিরশ্চীন মলাতশল্যং
প্রত্যুপ্তমন্তঃ সবিষশ্চ দংশঃ।
তথৈব তীব্রো হৃদি শোকশঙ্কুঃ
মর্ম্মাণি কৃন্তন্নপি কিং ন সোঢ়ঃ॥

অন্তরে বক্রভাবে প্রোথিত জ্বলদঙ্গার নির্ম্মিত শল্যের ন্যায়, এবং বিষাক্ত দংশনের ন্যায় হৃদয়ে নিহিত তীব্র শোকশঙ্কু আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে, তাহা কি আমি সহিতেছি না?

এইবারে ছায়াময়ীর মুখ দিয়া সীতা হৃদয়ের অবশ্যম্ভাবিনী আত্মগ্লানি স্পষ্টই প্রকাশিত হইল—

এব্বংস্মি মন্দভাইণী পুণো বি আআসআরিণী অজ্জউত্তস্স।

আমি এমন মন্দভাগিনী, আবার আর্য্যপুত্রের আয়াসকারিণী হইলাম!

রাম নিজ দুঃখ-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—

এবমতিনিষ্কম্পস্তম্ভিতান্তঃকরণস্যাপি মম সংস্তততত্তৎপ্রিয়বস্তুদর্শনা দদ্যায়মাবেগঃ—

তথাহি

লোলোল্লোলক্ষুভিতকরুণোজ্জৃম্ভণস্তম্ভনার্থং
যো যো যত্নঃ কথমপি ময়া ধীয়তে তংতমন্তঃ।
ভিত্বা ভিত্বা প্রসরতি বলাৎ কোঽপি চেতোবিকার-
স্তোয়স্যেবা প্রতিহতরয়ঃ সৈকতং সেতুমোঘঃ॥

এই প্রকার অতি স্থির এবং এবং গভীরান্তঃকরণ হইলেও আমার সেই সেই পরিচিত প্রিয়বস্তু দর্শনে অদ্য এই আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। অতি প্রবলরূপে বিলোড়িত ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্বেগনিরোধার্থ আমি কষ্টসৃষ্টে যে যে যত্ন করিতেছি, কি জানি কি অনির্ব্বচনীয় চিত্তবিকার, অপ্রতিহত বেগ জলপ্রবাহ যেমন বালুকাময় বাঁধ ভগ্ন করে তদ্রূপ, সেই সেই যত্ন ভেদ করিয়া চিত্তে প্রসরলাভ করিতেছে।

একটু বিশিষ্টমনে দেখিলে এ স্থানে কবির অপরিসীম মানবচিত্তজ্ঞতার বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। রাম আপনার দুঃখসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে দিতে তিনি বলিয়াছেন—তাহার হেতু নির্দ্দেশ সহ একটী সীমাবন্ধন করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—"মম সংস্তুততত্ত্বংপ্রিয় বস্তুদর্শনাদদ্যায়মাবেগঃ।"

পূর্ব্ব পরিচিত সেই সেই প্রিয় বস্তু দর্শনে অদ্য আমার এই আবেগ। অতএব রামের বলা হইল যে, প্রিয়বস্তু দর্শনই তাঁহার আবেগের কারণ, এবং ঐ আবেগ ঐ কারণে ঐ দিনই ঘটিয়াছে। রাম নিজ দুঃখ-প্রাবল্যের বিশেষ হেতু এবং কালের উল্লেখ করাতে বিরহদুঃখপ্রাবল্যের যে তাদৃশ কোন কারণ সীতার সম্বন্ধে সে সময়ে উপস্থিত হয় নাই, এরূপ আভাস দিয়াছেন।

অতএব ছায়াময়ীর মুখে বাহির হইল—

এদিণা অজ্জউত্তস্স দুব্বারদারুণারম্ভেণ দুক্কথসংখোহেণ পপ্ফুরিদণিঅ-
দুক্কথং বিঅ আকম্পিদংমে হিঅঅং।

আর্য্যপুত্রের এই অনিবার্য্য এবং দুঃসহ দুঃখাবেগে আমার নিজ দুঃখ যেন প্রস্ফুরিত হইয়া আমার হৃদয় কম্পিত করিতেছে।

পাঠক দেখুন, এই কথায় যদিও রামের দুঃখে সীতার সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে বটে, তথাপি সহানুভূতির আতিশয্যে পূর্ব্বে যে আত্মগ্লানির অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধ হইয়াছিল, সে আত্মগ্লানির লক্ষণ, রামের ওরূপ কথার পর আর কিছুই নাই। এখন সীতার দুঃখকে রামের দুঃখ হইতে স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাম নিজ দুঃখের যে হেতুনির্দ্দেশ এবং সীমাবন্ধন করিয়াছিলেন, কবি তাহার উচিত ফলই দেখাইলেন। বোধ হয়, ভবভূতি মনে করিয়াছিলেন যে, যদিও রামের হৃদয় বিরহতাপে গলিয়াছিল বটে, তথাপি যেন আরও একটা আঁচ লাগাইবার প্রয়োজন আছে। তিনি সেই আঁচ লাগাইতে চলিলেন। বনদেবী একটী লতাকুঞ্জগৃহ দেখাইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

দেব দেব!

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্‌গোদাবরীসৈকতে।
আয়াস্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুড্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

হে দেব! (এক সময়ে) সেই সীতার পথ পানে চাহিয়া তুমি এই লতাগৃহেই ছিলে। সীতা হংসের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গোদাবরীর সিকতাময় তীরভূমিতে বিলম্ব করেন। প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে উৎকণ্ঠাকুল দেখিয়া কাতর ভাবে পদ্মকুঁড়ির ন্যায় মনোহর প্রণামাঞ্জলি বিধান করিয়াছিলেন।

যদি পাঠকদিগের মধ্যে কেহ মৃতবন্ধুক থাকেন, এবং মনে করিতে পারেন যে, জীবদ্দশায় সেই বন্ধুর প্রতি কখন ক্রোধ বা বিরাগ করিয়াছিলেন, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, এখন তাহা স্মরণ হইলে তাঁহাদিগের আত্মগ্লানি কেমন হৃদয়দ্রাবক তীব্রভাব উৎপাদন করে। আবার যদি মনে পড়ে যে, সেই বন্ধু একান্ত নম্র এবং বিনীত ভাবে, তাঁহাদিগের সেই ক্রোধ ও বিরাগের শান্তি করিয়াছিলেন, তবে আর অনুতাপাগ্নির ইয়ত্তা

থাকে না—উহার তেজে হৃদয় কেবল দ্রবমাত্র হয় না, বাষ্পবৎ হইয়া উবিয়া যায়। রামের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত কাতরবদনে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সীতা ঐ লতাগৃহে একবার তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, রাম যেন আবার তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার যে সহিষ্ণুতা ছিল, বলিতেছিলেন, আর তাহা রহিল না। সীতার সেই কাতরমুখ, সেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানি, বনভূমির সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতে লাগিলেন। এরূপ "হৃদয়মর্ম্মগূঢ়শল্যঘট্টনে" তিনি বলিয়া ফেলিলেন—

চণ্ডি জানকি! ইতস্ততোদৃশ্য স ইব নচানুকম্পসে?
হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ংস্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বঙ্‌মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি।

ইতি মূর্চ্ছতি।

অয়ি কোপনে জানকি! যেন তুমি ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছ, কৈ দয়া করিতেছ না?

হায় হায়! দেবি! হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের বন্ধন গ্রন্থি সকল শিথিল হইতেছে, আমি জগৎ শূন্য দেখিতেছি; অবিরত জ্বালায় আমার অন্তর জ্বলিতেছে; কাতর অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া যেন অন্ধকারে মগ্ন হইতেছে; মোহ আমার চারিদিক আবরণ করিতেছে। হতভাগ্য আমি এখন কি করি?

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

(৯)

ভবভূতি কেমন নিখুঁত করিয়া রাম সীতার পুনর্মিলনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইবে।

তিনি অনুতাপাগ্নিদগ্ধ রামের প্রতি সীতার সহানুভূতির সঞ্চার, রামের দুঃখে সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানির উদ্বোধ, এবং তৎসহ সহানুভূতির বৃদ্ধি; পরে রামের সহিষ্ণুতার সম্যক্ পরিহার এবং তাঁহার মোহ—ক্রমান্বয়ে এই ভাবগুলি বর্ণন করিয়া এক্ষণে সীতার মনে রাম সহ পুনর্মিলনাভিলাষের আতিশয্য যেরূপে হইতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্রমশঃ তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম মূর্চ্ছিত হইলে ছায়াময়ীও সুতরাং মূর্চ্ছিতা হইলেন। রামহৃদয়ে সীতার প্রথম উদ্বোধনস্বরূপ বনদেবী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—

হা প্রিয়সখি সীতে! ক্বাঽসি? সম্ভাবয়াত্মনো জীবিতেশ্বরম্।

হা প্রিয়সখি সীতে! কোথায় আছ? আপনার জীবিতেশ্বরকে বাঁচাও।

ছায়াময়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামের হৃদয় এবং ললাটে স্পর্শ করিলেন।

রাম বলিলেন,—

আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ রন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহং॥

অমৃতময় প্রলেপদ্বারা সর্ব্বশরীরকে যেন ভিতর বাহিরে লিপ্ত করত, স্পর্শ আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আনন্দোৎপাদনদ্বারা অকস্মাৎ অন্যবিধ মোহ বিস্তার করিতেছে।

সখি বাসন্তি! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে।

সখি বাসন্তি! বড় সৌভাগ্য!

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—

দেব! কথমিব?

দেব! কিরূপ?

রাম উত্তর করিলেন—

কিমন্যৎ, পুনঃ প্রাপ্তা জানকী।

অন্য আর কি, জানকীকে আবার পাইয়াছি।

বাসন্তী। অয়ি দেব! ক্ব সা?।

হে দেব! কৈ তিনি?

রামঃ। পশ্য—নন্বিয়ং পুরত এব।

দেখ, এই আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। অয়ি! কিমিতি মর্ম্মচ্ছেদদারুণৈরেভিঃ প্রলাপৈঃ?

মর্ম্মচ্ছেদকারী নিদারুণ এ সকল প্রলাপ কি জন্য?

রামঃ। সখি কুতঃ প্রলাপাঃ?।

সখি প্রলাপ কোথা?

গৃহীতো যঃ পূর্ব্বং পরিণয়বিধৌ কঙ্কণধর-
শ্চিরং স্বেচ্ছাস্পর্শৈ রমৃতশিশিরৈর্যঃ পরিচিতঃ।
সএবায়ং তস্যাস্তহিনকরকৌপম্যসুভগো
ময়া লব্ধঃ পাণির্ললিতলবলীকন্দলনিভঃ॥

বিবাহ সময়ে কঙ্কণধর যে কর আমি পূর্ব্বে ধারণ করিয়াছিলাম, অমৃতের ন্যায় শীতল যে কর স্বেচ্ছাধীন স্পর্শদ্বারা চিরপরিচিত, তুষার এবং করকার তুল্য স্নিগ্ধ লবলীনবপল্লববৎ কোমল তাঁহার সেই এই কর আমি লাভ করিয়াছি।

মোহগ্রস্ত রাম এই সময়ে মনে করিয়াছিলেন যেন সীতার হাতটি ধরিয়াছেন। তিনি বলিলেন—

আনন্দনিমীলিতেন্দ্রিয়ঃ সাধ্বসেন
পরবানস্মি, তৎ তং তাবদেনাং ধারয়।

আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম জড়ীভূত হইয়াছে। আমি বিকল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব তুমি ইহাঁকে ধারণ কর।

বাসন্তীর হস্তে তুলিয়া দিবার সময় ছায়াময়ী সুতরাং আপনার হস্ত সরাইয়া লইলেন। রাম এতক্ষণ সীতার স্পর্শসুখ এমন গাঢ় ভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, হাতটী সরিয়া গেলে বলিলেন—

করপল্লবঃ স তস্যাঃ সহসৈব জড়াজ্জড়ঃ পরিভ্রষ্টঃ।
পরিকম্পিণঃ প্রকম্পী করান্মম স্বিদ্যতঃ স্বিদ্যন্॥

তাঁহার সেই জড়ীভূত কম্পমান স্বেদযুক্ত করপল্লব সহসা আমার জড়ীভূত কম্পযুক্ত স্বেদবিশিষ্ট কর হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।

রামের এই সময়ের অবস্থাটী বুঝিতে হইলে কবি তাঁহার মুখ দিয়া ষষ্ঠাঙ্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন—

"চিরং ধ্যাত্বা ধাত্রা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ
প্রবাসেঽপ্যাশ্বাসং নখলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।"

'নিয়ত ধ্যানযোগে নির্ম্মিতাকারবৎ সম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিযুক্ত হইয়াও সান্ত্বনা প্রদান করে।'

রাম সীতার হাত সরিয়া গেলেও আশ্বাস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সেই ধ্যানগম্যা পুরোবর্ত্তিনীবৎ প্রতীয়মানা সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। কিরূপ দেখিলেন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি প্রকাশ করিতেছেন।

সস্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥

প্রিয়তমের স্পর্শসুখে বাছার শরীরে স্বেদ, রোমাঞ্চ ও কম্প হইতেছে। অতএব ইহাকে বায়ুবিকম্পিত ও নবজলসিক্ত মুকুলিত কদম্বশাখার ন্যায় দেখাইতেছে।

সীতাকে এরূপ সাত্ত্বিকভাবসম্পন্না দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে একটু লজ্জিতা মনে করাও রামের পক্ষে অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, কবি সেই ভাবই সীতার মানসোক্তিতে ব্যক্ত করিতেছেন।—

অম্মহে! অবসেণ এদেণ অত্তাণএণ
লজ্জাবিদম্হি ভঅবদীএ তমসাএ,

কিংত্তি কিল এসা মণিস্সদি-এসো
দে পরিচ্চাও, এসো অ হি অআসঙ্গো ত্তি।

আমার আত্মা এরূপ অবশ হওয়ায় ভগবতী তমসার নিকটে আমায় লজ্জা পাইতে হইল। ইনি কি মনে করিবেন? ইনি মনে করিবেন—এই তোমার পরিত্যাগ, আবার এই হৃদয়ানুরাগ।

রাম এই সময়ে তদীয় অনবস্থিত স্তিমিত মূঢ় ও ঘূর্ণৎ মোহলক্ষণাক্রান্ত নয়ন দ্বারা সীতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বলিলেন—

হা কথং নাস্ত্যেব! নন্বকরুণে বৈদেহি!—

হায় কৈ নাইই তবে! হে নির্দ্দয়ে বৈদেহি!

সীতা। সচ্চং অকরুণম্হি; জা এবং বিধং তুমং পেক্খন্তী ণং ধরামি এব্ব জীবিদং।

সত্যই আমি নির্দ্দয় হইয়াছি, যে আমি তোমাকে এই প্রকার দেখিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।

রামঃ। ক্বাসি দেবি! প্রসীদ ন মামেবংবিধং পরিত্যক্তুমর্হসি

কোথা দেবি প্রসন্ন হও, ঈদৃশাবস্থ আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না।

সীতা। অই অজ্জউত্ত বিবরীদং বিঅ এদং।

হে আর্য্যপুত্র ইহা বিপরীত।

বাসন্তী। দেব প্রসীদ প্রসীদ স্বেনৈব লোকোত্তরেণ ধৈর্য্যেণ সংস্তভ্নাতি-ভূমিংগতবিপ্রলম্ভমাত্মানং, কুতোঽত্র মে প্রিয়সখী?

হে দেব প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, প্রিয়াবিয়োগশোক পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব স্বীয় অলৌকিক ধৈর্য্য দ্বারা আপনাকে শান্ত কর। আমার প্রিয়সখী এখানে কোথায়?

রামঃ। ব্যক্তং নাস্তি! কথমন্যথা বাসন্ত্যপি তাং ন পশ্যেৎ! অপি খলু স্বপ্ন এষঃ? নচাস্মি সুপ্তঃ; অথবা কুতো রামস্য স্বপ্নঃ? সর্ব্বথা স এব ভগবানেকুষারপরিকল্পনানির্ম্মিতো বিপ্রলম্ভঃ পুন পুনরনুবধ্নাতি মাম্।

সত্যই নাই; অন্যথা বাসন্তীও তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? ইহা কি তবে স্বপ্ন? কিন্তু আমিত নিদ্রিত নই। অথবা রামের স্বপ্ন কোথায়? বারম্বার কল্পনা প্রসূত ভ্রমই আমার পুনঃ পুনঃ অনুসরণ করিতেছে।

সীতা। মএ এব্ব দারুণাএ বিপ্পলদ্ধো অজ্জউত্তো।

আমি নিষ্ঠুর, আমাকর্ত্তৃকই আর্য্যপুত্র প্রতারিত হইতেছেন।

পাঠক দেখুন, যে অবস্থায় সীতার মনে পুনর্ব্বার আত্মগ্লানির উদয় হইতে পারে, কবি আবার যেন তাঁহাকে সেই অবস্থায় আনিলেন। বস্তুতঃ সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানির ঢেউ কেমন করিয়া উঠে, এবং পড়ে আবার উঠে, ভবভূতি প্রেমিকের হৃদয়ের এই লহরীলীলাটী দেখাইলেন।

---

(১০)

রামের সীতাবিরহশোক যেরূপে বর্ণিত হইলে সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার হয়, এবং সেই সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানি জন্মে, এবং আত্মগ্লানিনিবন্ধন পুনর্ম্মিলনের অভিলাষ উদ্রিক্ত হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া কবি তাহার পর ঐ অভিলাষ যাহাতে বর্দ্ধিত এবং ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা দেখাইতে চলিলেন।

কবি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সীতার জন্য রাম পূর্ব্বে যে যে কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমতঃ স্মরণ করাইলেন। বনদেবী বলিলেন,—

দেব! পশ্য পশ্য—

পৌলস্ত্যস্য জটায়ুষা বিঘটিতঃ কার্ষ্ণায়সোঽয়ংরথঃ
পশ্যৈতে পুরতঃ পিশাচবদনাঃ কঙ্কালশেষাঃখরাঃ।
খড়্গাচ্ছিন্নজটায়ুপক্ষতি রিতঃ সীতাং জ্বলন্তীং বহ-
ন্নন্তর্ব্যাকুলবিদ্যুদম্বুদ ইব দ্যামভ্যুদস্থাদরিঃ॥

হে দেব! দেখ দেখ—জটায়ু-কর্ত্তৃক ভগ্ন কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত রাবণের এই রথ পড়িয়া আছে। আর সম্মুখভাগে এই সকল পিশাচের ন্যায় বদন

বিশিষ্ট তাহার যথার্থ অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়া আছে। এই খান হইতে অরি (রাবণ) খড়্গদ্বারা জটায়ুর পক্ষ ছিন্ন করিয়া প্রদীপ্তরূপা সীতাকে বহনপূর্ব্ব চঞ্চল তড়িদ্গর্ভ অম্বুদের ন্যায় আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল।

রামের স্ফটিকস্বচ্ছ হৃদয়ে পূর্ব্বঘটনাগুলি একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। তিনি যেন ভয়ব্যাকুল সীতার মুখখানি দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার 'পরিত্রাহি' ডাক শুনিতে পাইলেন, এবং জটায়ুহন্তা সীতাপহারী রাবণকে যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অপরাধীর দণ্ডদানার্থ বেগে উত্থিত হইলেন। কিন্তু পরেই বলিলেন,—

অস্বর্থ এবায়মধুনা প্রলাপো বর্ত্ততে-
উপায়ানাং ভাবাদবিরতবিনোদব্যতিকরো
বিমর্দ্দৈর্বীরাণাং জগতি জনিতাত্যদ্ভুতরসঃ।
বিয়োগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ স খলু রিপুঘাতাবধিরভূৎ
কথংতূষ্ণীং সহ্যো নিরবধিরয়ং স্বপ্নতিবিধঃ॥

এক্ষণে এই প্রলাপ অন্বিতার্থই হইতেছে—

যে বিয়োগে সীতাপ্রাপ্তির উপায় সমস্তের সদ্ভাব প্রযুক্ত বিরহদুঃখাপনয়নের সম্পর্ক ছিল, যে সীতা বিয়োগ বীরদিগের পরস্পর সংগ্রামদ্বারা জগতে উৎকট অদ্ভুত রসের উৎপাদন করিয়াছিল, মুগ্ধাক্ষী সীতার সেই বিপ্রয়োগের সীমা শত্রুনাশ পর্য্যন্তই ছিল। কিন্তু এখনকার এই বিরহের আর সীমা নাই, এবং কিছুতেই ইহার আর প্রতিবিধানও হইতে পারে না। অতএব কেমন করিয়া স্থিরভাবে এরূপ বিরহ সহ্য করা যায়?

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামের সীতাবিরহ ঘটিয়াছিল, তাহার সীমা ছিল, এবারকার বিরহের সেরূপ সীমা নাই। এই নিরবধিত্বের প্রতীতিই রামের বিশেষ দুঃখ, সুতরাং ছায়াময়ীর ক্রন্দনেরও কারণ। কবি নিরবধি শব্দের পুনরুক্তি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া করাইয়া দেখাইলেন যে, ঐ সকল পূর্ব্ব বিবরণস্মরণে রামের সহিত সীতার পুনর্ম্মিলন হয়, এরূপ অভিলাষ অবশ্যই অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে।

রাম বলিতে লাগিলেন,—

হা কষ্টম্!

ব্যর্থংযত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্য্যং হরীণাংবৃথা
প্রজ্ঞা জাম্ববতোঽপি যত্র ন গতিঃ পুত্রস্য বায়োরপি।
মার্গং যত্র ন বিশ্বকর্ম্মতনয়ঃ কর্ত্তুং নলোঽপিক্ষমঃ
সৌমিত্রেরপি পত্রিণামবিষয়ে তত্র প্রিয়ে ক্বাসি মে॥

হা কষ্ট!

যেখানে বানররাজ সুগ্রীবের সখ্য ব্যর্থ—কপিসৈন্যদিগের বলবিক্রমের কোন ফল নাই—যেখানে জাম্ববানের বুদ্ধি খাটে না,—যেখানে পবনপুত্র হনুমানের গতি নাই—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলও যেখানে পথ করিতে অক্ষম, যে স্থান সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণেরও বাণের অবিষয়ীভূত, প্রিয়ে! এক্ষণে এমন কোন্ স্থানে তুমি রহিয়াছ?

যে সীতার জন্য সেই সমস্ত অসাধ্যসাধন করা হইয়াছিল, যে সীতার জন্য জগজ্জেতা রাবণকে জয় করা হইয়াছিল, সেই সীতা কেবল প্রেমময়ী কোমলা বরবর্ণিনী মাত্র নহেন, তিনি মহা গৌরবান্বিতা ও বহু সম্মানিতা। রামের মনে এই ভাবের উন্মেষ কবি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া ব্যক্ত করিলেন,—

বহু মন্নাবিদম্হি পুর্ব্ব বিরহং।

পূর্ব্ব বিরহ আমি শ্লাঘ্য বলিয়া মানিতেছি।

এ দিকে সীতার আত্মগৌরববুদ্ধিই যে রাম সহ পুনর্ম্মিলনের সহকারী ভাব হইবে, তাহাও দেখান হইল।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই পর্য্যন্ত হওয়াতেই যথেষ্ট হইল। বাস্তবিক, সহানুভূতি, আত্মগ্লানি, অভিলাষ এবং আত্মগৌরব এই কয়টি ভাবকে ক্রমান্বয়ে আনিয়া রামসীতার পুনর্ম্মিলনের পথ অতি পরিষ্কারই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইহার পর রাম বনদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামের হৃদয় উদ্ঘাটিত হইতে দেওয়ায় লোকে তাঁহার প্রতি বিগতমন্যু, এবং সীতাসহ তাঁহার

পুনর্ম্মিলন হয়, এরূপ ইচ্ছাযুক্ত হইয়াছে। তমসা আর রামকে ঐক্ষাক রাজা বা 'জগৎপতি' বলেন না। বাসন্তীও অনেকক্ষণ হইতে 'মহারাজ' 'দারুণ' 'কঠোর' প্রভৃতি অপ্রণয় বা নিন্দাব্যঞ্জক সম্বোধন প্রয়োগ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রামের প্রতি অতিরিক্ত হৃদয়াসক্তি নিবন্ধন ছায়াময়ীর মুখ দিয়া আর লজ্জাব্যঞ্জক উক্তি বাহির হয় না।

কিন্তু ভবভূতির সমীচীন বিবেচনায় আরও একটু বাকি ছিল। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, রাম, সীতার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রবন্ধন এবং রাবণ বিজয় প্রভৃতি যে সকল অবদানপরম্পরা সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অবিমিশ্ররূপে সীতার গৌরবখ্যাপন করে না। ঐ সকল কার্য্যে সীতার উদ্ধার হইয়াছিল বটে, এবং ঐ সকল কার্য্য সীতার জন্যই বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বৈরনির্য্যাতন, কুলগৌরব রক্ষা, বীরত্বপ্রকাশ, ত্রিলোকের আধিপত্যলাভ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনও সংসাধিত হইয়াছিল। অতএব যাহাতে সীতার বিশুদ্ধ আত্ম-গৌরবই জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পায় পায়, সেরূপ কোন ব্যাপারের অবতারণা করা আবশ্যক। কবি এক্ষণে তাহা করিতে চলিলেন, এবং সেই জাজ্বল্যমান দীপ্তির সহিত কোন কোন প্রণয়ক্ষেত্রে যে একটি কালিমময় ছায়া পড়িয়া থাকে, সেই ছায়াটুকুও ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। রাম বনদেবীর স্থানে বিদায় প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন—

অস্তি চেদানী মশ্বমেধীয় সহধর্ম্মচারিণী মে—

এক্ষণে অশ্বমেধের নিমিত্ত আমার সহধর্ম্মচারিণী আছেন। রামের মুখে ওরূপ কথা শুনিলে প্রকৃত সীতার যে ভাব হইতে পারে রাম হৃদয়বাসিনী ছায়াময়ীরও তাহাই হইল। ছায়াময়ী কাঁপিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

উজ্জ্বত্ত কা সা ?

আর্য্যপুত্র কে সে ?

এই ভাবটি প্রেমগৌরবে গৌরবান্বিতা সৌভাগ্যবতীদিগের হৃদয়ের তামসী নিশা। যখন যখন তাঁহারা এই অন্ধকারে পড়েন, তখন তাঁহা-

দিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—আর জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা বিশেষ না জানেন তাঁহারা বলেন যে, প্রণয়ক্ষেত্রমাত্রেই এই ছায়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু ভবভূতি জানিতেনযে তাহা নহে। এই ছায়া প্রেমের সৌভাগ্য ক্ষেত্রেই পতিত হয়। যেখানে সোহাগ অধিক এরূপ ঈর্ষা সেই খানেই দেখা দেয়। যদি সীতা পূর্ব্বেই রামের সোহাগে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া না মনে করিতেন, যদি পূর্ব্বেই 'বহুমন্নাবিদস্মি' না বলিতেন, তবে এখানকার 'অজ্জউত্ত কা সা' কথাটি তেমন অতি সুসঙ্গত হইত না। রাম বলিলেন—

হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিঃ

সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

ভবভূতি বর্ণন করিলেন যে, রামের এই কথায় অমনি ছায়াময়ীর সমুদার হৃদয়কোষ শূন্য করিয়া যেমন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—

অজ্জউত্তো দাণিং সি তুমং। অম্মহে উক্কণ্ঠিতং মে দাণিং পরিচ্চা-অলজ্জাসল্লং অজ্জউত্তেণ।

এক্ষণে তুমি আর্য্যপুত্র। অহো আর্য্যপুত্র এক্ষণে আমার পরিত্যাগজনিত লজ্জাশল্য উদ্ধার করিলেন।

এই এত ক্ষণে—অর্থাৎ রাজসভামধ্যে প্রকাশ্যরূপে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে লজ্জাশল্য সমূলে উৎখাত হইল। রাম বলিতে লাগিলেন—

তত্রাপি তাবৎবাষ্পদিগ্ধং চক্ষুর্বিনোদয়ামি।

তাহাকে দেখিয়াই এক একবার বাষ্পকলুষিত চক্ষুকে বিনোদিত করি।

কবি ছায়াময়ীকে দিয়া বলাইলেন—

ধণ্ণা সা জা অজ্জউত্তেণ বহু মণাইঅদি, জাঅ অজ্জউত্তং বিণোদঅন্তী আসাবিবন্ধণং জাদা জীঅলোঅস্স।

সেই ধন্যা, যে আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়াছে, এবং যে আর্য্যপুত্রকে বিনোদিত করিয়া জীবলোকের আশার কারণ হইয়াছে।

তমসা বুঝাইয়া বলিলেন—

অয়ি বৎসে! এবমাত্মা স্তূয়তে।

বৎস! ইহাতে যে আপনারই স্তব করা হইল।

কবির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ছায়াময়ী আর আপনাকে মন্দভাগিনী মনে করিতে পারিলেন না। পরিত্যাগে লজ্জার কারণ নাই- প্রত্যুত বিশুদ্ধ আত্মগৌরবের কারণই দেখা দিল,—পুনর্ম্মিলনের পথ সর্ব্বতোভাবেই পরিষ্কৃত হইল।

কবি ইহার পর তমসার মুখ দিয়া সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিলেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
নম্ভো যথা সলিল মেব তু তৎসমগ্রম্॥

জল যেমন ঘূর্ণি, ফেন, তরঙ্গ প্রভৃতি রূপভেদ আশ্রয় করে, কিন্তু তৎসমস্তই জল; সেই প্রকারে এক করুণ রসই নিমিত্তভেদে ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পরিবর্ত্ত বা মূর্ত্তিভেদ ধারণ করে।

ইহার নিষ্কৃষ্টার্থ এই যে, এই তৃতীয়াঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তাহা এক করুণ রসেরই প্রকারভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সমালোচনের পরিসমাপ্তি কালে আমরাও বলিব—

নৃণাং হৃদ্গত-গূঢ়-তত্ত্ব-কলনে, প্রীতেঃ প্রকাশে ক্রমাদ্
বন্ধ-গ্রন্থি গণস্য, ভেদ কথনে পাপস্য পুণ্যস্য চ।
সাধ্বী-বীর-চরিত্রয়োঃ প্রকটনে, চা, হন্যোপমাবর্জ্জিতাম্
মন্যন্তেঽস্য বুধাঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্॥

বিবিধ প্রবন্ধ।

রত্নাবলী।

শ্রীহর্ষ প্রণীত।

(১)

রত্নাবলী নাটিকা সংস্কৃতের একটী সুপ্রসিদ্ধ সুন্দর বস্তু। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দোষ প্রকরণ ভিন্ন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রায় অপর সকল প্রকরণেই রত্নাবলী হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, আলঙ্কারিকদিগের নির্দ্দেশিত দোষ ভাগ ইহাতে অতি বিরল, এবং তাঁহাদিগের বিধি-সম্মত উৎকর্ষ বহুলপরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান আছে। এবম্প্রকার গ্রন্থ রচনায় রচয়িতার পাণ্ডিত্য, বিবেকশক্তি, সহৃদয়তা এবং সদ্রুচির যে সম্যক্ পরিচয় হয় তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার বিবেকশক্তির একটী বিশেষ পরিচয় এই যে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র না পাইয়াও এবং সংস্কৃতে অন্যান্য মহাকবিগণ নাটক রচনা সম্বন্ধে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, দেখিয়াও রত্নাবলীকার তদীয় নাট্যোল্লিখিত ব্যাপার সমস্তের সংঘটন-কাল এবং সংঘটন-স্থান একোদ্যমে এক রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের উপযোগী হয়, এরূপ করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছেন। রত্নাবলী নাটিকার চারি অঙ্কে বর্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্য্যপরম্পরা এক দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে পর দিবসের রাত্রিশেষের মধ্যে সম্পন্ন এরূপ মনে করা যাইতে পারে, এবং সেই ঘটনাবলীর স্থান উক্ত নাটিকার নায়ক রাজা উদয়নের বাটী এবং তাঁহার প্রমোদোদ্যান মাত্র। অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের এরূপ সন্নিহিত সঙ্গতি রক্ষা আর কোন সংস্কৃত নাটকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। শকুন্তলার অভিনয়-দর্শককে এক স্থানে বসিয়া প্রহরৈক রাত্রির মধ্যে, কখন দুষ্মন্তের

সহিত কণ্বমুনির তপোবনে, কখন রাজসভায়, কখন গিরিশিখরে,—এই রূপে নানা স্থানে, শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্ত রাজার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হওয়ার পর তদীয় ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের সিংহশাবকের সহিত ক্রীড়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর কাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি উত্তর রামচরিতের অভিনয় দর্শন করিতে বসিবেন, তাঁহাকেও দণ্ড কয়েকের মধ্যে কখন অযোধ্যায়, কখন পঞ্চবটীতে, কখন বাল্মীকির তপোবনে—এইরূপে অন্ততঃ বার বৎসর পর্য্যটন করিতে হইবে। এই রূপ সংস্কৃত নাটকের প্রায় সর্ব্বত্র। রত্নাবলীর অভিনয় দর্শনে দর্শককে সেরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। অভিনীত ব্যাপার যে প্রকৃত ব্যাপার, তাঁহার এরূপ মনে করিবার ইচ্ছা হইলে সে ইচ্ছার অধিক ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। রত্নাবলীর অভিনয়-দর্শক যে প্রকৃত ব্যাপারই দর্শন করিতেছেন, এই ভ্রমের সুখস্বাদ তাঁহার আরও একটী কারণে লব্ধ হইতে পারে। রত্নাবলীর ঘটনাবলী রাজা রাজড়ার ঘরে যেরূপ উপকরণ লইয়া যেরূপ ভাবে সচরাচর সংঘটিত হয়, বা হইতে পারে শুনা যায়, সেই রূপেই সম্পাদিত। ইহাতে একজন মনীষী ধর্ম্মভীরু রাজা কোন মুনির শাপপ্রভাবে বহুলবিশ্রম্ভালাপিনী হৃদয়-প্রেম-প্রতিমা ধর্ম্মপত্নী সম্বন্ধে এক-বারে স্মৃতিবিমূঢ় হইয়া আবার একটি অঙ্গুরীয়মাত্র দর্শনে লব্ধসংজ্ঞ হয়েন না। অথবা কোন ছিন্নশীর্ষ ব্যক্তি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া গিরি নদী নির্ঝরিণ্যাদি বর্ণন পূর্ব্বক দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা আপন হন্তাকে শ্রবণ করান না। রত্নাবলীতে আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে এক ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহাও ইন্দ্রজাল বলিয়াই স্বীকৃত, অলৌকিক ঘটনা নহে। অতএব অন্যান্য অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক অপেক্ষাও রত্নাবলীতে যেমন অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের দেশ কাল সম্বন্ধে সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে, তেমনি পাত্রের এবং কার্য্যা-দিরও সম্যক্ সঙ্গতি আছে। আরও একটী নাটকীয় গুণে রত্নাবলীর

শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। নাটক পদার্থ মুখ্যতঃ অভিনয়ে দেখিবার—পুস্তকে পড়িবার বস্তু নহে। সুতরাং নাটকের পূর্ব্বাপর সমস্ত ভাব এমন ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ, এবং ইহার প্রত্যেক ব্যাপার দর্শকের চিত্তপটে এরূপ গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক যে, অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বিলুপ্ত না হইয়া সমুদায় ব্যাপার প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্যমান থাকে, এবং যথাযথ রসোদ্ভাবনে সমর্থ হয়। স্মৃতিপটে সেরূপ দীপ্যমান থাকিবার বস্তু যেমন নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্য্য, তাহাদের বাক্য ভাব ইঙ্গিতাদি তেমন নহে। কারণ, কার্য্যগুলি দেখা যায়, এবং যাহা দেখা যায়, মানসচিত্রে তাহার অঙ্কন যেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়, যাহা কাণে শুনা বা মনে মনে অনুমান মাত্র করা যায়, তাহার বোধ সেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় না। অতএব নাটকে বিশেষ ভাবোদ্দীপক কার্য্য সকলের প্রদর্শন করা আবশ্যক। কেবল নিতান্ত বাক্যমাত্রে তত্তৎভাব প্রকাশ করিলে নাটক ভাল হয় না। ফলতঃ উল্লিখিত পাত্রগণের দৃষ্টিলভ্য কার্য্য পরম্পরাই নাটক বা দৃশ্য কাব্যের জীবনস্বরূপ। সেই জীবন রত্নাবলী নাটিকায় যেরূপ নিপুণতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অপর কোন সংস্কৃত নাটকে সেরূপ হয় নাই। রত্নাবলী রচয়িতা যখন যে ভাবটীকে দর্শকের মনে উদ্দীপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তাহা কেবল নটদিগের বাক্যমাত্রে রঞ্জিত না করিয়া তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনায় নাট্যাংশে রত্নাবলীর তুল্য নাটক সংস্কৃতে দ্বিতীয় নাই।

তবে কি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে যে লিখিয়াছেন যে, "শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে রত্নাবলীর নামনির্দ্দেশ হইতে পারে" আমরা এই সিদ্ধান্ত বাক্যের অপলাপে সাহসী হইতেছি? তাহা নহে। আমরা এই স্থলে যাহা বলিলাম তাহা তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত উক্তিরই "ভাষ্যভূত"।

---

(২)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা এবং উত্তর চরিতের পরেই রত্নাবলীর নাম নির্দ্দেশ হইতে পারে। তাঁহার এই কথাটী দ্বারা উক্ত দৃশ্য কাব্যত্রিতয়ের অগ্রপশ্চাদ্ভাবে বিনিবেশ উপলব্ধ হয়। কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বস্তুদিগের আপেক্ষিক উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সেই সেই ভাবের প্রকৃত অববোধ অনেক স্থলে বিলক্ষণ ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। গুণ, রস বা সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ক জটিল-ভাব সম্বন্ধে, কি বিধাতৃসৃষ্ট পদার্থে, কি তদনুকারী কবিসৃষ্ট কাব্যে, ঐরূপ অগ্র পশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি রূপ রেখাঙ্কপাত দ্বারা পর্য্যায়ক্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জগতের সকল বস্তুরই স্ব স্ব গুণধর্ম্মে বিশিষ্টতা আছে। একের সমুদায় গুণ অন্য কিছুতেই ব্যাপ্যভাবে নাই। সুতরাং পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা-সম্বন্ধ-বিহীন বস্তুদিগকে স্ব স্ব প্রধানই বলা যাইতে পারে। তবে রুচিভেদে যে ব্যক্তির মন যে গুণের পক্ষপাতী, তিনি সেই গুণের তারতম্যানুসারে বস্তুদিগের অগ্রপশ্চাৎ ক্রম অনুমান করিয়া লয়েন, এবং যদি তিনি সাহিত্য সংসারের ব্যবস্থাপক হয়েন, তবে তৎকৃত সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাস্বরূপে প্রচলিত হইয়া যায়।

বস্তুতঃ উত্তর চরিত, শকুন্তলা, এবং রত্নাবলী এই তিনটী দৃশ্যকাব্য পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতিক। তিনটী তিন প্রকারে প্রধান। উত্তর-চরিত গাম্ভীর্য্যে, শকুন্তলা বৈচিত্র্যে, এবং রত্নাবলী পারিপাট্যে। সংস্কৃত কাব্যোদ্যানে তিনটীই বিকসিত কুসুম। কিন্তু তিনটিই এক জাতীয় কুসুম নহে। উহাদের মধ্যে একটী পদ্ম, একটী গোলাপ, এবং একটী নবমল্লিকা। পদ্মটী গভীর সরসীর নির্ম্মল জলে অধিষ্ঠান করে, আপনার স্বচ্ছকান্তির ছায়ায় আপনিই হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে, এবং জগদ্বিধাত্রী ভগবতীর চরণে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পায়। গোলাপটী

রাজোদ্যানের মধ্যস্থলে বিরাজ করে, রাগরঞ্জনে সকলের নয়নাকর্ষী হয়, ফুলের তোড়ার সর্ব্বোপরিভাগে উঠে, এবং বিলাসভবনে সমাদরে পরিগৃহীত হয়। নবমল্লিকাটির স্থান বিভবশালীর আরাম, নায়কনায়িকার নিভৃত পর্য্যটনের অবসরই ইহার ফুটিবার সময়; এ অন্যের অনুবর্ত্তী, এবং ইহার মালা কামিনীর কবরী-বন্ধনে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই তিনটী কুসুমের মধ্যে একটী পূজার, একটী আমোদের এবং একটী আদরের সামগ্রী। প্রথমটীকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলে তাহার মৃদুল অন্তঃপ্রসারী সৌরভে জীবাত্মা প্রসিক্ত হয়; দ্বিতীয়টীর দিগন্তব্যাপী সৌরভে সবন্ধু বান্ধবে উল্লাসপূর্ণ হওয়া যায়; তৃতীয়টীকে সঙ্গে করিয়া বিশেষ দুই জনে না বসিলে উহার সুস্নিগ্ধ আমোদের সম্যক্ উপভোগ হয় না। সহৃদয় পাঠক ইহা অবশ্যই বোঝেন যে, প্রকৃতরূপে উত্তর চরিতের রসানুভব করিতে হইলে তাঁহাকে সুগভীর চিন্তায় অবগাহন করিয়া যাইতে হয়, শকুন্তলার রসগ্রহ পাঠকমাত্রেরই সহজে হইয়া থাকে; এবং রত্নাবলীর রসে আপ্লুত হইতে চাহিলে পাঠককে উহা পাঠ করিয়া নিজ প্রিয়তমাকে শুনাইতে হয়। অতএব এই তিন খানি গ্রন্থই তিন প্রকার—তিনটীই, স্বতন্ত্ররূপ নিজগুণে প্রশংসনীয়।

কিন্তু এই সকল গুণপার্থক্য ভিন্ন উত্তর চরিত এবং শকুন্তলা অপেক্ষা রত্নাবলীর গঠন-প্রণালীতেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। প্রথম দুইটী নাটকে, রসের প্রারম্ভ অবধি তাহার বিবিধ পরিণতি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, রত্নাবলীতে সেরূপ ক্রমান্বয় নাই। রসের বৃদ্ধিশীলতা, এবং তাহার একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তি, প্রথমোক্ত দুইটীর সারভূত। তৃতীয়টীতে, রসের ভাব এমত স্থির যে, যেন পাত্রনিহিতের ন্যায় দৃশ্যমান। সুতরাং প্রথম দুইটীকে দেব-নদী ও তৃতীয়টীকে দেব-সরোবর বলা যাইতে পারে। কিন্তু নদী দুইটীও অবিকল একরূপ নহে। উহার একটী যেন ভাগীরথী—উহা জগতের সর্ব্বোচ্চ মহিমশালীর তুঙ্গশীর্ষে চিরসঞ্চিত পুঞ্জীভূত দ্রবময় বিশদ মেহসার, দারুণ বিলোড়নে হৃদয় বিঘট্টনপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন ও প্রপাতরূপ

হইয়া অগাধ করুণরস-প্রবাহে জগতীতলের পবিত্রতা সাধনপুরঃসর পাবনী ধারায় অদ্ভুত মহাসাগরকে পূর্ণ করিতেছে। অপরটী যমুনা—এটীর মূল অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশে। উহা লক্ষ্মলাঞ্ছিত হিমাংশুলক্ষ্মীর সংস্পর্শে গলিত চন্দ্রকান্ত-মণি-শৈল হইতে বাহির হইতেছে, এবং আপনার সুবিস্তৃত স্বচ্ছ হৃদয়ে সমুদায় সংসারের প্রতিবিম্ব ধারণপূর্ব্বক মোহনবংশীরব সূচিত করিবার জন্যই যেন মধুর ভ্রমর গুঞ্জনধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিতেছে। সরোবরটী স্বচ্ছ স্ফটিক-নিবদ্ধ মানস-সরোবর। ইহার বিশদ বারি আদিম প্রণয়োৎস হইতে স্বতঃ সমুদ্ভূত। ইহা দেব দেবীর বিলাসভূমি। এই লীলাস্থলীতে জগৎপাতা শ্রীবৎসরাজ যুগ-ধর্ম্মপ্রভাবে বসু*দুহিতা সরস্বতী এবং সাগর সম্ভবা লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইতেছেন। এই স্থলে সগুণা প্রকৃতি পুরুষকে গ্রহণ করিতেছেন, এবং রূপভেদে তাঁহারা রতি কাম হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সরোবরবিহারী হংস নলিনীনালে, ভ্রমর কমলকোরকে, তরুরাজি লতাপাশে বদ্ধ হইতেছে, এবং একটী শারিকা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ পূর্ব্বক বসন্ত রাগে—দুল্লহ জণঅণুরাও লজ্জাগুরুই পরব্বসা অপ্পা।

পিয়সহি বিসমংপেম্মং মরণং সরণং ণবরিঅমেক্কং॥

এই সঙ্গীতটী করিয়া তদ্দ্বারা জীবের প্রেমোল্লাস এবং প্রেমোদ্বেগ রবে জগতীতল মুখরিত করিতেছে।

---

(৩)

উত্তরচরিত এবং শকুন্তলার সহিত রত্নাবলীর যে তুলনা হইতে পারে না, তাহা বলা হইয়াছে। বস্তু একজাতীয় না হইলে, প্রকৃতপ্রস্তাবে পরস্পর তুলনা হয় না। উল্লিখিত নাটকদ্বয়ের সহিত রত্নাবলীর প্রকৃতিগত, নির্ম্মাণগত, সুতরাং জাতিগত বৈসাদৃশ্যই আছে। তবে যাঁহারা কাব্য নাটকাদিতে খাসা খাসা দুই পাঁচটা সমানরূপ কবিতা দেখিয়াই সেই সকল কাব্য নাট-

* বসু. অগ্নি—রাগ যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা।

কাদির তুলনা করিতে বইসেন, তাঁহারা উত্তরচরিত, শকুন্তলা এবং রত্নাবলী পাঠ সময়ে উহাদের এই চারিটী তুল্যরূপ শ্লোক দেখিয়াই পরস্পর তুলনার অবসর পাইয়াছেন মনে করেন, এবং সমগ্র গ্রন্থগুলির জাতিগত বৈসাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না। উত্তরচরিত, শকুন্তলা এবং রত্নাবলীতে ঐ প্রকার সমানরূপ দুই চারিটা কবিতার অভাব নাই। যথা—

উত্তরচরিতে—

পরিপাণ্ডু দুর্ব্বলকপোল সুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

শকুন্তলায়—

বসনেপরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

রত্নাবলীতে—

উদয়গিরিতটান্তরিতমিয়ং
প্রাচী সূচয়তি দিঙ্মিশানাথং।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন
প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী॥

উদ্ধৃত এই তৃতীয় কবিতাটী অনুদ্‌ভূত বিরহের অঙ্কুর মাত্র; তথাপি সৌন্দর্য্যে উপরকার দুইটী ফুল্ল বিরহ হইতে ন্যূন নহে—কেহ ইহাকে অধিকতর সুন্দর মনে করিলেও আমাদের আপত্তি নাই। এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে,—অবশ্য, রত্নাবলী হইতে কম—অপর দুইটী হইতে অনেক।

কিন্তু গ্রন্থ সমালোচন-প্রসঙ্গে এরূপ করা আমাদের মনঃপূত নহে। কারণ, এই কার্য্য করিতে গেলে যেন আমরা একটী গগনভেদী, অস্ফুটালোকে আলোকিতান্তর, রোমাঞ্চকারী দেবমন্দির; এবং সুপ্রশস্ত, বহ্বায়ত, প্রভাশালী, বিচিত্র চিত্র-নৈপুণ্যে পরিশোভিত একটী নাটমন্দির; আর সুন্দর সুঘটিত পরিপাটীরূপে সজ্জিত একটী আমোদভবন;—এতাদৃশ ত্রিবিধ হর্ম্ম্যগুলির বর্ণনায় আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগের হইতে এক এক ঝুড়ি ইটমাত্র আনিয়া আদেষ্টার সম্মুখে ধরিতেছি, এইরূপ বোধ হয়। ইটগুলি দেখিয়া দর্শক মনে করিবেন যে, সকল ইটগুলিই সেকালের—দৃঢ়, পেটাসেটা, একটীও একেলে ঢেপ্‌ঢেপে আমা ইট নয়। কিন্তু তাহা দেখাইলেই কি হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য দেখান হইল?—শিল্পীর যথাযথ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইল?—অথবা কোন্‌টী কোন্ পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাই বা কোন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল?

আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, আমরা রত্নাবলীকে যে চক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের পাঠকও তাহাকে সেই চক্ষে দেখেন। আমরা রত্নাবলীকে তাহার অগ্রজ নাগানন্দের সহিত একত্র দেখিয়াছি, এবং বোধ হয় সেই জন্য তাহাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্টতর উপলব্ধ করিয়া রত্নাবলীর অঙ্গসৌষ্ঠব, সুলক্ষণ এবং প্রকর্ষ অনুভব করিবার পক্ষে কিছু সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি।

নাগানন্দও রত্নাবলী-রচয়িতা কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত। ইহার সহিত রত্নাবলীর যেমন সাদৃশ্য আছে, অপর কোন সংস্কৃত নাটকের সহিত তেমন সাদৃশ্য নাই। শুদ্ধ সাদৃশ্য আছে তাহা নহে; উহাদিগের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব উৎকর্ষক্রমও লক্ষিত হয়। নাগানন্দ কবির প্রথম প্রসূত এবং বোধ হয়, তাঁহার নবীন বয়সেরই সন্তান। নাগানন্দের ভাব উচ্চ, বর্ণনা সরল, কিন্তু গ্রন্থন অপেক্ষাকৃত শিথিল। এই গ্রন্থে কবি স্বীয় বিদ্যাবত্তা প্রকাশের লোভ সম্যক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রত্নাবলীতে সে প্রকার লোভ গুণীভূতভাবেও লক্ষিত হয় না। নাগানন্দের রচনায় অনর্থক বা বিসদৃশ বিশেষণ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রত্নাবলীতে

ঐ দোষের লেশমাত্র দেখা যায় না। নাগানন্দের উপাখ্যান ভাগের উৎকর্ষ সম্পাদন করা অধিক আয়াস-সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু রত্নাবলীর উপাখ্যানের সেরূপ উৎকর্ষসাধন নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। নাগানন্দে অকৃতাস্বাদ ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধে কল্পিত বর্ণনা, রত্নাবলীতে ভুক্তভোগীর সাংসারিক কার্য্যকলাপের বিবরণ।

নাগানন্দে হিন্দু ধর্ম্ম্য মতবাদের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম্য মতবাদ কিরূপে সম্মিলিত হইয়া উভয়ে এক পদার্থ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, রত্নাবলীতে ঐ সম্মিলনের ফল কেবল নায়কাদির চরিত্রে গূঢ়ভাবে অনুভব করিতে হয়। নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহন; তিনি একজন পরোপকার ব্রতপরায়ণ বোধিসত্ত্ব। তিনি বানপ্রস্থ পিতা মাতার শুশ্রূষার নিমিত্ত যৌবরাজ্যপরিহার পূর্ব্বক মলয়পর্ব্বতের সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন, এবং তথায় বিদ্যাধর-দুহিতা মলয়বতীকে দর্শন করিয়া তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হন, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সুচতুর শ্যালকের কৌশলবশে সমুদ্র দর্শনে গমন করিলে তথায় গরুড়ের ভক্ষণার্থ উপস্থিত একটী নাগের উদ্ধারার্থ আত্মশরীর সমর্পণ করেন, এবং পরে দেবী গৌরীর অনুগ্রহে ও গরুড়ের অমৃতাভিবর্ষণে পূর্ব্ব-ভক্ষিত নাগকুলের সহিত পুনরুজ্জীবিত হয়েন। রত্নাবলীর নায়ক রাজা উদয়ন, প্রৌঢ়বয়স্ক ও বিবাহিত পুরুষ। তাঁহার রাজ্ঞী বাসবদত্তার দাস্যে নিযুক্তা সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলী পূর্ব্বে নিজ পিতাকর্ত্তৃক রাজার প্রতি বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন জানিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত প্রণয়াসক্ত হন, এবং রাজাও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ অনুভব করেন। কিন্তু রাজ্ঞী প্রতিকূল হইয়া নিজ দাসীভূতা রাজপুত্রী রত্নাবলীকে অন্তঃপুরে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখেন। অনন্তর রাজমন্ত্রীর কৌশলে রত্নাবলীর নিগড়মোচন এবং তাঁহার প্রকৃত পরিচয়প্রাপ্তি হইলে রাজ্ঞী অনুকূলা হইয়া স্বয়ং রাজার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেন।

(৪)

কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত নাগানন্দ এবং রত্নাবলী এই দুই খানি দৃশ্য কাব্যের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভাই ভগিনীর আকারের যেরূপ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে, সেরূপ বলিলেও হয়—অথবা কোন ব্যক্তির কৌমার কালের চিত্রের সহিত তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থার চিত্রের যেরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেরূপ বলিলেও হয়। নবীন বয়সের চিত্রের যে মুখ, যে কাণ যে চক্ষু—পূর্ণ বয়সের চিত্রেও সে সকল তাহাই। তবে নবীন বয়সের চোখ্ নাক মুখ ঢল ঢলে, নধর ও ঋজু থাকে, পূর্ণ বয়সে সেগুলি সুপরিশ্লিষ্ট এবং বিশেষ রূপে আন্তরিক ভাবের পরিব্যঞ্জক হয়। নাগানন্দ এবং রত্নাবলীর আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্র এইরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। নান্দীটী লইয়াই দেখা যাউক।

নাগানন্দের নান্দীতে সমুদায় নাটকের এই একটী দূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মনুষ্যের দেহধারণ ভোগ সুখের নিমিত্ত নহে, বাসনা-দমন-পূর্ব্বক পরার্থ সাধনের নিমিত্ত।

যথা—

ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণম্,
পশ্যাহনঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাহপি নো রক্ষসি।
মিথ্যাকারুণিকোহসি নির্ঘৃণতর স্ত্বত্তঃ স কোহন্যঃ পুমান্,
সের্ষ্যং মারবধূভিরিত্যভিহিতো বুদ্ধো জিনঃ পাতু বঃ।

ধ্যানের ছল অবলম্বন করিয়া তুমি কোন স্ত্রীকে চিন্তা করিতেছ? চক্ষুঃ উন্মীলনপূর্ব্বক অনঙ্গশরাতুর এ জনকে দেখ, দুঃখপরিত্রাতা হইয়াও রক্ষা করিতেছ না? তুমি মিথ্যা কারুণিক—তোমা অপেক্ষা আর কে অধিকতর নির্দ্দয়, এইরূপে ঈর্ষাপূর্ব্বক মারবধূদিগের কর্ত্তৃক অভিহিত বুদ্ধ জিন তোমাদিগকে পালন করুন্।

অপর—

কামেনাকৃষ্য চাপং হতপটুপটহাবল্‌গিভির্মারবীরৈ
ভ্রূভঙ্গোৎকম্পজৃম্ভাস্মিতচলিতদৃশা দিব্যনারীজনেন।
সিদ্ধৈঃ প্রহ্বোত্তমাঙ্গৈঃ পুলকিতবপুষা বিস্ময়াদ্‌বাসবেন
ধ্যায়ন্‌ বোধৈরবাপ্তো ন চলিত ইতি বঃ পাতু দৃষ্টো মুনীন্দ্রঃ॥

আকৃষ্টশরাসন কাম, পটুপটহবাদনপর ও বিক্রান্তউদ্ধতগতি মারবীরগণ (অর্থাৎ?) ভ্রূভঙ্গী, উৎকম্প, জৃম্ভা, স্মিতসহকৃত চলিতচক্ষু-বিশিষ্ট সুর সুন্দরীজন, অপরিশূন্যজ্ঞানশক্তি ও ধ্যানাবসক্ত মুনীন্দ্রকে ধ্যানক্রিয়া হইতে বিচলিত করিতে পারিল না দেখিয়া সিদ্ধসমূহ ভক্তিভারাবনত মস্তকে এবং বাসব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, সেই মুনীন্দ্র তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

গ্রন্থের নায়ক জীমূতবাহন যে রাজ্যসুখ ত্যাগ এবং বিদ্যাধরী মলয়-বতীর প্রণয়সুখ বিসর্জ্জন করিয়া জগতের সমস্ত কামনা পরিহারপুর্ব্বক করুণাপ্রণোদিত হইয়া পরার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা পরমকারুণিক জিনবুদ্ধের মারবধূর তিরস্কার এবং অপরিভ্রষ্ট জ্ঞানদ্বারা বাসনাবিজয়, সেই ভাবেরই সূচনা করিতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সূচনা মাত্র, এবং নান্দীতে গ্রন্থের আভাস অত্যন্ত দূরগত ও অপরিস্ফুট। রত্নাবলীর নান্দীর চারিটী শ্লোকের প্রত্যেকটীতে ঐ নাটিকার এক একটী অঙ্কের সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

যথা—নান্দীর প্রথম শ্লোক—

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুস্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং
শম্ভোঃ সম্পৃহলোচনত্রয়পথং যাস্ত্যা তদারাধনে
হ্রীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্‌গমোৎকম্পয়া।
বিশ্লিষ্যন্‌ কুসুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোঽন্তরে পাতু বঃ॥

শম্ভুর আরাধনা সময়ে পাদাগ্রস্থিতা, স্তন-ভারাবনতাঙ্গী, শম্ভুর সাভি-লাষ নয়নত্রয়পথবর্ত্তিনী, লজ্জাবতী ও পুলকস্বেদকম্পান্বিতা গিরিজা কর্ত্তৃক

শিরঃপ্রদেশে দিবার নিমিত্ত সমীহিত হইলেও যে পুষ্পাঞ্জলি মধ্যভাগে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

রত্নাবলীর প্রথম অঙ্কে, সাগরিকা, রাজা উদয়নকে, রাজ্ঞী বাসবদত্তা কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইতেছেন, এই অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ কামদেব মনে করেন, এবং স্বয়ং সেই দেবতাকে পূজা করিবেন, ইচ্ছা করিয়া মধ্য পথে কুসুমাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোক—

ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্ত্তমানাহ্রিয়া
তৈস্তৈর্বন্ধুবধূজনস্য রচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ।
দৃষ্টাগ্রে বরমাত্তসাধ্বসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতা শ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ।

নবসঙ্গমে বরকে সম্মুখস্থ দেখিয়া সাধ্বস বিশিষ্টা, ঔৎসুক্যবশতঃ ত্বরান্বিতা, সহজলজ্জাহেতুক, প্রত্যাবর্ত্তমানা, বন্ধুবধূদিগের সেই সেই প্রবোধ বাক্যে আভিমুখ্যপ্রাপ্তা, স্মিতমুখ হরকর্ত্তৃক আশ্লিষ্টা অতএব পুলকিতা গৌরী তোমাদিগের মঙ্গল করুন।

দ্বিতীয় অঙ্কে, সাগরিকা মনে মনে পতিরূপে বৃত রাজা উদয়নের নিকটে সঙ্কেতগৃহে যাইবার নিমিত্ত মনে মনে অত্যন্ত উৎসুকা হইলেও লজ্জায় যাইতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর পরিচারিকা সুসঙ্গতাকর্ত্তৃক রাজসমীপে সমানীতা হইলে রাজা হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক সাগরিকাকে স্পর্শ করিলেন। নবসঙ্গমে সাগরিকা লজ্জায় জড়ীভূতা, ও উদ্গতপুলকা হইয়াছিলেন।

নান্দীর তৃতীয় শ্লোক—

সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তোমদর্থে পুরা,
তদ্যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ুং স্তব।
তামেবানুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণকণ্ঠ গ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎ স বঃ॥

পূর্ব্বে আমার জন্য তোমা হইতে মকরধ্বজ বিমর্দ্দিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই আমার সম্মুখে বহুমার্গগাকে বহন করিতেছ! হে নির্লজ্জ! এই কার্য্য কি উচিত? অতএব সেই কুটিলভাবাকেই অনুনয় কর, আমাকে ছাড়িয়া দাও, এই কথা রোষ পূর্ব্বক পর্ব্বতদুহিতা ও লক্ষ্মী যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে পালন করুন্।

তৃতীয়াঙ্কে, সাগরিকা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন, রাজার নয়নগোচর হওয়ায় তিনি তাঁহার গলদেশ হইতে লতাপাশ বিমোচন করিয়া সাগরিকার বাহুপাশ আপন গলদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "হে জীবিতেশ্বরি আমার কণ্ঠে বাহুপাশ অর্পণ কর" এই বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন, এমত সময়ে মহিষী বাসবদত্তা আসিয়া 'এ কর্ম্ম কি তোমার উপযুক্ত? এই বলিয়া রাজাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ শ্লোক—

ক্রোধেদ্ধৈর্দৃষ্টিপাতৈস্ত্রিভিরুপশমিতা বহ্নয়োঽমী ত্রয়োপি,
ত্রাসার্ত্তা ঋত্বিজোঽধশ্চপলগণহৃতোষ্ণীষপট্টাঃ পতন্তি।
দক্ষঃস্তৌত্যস্যপত্নী বিলপতি কৃপণং বিদ্রুতং ক্ষৌণিদেবৈঃ
শংসন্নিত্যট্টহাসো মথমথনরিপো পাতু দেব্যৈ শিবো বঃ॥

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে শিবানুচরদিগের ক্রোধোজ্জ্বলিত নয়নানলদ্বারা যজ্ঞের ত্রিবিধ অগ্নি নির্ব্বাপিত এবং প্রমথগণকর্ত্তৃক হৃতোষ্ণীষ ঋত্বিকগণ ভয়ে ভীত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল। দক্ষ স্তব ও প্রসূতি করুণস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে আহূত ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিয়াছিলেন। দেবীকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিবার সময় অট্টহাসযুক্ত শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুণ।

চতুর্থ অঙ্কে, ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়ায় রাজবাটী মধ্যে অগ্নির সমুত্থান এবং তাহাতে রাজবাটীর প্রতীয়মান দাহরূপ ধ্বংসঘটনা ও বিলাপাদি দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসের অনুরূপ।

ফলতঃ নান্দীমধ্যে নাটকীয় বৃত্তান্তের এরূপ সমগ্রভাবে আভাস প্রদান শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী ভিন্ন আর কোন কবির কোন নাটকে পরিদৃষ্ট হয় না।

---

(৫)

নাটকের নান্দীর মধ্যে সমুদায় গ্রন্থের আভাস প্রদান পূর্ব্বক নান্দীর সার্থকতা সম্পাদন, এক মাত্র কবি শ্রীহর্ষই করিয়াছেন; এবং তাঁহার দুই-খানি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালে প্রণীত রত্নাবলীতে ঐ বিষয়ে অভূতপূর্ব্ব নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এক্ষণে উল্লিখিত নাটকদ্বয়ের প্রস্তাবনা লইয়া দেখা যাউক। নাটকের প্রস্তাবনায় আলঙ্কারিকদিগের নির্দ্দিষ্ট যে সকল প্রকারভেদ আছে, তাহা-দিগের মধ্যে কোন্ প্রকার উৎকৃষ্ট কোন্ প্রকার অপকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে তাঁহারা স্পষ্টরূপে কোন অভিমতি প্রকাশ করেন নাই। আমাদিগেরও এই মাত্র বক্তব্য যে, নাগানন্দের প্রস্তাবনায় যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ কৌশলপূর্ণ নহে।

নাগানন্দে সূত্রধার একটী কবিতা পাঠ করিয়া নাটকের উপখ্যান ভাগের সারভূত কয়েকটী কথা এবং নায়ক জীমূতবাহনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রঙ্গ-ভূমিতে নাটকীয় কোন পাত্রের উপস্থিতির আভাস প্রদান হইল না। যথা—

পিত্রোর্ব্বিধাতুং শুশ্রূষাং ত্যক্ত্বৈশ্বর্য্যং ক্রমাগতম্।
বনং যাম্যহমদ্যৈব যথা জীমূতবাহনঃ॥

পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া জীমূতবাহনের ন্যায় আমি অদ্য বনগমন করিব।

এই প্রস্তাবনাভাগে নাটকীয় কোন পাত্রের রঙ্গস্থলে উপস্থিতি সূচিত

হইতেছে না। সুতরাং প্রস্তাবনার সহিত নাটকীয় ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা হয় নাই। ইহা অপেক্ষা কালিদাসের শকুন্তলাতে প্রস্তাবনায় অধিকতর কৌশল দৃষ্ট হয়।

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ শারঙ্গেণাতিরংহসা॥

অতিবেগশালী শারঙ্গ কর্ত্তৃক 'এই' দুষ্মন্ত রাজা যেমন দূরে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তেমনি আমি তোমার মনোহর গীতরাগে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়াছি।

এস্থলে নটীর সঙ্গীতের প্রশংসার সহিত নাটকীয় পাত্রের রঙ্গস্থলে সাক্ষাৎ উপস্থিতি যে এক প্রকার কৌশলসম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রত্নাবলীর প্রস্তাবনা ইহা অপেক্ষাও সুন্দরতর কৌশলসম্পন্ন। যথা—

দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দ্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥

বিধি, অনুকুল হইলে দ্বীপান্তর সাগরমধ্য এবং দিগন্ত হইতেও ত্বরায় আনয়ন পূর্ব্বক অভিমত বস্তু সংঘটন করেন।

এই প্রস্তাবনায় সমুদায় নাটকীয় উপাখ্যানের ছায়া পতিত হইয়াছে—নটী পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিল, তাহার প্রকৃতরূপ উত্তর করা হইয়াছে—এবং নাটকীয় একটী প্রধান পাত্র যৌগন্ধরায়ণের রঙ্গস্থলে প্রবেশ সাধন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যেমন রত্নাবলীর নান্দীর তুল্য নান্দী সংস্কৃত নাটকে দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ রত্নাবলীর প্রস্তাবনাও সংস্কৃত নাটকে অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। বলিলেও চলে, এরূপ খুঁত রাখিয়া বলিবার হেতু এই যে, অপর একটী নাটকেও ইহারই তুল্য, কি ইহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্টতর একটী প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়। যথা মুদ্রারাক্ষসে—

ক্রূরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রং সংপূর্ণ মণ্ডলমিদানীং
অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ (ইত্যর্দ্ধোক্তে)

নেপথ্যে। আঃ, ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্ত মভিভবিতু মিচ্ছতি বলাৎ?

সূত্র। রক্ষত্বেনস্তু বুধযোগঃ।

কেতুর সহিত ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলকে এক্ষণে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে (এই ভাগ মাত্র বলা হইলে)

নেপথ্যে। আঃ, আমি থাকিতে কে চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করে?

সূত্রধার। ইহাঁকে বুধযোগ রক্ষা করুক।

এই প্রস্তাবনাটী অতি গূঢ় কৌশলে পরিপূর্ণ। নটী এবং সূত্রধারের উক্তি প্রত্যুক্তিতে যে একটী আর্য্যা ছন্দের কবিতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতেই সমুদায় গ্রন্থের আভাস প্রদত্ত এবং নেপথ্য হইতে পুনরুক্তবৎ প্রতীয়মান যে চাণক্যের উক্তি তাহাতে নাটকীয় একটী প্রধান পাত্রের রঙ্গস্থলে প্রবেশ সাধিত এবং সেই নাটকীয় পাত্রের প্রোজ্জ্বল প্রতিকৃতি অভিনয় দ্রষ্টৃবর্গের নয়নপথে সমানীত করা হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলীর পরবর্ত্তী; এবং ঐ দুই নাটকের আভ্যন্তরীণ অনেক লক্ষণ দর্শনে বোধ হয় যে, মুদ্রারাক্ষসপ্রণেতা বিশাখদত্ত শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিতপথ হইয়াই নিজ নাটকের প্রস্তাবনার এরূপ উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেণীসংহারের প্রস্তাবনা মুদ্রারক্ষসের প্রস্তাবনার অনুকৃতি; সুতরাং রত্নাবলীর অনুকৃতির অনুকৃতি।

উৎকৃষ্ট বোধেই লোকে অনুকরণ করিয়া থাকে। রত্নাবলীর প্রস্তাবনার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনার্থ পূর্ব্বোক্ত এই সকল কথা বলা হইল, তাহা ছাড়া আমাদিগের আর একটী উদ্দেশ্য আছে। রত্নাবলীর নান্দীও যে অতি উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু উহার নান্দীর অনুকরণ শ্রীহর্ষদেবের পরবর্ত্তী নাটকলেখকদিগের নাটকে দৃষ্ট হয় না কি জন্য?—আমাদিগের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং আমরা ইহার মনঃপূত উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। তবে এইরূপ ভাবিয়াছি যে, শ্রীহর্ষদেবের পরবর্ত্তী নাটকলেখকগণ তাদৃশ প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহারা কল্পনাশক্তির অনুসরণ করা দূরে থাকুক, নূতন কিছুর অনুকরণ করিতেও সম্যক্ সাহসী হইতেন না। তাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নান্দীর লক্ষণের অনুসরণ

করিয়াই স্ব স্ব নাটকের নান্দীরচনা করিয়া গিয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবে যে কবিত্বের হানি হয়, এই ব্যাপার তাহারই অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু এস্থলে বলিতে হইবে যে, আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটক যদিও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তথাপি উহার নান্দীতে নাটকীয় উপাখ্যান ভাগের গূঢ়রূপে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(৬)

রত্নাবলীর নান্দী এবং প্রস্তাবনা যে সমীচীন কৌশলসম্পন্ন, তাহা নাগানন্দ এবং অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনাপূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে নাটকীয় প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

নাগানন্দের প্রথমেই একেবারে নায়ক জীমূতবাহনের রঙ্গস্থলে প্রবেশ; তিনি স্বীয় বয়স্য আত্রেয়কে আন্তরিক নির্ব্বেদ সহকারে এই শ্লোকটী শুনাইলেন—

রাগস্যাস্পদমিত্যবৈমি, নহি মে ধ্বংসীতি ন প্রত্যয়ঃ,
কৃত্যাকৃত্যবিচারণাসু বিমুখং কো বা ন বেত্তি ক্ষিতৌ।
এবং নিন্দ্যমপীদমীপ্সিতফলপ্রাপ্ত্যৈ ভবেদ্‌যৌবনং
ভক্ত্যা যাতি যদীত্থমেব পিতরৌ শুশ্রূষমাণস্য মে॥

যৌবন সংসারাসক্তির আস্পদ, ইহা আমি জানি, এবং ইহা যে বিধ্বংসশীল নয়, তাহাও আমার প্রত্যয় নয়, আর এই কাল যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারবিমুখ, তাহাও পৃথিবীতে কে না জানে, কিন্তু যৌবন এমন নিন্দনীয় হইয়াও যদি আমাকর্ত্তৃক পিতা মাতার শুশ্রূষায় নিয়োজিত হয়, তবে অবশ্যই ইহা অভীপ্সিত ফলপ্রাপ্তির পক্ষে অনুকূল হইবে।

তাহার পর আবার বলিলেন,—

তিষ্ঠন্‌ভাতি পিতুঃ পুরো ভুবি যথা সিংহাসনে কিন্তথা,
যৎ সংবাহয়তঃ সুখং তু চরণৌ তাতস্য কিং রাজকে।
কিং ভুক্তে ভুবনত্রয়ে ধৃতিরসৌ ভুক্তোজ্‌ঝিতে যা গুরো-
রায়াসঃ খলু রাজ্যমুজ্‌ঝিতগুরো স্তত্রাস্তি কশ্চিদ্‌গুণঃ॥

পিতার সম্মুখে ভূমিতলে দণ্ডায়মান সন্তান যেরূপ শোভা ধারণ করে; সিংহাসনে বসিয়া কি সেরূপ শোভা পায়? পিতৃচরণ সংবাহনে যেরূপ সুখানুভব হয়, রাজকার্য্যে কি সেরূপ সুখানুভব হইয়া থাকে? পিতার ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে যে তৃপ্তি, ভুবনত্রয়ভোগেও কি সেই তৃপ্তি হয়? পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া রাজ্যভোগ করা কেবল ক্লেশকর, তাহাতে কোন গুণই নাই।

নায়ক পুনরায় আপন কৃত কার্য্য সম্বন্ধে বলিলেন;—

ন্যায্যে বর্ত্মনি যোজিতাঃ প্রকৃতয়ঃ সন্তঃ সুখং স্থাপিতা
নীতো বন্ধুজনস্তথাত্মসমতাং রাজ্যে চ রক্ষা কৃতা।
দত্তো দত্তমনোরথাধিকফলঃ কল্পদ্রুমোঽপ্যর্থিনে
কিংকর্ত্তব্যমতঃপরং কথয় বা যত্তে স্থিতং চেতসি॥

আমি প্রজাসকলকে ন্যায়পথে প্রয়োজিত করিয়াছি, সাধুদিগকে সুখে রাখিয়াছি, বন্ধুবর্গকে আত্মসমতা প্রাপ্ত করিয়াছি। রাজ্যের রক্ষা করিয়াছি, অর্থী জনকে, মনোরথের অধিক ফল প্রদান করে, এমন কল্পদ্রুমও দান করিয়াছি, ইহার পর কর্ত্তব্য আর কি আছে, যাহা তোমার মনে থাকে বল।

এই শ্লোকত্রিতয়ে সংসারের অনিত্যতা, সংসারাসক্তির দোষ, গুরুশুশ্রূষার উৎকর্ষ এবং পরোপকারব্রত পালনের কর্ত্তব্যতা—এই চতুর্বিধজ্ঞানে পরিপূত একটী কিশোর-হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতবাদে প্রসিক্ত এবং আর্য্যপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সম্মার্জ্জিত হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ এই। সংসারের অনিত্যতা জ্ঞান এই ধর্ম্মবৃক্ষের মূল, ঐহিক সুখপরিহার ইহার কাণ্ড, বিধিপ্রতিপালন এবং গুরুশুশ্রূষা ইহার শাখা-পল্লব, এবং সর্ব্বপ্রাণীতে সমতা বোধ ও পরোপকার ইহার পুষ্প ও ফল।

এই ধর্ম্মে শিক্ষিত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, উদারচেতা যুবক এইরূপ সরলভাবে আপনার মূল সংস্কার সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আজি কালি বিদ্যালয় হইতে নূতন বহির্ভূত কৃতবিদ্য যুবাদিগের মুখেও তাহাদের নিজের শিক্ষিত হৃদ্‌গত সংস্কার এবং সঙ্কল্প সকল এইরূপে অনর্গল ব্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব কবি কেমন নিপুণতা সহকারে তাঁহার নবীন বয়স্ক নায়কের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

কিন্তু কবি তাঁহার রত্নাবলীতে এরূপ করেন নাই। রত্নাবলীতে নায়ক রাজা উদয়নের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ হঠাৎকারে সম্পন্ন হয় নাই। প্রস্তাবনায় সূচিত প্রবেশ সচিববর যৌগন্ধরায়ণ রঙ্গস্থলে আসিয়া প্রথমে বলিলেন,—

প্রারম্ভেঽস্মিন্ স্বামিনোবৃদ্ধিহেতৌ দৈবেনেত্থং দত্তহস্তাবলম্বে।
সিদ্ধে ভ্রান্তির্নাস্তি সত্যং, তথাপি স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাস্মি ভর্ত্তুঃ॥

স্বামীর উন্নতির নিমিত্ত এরূপ দৈবানুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সিদ্ধিসম্বন্ধে যদিও সন্দেহ নাই সত্য, তথাপি স্বেচ্ছাচারী হইয়া এরূপ করিতেছি বলিয়া প্রভুর নিকট শঙ্কিত হইতেছি।

তৎপরে, রাজা প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইয়াছেন দেখিয়া, বলিলেন।

বিশ্রান্তবিগ্রহকথো, রতিমান্, জনস্য চিত্তে বসন্, প্রিয়বসন্তক এব সাক্ষাৎ।
পর্য্যুৎসুকো নিজমহোৎসবদর্শনায় বৎসেশ্বরঃ কুসুমচাপ ইবাভ্যুপৈতি॥

নিঃশেষিত-বিগ্রহ, রতিমান্, লোকের চিত্তনিবাসী, বৎসরাজ প্রিয় সহচর বসন্তককে লইয়া যেন কুসুমায়ুধ স্বয়ং আপনার মহোৎসবদর্শনার্থ পর্য্যুৎসুক হইয়া আসিতেছেন।

ইহার পর নায়ক স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বয়স্যকে বলিয়াছেন—

রাজ্যং নির্জ্জিতশত্রু যোগ্য সচিবে ন্যস্তঃ সমস্তোভরঃ
সম্যক্ পালনলালিতাঃ প্রশমিতা শেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ।
প্রদ্যোতস্য সুতা, বসন্তসময় ত্বঞ্চেতি নাম্না ধৃতিং
কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্মন্যে মহানুৎসবঃ॥

রাজ্যের শত্রু পরাজিত হইয়াছে, উপযুক্ত মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে, প্রজাদিগের আপদ বিপদ প্রশমিত এবং তাহারা সম্যক্‌রূপে পালিত হইয়াছে, (প্রিয়তমা) প্রদ্যোতরাজকন্যা, বসন্ত সময় এবং তুমি উপস্থিত,—অতএব মদনের উৎসব নাম মাত্র প্রকৃত উৎসব আমারই।

এই তিনটী শ্লোকের প্রথমটীদ্বারা অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গের কৌতূহল প্রবল-রূপে উদ্দীপ্ত করা হইয়াছে; দ্বিতীয়টীর দ্বারা নায়কের রূপ গুণ গৌরবাদি এমনরূপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে যে, তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনার্থ দ্রষ্টৃবর্গের মনে স্বতই ঔৎসুক্য জন্মে; এবং তৃতীয় শ্লোকদ্বারা উৎসবের অবসর এবং তাহার অধিক্য প্রকটিত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করা হইয়াছে।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, নাগানন্দে যেরূপে নায়কের হঠাৎকারে রঙ্গভূমিপ্রবেশ হইয়াছে, যদিও প্রায় সেইরূপে কালিদাস শকুন্তলায় তাঁহার নায়কের প্রবেশসাধন করিয়াছেন বটে, তথাপি রত্নাবলীর প্রণালী উৎকৃষ্ট-তর বলিয়াই বোধ হয়। নায়ক নাটকের সর্ব্বপ্রধান পাত্র। যেমন প্রধান বা পূজ্য ব্যক্তির সমাগমের পূর্ব্বে কতকগুলি ব্যাপার অবশ্য অনুষ্ঠেয় সেইরূপ রঙ্গস্থলে নায়কপ্রবেশের পূর্ব্বেও তাঁহার প্রতি অভিনয়দ্রষ্টৃবর্গের ঔৎসুক্য উৎপাদন করা প্রয়োজনীয়। রত্নাবলীতে সেই প্রয়োজন সম্যক্‌-রূপে সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যৌগন্ধরায়ণের সংক্ষেপোক্তি দ্বারা কবি কি অপূর্ব্ব কৌশল সহকারে দেখাইয়াছেন যে যেমন বিশ্বসংসারের অন্তর্ভূত বিধাতৃশক্তি অপ্রকটভাবে সমস্ত কার্য্যকলাপ সাধন করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার এই নাটক-সংসারটীতেও একটী পরম চক্রীর প্রভাব অন্তর্গূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(৭)

রত্নাবলী নাটিকার গঠনপ্রণালীর সমীচীন পারিপাট্য, ইহার বিশিষ্টরূপ অভিনয়োপযোগিতা এবং ইহার 'নান্দী' এবং 'প্রস্তাবনার' উৎকর্ষ—এই সকল বিষয় উত্তরচরিত, শকুন্তলা, নাগানন্দ এবং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাট-

কের সহিত তুলনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই নাটিকার প্রথম অঙ্কের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

রাজা উদয়ন সহচর বসন্তকের সহিত প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইয়া নগরবাসীদিগের প্রবর্ত্তিত মদন মহোৎসব দেখিতেছিলেন। নগরের শোভা কিরূপ এবং নগরবাসীদিগের আমোদ প্রমোদ কিরূপ, তাহা রাজার এবং বসন্তকের কথোপকথনদ্বারা জানাইয়া কবি, ঐ মহোৎসব ব্যাপারটিকে অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গের চাক্ষুষ করাইবার নিমিত্ত রাজ্ঞীর অন্তঃপুরপরিচারিণী দুইটী দাসীর রঙ্গস্থলে অবতারণা করিলেন। ইহারা দুই জনে গান গাইতে গাইতে এবং নৃত্য করিতে করিতে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইল। ঐ দিনটী মদন মহোৎসবের দিন—ঐ দিন বে-আদবীতে দোষ হয় না—ঐ দিন অশ্লীল কথার ব্যবহার এবং কতক অশ্লীল আচরণও চলে। রাজ্ঞীর পরিচারিকারা আসিয়া রাজ সমক্ষে নৃত্য গীত করিতে লাগিল—রাজসহচর বসন্তকও উহাদের নৃত্য গীতে যোগ দিলেন—পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রূপ, হাত পাকড়াপাকড়ি চলিতে লাগিল। মদন মহোৎসব কেমন ব্যাপার তাহা আর কথায় বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন রহিল না—অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গ তাহা স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পাইলেন। সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই এই মদনমহোৎসবের অনুরূপ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার মহানবমী—পশ্চিমাঞ্চলের হোলি—প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয়দিগের মে মাসিক 'নৃত্যপর্ব্ব'—কাথলিক ইউরোপীয়দিগের রোমীয় 'কার্ণিবল'—আসামীয়দিগের 'বিহু'—ব্রহ্মদেশীয়দিগের মহাবিষুব জলসেক, চীনীয়দিগের বাসন্তিক পূজা—ইত্যাদি সকল ব্যাপারই ঐ এক-প্রকৃতিক। কেন যে দেবপূজার সহিত এবং ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানের সহিত ঐরূপ যথেচ্ছাচারব্যঞ্জক একটী উৎসব সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে—কোন্ মানব ইতিবৃত্তের অতি প্রাচীন কালের অতি প্রচলিত রীতি যে এই ব্যাপারের দ্বারা স্মারিত হইতেছে, তাহা ইতিহাসও আর স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারে না। কিন্তু উহা যে নিকৃষ্টাবস্থ মানবের পাশব ব্যবহারের চিহ্নস্বরূপ, তাহা নিঃসন্দেহ।

রাজ্ঞীর পরিচারিকারা রাজাকে বলিল যে রাজ্ঞী বাসবদত্তা অন্তঃপুরোদ্যানের অশোকবৃক্ষ মূলে মদনদেবের পূজা করিবেন, মহারাজাকে তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন। আজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াই দাসী যেন একটু 'জীব কাটিল', তাড়াতাড়ি বলিল 'প্রার্থনা করিয়াছেন'। রাজসহচর বলিয়া উঠিল 'বেটী দাসীপুত্রি! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা—মহারাজাকে 'আজ্ঞা করিয়াছেন' বলিস্! রাজা মধ্যস্থতা করিলেন—বলিলেন 'তাহাতে দোষ নাই, রাজ্ঞী আজ্ঞা করিয়াছেন বলাই ঠিক কথা;—বিশেষতঃ আজি মদন মহোৎসব, আজি ত তিনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াই পাঠাইবেন'। বেশ রসিকতা হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি ঐ "বিশেষতঃ" টুকু দ্বারা রাজা যেন আপনার সম্ভ্রমের দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহা করাতে রসিকতারও কিছু ত্রুটি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাজা উদয়নত খুব রসিক পুরুষ। তবে কবি, কি ইচ্ছা পূর্ব্বকই তাঁহার রসিকতার একটু দোষ দেখাইলেন এবং তাহা দেখাইয়া জানাইলেন যে রাজ্ঞীর প্রতি উদয়নের যে প্রেমভাব তাহা পূর্ণমাত্রায় নহে—ঐ প্রেমে একটু ভয়ের ভাগ আছে, এবং তাহা আছে বলিয়াই রাজার মনে আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিবার একটু গূঢ় ইচ্ছাও আছে। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজা উদয়নের প্রেম কতকটা ভয়-ভক্তি-মূলক হয়, তবে কবি এই প্রারম্ভেই যে প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহার সূচনা করিলেন সে কৌশল, মানবচিত্তাভিজ্ঞ কোন মহাকবির অযোগ্য বলা যায় না। সহচর বসন্তকের সহিত রাজা অন্তঃপুরোদ্যানে গমন করিলেন। দেখিলেন রাজ্ঞী আসিয়াছেন, অমনি বয়স্য বসন্তককে রাজ্ঞীর মূর্ত্তি বর্ণন করিয়া বলিলেন—

কুসুমসুকুমারমূর্ত্তির্দধতী নিয়মেস নমুতরং মধ্যং।
আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থ চাপযষ্টিরিব।

কুসুমের ন্যায় সুকোমল মূর্ত্তি দেবী উপবাসাদি দ্বারা কৃশতর মধ্য ধারণ করত মকরকেতুর পার্শ্বস্থযষ্টির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

রাজ্ঞী রাজাকে আসন প্রদান করিলেন এবং উপবেশন করাইয়া স্বীয় হস্তদ্বারা অশোক বৃক্ষ স্পর্শ পূর্ব্বক মদনদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন—

প্রত্যগ্রমজ্জনবিশেষবিবিক্তকান্তিঃ
কৌসুম্ভরাগরুচির স্ফুরদংশুকান্তা
বিভ্রাজসে মকরকেতনমর্চ্চয়ন্তী
বালপ্রবালবিটপি প্রভবা লতেব॥

নূতন মজ্জনবিশেষে প্রকাশিতকান্তি কৌসুম্ভরাগে মনোহর প্রস্ফুরিত বস্ত্রাঞ্চল ধারিণী হইয়া এই যে মকরকেতনকে অর্চ্চনা করিতেছ ইহাতে নবীন তোমাকে প্রবালবৃক্ষ-সম্ভবা লতার ন্যায় দেখাইতেছে।

স্পৃষ্টস্ত্বয়ৈষ দয়িতে স্মরপূজাব্যাপৃতেন হস্তেন।
উদ্ভিন্নাসবমৃদুতর কিসলয় ইব লক্ষ্যতেঽশোকঃ॥

প্রিয়ে, তোমার স্মরপূজাব্যাপৃত হস্তের স্পর্শলাভ করিয়া অশোক যেন একটী মৃদুতর কিসলয় ধারণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

অনঙ্গোঽয়মনঙ্গত্বমদ্য নিন্দিষ্যতি ধ্রুবং।
যদনেন ন সম্প্রাপ্তঃ পাণিস্পর্শোৎসবস্তব॥

তোমার পাণিস্পর্শের আনন্দ প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া অনঙ্গ অদ্য আপনার অনঙ্গত্বের নিন্দা করিবেন।

মদনদেবের পূজা সমাপন হইলে রাজারও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা পূজা করা হইল, এবং বৈতালিক কর্ত্তৃক রাত্রিকালের প্রবেশ বিজ্ঞাপিত হইলে রাজা রাণী সকলে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময়ে রাজা বলিলেন—

দেবিত্বন্মুখপঙ্কজেন শশিনঃ শোভাতিরস্কারিণা
পশ্যাজানি বিনির্জ্জিতানি সহসা গচ্ছন্তি বিচ্ছায়তাং।
শ্রুত্বা তে পরিবারবারবণিতা গীতানি ভৃঙ্গাঙ্গনা
লীয়ন্তে মুকুলান্তরেষু শনকৈঃ সঞ্জাতলজ্জা ইব॥

হে দেবি! চন্দ্রের শোভাতিরস্কারী তোমার মুখপঙ্কজ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া পঙ্কজ সকল সহসা ম্লানতা প্রাপ্ত হইতেছে দেখ, এবং তোমার পরিবারস্থ বারবণিতাদিগের গীত শ্রবণ করিয়া ভৃঙ্গাঙ্গনাগণ লজ্জিত হইয়াই যেন আস্তে আস্তে মুকুলান্তরে লীন হইতেছে।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, এমন সময়ে এক জন ভাবুক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে আসিলেন এবং কি লিখিতেছি শুনিতে চাহিলেন। তাঁহাকে সমুদায় পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ শ্লোকগুলির অনুবাদ মাত্র লিখিয়া দিলেই আপনার মনের কথা সমুদায় খুলিবে না। শ্লোক গুলিতে যে কেবল রসিকতা এবং পাণ্ডিত্য আছে—তেমন প্রেমানুরাগের চিহ্ন নাই—ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, প্রথম শ্লোক যদি প্রেমবিহ্বল ভাবুকের মুখনিঃসৃত হ[illegible] তবে ঐ কুসুম-সুকুমারী, ব্রতশীলা, ক্ষীণ-মধ্যা, অনঙ্গদেবের চাপ-যষ্টি রূপা, অগ্রবর্ত্তিনী নারীমূর্ত্তি যে আপনার নিজের জিনিস ভাহা কোনরূপে না কোনরূপে অবশ্যই ব্যক্ত হইত। কিন্তু ঐ শ্লোকে সে ভাবের লেশমাত্র নাই।

"মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা"—ছি! ছি! ওকি প্রকৃত প্রেমিকের কথা? 'আভাতি'—কোথায়? প্রেমিক বলিবে, তাহার নিজের হৃদয়ে—উদয়ন বলিল মকরকেতুর পার্শ্বে!

"দ্বিতীয় শ্লোকেও ঐ কাণ্ড—কেবল রূপের বর্ণন মাত্র—নিজে যে সেই রূপরাশির অধিকারী তাহার কোন চিহ্ন নাই—যদি প্রকৃত গাঢ়তম প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে কবি উদয়নের চক্ষুকে অত গাত্রমার্জ্জন এবং অঞ্চলের শোভা দেখিতে দিতেন না—ঐ প্রবাললতিকা যে অশোক বৃক্ষকে জড়ায় না, আর কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকে, এ ভাবও প্রকাশ করিতেন।

"তৃতীয় শ্লোকেও প্রায় ঐরূপ—কিন্তু কিছু ভিন্ন। রূপরাশি দেখিতে দেখিতে একটু সাত্ত্বিক ভাবের যেন আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে।

"বাসবদত্তার করপল্লব অশোক বৃক্ষের গাত্রে লাগিয়াছে—যেন অশোক হইতেই উঠিয়াছে। এতক্ষণে সাত্ত্বিকভাব দেখা দিয়াছে, এবং সেই ভাব চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

"অনঙ্গ অঙ্গহীন বলিয়া তোমার পানিস্পর্শ সুখ পাইতেছেন না—উদয়ন তাহা পাইয়া থাকেন, বুঝি এ কথাটাও মনে উঠিয়া থাকিবে—এই বারে রাজার প্রেমোচ্ছাস হইল। অতএব প্রেম যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু উহা তেমন সতেজ নয়—উস্কাইতে উস্কাইতে দেখা দেয় আবার শীঘ্রই মিড় মিড়ে হইয়া পড়ে। শীঘ্র মিড় মিড়ে হইয়া পড়ে এই জন্য বলিলাম যে, উদয়ন যখন রাত্রি সমাগম হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন—

উদয়গিরি তটান্তরিত মিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথং।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিবহৃদয়স্থিতং রমণী॥

এই পূর্ব্বদিক্ পরিপাণ্ডুমুখে উদয়গিরির তটান্তরিত নিশানাথকে রমণীর হৃদয়-গূঢ় দয়িতের ন্যায় সূচনা করিতেছে—

তখন ঐ কথাটী যে বাসবদত্তার মুখপানে চাহিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ ত বোধ হয় না। পরিণীতা ভার্য্যা বাসবদত্তার মুখ স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া হৃদয়স্থিত প্রিয়তম স্মরণ করিয়া 'পরিপাণ্ডু' হইতে পারে না। উহা প্রদীপ্ত এবং প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। হৃদয়স্থিত যে প্রিয়ার সংস্মরণে রমণীর মুখমণ্ডল 'পরিপাণ্ডু' বর্ণধারণ করে সে প্রিয় বস্তুতে রমণীর তখন অধিকার হয় নাই। পরিপাণ্ডু বর্ণ অনুভূত বিরহেরই লক্ষণ। বস্তুতঃ উদয়ন যদিও বাসবদত্তার প্রতি প্রেমিক বটেন তথাপি তাঁহার মনে যে অন্য প্রকার প্রেমেরও একটী ছবি নিহিত ছিল, কবি এই সুন্দর শ্লোকটী দ্বারা নায়কের সেই ভাব প্রদর্শন করিলেন। উদয়ন যেন মনে মনে ইচ্ছা করেন যে কোন রমণী তাঁহাকে মনের ভিতরে রাখিয়া পরিপাণ্ডু-মুখী হয়। অঙ্কের শেষ কবিতাটীতে কবি যেন পাঠকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়াই দেখাইয়াছেন যে বাসবদত্তার প্রতি

উদয়নের সাত্ত্বিক ভাবটী নিতান্তই মৃদু। রাত্রি হইয়াছে মদনপূজার পরে স্ত্রী পুরুষে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতেছেন, অথচ উদয়নের মুখে কবির সময়োচিত বর্ণনা ভিন্ন প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবের লেশও নাই। কবির যদি উদয়নের গাঢ় প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে এমন সময়ে উদয়নকে দিয়া সম্ভ্রমসূচক 'দেবি' সম্বোধন করাইতেন না—তাঁহার মুখ 'পঙ্কজের' দ্বারা শশির তিরস্কার না করাইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলরূপ নিষ্কলঙ্ক সুধাকরের দ্বারা সকলঙ্ক শশির তিরস্কার করাইতেন, এবং ভৃঙ্গের 'অঙ্গনা' বেচারাদিগকে 'লজ্জা' প্রভাবে পদ্মমুকুলের মধ্যে বিলীন না করিয়া—মধুপ বৃন্দকে সমস্ত রাত্রির জন্য পদ্মমুকুলাভ্যন্তররূপপিঞ্জরে বদ্ধ করিতেন, কিন্তু মনে যে ভাব নাই—মুখে তাহা ব্যক্ত হইবে কেন? এইরূপে না দেখিলে রত্নাবলীর কবিত্বে ত্রুটি লক্ষিত হয়—আর এই রূপে দেখিলে উহাতে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়"।

ভাবুক মহাশয়ের উক্তিগুলি আমাদিগের মনঃপূত বলিয়া পত্রস্থ করিলাম।

---

(৮)

রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজা উদয়নের প্রেম যে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধাদিমূলক, প্রগাঢ় সাত্ত্বিকরস-সংশ্লিষ্ট নহে, এবং উদয়নের হৃদয় যে অন্যবিধ প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কবি অতি নিপুণতা সহকারে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু উদয়নের এই ভাব প্রদর্শন সহকারে বাসবদত্তারও মন উদয়নের প্রতি কিরূপ, তাহাও প্রথম হইতেই দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সাধ্বী বাসবদত্তা গম্ভীর-প্রকৃতি এবং তেজস্বিনী। তিনি স্বামীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহাকে চঞ্চলস্বভাব বলিয়াও জানেন। তিনি যখন অন্তঃপুরোদ্যানে মদনদেবের পূজা করিতে আইসেন, তখন

অন্যান্য পরিচারিকার মধ্যে সাগরিকা নাম্নী একটী অতীব সুন্দরী পরিচারিকাকে পূজোপহার লইয়া আসিতে দেখিয়া মনে মনে বলেন—"এ এখানে এলো কেন?—উহাকে ত শারিকা পালনের ভার দিয়া অন্তঃপুরেই রাখিব মনে করিয়াছি—ইহাকে তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইতে দেওয়া হইবে না।" রাজ্ঞী এইরূপ ভাবিয়া সাগরিকাকে অন্তঃপুর মধ্যে যাইবার আদেশ করেন। এটি অবিশ্বাসের লক্ষণ। যে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তিনি বরং ইচ্ছা করেন যে, স্বামী অন্য সুন্দরী স্ত্রীকে দেখুন—তাহা না হইলে প্রণয়ের পরীক্ষা হয় কৈ? সৌভাগ্য গৌরব সংস্থাপিত হয় কৈ? বাসবদত্তার মন উদয়নের প্রতি সে ভাব ধারণ করে নাই—সে ভাব ধারণের কোন যো'ই ছিল না—বাসবদত্তার প্রকৃতি উদয়নের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উদয়ন তাঁহার বশ, কিন্তু তত প্রেমে নয়—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকৃতি বশতঃ কিছু ভয়ে, অনেকটা ভক্তিতে, এবং কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমে।

একবার পতি-পত্নী-প্রেমের আদর্শভূত রামসীতাকে মনে করা যাউক। কি বাল্মীকির রামায়ণে, কি ভবভূতির উত্তরচরিতে, যেখানে দেখি, রাম যখন সীতার সৌন্দর্য্য কি স্বভাবের প্রতি আপনার প্রীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, সীতা তখনি অমনি গলিয়া পড়িতেছেন। আমরা যেন কখন বিস্ফারিত—কখন মুকুলিত—সেই নয়নযুগল, সেই অবনমিত মুখপদ্ম—সেই আরক্ত গণ্ডস্থল একেবারে সম্মুখে দেখিতে পাই। কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তার দেহকে "মদনের চাপযষ্টি" তাহার হস্তটীকে "নবীন কিসলয়", তাহার রাগরঞ্জিত দেহ এবং বস্ত্রাঞ্চল "প্রবাল বিটপী" বলিয়া এই যে এত প্রশংসা করিলেন—হৃদয়স্থিত প্রিয়কে রমণীমুখ কেমন পাণ্ডু বর্ণের দ্বারা সূচিত করে, জানাইলেন, তাহার মুখপঙ্কজ দর্শনে পদ্ম সকল ম্লান হইতেছে, বলিলেন—তাহাতে বাসবদত্তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সেই খাড়া "চাপযষ্টি"—সেই দেবপূজাপরায়ণ "দেবী"ই রহিলেন। যদি চেষ্টা করিয়া তাঁহার ঐ সময়ের মুখ খানি

মনে মনে চিত্রিত করিতে যাই, তবে কি দেখিতে পাই? উজ্জ্বল গৌরকান্তি—প্রশস্ত ললাট—দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর—মুখমণ্ডলে ঈষৎ মলিনতার ছায়া—বোধ হয় ইহাই দেখিতে পাই। তাঁহার কথার মধ্যে কি শুনিতে পাই?—রাজার প্রতি "আর্য্যপুত্র! আপনার জয় হউক—এই আসনে উপবেশন করুন"—দাসীদিগের প্রতি—"পূজার পুষ্প চন্দন আনয়ন কর।" আর কোন কথাই নাই।

ফলতঃ, বড় বড় কবিরা যাহা যাহা বলেন, বা পাত্রদিগের দ্বারা বলান্ বা করান্, তদ্দ্বারা ত গ্রন্থের প্রকৃত ভাব বুঝিতেই হয়, কিন্তু যাহা তাঁহারা বলেন না, বা বলান বা করান না, তাহার দ্বারাও—অনেক বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। বাসবদত্তা যে এতই চুপ করিয়া থাকিলেন তাহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই? পূজাবসরে—অন্ততঃ পূজাবসানে, তাঁহার দুই চারিটী কথা, ন্যূনকল্পে এক আধ বার হাসি—একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত—একটু অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র,—ও সকল ত কিছু না কিছু হইবারই কথা, কিন্তু কিছুই নাই কেন? বাসবদত্তা সাধ্বী, তেজস্বিনী, উচ্চ-প্রকৃতি—তিনি উদয়নের মত শুদ্ধ কথার কথা—ভাববিহীন রসিকতা—সুখের অভাবে তাহার ভাণ মাত্র—করিতে পারেন না। এই জন্যই অত চুপ চাপ।

উদয়নের হৃদয়ে যে অন্য প্রণয়ের অবসর আছে, এবং বাসবদত্তার প্রকৃতি যে অতি উচ্চ বলিয়া উহা ভয় ভক্তির বিশেষ আস্পদ, এই দুইটী তথ্য অতি নিপুণতা সহকারে দেখাইতে দেখাইতে কবি অপর একটী প্রণয়ের ভাব উন্মুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। উদয়ন এবং বাসবদত্তার স্তিমিত-প্রায় প্রেমানুরাগের যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতর অনুরাগের চিত্র প্রদর্শিত হওয়ায় ইহা আরও বিশিষ্টরূপে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাসবদত্তা শারিকার রক্ষার্থ পরিচারিণী সাগরিকাকে অন্তঃপুরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। বাসবদত্তার প্রদত্ত আজ্ঞা যে শ্রবণমাত্র প্রতিপাল্য, তাহা সাগরিকার ব্যব-

হারেই বিদিত হয়। সে নবীনা কৌতূহলপূর্ণা হইয়া পূজা দেখিতে আসিয়াছে কিন্তু রাজ্ঞীর আজ্ঞা পাইয়া কিছুই বলিতে পারিল না। আদেশমাত্র অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল; যাইতে যাইতে ভাবিল, আমি ত শারিকার পিঞ্জর সখী সুসঙ্গতার হস্তে দিয়া আসিয়াছি, অতএব শারিকার জন্য কোন শঙ্কা নাই—একটু অন্তরালে থাকিয়া যাই। এই ভাবিয়া সে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল, এবং ক্ষণেক পরেই পূজাস্থানের সমীপে আসিয়া রাজ্ঞী যে সময়ে উদয়নকে পূজা করিতেছেন, সেই সময়ে রাজাকে দেখিতে পাইল। সে রাজ্ঞীর পূজা গ্রহণকারী উদয়নকে প্রকৃত মদনদেবই মনে করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—

কহং পেকৃখিদোজ্জেব্ব অপূর্ব্বো কুসুমাউহো অম্হাণং তাদস্স অন্তেউরে চিত্তগদো অচ্চীঅদি ইহ পচ্চক্খো লক্খীঅদি। তা অহং পি ইমেহিং কুসুমেহিং ইহট্ঠিদা জ্জেব্ব ভঅবন্তং কুসুমাউহং পূঅইসুসং। নমো দে ভঅবং কুসুমাউহ সুভদংসণো মে ভবিস্সসি। দিট্ঠং জং দট্টব্বং; অমোঘদংসণো মে ভবিস্সসি। দিট্টোবি পুণো পেকৃখিদব্বো।

অপূর্ব্ব কুসুমায়ুধকে দেখিলাম, পিতার ভবনে চিত্রে অর্চ্চনা করে, এখানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! অতএব আমিও এই সকল কুসুম দ্বারা এই খানে থাকিয়াই ভগবান কুসুমায়ুধকে পূজা করি! হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ তোমাকে নমস্কার; আমার শুভদর্শন হউক! যাহা দেখিবার তাহা দেখিলাম! আমার অমোঘদর্শন হও! আশ্চর্য্য! দৃষ্ট হইয়াও পুনঃ পুনঃ দর্শনীয়।

যখন দেবদেবীদিগের পৃথিবীতে অবতরণ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ ছিল না, সে কালে সাগরিকার এই ভ্রমটী অসম্ভব বলিয়া অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। অতি পণ্ডিতা, অধিকতর প্রৌঢ়া, হিপেসিয়া নাম্নী গ্রীক জাতীয়া একটী রমণীর কোন সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া তাহাকে আপলোদেব বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল—এরূপ বর্ণনা আছে। ইহাও বর্ণিত আছে যে ঐ ভ্রমের সহিত হিপেসিয়ার হৃদয়ে অনিবার্য্য প্রণয়বেগ

প্রবিষ্ট হয়। সাগরিকারও তাহাই হইল। সে পুনঃ পুনঃ ঐ সাক্ষাৎ কামদেব উদয়নমূর্ত্তির প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতি অন্তঃপুর গমনের নিমিত্ত রাজ্ঞীর আদেশ আছে ইহা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইতে লাগিল। এমত সময়ে বৈতালিকের উক্তি দ্বারা জানিতে পারিল যে, ঐ দেবমূর্ত্তিই রাজা উদয়ন। অমনি তাহার স্মরণ হইল, তাহার পিতা এই রাজা উদয়নেরই সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত মনন করিয়াছিলেন। তাহার আর সুখের সীমা রহিল না—সে বলিল—

কহ অঅংসো রাজা উঅঅণো ণাম। জস্স অহং তাদেণ দিণ্ণা। তা পরপ্রেসণদূষিদংবি মে সরীর এদস্স দংসণেন দাবিং বহুমদং সংবুত্তং।

কি এই সেই রাজা উদয়ন; আমি তাতকর্ত্তৃক যাঁহাতে সমর্পিত! তবে দাসত্বে দূষিত হইলেও আমার দেহ অদ্য ইহাঁর দর্শনে গৌরবান্বিত হইল।

---

(৯)

সাগরিকা বলিল "এই সেই রাজা উদয়ন, পিতা আমায় যাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন—তবে আমার শরীর পরপ্রেষণজনিত দোষে দুষ্ট হয় নাই"। সাগরিকার পিতা কে?—তিনি কখন্ কিরূপে রাজা উদয়নকে সাগরিকা সম্প্রদান করিয়াছিলেন?—যদি সাগরিকা উদয়নে সম্প্রদত্তা হইয়াছিল, তবে তাহার দাসীবৃত্তি কি জন্য হইল?।

স্বাধীনতাবস্থায় ভারতবর্ষ অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল বটে, কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র রাজ্যখণ্ডগুলির মধ্যে পরস্পর সম্মিলনের চেষ্টাও বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল। যে কোন রাজা কোন সময়ে প্রাবল্য লাভ করিতেন, তিনিই দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, অন্যান্য রাজাদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন, এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমাধান করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ বা সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করিতেন। দিগ্বিজয়ের

উপযোগী বল সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত রাজাদিগের মধ্যে বিবেচনাপূর্ব্বক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য হইয়াছিল—সুতরাং বুঝিয়া রাজাদিগের বিবাহ প্রদান করা রাজমন্ত্রীদিগের বুদ্ধিমত্তার এবং কার্য্যক্ষমতার একটী প্রধান প্রমাণ হইয়াছিল। কৌশাম্বী বা কনোজের রাজা উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সিংহলেশ্বর-দুহিতা রত্নাবলীর সহিত উদয়নের বিবাহ দেন। তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, ঐ বৈবাহিক ব্যাপার সিদ্ধ করিতে পারিলে উদয়ন বর্দ্ধিতবল হইয়া 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইতে পারিবেন। কিন্তু মন্ত্রিবরের এই অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায় ছিল। সিংহলেশ্বর জানিতেন যে, উদয়নের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়ী অবন্তী-রাজদুহিতা বাসবদত্তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অতএব নিজ কন্যাকে ভাগিনেয়ীর সপত্নী করিয়া দিতে সিংহলেশ্বর একান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। মন্ত্রিবরের অভিলাষ সিদ্ধির আরও একটী বিষম অন্তরায় ছিল। রাজ্ঞী বাসবদত্তা যেরূপ তেজস্বিনী এবং উদয়ন তাঁহার যেরূপ বশ, তাহাতে বাসবদত্তার বিনানুমতিতে অন্য ভার্য্যা পরিণয়ে সম্মত হওয়া উদয়নের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। এই সকল অন্তরায় অতিক্রম করিবার উদ্দেশে যৌগন্ধরায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী কৌশলজাল বিস্তৃত করেন। তিনি রটাইয়া দেন যে, কৌশাম্বী এবং মগধের অন্তর্বর্ত্তী লাবণক নামক প্রদেশে রাজা যখন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজ্ঞী বাসবদত্তা গৃহদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই জনপ্রবাদ সিংহলে পৌঁছিল, এবং যৌগন্ধরায়ণের প্রেরিত দূতও সিংহলে উপনীত হইয়া সিংহলেশ্বরের স্থানে বিগতভার্য্য উদয়নের নিমিত্ত তাঁহার রত্নাবলী কন্যাকে প্রার্থনা করিল। সিংহলরাজ ঐ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং আপন অমাত্যকে সমভিব্যাহারে দিয়া কন্যাকে বহিত্রযোগে প্রেরণ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের অভিসন্ধি সিদ্ধির একটী ব্যাঘাত ঘুচিল বটে, কিন্তু বাসবদত্তা এবং বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের যে ভয়, ইহাতে তাহার কোন প্রতিবিধান হইল না। উহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত অনেকটা কাজ

করিতে হইল। রত্নাবলী যে জাহাজে আসিতেছিল সে জাহাজ সমুদ্রে ডুবিল, এবং রত্নাবলী আপন সমভিব্যাহারী সকল লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকিনী মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের নিকটে সমানীতা হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে রাজ্ঞী বাসবদত্তার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন সে, কন্যাটীকে সাগরতীরে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বাসবদত্তা আপন পরিচারিকাদিগের মধ্যে স্থান দিয়া তাহার 'সাগরিকা' নাম রাখিলেন। সে কালের নিয়ম ছিল, আর অনেক দেশে একালেও নিয়ম আছে যে, সমুদ্র হইতে কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস যে পায়, তাহার সম্পত্তি হইয়া যায়। মনুষ্য হইলে দাস্যে নিযুক্ত হয়—কেহ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না—এবং জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেও না। রাজতনয়া রত্নাবলী এইরূপে—অপরিচিতা দাসী সাগরিকা।

সাগরিকা দেখিল, যে ঘরে সে রাজরাণী হইতে পারিত, সেই ঘরেই সে দাসী হইয়াছে—যে জন তাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিল, সেই এখন তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়াছে—দাসী হইয়া সেই রাজ-রাজেশ্বরকে কামনা করাও তাহার গুরুতর লজ্জার কারণ হইয়াছে। হৃদয়ে সেই লজ্জার আঘাতে প্রতিঘাত হইল, "এ পর-প্রেষণ আমার শরীরকে দূষিত করে নাই"—কিন্তু ঐ ভাব কতক্ষণ থাকে। অপার প্রেমে মোহিত 'পরবশ আত্মা', লজ্জা নিবারণের একমাত্র স্থায়ী উপায় যে মরণ তাহা হইতেও নিবারিত করে—হৃদয়বল্লভের মোহনমূর্ত্তিটী পুনঃ পুনঃ দেখিবার নিমিত্তই উত্তেজিত করে।

একবার এই সকল কথা ভাবিয়া লইতে পারিলে সাগরিকার বিরহ বেদনাটী অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত কবিরা বিরহ-বর্ণনায় পারগ লইয়া অনেকটা উৎকট এবং বিসদৃশ বর্ণন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীহর্ষের সাগরিকা বিরহ দুঃখ প্রকাশ জন্য আর কিছুই করেন না—কেবল যে আপনার তাম্বূলকে ধিক্কার দেয়, কুসুমায়ুধকে দুই একটী গালি দেয়, এবং দশনের সাথ মিটাইবে মনে করিয়া নিভৃতে উদয়নের

মোহনমূর্ত্তি চিত্রিত করে। সাগরিকা যে সময়ে একতান মনে উদয়নের ছবি আঁকিতে মগ্ন ছিল, সেই সময়ে সুসঙ্গতা নাম্নী তাহার সখী শারিকার পিঞ্জর হস্তে লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হয়—এবং সাগরিকা কর্ত্তৃক চিত্রিত উদয়নমূর্ত্তি দেখিয়া তাহা চিনিতে পারিয়া মনে মনে বলে—উপযুক্তই হইয়াছে—রাজহংসী কমলাকর ভিন্ন আর কোথায় অভিরত হইবে'। ইহার পর সুসঙ্গতা জিজ্ঞাসা করে যে, ঐ চিত্রটী কাহার? সাগরিকা বলে মদন দেবের। সুসঙ্গতা চিত্র-ফলকটী স্বহস্তে লয়, এবং কামদেবের নিকটে রতিদেবীর চিত্র না থাকিলে ভাল দেখায় না বলিয়া রাজার ছবির পার্শ্বে সাগরিকারই চিত্র আঁকিয়া দেয়। আর লুকাচুরি চলে না—সাগরিকা মনের কথা খুলিল; প্রেমিক হৃদয় উদ্ঘাটিত হইলে স্বতঃই গীতিরূপে প্রকটিত হয়—এই জন্য গুণ গুণ স্বরে গান করিল—

দুল্লহ জন অনুরাওো লজ্জাগুরুই পরবশো অপ্পা
পিঅসহি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণ বরিঅ মেক্কং।

---

(১০)

সাগরিকার বিরহ বর্ণনাটী সুন্দর,—পুরাতন হইয়াও যেন কতকটা নূতন। আর ইহাতে বিরহ ব্রতের চিরপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের অর্থাৎ পদ্মপত্রে শয়নাদি ব্যাপারের অযথা বিস্তার নাই। কাব্যনাটকাদিতে যে বিরহবর্ণনাদির আড়ম্বর হয়, তাহার একটী প্রকৃত কারণ আছে। ও সকল বর্ণনা না থাকিলে, প্রেমিক যুগলের হৃদয়ে যে প্রকৃত প্রণয়রস উদ্রিক্ত হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে না—সুতরাং সন্দিগ্ধ-চিত্ততার অবসর থাকায় অন্যোন্যের প্রতি প্রণয় গাঢ় হইবার সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যে পর্য্যন্ত করা আবশ্যক কবি তাহাই করিবেন, তাহার অধিক করিলেই সদ্রুচির ব্যাঘাত হয়। রত্নাবলীতে উদয়নের প্রতি সাগরিকার প্রেম যে অতি প্রখর, তাহা অভি-

নয় দর্শকেরা সাগরিকা কর্ত্তৃক মদনভ্রমে রাজার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ হওয়াতেই দেখিয়াছেন; উদয়ন নিজেও যে, সাগরিকার প্রেমের সম্যক্ প্রমাণ পাইবেন, কবি তাহারও বেশ যোগাড় করিয়াছেন। কিন্তু সাগরিকারও ত উদয়নের মনের গতিসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ চাই। সেরূপ প্রমাণ না পাইলে সেই লজ্জাশীলা রাজকুলবালা কেমন করিয়া আপনার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে? পদ্মপত্রে শয়নাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করাইয়া কবি, তাহারই উপায় করিয়া রাখিলেন। উদয়ন ঐ সকল বিরহোপকরণ দেখিয়া অনেক কথা বলিবেন, এবং সাগরিকা অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই সকল কথা শুনিবেন। কালিদাসের শকুন্তলাতে ইহার ঠিক বিপরীত বর্ণন দেখা যায়। সেখানে বিরহিণী শকুন্তলার পদ্মপত্রে শয়নাদি রাজা দুষ্মন্ত নিভৃতে থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন করেন।

রত্নাবলীকারের সদ্রুচির অপর বিশেষ প্রমাণ এই যে, তিনি বিরহ ব্যাপারের বর্ণনা যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক সেই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, অধিক বাড়াবাড়ি করেন নাই। যদি পদ্মপত্রে শয়নাদি কদলীগৃহের অভ্যন্তরেই অভিনীত হয়, দ্রষ্টৃবর্গের সমক্ষে না হয়, নাটিকায় এরূপ কোন নির্দ্দেশ ছিল, মনে করা যায়, তাহা হইলে রত্নাবলীকারের প্রতি কিছুমাত্র দোষ স্পর্শিতে পারে না। যাহা হউক, বিরহ ব্যাপার সংক্ষেপেই সারা হইল। রাজার অশ্বশালা হইতে একটা বৃহৎকায় বানর তাহার শিকল ছিঁড়িয়া বাহির হওয়াতে রাজবাটীতে মহা হুল স্থুল পড়িয়া গেল। কদলীগৃহের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী সখীদ্বয় ভয়ে জড় সড় হইয়া তমাল পাদপচ্ছায়ায় লুকাইলেন। বানরটা কদলীগৃহে প্রবেশ করিল—পাখীর খাঁচায় দই মাখা ভাত ছিল, তাহা খাইবার নিমিত্ত খাঁচাটা নাড়িতে চাড়িতে উহা ভাঙ্গিয়া গেল—শারিকা উড়িয়া পলাইল। সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা পাখীটা ধরিবার জন্য, সে যে দিকে উড়িয়াছিল, সেই দিকে চলিল।

রাজ্ঞীর পোষিত শারিকা উড়িয়া গেলে দাসীরা যে বিশেষ ব্যগ্র হই-

য়াই তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এ স্থলে একটু বিশেষ ব্যগ্রতার অপর কারণও ছিল। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কোন কোন পক্ষিজাতির শিক্ষায় সমধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি স্ফুট-বাক্ এবং বিলক্ষণ মেধা-শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ রাজস্থানে অনেক পোষিত শুকপক্ষীকে ঠিক মানুষের মত কথা কহিতে শুনা যায়—বাঙ্গালাতেও অনেক কাকাতুয়া, টিয়া এবং ময়না পাখী মানুষের কথার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যখন ভারতবর্ষে অন্ন ছিল, সুখ ছিল, ঘরে ঘরে পাখী পোষা এবং পাখী পড়ান ছিল—তখন যে রাজা রাজড়াদিগের গৃহে অতি সুশিক্ষিত পক্ষী সকল থাকিত, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং সে সময়ে সেইরূপ পক্ষী সকল ছিল বলিয়াই তাহাদিগের জাতি-স্মরতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে শ্লোক, আখ্যায়িকা এবং পুস্তকাদি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্বন্ধে অতি প্রচলিত একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

দম্পত্যোর্নিশিজল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ,
স্তৎপ্রাতর্গুরুসন্নিধৌ নিগদত স্তস্যোপহারং বধূঃ।
কর্ণালঙ্কৃতি-পদ্মরাগ-শকলং বিন্যস্য চঞ্চুপুটে,
ব্রীড়ার্ত্তা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্‌বন্ধনম্॥

দম্পতী রজনীতে পরস্পর যে সকল কথোপকথন করিয়াছিল, গৃহস্থিত শুকপক্ষী তাহা শুনিয়া প্রাতঃকালে গুরুজন সমক্ষে আবৃত্তি করিতে লাগিল; ইহাতে বধূ অতিশয় লজ্জাকুলা হইয়া পক্কদাড়িম্ব বীজ তুল্য আপনার কর্ণালঙ্কার পদ্মরাগ মণিখণ্ডকে উহার চঞ্চুপুটে উপহাররূপে প্রদান করিয়া কৌশলক্রমে কথা বন্ধ করিল।

বানর কর্ত্তৃক খাঁচা ভগ্ন হওয়ায় যে শারিকাটী উড়িয়া পলাইল সেটীও ঐরূপ অত্যন্ত মেধাবিনী ছিল। তাহার সমীপে কেহ কোন

কথা বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা শিখিয়া ফেলিত, এবং সেই কথার আবৃত্তি করিত। সখী সুসঙ্গতার শঙ্কা হইল যে, শারিকাটী উড়িয়া গিয়া যেখানে সেখানে, তাহার সহিত সাগরিকার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি করিবে—এই শঙ্কা প্রযুক্তই সে শারিকাটীকে ধরিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইল, এবং চিত্রফলক খানি যে কদলীগৃহে পড়িয়া রহিল, তাহার সংগ্রহের নিমিত্ত প্রথমে কোন চেষ্টাই করিল না।

কিন্তু ঐ সময়ে অপর একটী ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে রাজা এবং রাণীতে দুইটী ফুলের গাছ লইয়া একটী বাজী রাখা হয়। রাজা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নবমালিকার গাছে আগে ফুল ফুটিবে—রাণী বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মাধবীলতায় আগে ফুল ফুটিবে। রাজা কোন গুণী ব্যক্তির দ্বারা নবমালিকার মূলে এরূপ দোহদ সংযোজিত করিয়াছিলেন যে, তাহার গুণে নবমালিকা পুষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া সহচর বসন্তকের সহিত বিকসিত-পুষ্প নবমালিকাটীকে দেখিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরোদ্যানে আসিয়াছিলেন, এবং রাজ্ঞীকে তথায় আসিবার নিমিত্ত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবি এই উপলক্ষে রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার একটী সুযোগ পাইয়া তাহা ছাড়েন নাই। রাজা বসন্তককে বলিলেন—

উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচিং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা
দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাংস্ত্বরং
পশ্যন্ কোপবিপাণ্ডুরপ্রতিমুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহং॥

উদ্দামোৎকলিকা, বিপাণ্ডুরকান্তি, প্রারব্ধজৃম্ভা, অবিরল শ্বাসোদ্গমে মুহুঃ আয়াস প্রাপ্তবতী, মদনাবস্থাপন্না, অন্য নারীর ন্যায় এই উদ্যানলতাকে প্রদর্শন করিয়া আজি আমি নিশ্চয় দেবীর কোপপাণ্ডুর প্রতিমুখ করিব।

প্রিয়তমাকে এমন সকল বাজীতে হারাইয়া দিয়া তাঁহার একটু রাগাল রাগাল—সলজ্জ সলজ্জ—অভিমানের মুখখানির শোভা দেখিতে রসিক

পুরুষের ইচ্ছা হইতে পারে বটে, কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তার সে মুখ-শোভা দর্শনের লালসায় ব্যগ্র নহেন। তিনি বাসবদত্তার মুখে কোপের প্রভাবই বিস্ফুরিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। কবি, প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন, এ স্থলেও দেখাইলেন যে, উদয়ন বাসবদত্তাকে তেমন ভাল বাসিতেন না—অতএব তাঁহার মন প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারেন নাই। রাজা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া নবমালিকা দর্শনে যাইতেছেন, এমত সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটী শারিকা পড়িতেছে, শুনিতে পাইলেন শারিকা পড়িতেছে—"সখি! তুই কেন এই চিত্রফলকে আমায় চিত্রিত করিলি?" "সখি! রাগ কর কেন? তুমিও যেমন কামদবের চিত্র আঁকিয়াছ, আমিও তেমনি রতিদেবীর চিত্র আঁকিয়াছি বই ত নয়।" "সখি!—পদ্মের পাতা, মৃণালের বলয়, খুলিয়া দাও।"

"দুল্লহ জন অনুরাআো লজ্জাগুরুই পরব্বসা অপ্পা
পিঅসহি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণ বরিঅ মেক্কং।"

---

(১১)

শারিকাটি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উড়িল—রাজা লক্ষ্য করিলেন যে, সে কদলী গৃহের দিকে গেল। আপনিও সেই দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন—

দুর্ব্বারাং কুসুমশরব্যথাং বহন্ত্যা
তন্বঙ্ঙ্যা যদভিহিতং পুরং সখীনাং
তদ্ভূয়ঃ শিশু-শুক-শারিকাভিরুক্তং
ধন্যানাং শ্রবণংপথাতিথিত্বমেতি।

দুর্ব্বার মদনব্যথা বহনকরিণী কৃশাঙ্গী আপনার সখীজনদিগের সম্মুখে যাহা যাহা বলেন, তাহা শিশু, শুক, শারিকাদিগের কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হইয়া যাহাদিগের শ্রবণপথের অতিথি হয়, তাহারা ধন্য।

এই কবিতাটি অতি উপাদেয়। আর কোথাও প্রকৃত প্রণয়ের এরূপ সুন্দর অসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রদানের উপায় করা হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না। কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব এবং রুচিকর প্রমাণের আবিষ্কৃতি মাত্র এই কবিতাটির গুণ নহে। ইহাতে যে বক্তার গূঢ় প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সূচিত করিতেছে, উহাই এই কবিতাটীর বিশেষ গুণ। রাজা বলিলেন, যাহাদিগের কর্ণে সখীজনের সহিত বিরহিণীর বিশ্রম্ভ আলাপের কথা শিশু, শুক বা শারিকা কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হয়, তাহারা ধন্য। কিন্তু শুদ্ধ ঐরূপ পুনরুক্তি শুনিতে পাইলেই কি ধন্য হওয়া যায়?—কখনই নয়। যদি নিজেই তাদৃশ বিশ্রম্ভালাপের বিষয়ীভূত হওয়া যায়—তা হলেই ধন্য! কবি, এই 'ধন্য' শব্দটির প্রয়োগ করিয়া কতটা ভাবই ব্যক্ত করিলেন। তিনি পূর্ব্বে এক বার দেখাইয়াছেন যে, উদয়নের হৃদয়ে কোন বিরহিণীর প্রণয়াস্পদ হইবার নিমিত্ত একটি গূঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে, আবার এই স্থলে সেই ভাব অধিকতর স্পষ্ট করিলেন। উদয়ন ঐরূপ ধন্য পুরুষ হইতে একান্ত অভিলাষী!

রাজা শারিকার অনুসরণে বসন্তকের সহিত কদলীগৃহে প্রবেশ করিলেন—সেখানে গিয়া একটী চিত্রফলকে তাঁহারা নিজের এবং লাবণ্যময়ী একটী যুবতীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন—

লীলাবধূতপদ্মা কথয়ন্তী পক্ষপাতমধিকন্নঃ।
মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজহংসীব।

আমাদের প্রতি সমধিক পক্ষপাত প্রকাশ করত লীলাচ্ছলে পদ্ম বিকম্পিত করিয়া রাজহংসীর ন্যায় মানসে প্রবেশ করিতেছেন, চিত্রাঙ্কিতা ইনি কে?

রাজহংসী সাগরিকা উদয়নের হৃদয়পদ্ম বিকম্পিত করিয়া তাঁহার মানস সরোবরে প্রবেশ করিল। রাজা সহচর বসন্তককে ঐ চিত্রগত রূপমাধুরীর ব্যাখ্যা করিয়া অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। সে সকল

কথা, বাসবদত্তার রূপবর্ণন সম্বন্ধে যেরূপ শান্ত নির্ম্মল রসিকতাপূর্ণ বাক্যাবলী নিঃসৃত হইয়াছিল, সেরূপ নহে; এ কথা গুলি তীব্র লালসায় পরিপূর্ণ। এবারে আর সমুদয় দেহযষ্টির প্রতি সামান্য দৃষ্টি নয়—এবার, শরীরের প্রতি পর্ব্বে পর্ব্বে চক্ষুর বিলম্বিত অবস্থান—

কৃচ্ছ্রাদুরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে,
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌস্তনৌ,
সাকাঙ্ক্ষং মুহরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥

আমার দৃষ্টি ইহার উরুযুগ কষ্টে অতিক্রম করিয়া নিতম্বস্থলে অনেক ক্ষণ ভ্রমণপূর্ব্বক ত্রিবলীতরঙ্গে বিষমতা প্রাপ্ত মধ্যদেশে একবারে স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়াছিল—সম্প্রতি উন্নত পয়োধরে আরোহণপূর্ব্বক তৃষিতের ন্যায় সাকাঙ্ক্ষ ভাবে জলকণস্রাবিলোচনদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছে।

চিত্রফলকে সাগরিকার ছবিটি কেমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল? রাজা যখন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন—সাগরিকা তাঁহাকে সেই সময়েই দেখে, অতএব তাঁহাকে ক্ষত্রিয়জনোচিত গরুড়াসনোপবিষ্টরূপেই অঙ্কিত করিয়াছিল। যদি রাজার ছবির সেই ভাব হয়, তাহা হইলে রতিব্যপদেশে অঙ্কিত সাগরিকার চিত্রও ঐ চিত্রের বাম দিকে স্ত্রীজনোচিতপদ্মাসনোপবিষ্ট ভাবেই অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এই জন্য উরুযুগই প্রথম দ্রষ্টব্য হইয়াছে।

এ দিকে সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা চিত্রফলকটী সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে কদলীগৃহের নিকটে আসিল এবং রাজা ও বসন্তকের কথোপকথন শুনিয়া জানিতে পারিল যে, শারিকার মুখে ব্যক্ত হইয়া সকল কথাই রাজার কর্ণগোচর হইয়া গিয়াছে—এবং চিত্রফলকটীও রাজার হাতে পড়িয়াছে। উভয়ে অন্তরালে থাকিয়া রাজার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। যখন রাজা উল্লিখিতরূপে সাগরিকার রূপের বর্ণন করিলেন, তখন সুসঙ্গতা সাগরিকাকে বলিলেন, "সখি! শুন্‌চ ত!" সাগরিকা "উত্তম;

করিলেন, "তুমিই শোন—তোমারই আলিখিত চিত্রের বর্ণন হইতেছে!"। এই উক্তি প্রত্যুক্তির দ্বারা কবি, রাজার প্রণয় ভাবের আরও প্রমাণ দেখাইবার প্রয়োজন আছে, বুঝাইলেন। কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্তকে দিয়া বলাইয়াছেন—

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেবোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিত মুখে॥

পক্ষী পিপাসাশুষ্ককণ্ঠে অম্বু যাচ্ঞা করিল, অমনি নবমেঘপরিত্যক্ত ধারা তাহার মুখে পতিত হইল।

রত্নাবলীকার তাঁহার নায়িকাকে তত ঝট্ করে চাতকের মুখে ফেলিতে চানে না। এই জন্যই ঐ উক্তি প্রত্যুক্তি "ও ত ছবির প্রশংসা—আমার কি?" সেই "আমার কি" সন্দেহ কাটাইবার জন্য প্রথম শ্লোক—

ভাতি পতিতো লিখন্ত্যা স্তস্যা বাষ্পাম্বুশীকরকণৌঘঃ।
স্বেদোদ্গমইব করতলস্পর্শাদেষ মে বপুষি।

লিখিতে লিখিতে ইহাঁর বাষ্পবারিশীকর সমূহ আমার শরীরে পতিত হইয়া করতল সংস্পর্শজাত স্বেদোদ্গমের ন্যায় দেখাইতেছে। অতএব সামান্য ছবির ভাবে ছবি খানি দেখা হইতেছে না—ছবি হইতেই প্রকৃত ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ইহার পর যে পদ্মপত্রে সাগরিকার শয়নাদি হইয়াছিল—সেইগুলি দেখিয়া, তুলিয়া, নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া, রাজা অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন—আর প্রমাণ প্রাপ্তির পক্ষে কোন ত্রুটিই রহিল না।

সুসঙ্গতা আর স্থির থাকিতে পারিল না—সে কদলীগৃহে প্রবেশ করিল, এবং দুই চারিটী কথা কহিয়াই রাজাকে বলিল—মহারাজ! ঐ চিত্রফলকে রতিব্যপদেশে তাঁহাকে চিত্রিত করায়, সখী আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন, মহারাজ আসিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করুন!

রাজা ব্যগ্র হইয়া আসিলেন—এবং সুসঙ্গতার কথায় সাগরিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লব।
কুতোন্যথা স্রবত্যেষ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবঃ॥

ইনি শ্রী, ইহাঁর কর পারিজাতের পল্লব, নতুবা স্বেদচ্ছলে অমৃত দ্রব কোথা হইতে?

রাজা সাগরিকার যে হাত ধরিলেন—অমনি ধরিয়াই রহিলেন। কথা প্রসঙ্গে বসন্তক, দেবী বাসবদত্তার নাম করিয়া ফেলিল। অমনি রাজা হাত ছাড়িয়া দিলেন। সাগরিকা ও সুসঙ্গতা সরিয়া গেল।

বাসবদত্তা আসিলেন—রাজার সুখপূর্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন, আর নবমালিকার পুষ্পোদ্গম দেখিতে যাইবার প্রয়োজন নাই, আর্য্যপুত্রের হাসি হাসি মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, নবমালিকার পুষ্পোদ্গম হইয়াছে এই বলিয়া বাসবদত্তা আর গেলেন না। কিন্তু চিত্রফলকটি তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল; রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন' এ কি?' বসন্তক উত্তর বিলেন, আমি রাজার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। বাসবদত্তা স্ত্রী চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটিও কি বসন্তকের কারিগুরি?" রাজা বলিলেন, "এটি মনগড়া ছবি—কোন দৃষ্ট-পূর্ব্বার চিত্র নহে।" বাসবদত্তা বলিলেন—আর্য্যপুত্র! এই চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল—সুখে থাক—আমি যাই"। রাজা বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বলিলেন—

প্রসীদেতি ব্রুয়ামিদ মসতি কোপে ন ঘটতে
করিষ্যাম্যেবং নো পুনরিতি ভবেদভ্যুপগমঃ।
ন মে দোষোস্তীতি ত্বমিদ মপিচজ্ঞস্যসিমৃষা,
কিমেতস্মিন্ বক্তুং ক্ষমমিতি নবেদ্মি প্রিয়তমে॥

কোপ না হইলে প্রসন্ন হও এ কথা বলা সম্ভবে না; পুনরায় এমন কর্ম্ম করিব না, ইহা বলিলে অপরাধই স্বীকার করা হয়। আমার দোষ নাই,

এ কথাও তুমি মিথ্যা জ্ঞান করিবে, অতএব হে প্রিয়তমে, এ বিষয়ে যে কি বলিব তাহা জানি না।

বাসবদত্তা বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া লইয়া বলিলেন—

অজ্জ উত্ত! মা অন্নধা সংভাবেহি, সচ্চং এব্ব মং সীসবেঅণা বাধেদি। তা গমিসসং।

আর্য্যপুত্র! অন্যথা ভাবিবেন না, সত্যই আমাকে মস্তক বেদনা বাধা দিতেছে, অতএব যাই।

বাসবদত্তা চলিয়া গেলেন। বসন্তক বলিল, আমাদের বড় সৌভাগ্য দেবী কুপিতা হয়েন নাই। রাজা উত্তর করিলেন—তুমি দেবীর কোপানুবন্ধ নিগূঢ়রূপে লক্ষ্য কর নাই।

ভ্রূভঙ্গে সহসোদ্গতেঽপি বদনং নীতং পরাং নম্রতা
মীষন্মাং প্রতি ভেদকারি হসিতং নোক্তং বচো নিষ্ঠুরং।
অন্তর্ব্বাষ্পজড়ীকৃতং প্রভুতয়া চক্ষুর্নবিস্ফারিতং
কোপশ্চ প্রকটীকৃতো দয়িতয়া মুক্তশ্চ ন প্রশ্রয়ঃ॥

প্রিয়ার সহসা ভ্রূভঙ্গ উপস্থিত হইলেও বদন নত করিয়াছেন, আমার প্রতি ভেদকারী ঈষৎ হাস্য হাসিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই; অন্তর্ব্বাষ্প দ্বারা জড়ীভূত চক্ষুকে প্রভুতাগুণে বিস্ফারিত করেন নাই; কোপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রশ্রয় পরিত্যক্ত হয় নাই।

---

(১২)

রত্নাবলীর নাটিকায় রাজ্ঞী বাসবদত্তার চরিত্রচিত্রটী কি অপূর্ব্ব বস্তু।—রাজা তাঁহার রূপ বর্ণন করিয়া সুদীর্ঘ সালঙ্কার কবিতা সকল আবৃত্তি করেন, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ হয় না। তাঁহার আজ্ঞা পালনে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারে না, অথচ তিনি 'পরিজনবৎসলা'। রাজা নবমালিকার পুষ্পোদ্গম দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করেন;

আসিয়া, রাজার মুখ দেখিয়াই বলেন, আর নবমালিকা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তোমার হাসি হাসি মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আমার হারি হইয়াছে! রাজা অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইতেছেন বুঝিয়া, যেমন ক্রোধের উদ্রেকে ভ্রূভঙ্গ উপস্থিত হয়, অমনি আত্মদমন করিয়া মুখমণ্ডলকে বিনয়নম্র করেন, যেমন অন্তর্ব্বাষ্প উত্থিত হইয়া নেত্রদ্বয়কে সজল করিয়া আনে, অমনি আত্মসংযম বলে চখের জল চখেই শুষ্ক করেন; কটু কথা বলেন না—কেবল মাত্র 'ভেদকারী' ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া যান। এ কি অত্যদ্ভুত স্ত্রী-চিত্র! এরূপ আত্মদমনশীলা, উপেক্ষাকারিণী, অনুগ্রহপরায়ণা, পরিজন বৎসলা, যাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া পরিজনবর্গ শপথ গ্রহণ করে, মানুষী-দেবী কি কাব্য নাটকাদিতে আর দেখিতে পাওয়া যায়?

সকল কাব্য নাটকেই দেখা যায়, উৎকৃষ্টা নায়িকামাত্রেই কোমলা, সরলা, দুর্ব্বলা, মুগ্ধারূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। এত আত্মদমন, এত উপেক্ষা, এত গাম্ভীর্য্য আর কোন নায়িকায় দেখা যায় না। এই বস্তুটি কি রত্নাবলীকারের মনঃ কল্পিত, না রত্নাবলীকার তাঁহার বাসবদত্তা সংগঠনের উপাদান গ্রন্থান্তর হইতে পাইয়াছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে আরও অনেক কথা বাহির হয়—এবং তাহাতে সমগ্র নাটিকাটীরই প্রকৃতি কিছু নূতন ভাব ধারণ করে। রত্নাবলীর আখ্যায়িকা অপর একটী মূলগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। সে মূলগ্রন্থ 'বৃহৎ কথা' বা তাহারই সংক্ষিপ্তসার 'কথা সরিৎ সাগর'। যেমন রামায়ণ এবং মহাভারত, মহাবীর উত্তরচরিতাদি এবং শকুন্তলা বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটকের উপজীব্য, বৃহৎ কথাও সেইরূপ অনেক কাব্য নাটকাদির অবলম্ব। 'মুদ্রারাক্ষস' 'নাগানন্দ' এবং 'রত্নাবলীর' উপাখ্যান ভাগ বৃহৎ কথা হইতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। 'নাগানন্দে'র ত আদ্যন্ত সমুদায়ই 'কথা সরিৎসাগর' হইতে লওয়া। যদিও রত্নাবলীর সমুদায় কথা সেরূপ আনুপূর্ব্বীক্রমে ঐ

গ্রন্থ হইতে লওয়া হয় নাই, তথাপি ইহারও অনেক সার কথা, ঐ গ্রন্থের।

ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত আছে যে, রাজা উদয়ন যখন গর্ভস্থ তখন তাঁহার মাতা একটা লোহিত হ্রদ হইতে গরুড় কর্ত্তৃক আকাশ পথে উদয়গিরির শিখরদেশে সমানীতা হয়েন। উদয়ন সেই স্থানে জন্মেন। এ স্থলে কি এরূপ বোধ হয় না যে, ঐ 'লোহিত হ্রদ' সূর্য্যোদয়-কালীন প্রাচী দিক্?—উদয়নের মাতা ঊষাদেবীর প্রতিরূপ?—এবং উদয়ন নিজে সূর্য্যদেবের প্রতিরূপ স্বরূপ? সূর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত "সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ"—তিনি সকল দেবতাময়। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সকল দেবতারই স্থানীয় হইতে পারেন।

'কথা সরিৎসাগরের' ত্রয়োদশ তরঙ্গের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—

এষা বাসবদত্তা চ পত্নী তে নৈব মানুষী।
দেবীয়ং কারণবশাদবতীর্ণা ক্ষিতাবিতি॥

এই বাসবদত্তা তোমার পত্নী মানুষী নহেন, ইনি দেবী, কারণবশে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ঐ শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে যে, বাসবদত্তা কোন দেবীর প্রতিরূপ স্বরূপা। কোন্ দেবী? তাহাও অব্যক্ত নাই। একবিংশ তরঙ্গে দেখা যায়—

পুরাঽনঙ্গাঙ্গসংভূত্যৈ রত্যাস্তুতিভিরর্চ্চিতঃ।
তুষ্টো রহস্যসংক্ষেপং ইদং তস্যা শিবোভ্যধাৎ॥
অবতীর্য্য নিজাংশেন ভূমাবারাধ্য মাংস্বয়ং।
গৌরী পুত্রার্থিনী কামং জনয়িষ্যত্যসাবিতি॥
অতশ্চণ্ডমহাসেনসুতা দেবী নরেন্দ্র সা।
জাতা বাসবদত্তেয়ং সম্পন্না মহিষী চ তে॥

পূর্ব্বকালে অনঙ্গের অঙ্গসংঘটন নিমিত্ত রতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং স্তুতিদ্বারা তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে শিব এই রহস্যসংক্ষেপ বলিলেন। গৌরী

নিজ অংশে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রার্থিনীরূপে স্বয়ং আমাকে সম্যক্ আরাধনা পূর্ব্বক কামদেবকে জন্মাইবেন। অতএব হে নরেন্দ্র! সেই দেবী গৌরী চণ্ডমহাসেনসুতা বাসবদত্তা হইয়া জন্মিয়াছেন, এবং তোমার মহিষী হইয়াছেন।

তবেই জানা গেল যে, রাজ্ঞী বাসবদত্তা সাক্ষাৎ গৌরী বা আদ্যা প্রকৃতির অংশস্বরূপা। ইহাও জানা গেল যে, ইনিই কামদেব জননী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা রমণী প্রদ্যুম্ন-মাতা রুক্মিণী দেবী হইতে অভিন্না। কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকে শিব বলিতেছেন, ইনি সাক্ষাৎ আমাকে আরাধনা করিয়া কামদেবকে পুত্ররূপে পাইবেন। তাহা হইলে হরি হরের যে অভিন্নতা তাহাও এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। রত্নাবলীর নান্দীর তৃতীয় শ্লোকটীরও দুই পক্ষে—অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এবং শিবপক্ষে—সমান অর্থ হয়। ঐ শ্লোকটীর তাদৃশ বৈচিত্র্য, মূলগ্রন্থের এই হরিহরের একাত্মতা ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থে নান্দীর ঐ শ্লোকটী এই স্থলে পুনরুদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তো মদর্থে পুরা
তদ্‌যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ুং তব
তামেবানুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণ কণ্ঠগ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎসবঃ॥

পূর্ব্বকালে আমার নিমিত্ত তোমা হইতে মকরধ্বজ (হরপক্ষে কন্দর্প, হরিপক্ষে সমুদ্র) মথন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে নির্লজ্জ! আমার সম্মুখে সেই বহুমার্গগাকে (হরপক্ষে গঙ্গা, হরিপক্ষে সরস্বতী) বহন করিতেছ, ইহা কি তোমার উচিত? অতএব (হরপক্ষে)—হে কৃষ্ণকণ্ঠ! গ্রহ—আগ্রহ ত্যাগ কর। (হরিপক্ষে) হে কৃষ্ণ! কণ্ঠগ্রহ ত্যাগ কর। ভাবকুটিলা তাহাকেই অনুনয় কর; এই কথা রোষভরে (হরপক্ষে অদ্রিতনয়া এবং হরিপক্ষে লক্ষ্মী) যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে কি এই নাটিকাটী রূপক বর্ণনা। আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। রত্নাবলী কখনই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিনয়াকারে প্রদর্শন নহে। কিন্তু ঠিক তেমন না হইলেও যখন ইহার মূলগ্রন্থে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই দেবতারূপে অভিব্যক্তি আছে, তখন এই নাটিকার উপরেও যে দৈব ভাবের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়; বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, রত্নাবলীকার শ্লিষ্ট পদ ব্যবহারে বিশেষ সমুৎসুক, এবং দ্ব্যর্থ ঘটাইয়া লিখিতে বিলক্ষণ নিপুণ, তখন নাটিকাটীর আপাতদৃষ্ট তাৎপর্য্যের অভ্যন্তরে তিনি আর একটী গূঢ় তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এরূপ অনুমান তাঁহার সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। যদি কোন গূঢ় দৈব ভাব রত্নাবলীতে থাকে, তবে সে কি ভাব হইবে? নায়ক 'উদয়ন' 'পুরুষোত্তমের' প্রতিরূপ হইলে, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে সম্মিলিত হইবেন, কারণ পুরাণ-শাস্ত্রে বলে—

লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি।
প্রেমাসমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ॥

লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা (দেবী গৌরীর স্থানীয়া) শ্রীহরির এই তিন ভার্য্যা, প্রেমে সমানা, সর্ব্বদা হরি-সমীপে থাকেন।

প্রথমা স্ত্রী যদি 'গৌরীর' প্রতিরূপা হয়েন, তবে অপর দুই জনের মধ্যে একজন অবশ্যই 'সরস্বতী' এবং একজন অবশ্যই 'লক্ষ্মী' হইবেন।

রত্নাবলীতে উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর নাম নির্দ্দেশ নাই—কিন্তু 'প্রদ্যোতসুতা' বলিয়া প্রথমাঙ্কের প্রারম্ভেই তাঁহার উল্লেখ আছে। 'প্রদ্যোত' শব্দের অর্থ 'অগ্নি' এবং 'ব্রহ্মনন্দিনী' বাণীকে অগ্নির কন্যাও বলিয়া থাকে। মূলগ্রন্থ বৃহৎ কথায় উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর নাম আছে। উহা 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী' বিশেষরূপে দেবী লক্ষ্মীরই নামান্তর, তবে উহা দেবী সরস্বতীরও নামান্তর না হইতে পারে, এমত নহে। কিন্তু

রত্নাবলীকার 'পদ্মাবতী' নামের উল্লেখ না করাতে, এবং প্রদ্যোতসুতা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করাতে তাঁহাকে 'সরস্বতীর' প্রতিরূপস্বরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করাই যেন তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

যদি তেমন অভিপ্রায় হয়, তবে তৃতীয়া রাজ্ঞী অবশ্যই লক্ষ্মীদেবীর প্রতিরূপস্বরূপা হইবেন। রত্নাবলীই সেই তৃতীয়া রাজ্ঞী। লক্ষ্মীদেবী সমস্ত রত্নরাজির অধিষ্ঠাত্রী—ইনিও রত্নাবলী। লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানে উল্লেখ আছে, "মুক্তাহারবিরাজমানপৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাষিণী"—পৃথুল উত্তুঙ্গস্তনদ্বয় মুক্তাহারদ্বারা উদ্ভাষিত, রত্নাবলীরও একটী অপূর্ব্ব রত্নমালা ছিল। লক্ষ্মীদেবীর নামান্তর সাগরসম্ভবা—ইহাঁরও একটী নাম সাগরিকা। লক্ষ্মীদেবী বরুণ দেবের কন্যা যথা,—

"তদা লক্ষ্মীশ্চ কলয়া পুরা নারায়ণাজ্ঞয়া।
বভূব সিন্ধুকন্যা সা শক্রসম্পৎস্বরূপিণী"॥

পূর্ব্বকালে নারায়ণের আজ্ঞায় ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী নিজাংশে সিন্ধুকন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বরুণদেবের একটী নাম 'মহাবাহু' যথা—

বরুণোধবলোজিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহু স্তস্মৈনিত্যং নমোনমঃ॥

রত্নাবলীরও পিতার নাম 'বিক্রমবাহু'। যখন এতগুলি মিল পাওয়া যায়—তখন নাটিকার মধ্যে সাগরিকার সম্বন্ধে "শ্রীরেষা" ইনি 'লক্ষ্মী' বলিয়া রাজার যে উক্তি আছে সে উক্তিটী যেমন সৌন্দর্য্যপ্রশংসাপর তেমনি স্বরূপাখ্যান বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সেই শ্লোকেই আছে, "পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ" ইহাঁর হস্তও পারিজাতের পল্লব—লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানেও দৃষ্ট হয়, "কাঙ্ক্ষিতপারিজাত লতিকাং" ইনি কাঙ্ক্ষিত পারিজাতলতিকা। আর একটী শ্লোকে যে, 'লীলাবধূতপদ্মা' ক্রীড়ায় পদ্ম বিকম্পিত করিয়া, এই শ্লিষ্ট পদটী আছে তাহার অভ্যন্তরে দেবী লক্ষ্মীর হস্তস্থিত 'লীলাকমলের' উল্লেখ থাকিতে পারে, কারণ 'পদ্মবারিণী' লক্ষ্মীদেবীর দ্বাদশ নামের মধ্যে একটী নাম। রাজা রত্না-

বলীকে পত্নীরূপে পাইয়া বলিলেন, "সসাগরমহীপ্রাপ্ত্যেকহেতুঃ প্রিয়া" প্রিয়াই সসাগরা মহীপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু। শাস্ত্রেও বলে সমস্ত 'বসুন্ধরা' লক্ষ্মীর আবাস।

আর্য্য কবিরা শুদ্ধ মানুষ ভাব বর্ণন করিতে তত ভাল বাসিতেন না। তাঁহাদিগের চক্ষে বাহ্য জগৎ অন্তর্জগতের প্রতিবিম্বরূপেই প্রতিভাত হইত। যে বাহ্য ব্যাপারে তাঁহাদিগের মনোনিবেশ হইত, তাহাই যেন সামান্য বাহ্যমূর্ত্তি পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক আলোকে রঞ্জিত, এবং পরিশেষে দেবলীলায় পর্য্যবসিত হইত।

বিবিধ প্রবন্ধ।

মৃচ্ছকটিক।

(১)

সংস্কৃতে যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখানি সর্ব্বাপেক্ষায় অতি প্রাচীন। এই নাটক সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্বতন কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহার প্রণেতা এক জন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম বলা হইয়াছে শূদ্রক। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের কোন্ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই। কাহার কাহার মতে তিনি মগধদেশের অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, আবার কাহার মতে তিনি অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিচারেও শূদ্রক রাজার প্রাদুর্ভাবের সময় সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন, ঐ সময় খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, কেহ বলেন দুই শত বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন ছয় শত বৎসর পরে।

কিন্তু ঐ সকল কল্পনাপূর্ণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের কোন প্রয়োজন এবং কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যতই গবেষণা করুন, তাহার গবেষণার মূল একটী কথা মাত্র। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে আসিয়াছিলেন। সেই রাজ-

তের প্রণীত গ্রন্থ আছে এবং উহা কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল তাহা
না আছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময়ও তদ্দ্বারা জানা হইয়াছে। এই
ক মাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমুদায় ঐতিহাসিক
বরণের সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার
ষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপায়
থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং
কৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেরূপ গলদ্‌গোময়
য়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়।

কিন্তু যিনিই যাহা বলুন, মৃচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্প দিনের বস্তু
। উহা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরবর্ত্তী ত বটেই, রাজা চন্দ্রগুপ্তেরও
পরবর্ত্তী। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনরূপেই প্রমাণিত
তবে এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে যে, মৃচ্ছ-
র্য্যক" নামক পুরুষটী যিশুখৃষ্টের ছায়া হইতে প্রাপ্ত। যদি
কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত, তাহা হইলে বিচার করা যাইত।
ঐতিহাসিক বিবরণ অথবা গ্রন্থাদি প্রণয়নের কাল নির্ণয়
মিলাইতে গেলেই অধিক গোলযোগ হইয়া পড়ে। আভ্যন্ত-
লইয়া তাহাদিগের পূর্ব্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে ততটা

ত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রচনা এত সরল। ইহার
পারিপাট্যের জন্য যত্নের আধিক্য নাই, এবং বর্ণিত বিষয়টী
ক ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত অধিক
।

ভাষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই যে,
ক নাটক রচনা-কৌশল-শূন্য তাহা নহে। একটু নিপুণ হইয়া
ই, উহাতে গূঢ় রচনাকৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অথচ সেই রচনাকৌশল এমন অতি সহজ ভাবে আসিয়াছে যে, একবার কৌশল বলিয়া মনে হয় না।

নাটকটীর নান্দীভাগ লইয়াই দেখ। নান্দীতে দুইটী শ্লোক আছে তাহার প্রথমটীতে দেবাদিদেব মহাদেবের পর্য্যঙ্কবন্ধ ভুজগবেষ্টনে দৃঢ়ীকৃ তাঁহার ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ, আত্মমাত্র সাক্ষাৎকার, এবং স্থিরশূন্য বর্ণিত [১]; দ্বিতীয় শ্লোকটীতে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের ঘোর শ্যাম কণ্ঠে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জ্বল গৌর ভুজ-লতার অব বর্ণিত [২]; প্রথম শ্লোকে মহাদেব শ্মশানবাসী, ধ্যান নিমগ্ন, সমাধি জগৎ শূন্য, সংসার শূন্য। দ্বিতীয় শ্লোকে হরগৌরীরূপ একত্রে সম্মি জগৎ পূর্ণ, সংসার জাজ্বল্যমান। সমুদায় নাটকটীতেই ঐ দুই এক কথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্ব্ব-শূন্যত্ব; দ্বিতীয় কথা হার প্রেমিকা প্রেয়সীর লাভ, এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক সু অতএব মৃচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায় নাটকটীর হইয়া আছে। উৎকৃষ্ট রচয়িতাদিগের লক্ষণই এই যে, তাঁহা লেখেন তৎসমুদায় পরস্পর দৃঢ়সম্বন্ধ এবং সকল কথাতেই অনুকূলতা সাধিত হয়।

নান্দীর পরে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনাটীও বিলক্ষণ কৌ ধনার আরম্ভে নাটকরচয়িতার পরিচয়। রচয়িতার পরি রীতি প্রায় সকল নাটকেই প্রচলিত আছে। পরি ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন

---

[১] পর্য্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধ-দ্বিগুণিতভুজগাশ্লেষসংবীত জানো
রন্তঃ প্রাণাবরোধব্যুপরত-সকল-জ্ঞান-রুদ্ধেন্দ্রিয়স্য;
আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগতকরণং পশ্যতস্তত্ত্ব দৃষ্ট্যা
শম্ভোর্ব্বঃপাতু শূন্যেক্ষণঘটিত-লয়-ব্রহ্মলগ্নঃ সমাধিঃ॥

[২] পাতুবো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠশ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥

াগ, নাটক-রচয়িতা স্বয়ং লেখেন না, তাঁহার শিষ্যাদি কেহ লিখিয়া । এরূপ অনুমান যে অমূলক, তাহা ঐ পরিচয় ভাগের রচনা প্রণালীর ত অপরাপর ভাগের রচনা প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধ হয়। কটিকের ঐ পরিচয় ভাগে বলা হইল রচয়িতার নাম শূদ্রক, তিনি , এবং দ্বিজমুখ্যতম, ঋগ্‌বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের , এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ; তিনি শত বর্ষ এবং দশ আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্যদানপূর্ব্বক চিতারোহণে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রন্থরচয়িতার এবম্ভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনে বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন ্যসনী ক্ষিতিপাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্মণ। ইহাঁকে লা হইল, অথচ কোথাকার রাজা এবং থাকিতেন কোথায়, লা হইল না। এমন স্থলে যদি মনে করা যায় যে, গ্রন্থকারের কি নামটাই কল্পিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্ট কল্পনা ? আর্য্য গ্রন্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশতঃ আপনাদিগের নাম হারপূর্ব্বক একমাত্র লোকোপকার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি রচনা করিতে ন—নাম বাহির করিতে না পারিলে তাঁহাদের বুক ফাটিত না। াড়া আর একটা কথা আছে। আমাদিগের কোন গ্রন্থকার বর্ণন করিব এরূপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত । মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাহা করিয়াছেন (৩)। তিনি বলি-

---

৩] অবন্তি পুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য,
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।
তয়োরিদং সংসুরতোৎসবা শ্রয়ং,
নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাং।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা,
চকার সর্ব্বং কিল শূদ্রকোনৃপঃ॥

য়াছেন তাৎকালিক "নয় প্রচার" "ব্যবহার দুষ্টতা" "খল স্বভাব" "ত
তব্যতা" প্রভৃতি সমুদায় বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মৃচ্ছক
রচনা করিয়াছেন। সমাজ বর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকর্ত্তৃগণ প্রায়ই স্ব স্ব
গোপন করিয়া থাকেন। অতএব কোন নাটক রচয়িতা সমাজের
ত্তমভাগ যে শূদ্র জাতি তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহপূ
আপনাকেই ক্ষত্রিয় গুণ এবং ব্রাহ্মণ গুণ সমন্বিত এবং সমুদায়
জের প্রতিরূপ স্বরূপ দেশ সাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণন পূর্ব্বক
পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও করা য
পারে। গ্রন্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও সম্মুখে খ্যাপন করিতে পা
ছেন তাহার তাৎপর্য্যও উল্লিখিত কল্পনার অবলম্বনে কিছু বিশদ
পারে। শাস্ত্রে বলে মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল শত বর্ষ; অতএব ম
য়াইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের বয়স এক শ
আর মৃত্যুর পর দশ দিন যে অশৌচকাল সে পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির গ
গতি নাই—এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি; এই জন্য এক এক
প্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই এক শত দ
পর দ্বিতীয় সমাজপ্রতিরূপ পূর্ব্বগত সমাজ প্রতিরূপের পুত্র স্বরূ
ভূত হয়। এই জন্য মৃচ্ছকটিক রচয়িতা—

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং
"লব্ধায়ুঃ শতাব্দং দশ দিন সহিতং
শূদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

---

(২)

মৃচ্ছকটিক রচয়িতা নান্দীর দুইটী শ্লোকে অভিনেয় বস্তুর সম
নিহিত করিয়া এবং প্রস্তাবনার প্রারম্ভে আপনি যে সমাজের
স্বরূপ হইয়াই তাহার একটী আদর্শ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে উদ্য
য়াছেন, যেন এইরূপ আভাস প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের এবং

কৌতূহল উদ্দীপনপূর্ব্বক একটী গীতির সহিত প্রস্তাবনার দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গানটী এই—

শূন্যমপুত্রস্য গৃহং,
চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রং।
মূর্খস্য দিশঃ শূন্যাঃ,
সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য॥

অপুত্রের গৃহ শূন্য, সন্মিত্র বিহীনের চিরশূন্য, মূর্খের দিক্ শূন্য; দরিদ্রের সকলই শূন্য।

নান্দীতে "শূন্যেক্ষণ" শব্দের প্রয়োগে যে বীজ নিহিত হইয়াছে, উল্লিখিত গানটীতে তাহার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইল। "সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই কথাই নাটকের সকল কথার ধূয়া হইয়া রহিল, এবং নায়কের সর্ব্বশূন্যতা কি প্রকার বিশিষ্টরূপ তাহারও পরিচায়ক হইল। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত, তাঁহার "নিজ রূপ গুণের অনুরূপ" রোহসেন নামক পুত্র আছে, তাঁহার "সর্ব্বকাল মিত্র" মৈত্রেয় নামক একজন সুহৃদও আছেন, এবং তাঁহার গৃহ মধ্যে "পুস্তক সকল" থাকায় এবং অন্যান্য প্রকারেও তাঁহার বিদ্যাবত্তা সূচিত হইয়া আছে—তাঁহার নাই কেবল ধন, এবং ধন না থাকায় ঐ সকল থাকিতেও তাঁহার 'সকল শূন্য', —"সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রস্য"।

সমাজ চিত্রণে যে দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রণ অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতি বিপুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং কোন বস্তুর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তুরই হইতে পারে না।

কিন্তু দারিদ্র্যাবস্থা যদিও দয়াবৃত্তির উত্তেজিকা হয় বটে, তথাপি সকল স্থলে কবিসময়োচিত হইয়া উঠে না। যে দারিদ্র্য দশা পুরুষপরম্পরাক্রমে ভোগ হইয়া আইসে, যে দারিদ্র্যের প্রভাবে ধর্ম্মজ্ঞানের হিতাহিত বোধের স্ফূরণ হইতে পায় না, যে দারিদ্র্যযন্ত্রণা নিরন্তর সহ্য

করিতে করিতে শরীর এবং মন কঠিন হইয়া উঠে, দুঃখানুভূতিই যেন ন্যূন হইয়া পড়ে, মানুষ পশুবৎ হইয়া যায়—সেরূপ দারিদ্র্য দশার প্রকৃত বর্ণনায় মনুষ্য হৃদয়ের বিকাশ অতি অল্প হইয়া থাকে, এবং সহানুভূতির আকর্ষণও অধিক হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যা, বিনয়, শীল, আভিজাত্য, দাতৃত্ব, পরোপকারিতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পন্ন কোন গৃহস্থের দারিদ্র্যদশা ঘটিলে, তিনি প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করেন, এবং সেই যন্ত্রণা কখন কিরূপে অনুভূত হয়, তাহাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন।

এই জন্য উচ্চ দ্বিজকুলসম্ভূত, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্র, প্রাসাদবাসী, পরমাতিথেয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধক, সাধারণের হিতার্থে সুবহু সরোবর, দেবভবন, উদ্যানাদির নির্ম্মাণ কর্ত্তা, এবং এবম্বিধ দানশৌণ্ডতা নিবন্ধন স্বয়ং বিত্তবিহীন এবং দুর্গত যে চারুদত্ত, তিনিই দারিদ্র্যাবস্থার কাব্যোচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া সমাজচিত্র করণে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক রচয়িতার নাটকের নায়করূপে উপকল্পিত। এই জন্যই বোধ হয় উক্ত চারুদত্তের মুখ দিয়াই কবি একস্থলে উল্লিখিত ভাবটী এইরূপে ব্যক্ত করাইয়াছেন, যথা—

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে।
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
"সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং।
স জীবদীপান্মরণান্ধমাপ্নুতে॥

দুঃখভোগপূর্ব্বক যে সুখ তাহা গভীর অন্ধকারে দীপদর্শন স্বরূপ। সেই রূপ সুখের অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি দুঃখের অবস্থায় পড়ে, সে জীবনের আলোক হইতে মৃত্যুরূপ অন্ধকারে পতিত হয়।

বনং গন্তুং বুদ্ধির্ভবতি চ কলত্রাৎ পরিভবো,
হৃদিস্থঃ শোকাগ্নির্ন চ দহতি সন্তাপয়তি চ॥

দারিদ্র্য চিন্তার আস্পদ, দারিদ্র্য হইতে পর কর্ত্তৃক পরিভব প্রাপ্ত হইতে হয়। লোকে শত্রুতা করে, মিত্র ব্যক্তিরাও ঘৃণা করে, দরিদ্রতা হেতু আত্মীয় বন্ধুরাও বিদ্বেষ করিয়া থাকে, বনে যাইতে মতি হয়, ভার্য্যাও তিরস্কার করে। হৃদয়স্থ শোকাগ্নি ভস্ম করে না, কিন্তু পোড়াইতে থাকে।

উল্লিখিত কয়টী কবিতাতে আর্য্য নায়কের মনে দারিদ্র্যাবস্থায় যে সকল দুঃখ অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই বলা হইল—অনার্য্যের অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদির মনে স্বতঃই যে প্রথম এবং প্রবল অনুভব হয়, সে কথার নামগন্ধও এখানে নাই। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে আপনি খাবে কি, এই প্রথম চিন্তা, তাহার পর স্ত্রী পুত্র খাবে কি, এই দ্বিতীয় চিন্তা; তাহার পর আপনাদের ভাল খাওয়া ভাল পরা ভাল থাকার কি হইবে, এই চিন্তা—কিন্তু আর্য্যনায়কচারুদত্তের ও সকল চিন্তা নাই। অতিথি আইসে না, সুহৃজ্জনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, লজ্জা, নিস্তেজস্বিতা, পরিভব, নির্ব্বেদ, শোক, বুদ্ধিভ্রষ্টতা প্রভৃতি দোষ দারিদ্র্য হইতে জন্মে, এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনে অতি বলবতী।

কবি এইরূপ আপন নায়ককে প্রথম হইতেই উদাত্ত গুণে বিভূষিত করিয়া তাহার পর তাঁহাকে অতি বিস্পষ্ট আর একটী মুদ্রাঙ্কে মুদ্রিত করিয়া তাঁহার আর্য্য ভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার বয়স্য মৈত্রেয় বলিলেন —"দেবতাদিগের এরূপ পূজা করিয়াও যখন তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন নাই, তখন আর তাঁহাদের পূজার গুণ কি?" চারুদত্ত এই কথার উত্তরে বলিলেন,—

মা মৈবং, গৃহস্থস্য নিত্যোয়ং বিধিঃ।
তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্ম্মভিঃ।
তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ॥

তা নয়, গৃহস্থের এই নিত্য বিধি। তপস্যা, মন, বাক্য এবং বলি দ্বারা পূজিত হইয়া দেবতারা শান্তিমান ব্যক্তিদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই।

এই আর্য্য—এই প্রকৃত হিন্দু। পৃথিবীর অপর কোন নরকুলে আর এরূপ বিশুদ্ধ আচরণ শিক্ষিত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মে রত হয়, ধর্ম্ম-ফলাভিসন্ধিতে। হিন্দু বিনা ফলাভিসন্ধিতেই ধর্ম্মাচরণে শিক্ষিত। তিনি বিধি প্রতিপালনেরই কর্ত্তব্যতা জানেন। বিধি প্রতিপালন নিবন্ধন যে সুখপ্রাপ্তিরূপ শুভ ফল হইবে, তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে তিনি ভূয়োভূয়ঃ নিষিদ্ধ হইয়াছেন। চারুদত্তের চরিত্র এইরূপ শাস্ত্রশিক্ষার ফল।

---

(৪)

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দরিদ্র দশায় পতিত এবং আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা গুণে সর্ব্বতোভাবে উদার-চেতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ইহা প্রদর্শিত হইলে রঙ্গভূমিতে নায়িকা বসন্তসেনার অবতরণ আরম্ভ হইল। এই নায়িকার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। সেই বৈচিত্র্যটী সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে সমাজ চিত্রই পরিষ্কাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়; এবং তাহা হয় বলিয়াই সমাজ চিত্রাঙ্কনে কৃতসংকল্প মৃচ্ছকটিক-রচয়িতার তাদৃশ নায়িকা লইয়াই নাটক রচনা।

বসন্তসেনা একটী গণিকা। সে বহুল ধনশালিনী। তাহার বাটী আট মহল। সে বাটীর তোরণ-দ্বার অতি উচ্চ। বাটীর ভিতরে কত পুষ্পোদ্যান, দীর্ঘিকা, কত রত্নবেদী, কত রত্ন-স্তম্ভ, কত গোরু, হাতী, ঘোড়া, কত লোক জন, কত কত দাস দাসী, কত পড়ুয়া পণ্ডিত, কত গান বাদ্য, কত রঙ্গ রস। তাহার বাটীর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শিল্প-নৈপুণ্যের, কলাবিদ্যানুশীলনের, এবং বিভব-শালিতার বিলক্ষণ আতিশয্য অনুভূত হয়। বসন্তসেনা যে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন, সেই নগরের

সর্ব্বপ্রধান শোভা বলিয়াই নাগরিকেরা তাঁহার উল্লেখ করিত। তিনি যেমন ধনবতী তেমনি মাননীয়াও ছিলেন।

গণিকার এরূপ গৌরব এবং সমাদর বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গ্রীকদিগের, রোমীয়দিগের এবং মিশরীয়দিগের মধ্যে অতি গৌরবান্বিতা এবং গুণান্বিতা গণিকাসকল ছিল, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এথেন্স নগরীর একটী গণিকার গৃহ হইতেই সর্ব্ব-প্রধান রাজকার্য্যাদির মন্ত্রণা সকল বাহির হইত, আর একটী গণিকার গৃহে দার্শনিকপ্রবরেরা স্বয়ং গমন করিয়া তাহাদিগকে কলাবিদ্যাসকল শিক্ষা করাইতেন। কিন্তু শুদ্ধ পূর্ব্বকালেই যে ঐরূপ হইত, তাহা নহে। সকল কালেই এবং সকল দেশেই ঐরূপ বিবরণ কতকটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন দার্শনিক তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকাগার এক জন গণিকার দান হইতে পাইলেন, কোন কবি এক জন গণিকার কৃপালাভে ধনাঢ্য হইয়া উঠিলেন, কোন রাজ নীতিবিশারদ এক জন গণিকার প্রিয়পাত্র হওয়াতেই কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় বহুবিধকুটিল রাজমন্ত্রণা উদ্ভেদ করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলেন, নব্য ইউরোপীয় ইতিহাসেও এইরূপ কথার অভাব নাই।

তবে যে সামাজিক নিয়মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব বশতঃ ভারতবাসী-দিগের সর্ব্ব বিষয়েই একটী বিশিষ্টতা জন্মিয়া আছে, মৃচ্ছকটিকের গণিকা নায়িকার প্রকৃতি বিচারেও সেই বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। ভারতবর্ষীয় সমাজে বর্ণভেদ প্রথার যেন একটী ছাঁচ জন্মিয়া গিয়াছে। এখানকার সকল ব্যবসায় ঐ ছাঁচে ঢালা হইয়া গঠিত হয়। এখানকার গণিকার ব্যবসায়ও একটা জাতি ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য। কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, কোন গণিকার কন্যা যদি মাতৃব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তবে রাজদ্বারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারিত। মৃচ্ছকটিকের নায়িকা বসন্তসেনা ঐরূপ "কনেলী মাতা" (অর্থাৎ অনূঢ়াগর্ভজাত) এবং মাতৃব্যবসায়াবলম্বনে একান্ত

অনিচ্ছাবতী। তাদৃশ অনিচ্ছার প্রতিকারণ—নায়ক চারুদত্তের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বসন্তসেনা সেই অনুরাগের বশীভূতা হইয়া সখীজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ সময়ে ঐ চারুদত্তের কথাই কহে। স্বয়ং একাকিনী বসিয়া চারুদত্তের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির প্রতি নিরীক্ষণ করে। ঐ চিত্রলিপিখানি আপনার শয্যার উপর রাখিতে বলে, অনুক্ষণ চারুদত্তের প্রতি তন্মনস্ক ভাবে থাকে, চারুদত্তের ব্যবহৃত কোন বস্ত্র হস্তগত হইলে তাহা আপনার অঙ্গাবরণ করিয়া কৃতার্থ হয়, দূর হইতেও চারুদত্তকে দেখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হয়, চারুদত্তের শরীরসেবক কোন ভৃত্যের দর্শন পাইলেও তাহার সমূহ সমাদর এবং গৌরব করে, এবং মাতা কর্ত্তৃক পুরুষান্তর গ্রহণে আদিষ্ট হইলে বলে—"জই মং জীঅংতীং ইচ্ছসি তা এব্বং ন পুণের অহং অজ্জাত্ত অণবি দব্বা" (অর্থাৎ যদি আমাকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে মাতা কর্ত্তৃক যেন আর এরূপে অনুজ্ঞাতা না হই)।

গণিকা জাতীয়া এবং এরূপ অনুরাগসম্পন্না বসন্তসেনা দেখিতে কেমন ছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। তিনি যে বিশিষ্টরূপেই সৌন্দর্য্যসম্পন্না যুবতী, তাহা "বসন্তশোভেব" "দেবতোপস্থানযোগ্যা" ইত্যাদি বিশেষণ পদের দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে। তবে একটী কথা এই—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং খাঁটি শূদ্র অপেক্ষা নানা প্রকার সংমিশ্র বর্ণের লোকই অধিক এবং সেই মিশ্র বর্ণের লোকদিগের মধ্যে শূদ্র বা অনার্য্য সম্বন্ধই অধিক। অতএব সম্ভবতঃ পূর্ব্ব কালের গণিকাজাতীয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনার্য্যশোণিত সম্বন্ধ ছিল। কবি যেন সেই কথাই কতকটা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয়। এক জন দাস (সুতরাং শূদ্র-জাতীয় ব্যক্তি) বসন্তসেনাকে অত্তিকা (অর্থাৎ দিদি) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বসন্তসেনা উচ্চজাতীয়া হইলে তাঁহার প্রতি দাসের ঐরূপ সম্বোধন কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না। অপর এক স্থলে এক জন বসন্ত-

সেনাকে গালি দিয়া "নীনাসা" (নিম্ননাসা) বলিতেছে। "নিম্ন নাসা" বিশুদ্ধ আর্য্য স্ত্রী পুরুষের লক্ষণ নয়—যেখানে নিম্ন নাসা দেখা যায়—সেই স্থলেই অনার্য্য শোণিতের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। অপর এক স্থলে বসন্তসেনাকে গাঢ়ান্ধকারে হারাইয়া বলা হইতেছে মসীরাশি মধ্যে যেন "অঞ্জি গুড়িয়া" (অঞ্জন গুটিকা) হারাইয়া গেল। এই কথায় বসন্তসেনার বর্ণটা গৌর না হইয়া কিছু কাল বলিয়াই বোধ হয়। কৃষ্ণবর্ণতাও অনার্য্য সংস্রবের স্পষ্ট লক্ষণ! অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বসন্তসেনা "বিশাললোচনা" শ্যামাঙ্গী সুন্দরী।

বসন্তসেনা যে সমস্ত কলাবিদ্যায় বিদ্যাবতী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি? তাঁহার স্বর-বৈচিত্রীকরণ ক্ষমতা, পদবিন্যাসাদির লঘুতা, সর্ব্বকার্য্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশিষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়া তাঁহার বাটী যে, সমস্ত কলাবিদ্যার আগারস্বরূপ, তাহা স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা অন্যান্য সংস্কৃত নাটকাদির অত্যুৎকৃষ্ট নায়িকাদিগের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। তবে তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতা কিরূপ ছিল, তাহা কবি একটু বিশেষ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বড় পরিষ্কাররূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন। বসন্তসেনা কদাপি উচ্চ শ্রেণীর পাত্রদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে যান না। তিনি কলাবিদ্যার শিক্ষাদাতা বিটের সহিত সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, আর বিদূষককেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হয় তাহা সংস্কৃতে বলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বগত উক্তি গুলিও প্রাকৃত ভাষায় হয়, সংস্কৃতে হয় না। কবি এইরূপে দেখাইলেন যে, স্ত্রীলোককে বিদ্যা ফলাইতে দেখিলে ভদ্র লোকের যে অশ্রদ্ধা হয় বসন্তসেনা তাহা বুঝিতেন, এবং বসন্তসেনার সংস্কৃতজ্ঞতা এমন পাকা রকমেরও ছিল না যে, স্বয়ং সংস্কৃতে চিন্তা করিতে পারেন।

---

(৫)

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত, উহার নায়িকা বসন্তসেনা। নাটকোল্লিখিত অপরাপর পাত্রদিগের মধ্যে সমূহ দোষ গুণে জড়িত অপর একটী বিশিষ্ট ব্যক্তির বর্ণন আছে। তাঁহার নাম শর্ব্বিলক। অন্যান্য নাটকাদিতে যে সকল কাজ দৈবশক্তি বা সম্যক্ অতি-মানুষশক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, মৃচ্ছকটিক নাটকে এই শর্ব্বিলকের দ্বারাই সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ইনিই রাজার কারাগৃহ হইতে ভাবী ভূপতিকে মুক্ত করিয়া দেন, ইনিই রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনিই পরিশেষে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পাদন করিয়া দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সুসিদ্ধ করেন। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত তিনি যথার্থ হিন্দুর আদর্শ স্বরূপ। এরূপ লোককে আদর্শ জ্ঞান করিবার মানুষই এদেশে অধিক। ঐরূপ লোকের গঠন করাই আর্য্য শাস্ত্রের এবং আর্য্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। চারুদত্তই আমাদিগের অলঙ্কার শাস্ত্র মতে ধীরোদাত্ত অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নায়ক। নাটককারও পদে পদে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার চারুদত্ত নিজ ঔদার্য্য "গুণশস্ত্রের" বলেই শস্ত্রধারীদিগের অপেক্ষাও বলীয়ান্, তিনি জনগণের "তৃষ্ণার অপনয়ন করিয়াই বিশুষ্ক হ্রদের ন্যায় নীরহীন", তিনি জনসাধারণের চক্ষে 'ভূদল মিঅংক্কা' (ভূতল মৃগাঙ্ক), তিনি নির্দ্ধন হইলেও 'ভৃত্যানুকম্পক' বলিয়া ভৃত্যদিগের প্রিয়, এবং তিনি স্বভাবতঃ এমনি সুশীতল যে, অপকারী ব্যক্তিরও অপকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, "ন চন্দ্রা দো আদবো হোদি" (ন চন্দ্রাদাতপো ভবতি)।

কিন্তু শর্ব্বিলক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনিও ব্রাহ্মণ কুলপতির সন্তান, তিনিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তিনিও দরিদ্র, এবং তিনিও একটি যুবতীর প্রণয় পাশে একান্ত সম্বদ্ধ। ঐ যুবতী বসন্তসেনারই একটী দাসী, তাহার নাম মদনিকা। সেই মদনিকার নিষ্ক্রয়সাধনপূর্ব্বক তাহাকে "অভুজিষ্যা" বা অনন্যভোগ্যা করিবার জন্য দরিদ্র শর্ব্বিলকের অর্থ

সংগ্রহ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার শারীরিক বলবীর্য্য যেরূপ তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা—

মার্জ্জারঃ ক্রমণে, মৃগঃ প্রসরণে, শ্যেনোগ্রহালুঞ্চনে,
সুপ্তাসুপ্ত-মনুষ্যবীর্য্যতুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ।
মায়ারূপশরীরবেশরচনে, বাগ্‌দেশভাষান্তরে।
দীপো রাত্রিষু সঙ্কটেষু ডুড়ুমো বাজীস্থলে, নৌর্জলে॥

আমি উৎক্রমণাদিতে মার্জ্জারের তুল্য অর্থাৎ আমার উঠা নামা প্রভৃতি নিঃশব্দে; বেগগমনে হরিণের সমান; গৃহীত বস্তুর আচ্ছিন্দনে আমি শিকারী পক্ষীর সদৃশ; নিদ্রিত বা জাগরিত মনুষ্যের বীর্য্য পরীক্ষণে আমি কুকুরের সমান; চলনে আমি সর্পবৎ (লক্ষ্যাতীত), নানা বেশ রচনা দ্বারা শরীরকে ছদ্ম করায় আমি সাক্ষাৎ মায়া, বিভিন্ন দেশীয় ভাষাজ্ঞতায় আমি সরস্বতী; আমি রাত্রিকালে দীপ; সঙ্কটপথে অশ্বতর; সমভূমিতে অশ্ব; জলে নৌকা।

অপিচঃ

ভুজগ ইব গতৌ, গিরিঃ স্থিরত্বে,
পতগপতেঃ পরিসর্পণে চ তুল্যঃ।
শশইব ভুবনাবলোকনেঽহং,
বৃকইব চ গ্রহণে বলে চ সিংহঃ॥

আমি গমনে সর্পের, স্থৈর্য্যে পর্ব্বতের, বেগে গরুড়ের তুল্য। সকল দিক দেখিয়া চলায় আমি শশ, গ্রহণে ব্যাঘ্র, বলে সিংহ।

এই রূপ সবল, সক্ষম, কর্ম্মঠ, বিক্রান্ত এবং সুঘটিত শরীর বিশিষ্ট দরিদ্র শর্ব্বিলকের অর্থ প্রয়োজন বোধ হওয়াতে তিনি অন্য কোন উপায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং এই দুষ্টবৃত্তির দোষ প্রচ্ছাদিত করিয়া বলিতেছেন।

কামং নীচমিদং বদন্তি পুরুষাঃ স্বপ্নেচ যদ্বর্দ্ধতে,
বিশ্বস্তেষু চ বঞ্চনাপরিভবশ্চৌর্য্যং ন শৌর্য্যং-হি তৎ।

স্বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলিঃ,
মার্গোহেষ নরেন্দ্রসৌপ্তিকবধে পূর্ব্বংকৃতো দ্রৌণিনা॥

লোকে ঘুসাইলে (অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে) এ কাজটাকে নীচ বলে বটে, কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি বঞ্চনা করা চৌর্য্য—কারণ তাহাতে শৌর্য্য নাই। পরন্তু লোকের নিন্দনীয় হইলেও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেবা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা এ কর্ম্ম স্বাধীন এবং শ্রেষ্ঠ। আর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সুপ্ত রাজাদিগের বধবিধানে এইরূপ কাজের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সিংহ-বিক্রমশরীর, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি, পরাধীন বৃত্তিপরাঙ্মুখ, স্বাভাবিক প্রখরা ইচ্ছাবৃত্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বাবলম্বিত চৌর্য্য ব্যবসায়ের উৎকর্ষ খ্যাপনপূর্ব্বক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শর্ব্বিলক সাহসকার্য্যে রত হইয়াছেন। শর্ব্বিলকের সমান প্রকৃতির লোক পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ছিল। ইউরোপে পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে—বস্তুতঃ শর্ব্বিলককে. ইউরোপীয় ছাঁচের মানুষ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ওরূপ প্রবল স্বৈরাচারের একান্ত বিরোধী আর্য্যশাস্ত্রের শিক্ষাপ্রভাবে ঐ প্রকার লোক এদেশে ক্রমেই ন্যূন হইয়া গিয়াছিল—চারুদত্ত প্রকৃতির লোকই বাড়িয়াছিল, এবং এখনও বাড়িয়া আছে। দেখ মৃচ্ছকটিক প্রণেতা চারুদত্ত এবং শর্ব্বিলক উভয়কে গঠন করিয়া নিজগ্রন্থে চারুদত্তেরই প্রধান স্থান কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শর্ব্বিলকের স্থান উচ্চ নয়। শর্ব্বিলক যে সাহসের কর্ম্ম করেন তাহা বলিয়াই গ্রন্থকার নিবৃত্ত হয়েন নাই। শর্ব্বিলক যে কোন প্রকার ধর্ম্মকথাই মানে না, যাহা কিছু তাহার ইচ্ছার গতিরোধ করে, তাহাই উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত, নাটককার তাহাও পদে পদে দেখাইয়া দিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। শর্ব্বিলক চৌর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সন্ধিখনন করিতে করিতে পরিমাণসূত্র ভুলিয়া আসিয়াছে মনে হওয়াতে বলিল—

বিকৃষ্টং প্রমাণসূত্রং মে বিস্মৃতং,বিচিন্ত্য—আং ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণসূত্রং ভবিষ্যতি; যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং; বিশেষতো মদ্বিধস্য।

কি দুঃখ! পরিমাণসূত্র ভুলিয়া আসিয়াছি। চিন্তা করিয়া—হাঁ এই যজ্ঞোপবীতই প্রমাণসূত্র হউক; পৈতাটা ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষতঃ আমার সদৃশ ব্রাহ্মণদিগের বড়ই উপকরণ-দ্রব্য।

অতএব পৈতা দিয়াই শর্ব্বিলক সিঁদ মোয়ান মাপিয়া লইলেন।

---

(৬)

মৃচ্ছকটিকের মুখ্যপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য্য। তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্র শাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিকের গৌণপাত্র শর্ব্বিলক ইউরোপীয় ছাঁচের লোক। তিনি **সক্ষম**, পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণধী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব বলবতী—ধর্ম্ম-**শাসনে**র ততটা বশীভূতা নহে। এক কথায় চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্ব্বিলক, রাজস পুরুষ। স্বৈর-স্বভাব ইউরোপীয়ের চক্ষে সত্ত্বগুণের আদর অল্প, রজোগুণের সমাদর অধিক। এক জন ইউরোপীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের মতে মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির নহেন। উহার নায়ক অর্জ্জুন। সেইরূপ ইউরোপীয় আলঙ্কারিকের চক্ষে মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত না হইয়া শর্ব্বিলক হইলেই ভাল হইত। আজি কালি ইউরোপীয় শিক্ষা, ইউরোপীয় ভক্তি এবং ইউরোপীয় অনুকরণের দিন পড়িয়াছে। অতএব বোধ হয়, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এতদ্দেশীয় নব্যেরাও যদি মৃচ্ছকটিক পাঠ করেন, তবে তাহাদিগেরও মনে চারুদত্ত অপেক্ষা শর্ব্বিলককেই ভাল লাগিবে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে যে চিত্তাদর্শের প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথার উল্লেখ করা গেল। এই কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলেই এখনকার নাটক নাটিকা, আখ্যায়িকাদি গ্রন্থে যে কি জন্য সত্ত্বগুণপ্রধান পাত্রদিগের অপেক্ষা

রজোগুণপ্রধান পাত্রদিগের অধিকতর গৌরব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারও কারণ উপলব্ধ হইবে। কিন্তু এই যে পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃতি কি? আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে সকল গুণ এবং চরিত্রকে অপেক্ষাকৃত দুষ্ট এবং হেয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাহাই ভাল এবং আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে বই ত নয়। ইউরোপীয় শাস্ত্রে শিক্ষিতেরা যদি মনে করেন যে, তাঁহারা ঐ শিক্ষার প্রভাবে শৌর্য্য গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন, এই জন্য বলা আবশ্যক যে, শৌর্য্যগুণের মধ্যেও বিলক্ষণ ভেদ আছে। যে শৌর্য্যের মূলে যশোলিপ্সা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, অথবা আত্মগৌরব থাকে, সে শৌর্য্য এক প্রকারের, আর যাহার মূলে বিশুদ্ধ-ধর্ম্মজ্ঞান, সে শৌর্য্য আর এক প্রকারের। এই মৃচ্ছকটিকেই ঐ দুই প্রকার শৌর্য্যের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শর্ব্বিলকের শৌর্য্য প্রথম প্রকারের —উহা আত্ম-গৌরকমূলক এবং রজোগুণসম্ভূত। নাটকের যে অংশে শর্ব্বিলককে অতি প্রোজ্জ্বলরূপ দেখা যায়, সেই স্থানটী লইয়া বিচার করা যাইতেছে। শর্ব্বিলক মদনিকার নিষ্ক্রয় হেতু উহার চৌর্য্যলব্ধ অলঙ্কার মঞ্জুষা লইয়া বসন্তসেনার বাটীতে আসিয়াছে, এবং মদনিকাকে নিভৃতে বলিতেছে;

দারিদ্র্যেণাভিভূতেন ত্বং স্নেহানুগতেন চ।
অদ্য রাত্রৌ ময়া ভীরু! ত্বদর্থে সাহসং কৃতম্।

আমি দারিদ্র্যাভিভূত এবং তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত, তোমার জন্যই অদ্য রাত্রিতে সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি।

মদ। সর্ব্বিলজ! ইথী কল্লবত্তস্স কারণে ণ উহঅংপি সংসএ বিণিক্খিত্তং।

শর্ব্বিলক! তুমি একটা স্ত্রীস্বরূপ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত দুইটীকে সংশয়ে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ।

শর্ব্বি। কিং কিং?
কি কি?

মদ। সরীরং চারিতংচ।
শরীর এবং চরিত্র।

শর্ব্বি। অপণ্ডিতে! সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি।

অপণ্ডিতে! সাহসে লক্ষ্মীর বাস।

মদ। সর্ব্বিলঅ! অখণ্ডিত চারিত্তাসি; তাণ হু দে মম কারণাদেব সাহসং করন্তেন অচ্চংত বিরুদ্ধং আচরিদং।

শর্ব্বিলক। তোমার চরিত্র অখণ্ডিত আছে—আমার জন্য সাহস কর্ম্ম করায় অতি বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় নাই?

শর্ব্বি। নোমুষ্ণাম্যবলাং বিভূষণবতীংফুল্লামিবাহং লতাম্।
বিপ্রস্বং নহরামি কাঞ্চনমথো যজ্ঞার্থমভ্যুদ্ধৃতং॥
ধাত্র্যুৎসঙ্গগতং হরামি ন তথা বালং ধনার্থী ক্বচিৎ,
কার্য্যাকার্য্যবিচারিণীমম মতিশ্চৌর্য্যেঽপি নিত্যং স্থিতা।

পুষ্পবতী লতার ন্যায় বিভূষিতা কোন অবলার ধন চুরি করি নাই—যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বিপ্রসঞ্চিত সুবর্ণ হরণ করি নাই—ধনার্থী হইয়া ধাত্রীক্রোড়স্থিত বালককে অপহরণ করিয়া লই নাই—চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও আমার বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্য বিচার বিষয়ে সুস্থিরাই থাকে।

অপর এক স্থলেও শর্ব্বিলক বলিয়াছেন—"ভীতে সুপ্তে ন শর্ব্বিলকং প্রহরতি" (ভীত এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে শর্ব্বিলক আঘাত করেন না)।

শর্ব্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ আছে। কর্ত্তব্যাবধারণে তাঁহার বিলম্ব হয় না। যেমন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়মিত্র "আর্য্যক" রাজা "পালক" কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, অমনি সদ্যঃপ্রাপ্তা "মদনিকা"কে ছাড়িয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন—

কথং রাজ্ঞা পালকেন প্রিয়সুহৃদার্য্যকো মে বদ্ধঃ। কলত্রবাং স্মাস্মি সংবৃত্তঃ।
আঃ কষ্টম্। অথবা
দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ং নরাণাং সুহৃচ্চ বনিতা চ।
সম্প্রতি তু সুন্দরীণাং শতাদপি সুহৃদ্বিশিষ্টতমঃ॥

কি! রাজা পালক কর্ত্তৃক আমার প্রিয় সুহৃদ আর্য্যক বদ্ধ হইয়াছেন, আর আমি এই সময়ে কলত্রবান্ হইলাম! কি দুঃখ! অথবা ইহলোকে

মনুষ্যের প্রিয় দুইটী, সুহৃদ্ আর বনিতা। সম্প্রতি শতসুন্দরীর অপেক্ষা সুহৃদ্ বিশিষ্টতম।

শর্ব্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উপলব্ধ হয়। তিনি আর্য্যককে কারামুক্ত করিবার উপায় ক্ষণমাত্রে স্থির করিয়া কহিলেন—

অহমিদানীম্
জ্ঞাতীন্ বিটান্ স্বভুজবিক্রমলব্ধবর্ণান্
রাজাপমানকুপিতাংশ্চ নরেন্দ্রভৃত্যান্।
উত্তেজয়ামি সুহৃদঃ পরিমোক্ষণায়,
যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ॥

আমি এক্ষণে জ্ঞাতিগণকে, বিটদিগকে, স্ব স্ব ভুজবিক্রম দ্বারা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আর কৃতাপমান কুপিত রাজভৃত্যদিগকে সুহৃদের মুক্তিসাধন করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিব, যেমন উদয়ন রাজার জন্য যৌগন্ধরায়ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অন্যের উত্তেজনা ত পরের কথা। সম্প্রতি শর্ব্বিলক স্বয়ংই আর্য্যককে কারামুক্ত করিতে চলিলেন। ইহাই ত যথার্থ সৌহার্দ্দ।

প্রিয়সুহৃদমকারণে গৃহীতং রিপুভিরসাধুভিরাহিতাত্মশঙ্কৈঃ।
সরভসমভিপত্য মোচয়ামি, স্থিতমিব রাহুমুখে শশাঙ্কবিম্বম্॥

অসাধু রিপুবর্গ মনে মনে ভীত হইয়া বিনা দোষে প্রিয় সুহৃদকে বন্দী করিয়াছে। আমি সত্বরেই যাইয়া যেমন রাহুগ্রাস হইতে শশাঙ্ক মুক্ত হয়েন সেইরূপে তাঁহাকে মুক্ত করি।

শর্ব্বিলক যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক আর্য্যকের দল পুষ্ট হইল। পরিশেষে যজ্ঞাগারে রাজা পালক তৎকর্ত্তৃক হত, এবং আর্য্যক রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। শর্ব্বিলক বলিতেছেন—

হত্বা তং কুনৃপমহং হি পালকং ভো
স্বরাজ্যে দ্রুতমভিষিচ্য চার্য্যকং তম্।

তস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেষভূতাং
মোক্ষেঽহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তং॥

আমি সেই দুষ্ট নরপতি পালককে বধ করিয়া এবং তাহার রাজ্যে র্য্যকের অভিষেক করিয়া তাঁহার শেষ আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক বিপন্ন দত্তকে মুক্ত করিব।

কিন্তু বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিবার জন্যও তাঁহার সমীপস্থ হইতে লকের মনে ভয় হইতেছে। তিনি বলিলেন—

তৎকৃতমহাপাতকঃ কথমিবৈনমুপসর্পয়ামি
অথবা, সর্ব্বত্রার্জ্জবং শোভতে।

ইহাঁর বাটীতে চুরি করিয়া আমি মহাপাতক করিয়াছি। কেমন া নিকটে যাইব। অথবা সর্ব্বত্র সরলতাই শোভনীয়।

---

(৭)

কটিক রচয়িতা তাঁহার নাটকের গৌণপাত্র শর্ব্বিলকের বীর্য্য- ক্ষিপ্রকারিতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি অত্যুচ্চ গুণাবলী প্রদর্শন করত রাজস-প্রকৃতিক, অতএব নিজ ইচ্ছাবৃত্তির একান্ত অধীন, এবং যে সত্ত্বগুণপ্রধান চারুদত্তের সমীপে লজ্জান্বিত। ইহা দেখাইয়া রই যে সম্যক্ প্রাধান্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ নহে। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা যে সাত্ত্বিক শৌর্য্যগুণেরই বিশেষ ী, তাহাও চারুদত্তের চরিত্র সংঘটন প্রণালীতে দেখাইয়াছেন। ও বীরপুরুষ। তবে তাঁহার বীরতা বলবিক্রম প্রকাশে অথবা কারামোচনে কিম্বা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটনে পর্য্যবসিত হয় না। তাঁহার কিরূপ, এবং আর্য্য হিন্দুর শৌর্য্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখাই- মত্ত নাটক হইতে কয়েকটী স্থূল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

) রাজার শ্যালক অতি দুষ্ট এবং গর্ব্বিত এবং রাজার একান্ত । সে চারুদত্তকে কোন অকার্য্য করিবার নিমিত্ত আদেশ

করিয়া বলিয়া পাঠাইল, যদি এই কাজটী কর, তবে ভাল, নচেৎ আমি তোমার চিরশত্রু হইব। চারুদত্ত এই কথার উত্তরে অধিক কিছুই বলিলেন না। ধৃষ্টতার প্রতি প্রযোজ্য উপেক্ষা মাত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন- "মূর্খঃ সঃ" (সেটা মূর্খ)।

(২) বড় একটা বিপদের সময় কোন বন্ধু তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে তিনি ঘৃণাপূর্ব্বক বলিলেন—

অহমিদানীমনৃতমভিধাস্যে ?
ভৈক্ষ্যেণাপ্যর্জ্জয়িষ্যামি পুনর্ন্যাস প্রতিক্রিয়াম্।
অনৃতং নাভিধাস্যামি চারিত্রধ্বংসকারণং।

কি! আজি আমি মিছা কথা বলিব? বরং ভিক্ষা করিয়া ন্যস্ত প্রত্যর্পণের উপায় করিব, তথাপি চরিত্রদূষণ অনৃত বাক্য বলিব না।

(৩) রাজ-দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত, অপরিচিত পূর্ব্ব আর্য্যক গাড়ি চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিল

শরণাগতো গোপালপ্রকৃতিরার্য্যকোঽস্মি।

আমি গোপালজাতীয় আর্য্যক, আপনার শরণাগত।

চারু। কিং ঘোষাদানীয় যোঽসৌ রাজ্ঞা পালকেন বদ্ধঃ?

কি! পল্লীগ্রাম হইতে আনিয়া যাহাকে রাজা পালক বদ্ধ করিয়াছেন সেই?

আর্য্য। অথ কিং (হাঁ, সেই)।

চারু। বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং ন তু ত্বাং শরণাগতং॥

বিধাতা কর্ত্তৃকই তুমি উপনীত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলে, বরং প্রাণ ত্যাগ করিব, তথাপি শরণাগত তোমাকে ত্যাগ করিব না।

(৪) এই ব্যাপারের পর হইতে রাজার শ্যালক যে চির ভয় দেখাইয়াছিল, সেই শত্রুতার কার্য্যারম্ভ হইল। সে স্বয়ং ব কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং পদাহত হইয়া তাহার গলা টিপিয়া মৃতপ্রায়

রাখিয়া গেল। এবং সে মরিয়াছে মনে করিয়া চারুদত্তই অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে মারিয়াছে এই কথা ব্যক্ত করিল। আদালতে চারুদত্তের বিচার হইল। আনুসঙ্গিক প্রমাণের বলে তিনি দোষী সাব্যস্থ হইলেন। রাজা তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। চারুদত্ত বলিতেছেন—

অহো! অবিমৃশ্যকারী রাজা পালকঃ।

অথবা

ঈদৃশে ব্যবহারাগ্নৌ মন্ত্রিভিঃ পরিপাচিতাঃ।
স্থানে খলু মহীপালা গচ্ছন্তি কৃপণাং দশাং॥

হায়! রাজা পালকের কি অপরিণামদর্শিতা। অথবা দুষ্টমন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যবহারাগ্নিতে পাচিত হইয়া রাজারা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

(৫) তাহার পর রাজদণ্ডের বিবরণ ঘোষণা করিতে করিতে যখন বধ্যভূমিতে লইয়া যায় তখন একজন তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিতেছেন, ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—

ভোঃ! শ্রুতং ভবদ্ভিঃ

ন ভীতোমরণাদস্মি, কেবলং দূষিতং যশঃ
বিশুদ্ধস্যাহি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমো ভবেৎ॥

আপনারা শুনিলেন, আমি মরিতে ভীত নই, আমার যশ দূষিত হইয়াছিল এই দুঃখ। যদি যশ বিশোধিত হইল, তবে এই মৃত্যুও পুত্রজন্মের সমান আনন্দকর হইল।

(৬) কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথা রহিল না। রাজ শ্যালকের চাতুর্য্যে সেই ব্যক্তির কথা অবিশ্বাস্য হইয়া গেল। অতএব চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে লইয়াই উপস্থিত করিল। তখন তিনি বলিলেন—

প্রাপ্যৈতদ্ব্যসনমহার্ণব-প্রপাতং
ন ত্রাসো ন চ মনসোঽস্তি মে বিষাদঃ॥

একো মাং দহতি জনাপবাদবহ্নি।
বন্ধব্যং যদিহ ময়া হতা প্রিয়েতি॥

এই দুঃখ মহার্ণবের প্রপাতে উপস্থিত হইয়া আমার ভয় অথবা মনের বিষাদ হইতেছে না। কেবল এক জনাপবাদ বহ্নি আমাকে দহন করিতেছে, আমি প্রিয়াকে হনন করিয়াছি।

(১) সেই প্রিয়া বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়া চারুদত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছেন—

প্রভবতি যদি ধর্ম্মো দূষিতস্যাপি মেঽদ্য,
প্রবলপুরুষবাক্যৈর্ভাগ্যদোষাৎ কথঞ্চিৎ।
সুরপতিভবনস্থা যত্র তত্র স্থিতা বা,
ব্যপনয়তু কলঙ্কং স্ব স্বভাবেন সৈব॥

আমি প্রবল পুরুষদিগের বাক্যে এবং নিজ ভাগ্যদোষে যদিও আজি দূষিত হইলাম, তথাপি যদি আবার ধর্ম্মের প্রভাব হয়, তবে সুরপতি ভবন হইতেই হউক, আর যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থান হইতেই হউক, সে নিজ স্বভাবগুণেই আমার এই কলঙ্কের অপনোদন করিবে।

(৮) ইহার পর শর্ব্বিলক এবং তাঁহার সহকারিবর্গ যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে চারুদত্তের নিষ্কৃতি হইল, এব তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়িল। মৃত রাজার শ্যালক বন্দীকৃত হইয়া চারুদত্তের সমক্ষে আনীত হইল। সেই সময়ে ঐ রাজ শ্যালকের সম্বন্ধে চারুদত্তের সহিত শর্ব্বিলকের যে কথোপকথন হয়, তাহা শ্রবণ যোগ্য।

শর্ব্বি। আর্য্য চারুদত্ত! আজ্ঞাপ্যতাং কিমস্য পাপস্যানুষ্ঠীয়তাং।
আর্য্য চারুদত্ত! আজ্ঞা করুন, এই পাপের সম্বন্ধে কি করা যাইবে?
চারু। কিম্ অহং যদ্ ব্রবীমি তৎ ক্রিয়তে?
কি, আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে?
শর্ব্বি। কোঽত্র সন্দেহঃ?
তাহাতে সন্দেহ কি?

চারু। সত্যম্? (সত্য?)

শর্ব্বি। সত্যম্? (সত্য।)

চারু। যদ্যেবং শীঘ্রময়ম্—(যদি তাহাই হয় তবে ইহাকে—)

শর্ব্বি। কিং হন্যতাম্? (কি মারিয়া ফেলিব?)

চারু। নহি নহি মুচ্যতাম্। (না না, ছাড়িয়া দাও।)

শর্ব্বি। কি মর্থম্? (কি জন্য?)

চারু। শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রেণ ন হন্তব্যঃ।

যে শত্রু অপরাধ করিয়া শরণাগত হইয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করিতে নাই।

শর্ব্বি। এবং তর্হি শ্বভিঃ খাদ্যতাম্।

তবে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে হয়?

চারু। নহি, উপাকরহতস্তু কর্ত্তব্যঃ।

না, তাহাকে উপকার-হত (অর্থাৎ উপকার দ্বারা তাহার শত্রুতা হত) করিতে হয়।

শর্ব্বি। অহো আশ্চর্য্যম্! কিং করোমি বদত্বার্য্য।

অহো আশ্চর্য্য! আর্য্য আমাকে বলুন কি করিব।

চারু। তন্মুচ্যতাম্। (ছেড়ে দাও।)

আর্য্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্ম্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, মরণে নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্ম্ম-প্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্ত্বিক ধীরতা। এই ধীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

---

(৮)

মৃচ্ছকটিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান দুই জনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য্য এবং ইউরোপীয় আর্য্য, এতদুভয়ের মধ্যে যে চিত্তাদর্শ সম্বন্ধীয় মৌলিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে, দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্য্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাদ্ভাগে আইসেন।

সমালোচ্য মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া এই বোধ জন্মে যে, জনগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ হইলেই তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষ করে। কিন্তু সকল দেশেই ঐ বিদ্বেষ সমানরূপে প্রখর হয় না। ইউরোপীয়েরা রজোগুণপ্রধান। তাহারা কামক্রোধের একান্ত বশীভূত। আবার তাহাতে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করা তাহাদের শাস্ত্রানুমোদিত। ভারতবর্ষীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের সাত্ত্বিক শিক্ষার গুণে চিরকাল রিপুদমনে প্রবণ এবং পরামার্থদৃষ্টি। তাহাদিগের শাস্ত্রেও ভেদ জ্ঞানের ভূয়সী নিন্দা ও অভেদ জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। এই সকল কারণে এ দেশে মতভেদ হইলেই ইউরোপের ন্যায় পরস্পর পীড়ন, নির্য্যাতন, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারের সূচনা হয় না।

আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত নব্যেরা অনেকেই মনে করেন যে, যখন বৌদ্ধ মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন সনাতন হিন্দুমতাবলম্বীরা বৌদ্ধদিগের যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইবার কারণ এই যে, ইউরোপে যখন প্রটেষ্টাণ্ট মতের সূত্রপাত হয়, তখন রোমান কাথলিকেরা ঐ নূতন মতাবলম্বীদিগের প্রতি অনেক

অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করেন, বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রটেষ্টাণ্ট স্থানীয়, আর সনাতন মতাবলম্বীরা যেন কাথলিক-দিগের স্থানীয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাদিগের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য নাই। এই মৃচ্ছকটিক নাটকেই দেখা যায় যে, হিন্দু এবং বৌদ্ধ পরস্পর অবিরোধেই একত্রে বাস করিত, কোন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হইলে ঘৃণা অথবা বিদ্বেষের ভাজন হইতেন না, এবং হিন্দু রাজারাও বৌদ্ধ-দিগের মঠধারী প্রভৃতির নিয়োগ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা সকলের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নপর হইতেন। হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ বিহারাদির রক্ষা করায় অধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। তাঁহাদের সাত্ত্বিক চক্ষে ধর্ম্মালয়-মাত্রেই লোকোপকারক এবং রক্ষণীয়।

সর্ব্বেশ্বরমতবাদ হইতে পরধর্ম্মবিদ্বেষ কখনই স্বতঃ উত্থিত হয় না। ভারত-বর্ষে জাত্মস্বভাব এবং একেশ্বরবাদী মুসলমানেরাই আসিয়া ধর্ম্ম বিদ্বেষের আগুন ক্রমে ছড়াইয়া দেয়। তাহারাই মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মণ করে এবং তাহাদেরই দেখাদেখি, শিখেরা যখন প্রবল হইয়াছিল, তখন কোথাও কোথাও মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা সকল ভগ্ন করিতেন না, এবং বৌদ্ধ রাজারাও হিন্দু ধর্ম্মশালা সকল নষ্ট করিতেন না। ইহাঁরা শুদ্ধ পরস্পরের ধর্ম্মশালা নষ্ট করিতেন না এমত নহে, পরস্পরের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলাই ইহাঁরা আপনাপন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। যে ঔদাসীন্যের গূঢ় কারণ বিদ্বেষ, সেরূপ ঔদাসীন্যকেও সাত্ত্বিকস্বভাব ভারতবর্ষীয় রাজগণ আপনাদিগের হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। রাজ সাহায্য ব্যতিরেকে যেরূপে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-শালী অনেক মন্দির, মসজিদ, হর্ম্ম্যাদি বিনাশ পাইয়াছে এবং আজও কতক পাইতেছে হিন্দুর বা বৌদ্ধের আমলে সেরূপ পূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষণে উদাসীন্য ছিল না।

সম্পূর্ণ

বিবিধ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় ভাগ।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

চুঁচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

গ্রন্থের আভাস।

——০()০——

এডুকেশন গেজেটে ও শিক্ষা দর্পণে পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক সমালোচনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। অপর প্রবন্ধের কিছু এই দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল। পুরাবৃত্তসারের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া ইহারই প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা গেল। সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হইবার অনেক পূর্ব্বে সমাজসম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই। উহা তাঁহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেক বিষয়ের মিল আছে বটে কিন্তু কোন কোন বিষয় একটু বিশদভাবেও বর্ণিত থাকায় সে প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা একসময়ে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র, সাধারণে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তন্ত্রের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার সভক্তিক অনুশীলন সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল।

ফাল্গুন ১৩১১।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

—*—

প্রথম অধ্যায়।

পুরাবৃত্তের কথা—

	পৃষ্ঠা
মনুষ্যসৃষ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ	১
মানবজাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক	৪
সত্যকালে মনুষ্যের বিশাল শরীর	৬
সত্যকালে মনুষ্যের সুদীর্ঘ আয়ুঃ	৮
মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা	১০
ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা	১২
ভাষাভেদ বিষয়ক পুরাবৃত্ত—নানা দেশে মনুষ্যসঞ্চার	১৫
মনুষ্য সমাজ	১৮
শাসন প্রণালী	১৯
ব্যবস্থা প্রণালী	২২
শিক্ষা প্রণালী এবং বাস্তু শিল্প	২৬—৩২
মিসরীয় হর্ম্ম্য প্রণালী	২৮
গ্রীক হর্ম্ম্য প্রণালী	২৯
চীনীয় হর্ম্ম্য প্রণালী	৩০
গথিক হর্ম্ম্য প্রণালী	৩১
মুসলমানীয় হর্ম্ম্য প্রণালী	৩১
অন্যান্য শিল্প এবং বিদ্যাপ্রণালী	৩২
যুদ্ধপ্রণালী	৩৪
ধর্ম্মপ্রণালী	৩৭
মনুষ্যের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ	৪১
যুগভেদের পর্য্যায়ক্রম	৪৩
অগ্নি ব্যবহার, রন্ধন এবং পাত্রাদি গঠনের পর্য্যায়ক্রম	৪৬

ভাষার পর্য্যায়ক্রম ৪৯
লিপির পর্য্যায়ক্রম ৫১
সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম ৫৪
মুদ্রাদি প্রচলনের পর্য্যায়ক্রম ৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সমাজের কথা—
বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন ৬১
জাতিভেদ ৭১
বাঙ্গালী সমাজ ৭৬
সাময়িক পরিবর্ত্ত ৮০
জাতীয় ইতিবৃত্ত ৮৪
হিন্দু সমাজে খাওয়া দাওয়া ৮৯
পর ধর্ম্ম গ্রহণ ৯৪
হিন্দু সমাজ ধর্ম্মনীতি ৯৭
পারিবারিক নীতি ১০১
হিন্দু সমাজ ও কূপমণ্ডূকতা ১০৫
বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পূজা ১০৯
ঈর্ষ্যাপ্রবণতা ১১৪
বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ ১১৮
স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য ১২২
স্বাধীন চিন্তা ১২৪
লক্ষ্মীছাড়া দশা ১৩০
রাজভক্তি ১৩৩
জীবন রক্ষা বা দৈনন্দিন পুস্তক ১৩৭
বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতা ১৩৮
শান্তি ও সুখ ১৪০
সমাজ সংস্কার ১৪২
অধিকারীভেদ ও স্বদেশানুরাগ ১৪৭

ধর্ম্মবুদ্ধি, ভক্তিপ্রীতি ও আচার রক্ষা ১৪৮
সৃষ্টিস্থিতি ও লয় ১৪৯
সন্তানোৎপত্তি ১৫০
ঈশ্বরের স্বরূপ ১৫১
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র ১৫২
বঙ্গ সমাজের বিবরণ ১৬১
রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্রশাস্ত্র ১৬৫
তন্ত্রের ত্রুটি বা ত্রুটি নয় ১৭১

তৃতীয় অধ্যায়।

তন্ত্রের কথা—

গুরু ১৭৪
সাধন প্রকরণ ১৭৫
আসন ১৭৭
মুদ্রা ১৭৯
হঠযোগ ১৮২
পশ্বাদি সাধন ১৮৪
জপপ্রণালী ১৮৭
মানস পূজা ১৮৯
প্রাণায়াম ১৯২
পূর্ণাভিষেক ১৯৪
সংন্যাস ১৯৬
কুলাচার ১৯৭
চক্রানুষ্ঠান ১৯৮
পঞ্চ-মকার ১৯৯
দেবমূর্ত্তি ২০৪

বিবিধপ্রবন্ধ ।

দ্বিতীয় ভাগ।

—•○•—

প্রথম অধ্যায়।

—:০:—

মনুষ্য সৃষ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ।

কোন ব্যক্তিই কখন স্বয়ং নিজ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন না। পিতৃমাতৃসন্নিধানে তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত না হইলে, আমরা কে কত দিন জন্মিয়াছি, আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইয়াছে, তাহা কিছুই বলিতে পারিতাম না। ইহাতেই বোধ হইবে যে, মনুষ্যজাতির আদিম সৃষ্টির বিবরণ কখনই কোন মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার নহে। মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং কোনরূপে না বলিয়া দিলে তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না।

এই হেতু সর্ব্বজাতীয় লোকেই সৃষ্টি বিবরণ বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা প্রায়ই আপনাদের ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রকেই মূল করিয়া কহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইউরোপীয় যাজকেরা কহেন যে, জগৎকর্ত্তা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে একটি মনুষ্য দম্পতীর উৎপাদন করেন। কাহার কাহার মতে এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হয়।

উক্ত মানবদম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে, তাঁহার নাম 'আদম' এবং তাঁহার পত্নীর নাম 'ইব'। ইহাঁরা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উদ্যানে

নিবাস করিতেন। তখন রোগ শোক কিছুই জানিতেন না। পরে পাপাসক্ত হইয়া জগৎপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে উহাদিগকে মর্ত্ত-লোকের দুঃখদায়ক যাবৎ নিয়মের অধীন হইতে হয়।

ফলতঃ প্রাচীন জাতিমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থার বর্ণনাকালে সেই অবস্থাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণশাস্ত্রে যে প্রকার সত্যযুগের কথা আছে, সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই ঐ প্রকার একটি সময়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। 'গ্রীক' জাতীয়েরা ইহাকেই 'সুবর্ণকাল' কহিয়াছেন, এবং খৃষ্টীয় বাইবেল ও মহম্মদীয় কোরাণের মতে উহাই আদম এবং ইবের 'ইডন্' উদ্যানে নিবাসের সময়।

ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের কোন কথা স্পষ্টরূপে অথবা আনুপূর্ব্বিক মনে আইসে না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতি প্রধান প্রধান ঘটনা স্বপ্নবৎ স্মৃতি-পথারূঢ় হয়, সেই রূপ ঐ সত্যযুগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও দুর্ব্বোধ অদ্ভুত ব্যাপার সম্মিলিষ্ট দুই একটী বোধগম্য বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জলপ্লাবনবিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্বৃত্ত অসুর সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার সমুদায় অত্যন্ত দুষ্ট হওয়াতে ধরা সেই পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্ত্তা ঐ ভারাবতরণের অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ বিশ্বাস, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, ভগবান্ মৎস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত মনুকে একখানি সুবৃহৎ বহিত্র নির্ম্মাণের আদেশ করেন। পরে উক্ত মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী আর সাত জন সুবিখ্যাত ঋষি সমভিব্যাহারে সেই বহিত্রে আরোহণ করিলে পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিতা হইলেন।

প্রাচীন 'কাল্ডীয়' জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আদিম মনুষ্যের দশম পুরুষের সময় জলপ্লাবন হয়। সেই সময়ে 'যিসুথ্রস্' নামক কোন ধর্ম্মাত্মা তদ্দেশে রাজ্য করিতেন। তিনি মীন-নরাকার 'ওয়ানে' নামা কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একখানি অতি বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করেন। পরে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী সমভিব্যাহারে সবান্ধবে ঐ পোতারূঢ় হইলে পৃথিবী প্লাবিতা হয়েন।

'মিসরীয়দিগের' মধ্যেও জলপ্লাবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে 'অসিরিস্' নামা কোন ব্যক্তি রক্ষা পায়েন।

'সাইরিয়া' দেশবাসীরা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেশে একটী গুহা দেখাইয়া কহিত "এই গুহা দিয়া জলপ্লাবনের জল পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" ইহাতেই বোধ হয় সাইরিয়াবাসী লোকেরাও জলপ্লাবনে বিশ্বাস করিত।

'চীনীয়' জাতি অতি প্রাচীন। উহাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এক সময়ে চীন দেশে এক মহাজলপ্লাবন হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইতে কেবল 'পয়ান্সু' নামক এক ব্যক্তি সপরিবারে রক্ষা পায়েন—আর সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু চীনীয়েরা ঐ জলপ্লাবন যে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছিল, এমত বলে না।

'গ্রীক্' জাতীয়েরা দুইটী জলপ্লাবনের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদুভয়ই বিশেষ বিশেষ দেশব্যাপক হইয়াছিল—ঐ জলপ্লাবনের দ্বারা সমুদয় ভূমণ্ডল একবারে প্লাবিত হইয়াছিল, এমত কথার প্রসঙ্গ নাই। ঐ দুই জলপ্লাবনের, প্রথমটী হইতে 'ওগাইইজেস্' এবং দ্বিতীয়টী হইতে 'ডিউকেলিয়ন্' এই দুই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পায়েন।

'ফিনিকীয়' নামে আর একটী অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সেই ইতিহাসে জলপ্লাবনের কোন কথারই উল্লেখ নাই।

খৃষ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, 'নোয়া, স্বয়ং এবং "সেম্" "হাম" ও "যাফেৎ" নামক তাঁহার তিন পুত্র, ইহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে

স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করত জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উক্ত বাইবল গ্রন্থের ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ বলেন যে, এই জলপ্লাবন খৃষ্ট জন্মিবার ২৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উল্লিখিত বিবরণ সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় নরগণের পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে সঙ্কলিত হইল। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্য-জীব অপরাপর জীবের পরিণামেই উদ্ভূত হইয়াছে—স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। সে উদ্ভবের কাল নিরূপণ অসাধ্য—এবং তাহা কোন এক সময়ে বা কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানেও হয় নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পৃথিবীর এক্ষণে যে ভাগ ভূমি বা পর্ব্বত, কোন কালে সেই সকল ভাগ সাগরগর্ভস্থ ছিল—এবং সেই জন্যই ঐ সকল স্থানে সমুদ্রচর জীবদিগের কঙ্কালাদি এবং জলসংঘর্ষের চিহ্ন দর্শনে একটী সাধারণ জলপ্লাবনের কল্পনা হইয়া গিয়াছে।

মানব জাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক।

সত্যযুগ সম্বন্ধে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কথা প্রথিত আছে। তন্মধ্যে তাৎকালিক নরজাতীয়দিগের সহিত দেবতাদিগের সংস্রব বিষয়ে অতীব চমৎকারজনক বিবরণ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন লোকে শিশু-দিগকেই বিশিষ্টরূপে দেবাধিষ্ঠিত জ্ঞান করে, বোধ হয় সেইরূপ পৃথিবীর আদিম অবস্থাকেও দেবাবির্ভূত বলিয়া জন সমূহের প্রতীতি হইয়াছিল।

মনুষ্যসৃষ্টির সর্ব্ববাদিসম্মত কোন বিবরণই যে স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। পরন্তু মানবকুল যে প্রকারে সৃষ্ট হউক, তাহারা প্রথমে কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কিরূপে আপনা-দিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কেমন করিয়াই বা প্রথমে পরস্পর বাক্যালাপ করিতে শিখিল, আর এখন মনুষ্যগণ যে বিবিধ বিদ্যায়

নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, সেই সকল বিদ্যার আরম্ভই বা কি প্রকারে হইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল হয়। ঐ কৌতূহল পরিপূরণার্থ যথার্থ ইতিবৃত্তের অভাববশতঃ যে বিবিধ উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা যে সর্ব্বস্থলে সকলের মনঃপূত হয় না, ইহা বলা বাহুল্য।

ভাষা, লিপি, শিল্প ও চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিদ্যার সৃষ্টি—এই সমুদয় কি কেবল মনুষ্যের অভিজ্ঞতামূলক, না প্রথমতঃ ইহাদিগের উপদেষ্টা কেহ ছিল, সকলের মনেই এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু বোধ হয়, কেহই ইহাদিগের নিশ্চয়রূপ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন না।

পূর্ব্বতনকালের সর্ব্বদেশীয় জনগণের এই সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে, নরজাতির আদিম অবস্থায় সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং, অথবা তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিরা মনুষ্যদিগকে তাহাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত শিখাইয়া দিতেন। এই হেতু সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাই জগদীশ্বর প্রদত্ত অথবা দেববিশেষ দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের পুরাণে প্রায় সকল বিদ্যাই মহাদেবের প্রকটিত বলিয়া প্রথিত আছে। "মিশর" দেশীয়রা "আইরিস্" "আইসিস্" ও "হর্ম্মিস্" এই দেবত্রয়কে মনুষ্য জাতির আদিম উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রাচীন আসিরীয় লোকেরা আপনাদিগের "বিলস্" দেবকে সকল বিদ্যার স্রষ্টা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীকেরা মিসর দেশ হইতেই আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহারাও যে মিসরীয়দিগের অনুমত কথা বলিবেন, ইহা বলা বাহুল্য।

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অনেকেই কহিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে পরমেশ্বর স্বয়ং মনুষ্যদিগের কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন। তখনকার লোকের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত এবং কখন মনুষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আপন অনুচর দেবতাদিগকে এই মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ সকল সময়ে মনুষ্যেরা তাবৎ প্রয়োজনীয় বিদ্যাতেই উপদিষ্ট হয়েন।

পরন্তু অনেকানেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিরা এক্ষণে কহিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বর নরজাতিকে যেরূপ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার উদ্ভাবনে সক্ষম। তাঁহারা বলেন যেমন পশ্বাদিকে তাহাদিগের কি প্রয়োজনীয় কিছুই শিখাইতে হয় না, তাহারা আপনাদিগের নৈসর্গিক জ্ঞানের প্রভাবেই সমুদায় জানিতে পারে, মনুষ্যদিগেরও সেইরূপ হয়। ফলতঃ আদিম অবস্থায় মনুষ্যের নৈসর্গিক জ্ঞান সভ্যাবস্থা অপেক্ষা অনেক প্রবল থাকে। অতএব বিদ্যামাত্রকেই ঈশ্বরের উপদিষ্ট বলিতে গেলে অনেক গৌরব স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বতন কালে লোকেরা যে সকল দেবতাকে নরজাতির উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিক কোন প্রকার অমানুষশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধিবলে কোন প্রকার অতি প্রধান প্রধান কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই অজ্ঞ লোক সকল কর্ত্তৃক দেবতা বলিয়া পূজিত হয়েন।

সত্যকালের মনুষ্যের বিশাল শরীর।

সর্ব্বদেশীয় লোকেরই এমত বিশ্বাস আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে মনুষ্যগণ যেমন উদারপ্রকৃতি, অতীব বিক্রমশালী এবং দেবাবিষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগের শরীরও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত যে, সত্যযুগে সাধারণ মনুষ্যশরীর শত হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ ছিল। মুসলমানদিগের কোরাণে লিখিত আছে, প্রথমে আদমের শরীর পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এমত সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে পাপসংস্পর্শে তদ্দেহ খর্ব্ব হইয়া আধুনিক নরশরীরের সদৃশ হইল। 'আসিরীয়' লোকসকল আপনাদিগের পূজ্যপাদ বিলস্ দেবের মূর্ত্তি ৪০ ফুট পরিমিত করিয়াছিলেন। গ্রীকজাতীয় কবিগণ যে সকল অসুরের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা এক এক জন এক একটি পর্ব্বত হস্তে লইয়া সংগ্রাম করিত। উহাঁদিগের সর্ব্ব

প্রধান কবি 'হোমার' বহুস্থলে এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সময়ে লোক সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হীনবীর্য্য এবং খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিল। ইহুদিদিগের কোন কোন গ্রন্থে কথিত আছে যে, পূর্ব্বে মানবীগণের গর্ভে অতি প্রকাণ্ডাকার দেবপুত্র সকল জন্মগ্রহণ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিত।

অধুনাতন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক বিষয়ে পৃথিবীর পূর্ব্বাবস্থা নিরূপিত করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, অতি পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের জীবনোপায় উদ্ভিদাদি কিছুই প্রসূত হইত না, এবং ভূর্গভস্থ প্রচণ্ড অগ্নিতাপে পৃথিবীর উপরিভাগ পর্য্যন্তও দুঃসহরূপে উত্তাপিত ছিল। সুতরাং তৎকালে পৃথিবী মনুষ্য বাসোপযুক্ত ছিল না। সেই সময়ে অতি বিশাল শরীর বহুবিধ প্রাণী ইহাতে নিবাস করিত। তাহারা অধিকাংশই বর্ত্তমান কোন জাতীয় জীবের সদৃশ নহে। তাহাদিগের অনেকের সমুদায় কঙ্কাল, কাহার কাহার কতিপয় অস্থি, কতকগুলির শরীরের অন্যান্য চিহ্ন অনেক স্থলেই ভূগর্ভে দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোথাও মনুষ্য শরীরের কোন চিহ্নপ্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে অবধি মনুষ্য দেহের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, সেই খান হইতেই মনুষ্য শরীরের এক্ষণে যে পরিমাণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাই দেখা গিয়াছে। অতএব অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি পূর্ব্বকালে মনুষ্য শরীর এক্ষণকার অপেক্ষা সমধিক বৃহৎ ছিল এমত হয়, তবে সেই শরীরের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না কেন? যে সময়ে তাদৃশ মনুষ্যগণ পৃথিবীতে বাস করিতে পারিত তাহার পূর্ব্বকালের জীবদিগের চিহ্ন সমূহ রহিয়াছে, তাহার পর সময়েরও সমুদায় চিহ্ন রহিয়াছে, কেবল সেই সময়েরই কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না ইহার কারণ কি?

অতএব এক্ষণে অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বতনকালে মনুষ্য শরীর যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল সে কথা প্রামাণিক নহে। তাঁহারা বলেন যে, অতি পূর্ব্বকালের কোন যথার্থ ইতিবৃত্তই নাই, অথচ সেই প্রাচীন বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত বাসনা

আছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব কালের কোন লোকদিগের মধ্যে ঐ বাসনা সমধিক প্রবল ছিল, সুতরাং তাৎকালিক কবিগণ সেই বাসনা পরিপূরণের চেষ্টা পাইয়া আপনাদের অলৌকিক কবিশক্তি প্রভাবে প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় পরিকল্পিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহাঁদিগের মতে পূর্ব্ব-কালিক লোকের যে বৃহৎ শরীর বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল কবিগণের কল্পনামাত্র, উহা কোন প্রকার প্রকৃত শরীরের বর্ণনা নহে।

ঐ সকল আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাও কহিয়া থাকেন, "দেখ জন-সাধারণের সংস্কার এই যে, প্রশস্তমনা ব্যক্তির শরীর তদনুরূপ প্রশস্ত না হইলে শোভা পায় না। অতএব মনুষ্য প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধায়ী কবিগণ যখন সত্যকালকে পরম ধর্ম্মের কাল বলিয়া বর্ণন করিলেন, তখন সেই সময়ের লোকসমূহকে সুবিন্যস্ত সুদীর্ঘাবয়বও বলিবেন ইহাতে বৈচিত্র্য কি?"

——()**()——

সত্যকালে মনুষ্যের সুদীর্ঘ আয়ুঃ।

জগতে মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য নানা প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমরা বার বার লোকের মৃত্যু দর্শন করিতেছি, অনেকের মৃত্যু হইতেছে শুনিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সমস্ত ক্রমে ক্রমে ঐ মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন জানিয়াছি, তথাপি কোন ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে একাকী বসিয়া থাকিলে মনের কেমন ঔদাস্য জন্মে, ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতি একবার নিবিষ্টমনা হইলে আর শীঘ্র অন্যমনা হইতে পারা যায় না, একেবারে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া উহারই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

যদি এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের এইরূপ ঘটে, তবে পৃথিবীর আদিমাবস্থায় মৃত্যু দর্শনে জনসমূহের মন যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন, ভীত, সঙ্কুচিত এবং বিচলিত হইত তাহা কে বলিতে পারে? তখন লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, বহু মৃত্যুঘটনাও ঘটে নাই, সুতরাং মৃত্যু যে একটি অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য বস্তু তাহা সম্যক্ প্রতীতই হয় নাই।

বোধ হয় যে, এই জন্যই পূর্ব্বতন কালের লোক সকল অমর হইবার নিমিত্ত এত অধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সাধ্যায়ত্ত কার্য্যের সাধনেই লোকে যত্নবান হইয়া থাকে—যাহা কদাপি হইবার নহে, তাদৃশ কার্য্য সম্পাদনে কেহই সচেষ্ট হয়েন না। পূর্ব্বকালের লোক সকল অমর হইবার চেষ্টা করিত। এক্ষণে কেহই সেই চেষ্টা করেন না। কিন্তু তাঁহারাও জানিয়াছিলেন যে অমর হওয়া অতীব দুঃসাধ্য। এই জন্য ধর্ম্মোপদেশকগণ অমর হইবার অতি কঠিনতর উপায় সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সেই সুযোগে লোক সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দানকরণের মানসে প্রায়ই এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ধর্ম্মই অমর হইবার একমাত্র উপায়। পুরাণে আছে, সুরাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন দ্বারা অমৃত উদ্ভাবিত করেন, পরন্তু সত্বপ্রধান দেবতারাই সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ কঠোর তপস্যা সহকারে দেবতার স্থানে অমর বর যাচ্ঞা করেন। ফলতঃ অমর হওয়া অথবা মরিলে পুনর্ব্বার জীবিত হওয়া—ইহা পূর্ব্বকালে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত না। মিশর দেশীয়েরা শবকে দাহ বা অন্যপ্রকারে বিনষ্ট করিত না, তাঁহাদের মতে জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে, পুনর্ব্বার সেই শরীরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই বিশ্বাস বশতঃ মিশরীয়েরা 'পিরামিড' নামক অতি প্রধান প্রধান সমাধি স্তম্ভের গর্ভ মধ্যে শব রক্ষা করিত। গ্রীকদিগেরও এমত বোধ ছিল যে, এই মর্ত্তলোকে কেহই অমর হইতে পারে না বটে, কিন্তু দেবতারা অনুগ্রহ করিলে মনুষ্যদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন এবং তথায় যাইলে মৃত্যুর অধিকার থাকে না। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মর্ত্তে অমর হইবার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু তাঁহাদের অন্যান্য গ্রন্থে এমত অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে যে, দ্রব্যগুণ বিশেষের দ্বারা লোকে অমর হইতে পারে। বাইবেলে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে, ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে আদিম মানব পাপাসক্ত হওয়াতে তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্য হইলেন।

বাইবেলে ইহাও প্রকাশিত আছে যে, কোন ধর্ম্মাত্মাব্যক্তি জগদীশ্বর

প্রসাদাৎ সশরীরে স্বর্গারূঢ় হয়েন, সুতরাং তাঁহার মর্ত্ত্যদেহ মৃত্যু কবলিত হয় নাই।

বস্তুতঃ সর্ব্ব জাতির শাস্ত্রেই এই উপদেশ যে, ধার্ম্মিক না হইলে অমর হওয়া যায় না। ধর্ম্মই অমর হইবার একমাত্র কারণ। যদি তাহাই হইল তবে যথায় ধর্ম্মের আধিক্য সেই স্থলে সুতরাং আয়ুরও দীর্ঘতা হইবে। অতএব সত্যযুগ ধর্ম্মপ্রধান বলিয়া তৎকালের লোক দীর্ঘায়ুঃ ছিল।

পুরাণে বর্ণিত আছে সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু লক্ষ বর্ষ, ত্রেতায় অযুত-বর্ষ এবং দ্বাপরে সহস্র বর্ষ পরিমিত ছিল। খৃষ্টের বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বকালে মনুজগণ অতি দীর্ঘ ছিলেন। তখন কেহ কেহ নয় শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিতেন। খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয়েই ইহুদীদিগের মূলগ্রন্থ হইতে স্ব স্ব ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং অনেক স্থলে ঐ দুই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে একবাক্যতা হইবে তাহার সন্দেহ কি?

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় মানব জাতি এক আদিম দম্পতী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে জগৎকর্ত্তা যে, সেই পূর্ব্বকালের মনুষ্যদিগকে সুদীর্ঘ আয়ুষ্মান্ করিবেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়।

—০○০—

মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

বিভিন্নবর্ণ, বিভিন্নাকার, বিভিন্নাচার এবং বিভিন্নভাষী কতকগুলি ব্যক্তিকে একত্র অবস্থিত দেখিলে অবশ্যই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এইরূপ প্রভেদ ঘটিবার হেতু কি? পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদি-সম্মত উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু হেতুনির্দ্দেশ করিতে না পারুন, অধুনাতন প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়েরা এই সকল ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য জাতি পাঁচ প্রধান বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটীর নাম "ককেসীয়"। এই ককেসীয় বর্ণের লোকদিগের বর্ণ গৌর, মস্তক

গোল, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত, এবং মুখ-কোণ * সুবিস্তৃত। ইহারা বুদ্ধিবলে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে অপর সমুদায় বর্ণের মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। উত্তরে 'স্কট্‌লণ্ড' এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত যাবৎদেশ, প্রায় সকলই এক্ষণে ককেসীয় লোকের আবাস হইয়া আছে।

দ্বিতীয় বর্ণের নাম "মোগল"। ইহারা পীতবর্ণ, খর্ব্বনাস ও উন্নতগণ্ড'। ইহাদিগের মস্তক ঠিক গোল নহে, উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ চাপা এবং মুখ-কোণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মোগলেরা ককেসীয়দিগের অপেক্ষা বুদ্ধিবলে নিকৃষ্ট। উত্তরমেরুসন্নিহিত সমস্ত দেশে এবং পশ্চিমে "তুরস্ক" হইতে পূর্ব্বে "জাপান" দ্বীপ পর্য্যন্ত এই সমুদয় ভূভাগে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

তৃতীয় বর্ণ 'মালাই' নামে অভিহিত হয়। ইহারা কপিশ বর্ণ, প্রশস্ত-নাস, উন্নত-ললাট, এবং বিস্তৃত মুখরন্ধ্র। ইহাদিগের উপরিস্থ দন্তপঙ্‌ক্তির মাড়ি কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখ-কোণ মোগলদিগের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অতিশয় দুর্ব্বল। পূর্ব্ব প্রায়দ্বীপ এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপসকলে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে 'আমেরিক' বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ লোহিত, মস্তক ক্ষুদ্র এবং নাসিকা শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আভুগ্ন। ইহাদিগের মস্তকের উর্দ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ চাপা। ইহাদিগকে শীঘ্র কোন বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারা যায় না। ইহারা অতিশয় বৈরনির্য্যাতক। আমেরিকা-খণ্ডের প্রায় সর্ব্বস্থানেই ইহাদিগের বাস ছিল। এক্ষণে ককেসীয় বর্ণের লোকেরা ইউরোপ হইতে গিয়া ইহাদিগকে স্বাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

---

* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে উপরিস্থিত দন্তপংক্তি পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা কল্পনা কর, আর সেই স্থান হইতে কর্ণের মূল পর্য্যন্ত আর একটী রেখা কল্পনা কর। উক্ত রেখাদ্বয়ের সম্পাতে যে কোণ জন্মে তাহারই নাম মুখ-কোণ।

পঞ্চম বর্ণের লোক সকল 'ইথিয়োপীয়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বনাস, সঙ্কীর্ণললাট, কুঞ্চিতকেশ এবং স্থূলোষ্ঠ। ইহাদিগের কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভুজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়। ইহারা অতি নির্ব্বোধ এবং অজ্ঞ কিন্তু প্রণয়শীল। আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপে এই সকল লোক বসতি করিয়া আছে।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে, মনুষ্যদিগের বর্ণভেদ বিভিন্ন দেশে আবাস বশতঃই ঘটিয়াছে—বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা মূলতঃ একই জাতি। কিন্তু কাহার কাহার মতে বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্য বিভিন্ন মূল হইতেই সমুদ্ভূত।

——()**()——

ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা ভিন্ন। এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয়ের কথা বুঝিতে পারে না। যে কেবল বাঙ্গাল জানে, সে ইংরাজী বুঝে না। আবার যে ইংরাজী মাত্র জানে, সে কদাপি বাঙ্গালা বা পারসী কথা বুঝিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে সকলই কতিপয় মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। ঐ মূল ভাষাগুলির অবান্তর ভেদে অপরাপর সমস্ত ভাষা জন্মিয়াছে। চমৎকারের বিষয় এই যে প্রাকৃতিক বর্ণ-ভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষাভেদও হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম আর্য্য বা 'ইরাণী' কেহ কেহ ইহাকে 'হিন্দু ইউরোপীয়' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন এই ভাষা এক্ষণে কোন দেশবিশেষে প্রচলিত নাই। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত হিন্দুকুশ নামক পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সকলে হিন্দু-ইউরোপীয় জাতিদিগের আদিম পুরুষেরা বাস করিতেন, এবং সেই দেশে হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মূল ভাষা কোন কালে প্রচলিত ছিল। ঐ হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দ্রোণীদে-

হইতে দক্ষিণে হিন্দু এবং পারসিক, পশ্চিমে এবং পশ্চিমোত্তরে কেল্ট ও টিউটোনীয় এবং স্লাবোনিক জাতি সমস্ত বিভিন্ন সময়ে নির্গত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য অর্থাৎ মূল এক হওয়াতে ঐ সকল বিভিন্ন জাতীয়দিগের ভাষার প্রধান লক্ষণ একইরূপ হইয়া আছে।

আর্য্য বা হিন্দুইউরোপীয় ভাষায় এই কয়েকটী প্রধান প্রধান শাখা আছে যথা,—১ম, সংস্কৃত, এতদ্দেশপ্রচলিত; ২য়, জেন্দ, প্রাচীন পারসিকদিগের ব্যবহৃত; ৩য়, লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোমক জাতীয়দিগের ভাষা; ৪র্থ, গ্রীক, বিখ্যাত গ্রীকজাতির ভাষা; ৫ম, স্লাবোনিক রুসীয় সাম্রাজ্যান্তর্গত বহু দেশে প্রচলিত; ৬ষ্ঠ, লেটিস, লিথুয়ানিয়া প্রদেশে ব্যবহৃত; ৭ম, গথিক, ইহা হইতে জর্ম্মণ ভাষা সমুদায় জন্মিয়াছে; ৮ম, কেল্টিক, এই ভাষা রোমীয়দিগের সময়ে ইউরোপের বহুস্থলে প্রচলিত ছিল; এখন ওয়েল্‌স, আয়র্লণ্ড ও অপরাপর স্থানে প্রচলিত আছে। এই সকল ভাষার অনেক কথারই মূল এক বলিয়া বোধ হয়। দেশভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই উহাদিগের শব্দ সকল বিভিন্নরূপে শ্রুত হইয়া থাকে। পরন্তু কোন্ ভাষায় উচ্চারণের কিরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, পণ্ডিতেরা তাহারও অনেক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আটটী ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষায় হউক না কেন একটী শব্দ বলিলে, অপর কোন্ ভাষায় সেই শব্দটী কিরূপে উচ্চারিত হইবে, তাঁহারা তাহা প্রায়ই বলিয়া দিতে পারেন। আর্য্য ভাষা মাত্রেরই আর একটী প্রকৃতি এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থান্তর করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে বা পরে অপর শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সকল সংযুক্ত শব্দ প্রধান শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তাহারই বিভক্তি, অথবা উপসর্গরূপে পরিণত হয়।

ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত অপর কয়েকটী জাতি আছে। তাহাদিগের ভাষা পূর্ব্বোক্ত আর্য্যজাতীয় ভাষা নহে। ইহাদিগের ভাষার নাম 'সেমেটিক।' সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীয়, আরব এবং ইহুদী বা হিব্রু ভাষা এই প্রকার। সেমেটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতুমূলক হয়। কিন্তু সেই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তি হইয়া রূপান্তর হয় না। অনেক

স্থলেই ধাতুর অন্তর্গত স্বর বর্ণের রূপান্তর হইয়া অর্থান্তর প্রতিপন্ন করে। সেমেটিক জাতীয় ভাষা সমস্তের সকল ধাতু প্রায়ই তিন মূল বর্ণের যোগে জন্মিয়া থাকে—একমাত্র, অসংযুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপন্ন হয় না। এই ভাষা প্রথিত শেমের সন্তানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাম সেমেটিক হইয়াছে।

আর এক প্রকার ভাষার নাম 'তুরাণী' বা 'তাতার'। এই জাতীয় ভাষা ভাষী লোকেরা যে কোন সময়ে ইউরোপ খণ্ডের অতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত দেশে বাস করিত, এমত অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। আমাদিগের দক্ষিণ দেশে যে 'তামিল' ভাষা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহা যে তুরাণী ভাষামূলক, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে সকল অসভ্য চুয়াড় লোক আমাদিগের দেশের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদিগের ভাষাও তাতার জাতীয় ভাষার সদৃশ। তুরাণী ভাষায় বিশেষ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইহার ক্রিয়াপদ সকলের প্রায়ই রূপান্তর হওয়ার ব্যবস্থা নাই। শব্দেরও রূপভেদ অধিক হয় না।

চীনীয়দিগের আচার ব্যবহার যেমন অন্য সর্ব্বজাতির আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন, ইহাদিগের ভাষাও সেইরূপ—অন্য কোন জাতীয় ভাষার সদৃশ নহে। ইহাদিগের ভাষা 'এক-বর্ণাত্মক', অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মূলশব্দ সকল যেমন অধিকাংশই 'ত্রি-বর্ণাত্মক', অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, চীনীয়দিগের মূল শব্দ সকল সেরূপ হয় না। উহারা এক একটী বর্ণমাত্র। অপরন্তু চীনীয়দিগের ভাষায় ক্রিয়া, গুণ এবং দ্রব্য-বাচক এই তিন প্রকারের পৃথক পৃথক শব্দ নাই। তাহাদিগের সকল শব্দই দ্রব্যবাচক। ঐ সকল দ্রব্যবাচক শব্দ উচ্চারণ বিশেষে কখন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে। এই ভাষাকে তুরাণী ভাষারই আদিম অবস্থা বলিলে বলা যাইতে পারে।

আর এক প্রকার মূল ভাষার নাম 'আফ্রিক'। এই জাতীয় ভাষা-সমূহ আফ্রিকা খণ্ডে প্রচলিত। ইহার প্রকৃতি সেমেটিক এবং আর্য্য উভয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কিন্তু কোন কোন অংশে উক্ত উভয় ভাষারই সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অতএব পণ্ডিতেরা আফ্রিক

ভাষা সকলকে উক্ত দুই প্রকার ভাষার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রাচীন মিশরীয়দিগের ভাষা এই আফ্রিকজাতীয় ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমেরিক বর্ণের মূল ভাষা পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষা হইতে ভিন্ন। উহাকে 'বহু বর্ণাত্মক' বলা যায়। কারণ এই সকল ভাষায় যদিও বিভক্তিযোগাদির কোন সুকৌশল দৃষ্ট হয় না বটে, তথাপি অনেকানেক মূল শব্দকে একত্র করিয়া অর্থ প্রতিপন্ন করা উহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ বোধ হয়। এই সকল ভাষা আমেরিকাখণ্ডের আদিমনিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি এই ভাষার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় নাই।

—**:**—

ভাষাভেদ বিষয়ক পুরাবৃত্ত—নানা দেশে মনুষ্যসঞ্চার।

পূর্ব্বে ভাষাভেদের যেরূপ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ নাই। বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জলপ্লাবনের কতিপয় বৎসর পরে নোয়ার সন্ততিগণ 'টাইগ্রিস্' এবং 'ইউফ্রেটিস্' নদীর মধ্যবর্ত্তী 'সিনার' নামক কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় একটী নগর এবং সুবৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির ভাষা ভেদ করিয়া দেন। তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অশক্ত হইয়া নানা দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্যসমূহ বিবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়। অনেকে কহেন, এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ১৯৯৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উক্ত বাইবেল গ্রন্থকে মূল স্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপয় প্রাচীন জাতির ইতিহাস হইতে কোন কোন স্থলে সাহায্যগ্রহণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ জাতিসমূহের আদিম বসতির স্থান যেরূপ নিরূপিত করেন, তাহাতে বোধ হয় যে, উত্তরে 'ককেসস্' পর্ব্বত এবং 'মিডিয়া,' পশ্চিমে 'লিবিয়া' এবং 'গ্রীস' আর দক্ষিণে 'ইথিয়োপীয়া' বা 'হাবেশ' এই চতুঃ-

সীমাবচ্ছিন্ন দেশেই প্রথমে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। পরে প্রতিপুরুষে মনুষ্যদিগের আবাসভূমি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতির ইতিহাস সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে, কোন দেশের সম্যক্ আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটীর নাম মনে কর। সেই দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইবে, এক্ষণে যে জাতি সেই দেশে বাস করিতেছে তাহাদিগের তথায় আগমনের পূর্ব্বে অবশ্যই অপর কোন জাতি সেই দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি সেই পূর্ব্ব জাতির কোন ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে আবার দেখা যাইবে যে, তাহারাও ঐ দেশে অন্য কোন অধিকতর প্রাচীন জাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাস নাই—কেবল তাহাদিগের নির্ম্মিত কতকগুলি সমাধি, তাহাদিগের ভাষায় কতিপয় শব্দমাত্র, অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্য অস্ত্রাদি, অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহারাই যে ঐ দেশের আদিমনিবাসী ছিল, ইহারই বা প্রমাণ কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমেরিকা খণ্ড অতি অল্পকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। 'কলম্বস' নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ঐ খণ্ড ইউরোপীয়দিগকে অবগত করান। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়া প্রথমতঃ যে সকল তাম্রবর্ণ অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকেই ঐ খণ্ডের আদিম নিবাসী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ঐ দেশের নানা স্থানে সুবৃহৎ দুর্গপ্রাচীর এবং সমাধি-স্থান প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়াছে। ইণ্ডিয়ানেরা বলে, ঐ সকল দেব-নির্ম্মিত। অতএব বোধ হয় যে, ইণ্ডিয়ানদিগের পূর্ব্বেও কোন সুসভ্য জাতি আমেরিকাখণ্ডে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশ নির্ম্মূল হইয়া গেলে ইণ্ডিয়ানেরা তথায় বাস করে।

এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে 'জর্ম্মণ' জাতীয়

লোকেরা প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে 'কেল্‌টিক' জাতীয়েরা নিবাস করিত। জর্ম্মণ এবং কেল্টিক উভয়ই ককেসীয় জাতীয় লোক, এবং উহাদিগের ভাষা আর্য্যপ্রকৃতিক। এক্ষণে অনেক স্থলে ঐ দুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেল্টিকদিগের পূর্ব্বেও ইউরোপ খণ্ডে যে অন্য কোন জাতি বাস করিত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল লোক ককেসীয় বর্ণের নহে। তাহারা মোগলজাতীয় ছিল।

আসিয়া খণ্ডের অনেক স্থলেও ঐরূপ দেখা যায়। আমাদিগের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে মোগলজাতীয় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য চুয়াড় জাতি বনে ও পর্ব্বতে বসতি করিতেছে, তাহারাও ককেসীয় বর্ণের লোক নহে। কিন্তু হিন্দুরা ককেসীয় বর্ণসম্ভূত। ইহাতেই দেখা যায় যে, হিন্দুজাতির আগমনের পূর্ব্বেও এই দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জাতি যে কত প্রাচীন, তাহাও নির্ণয় করা যায় না।

আফ্রিকাখণ্ডেরও স্থানে স্থানে ককেসীয় বর্ণের লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই খণ্ডের সর্ব্বদক্ষিণে যে 'হটেণ্টট্,' জাতি নিবাস করিতেছে, তাহারা যে মোগলজাতীয় লোক, এমন বিলক্ষণ বোধ হয়। অতএব অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথমে ঐ খণ্ডে মোগলজাতীয় লোকের আগমন হয়, পরে ককেসীয় এবং ইথিয়োপীয় জাতি উহাতে যাইয়া বাস করিয়াছে।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, কোন দেশেরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইবার নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে, মনুষ্যজাতির অনাদিত্বাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, এমত নহে। ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন সময়ে এই পৃথিবী মনুষ্যজাতির বাসোপযুক্ত ছিল না। অতএব অবশ্যই তাহার পর ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কাল যে এক্ষণকার কত পূর্ব্ব, যুক্তিদ্বারা তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসাধ্য।

মনুষ্য-সমাজ।

আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় ও সুখোপযোগী সামগ্রীসম্ভারপরিবৃত হইয়া থাকি, নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ সেই দ্রব্য যে কত যত্ন ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের এক একটী প্রস্তুত করিতে প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের যে কত বিবেচনা, কত পরিশ্রম ও কত কাল লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। দেখ, লৌহাদি ধাতু আমাদের কত প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু অনেক জাতীয় লোক বহুকাল পর্য্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানিত না। লৌহের কথা দূরে থাকুক, লবণ যে এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য—যাহা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদিগের কোন প্রধান খাদ্য বস্তুই প্রস্তুত হইতে পারে না, অনেক দেশের লোকে সেই লবণ প্রস্তুত করিতেও জানিত না। আর কোন কোন দেশের লোক এমত বর্ব্বর ছিল যে, তাহারা অগ্নিরও ব্যবহার অবগত ছিল না। তৎকালে তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অনুমান মাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়; তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন মনুষ্যগণ ঐরূপ বর্ব্বর দশা হইতে মুক্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি দুই একটী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এক এক প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে জানিয়াছে, যখন তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবোধ জন্মিয়াছে, পরস্পর কথোপকথন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পর সময় হইতেই মানবগণের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইতিহাসে তাহারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাজবদ্ধ হইলেই নরগণ যে একেবারে বহুসংখ্যক লোকমিলিত হইয়া এক একটী সুবিস্তীর্ণ রাজ্যশাসনের প্রণালী প্রস্তুত করে, এমত নহে। প্রথমে কেবল এক একটি পরিবারের লোকই একত্র থাকিত। পরিবারস্থ অপরাপর লোকেরা তাহাদিগের পিতা বা তৎসদৃশ অন্য কোন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। তখন মনুষ্যগণ মৃগয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এবং কোন এক স্থানেও বাসস্থান

নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত না। পরন্তু মৃগয়াদ্বারা জীবনোপায় করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন কোন দিন মৃগয়া সফল না হওয়াতে হয়ত কিছুই ভক্ষ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উপবাসেই দিনযাপন করিতে হয়। বার বার এইরূপ হইলে, মনুষ্যেরা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে, এবং সহজেই দেখিতে পায় যে, কতকগুলি পশু পোষিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ কষ্টের নিবারণ হইতে পারে। এইরূপে মৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পাশুপাল্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন লোকেরা আপন আপন 'কুলপতির' শাসনাধীনে থাকিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব ইহাদিগের শাসন-প্রণালীকে 'কুল-তন্ত্রতা' বলা যাইতে পারে।

পশুপালন দ্বারা যত লোক প্রতিপালিত হয়, কৃষিদ্বারা তদপেক্ষা অধিক লোকের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে। দেশভেদে এবং প্রকৃতিভেদে এই জ্ঞান কোন কোন জাতীয় লোকের মনে অতি শীঘ্রই উদ্ভূত হয়। তাহা হইলেই উহারা আর নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় না—কোন উর্ব্বর ভূমিখণ্ড দেখিয়া লইয়া তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় প্রথমে মানববর্গ কুল-তন্ত্রতারই বশীভূত থাকে। কিন্তু অধিক স্থলেই এই অবস্থা অতি শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন একটী কুলের লোক অধিকসংখ্যক, অধিক পরাক্রান্ত বা অধিক দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপর কুলজাত লোকের প্রতি আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের অধীন করিয়া রাখে। এইরূপে তিন চারিটী কুল একত্র হইলে, তৎসমুদায়ের কর্ত্তাকে রাজোপাধি প্রদত্ত হয়। এই প্রকারেই বর্ত্তমান বিস্তীর্ণ রাজ্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অবস্থায় রাজগণ যুদ্ধদ্বারাই অধিক লাভ দেখিয়া অনুক্ষণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে।

শাসন-প্রণালী।

একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকাতে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ-চিত্ত, সমধিক বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন কতকগুলি লোক প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহারা জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। রাজা যত দিন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ থাকেন, তত দিন তাঁহারা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজা দুর্বৃত্ত হইলে যাজকেরা রাজার বিপক্ষ হন। এইরূপে কোথাও কোথাও রাজপক্ষে এবং যাজকপক্ষে ঘোরতর বিবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাজকবর্গ প্রায়ই সর্ব্বস্থলে লব্ধবিজয় হইয়াছে। আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার স্পষ্ট বিবাদ হয় নাই, সে সকল স্থলেও রাজাকে যে যাজকদিগের মতানুসারে অনেক কর্ম্ম করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি পূর্ব্বকালে যাজকেরাই সাধারণ প্রজাগণের এক মাত্র সহায় ও শরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা না থাকিলে দুর্বৃত্ত রাজাদিগের দৌরাত্ম্যে ও নিরন্তর যুদ্ধে প্রজাদিগের দুঃখের সীমা থাকিত না।

রাজদৌরাত্ম্য নিবারণের আরও এক উপায় ছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোদ্ভব জনসমূহকে অধীন করিয়া আপনাদিগের কুলপতিকে সমুদায় প্রজার রাজা করিতেন। কিন্তু আপনারাও যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতেন না, এমত নহে। তাঁহারা রাজার স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহায়তাতেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা রাজার স্থানে বিস্তীর্ণ ভূম্যধিকার গ্রহণ করিতেন, আর এরূপ নিয়ম করাইতেন যে, রাজা তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত এবং তাঁহাদিগকে লইয়াই রাজকার্য্যের মন্ত্রণা করিবেন। এই সকল লোক 'কুলীন-ভূম্যধিকারী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রজা সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজা তাঁহাদিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, আর ভূম্যধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক অন্যথা করিতেন না। এইরূপে শাসন-শক্তি, রাজা, যাজক এবং ভূম্যধিকারিবর্গেরই হস্তে সমর্পিত থাকে। প্রজাসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি

হইয়া দেশমধ্যে শান্তিভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে বণিক্‌বৃত্তির সোপান প্রশস্ত হয়। বাণিজ্যদ্বারা লোকের ধনসঞ্চয় হয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে প্রজাসাধারণের মধ্যে কাহার কাহার মনে শাসন-শক্তির কিয়দংশ গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে সুতরাং রাজা, ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজশক্তি হ্রস্ব হইয়া পড়ে। তখন যদিও নামে উহাঁরাই রাজ্যশাসনকর্ত্তা হউন, কিন্তু বাস্তবিক কতকগুলি আঢ্য প্রজার হস্তেই রাজশক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হয়। অনেকগুলি ইউরোপীয় জাতি এবং আমেরিকাবাসী ইউরোপীয়েরা এই অবস্থাপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপেও অদ্যাপি প্রজাসাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই। যাবৎ সকলেই জ্ঞানবান্ ও ধনবান্ না হইবে, তাবৎকাল তাহা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব।

মানব জাতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারা অবশ্যই এইরূপ প্রতীতি হয় যে, যেমন মনুষ্যগণ শৈশবে স্ব স্ব পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কার্য্যক্ষম হইলে বন্ধুবৎ আচরিত হয়, মনুষ্যসমাজেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। একান্ত বর্ব্বর দশায় কুলপতি, রাজা, যাজক কিম্বা ভূম্যধিকারিবর্গ—ইহাঁরাই প্রজাসাধারণের শাসন করেন। কিন্তু প্রজাগণের জ্ঞানোন্নতি হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে থাকে। ফলতঃ বুদ্ধিই বল। সমাজ মধ্যে যাঁহারা অধিক বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, তাঁহাদিগের হস্তে অধিক রাজশক্তি সমর্পিত হইবে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথা ঘটিতে পারে না। যখন যেখানে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, সেই স্থানেই অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে।

শাসন-প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আরও একটী প্রাকৃতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্ন পরামর্শী কতিপয় দল থাকে। দেখ, রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ এক দল, এবং যাজকেরা তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন; আবার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গ পূর্ব্বোক্ত উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র; আর আঢ্য প্রজাগণ ঐ তিন দল হইতেই পৃথক্। পরন্তু, প্রজা সাধারণ ঐ চারি দলের কোন দলেরই

সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। এই সকল দল কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী। ধর্ম্মপ্রণোদিত না হইলে সকলেই স্ব স্ব হস্তে সমধিক রাজ-শক্তি গ্রহণের নিরন্তর চেষ্টা করে। তাহা করাতে সমাজের কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না—কেহই স্থায়িভাবে অতি প্রবল হইয়া অপর সকলের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের হিতসাধন হয় না।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে মনুষ্যসমাজকে একটী তুলাদণ্ড স্বরূপ বোধ করা যায়। যেমন তুলাদণ্ডের এক এক দিকের ভার ঐ দণ্ডকে স্ব স্ব অভিমুখে নত করিবার চেষ্টা করে, তেমনি সমাজ-সম্ভুক্ত প্রত্যেক দলই সমধিক শক্তি গ্রহণের চেষ্টা করিয়া উহাকে আপনাপন পক্ষপাতী ব্যবস্থায় আয়ত্ত করিতে চায়; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের অবলম্ব যথাযোগ্য স্থানে নিবেশিত থাকিলে দণ্ডের সাম্যাবস্থা থাকে, তেমনি যথোচিত ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা ন্যায়পরতার প্রাধান্য সংরক্ষিত হইলেও সমাজের সাম্যাবস্থা পরিভ্রষ্ট হইতে পারে না। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই নিয়মকে "সামাজিক সাম্যাবস্থার নিয়ম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক মাত্রেরই এই মৌলিকসূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই ব্যবস্থার দোষ হয়; এবং সেই দোষে হয়ত সমাজ একবারে হীনবল হইয়া যায়, অথবা তদ্দোষ সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে। যত দিন উক্ত দোষ সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার ন্যায়পরতার প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া সাম্যাবস্থা না হয়, তাবৎকাল সমাজের কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যবস্থা-প্রণালী।

যদি মনুষ্যমাত্রেই অস্বার্থপর, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইত, তবে সচ্ছন্দে সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। কেহ কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; সুতরাং কোন প্রকার

শাসনেরও আবশ্যকতা থাকিত না। যিনি বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, সকলে তাঁহার মতানুযায়ী হইয়া সমাজের সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, আর নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদনে কাহাকেও কোন প্রকার শাসনের অধীন থাকিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ নয়। ধর্ম্মশিক্ষিত না হইলে সকলেই আত্মম্ভরী হইয়া থাকে। শিশুদিগের স্বভাবে ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। তাহাদিগের মনে সদাশয়তার লক্ষণ সমস্তও যেমন দেখা যায়, একান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ সমস্তও তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহাতেই ধর্ম্মশিক্ষা এবং শাসনের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। মনুষ্য-সমাজের আদিমাবস্থায় যখন এক একটী পরিবারের লোকমাত্র একত্র সম্বদ্ধ থাকে, তখন ঐ পরিবারের কর্ত্তা যেরূপ শাসন করেন, সকলে তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। নিজ পরিবারের প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে তদ্দ্বারাই তাঁহার শাসন-বিধি পক্ষপাতশূন্য এবং সকলের সুখাবহ হয়। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হইয়া কুলতন্ত্রতার কাল উপস্থিত হইলে কুলপতিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা এবং জ্ঞান অনুসারে শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই এক প্রকার ব্যবস্থাও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কুলস্বামী যে প্রকারে স্থলবিশেষে বিচার করিয়া যান, তাহা সকল লোকের হৃদ্গত হইয়া থাকে। তাহার পর আবার সেই প্রকার স্থল উপস্থিত হইলে তদনুযায়ী হইয়া বিচার করাই আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে বিচারকের নিন্দা হয়, এবং জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এইরূপে ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া উঠিতে থাকে। কবিগণ তৎসমুদয়কে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। লোকে যত পারে স্মরণ করিয়া রাখে। পরে লিপিসৃষ্টি হইলে অগ্রেই ব্যবস্থা সকল লিপিবদ্ধ হয়। যে মহাত্মাকর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে কোন দেশের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিই তদ্দেশের ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। আমাদের দেশে ব্যবস্থাপকদিগকে 'সংহিতাকার' কহে।

অনেক প্রাচীন জাতীয় লোকের সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

দেশভেদে ও তৎকালীন ব্যক্তিদিগের অবস্থাভেদে সংহিতার প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সংহিতাদিগের ঐক্য আছে। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই মানবগণের কেমন অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। অতএব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যবস্থা সকল লোকোপকারী হয় বলিয়া বহু পূর্ব্বকাল হইতে পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে ভক্তিসহকৃত প্রচলিত হইয়া আইসে। সুতরাং ঐ সকল ব্যবস্থা মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রণীত, অথবা ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাত্মার প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ আদিমাবস্থায় লৌকিক ব্যবস্থা ধর্ম্মব্যবস্থা হইতে অভিন্নরূপ থাকায় সকল ব্যবস্থাই ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক বলিয়া সমধিক মান্য হয়।

কিন্তু মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা-ব্যবসায়ীলোক সঙ্ঘটিত হইলে উহার প্রথমাবস্থার অত্যুদার ব্যবস্থাসূত্রের প্রয়োগস্থল সঙ্কুচিত হয় এবং সেই জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্র বহুমুখ হইয়া উঠে। প্রথমতঃ ব্যবস্থাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ধর্ম্মকর্ম্মের আচারগত, অপর ভাগ লৌকিকব্যবহার সম্পৃক্ত। সকল দেশেরই 'স্মৃতিশাস্ত্র' এইরূপ আচারকাণ্ড ও ব্যবহার-কাণ্ডে বিভক্ত হইয়া আছে।

বন্যদশায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও নিতান্ত অসদ্ভাব থাকে; এবং সেই সকল দ্রব্যাদির সংরক্ষণের নিমিত্ত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে নিরন্তরই অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়ে মনুষ্যজীবন যে কেমন অমূল্য রত্ন, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না। তখন মনুষ্যের ধন-বিশেষ হরণ করা এবং প্রাণনাশ করা উভয়ই সমান দোষ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালের ব্যবস্থামাত্রেই দেখা যায় যে, পরদ্রব্যবিষয়ক অপরাধে এবং পরশরীরবিষয়ক-সাহস কর্ম্মে প্রায় অধিক প্রভেদ নাই। উভয় প্রকার দোষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে। বরং সাহস কর্ম্মের অপেক্ষা কোথাও কোথাও অপহরণের দণ্ড অধিক ছিল। পরন্তু যখন লোকের সভ্যাবস্থা হয়, তখন এইরূপ ব্যবস্থা সকল প্রচলিত থাকিতে পারে না। তখন দ্রব্য-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড এক

প্রকার, আর শরীর-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড অন্য প্রকার হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবহারকাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগের নাম 'দেওয়ানী আইন' ও অপর ভাগের নাম 'ফৌজদারী আইন'।

ব্যবহারকাণ্ড এইরূপে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইলেও ঐ দুই প্রকার আইনের দণ্ড কিছু কাল বহু স্থলে সমানই থাকে, একবারে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। ফৌজদারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈর-সাধনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কোন অপরাধে হস্তচ্ছেদ, কাহাতেও বা পদচ্ছেদ, অপর কোন প্রকার অপরাধে চক্ষুরুৎ-পাটন, আর কাহাতে বা অগ্নিদ্বারা দহন ইত্যাদি অতিনৃশংস দণ্ড সকল প্রচলিত হইয়া থাকে। দেওয়ানীর দণ্ডও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শরীর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও কোথাও এমন আইন প্রচলিত ছিল যে, অধমর্ণকে একবারে হত্যা করিলেও দোষ হইত না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে আইনের এই সকল দোষ সংশোধিত হইয়া আইসে। রাজকর্ম্মচারিগণ, ভূম্যধিকারিবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীরাই প্রথমে ঐ প্রকার নৃশংস ব্যবস্থার অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল আপনাদিগকেই উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ দণ্ড হইতে মুক্ত করেন। পরে প্রজাসাধারণের প্রতিও উহার কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্তর সমাজ যত দৃঢ়বদ্ধ ও শান্তিবহুল হইতে থাকে, ততই ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ হইয়া অপরাধীর প্রতি বৈরনির্য্যাতক ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং যাহাতে দোষী ব্যক্তির দুষ্ট স্বভাব সংশোধিত হয়, তখন কেবল এইরূপ চেষ্টাই হইতে থাকে। অদ্যাপি কোন দেশে এইটী সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রাণদণ্ডের বিধি একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কোথাও কোথাও ঋণ জন্য কারাদণ্ড রহিত হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। ইহাতেই অবস্থাভেদে আইনের প্রকৃতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে।

শিল্পপ্রণালী এবং বাস্তুশিল্প।

যেরূপ মানবজাতির ব্যবস্থা প্রণালী, শাসন প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ দেশের লোক কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ শিল্পবিদ্যারও উৎকর্ষ পরীক্ষা করিয়া জনগণের সভ্যাবস্থা কত উন্নত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। অতএব শিল্পতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়োপলক্ষে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইবে। প্রথমতঃ বাস্তু-শিল্পের প্রণালী বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রায় সকল প্রকার জীবই স্ব স্ব নৈসর্গিক সংস্কার প্রভাবে আপন আপন বাসোপযোগী স্থান প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। পক্ষীদিগের কুলায় আছে, হিংস্র পশুগণ স্ব স্ব গহ্বরে গিয়া বিশ্রাম করে, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। মনুষ্যেরাও প্রথমে উক্তরূপ কোন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। দেশের প্রকৃতিভেদে বর্ব্বর নরগণের আবাস কোথাও বা তরুস্কন্ধে, আর কোথাও বা পৃথিবীগর্ভে হয়। শীতপ্রধান দেশে মনুষ্যেরা পৃথিবীতে খাত করিয়া থাকে। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাদিগের বাস তরুতলে বা তদুপরিভাগে হয়। ইউরোপের স্থানে স্থানে ঐ সকল আবাস গর্ত্তের চিহ্ন সমস্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গর্ত্তের মুখ প্রস্তরদ্বারা বদ্ধ, প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক একটী অতি সঙ্কীর্ণ ছিদ্রমাত্র ছিল। গর্ত্তের ভিতরে কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গার দৃষ্ট হইয়াছে, এবং শিলা বা অস্থিনির্ম্মিত শরমুখাদি স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব ঐ সকল স্থান যে নরগণের আবাস ছিল, তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ সকল গর্ত্তে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সকলই শিলানির্ম্মিত, একটিও ধাতুনির্ম্মিত নয়। আর তথাকার লোকেরা যে কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত, এমত কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, ঐ প্রকার আবাসগর্ত্ত অনেকগুলি করিয়া এক এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় যে, তখনও

মনুষ্যেরা এক প্রকার সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই ভাষা সৃষ্টির আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ইহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে যে সকল আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তখনও মনুষ্যেরা গর্ত্তের ভিতর বাস করিত, কিন্তু তখন গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে বদ্ধ করিত না, উহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর বসাইয়া তদুপরিভাগে একপ্রকার ছাদ প্রস্তুত করিত। সুতরাং গর্ত্তে গমনাগমনের পথও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই সকল গর্ত্তের ভিতর যেমন পূর্ব্ববৎ অস্থি ও প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়, তেমনি পিত্তলনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তখনকার লোকেরা কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছিল।

বোধ হয়, ইহার অত্যল্প কাল মধ্যে মনুষ্যদিগের মনে হিংস্র পশুর ভয় অনেক খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আর গর্ত্তে বাস না করিয়া বাহিরে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তখনকার যে সকল আবাস স্থানের বা দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দর্শনে বোধ হয় যে, সে সময়ের লোকেরা লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিল।

সকল জাতীয় লোককেই ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত দুইটী অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের জল বায়ু ভাল এবং ভূমি উর্ব্বরা তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই বর্ব্বরদশা শেষ হইয়া সভ্যাবস্থা প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি সেই দেশ পৃথিবীর এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক লোকের সহজে গমনাগমন হইতে পারে, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতীয় লোকের পরস্পর পরিচয়দ্বারা অতি শীঘ্রই নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সেই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রেই সুসভ্য হয়। আসিয়া খণ্ডের যে ভাগ হইতে অন্য সকল দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভাগ উক্ত সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত। অতএব তত্রত্য লোকেরা যে প্রথমেই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহা সম্ভবপর। আসিরিয়া, বেবিলন, পারস্য,মিশর,নিউবিয়া এবং তৎসমীপবর্ত্তী সকল দেশে যে সমস্ত

প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অতি আশ্চর্য্য এবং মনোহর। তাহাদিগের কাহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ শিলা বা পিত্তল ঘটিত অস্ত্র শস্ত্রাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাতেও নির্ম্মাতৃগণের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়।

(মিসরীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।)

পূর্ব্বোক্ত সকল জাতির হর্ম্ম্যই এক প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর অধুনা আমেরিকা খণ্ডের মধ্যভাগে যে সকল ভগ্ন প্রাসাদসমূহের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ও এই জাতীয় হর্ম্ম্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকলই যে সর্ব্ব প্রাচীন হর্ম্ম্য প্রথা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মিসর দেশেই ইহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'মিসরীয়' বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিসিলীতে এবং গ্রীসে যে সমস্ত অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যে সমস্তকে কেহ কেহ 'সাইক্লোপিস' (অর্থাৎ অসুরনির্ম্মিত) বলিয়া আখ্যাত করেন, অধিকাংশ হর্ম্ম্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে তাহাও এই জাতীয় নির্ম্মাণ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

মিসরীয় হর্ম্ম্য-প্রণালীর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ ইহার প্রাচীর সকল নীচে অত্যন্ত স্থূল হইয়া উপরিভাগে ক্রমশঃ স্বল্পায়ত হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ছাদ সকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যোগে নির্ম্মিত হয় যে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্যকতা থাকে না; প্রস্তরফলক সমস্ত একবারে এক প্রাচীর হইতে সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীর পর্য্যন্ত অথবা এক স্তম্ভ হইতে অন্য স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ স্তম্ভ সকল অতিশয় স্থূল, খর্ব্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র খোদকতায় পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহৎ বৃহৎ ভাস্করীয় শিল্প গৃহের স্থানে স্থানে থাকে। পঞ্চমতঃ কোথাও কোথাও পর্ব্বতের অন্তর্ভাগ খনন করিয়া তন্মধ্যে এইরূপ হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষেই এই সকল 'গুহামন্দিরের' বিশেষ বাহুল্য এবং বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিতেরা কহেন যে, যে সকল লোক প্রথমতঃ পর্ব্বত গুহায় বাস করিয়া পরে মৃত্তিকাদ্বারা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারাই ক্রমে

প্রবল ও শিল্পকুশল হইয়া এই প্রকার হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে। তাঁহারা কহেন, মৃণ্ময় প্রাচীর ও স্তম্ভাদির অনুকরণ করিতে গেলেই অট্টালিকা সমস্ত উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। আর পর্ব্বত গুহায় বাস করিতে করিতেই প্রয়োজন-বশতঃ ঐ সকল গুহাকে প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যখন তাদৃশ লোকের মনোমধ্যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহারা যে পর্ব্বত খনন দ্বারাই দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে।

(গ্রীক হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

গ্রীকেরা মিসরীয়দিগের স্থানে সকল বিষয়েরই শিক্ষা পাইয়াছিল। উহারা মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্য বিদ্যাও শিখে। কিন্তু উহারা আপনাদিগের সহৃদয়তাগুণে অল্পকালমধ্যেই ঐ শিল্পবিদ্যার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, মিসরে কখনই সেরূপ হয় নাই। প্রথমতঃ উহারা প্রাচীর সমস্তকে সমপৃষ্ঠ করিল, এবং স্তম্ভগুলির গাত্রের অন্য খোদকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সরল রেখাগুলি মাত্র রাখিল। উহারা স্তম্ভ সকলকে প্রথমাবধি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ ব্যাস পরিমাণে চতুর্গুণের অধিক দীর্ঘ করে নাই। এইরূপ হর্ম্ম্য-প্রণালীকে 'ডোরীয়' কহিয়া থাকে।

ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীকেরা স্তম্ভ সকলের দৈর্ঘ্য ব্যাসপরিমাণের ৮।৯ গুণ করিত, স্তম্ভের নীচে সমচতুরস্র পীঠিকা গ্রথিত করিত এবং স্তম্ভের মস্তক 'কানমোচড়া' করিত। এইরূপ করাতে হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য যে অধিক হইবে, তাহার সন্দেহ কি? ইহাকে "আইওনীয়" প্রথা কহে।

তৃতীয় প্রকার গ্রীক হর্ম্ম্যের স্তম্ভ সকল দৈর্ঘ্যে ব্যাসের দশ গুণ হইত। তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভূষণ সপল্লবপাদপ-শিরোভাগের অনুরূপ হইত। এই প্রথাকে 'করিন্থীয়' কহা যায়।

গ্রীকদিগের দেশ অতি রমণীয়। তথায় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত প্রায়ই হয় না। তথায় সমস্ত বৎসরই যেন ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। এই হেতু অট্টালিকা সমস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, নাট্যশালা প্রভৃতি সাধারণ সমাগম গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবালয় সকলের চতুর্দ্দিকেই

অতি সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হইত। অতএব ইহাদিগের হর্ম্ম্য সকল যে সমধিক শোভাসম্পন্ন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। চমৎকারের বিষয় এই যে, গ্রীকজাতীয় লোকের মনের প্রকৃতি যখন যেরূপ হইয়াছিল, তাহাদের তৎকাল নির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকলও সেই সেই প্রকার মনের ভাব প্রকাশক হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন গ্রীকজাতির প্রথম অভ্যুদয়কাল সুতরাং লোকমাত্রের মনে দৃঢ়তা, ঔদার্য্য এবং সারল্য গুণের আধিক্য, তখন হর্ম্ম্য সকল সুদৃঢ় ডোরীয় প্রথায় বিনির্ম্মিত হয়। যখন তাহারা প্রবল-পারসীক জাতিকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব করিয়া আপনাদের বলবিক্রম উত্তমরূপে অবগত হইল, এবং কাব্যরসের রসিক হইতে লাগিল, তখন শোভমান আইয়োনীয় প্রথায় উহাঁদিগের হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। পরে যখন তাহারা চতুর্দ্দিক জয় করিয়া সাতিশয় অর্থশালী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইল, তখন নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করীন্থীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী তাহাদের সমধিক আদরণীয়া হইল। গ্রীকেরা হর্ম্ম্য-শিল্পের যে পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি পৃথিবীর অপর কোন জাতি তাহা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট করিতে পারেন নাই।

(চীনীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।)

চীনদেশীয় লোকেরা মোগল-বর্ণ-সম্ভূত, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইহারা চীন দেশে বাস করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান তাতারীয় লোকের ন্যায় পশুচারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহার সন্দেহ নাই। তখন উহারা বস্ত্র বা পশুচর্ম্মাদি নির্ম্মিত তাম্বু মধ্যে অবস্থান হইত। অতএব যখন উহারা চীন দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং পশুপাল্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্যুপজীবী হইল, তখন কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সকল আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিল, তাহাও অবিকল তাম্বুর ন্যায় হইল। ইহাদিগের হর্ম্ম্য-প্রণালী অদ্যাপি সেইরূপ আছে। পর্য্যাটকেরা কহেন যে, দূর হইতে কোন চীনীয় নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন কতকগুলি তাম্বু একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যেমন বস্ত্রের চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিলে মধ্যস্থান নিম্ন এবং পার্শ্বভাগ উন্নত হয়, চীনীয়দিগের বাটীর ছাদ সকল অবিকল সেইরূপ দেখায়। মোগলজাতীয় লোকের

অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল!—চীনীয়েরা কত সহস্র বর্ষ হইল সমাজবদ্ধ হইয়া সভ্যরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বনবাসী পূর্ব্ব পুরুষদিগের তাম্বুগুলি ভুলিতে পারে নাই—অদ্যাপি যেন কাষ্ঠের তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে।

(গথিক হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

অনুকরণবৃত্তি যে ককেসীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এমত নহে। অনুকরণ মনুষ্যমাত্রেরই সাহজিক ধর্ম্ম। ইউরোপের টিউটন জাতীয় লোকেরা এক্ষণে সুসভ্য এবং খৃষ্টানধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহারা বনচর এবং জড়োপাসক ছিল। সেই সময়ে উহারা নিবিড় বনমধ্যে পর্ণচন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। অতএব কেহ কেহ বলেন যে, যখন উহারা খৃষ্টান হইয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই গির্জ্জা তাদৃশ বনস্থলীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় মিলিত হইয়া বনস্থলীর উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জ্জাঘরও সেইরূপ দেখাইয়া থাকে। গথিক গির্জ্জার খিলান ঠিক গোল হয় না, খিলানের মধ্যস্থলে এক একটি কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের প্রাচীরগুলি বৃক্ষের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে সূচ্যগ্রবৎ হইয়া উঠে। এক প্রকার গির্জ্জার বাতায়নে যে কাচ থাকে, তাহাও নানা বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে তন্মধ্যদিয়া ভিতরে আলোকের সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় না। বনস্থলীতে যেরূপ অস্ফুট আলোক দর্শন হয়, ইহাও তাহারই অনুকৃতি মাত্র।

(মুসলমানীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা সচেতা ছিল, পশ্চিম আসিয়ায় আরব জাতিও সেইরূপ। ইহারা প্রথমতঃ তাম্বু মধ্যে বাস করিত, পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে অতীব শৌর্য্যশালী এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিল। উহারা নানা দেশ জয় করিয়া সমূহ সম্পত্তিশালী হইলে যে সকল হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ করে, তাহা চীনীয়দিগের বিরচিত তাম্বুবৎ না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়দিগের হর্ম্ম্য সদৃশ হইয়াছিল। বিশেষ এই যে, ইহারা তাম্বুর

অনুকরণে অশ্বক্ষুরাকারে খিলান নির্ম্মাণ করিত এবং যেমন তাম্বুর অন্তর্ভাগ পুষ্প লতাদি দ্বারা সুশোভিত হইত হর্ম্ম্য প্রাচীরেও সেইরূপ খোদকতার বাহুল্য করিত। অপিচ তাম্বুর বিলম্ভ সমস্ত যেমন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয়, ইহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার স্তম্ভসকলও সেইরূপ অধিক সূক্ষ্ম হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমীয়, টস্কান, বাইজান্‌শীয় প্রভৃতি কতিপয় হর্ম্ম্য-প্রথা আছে। কিন্তু সেই সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অনুকৃতিমাত্র। অতএব উহাদিগের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে মনুষ্য জাতির মধ্যে হর্ম্ম্যশিল্প কি প্রকারে প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমশঃ কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বোধ হইতে পারিবে। ফলতঃ সকল শিল্পই মনুষ্যের সৃষ্ট। মনুষ্যদিগের যখন যেমন জ্ঞান, যখন যেমন প্রকৃতি, তৎসৃষ্ট শিল্পেরও উৎকর্ষ যে তখন সেইরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি।

অন্যান্য শিল্প এবং বিদ্যা-প্রণালী।

সকল দেশেই সর্ব্বপ্রথমে কবিতার সৃষ্টি হয়। তখন কবিরাই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, দর্শনবেত্তা, ভূগোলবেত্তা, ইতিহাসবেত্তা—ফলতঃ তাঁহারাই তৎকালে জনসাধারণের একমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় সামান্য কবিতা বলিয়া পঠিত হয় না। ইহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, লৌকিক ব্যবহারের যুক্তি, আচারগত বিশেষ বিশেষ নিয়ম, পুরাবৃত্ত সম্পৃক্ত বহুবিধ প্রমাণ, সকলই জানিতে পারা যায়। আর ঐ সকল কবিতা এক্ষণকার কবিতার ন্যায় কেবল ছন্দোবন্ধে পঠিত মাত্র হইত, এমত নহে। পূর্ব্বকালে উক্ত কবিগণ অথবা তাঁহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যেরা তান-লয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে ঐ সকল কবিতা গান করিতেন। এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যা দুইই একেবারে প্রবৃত্ত হয়। এমন অসভ্য কোন জাতিই নাই, যাহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাব্যের চর্চ্চা দেখা যায় না। ফলতঃ ইহা-

অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রণদক্ষ ব্যক্তিরা যে এক এক জনে নিরস্ত্রপ্রায়, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল, শত শত সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয়, এই জন্যই সকলদেশেরই প্রাচীন মহাকাব্যে তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি থাকা স্বীকার করিলেও ঐ বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমন বোধ হয় না। তখন এক একজন মহারথ যে বহুসঙ্খ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, এ কথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়, সেই সকল দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকল দেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর, তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি যুদ্ধকালে রথী, অশ্বারূঢ় ও গজারূঢ় যোদ্ধৃবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন—পদাতিগণের প্রতি অধিক আস্থা করিতেন না।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালীও যে প্রথমতঃ এই রূপ ছিল, তাহা হোমর বিরচিত মহাকাব্য পাঠেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাহা করাতে ভূম্যধিকারিবর্গের সম্মানের লাঘব হইল। প্রজামাত্রেই ভূম্যধিকারী হইতে লাগিল। সুতরাং তাহাদিগের দশা নিতান্ত দরিদ্র না থাকায় সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল। বিশেষতঃ গ্রীসদেশ অত্যন্ত পর্ব্বতময়; তাহা অশ্বারূঢ় সৈন্যের পক্ষে বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পদাতিকগণ অধিক সম্মানিত হইয়াছিল। যে স্থানে পদাতি সৈন্যের সমাদর, তথায় রাজ্যশাসনপ্রণালীও নিতান্ত যথেচ্ছাচার বিদূষিত হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্র-প্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্যেরও সমধিক আদর ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি সৈন্যের সহিত সংগ্রামে তাৎকালিক কোন জাতীয় লোকেই জয়লাভ বা সমকক্ষতা করিতে পারে নাই। যাহারাই ঐ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই

পরাজিত এবং যেমন অনলে তূলারাশি দগ্ধ হয় তদ্রূপ, অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া আসিতেছে, দেখা যায়। যাবৎ উহাদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রাধান্য ছিল,তাবৎকাল পদাতি সৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পত্তিগণেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল।

পদাতির সমধিক গৌরব হইলে সমরপ্রণালীর আরও একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল রাজ্যেরই প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যধিকার হইতে ঐ সকল সেনা লইয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্বগৌরব হইলে আর এইরূপ থাকে না। তখন রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি ভৃতিভুক্ সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। তাহারা রাজকোষ হইতে ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়াছে। অপরন্তু তথায় প্রজা সাধারণের মধ্যেও যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে। ইউরোপের এক একটী রাজ্য যেন এক একটী প্রকাণ্ড সৈনিকাবাস হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধবিদ্যা একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র,শস্ত্রবিদ্যার সহকারী হইয়াছে। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, নব্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমন বিদ্যাবাহুল্যপ্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি শান্তিগুণেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষের পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের সময়ে বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণের প্রতি প্রায় অকারণে অত্যাচার করা হয় না—শত্রু শরণাপন্ন হইলে প্রায় তাহার প্রাণনাশ করা হয় না। কোন পরাজিতরাজ্যের প্রজাগণকে দাসত্ব

শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির মনে এমন ভাবোদয়ও হইয়াছে যে কোনরূপে যদি জাতীয় বিবাদ সমস্ত শালিসীর দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া একেবারে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়।

ধর্ম্মপ্রণালী।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ সংস্কারমূলক। কোন দেশে কোন কালে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার মনে অতি শৈশবাবধিই এই জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিতে না পাওয়া গিয়াছে। আর যদিই এমত কেহ থাকে, তবে তাহার তাদৃশ অবস্থা মানসিক পীড়ার মধ্যে গণ্য করা আবশ্যক। যাহা কিছু দেখি তাহারই মূলানুসন্ধানে সকলেই প্রবৃত্ত হই। বিনা কারণে কিছু হইয়াছে বলিলে কদাপি বিশ্বাস করি না।

যেমন কার্য্যকারণের অনুসন্ধান করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃতি-সিদ্ধ, তেমনি যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারা যায়, তদবলোকনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হওয়াও মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্থলবিশেষে ঐ বিস্ময়, ভয় ও ভক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব করে। সেই ভাবের নাম "আরাধনা" এবং ঐ ভাব যাহাকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হইয়া থাকে সেই "আরাধ্য বস্তু"। যদি আরাধ্য বস্তুর স্থানে কোন অভিপ্রেত যাচ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে উহার পূজা করা হয়। এই ভাবপরিশূন্য মনুষ্য কোথাও কখন জন্মে নাই। ইহাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। অতএব যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমাদিগের শরীরধর্ম্ম, তেমনি ধর্ম্মানুষ্ঠানও আমাদিগের মানসিক-প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু যাহার যেমন বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও তেমনি বিশুদ্ধ অথবা মলীমস হইয়া থাকে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথাভাব ঘটিতে পারে না। পুরাবৃত্তানুসন্ধান দ্বারা বিভিন্নদশাপন্ন ব্যক্তিদিগের

মধ্যে যে যে প্রকার ধর্ম্মপ্রণালীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

প্রাকৃতিক ব্যাপার সমস্ত যত অধিক পর্য্যবেক্ষিত হয় ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটী কারণ হইতে বহুবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই এক একটী কারণকে পণ্ডিতেরা 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলিয়া অভিহিত করেন। নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিলেই বোধ হয়, যেন ঐ সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাদিগের নিয়ম প্রকাশের পূর্ব্বেও ঐ সকল ব্যাপার যেমন বুদ্ধির অগম্য ছিল, নিয়ম প্রকাশ হইলেও উহারা সেইরূপ থাকে। নিয়ম জানাতে কেবল আপনাদিগের কার্য্যের কতক সুবিধা হয়, এই মাত্র লাভ। কিন্তু যখন প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমধিক অনুসন্ধান না হইয়াছে, তখন প্রত্যেক প্রকৃতি-কার্য্যই অতি অদ্ভুত রসাস্পদ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা দহন হইতেছে, আলোক দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, মেঘ হইতে বারি পড়িতেছে, ইত্যাদি যাবৎ ব্যাপারই নিতান্ত বিস্ময়জনক হয়। অদ্যাপি ঐ বিস্ময়ের যে সম্পূর্ণরূপ অপগম হইয়াছে তাহাও নহে; কিন্তু এক্ষণে জনগণ উহাদিগের এক একটী নিয়মরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। তখন ঐ সকল নিয়মের নামও জানা ছিল না। সুতরাং অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া উক্ত কার্য্যসমুদায়ে অবিচন্তনীয় বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা হইত। ঐ সকল শক্তির উপাসনাই মনুষ্যদিগের আদিম ধর্ম্ম। এই আদিম-ধর্ম্ম এক্ষণে 'জড়োপাসনা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন জড়োপাসনার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন উপাসকেরা স্ব স্ব দেবশরীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। যে জল বা অগ্নি তাহারা সম্মুখে দেখে, তাহাকেই মূর্ত্তিমদ্দেবতাবিশেষ ভাবে। কিন্তু অতি শীঘ্রই এই বুদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়। সকল জলই এক, সকল অগ্নিই এক, সকল মৃত্তিকাই এক—ইত্যাদি জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ঐ সকল ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও একজন আছেন, এমত বোধ হইতে থাকে। তখনকার ধর্ম্মপ্রণালীকেও জড়োপাসনা

বলা যায়, কিন্তু ইহা প্রথমকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। ইহাতে পূজা-কালীন দেবতার আবাহন এবং পূজাবসানে বিসর্জ্জন আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাকেই নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। ঐ কাল হইতে গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের উপাসনা প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। মর্ত্তের বায়ু, জল, মৃত্তিকা, বহ্নি অপেক্ষা ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যে অবশ্য উৎকৃষ্ট তাহার কোন সন্দেহ হয় না। বিশেষতঃ, আলোকের সহিত জীব মাত্রের এমত সম্বন্ধ যে, তদ্দর্শনেই সকলে পুলকপূর্ণ হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রকাশে যেন জগতে পুনর্জীবন্যাস হয়। অতএব প্রথমাবধিই আলোকের সহিত জীবনের বিশিষ্ট সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সূর্য্যাতপ সংযোগে পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়, ফল সকল পরিণত হয়, শৈত্য নিবারিত হয়, অতএব সূর্য্য মনুষ্যের যেমন হিতকারী, এমন আর কেহই নাই। যাজকেরাও ঐ সময় হইতে জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ্ক উপাসনাই এই সময়ে পরম ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মপ্রণালী পূর্ব্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইহাতে সাকার উপাসনা হয় বটে, কিন্তু ইহার উপাস্য পদার্থ, দূরবর্ত্তী অবিনশ্বর ও হিতকারী বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব ইহাদের উপাসনাধীন চিত্ত বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইহাই জগৎপাতা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় সোপান।

মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান এই পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিলেই ক্রমে ক্রমে আর একপ্রকার উপাসনার আরম্ভ হয়। মানবগণ জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি সমুদায় স্ব স্ব বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া তৎসমুদায়কে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন, কিন্তু জীবন পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকার-জনক। জীবন কি ? কেহই এই প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদানে সমর্থ নহেন।

অতএব সর্ব্বস্থলেই জড়োপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী-উপাসনারও আরম্ভ হইয়া থাকে। তখন যত প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দৃষ্ট হয় সকলেতেই কোন গুহ্য দেব-শক্তি বর্ত্তমান আছে এমত প্রতীত হয়। বিশেষতঃ যে সকল জীব মনুষ্যের অধিক হিতকারী, অথবা বিশিষ্ট শক্তি-সম্পন্ন তাহাদিগের উপাসনায় সমধিক গৌরব হয়।

এইরূপ প্রাণিপূজা এবং পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্কপূজা, উভয়পূজা কিছু কাল একত্রিত হইলেই উপাসনার আর একটী নূতন প্রণালী জন্মে। যে সকল ব্যক্তি সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু জয় করেন, অথবা প্রয়োজনোপযোগী শিল্প নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া দেবতা বলিয়া পূজ্য হন। এইরূপে মনুষ্যোপাসনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্ব প্রণালীর সংযোগ রাখা আবশ্যক। এই হেতু প্রথম প্রথম যে সকল মনুষ্য দেবতা বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারা প্রায়ই জ্যোতিষ্কদিগের নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাও সাকার উপাসনা বটে কিন্তু ইহার বিষয়ীভূত যে সকল পদার্থ তাহারা চিজ্জড়াত্মক, কেবল জড়মাত্র নহে। অতএব ইহা চিন্ময় ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মনুষ্যোপাসনার আরম্ভ হইয়া সভ্যাবস্থার উন্নতি হইলে যখন শত্রুজয় এবং শিল্পনির্ম্মাণ মাত্র মনুষ্যের প্রয়োজনীয় থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশই সমধিক আবশ্যক বোধ হয়, তখন যে সকল মহাত্মা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ করেন তাঁহাদিগকে এই সকলের অপেক্ষাই বড় বলিয়া বোধ হয়। জল, বায়ু, বহ্নি অতি আশ্চর্য্য পদার্থ, জ্যোতিষ্কগণ তদপেক্ষাও অধিক চমৎকারজনক, জীবন আরও রহস্য বস্তু, বৈষয়িক সুখ দুঃখের ব্যাপার সকলের চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান যেমন অতীব গুহ্য এবং বিস্ময়জনক এমত আর কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা মূর্ত্তিমৎ জ্ঞানস্বরূপ তাঁহারা যে নরগণের অবশ্য পূজ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা চিন্ময় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই অবস্থায় যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হয় তাহার নাম অবতারোপাসনা। অবতার উপাসনা আরম্ভ হইলে মনুষ্যদিগের দিন দিন ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় হয়। কারণ উক্ত অবতারেরা নরজাতির সমীপে চিন্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপস্বরূপে পরিচিত হয়েন; এবং ঐ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জনগণ ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে।

মনুষ্যের মন কার্য্য কারণ সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মদর্শনক্ষম হইলে উহাতে ক্রমশঃ দ্বৈতভাবের হ্রাস হইয়া অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উন্মুখতা জন্মিতে

জন্মিতে থাকে। অদ্বৈতবাদী ভক্তিপরিষিক্তহৃদয়ে জড়জগৎকেও সেই একমাত্র অদ্ভুতময় শক্তি হইতে অভিন্ন দেখিতে চেষ্টা করেন এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সেই চিন্ময় পরমেশ্বরকে আপনাতেই দেখিতে পান।

এই বিষয়োপলক্ষে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। ধর্ম্মপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলে কোথাও পূর্ব্বপ্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায় না। পূর্ব্ব ধর্ম্মের সহিত পর ধর্ম্মটীর সংযোগ হইয়া কিছুকাল দুইই এক সময়ে চলিতে থাকে। ক্রমে দ্বিতীয়টীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয়, প্রথমটী তাদৃশ প্রবল থাকে না। যেমন বালকদিগকে প্রথমে বর্ণমালা পড়াইতে হয়, তাহার পর তাহারা বানান ফলা প্রভৃতি শিখে, কিন্তু সেইগুলি শিখিবার সময় যে বর্ণমালা ভুলিয়া যায় এমত নহে, বস্তুতঃ ঐ বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা অপরগুলি শিখিতে পারে। ধর্ম্মশিক্ষাতেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। জড়োপাসনার পর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাসনা আরম্ভ হয়, পরন্তু তৎকালে জড়োপাসনাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। প্রত্যুত জড়োপাসনাধীনা উপাসনায় যেরূপ সমস্ত বিধির শিক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ্ক উপাসনায় সেই সকল বিধিই প্রচলিত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে।

মনুষ্যের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ।

মনুষ্যজাতির ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রাচীন এবং নব্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটী বিশেষ মতভেদ আছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য জাতির অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, ক্রমে কালসহকারে সেই অবস্থা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা এই মতের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন না। ইহাঁরা বলেন, মনুষ্য আদিমাবস্থায় কি ধর্ম্মজ্ঞানে, কি সমাজ বন্ধনে, কি উপভোগ্য-সাধনে সকল বিষয়েই অতি হীনদশাপন্ন থাকে, ক্রমে অতি সুদীর্ঘকালে নানা বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অল্পে অল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত সকল বিষয়েই উন্নতিলাভ করে। যেমন শিশুদিগের কোন জ্ঞান এবং কোন ক্ষমতাই থাকে না, সেইরূপ

আদিম অবস্থায় মনুষ্যজাতিরও জ্ঞান এবং ক্ষমতার অভাব থাকে। শিশুরাও যেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, মনুষ্যজাতিও সেইরূপে সকল বিষয় শিখিয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান বর্ব্বর দশাপন্ন বন্য লোকদিগের মধ্যেই মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনুষ্যের আদিম অবস্থার উৎকর্ষের বর্ণন করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, অতি-মনুষ্য-শক্তি-সম্পন্ন দেবাদিই মনুষ্যগণের আদিম শিক্ষক। তাঁহাদিগের মতে, প্রথমে দেবতারাই মনুষ্যদিগকে ভাষা এবং লিপিকর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয় শিখাইয়াছিলেন। সেই সময়ে মনুষ্যের সহিত দেবগণের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠরূপই হইত, সুতরাং তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং সুখের যৎপরোনাস্তি আতিশয্য ছিল।

পরস্পর অতিবিরুদ্ধ এই দুইটী মতবাদের মধ্যে নব্য পণ্ডিতদিগের মতটীই বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হয়। অপর মতটী বুঝিবার নিমিত্ত তেমন কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। অমুক দেবতা অমুক জাতীয় জনগণকে অমুক বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন—একথা বলিলে কেমন করিয়া শিখাইয়াছিলেন, কেন শিখাইয়াছিলেন, কখন কাহাকে শিখাইয়াছিলেন, এ সকল প্রশ্নের স্থল প্রায়ই থাকে না। দেবতাদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালী, তাঁহাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহনিগ্রহাদির কালাকাল—এ সকল বিষয় মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ব্যাপার, সুতরাং এসকল কথা বিচারের বিষয় নহে। আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করা মনুষ্যের স্বভাব। সেই স্বভাবানুযায়ী হইয়াই ঐ সকল বিবরণে প্রতীতি স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যেরা আপনা হইতেই অল্পে অল্পে সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে—তাঁহাদিগের কথাগুলি বুঝিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা না করিলে, কোন ক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না। যে দিকে দৃষ্টি করা যাউক, পশ্বাদির সহিত তুলনায় মনুষ্যের উন্নতি এত অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় যে, সেই উন্নতির আরম্ভ এবং চরমসীমা ত নির্দ্দিষ্ট হইতেই পারে না; তাহার ক্রম নিরূপণ করাও বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু উন্নতির ক্রম নিরূপণ করা যদিও দুরূহ ব্যাপার বটে, তথাপি পণ্ডিতদিগের ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি, মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রাকৃতিকশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন মনুষ্য-সমাজে উন্নতি বা অবনতিসাধন হইতেছে, কস্মিন্‌কালেও তদর্থ অপর কোন শক্তির প্রয়োজন হয় নাই। এখনও যে সকল কারণের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইতেছে, সকল সময়েই সেইরূপ কারণেরই কার্য্য হইয়া আসিয়াছে।

যুগভেদের পর্য্যায়ক্রম।

প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবীতে চারিটী যুগ হইয়াছে এবং সেই সকল যুগভেদ সমস্ত পৃথিবীতে এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগের মতে প্রথম যুগটী অতি উৎকৃষ্ট—উহা সুবর্ণকাল। ঐ সময়ে নরগণ স্বর্ণ-পাত্রে ভোজনাদি করিত। তাহার পরে রজতযুগ। ঐ সময়ে রৌপ্য পাত্রাদির ব্যবহার। তদনন্তর তাম্রযুগ—তাম্রপাত্রাদির বহুল প্রচার। সর্ব্বশেষে লৌহযুগ এবং লৌহবিনির্ম্মিত পাত্রাদির প্রচলন।

নব্য পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নরগণ বিভিন্নরূপ উপাদানের দ্বারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পৃথিবীর যে সকল অতি নিম্নবর্ত্তী স্তরে মনুষ্যের কঙ্কাল, আবাস-গর্ত্ত, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঐ সকল যন্ত্র এবং অস্ত্রাদির অধিকাংশই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই জন্য সেই আদিম সময়কে প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা ইহাও দেখিয়াছেন যে, ঐ প্রস্তরযুগ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক সময়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। কোন কোন স্থানে, (যথা ফিজি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এবং ভারতবর্ষেরও দুই একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে) ঐ যুগ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল স্থানের লোকেরা এখনও প্রস্তরবিনির্ম্মিত

অস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার করে—কোন প্রকার ধাতব দ্রব্য হইতে অস্ত্র বা যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিতে জানে না। প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্রাদির মধ্যেও একটী বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন, তাহা প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বা চিরিয়া নির্ম্মিত। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সেগুলি ঘর্ষণের দ্বারা সুপরিষ্কৃত। প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদিতে এই প্রভেদ নিরীক্ষণ করিয়া পণ্ডিতেরা প্রস্তরযুগটীকে দুইটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেন। তাহার একটীর নাম উর্দ্ধতন-প্রস্তরযুগ, অপরটীর নাম অধস্তন প্রস্তরযুগ। ঐ উভয় যুগেই কাষ্ঠ, শৃঙ্গ এবং অস্থি হইতেও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। ঐ সময়ে, বিশেষতঃ অধস্তন প্রস্তরযুগ আবর্ত্তিত হইলে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যেরও কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার আরব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধাতব দ্রব্যের মধ্যে তাম্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। উহা প্রায়ই ভূগর্ভে অতি গভীরভাবে নিহিত থাকে না এবং অনেকানেক স্থলে উহা অবিমিশ্র অবস্থাতেও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কোন কোন দেশের ভাষায় উহা লোহিতপ্রস্তর নামেই খ্যাত। অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কঠিনতম প্রস্তরের অন্বেষণ করিতে করিতেই নরগণ তাম্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তাম্রকে এক প্রকার প্রস্তর বলিয়াই মনে করিয়াছিল। পরে উহারা উহার বিশেষ গুণ জানিতে পারে। প্রথমে অবিমিশ্র বৃহৎ বৃহৎ তাম্রখণ্ডকে প্রস্তর দ্বারা পিটিয়াই প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রস্তুত হইয়াছিল, পরে তামা গলাইয়া লইবারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। ফলতঃ প্রস্তরযুগের পরেই যে একটি তাম্রযুগ দেখা দিয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। পরন্তু তাম্রযুগ সমধিককাল স্থায়ী হয় নাই। যখন তামা গলাইয়া ঢালিয়া লইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন মনুষ্যের বিষয়জ্ঞতা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন অপর একটী ধাতু যথা রাঙ্গ বা টিন পাইলে তাহাকে তামার সহিত মিশাইয়া একটী মিশ্রধাতুর উৎপাদন করা আর তত কঠিন কার্য্য হয় নাই। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ তামা অধিক নমনীয়। তাহা হইতে যে অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাহা তেমন কঠিন বা তীক্ষ্ণধার হয় না। এই জন্য তামাকে সমধিক কঠিন করিয়া লইবার প্রয়োজন স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তামা এবং রাঙ্গের

মিশ্রণে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার ইংরাজী নাম 'ব্রন্‌জ'। বাঙ্গালায় উহাকে পিত্তল বলে—আর তামা এবং দস্তার মিশ্রণে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেও পিত্তল বলা যায়। যে সময়ে নরগণের মধ্যে পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার, সেই সময়টীকে পৈত্তলযুগ বলা গিয়া থাকে।

পৈত্তলযুগটী তাম্রযুগের ন্যায় স্বল্পকালস্থায়ী হয় নাই। পিত্তলযুগের উদাহরণস্থল অতি বিস্তৃত। প্রাচীন গ্রীকেরা মহাকবি হোমরের সময় পর্য্যন্ত পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির সমধিক ব্যবহার করিত। রোমীয়-দিগের মধ্যেও পিত্তলমণ্ডিত ঢাল সমধিক প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ঐ দুই জাতীয় লোকেরা এবং মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয়েরা যে কেবল পিত্তলেরই ব্যবহার জানিত এমত নহে। উহারা সকলেই লৌহ ধাতুর গুণও জানিতে পারিয়াছিল। অতএব উহাদিগের সময় হইতেই পিত্তলযুগের পরবর্ত্তী যে লৌহযুগ, তাহার আবি-র্ভাব হইয়াছিল, এমন বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ঐ লৌহযুগ এখনও চলিতেছে। লৌহের অপেক্ষা মনুষ্যের অধিকতর প্রয়োজনোপযোগী অপর কোন ধাতু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান ধাতু পিত্তলযুগের পূর্ব্ব হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল ধাতু শোভাসম্বর্দ্ধনের এবং ধন সঞ্চয়ের যেমন উপযোগী, মনুষ্যের অপর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন সাধনে তাদৃশ উপযোগী নহে। ঐ প্রকার ধাতুর আবিষ্কার প্রাকৃতিক শক্তির উপর মনুষ্যের প্রভুতা সম্বর্দ্ধনের হেতু-ভূত হইয়া যুগভেদের প্রবর্ত্তন করিতে পারে না।

বিজ্ঞানবিৎ নব্য পণ্ডিতদিগের এই যুগ পর্য্যায়ের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে,মনুষ্যের আদিম অবস্থা অতি অপকৃষ্ট—সেই অবস্থা হইতে মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে যেমন কাষ্ঠময় লগুড়াদি হইতে কঠিনতর প্রস্তর, প্রস্তর হইতে তাম্র, তাম্র হইতে পিত্তল এবং পিত্তল হইতে লৌহের ব্যবহার দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে,তেমনি সর্ব্ব বিষয়েই আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে।

নানা দেশে বিশেষতঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডে, নব্য পণ্ডিতেরা সুগভীর ভূগর্ভ নিহিত নর-কঙ্কাল সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক বলেন যে,যত পূর্ব্ব

কালে যাওয়া যায়, মনুষ্য ততই খর্ব্বশরীর, ক্ষুদ্রশিরস্ক এবং স্বল্পবলশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের মতে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে দীর্ঘাবয়ব, দীর্ঘশিরস্ক এবং দীর্ঘায়ু মনুষ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

অগ্নি-ব্যবহার, রন্ধন এবং পাত্রাদি-গঠনের পর্য্যায়ক্রম।

প্রস্তর যুগেরও বহু পূর্ব্বে অবশ্যই এমন একটী সময় ছিল যখন পশ্বাদির ন্যায় মনুষ্যেরাও অগ্নির কোন ব্যবহার জানিত না। কিন্তু সেই অনাগ্নিক দশায় মনুষ্যের যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা মনে মনেই অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহার কোন উদাহরণ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পর্য্যটকেরা দ্বীপনিবাসী কোন কোন বর্ব্বর দশাপন্ন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন বটে যে তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানে না। কিন্তু তাঁহাদের সে কথার যাথার্থ্য বিষয়ে তেমন প্রমাণ নাই। আর ভূগর্ভনিহিত প্রাচীনতম মনুষ্য-বাসের মধ্যেও সর্ব্বত্রই কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গারাদিরূপ অগ্নি ব্যবহারের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যেরা যে সময়ে অগ্নির ব্যবহার জানিত না, সে সময়ের কোন চিহ্নই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। সে সময়ে নরগণ নিতান্ত পশুভাবাপন্নই ছিল।

কিন্তু অগ্নির প্রয়োজন এত অধিক, উহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ও এত অধিক এবং উহার ব্যবহার করিতে পারিলে এত বিঘ্ন বিপত্তির নিবারণ এবং কার্য্যের সুবিধা হয় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি শক্তির প্রথম উন্মেষ মাত্রেই যে অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমে মনুষ্যেরা স্বইচ্ছাতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত করিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা অতি যত্নপূর্ব্বকই অগ্নির রক্ষা করিত, পরে কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর অরণিযন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় অগ্নি উৎপাদনের পরিশ্রম লঘু হইয়া আইসে। তাহার পর লৌহ এবং প্রস্তরের পরস্পর সংঘাতে অগ্নি উৎপাদনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া গেলে অরণি-যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হয়। পরে লুসিফর

শলাকা উদ্ভাবিত হইয়া চক্‌মকির স্থান গ্রহণ করে এবং চক্‌মকির ব্যবহার প্রায় উঠিয়া যায়।

অগ্নির ব্যবহার অবগত হইলেই ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যের পার্থক্য বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। ইতর হিংস্র জন্তু মাত্রেই অগ্নিকে ভয় করে এবং যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিতে পায়, সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং অগ্নির ব্যবহারের আরম্ভ মাত্রেই মনুষ্যের আবাস গুলি অনেকটা ভয় এবং বিঘ্নশূন্য হইয়া উঠে। প্রস্তরযুগে মনুষ্যাদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদি ভাল থাকে না। অগ্নির ব্যবহার শিখিয়া মনুষ্যেরা অগ্নি দ্বারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারে। বড় বড় কাঠ কাটিয়া তাহার অন্তর্ভাগ খুদিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করা অগ্নির সাহায্যে অল্পায়াস এবং অল্পকাল সাধ্য হইয়া যায়। তাম্রাদি ধাতু হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্র এবং পাত্রাদি নির্ম্মিত হয়, অগ্নির দ্বারা ঐ সকল ধাতুকে গলাইয়া তাহা সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। আর আম মাংস মৎস্যাদি ভক্ষণ করিবার যে রীতি প্রচলিত থাকায় মনুষ্যের বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পাইত না. অগ্নির ব্যবহার আরব্ধ হইলে সেই রীতি ক্রমশঃ রহিত হইয়া যায় এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রকারভেদ, স্বাদুতা এবং উপকারিতা বর্দ্ধিত হইয়া নরগণকে সুখী, সুধী এবং শান্তশীল করিয়া তুলে।

পাক করিয়া খাওয়া এক্ষণে মনুষ্যের একটী বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধনের প্রকারভেদ এবং তাহার কৌশল এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সূপকারিতা একটী বিশেষ বিদ্যা এবং ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অগ্নির ব্যবহার যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন পাকের এত পারিপাট্য হয় নাই। তখন খাদ্য সামগ্রীকে অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তাহার পর, অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ব্যতিরেকে শূল্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর খাদ্য দ্রব্য উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সে সময়ের সিদ্ধ করিবার রীতি এক্ষণকার রীতি হইতে স্বতন্ত্র। তখন হাঁড়ি কলসী মালসা প্রভৃতি মৃৎ পাত্রের এবং কড়া, বাঁটুলা, বহুগুণা প্রভৃতি ধাতু পাত্রের কিছুরই সৃষ্টি হয়

নাই। তখন ভূমি মধ্যস্থ গর্ত্তে, অথবা মৃগয়ালব্ধ পশুর চর্ম্মে, কিম্বা গাছের ডাল কাটিয়া তাহার চেয়াড়ির দ্বারা নির্ম্মিত চুপড়িতে অথবা বৃহদাকার শম্বুকাদির কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ ফলের খোলায়, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী পাত্র প্রস্তুত হইত। ঐ সকল পাত্রের কোনটীতেই অগ্নির জাল দিবার যো নাই। এই জন্য তখনকার লোকেরা কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইলে, ঐরূপ কোন পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে সেই দ্রব্যটী রাখিয়া অন্য স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত এবং সেই অগ্নিতে উপলখণ্ডাদি উত্তপ্ত করিয়া ঐ পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে জল গরম হইয়া উঠিত এবং সেই জলে খাদ্য দ্রব্যটী এক প্রকার সিদ্ধ হইত। এরূপ করিয়া সিদ্ধ করিতে অনেক সময় যায় এবং অনেক পরিশ্রম হয়। সুতরাং ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টাই হইতে থাকে। প্রথমে প্রস্তর দ্বারাই জ্বালসহ পাত্রের নির্ম্মাণ চেষ্টা হয়। পরে চেয়াড়ি অথবা পশুচর্ম্ম কিম্বা শম্বূক অথবা ফলের খোলায় যেসকল পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার তলায় খুব পুরু করিয়া মাটির লেপ দিয়া উহাদিগকে জ্বালসহ করা হয়। এইরূপ করিতে করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, শুদ্ধ মাটি হইতেও তদ্রূপ পাত্রের গঠন হইতে পারে। মাটির পাত্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়াই প্রথম ব্যবস্থা, তাহার পর তাহাকে পোড়াইয়া লইবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। কুম্ভকারের ব্যবসায়ের এইরূপে অল্পে অল্পে উদ্ভব হইয়াছে। এদেশে উহা এই পর্য্যন্তই উন্নতি লাভ করিয়াছে। চীনের বাসন প্রস্তুত করা এবং সে সকল বাসন চিত্রিত ও অতি দিব্যগঠন করা কুম্ভকারব্যবসায়ের চরম উন্নতি।

অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে নরগণের যে সকল নৈকর্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে, বারুদের এবং বাষ্পীয় কলের সৃষ্টি হইয়া অবধি তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এক্ষণে আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাবে মনুষ্য সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন। মনুষ্য মনে করিলেই অন্য যে কোন জীব হউক তাহার ধ্বংসসাধন করিতে পারেন। শুদ্ধ অন্য জীব নহে, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না জানে এমত কোন নরজাতিও আর আগ্নেয়াস্ত্রধারীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বাষ্পীয় কলের সহকারিতা

লব্ধ হওয়াতে মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, বারুদের এবং বাষ্পীয় ও তাড়িতযন্ত্রের আবিষ্কার পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

ভাষার পর্য্যায়ক্রম।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নরগণের প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অনুসারে কোন্ কোন্ মূল ভাষা ছিল, ইহা যেমন স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ভাষার প্রথম সৃষ্টি বিষয়ে তেমন কোন বিশুদ্ধ নিয়ম এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনদিগের মধ্যে একটী দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী নরজাতিসমূহ একমাত্র আদিম মনুষ্যদম্পতী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি একমাত্র মূল ভাষা হইতে সর্ব্ব প্রকার ভাষারও উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকালের কোন কোন রাজা সেই মূল ভাষা কি, তাহার নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রকার পরীক্ষাবিধান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মিসরের কোন রাজা সদ্যোজাত দুইটী শিশুকে একটী মূক ধাত্রীর হস্তে পালনার্থ সমর্পণ করিয়া রাখেন। পরে তাহারা সর্ব্বাগ্রে যে ভাষার শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া স্থির করেন যে, ফ্রিজীয় ভাষাই সকল ভাষার মূল! শুনা যায়, স্কটলণ্ডের কোন রাজা অবিকল ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, হিব্রুভাষাই সকলের মূল ভাষা! মোগল সম্রাট্ আকবর সাহ আগরা নগরের সন্নিহিত কোন স্থানে চারিটী সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কয়েক জন মূক ধাত্রীর দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, শিশুরা কি মৌলবী, কি পণ্ডিত, কি পাদ্রি কাহার পরিজ্ঞাত কোন ভাষার শব্দই উচ্চারণ করে না—কেবল হাত পা নাড়িয়া এবং নানাপ্রকার মুখ-ভঙ্গী করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপরিস্ফুট শব্দ করিয়া আপনাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারে।

আকবর সাহের অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা বিধানের বিবরণ সত্য হউক বা না হউক, ইহার মধ্যে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ অঙ্গভঙ্গী দ্বারাই আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করে। সেই সকল অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত,যেমন পশ্বাদিরও হইয়া থাকে, তেমনি মনুষ্যেরও মুখবিবর হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ শব্দ নির্গত হয়। যে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী এবং শব্দ একই সময়ে উদ্ভূত হয়, তদুভয়ই একই ভাবব্যঞ্জক বলিয়া তাহা-দিগের পরস্পরে এক প্রকার দৃঢ় সাদৃশ্য থাকে। যে পরিমাণে সেই সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে শব্দদ্বারা ভাবপ্রকাশ, অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাবপ্রকাশের স্থান অধিকার করে।

কিন্তু নূতন শব্দসৃষ্টিরও বিশেষ বিশেষ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য হইতে যে প্রকার শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, সেই শব্দের অনুকরণেই সেই দ্রব্যের নামকরণ হইয়া থাকে। * আর একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য যেরূপ কার্য্য করিতেছে বা করিয়া থাকে বলিয়া অনুভূত হয়, সেই কার্য্যের প্রকৃতি এবং নাম হইতে ঐ দ্রব্যের নামকরণ হয়। † এই দুইটী নিয়ম বুঝিলেই ভাষাসৃষ্টির মূল কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। কিন্তু কোন ভাষার সকল শব্দই যে, ঐ দুই প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীতে যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণতম ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ থাকে, যাহাদিগের উৎপত্তির ক্রম উল্লিখিত উভয় নিয়মের কোনটীরই অন্তর্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বনাম শব্দ, অব্যয় শব্দ এবং অপরাপর অনেক শব্দ ঐরূপ। উহারা কোন স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণজাত অথবা স্বতঃই কোন ক্রিয়াবাচক মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে,ঐ সকল শব্দ উচ্চারণসৌকর্য্যের নিমিত্ত কালসহকারে এতদূর রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে, উহাদিগের উৎপত্তির প্রণালী সম্যক্ প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

---

* যথা—কা শব্দ হইতে "কাক"।

† যথা—কর্ কর্ করিয়া কাটার শব্দ হইতে "করাত"।

ভাষার ক্রমোন্নতি বিষয়ে আর কয়েকটী নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একটী নিয়ম এই যে, ভাষার আদিমাবস্থায় দ্রব্যবাচক, গুণ-বাচক এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সেই অবস্থায় উপসর্গ এবং বিভক্তির ব্যবহার হয় না। উপসর্গ এবং বিভক্তিগুলি পূর্ণাবয়ব শব্দ সকলের অপভ্রংশ হইতে বহুকাল পরে জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের সৃষ্টি হইয়া গেলে ভাষার প্রগাঢ়তা এবং জটিলতা ক্রমে এতই বর্দ্ধিত হয় যে,উহার বৈয়াকরণবন্ধনগুলি নিতান্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। কোন জাতীয় লোকের ভাষা এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলে যদি সেই জাতি অপর কোন ভিন্নভাষী জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আইসে, তবে কথোপকথনে ঐ জটিল ভাষার ব্যবহার স্বতঃই রহিতপ্রায় হইয়া যায় এবং ঐ ভাষার অনেকানেক অংশ শিথিলবন্ধ নূতন ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃসারতা সম্বর্দ্ধিত করে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের এবং ইউরোপখণ্ডে লাটিন ভাষার অপভ্রংশ সমস্ত এইরূপে আধুনিক ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে। উভয় স্থলেরই আধুনিক ভাষাগুলি বিলক্ষণ সতেজ এবং পরিপুষ্ট, কিন্তু কোনটীই প্রাচীন সংস্কৃত এবং লাটিনের ন্যায় দৃঢ়সম্বদ্ধ নহে।

লিপির পর্য্যায়ক্রম।

মনুষ্যের মনোগত ভাব প্রকাশের আদিম এবং সাধারণ উপায় অঙ্গ-ভঙ্গী বা ইঙ্গিত। যদিও সকল দেশে এবং সকল বিষয়ে ইঙ্গিত বা অঙ্গ-ভঙ্গী অবিকল একরূপ হয় না বটে,তথাপি দৃষ্ট হইয়াছে যে, অনেক স্থলেই এবং অনেক বিষয়েই ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বধির এবং মূকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় একই প্রকার অঙ্গভঙ্গীর প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্রভৃতি নানা স্থান হইতে যে

বর্ব্বর লোকদিগকে সময়ে সময়ে আনিয়া একত্র করা হইয়াছে, তাহারা যদিও কেহ কাহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তথাপি অনায়াসেই পরস্পর-কৃত ইঙ্গিত বুঝিয়া এক প্রকার আলাপ করিতে পারে। উল্লিখিত মূক-বধিরদিগের বিদ্যালয়ে ঐ বর্ব্বর লোকদিগকে লইয়া দেখা গিয়াছে যে, মূক-বধির ছাত্রেরা উহাদিগের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে এবং উহারাও ছাত্র-দিগের ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহাদিগের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তোষ অনুভব করে। এই সকল এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয় যে, ইঙ্গিত দ্বারা ভাবের প্রকাশ করা মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে একবিধ কার্য্য এবং উহা প্রায়ই এক রীতিতে সম্পাদিত হয়।

বাস্তবিক ইঙ্গিতব্যঞ্জনা একরূপ হইবার একটী বিশেষ কারণই বিদ্যমান আছে। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কোন বস্তুর বোধ জন্মাইতে হইলে হস্তাদির দ্বারা সেই বস্তুর অনুকৃতি বা ছবি প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করা নৈসর্গিক ব্যাপার। এক বস্তুর ছবি মোটামুটি একরূপই হইয়া থাকে। এই জন্যই সর্ব্ব দেশের সর্ব্বকালের ইঙ্গিতব্যঞ্জনা সুবহুস্থলেই একবিধ হয়।

ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার সারভূত যে চিত্রকরণ ব্যাপার, তাহা হইতেই লিপি-কার্য্যের আরম্ভ। দুইটী মনুষ্য পরস্পর সন্নিহিত থাকিলেই ইঙ্গিত দ্বারা অন্যোন্যকে আপনাদিগের অভিপ্রায় অবগত করিতে পারে। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্বজনদিগকে মনোগত জানাইবার প্রয়োজন সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে যে ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয়—দূরবর্ত্তী ব্যক্তিকেও তাহারই অনুকৃতি চিত্রিত করিয়া পাঠাইতে হয়। বাস্তবিক বর্ব্বরজাতীয় লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার চিত্রলিপির প্রচলন সর্ব্বদেশ-সাধারণ। হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যদিগের তেমন নিকৃষ্টাবস্থায় চিত্রকার্য্যের তাদৃশ বাহুল্য কিরূপে হয়? কিন্তু শিশুদিগের মধ্যে কয়লা খড়ি প্রভৃতি দ্বারা মাটিতে আঁচড় কাটিয়া খেলা করিবার রীতি যেমন অতি অল্প বয়সেই দেখা দেয়, তেমনি দৃষ্ট বস্তুর অনুকৃতি প্রস্তুত করার প্রবৃত্তি মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা হইতেই জন্মে। যেখানে ভূগর্ভনিহিত মনুষ্যকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সেই খানেই তৎকালেও মনুষ্যেরা যে খোদকতাকার্য্যে মনোনিবেশ

করিয়াছিল, এবং ঐ কার্য্যে কতকটা দক্ষতাও লাভ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সশব্দ ইঙ্গিতব্যঞ্জনা এবং বৃক্ষের পত্রে, ত্বকে, কাষ্ঠে, প্রস্তরফলকে এবং স্বশরীরে সেই ইঙ্গিত সকলের চিত্রকরণ বা খোদকতা, একই সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যদিও এমন কথা বলা যাইতে পারে না বটে, তথাপি যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অন্তরকাল যে অধিক ছিল এরূপ অনুমানও করিতে পারা যায় না। প্রায় প্রথম হইতেই সশব্দ ইঙ্গিত এবং চিত্রকরণ—এই উভয় কার্য্যই যেন একযোগ হইয়া চলিয়াছে বোধ হয়।

কিছুকাল এইরূপ চলিলে এবং শব্দের উচ্চারণ অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, দ্রব্যবোধক ইঙ্গিতে এবং সেই ইঙ্গিতের চিত্রে এবং তদ্বোধক শব্দে একটী অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্রগুলি যেমন দ্রব্যের তেমনি শব্দেরও পরিচায়ক হইয়া উঠে।

চিত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে যেমন দ্রব্যের পরিচায়ক, তেমনি সেই দ্রব্যবোধক শব্দেরও পরিচায়ক হইলে, ক্রমে ক্রমে চিত্রের অঙ্গভঙ্গ হইয়া তাহার সংক্ষেপসাধন হইতে থাকে। প্রথমে এক একটী চিত্রাংশ এক একটী পূর্ণাবয়ব পদকেই বুঝায়, পরে ঐ চিত্রাংশ খর্ব্ব হইয়া যায়, এবং পদাংশকে বুঝাইতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে চিত্রাংশগুলি আরও ভগ্ন এবং ক্ষুদ্র হইয়া এক একটী বর্ণমাত্রকে বুঝায়।

লিপিকার্য্যের সৃষ্টি এইরূপে অল্পে অল্পে হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা চিত্রলিপি পর্য্যন্তই করিতে পারিত—দক্ষিণ আমেরিকার পেরু এবং মেক্সিকো দেশনিবাসী লোকেরা চিত্রলিপি এবং শব্দলিপি দুই প্রকার লিপিকার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিত। উহারা কেহই বর্ণলিপি করিবার রীতি উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ সামর্থ্য প্রাচীন মিসরীয়দিগের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। মিসরীয় যাজকেরা চিত্রলিপি, শব্দলিপি এবং বর্ণলিপি—এই তিনপ্রকার লিপিকার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত বর্ণমালা য়িহুদী এবং ফিনিকীয়েরা প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণলিপিজ্ঞান ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য খণ্ডেও প্রচারিত হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ, তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণলিপি-জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে, মিসরীয় বর্ণলিপি তাহার মূল বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বর্ণলিপিজ্ঞানের উদ্ভাবন প্রণালী একই, তথাপি অনুমান হয় যে, তাহার কোন স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল থাকিবে। কিন্তু সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম।

চিত্ররূপ লিপি, সকল বিষয়েই খাটে। কোন ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাহা চিত্রলিপি খানির পূর্ব্বাপর ভাগের অনুক্রমে চিত্রিত করিলেই হয়। কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া তাহার অপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুটী চিত্রিত করিয়া তাহার উপরি-ভাগে তাহার সংখ্যাবোধক দাঁড়ি দিয়া দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু নরগণ বস্তুর সংখ্যা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে ঐ প্রণালী অবলম্বন করে নাই। তাহারা প্রথমতঃ দড়িতে গাঁইট বাঁধিয়া সংখ্যা বুঝাইত। এই ব্যাপার কোন কোন দেশে (১) এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে,রাজকোষের খাজনা, তহবিলের হিসাব এবং আদমসুমারীর হিসাব পর্য্যন্ত দড়ির গাঁইটেই রাখা হইত! ঐ দড়ি কখন কখন চারি শত হাত লম্বা এবং অনেকানেক শাখা প্রশাখাযুক্ত হইত, এবং গাঁইটগুলিও বিভিন্ন রূপের এবং বিভিন্ন তাৎপর্য্যের হইত। ইহাও এক প্রকার লিপিকার্য্য এবং ইহার মূল সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞান সুপরিস্ফুট হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। অদ্যাপি এমন দুই চারিটি বর্ব্বর জাতি আছে, যাহারা পাঁচের অধিক গণনা করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা ছয় বা সাত বলিতে হইলে, পাঁচ আর এক, পাঁচ আর দুই, এইরূপ বলিয়া থাকে। কোন কোন পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, এমনও বর্ব্বরভাষা আছে

(১) পেরু ও মেক্সিকোয় দড়ির শাখা প্রশাখা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ ও গ্রামাদি বুঝাইত।

যাহাতে এক আর দুই সংখ্যার নাম ভিন্ন আর কোন সংখ্যার নাম নাই। কিন্তু আবার কোন কোন অসভ্য জাতি এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া তাহার পর এক কুড়ি আর এক, এইরূপে গণনা করিত। ফল কথা, সর্ব্বাদৌ নরগণ মনোগত ভাব প্রকাশের নিমিত্ত অপরাপর স্থলে যেমন করিয়াছিল, তেমনি সংখ্যা বুঝিবার এবং বুঝাইবার নিমিত্তও সর্ব্ব-প্রথমে ইঙ্গিতব্যঞ্জনার আশ্রয় লইয়াছিল, অর্থাৎ আঙ্গুলপাঁজি করিয়াই আপনারা সংখ্যার অবধারণা করিত এবং আঙুল দেখাইয়াই সংখ্যার পরিমাণ অন্যকে বুঝাইত। এক হাতে পাঁচটী অঙ্গুলি—এই জন্য অনেক জাতি অনায়াসেই পাঁচ পর্য্যন্ত সংখ্যার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামকরণ করিয়া সংখ্যাগুলিকে অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুকরণপূর্ব্বক চিত্রিত করিত। এই ব্যাপারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রোমান সংখ্যালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—যথা,

এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ
I	II	III	IV	V

এস্থলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, এক, দুই, এবং তিন, এই তিনটী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হস্তের এক, দুই এবং তিন অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুরূপ। পাঁচ সংখ্যা দেখাইতে একটী কৌশল প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এক হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি এই দুইটী মাত্র অঙ্গুলিকে বিস্তৃত ভাবে রাখিয়া এবং মধ্যের তিনটীকে মুড়িয়া রাখিয়া পাঁচ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। চারি সংখ্যাটী যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অপর একটী কৌশল আছে। চারি সংখ্যা যে পাঁচ হইতে এক কম উহা সেই ভাবে প্রকাশিত।

পাঁচের পরবর্ত্তী সংখ্যালিপিতেও ঐ প্রকার ইঙ্গিতচিত্রের এবং কৌশলের লক্ষণ আছে। যথা—

ছয়	সাত	আট	নয়	দশ
VI	VII	VIII	IX	X

এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে, এক হাতে পাঁচ দেখাইয়া তাহার দক্ষিণে অপর হস্তের একটী, দুইটী এবং তিনটী অঙ্গুলির যোগে ক্রমান্বয়ে ছয় সাত আট সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইত। দুইটী হস্তের মণিবন্ধে মণিবন্ধে

তির্য্যগ্‌ভাবে সংযুক্ত করিয়া একবারে উভয়েই পাঁচ দেখাইলে যেরূপ হয়, তাহার চিত্র দশ সংখ্যার জ্ঞাপক এবং তাহা হইতে এক বাদ দিয়া নয় সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

রোমান সংখ্যালিপির পরীক্ষাদ্বারা, কিরূপে যে ইঙ্গিতচিত্র হইতেই সংখ্যার লিপি সাধিত হইয়াছে,তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সংখ্যার নামকরণ কিরূপে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। পণ্ডিতেরা অনেক বিচার করিয়া এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন যে, মানবগণ কোন দৃষ্ট পদার্থের নাম হইতেই এক একটি সংখ্যার নামকরণ করিয়াছিল। ক্রমে পুনঃ পুনঃ কথনাধীন সংখ্যাবাচক নামগুলির এত অপভ্রংশ ঘটিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতবাসীদিগের সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। আর্য্যজাতীয় লোকেরা এত বহুপূর্ব্বকাল হইতে সংখ্যা সম্বন্ধে সুপরিস্ফুট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং গণনা কার্য্যে এত পটুতা লাভ করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের আদিম অবস্থার চিহ্ন সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কৌশলের উপর কৌশল পড়িয়া যে মূল হইতে যাহা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরাই দশোত্তর গণনার সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহাদিগের স্থানেই পৃথিবীর অন্য সকল সুসভ্যজাতি ঐ গণনারীতির জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু দশোত্তর গণনা প্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক, উহা যে মানুষের দশটি অঙ্গুলি থাকাতেই জন্মিয়াছে; সুতরাং ইঙ্গিত-চিত্রের অনুকরণেই ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। যদি আর্য্যেরা বা অপর কেহ নিরপেক্ষ বিচারমাত্রকে মূল করিয়া গণনার রীতি অবধারিত করিতে পারিতেন, তবে উহা দশোত্তর না হইয়া তাহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর যে দ্বাদশোত্তর গণনার রীতি, সেই রীতিক্রমেই হইত। কোন অতিমানুষ শক্তিদ্বারা গণনার রীতি উদ্ভাবিত হইলেও সেইরূপ হইত, আর মনুষ্যের দুই হাতের আঙুল যদি দশটী না হইয়া বারটী হইত, তাহা হইলেও সেইরূপ হইত।

মুদ্রাদি প্রচলনের পর্য্যায়ক্রম।

ভাষা এবং লিপি-কার্য্যাদির আদ্যারম্ভ নির্দ্দেশ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার, মুদ্রাদি ব্যবহারের প্রবর্ত্তন এবং তাহার ক্রমোন্নতি নিরূপণ করা তেমন কঠিন কার্য্য নহে। যখন দুই চারিটী মনুষ্য-পরিবার পরস্পর সন্নিহিত ভূগর্ভে অথবা বৃক্ষশাখায় বাস করিয়াছে, তখন হইতেই সমাজের সৃষ্টি এবং অন্যোন্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে। যে পরিবারের কোন বস্তুর অভাব বোধ হইয়াছে, সে পরিবার অপর পরিবারের স্থানে সেই বস্তুটী পাইবার নিমিত্ত আপনাদের অর্জ্জিত অপর কোন বস্তু প্রদান করিতে চাহিয়াছে, এবং যদি এই বস্তুটী ঐ দ্বিতীয় পরিবারের প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান সহজেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে ঠিক এরূপ ঘটিয়া উঠে না। অর্থাৎ যাহা একটী পরিবারের নাই, তাহাই অন্য পরিবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে, অথবা এরূপ পরিবার যাহা চায়, তাহাই অপরটীর স্থানে আছে, এরূপ সর্ব্বদা ঘটে না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সকল পরিবারের লোকেই স্বোপার্জ্জিত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। তাহা করিতে আরম্ভ করিলেই বিনিময়ের বিশেষ সৌকর্য্যসাধন হইতে থাকে। পাঁচ সাতটী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা বিনিময় সাধন করিতে করিতে দৃষ্ট হয় যে, যে দ্রব্যটী যে জাতীয়ের প্রধান উপজীব্য, বিনিময় কালে তাহাই সমধিক কার্য্যে আইসে। মৃগয়ালু জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, পশুচর্ম্মের দ্বারাই তাহাদিগের অধিক বিনিময় সম্পন্ন হয়; জালজীবী জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, মৎস্যই তাহাদিগের বিনিময় কার্য্যের বিশেষ সাধক; কৃষ্যুপজীবীরা দেখে যে, ধান্য, গোধূম বা অপর কোন শস্য হইতে তাহাদিগের বিনিময় সহজে সাধন হয়। এরূপ হইবার কারণ অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে জাতির যে দ্রব্যটী প্রধান উপজীব্য, সে জাতির মধ্যে সেই দ্রব্যটীই সমধিক প্রকার কার্য্যে লাগে। সুতরাং সেই দ্রব্যেরই প্রয়োজন অপর সকল দ্রব্যের

প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হয়, এবং সেই জন্যই তাহার দ্বারা বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। এই জন্যই মৃগয়ালু প্রাচীনরুসীয় এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে পশুচর্ম্মই বিনিময়-সাধক ছিল। পাশুপাল্যোপজীবী প্রাচীন গ্রীক রোমান এবং জর্ম্মণদিগের মধ্যে গো মেষাদি পশুর আদান প্রদান দ্বারা বিনিময় সাধন হইত। কৃষ্যুপজীবী সকল জাতীয়েরাই প্রথমাবস্থায় কৃষিজাত শস্য দ্বারা বিনিময় সাধন করিয়া থাকে। আবিসিনিয়া দেশে এবং আফ্রিকার অপরাপর স্থানে লবণ একটী বিনিময় সাধন দ্রব্য। আইসলণ্ড এবং নিউফৌণ্ডলণ্ড দ্বীপে শুষ্ক মৎস্য দ্বারাই সকল দ্রব্যাদির বিনিময় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কোথাও না কোথাও উল্লিখিত সকল প্রথাই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উল্লিখিত প্রয়োজনসাধনযোগ্য দ্রব্যের সহিত আর এক প্রকার দ্রব্যেরও বিনিময় কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। সমাজের আদিমাবস্থায় যখন প্রতি পরিবারকেই বিনিময় সৌকর্য্যার্থে অনেকগুলি করিয়া দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে অলঙ্কারের উপযোগী কতক বস্তুও সংগৃহীত হইত। প্রবাল, কড়ি, রঞ্জিত প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত এবং মনুষ্যজাতির আদিমাবস্থাতেও অলঙ্কারপ্রিয়তা বিশেষ প্রবল থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই ঐ প্রকার দ্রব্যের সমূহ প্রয়োজন বোধ হইত, এবং তাহাদিগেরই দ্বারা বিনিময় কার্য্য সুবহু স্থলেই সুসাধিত হইত। বস্তুতঃ সুবহু প্রাচীন যে প্রস্তরযুগ তাহাতেও স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবহার নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরে যখন সমাজের অধিকারবিস্তৃতি সম্পাদিত হইল এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হইয়া অনেকানেক বহুমূল্য দ্রব্যের আবিষ্কৃতি এবং প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল—তখন অপর সকল বিনিময় সাধন সামগ্রী অপেক্ষা ধাতুদিগের দ্বারাই উহার বিশেষ সৌকর্য্য অনুভূত হইয়া উঠিল। ধাতু সকল বহুকাল অবিকৃত থাকে—উহাদিগকে অধিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করিতে হয়, অতএব উহাদিগের মূল্যও অধিক হয়—উহাদিগকে অনায়াসে বিভক্ত করা যায় এবং অগ্নিতে একত্র গলাইয়া আবার সংঘটিত করা যায়। ধাতু-

দিগের এই সকল অনন্যসাধারণ গুণ থাকায়, কালে উহারাই বিনিময় সাধনের বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে।

পরন্তু, প্রথমে যখন ধাতুদিগের দ্বারা বিনিময় সাধন হইত, তখন উহাদিগের মূল্য ওজনদ্বারা এবং কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে সময়ের অপব্যয় হইত এবং মূল্য নির্দ্ধারণও সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ববাদিসম্মত হইত না। এই জন্য যখন সমাজ সম্বর্দ্ধিত হইয়া কোন কুলপতি বা রাজার আশ্রয় লাভ করে, তখন বিনিময় সাধক ধাতুখণ্ডগুলি তাঁহা কর্ত্তৃক তুল্যাকৃতি ও তুল্যপরিমাণে স্বনামে অথবা কোন দেবতার নামে মুদ্রিত হইতে থাকে। সেই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ডের মূল্য রাজকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ওজন করিয়া আর তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় না। সেগুলির দ্বারা বিনিময়কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকে। সেগুলিকে মুদ্রা বলে।

যতগুলি ধাতু প্রচলিত আছে তাহার সকলগুলি হইতেই কোন দেশে বা কোন কালে মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে। লৌহের মুদ্রা প্রাচীন স্পার্টা নগরে এবং অত্যল্পকাল গত হইল জাপান দ্বীপে চলিয়াছিল। সীসক মুদ্রার প্রচলনের কথা গ্রীক এবং লাটিন কবিগণের গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। রাঙ্গ বা টিনের মুদ্রা কোন সময়ে ইংলণ্ডে এবং জাবাদ্বীপে এবং মেক্সিকো দেশে চলিয়াছিল। তাম্র মুদ্রা বহুকালাবধি অনেক দেশেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। রোম সাম্রাজ্যে, রুসিয়াতে এবং সুইডেন দেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাম্র মুদ্রারই সমধিক প্রচলন ছিল। রৌপ্য এবং স্বর্ণের মুদ্রা যে এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই প্রচলিত, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্লাটিনম এবং নিকেল নামক দুইটী ধাতু হইতেও মুদ্রা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সুসভ্যদেশ মাত্রে প্রচলিত মুদ্রা তামার, রূপার এবং সোণারই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যেমন দিন দিন নূতন খনির আবিষ্কার হইয়া ধাতুগুলির অধিকতর পরিমাণে উদ্ধরণ হইতেছে, তেমনি অল্পমূল্যের ধাতু অধিকতর অল্পমূল্য হইয়া যাইতেছে, এবং এই প্রকার ধাতুর মুদ্রার প্রচলন ন্যূন হইয়া পড়িতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে তাম্র এবং

রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন সংক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলনই বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মনুষ্যসমাজ সুসম্বর্দ্ধিত এবং রাজ্যগুলি অধিক সুবিস্তৃত হইলে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা ব্যবহারেও বাণিজ্য কার্য্যের সম্যক্ সুবিধা হয় না—দূর প্রদেশে বা দূরবর্ত্তী ভিন্ন দেশে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা প্রেরণ করা অনেক অসুবিধাজনক হয়। কিন্তু সমাজের তাদৃশ অবস্থায় প্রায়ই লিপিকার্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব দূরবর্ত্তী স্থানে ধাতু বিনির্ম্মিত মুদ্রাদি প্রেরণের পরিবর্ত্তে বরাত চিঠি এবং হুণ্ডির প্রচলন হইয়া উঠে। কিছুকাল হুণ্ডির প্রচলন হইতে হইতেই নোটের চলনও আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহা হইলে বাণিজ্য কার্য্যের যৎপরোনাস্তি সৌকর্য্য-সাধন হয়। এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই নোটের চলন প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন দেশে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজ নামে নোট প্রচলিত করেন। ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে। চীন সাম্রাজ্যে সম্রাটের নিজ নামাঙ্কিত তাম্র ফলকের নোট চলে। গবর্ণমেণ্টের নোটকে করেন্সি নোট বলে। কোন কোন দেশে যথা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক হইতেই বিশেষ বিশেষ রাজনিয়মের অনুসারে নোট প্রচলিত হয় এবংসেই জন্য ঐ সকল নোটকে ব্যাঙ্কনোট বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—**:**—

বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন।

হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই অন্তঃশাসনের উপায় আছে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে ঐ সকল উপায় ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এখনও এখানে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা নিতান্ত কম নয়। ইংরাজ এদেশের রাজা হইয়া এবং সর্ব্বত্র আপনার দত্ত ক্ষমতার বিস্তার করিয়া এদেশের সমাজ-শাসনপ্রণালী বদ্ধপ্রায় করিয়াছেন। তথাপি কোথাও কোথাও তাহার কিছু কিছু অবশেষ আছে। সেই অবশিষ্ট ভাগ আমি কিরূপ দেখিয়াছি, তাহা বলিব।

কোন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—উহাতে প্রায় পাঁচ শত ঘর জানা আগুরি জাতীয় লোকের বাস এবং গ্রামের মণ্ডল সংখ্যা পাঁচ জন। ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে একটী শিবালয় এবং শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে অতি সুপরিষ্কৃত ভূমি। ঐ দিন অপরাহ্ণে গ্রামের পাঁচ জন মণ্ডল এবং গ্রামের অপরাপর অনেক লোক শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইয়া একটী অপরাধীর বিচার করিলেন। অপরাধ ধান-চুরি। চুরির মাল ধরা হইল, চুরির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, চোরকে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ অবসর দেওয়া হইল। চোর অধোবদনে দোষ স্বীকার করিল এবং বলিল যে নিতান্ত দারিদ্র্য নিবন্ধনই সে ঐ কাজ করিয়াছিল। চোর যে পাড়ায় বাস করে সেই পাড়ার মোড়ল তাহার দারিদ্র্যের প্রমাণ দিলেন। তখন পাঁচ জন মোড়লে বিচার করিতে লাগিলেন চোরের প্রতি কিরূপ দণ্ড হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি না বাড়ে তাহার কি উপায় করা যাইবে। শিবালয়ের পুরোহিত ঠাকুর এবং উপস্থিত আরও চারি পাঁচ জন ঐ বিচারে যোগ দিলেন। পরিশেষে অবধারিত হইল যে, দুই জন লোক চোরের কানে ধরিয়া পাঁচ

বার শিবালয় প্রদক্ষিণ করাইবে, আর চোর আপনার পাড়ার মোড়লকে জানাইলে তিনি তাহার মজুরি জুটাইয়া দিবেন অথবা তাহাকে চাউল ধার দিবেন—ধার লইলে তাহাকে খাটিয়া শোধ দিতে হইবে। যাহার ধান চুরি গিয়াছিল সে ধান লইয়া যাইবার সময় গোরকেই বলিয়া গেল, "যদি কালিকার কাজ আর কোথাও না জুটিয়া থাকে, তবে আমারই ক্ষেতে যাইস।"

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার বোধ হইল যে রাজার শাসন অপেক্ষা গ্রামের শাসন শত সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট। আমি ঐ গ্রাম্য মণ্ডল-দিগের মধ্যে এক জনকে নিভৃতে বলিলাম 'তোমরা চোরের দণ্ড যেরূপ করিলে তাহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। কিন্তু চোর যদি থানায় গিয়া নালিস করে যে তাহার শারীর দণ্ড করা হইয়াছে, তাহা হইলে কি হইবে? * * * "সে থানায় যাইবে না। আর মনে করুন যদিই যায় তাহা হইলে সে ত গ্রামে আর কাহার স্থানে মজুরি পাইবে না। তাহাকে এ গ্রামের বাস উঠাইতে হইবে।" * * * ভাল, ঐ ব্যক্তি যদি গ্রামান্তরের লোক হইত, তাহা হইলে কি করিতে? * * * যদি গ্রামের ভিতরেই ধরিতে পারিতাম ভাল করিয়াই উত্তম মধ্যম দিতাম, দিয়া ছাড়িয়া দিতাম।" * * * "সে নালিস করিলে কি হইত?" * * * "কিছুই প্রমাণ হইত না।" কথায় কথায় জানিতে পারিলাম যে ঐ গ্রামের কোন লোক গ্রামান্তরবাসী কাহার স্থানে টাকা কর্জ্জ করে না। কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইলে মণ্ডলদিগকে জানায় এবং মণ্ডলেরা গ্রাম হইতেই টাকা কর্জ্জ দেওয়ায়। ঐ গ্রামের জমিদার যখন আইসেন, তাঁহার যথেষ্ট সম্মান সমাদর করে, তাঁহাকে চাঁদা তুলিয়া দর্শনী দেয়; কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুকিতে নিষেধ করে। যে জমীদারের অধিকারে ঐ গ্রাম তিনি প্রজাদিগের মন রাখিয়াই চলিতেন দেখিয়াছি। এবং শুনিয়াছি তিনি স্বচ্ছন্দে আপনার ঘরে বসিয়াই যথাকালে খাজনা এবং যাহা আবোয়াব ধার্য্য ছিল তাহা নির্ব্বিঘ্নে পাইতেন।

কিন্তু ওরূপ স্বাধীন-তন্ত্র গ্রাম আর অধিক নাই। অধিক স্থলেই গ্রামের শাসন জমীদারের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। আমি যশোহর জেলার

একটি জমিদারী কাছারিতে ফৌজদারী বিচার যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিব; উহাও সমাজের আত্মশাসন শক্তির একটী উদাহরণ।

জমীদারের নায়েব বিচারপতি, গোমস্তা এবং মুখ্য মণ্ডলেরা সভাস্থ এবং নায়েব মহাশয়ের সহকারী। অভিযোক্তা একটী ব্রাহ্মণ। অভিযোগের বিষয় এই—সেকরাকে একযোড়া রূপার বালা গড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেকরা বালা গড়িয়া যথাকালে দেয় নাই আর অনেক পরে একযোড়া সীসকপূর্ণ বালা দিয়া রূপা চুরি করিয়াছিল। বিচারপতি বালা যোড়াটী দেখাইয়া সেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বালা তুই গড়িয়া দিয়াছিলি? সেকরা বলিল আমি দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি নিজ হাতে গড়ি নাই, আমার এক বেটা কারিগর ওটা গড়িয়াছিল এবং সেই উহাতে সীসা পুরিয়া দিয়াছিল! একজন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর কোন কারিগর রে।" সেকরা একটু ঢোক গিলিয়া একজনের নাম করিল। অমনি আর একজন বলিয়া উঠিল "সে ত আজি দুই বৎসর তোর দোকান ছাড়া হইয়াছে। তোরা দুই বাপ বেটা ভিন্ন আর কেহ তোদের দোকানে কারিগর নাই।" সেকরা আমতা আমতা করিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় অভিযোক্তা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় ভরি রূপা দিয়াছিলেন ঠাকুর?" * * * "আট ভরি"—সেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন রে আট ভরি বটে?" * * আজ্ঞা আট ভরি" * * "আট ভরির দাম আট টাকাই ধরা যাউক" এই বলিয়া সেকরাকে বলিলেন, "এই আট টাকা, আর জুয়াচুরির জরিমানা দুই টাকা, আর মিথ্যা ওজর করিয়াছিস তাহার জরিমানা আর দুই টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ বারটী টাকা এইক্ষণে হাজির কর।" সেকরা বলিল "এত রাত্রে অত টাকা কোথায় পাব?" * * "ফের যদি কোন কথা কবে জরিমানা বাড়িবে।" সেকরা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, দুইজন পাইক তাহার সঙ্গে গেল, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বারটি টাকা আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আটটী টাকা হাতে হাতে পাইয়া চলিয়া গেলেন। সেকরা সেই সীসক পূর্ণ বালা ফেরত চাহিল, নায়েব একটু মুচকি হাসিলেন, গোমস্তা চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বলিলেন, ঐ বালা লইয়া বুঝি আবার কাহাকেও

ঠকাইতে চাহিস্ এই বলিয়া সেকরাকে গালি গালাজ করিলেন। জমীদারী অন্তঃশাসনে রাজশাসনের ছায়া দেখিলাম, তথাপি সাক্ষাৎ রাজশাসনের অপেক্ষা ইহার মলিনতা অনেক কম বোধ হইল। উহা নিতান্ত বিচার বিক্রয়ের দোকানও নয়, মিথ্যা প্রবঞ্চনার নিজস্ব ক্ষেত্রও নয়, আর অভিযোজ্য এবং অভিযোক্তা উভয়ের সর্ব্বনাশেরও পথ নয়।

এ সকল অনেক দিনের কথা। ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগে একটু মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরীর সহিত দেখা হইলে তিনি একটি স্থানের নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি ঐ স্থানে কখন গিয়াছিলাম কি না। তিনি যে স্থানটীর নাম করিলেন সেটী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। আমি একাধিকবার সেখানে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম ঐ স্থানে একটী মুন্সেফী আদালত বসিয়াছিল। কিন্তু আদালতে একটীও নালিস রুজু হয় নাই। সুতরাং আদালতটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিসের একটি থানা আছে বটে, কিন্তু পুলিসকেও বড় কিছু করিতে হয় না। আমি ঐ কথা বলিয়া আরও বলিলাম "দেশের সর্ব্বত্র যদি ঐরূপ হয়, তবে বড়ই ভাল হয়।" সেক্রেটারী সাহেব ঐ কথায় রাগ করিলেন না। বলিলেন, "ওরূপ হওয়া প্রার্থনীয় বই কি—কিন্তু জমিদারেরা কি সুবিচার করেন বলিয়া তোমার বোধ হয়—উহাঁরা কি পক্ষপাত করেন না—উহাঁরা কি ব্রাহ্মণ অপরাধীর প্রতি অকাতরে দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন?" আমি বলিলাম, আমার বোধ হয় পারেন, আর যদি নাই পারেন তাহাতে দোষ কি? দণ্ডদানের মূল যাহাই হউক, সমাজ যাহার পক্ষে যে দণ্ড উচিত মনে করে, তাহাই কি প্রকৃত দণ্ড নয়? অন্যরূপ হইলে সাধারণতঃ বিচারের উপরে অভক্তি ও দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতিই কি সমাজের সহানুভূতি জন্মে না? গবর্ণমেণ্টের আদালতে ব্রাহ্মণ চণ্ডালনির্ব্বিশেষে শারীর দণ্ড প্রয়োগ হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড অতি অযুক্ত বলিয়াই ভাবে। এমন স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি শারীর দণ্ড প্রয়োগে কি কোন শুভ ফলোৎপত্তি হইতে পারে? সেক্রেটরী সাহেব ওসকল কথা আর গায়ে মাখিলেন না। বলিলেন, "যাহাদিগের

হস্তে ধর্ম্মাধিকরণ শক্তি স্বতঃই পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট করাই ভাল। আমি বলিলাম, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সৃষ্টিতে ঐ সকল লোকের হাত হইতে প্রকৃত ধর্ম্মাধিকরণ শক্তি বাহির হইয়া যাইবে; আপনাদের নিয়মানুযায়ী বিচারে এবং আপনাদের পর্য্যবেক্ষিত কার্য্যে আর কোন স্বাধীনতাই থাকিবে না। বিচার কার্য্যটা কেবল "কাগুজে বিচার" হইয়া উঠিবে। চুরির মালও আদায় হইবে না, যাহার মাল সেও তাহা পাইবে না, জরিমানার হার বর্দ্ধিত হইবে এবং লোকের দুঃখ বাড়িবে।" সেক্রেটরী সাহেব একটু হাসিলেন মাত্র। দুই মাসের মধ্যেই গেজেটে দেখিলাম ঐ জমীদারের দেওয়ান অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ থাকে না। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার প্রণালীতে সামাজিক অন্তঃশাসনের সমস্ত শুভ ফল ফলিতে পারে না।

হিন্দু সমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। স্থূলতঃ এই শাসনের বিষয় এমন সকল পাপাচরণ যাহা রাজদণ্ডের অন্তর্ভূত নহে।

ইউরোপের ইতিহাসে দুইবার মাত্র এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যখন সমাজের মধ্যে পবিত্রভাবের উত্তেজন হেতু রাজদণ্ড্য অপরাধে এবং সমাজ দণ্ড্য পাপাচারে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। একবার রোমীয়দিগের অভ্যুদয়ের এবং অতি প্রাবল্যের সময়ে, তাহাদিগের সেন্‌সর নামক কর্ম্মচারীরা প্রজাব্যূহ আপনাপন গৃহে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করে তাহারও সংবাদ লইতেন এবং পাপাচারীর দণ্ড করিতেন। ঐ সময়ে রোমীয়েরা যেমন সতেজ হইয়াছিল তেমন আর কখন হয় নাই। ইংলণ্ডও যখন প্রথমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন ইংরাজ যোদ্‌গণের সাহস, বীর্য্যবত্তা এবং ধর্ম্মশীলতা ইউরোপীয় অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ক্রমওয়েলের অধিকারকালে, পাপাচরণে এবং অপরাধে বড় ইতর বিশেষ করা হইত না। তখন যেমন অপরাধের তেমনি পাপাচারেরও বিচার এবং দণ্ড হইত। তখন ইংরাজেরা বাহ্য এবং গার্হ্য বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এইরূপ দুইটী-জীবন ধারণ করিতেন না

অর্থাৎ এখন যেমন কথা উঠিয়াছে আমি সরকারি কাজ কর্ম্ম কিরূপ নির্ব্বাহ করি তাহাই দেখ, আমি ঘরে বসিয়া কি করি না করি অন্যের তাহা দেখিবার কোন অধিকার নাই—তখন সেরূপ কথা উঠে নাই। ইংরাজ তখন তেজোবীর্য্যে জাজ্বল্যমান হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষেও কোন কালে পাপাচরণের প্রতি রাজদণ্ড যুক্ত হইত। কিন্তু সে কাল অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। আমার অনুমান এই যে বৌদ্ধ রাজাদিগের সময়েই রাজদণ্ড্য অপরাধে এবং অন্যবিধ পাপাচরণে প্রথমে প্রভেদ জন্মে এবং মুসলমানদিগের সময়ে সেই প্রভেদ সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইয়া যায়। আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে, তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না। সুতরাং পবিত্র হিন্দু সমাজকে আপনার পবিত্রভাব রক্ষার নিমিত্ত অন্তঃশাসনের উপায় করিতে হইল। অতএব সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান লোকদিগকেই সমাজ পতির স্থানীয় করিয়া লওয়া হইল এবং তাহাদিগের শাসন শিরোধার্য্য করা হইল। পুরাণ সংহিতাদিতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে যে, সমাজ-রক্ষার্থ "মহাত্মগণ" বা "মনীষিগণ" এই এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ঋষিগণ অথবা "সংহিতাকারগণ" বলিয়া ঐ সকল লোকের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজে আত্মশাসন কেমন সুবিস্তৃত এবং কেমন দৃঢ়মূল। শাস্ত্রের কথা না লইলে হিন্দুরা কোন কথা শুনে না বলিয়া যে প্রবাদ আছে সেটি প্রকৃত কথা নহে। মহাত্মারা" যাহা বলেন "বুদ্ধিমানেরা" যে উপদেশ দেন হিন্দুরা ভক্তিপূর্ব্বক সে সকল কথাও শুনে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করে। শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও "দেশাচার" এবং "দেশব্যবহার" ইহাদিগের নিকট অতি মান্য।

ইউরোপীয়েরা এই সকল শাসনের তেমন বশীভূত নহেন। এই জন্য উহাঁদিগের সকল কাজই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, আর যেখানে আইন কিছু স্পষ্ট নির্দ্দেশ না করিয়াছে সেই খানেই ইউরোপীয় জনগণ একেবারে নিরঙ্কুশ। রাজব্যবস্থা পাপের অতি স্থূলাংশই ধরিয়া চলিতে পারে, পাপের সূক্ষ্মাংশ গুলি রাজ ব্যবস্থার হাতে ঠেকে না। কিন্তু রাজ-ব্যবস্থা ভিন্ন ইউরোপীয়দিগের পাপাচরণ দমনেরও আর কোন

প্রকৃতরূপে কার্য্যকারী বিধান নাই, সুতরাং উহারা অধিক পাশবাচার।

ইউরোপীয় সমাজের এই দোষ লক্ষ্য করিয়া এবং উহাদিগের পরিগৃহীত ধর্ম্মপ্রণালী হইতে ঐ দোষের কোন অপনয়ন হয় না দেখিয়া অগষ্ট কোমটি আপনার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা প্রকাশ্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে অর্থাৎ তোমাদিগের আচার ব্যবহারের প্রতি আত্মসমাজের চক্ষু পড়িতে দিবে। সমাজের চক্ষু পড়িলেই আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হইবে।

হিন্দুদিগের সামাজিক শাসন ঐ কাজটী করিয়া আসিতেছে। সকল হিন্দুকেই প্রকাশ্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পথে স্থিরতর রাখিতেছে। আজি কালি অনেকে সমাজের শাসন অমান্য করিতেই শিখিতেছেন। তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহাদিগের আত্ম সমাজই তাঁহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান এবং নীতিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্ব, তাঁহারা মনে করেন না যে আত্মসমাজের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার অতি নীচ প্রকৃতির লক্ষণ, তাঁহারা জানেন না যে ভারতবর্ষে যতদিন সমাজ শাসন সম্মানিত হইতেছে ততদিন এই দেশ পরাধীন হইয়াও কতক পরিমাণে স্বাধীন, তাঁহারা ভাবেন না যে যদি সমাজ শাসন একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়, তবে ভারতবাসী আর কখন জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইবে না। সমাজশাসন বিলুপ্ত হইলেই পশুভাব প্রবল হইবে, পাপাচরণ বাড়িবে এবং হিন্দু জাতীয়দিগের যে উন্নত ধর্ম্মনীতির জন্য ইহাঁরা এখনও পৃথিবীর সর্ব্বোপরি অবস্থিত সেই ধর্ম্মনীতির অধঃপাত হইবে। এই বিষয়ে একটা বড়ই স্থূল কথা কখন কখন শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে অপরাধের দণ্ড রাজ ব্যবস্থানুসারে হইবে, আর পাপ কার্য্যের দণ্ড ঈশ্বর করিবেন, এই দুই শাসনের মধ্যে আবার একটা সমাজ-শাসন রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোম্‌টির মতাবলম্বীরা এরূপ কথা বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা সমাজের শাসনকেই সকল শাসনের অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মানেন। অপরাপর খৃষ্টান ইউরোপীয়রাই ঐ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন যে রাজব্যবস্থা এবং ধর্ম্মব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের ভদ্র সমাজে

একটা ঈজ্জতের বা সম্ভ্রমের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ ব্যবস্থা ইউরোপীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে আছে বলিয়াই উহাঁরা "ভদ্রলোক" আর ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা সূত্রের নাম গন্ধও নাই বলিয়াই তাহারা নিতান্ত পশু। ফলকথা লোকে কাহার আচার ব্যবহারকে ভাল বলে কি না বলে, তাহা জানিতে না পারিলে অনেকানেক স্থলে এবং অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম্মচ্যুতি হয়। এই জন্য রাজশাসন এবং ধর্ম্মশাসন সত্ত্বেও সমাজ শাসনের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। সমাজের শাসন অসম্মানিত হওয়া অতি দুর্লক্ষণ। উহা হওয়া লোকের প্রকৃতিতে পাশব স্বৈরভাবের উত্তেজনা বুঝায় এবং পাপাচরণের বৃদ্ধি সূচনা করে।

বঙ্গদেশে, সমাজের শাসন নিতান্ত অল্প প্রবল নহে। রাজধানীতে এবং সহর বাজারে কিছু কম বটে, কিন্তু সমস্ত পল্লীগ্রামে সমাজের শাসন বিলক্ষণ সবল এবং সতেজ। সহরের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের লোকেরা সরল এবং ধর্ম্মভীরু। কোন সমাজেরই শাসন সাক্ষাৎ শারীর দণ্ড বা সাক্ষাৎ ধনদণ্ড প্রয়োগ দ্বারা সাধিত হয় না। সমাজের দণ্ড ত্যাগরূপকই হইয়া থাকে। সমাজ পিতৃতুল্য; দুষ্ট সন্তানের প্রতি বলেন, "রে দুষ্ট! তোকে আমি ত্যাগ করিলাম।" বঙ্গসমাজ ঐ ত্যাগের কয়েকটী চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন যথা—(১) পংক্তি বারণ—(২) নিমন্ত্রণ বারণ—(৩)হুঁকা বারণ—(৮) আসন বারণ—(৫) নাপিত ধোবা বারণ।

কিছুকাল পূর্ব্বের কথা বলিতে পারি, আমি স্বচক্ষে তিন চারিটী গ্রামে ঐ সকল দণ্ডের কোন কোনটীর প্রয়োগ এবং তাহাতে অতি সুফল ফলিয়াছে দেখিয়াছি। এক জনের প্রতি হুঁকা বারণ হইয়াছিল; তিনি সত্য সত্যই একটী অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন—একজন ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রহার করিয়াছিলেন। হুঁকা বারণ হইলে ঐ ব্যক্তি গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং সমাজের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

আর একস্থলে একজনের নিমন্ত্রণ বারণ দেখিয়াছিলাম। তিনিও একটা উৎকট দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া নীচজাতীয়া কন্যাকে লইয়াছিলেন। তিনি উহাকে পরিত্যাগ করিলেন,

পত্নীকে গৃহে আনিলেন এবং সজাতীয় অনেকগুলি লোককে ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য হইলেন। অপর একস্থলে নিমন্ত্রণ বারণে কোন ফল না হওয়াতে ধোবা নাপিত বারণের উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার উল্লেখ হইবামাত্র লোকটা সমাজের বশে আসিল। যে দোষে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করিল এবং অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সমাজে সমন্বয়ীকৃত হইল।

সম্প্রতি একটী স্থানে দেখিলাম, অতি দুষ্কর্ম্মা কোন এক ব্যক্তিকে একটা নিমন্ত্রণে বাদ দেওয়া হইল। অমনি সে ব্যক্তি কোন পদশালী একটী বাবুজীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনিও ঐ নিমন্ত্রণে গেলেন না, একটী নূতন দল বাঁধিয়া ঐ দুষ্ট ব্যক্তিকে সমাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন —সে আর এক ঘরে হইল না। গ্রামে দলাদলি বাধিয়া রহিল।

এই রূপে যে দলাদলি হয় তাহাতে সমাজকৃত দণ্ড কার্য্যকারী হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ কাণ্ড বহুস্থলে ঘটে না। আর যিনি ওরূপে দলাদলি বাধান তাঁহাকেও অনেক ব্যয় ব্যসন করিতে হয়, সুতরাং সমাজ-কৃত দণ্ডের যে একেবারেই কোন ফল ভোগ করেন না তাহাও নহে।

একজন চাকুরে প্রবাস হইতে স্বগ্রামে আসিয়া আপনি যে অনেক টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছেন তাহার জাঁক করিতেন। কিন্তু কখন কাহাকেও কিছু দান করিতেন না, মুষ্টিভিক্ষাও না। গ্রামবাসীরা তাঁহার বাটীতে প্রতিমা ফেলিয়া ছিল। তিনি প্রতিমার পূজা করিলেন না; কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। গ্রামস্থেরা বাবুকে একঘরে করিয়া রাখিল। তাঁহার নিষ্কৃতি হইল না। তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন।

একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কোন অযাজ্যজাতীয় লোকের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণপণ্ডিতটীর অনেকগুলি ব্রাহ্মণ যজমান ছিল। সেই যজমানদিগের মধ্যে একজন অপর একজনের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়া বলিলেন——"শিরোমণি ত আপনারও পুরোহিত আমারও পুরোহিত। উনি অমুকের স্থানে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিয়াছেন এই জন্য আমাদের উহাঁকে ত্যাগ করা উচিত"। অপর ব্যক্তি বলিলেন—

"শিরোমণিকে আমরা বার্ষিক কত দিয়া থাকি, দেখা যাউক। যদি উহার সপরিবার ভরণ পোষণের উপযোগী দিয়া থাকি এমত হয়, তবে উনি লোভপরবশ হইয়াই অমুকের স্থানে দানগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ হইবে, এবং আমরা উহাঁকে অবশ্যই ত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আমরা উহাঁকে সপরিবার ভরণ পোষণোপযোগী টাকা না দি, তবে ব্রাহ্মণের তেমন দোষ ধরিতে পারি না। কারণ উহারও উদরান্নের উপায় করা আবশ্যক।" এই কথা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইল। শিরোমণির ব্রাহ্মণ যজমানেরা মিলিয়া তাঁহার আয় বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া এবং অযাজ্য লোকের স্থানে দানগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শিরোমণি লোভসম্বরণ না করিতে পারিয়া পুনর্ব্বার অযথা লোকের দান গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মণ যজমানেরাও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি ঠেকো হইয়া রহিলেন।

অনেকে মনে করেন যে সমাজের শাসনে আর কোন বলই নাই। সেটী প্রকৃত কথা নহে। যদি বঙ্গীয় সমাজে কোন বল না থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে দেশের সকল লোকেই মদ্যপ হইয়া উঠিত। মদ্যপান পূর্ব্বাপেক্ষায় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কেহ পল্লীগ্রামে প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান করিতে পায় না। এখনও মদ্যপায়ীর প্রতি একটা ঘৃণা সকল লোকেরই মনে মনে আছে। তবে ভারতবর্ষের অপরাপর ভাগ অপেক্ষা বাঙ্গালায় পানদোষের বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এবং ঐ দোষ যতটুকু বাড়িয়াছে, সমাজ শাসনের বল অবশ্যই ততটুকু কমিয়াছে।

জাতিভেদ।

অগষ্ট কোম্‌টিকে ইউরোপীয়েরা "সমাজ বিজ্ঞান" শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণন করেন। তিনি মনে মনে মনুষ্য সমাজের একটী আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, উহাতে (১) যাজক বা উপদেষ্টৃ সম্প্রদায় (২) শাসন কর্ত্তৃ বা রাজপুরুষ সম্প্রদায় এবং (৩) কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি নির্ব্বাহ-কারী সাধারণ প্রজা সম্প্রদায়, এই তিনটী সম্প্রদায় থাকা আবশ্যক। তিনি উল্লিখিত তিনটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমটীকে অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা-প্রণয়নের ও শাসন কার্য্যোপদেশের এবং কৃষি প্রভৃতি সকল বিষ-য়ের শিক্ষা প্রদান করিবার ভার দিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে যাজকবর্গ কখনই ধনসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে না, প্রত্যুত সমাজান্তর্গত অপর সম্প্রদায়ের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তৃতীয় সম্প্রদায়সম্ভুক্ত লোকেরা স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায়ই শিখিবে। যিনি এইরূপ আদর্শ সম্প্রদায়ের কল্পনা করিয়া ইউরোপীয় জাতিদিগকে উহার অনুরূপ করিয়া আপনাপন সমাজ সংঘটনে অনুরোধ এবং উত্তেজনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি বহু প্রাচীন কালের লোক নহেন, তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য সম্বন্ধীয় অনেক লোক এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন এবং তিনি স্বয়ং একত্রিংশ বর্ষ * হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি যে তাদৃশ আদর্শের অনুযায়ী সমাজ গঠন করিতে উপদেশ দেন তাহার কারণ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয়রা বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে ; উহারা একান্ত বিব্রত উত্যক্ত এবং স্বাস্থ্য-হীন হইয়াছে—উহাদিগের সমাজ বন্ধন সুঘটিত না হইলে, উহাদিগের কোন সুখশান্তি হইবে না এবং উহারা দিন দিন বিপথে যাইয়া ক্রমেই অধর্ম্মাচারী হইয়া বিনষ্ট হইবে।

এখন মনে কর,কোম্‌টির আদর্শে গঠিত একটী অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য সমাজ কোন কারণে স্বদেশ বিচ্যুত হইয়া অপর একটী দেশে তথায় আপনাদের অপেক্ষা রূপে গুণে অনেক অপকৃষ্ট এমন বিপক্ষজাতীয়

* অগষ্ট কোম্‌টি = ১৭৯৮—১৮৫৭।

লোকের মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইল। বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিয়া বিজিত হইল। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় যাজকেরা কি করিবেন? নিজ সমাজের এবং ঐ বিজিত দুর্বৃত্ত লোকদিগের হিতকামনায় তাহাদিগকে এক প্রকার কোমল দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন; বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না রাখিয়া বিজিত লোকদিগের কন্যাগণের পাণি গ্রহণে সম্মতি দিবেন এবং অনুলোমবিবাহ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়া সেই সঙ্কর জাতীয়দিগকে বিবিধ শিল্পকার্য্য শিখাইবেন। যে অনুলোম সঙ্কর যত উৎকৃষ্ট সে তদনুযায়ী উৎকৃষ্ট শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষা করিতে থাকিবে এবং পৈত্রিক ব্যবসায় শিক্ষা করায় লোকের সুবিধা অধিক হয় বলিয়া এবং আপনাদের সমাজে ঐরূপ আদর্শ আছে বলিয়া, সঙ্কর বর্ণ সম্ভুক্ত জনগণ পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী এবং পৃথক পৃথক সম্প্রদায় সম্ভুক্ত হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষে অবিকল এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কোম্‌টীর আদর্শভুক্ত যাজক প্রধান ত্রিধাবিভক্ত সমাজ আর্য্যদিগের। ভারতবর্ষে আসিয়া আদিম অধিবাসীদিগের সংস্রবে দাসনিয়োগ এবং বর্ণসঙ্কর উৎপাদনপূর্ব্বক চতুর্থ সম্প্রদায়, শূদ্র জাতি এবং তদন্তর্নিবিষ্ট বহুশাখা প্রশাখা জন্মাইয়াছে। অবশ্য কোন বিশিষ্ট প্রবল কারণ বশতঃই শূদ্র একেবারে আর্য্য-সমাজের তৃতীয় সম্প্রদায় বৈশ্যদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায় নাই এবং যতদিন সে কারণ বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন বৈশ্যদিগের মধ্যে শূদ্রের অন্তর্নিবেশ হইতে পারিবে না।

কিন্তু তাদৃশ অন্তর্নিবেশ যে কালক্রমে অবশ্যম্ভাবি এবং উহাদিগের পার্থক্য রক্ষা করিবার কারণ যে বহুদিন হইতে হীনবল হইতেছে তাহা বুদ্ধদেবের এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকানেক মহাপুরুষের উদ্যম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব, মহাত্মা নানক, কবীর, চৈতন্য মহাপ্রভু, ইহাঁরা সকলই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—সাম্যধর্ম্মী মুসলমানেরাও পুনঃ পুনঃ ঐ চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই। কেন হয় নাই—কোন প্রবলতর শক্তি ঐ সকল চেষ্টাকে বিফল করিয়াছে সন্দেহ নাই। স্বল্পদর্শীরা বলিবেন সেই শক্তি ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বিপক্ষতা। কিন্তু ঐতিহাসিক বৃহদ্ব্যাপার সকল

প্রাকৃতিক শক্তিরই কার্য্য—ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বিপক্ষতা বা স্বপক্ষতা ওরূপ কার্য্যের সাধক হয় না। বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালে ব্রাহ্মণেরাও একবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধরাজধানী পাটলিপুত্র নগরের সন্নিহিত বিহার প্রদেশেরত জাতি বিচার রহিতই হইয়া গিয়াছিল। যদি জাতি-ভেদের কোন নৈসর্গিক কারণ না থাকিত তবে কি উহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টায় আর পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিত? তাহার পর দেখ পঞ্জাব প্রদেশ। ওখানে মুসলমানের বল যার পর নাই বাড়িয়াছিল—এতদূর বাড়িয়াছিল যে ওখানে হিন্দুমতবাদ এবং মুসলমান মতবাদ উভয়ে সংমিশ্লিষ্ট হইয়া যে শিখ মতবাদ উঠিল তাহাতেও জাতিভেদ প্রণালী স্থান পাইল না। কিন্তু ক্রমে পঞ্জাবীদিগের মধ্যে "নমাজী সিং' 'রংরেটী সিং'এইরূপ অনেক শিখ জাতি উঠিয়াছে—এবং মুসলমানদিগেরও মধ্যে একটু জাতিভেদ প্রথা প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটী বিবরণ শুন। আমি কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে একটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম।—ছাত্রীদিগের মধ্যে একটী বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্না স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার জাতি কি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম সে "রাজপুত মুসলমান'! 'রাজপুত মুসলমান কি'? "ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা রাজপুত ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু আপনাদের সদৃশ অপর রাজপুত মুসলমানের সহিত উহাদের বিবাহাদি নির্ব্বাহিত হয়, অপর মুসলমানের সহিত হয় না।" "এরূপ কতদিন চলিতেছে"?—"মুসলমান হইয়া অবধি ছয় সাত পুরুষ।" "অন্যান্য মুসলমানের মধ্যে কি এইরূপ নিয়ম আছে?" "প্রায় সকল ভাল ভাল ঘরেই আছে। লালা মুসলমানেরা এবং ক্ষত্রিয় মুসলমানেরা প্রায়ই স্ব স্ব ঘর বাছিয়া বিবাহ করে—জাঠ টাঠেরা তাহা বড় একটা করে না"।

বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে কতকটা ঐরূপে জাতি বিচার করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা চলে তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। আর কৃত খৃষ্টানদিগের মধ্যেও যে ওরূপ বিচার একেবারে নাই তাহাও নয়। এই সকল স্থলে জাতি-ভেদ দেখা দেয় কেন? উহার প্রকৃত কারণ এই যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে রূপ-

গুণের প্রভেদ অনন্তজাতি-সাধারণ। জাতিভেদের প্রকৃত অর্থ বৈবাহিক সম্বন্ধের পার্থক্য মাত্র, ভোজনাদিতে যে ভেদ করা হইয়াছে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বৈবাহিক পার্থক্য বজায় রাখা। যদি ভারতবাসীদিগের মধ্যে রূপ গুণের যত পার্থক্য এখনও লক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূন হইয়া যায়, তবে অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা তিরোহিত হইবে। এখনও লোকের মুখে শুনা যায়—"কায়েত বামুনের চেহারা!" অর্থাৎ অপরাপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা ঐ দুই জাতীয়ের সৌন্দর্য্য এবং শ্রী অধিক। যখন বিভিন্ন জাতীয়দিগের মধ্যে এত অন্তরতা না থাকিবে তখন জাতিভেদও থাকিবে না। তবে বুদ্ধ নানকাদি মহাত্মগণ ঐ জাতিভেদ উঠাইতে গিয়াছিলেন কেন? তাহার উত্তর এই—ধর্ম্মজ্ঞেরাও দূরদর্শী, নীতিজ্ঞেরাও দূরদর্শী, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞদিগের দূরদর্শন ভাবাত্মকতা-মূলক, নীতিজ্ঞদিগের যুক্তিমূলক--ভাবাত্মকতা কালাকাল বিচার করে না। এই সকল কথা শুনিয়া যদি কোন অর্ব্বাচীন বিচারসখ বলেন যে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া বিভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে কন্যার আদান প্রদান করিলেত আকারগত ভেদ সত্বরেই মিটিয়া আইসে, তাঁহার কথার অনেক উত্তর আছে—কিন্তু এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ওরূপ কাণ্ড নর নারীদিগের এবং জন্তু মাত্রেরই অস্বাভাবিক।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ইহার অভ্যন্তর ভাগে কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ এবং গুণ আছে।

(১) বিজিত জাতীয় লোকের মধ্যে সহজেই আত্মগৌরব নষ্ট হইয়া যায়।

(২) সকল বর্ণের লোকেই একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহার অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না।

(৩) জাতিভেদ থাকায় ধনের গৌরব নিতান্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না।

(৪) জাতিভেদ থাকায় জনগণ আপনাপন অভিলাষানুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পায় না বলিয়া একটা শেখা কথা কাহার কাহার মুখে শুনা যায়, সেটা কিছুই নয়। বৌদ্ধবাদ প্রবল হইবার পর অবধি এক যাজকতা ভিন্ন অপর সকল ব্যবসায়ই সকলের পক্ষে

খোলা হইয়া গিয়াছে। শিক্ষকতা পর্য্যন্ত শূদ্রের অধিকারে আসিয়াছে।

(৫) জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকার সূত্রবস্ত্র, কটকের গহনা, দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব্ব ভাস্করীয় কার্য্য সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত। এরূপ কারুকার্য্য হিন্দু সমাজ বন্ধনের গুণেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে ইউরোপীয় পথ ভিন্ন উন্নতির অন্য পথ নাই যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা এ দেশের কিছুই যথাযথ মনে করেন না। একজন মান্দ্রাজী সিবিলিয়ান আমাকে বলিয়া ছিলেন, "শ্রমবিভাগের নিয়ম ভারতবর্ষে খুব পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সত্য কিন্তু লোকের অকর্ম্মণ্যতা দোষে তাহাতেও কোন ফল দর্শে নাই।"—"কেন?" "তোমাদের কুম্ভকারেরা ত পুরুষানুক্রমে হাঁড়ি, কলসী গড়িতেছে। ছিছি। উহাদিগের "সিবর্স বাস" (Sevres vase) গড়া উচিত ছিল।" "সিবর্স বাস কি প্রত্যহ গড়িবার এবং ফেলিয়া দিবার জন্য হইতে পারে?"

(৬) জাতিভেদ প্রচলিত থাকায়, হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষের অপরাপর সমাজকে আপনার অন্তর্নিবিষ্ট করিবার বিশেষ সুবিধাই পাইয়াছে, সুতরাং পরেও পাইবে। একেবারে ভিন্ন সমাজের লোককে লইয়া তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদির প্রচলন করা কঠিন। উহাদিগকে সমাজান্তর্গত একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করা তত কঠিন নয়। আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি হিন্দুসমাজের সজীববৎ ব্যবহার দেখ। সাঁওতালেরা হিন্দু হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে সংখ্যায় অধিক হইতেছে তথায় 'খারবার' নামে অভিহিত হইয়া জল আচরণীয় হইতেছে। মেকেরা'ও অনেকে এরূপে জল আচরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, শিখেরা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগী, কিন্তু উহারাও ক্রমে আপনাদিগকে নানকপন্থী হিন্দু বলিতেছে। কবীরপন্থীরা এবং দাদুপন্থীরা আপনাদিগকে হিন্দু সমাজান্তর্গত মনে করে। বাঙ্গালায় জাতিভেদ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও একটী বৈষ্ণব জাতি জন্মিয়া গিয়াছে।

মালদহ জিলায় কোন মুসলমানের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।

কথোপকথনে জানিলাম, তিনি নিরামিষভোজী। দেখিলাম, তিনি আবু বকর প্রভৃতি খলিফাদিগের মধ্যে একজনেরও নাম জানেন না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের নাম জানেন। তিনি বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যেমন নানা জাতি আছে না, আমরা মুসলমানেরাও সেইরূপ একটী জাতি। মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি জিলার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে অনেকানেক মুসলমান চাকর থাকে, এবং যদিও তাহাদিগের জল আচরণ না হউক, দুগ্ধ আচরণ হয়। অনেক মুসলমান গোমাংস খাও কি, জিজ্ঞাসা করিলে দন্তদ্বারা জিহ্বা কাটিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। ওয়াহাবি মতবাদের অভ্যুত্থানের পর ঐ ভাব যেন কিছু কমিয়া গিয়াছে। আর কোন কোন ইংরাজ হাকিমেরাও যেন হিন্দুর প্রতি মুসলমানের বিরোধ একটু রক্ষা করিয়া চলিতেছেন বলিয়াই কোথাও কোথাও সন্দেহ হয়। কিন্তু ও সব চেষ্টা বিফল হইবে।

বাঙ্গালী সমাজ।

শান্তিপ্রবণ হিন্দু সমাজ সুখাভিলাষী ইংরাজকে আপনার শিরোদেশে ধারণ করিয়াছে। নিবৃত্তিমার্গে দীক্ষিত জনগণ প্রবৃত্তি-মার্গানুসারী লোককে আপনার আদর্শ স্থলে প্রাপ্ত হইয়াছে। উচ্চাধিকারী নিকৃষ্টাধিকারীর বশে আসিয়াছে। অন্তর্দর্শী বাহ্যদর্শীর স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিতেছে। এই অতি বিপুল সমাজ সংঘর্ষের ফল কি হইতেছে, তাহা বাঙ্গালী সমাজটীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সুস্পষ্টরূপেই বোধগম্য হইবে—এবং পরেও কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহারও অনেক দূর অনুমান করা যাইতে পারিবে। কারণ, ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাতেই ইংরাজ প্রাধান্য অধিককাল বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইয়াছে; বাঙ্গালীদিগের অভ্যন্তরেই ইংরাজী রীতিনীতি দূরতর প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই ইংরাজী বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের মধ্যেই আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য উভয় ভাগের প্রকৃতি এমন সুন্দররূপে সম্মিলিত যে, এখানে যেরূপ যেরূপ

ঘটিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষেই সেইরূপ ব্যাপার ঘটিবে, এরূপ মনে করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। আর্য্যাবর্ত্তে উচ্চজাতীয় এবং নিকৃষ্টজাতীয় লোকদিগের মধ্যে আকার বৈসাদৃশ্য কম, দাক্ষিণাত্যে বেশী; বাঙ্গালায় কমও বটে, বেশীও বটে, অর্থাৎ এখানে উচ্চজাতীয় এবং অন্ত্যজ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এমন কতকগুলি জাতি জন্মিয়া আছে,যাহাদের সহিত ব্রাহ্মণাদির বৈসাদৃশ্য অনধিক অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায়; কিন্তু নিতান্ত অন্ত্যজদিগের সহিত বৈসাদৃশ্য অধিক অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের ন্যায়। এই সকল কারণে এবং আমি নিজে এই সমাজের লোক এবং যদি কেহ আমার লেখা পড়েন, তবে এই সমাজের লোকেই পড়িবেন ইহা মনে করিয়া বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক বোধ হয়, তাহাই বলিব।

বাঙ্গালী জাতি অপরাপর আর্য্যাবর্ত্তবাসীর ন্যায় আর্য্যপ্রধান। সেই প্রধানতম উপাদানের সহিত অনেকটা কোলেরীয় কতকটা দ্রাবিড়ী এবং কিছু পরিমাণ তাতারীয় মিশ্রিত হইয়া আছে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা কোন নূতন উপাদান নহে। কোলেরীয়রা কোন অতি পূর্ব্বকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসাম প্রদেশ ভেদ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে ছোট নাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল। দ্রাবিড়ীয়রা দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে, কাহার কাহার মতে সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগর দিয়া, উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে উঠিয়া ছিল। তাতারীয়রা ব্রহ্মদেশ হইতে কতক আসামের ভিতর দিয়া কতক মণিপুর প্রদেশের পাহাড় উপচিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে গঙ্গা প্রবাহের অনুক্রমে আসিয়া উল্লিখিত তিনটী বিভিন্ন স্তরের উপর বিস্তৃত হইয়াছিলেন। এই বহু পূর্ব্বগত ব্যাপার এখনও সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় নাই। কোলেরীয়দিগের আর কোন চিহ্ন বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব কি মধ্য ভাগে দৃষ্ট হয় না, এবং পশ্চিম ভাগেও অতি অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু দ্রাবিড়ীয় সাঁওতালেরা এখনও হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা,রাজমহল প্রদেশ দিয়া উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে চলিতেছে দেখা যায়, আর আসামের ভিতরে এবং খসিয়া পর্ব্বতাদিতে পূর্ব্বদিক হইতে নূতন নূতন পার্ব্বতীয় লোকের সঞ্চার এখনও হইয়া

থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্য সঞ্চারেরও এখন সম্যক্ নিবৃত্তি হয় নাই। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী জেলাগুলিতে এখনও বিহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে নূতন লোক আসিতেছে এবং বাস করিতেছে। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল জেলার কোন মেলা স্থানে গিয়া খাস তদ্দেশীয় লোক যত দেখিতে পাওয়া যাইত এখন আর তত পাওয়া যায় না—এখন হিন্দুস্থানী আকারের লোক বাড়িয়াছে। এখন সাঁওতাল নাচে আর খাস-সাঁওতাল তেমন অধিক থাকে না। কি সাঁওতাল পরগণার ভিতরে কি মৌরভঞ্জে অর্থাৎ সমস্ত সাঁওতাল-ভূমির পার্শ্বদেশে যে স্ত্রীপুরুষ সাঁওতাল বলিয়া নাচে উপস্থিত হয়, তাহার পনর আনা লোক মিশ্র জাতীয়। অবিমিশ্র সাঁওতাল নয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, কোন দেশের উপরিভাগ যেরূপ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া থাকে, তাহার হেতুনির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বগত কোন অদ্ভুত শক্তির কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে সেইগুলিই অধিক কাল ব্যাপিয়া কার্য্যকারী হইয়াছে মনে করিলেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থির হয়। ভূমিভাগের স্তর সম্বন্ধেও যে কথা, আর ভূমিনিবাসী মনুষ্যদিগের সম্বন্ধেও সেই কথা। যে ব্যাপার আজি হইতেছে দেখিতেছ, তাহাই পূর্ব্বাবধি হইয়া আসিয়াছে মনে করিলেই বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপে জন্মিল তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। আজি দক্ষিণ ভগলপুরে, সাঁওতাল পরগণায়, মৌরভঞ্জে যাহা হইতেছে দেখিতেছি, পূর্ব্বেও তাহাই হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্যসম্ভূত জনগণ আসিয়া এই সকল অঞ্চলের লোকের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণেরাই অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে মিশিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষাটী কেমন করিয়া জন্মিল, সেই কথা লইয়া আমাদিগের কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কিছু মতামত প্রকাশ এবং বাদানুবাদ করিয়াছেন। আমি যে সকল স্থানের নাম করিলাম সেই সকল স্থানের কথা শুনিলেই একেবারে বাঙ্গালা ভাষার সূতিকাগারটী দেখা যায়। ঐ সকল স্থানে হিন্দি ভাঙ্গিয়া যায়, দেশীয় কথাও ঠিক থাকে না—একটু দূরে হইতে শুনিলে যেন বাঙ্গালা ভাষার স্বরই শুনিতেছি বলিয়া বোধ

হয়। ক্রিয়াপদ গুলিই প্রথমে বাঙ্গালার ধরণে ভাঙ্গে। ভাষা সৃষ্টিও ক্রিয়াপদ লইয়াই হয়।

আর একটি ব্যাপারও বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ মাত্রেই লক্ষিত হয়। কি কাছাড়ী কি খসিয়াদিগের মধ্যে, কি আসামে, কি ছোটনাগপুর প্রদেশে, কি ভাগলপুরে সর্ব্বত্রই পশু পক্ষ্যাদি বলি প্রদান দ্বারা কোন না কোন দেবীর পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবীর নাম এবং রূপ ভিন্ন হয় বটে, কিন্তু পূজার পদার্থটী পুংদেবতা নয়, স্ত্রীদেবতা এবং পূজার অতি প্রধান অঙ্গ জীব হনন, এ দুইটী বিষয়ে সকলেরই মিল আছে। এমন কি ভূটীয় সিকিমী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিরা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াও বিবিধ বর্ণের এবং বহু পরিমাণ হস্ত সমন্বিত বুদ্ধ-শক্তি সকল স্বীকার করিয়া থাকে। বাস্তবিক আর্য্যাবর্ত্তের অপর সকল ভাগের অপেক্ষা, বাঙ্গালা দেশেই শক্তির পূজা বিশেষ প্রবল। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা এবং মধ্বাচারী কৃষ্ণভক্তেরা কেহই সীতা অথবা কোন কৃষ্ণ-শক্তিকে রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালার নিমায়ৎ বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের উপরেও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইৎ বৈষ্ণবদিগের মতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীরাধিকা স্বয়ং এবং সেই জন্যই একান্ত কৃষ্ণপ্রেমময় শরীর। চৈতন্য চরিতামৃতেরও অভ্যন্তরীণ ভাব ঐরূপ। বেদের উপাস্য ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। কিন্তু বৈদিক দেবতা ইন্দ্র বিষ্ণু রুদ্রাদি সকলেই পুরুষ। বেদে উপাস্য স্ত্রীদেবতা নাই বলিলেই হয়। "শোভমানা হৈমবতীর" কথা আছে, "শ্রমইব রূপ ধারিণী উষার" কথা আছে, "হিরণ্যবর্ণা হরিণী লক্ষ্মীর" নাম আছে, কিন্তু উহাঁরা দেবতা বলিয়া বিশিষ্টরূপে উল্লিখিত নহেন। কিন্তু বঙ্গদেশে, কি আর্য্য-দিগের মধ্যে কি প্রত্যন্তবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব দিগের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে শক্তি সেবারই বিশেষ সমাদর এবং গৌরব। এই কারণে এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি শক্তি-সাধন-প্রধান তন্ত্রশাস্ত্রের আকার ধারণ করিয়া আছে এবং এখানে সাংখ্যদর্শনের মত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়াতে অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত চিন্ময় পুরুষ তন্ত্রশাস্ত্রে জড়ময় এবং সাংখ্যোক্ত জড়প্রকৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে চিন্ময়ী হওয়াতে, বঙ্গদেশে সাংখ্যদর্শনের সমাদর ন্যূন

হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের সমাদর অল্প হওয়াতেই বোধ হয় যে,ন্যায়দর্শন এপ্রদেশে অধিক সমাদৃত হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে পরমাণুবাদই প্রবল,পুরুষ প্রকৃতি লইয়া কোন বিচার নাই। কিন্তু আর্য্যজাতীয় লোকের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বরূপ যে অদ্বৈতবাদ তাহাও বঙ্গদেশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তন্ত্রেরও চরম কথা বেদান্ত দর্শনের চরম কথা হইতে অভিন্ন। বঙ্গদেশের বেদ আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সেই দীক্ষা গ্রহণে সকল জাতীয় লোকের সমান অধিকার উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, তন্ত্রশাস্ত্রে ভৈরবী চক্র প্রভৃতি এরূপ সকল সাধন-সমিতির উল্লেখ আছে যাহাতে বর্ণভেদের বিচার নিষিদ্ধ। এই সকল লক্ষণে বোধ হয় যে, বৌদ্ধপ্রবর্ত্তিত সমীকরণ ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে তন্ত্রশাস্ত্র কর্ত্তৃক আর্য্যপ্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের এবং সাধনপ্রণালীর বৃদ্ধি হওয়াতে বৈদিক যজ্ঞবিধির বিধান সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

সাময়িক পরিবর্ত্ত।

সেই অতি পূর্ব্বে বৈদিক কালে হিন্দু সমাজ যেরূপ ছিল আজিও সেই ভাবাপন্নই আছে, এ কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন বটে, এখন আর কেহ বলেন না। প্রথমে বেদ ত্রয়ী ছিল, চারিটী বেদই ছিল না। পরে অঙ্গিরা ঋষি (অবশ্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্থানে শিক্ষা করিয়া) নিজ পুত্র অথর্ব্বনকে চতুর্থ বেদটীর শিক্ষা দান করেন। অথর্ব্ব বেদের সময়ে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের বিশিষ্টরূপেই উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে এবং আদিম অধিবাসী-দিগের অনেকানেক দেবতা আর তাহাদিগের কর্ম্ম কাণ্ড ঐ বেদের মধ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া রূপে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের বিশেষ বাহুল্য হইয়াছে। এই প্রথম পরিবর্ত্ত।

সমাজ শাস্তা এবং যুদ্ধকর্ত্তা দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে যে অতি ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় এই সময়ে। অঙ্গিরা বংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয় কুলের দমনকারী। ঐ বংশীয় গাধিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র

বশিষ্ঠ ঋষির বিদ্বেষ্টা—এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান সকল দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করে এবং সেই বিচ্ছেদ জন্য যাজন এবং যুদ্ধ ব্যবসায় সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। এই দ্বিতীয় পরিবর্ত্ত।

ইহার পর মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণাদির আচার ব্যবহারের সুদৃঢ়বন্ধন এবং আশ্রম বিভাগ; দ্বিজাতীয়দিগের অসবর্ণা বিবাহজাত বহুল সঙ্কর জাতীয় লোকের তালিকা; তন্মধ্যে অনুলোম সঙ্করের উৎকর্ষ এবং বিলোম সঙ্করের অপকর্ষ ব্যাখ্যাত। ঐ সংহিতার সময়ে সমাজের গঠন প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্রাহ্মণজাতীয়দিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া অপরাপর জাতীয় জনগণ বিবিধ বিদ্যা ও শিল্পাদির চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সঙ্কর জাতীয়েরাও ক্রমশঃ রূপে গুণে আর্য্যসাদৃশ্য লাভ করিতেছে। এই তৃতীয় পরিবর্ত্ত।

অধিবাসীদিগের মধ্যে রূপগুণের পরস্পর সাদৃশ্য ভারতবর্ষের যে ভাগে অধিক হইল সেই ভাগে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই জন্মিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ অযোধ্যা প্রদেশে, বেন প্রভৃতি রাজগণ মধ্যে মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন তাহা পুরাণে উল্লিখিত আছে। অনন্তর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মকার্য্যের দোষ, এবং জ্ঞান ও উপাসনা কার্য্যের গুণকীর্ত্তন করিলেন এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতে বর্ণভেদনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার স্থাপন করিলেন। এই চতুর্থ পরিবর্ত্ত।

এই পরিবর্ত্ত ক্রিয়ার অপর সকল বিষয় রহিয়া গেল কেবল জাতিভেদ প্রথাটী যে একেবারে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেইটী বিফল হইল। বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে আর্য্যাবর্ত্তভাগের ব্রাহ্মণেরা সুখাভিলাষী এবং সমাজশাসনে অমনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার অনেকানেক নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যভাগে তখনও ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যতেজঃ অক্ষুণ্ণ ছিল, শাস্ত্রে অধিকার ছিল, আচার পবিত্র ছিল এবং তর্কশক্তি সুমার্জ্জিত ছিল। সেই দাক্ষিণাত্যের প্রান্তরবর্ত্তী কানারা দেশে শঙ্করস্বামী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য

এবং বিচার দক্ষতায় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা পরাজিত হইল, বেদার্থ প্রকাশিত হইল এবং হিন্দু ধর্ম্মমত বৌদ্ধাধিকাররূপ অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার জ্যোতির্ম্ময়রূপে দৃষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গেল না; কিন্তু বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের ফলস্বরূপ আরও কতকগুলি সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া রহিল। এই পঞ্চম পরিবর্ত্ত।

ঐ পঞ্চম পরিবর্ত্তের পরবর্ত্তী কোন সময়ে আর কয়েকটী বিশেষ নিয়ম হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। সেগুলি কয়েকখানি অপ্রধান পুরাণ এবং উপপুরাণে নিবদ্ধ হইয়া আছে। সেই নিয়মগুলির প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহাদিগের সংস্থাপনই বা কিরূপে হইয়াছে তাহা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। ঐ নিয়মগুলি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নিবদ্ধ। বোধ হয় ছন্দানুরোধেই উহারা পরস্পর সঙ্গতিক্রমে ব্যবস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু নিয়মগুলির প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহারা পৃথক পৃথক চারিটী শ্রেণীগত। তাহার দুই শ্রেণী আচারবিষয়ক, আর দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর নিয়মগুলি কতকটা বৌদ্ধবাদের অনুকূল, অপর শ্রেণী উহার প্রতিকূল।

বৌদ্ধবাদের প্রাবল্যে শূদ্রাদি সকল জাতীয় লোকেই যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেড়াইত। কোন সমাজের অধিক লোক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষোপজীবী হইলে সমাজের ক্ষতি হয়। অতএব সমাজের হিতার্থ নিয়মিত হইল যে (১) দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য করিবে না; (২) কমণ্ডলু ধারণ করিবে না; (৩) অতি দূরস্থিত তীর্থদর্শনে গমন করিবে না; (৪) সমুদ্রযাত্রা করিবে না; (৫) বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন কবিবে না। পূর্ব্বে আর্য্যদিগের মধ্যে একটী বিধান ছিল যে, অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা অথবা ভৃগুপতন দ্বারা স্বেচ্ছাতঃ আপনাপন জীবন ত্যাগ করিতে পারিতেন। অনুমান করা যায় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে ঐরূপ আত্মহত্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহার বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিল, অতএব (৬) ভৃগুপতন এবং অগ্নিপ্রবেশও নিষিদ্ধ হইল। উল্লিখিত নিয়মগুলি বৌদ্ধবাদের প্রতিকূল।

কিন্তু অপর কতকগুলি আচারবিধি যাহা বৌদ্ধবাদের সমূহ বিশেষ

পরম্পরার চরমফল বুঝিয়া তৎপ্রতি কোন উদ্দেশ্যবিশেষের আরোপ না করা যায়, অর্থাৎ ঘটনা সকল ঐ ঐ রূপ হওয়াতে এইরূপ চরম ফল হইবে এই মাত্র বুঝিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার নাম নিরীশ্বর ভাব। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ফলাফল বিচার সম্বন্ধে সেশ্বর ভাবের পথ যাহা, নিরীশ্বর ভাবের পথও তাহাই। সে পক্ষে ঐ দুইটী ভাবের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

এই জন্য ভারত ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান কয়েকটী ঘটনার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি উল্লিখিত সেশ্বর এবং নিরীশ্বর উভয় ভাবের উপযোগী শব্দ সকল প্রয়োগ করিব—তাহাতে প্রকৃত বিচারের কোন দোষ নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তের প্রাথমিক ব্যাপার সমস্ত বৈদিক গ্রন্থসমূহে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আর্য্যঋষিগণ এই মহাদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া কৃষ্ণকায়, বিকৃতাকার, বিরুদ্ধাচার, শিল্পজ্ঞান এবং ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য, পরস্পর অসম্বদ্ধ, বহুরূপ ভাষাবিশিষ্ট, বিভিন্নগোষ্ঠীয় বন্যদশাপন্ন নরগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং, তাহাদিগকে দস্যু, দৈত্য দানব, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। উহারা আর্য্যবংশীয়দিগের সহিত নিরন্তর বিবাদ করিয়া পরিশেষে দমিত হইয়া যায় এবং তাহাদিগের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া কৃষি এবং শিল্পাদি শিক্ষা করে।

বৈদিক মন্ত্রাদির আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ যে সর্ব্বস্থলেই সৌরভাবের বা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যঞ্জনা বাহির করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী কালের সম্বন্ধে সত্য হইলেও মূলতঃ সত্য নহে। বজ্রধর ইন্দ্র, চক্রধর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যে সকল দৈত্য দানবাদির বিনাশসাধন করিয়াছিলেন তাহারা সম্ভবতঃ মানবশরীরী আর্য্যকুলবিদ্বেষ্টা অতি দুর্দ্দান্ত লোক ছিল। বৃত্র, অহি এবং পাণি প্রভৃতি বৈদিকদেবদ্বেষ্টৃবর্গ প্রথম হইতেই সজল-মেঘ, অন্ধকার এবং কুজ্‌ঝটিকার স্থানীয় ছিল না, কালে তাহাদিগের স্বরূপের স্মৃতি বিলোপ হইয়া গেলে উহারা কবিগণের হস্তে ঐ সকল আকার ধারণ করিয়া উঠে।

ফলকথা, প্রাকৃতিক বস্তু এবং শক্তি সকলে যে বিশিষ্ট সজীবতা এবং

মানবভাবের আরোপ হয়, তাহারও মূল ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ, পুরাণে যে সকল দেববিদ্বেষীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ অতি প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত—উহারা সত্যযুগের লোক। কিন্তু উহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্ন, ব্রহ্মর্ষিদেশ বা পঞ্জাবের প্রত্যন্তভাগেই পাওয়া যায়। মুলতানে হিরণ্যকশিপুপুত্র-স্তম্ভ বলিয়া একটা উচ্চভূমি প্রদর্শিত হয় এবং সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অদ্যাপি হিরণ্যকশিপুঘাতী নরসিংহদেবের উপাসক। অতএব হিরণ্যকশিপু কখনই বিশুদ্ধ কবিকল্পনা নহে। বৃত্রাদির স্থলেও ঐরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

আদিম অধিবাসিগণ দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সংস্রবে উৎকর্ষ লাভ করিতে এবং তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকালের দাসত্ব এখনকার ইউরোপীয়দিগের প্রবর্ত্তিত দাসত্ব প্রণালীর ন্যায় অতি কঠোর ব্যাপার ছিল না। আমি সেই পূর্ব্বকালের দাসত্ব দশার অতি ঈষন্মাত্র চিহ্ন উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছি। খাণ্ডাইত জাতীয় অতি সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তির গৃহে দিন কয়েক অতিথি হইয়াছিলাম। সেই গৃহে কয়েকটী সুন্দর যুবা পুরুষকে ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কোন জাতীয়। শুনিলাম উহারা "পাউলিপুয়া" অর্থাৎ উহারা গৃহ-পালিতা দাসীদিগের গর্ভজাত পুত্র। পূর্ব্বেও এই প্রণালীতে আর্য্যদিগের গৃহে গৃহে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই কারণেই প্রথমে ব্রহ্মর্ষিদেশ তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ এবং পরিশেষে সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যলক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যের বাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

মনুসংহিতায় স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে অনুলোম বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি তেমন দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। উচ্চপুরুষ নীচকুলের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন—কিন্তু নীচকুলের পুরুষ উচ্চ কুলের কন্যা গ্রহণ করিলে বড়ই দোষ হইত। এই অনুলোম বিবাহের ব্যবস্থা এবং বিলোম বিবাহের নিষেধ যে জীবমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই

ইহারই প্রভাবে ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যভাগও অনেক দূর পর্য্যন্ত আর্য্যলক্ষণাক্রান্ত হইয়া গেল। শুদ্ধ শারীর লক্ষণেই যে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর সাদৃশ্য হইল তাহা নহে, যেমন আর্য্য পুরুষদিগের ঔরসে আদিমনিবাসী স্ত্রীদিগের গর্ভে সুন্দরশ্রী সন্তান সকল জন্মিয়া পরস্পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল, তেমনি আদিম জাতীয়দিগের বিবিধ ভাষার প্রতি আর্য্যভাষা সংস্কৃতের বলপ্রয়োগ হওয়াতে প্রাকৃতাদি ব্যাপকতর ভাষাও জন্মিল, আর অনার্য্যজাতীয়দিগের উপাসিত এবং পূজিত বিভিন্ন দেবদেবীগুলিও আর্য্যঋষিদিগের শাস্ত্রমধ্যে পরিগৃহীত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিয়া উঠিল।

কিন্তু উল্লিখিতরূপে যেমন শারীরসাদৃশ্য, ভাষা সাদৃশ্য এবং ধর্ম্ম সাদৃশ্য জন্মিয়া উঠিল, তেমনি তাহার অবশ্যম্ভাবি ফলও ফলিল। বিলোমসঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল, প্রাকৃতাদি ভাষার প্রচলন সংস্কৃতের অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মভাবে আধ্যাত্মিকতা ন্যূন হইয়া অনুষ্ঠানমাত্রের আড়ম্বর প্রবল হইল। ব্রাহ্মণদিগের আর পূর্ব্বের মত শ্রীও রহিল না, বিদ্যাও রহিল না, আর তপঃপ্রবৃত্তিও রহিল না।

যখন আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যতেজঃ অতি বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্তিমিত ভাব প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখনও দাক্ষিণাত্যে উহা সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল—সাগরসঙ্গম স্থলে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইলেও নদীর উচ্চভাগে জোয়ারের জল অনেকক্ষণ চলিতে থাকে। সরযূ, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতী তীরে, অযোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা প্রভৃতি স্থানে আর্য্যের তেজ কম, কিন্তু রেবাতটবর্ত্তী বিশালায়, শিপ্রাসন্নিহিত উজ্জয়িনীতে, গোদাবরী সমীপস্থ নাসিকে আর কাবেরীতীরে ও কাঞ্চীপুরে ঐ তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইয়া চলিল এবং অনার্য্য গোষ্ঠীরা কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যভাববিশিষ্ট হইতে লাগিল। ও প্রদেশে আর্য্যতেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই।

আর্য্যভাব যে প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া প্রথমেই বিশিষ্টতা পরিহার করিয়াছিল সেই অযোধ্যা প্রদেশেই ক্ষত্রিয় রাজকুলে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইলেন এবং নীতির প্রাধান্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপ্রাধান্য, তপোবনের

উৎকর্ষ এবং জাতিভেদের অপকর্ষ অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের সাম্যবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শুষ্ক ইন্ধন অগ্নি পাইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে, তেমনি সাম্যভাবপ্রাপ্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অশোক, বিম্বসার প্রভৃতি অধিরাজবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শূদ্রজাতীয়েরা যতি ধর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রাকৃত হইতে অনধিক ভিন্ন পালি বা পারীভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বিরচিত হইতে লাগিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত বৌদ্ধ যতিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন—দাক্ষিণাত্য ছাড়াইয়া লঙ্কাদ্বীপে, যব দ্বীপে, মালাকা, ব্রহ্ম এবং চীনে স্বধর্ম্ম বিস্তার করিতে গেলেন। দূরবর্ত্তী দেশ সকল উহাঁদিগের সাম্যবাদের স্থল হইল। উহাঁরা চীন, ব্রহ্ম, জাপান. তাতার প্রভৃতি ভূভাগকে স্বতঃ পরতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন—ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা রূপে গুণে অনেকটা সমপ্রকৃতিক। কিন্তু ভারতবর্ষে তখনও জনগণের মধ্যে সম্যক্ সমভাব জন্মে নাই। দাক্ষিণাত্যের লোক সকল যে আর্য্যাবর্ত্তের জনগণ হইতে কত বিভিন্ন তাহা যিনি একবার ঐ প্রদেশে গিয়াছেন তিনিই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। আবার কি দাক্ষিণাত্য, কি আর্য্যাবর্ত্ত উভয় প্রদেশের লোক সকল হইতে বন এবং পর্ব্বতনিবাসী ভিল, গোন্দ, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতির বৈলক্ষণ্যের সীমা নাই—ইহারাই বোধ হয় আদিম অধিবাসীদিগের বংশধর। তদ্ভিন্ন কি আর্য্যাবর্ত্তে, কি দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই সম্প্রদায় এবং বর্ণভেদে জনগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্যই আছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্যজাতীয়দিগের রূপ গুণ অপর জাতীয়দিগের অধিকাংশ ব্যক্তি অবিকল প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অন্তর্বাহ্য ভেদ বিদ্যমানে সাম্যবাদ কখনই গৃহীত হইতে পায় না। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম্মটী আপন জন্মভূমি ভারতবর্ষের মধ্যে স্থান পাইল না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত সীমায় যে কানারা নামে একটী প্রদেশ আছে তাহা সর্ব্ব দক্ষিণে, এই জন্য তথায় ব্রাহ্মণদিগের প্রদেশ সর্ব্বশেষেই হয়। সেখানে গিয়া অনার্য্যরীতির উৎসাদনার্থ তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপেই চেষ্টান্বিত থাকিতে হয়। ঐ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজঃ ন্যূন হইয়া যাইতে

পায় নাই। তাঁহাদিগকে আচারপূত এবং বেদবিদ্যার অনুশীলনে রত থাকিতে হইত। সেই কানারা প্রদেশীয় নাম্বুরি ব্রাহ্মণবংশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। যেমন ব্রাহ্মণ তেজঃ উপশান্ত অযোধ্যায় বুদ্ধদেবের জন্ম তেমনি ব্রহ্মতেজে উদ্দীপিত কানারা প্রদেশে শঙ্করের জন্ম। শঙ্করাচার্য্য দিগ্‌জয় করিলেন—বৌদ্ধেরা তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইল। বৈদিকধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনা হইল। কিন্তু সেই পুনঃসংস্থাপিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধবাদ মিশিয়া গেল। শূদ্রাদির দীক্ষা গ্রহণ এবং ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার রহিল, আর ক্রিয়াকাণ্ড যে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা হীনমার্গ, তাহাও স্বীকৃত হইল। বৌদ্ধ নিরসনের পর হইতে হীনবর্ণে বিবাহ, বিধবার দ্বিতীয় পরিণয়, কমণ্ডলু ধারণরূপ যতিলক্ষণ গ্রহণ—এইরূপ কতকগুলি কার্য্য রহিত হইয়া যায়।

হিন্দু সমাজেখাওয়া দাওয়া।

হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদের মূল কথা যে, উদ্বাহ ব্যাপারের পার্থক্য, তাহা দুই দশটী বুদ্ধিমান ইংরাজ ভিন্ন আর কাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। জাতিভেদকে অধিক লোকেই একত্র পানভোজনের প্রতিষেধক মনে করেন এবং মুসলমানদিগকে এক সানকে এবং ইংরাজদিগকে এক টেবিলে খাইতে দেখিয়া হিন্দুদিগের ভিন্নরূপ ব্যবহারকে কুসংস্কারজাত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশীয় কোন আদমসুমারী বিজ্ঞাপনের এক স্থানে একজন সিবিলিয়ান প্রকৃতই লিখিয়াছেন—"বিবাহ-পার্থক্যই জাতিভেদের প্রকৃত দুর্গ, অসবর্ণদিগের মধ্যে একত্রে পান ভোজনাদির নিষেধ সেই দুর্গের বহিঃস্থ প্রাচীর মাত্র।"

কোন কোন ইংরাজ বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, ভারতবাসীরা তাসের কাগজের ন্যায় বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন বর্ণ। বাস্তবিক কোন এক দেশীয় এবং এক জাতীয় লোকের মধ্যে এত বর্ণ এবং এত রূপ-বৈচিত্র্য নাই। ফলতঃ সেই কারণেই এখানে অসবর্ণে বিবাহ প্রতিষিদ্ধ এবং তাহারই সহিত একত্রে ভোজনও প্রতিষিদ্ধ।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে প্রদেশে রূপবৈচিত্র্য কম সেই সেই প্রদেশে খাওয়ার আঁটাআঁটিও কম। পঞ্জাবে কাহার বা ঝিমর বা জাঠ বা অপর জাতীয় লোকদিগের দাউল, রুটি প্রভৃতি পক্ব ভোজ্য সামগ্রীর খোলা দোকান আছে—ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া খায়। সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যা প্রদেশে পক্ব মাংস এবং ব্যঞ্জনাদি কাহার কুর্ম্মি প্রভৃতি জাতীয়েরা মাথায় করিয়া বহে এবং ক্ষত্রিয়, রাজপুত, লালা প্রভৃতিরা তাহা গ্রহণ করে। উহাতে কিছু মাত্র স্পর্শদোষ হইয়াছে মনে করে না। বিহার অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশেরও অনেকানেক স্থানে ভৃত্যেরা মাংস ও ব্যঞ্জনাদি রান্ধিয়া দিলে—ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই খায়। পঞ্জাবে জনগণের মধ্যে রূপভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প, সেখানে সকল খাওয়াই একত্রে চলে। উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, এবং মধ্য প্রদেশাদিতে রূপভেদ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক, সেখানে ভাত, দাউল, রুটি- -এই তিনের "আয়েব" আছে আর কিছুরই নাই। বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় রূপভেদ আরও অধিক; ঐ সকল প্রদেশে আচমনীয় মাত্রেই নিষিদ্ধ; তবে লুচি, কচুরি, মণ্ডা, মিঠাইয়ের চলন আছে। ও সকলে বড় একটা স্পর্শ দোষ ধরা হয় না। কিন্তু, দাক্ষিণাত্যে রূপভেদ সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক এবং ওখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকে নিকৃষ্ট জাতীয়দিগের হস্ত হইতে ফল জল লওয়াতেও অনেকটা দোষানুভব করে। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতীয়ের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করেন না।

খাওয়ার আঁটাআঁটিও যে প্রদেশে যত কম বিবাহের বৈবাহিক সম্বন্ধে জাতি বিচারের আঁটাআঁটিও তথায় সেই পরিমাণে কম। (১) আমার একটী পঞ্জাবী আত্মীয় তাঁহার পত্নী সমভিব্যাহারে আমার বাটীতে দিন কয়েকের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ক্ষত্রিয়কন্যা, তিনি স্বয়ং জাঠ। সমাজে তাঁহার তত দোষ ধরে না। (২) কোন সময়ে কনোজ নগরে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবাসে ছিলাম। তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং আমার প্রতি ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। এক দিন উভয়ে একত্রে বসিয়া আছি এমন

সময়ে কোন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। উভয়ের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে বুঝিলাম যে যাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইবে তিনি ঝিমর জাতীয় দাসী গর্ভজাত। এতদিন তাঁহার মাতার মাতা জীবিতা ছিলেন বলিয়াই উপনয়ন দেওয়া হয় নাই, এখন হইবে; এবং সমাজে ঐ বালক ব্রাহ্মণ বলিয়াই একরূপ চলিয়া যাইবে। (৩) বিহার অঞ্চলের 'দেও' নামক গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিশেষ শ্রীমতী কাহার জাতীয়া বালিকাকে দেখিয়া জানিয়াছিলাম যে, উহারা ক্ষত্রিয়ের ঔরস সম্ভূত। কাহারদিগের মধ্যে উহাদের জাতি সম্বন্ধে কোন দোষই ধরে না। (৪) উড়িষ্যা প্রদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মাইতির বাটীতে কতকগুলি সুন্দর-মূর্ত্তি ভৃত্য দেখিয়া তাহাদিগের জাতি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম উহারা "পাতলিপুয়" বা দাসীগর্ভজাত সন্তান। উহারা পরিচয় দেয় "শ্রীকরণ", সমাজেও চলে। (৫) দাক্ষিণাত্যের অনেকানেক স্থানে স্মার্ত্তাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কুমারদিগের বিবাহে অতিরিক্ত পণ লাগে। আর্য্যাবর্ত্তে কন্যার পণ গ্রহণ যত দোষ বলিয়া গণ্য ঐ সকল প্রদেশে তত দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় না। ঐ সকল প্রদেশে অপ্রকাশ্যেও অসবর্ণা গ্রহণ কম হয়। (৬) দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দ্রাবিড় প্রদেশগুলিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল, মহারাষ্ট্রে শৈবধর্ম্ম বলবান। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবেরা রামানুজ সম্প্রদায় সম্ভুক্ত। রামানুজ সম্প্রদায়ীরা যদিও বাঙ্গালার চৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বীদের ন্যায় জাতিভেদ বিরোধী নহে তথাপি শৈব এবং স্মার্ত্ত বৈষ্ণবদিগের অপেক্ষা জাতিভেদের অল্প বিদ্বেষ করে। ফলেও দেখা যায় যে, দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা আর্য্যাবর্ত্তের এবং মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কুরূপ।

ফলতঃ যেখানে খাওয়া দাওয়ার আঁটাআঁটি কম সেখানেই বৈবাহিক সম্বন্ধ ও উৎপত্তির কথা (অর্থাৎ জাতির খুঁত) কম বাছা হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে যাহাদের খাওয়া দাওয়ার কোন বিচারই নাই তাহাদের মধ্যেই অসবর্ণবিবাহাদির ইচ্ছা জন্মিতে পারে।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত তথ্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে ঐ

বিষয়ে যে সকল কথা সর্ব্বদাই শুনা গিয়া থাকে, তদ্বিষয়েও কিছু বক্তব্য আছে। কেহ কেহ বলেন, একত্রে পান ভোজন না হইলে সামাজিকতার বৃদ্ধি হয় না, পরস্পর দৃঢ় সম্মিলন হয় না এবং জাতীয় ভাব জন্মিতে পারে না। একথাগুলি প্রকৃত কথা নয়। এক মুসলমান ছাড়া, পৃথিবীতে অপর কোন জাতি নাই যাহাদিগের মধ্যে সকল লোকের একত্রে পান ভোজন প্রচলিত আছে। ইংরাজেরাও সকলে একত্রে খায় না। "স্যর" উপাধিধারী কোন সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়ান কোন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলে, তত্রত্য অপরাপর ইংরাজেরা তাঁহার স্থানে একটী ভোজ যাজ্ঞা করিয়াছিল। তিনি খুব সমারোহপূর্ব্বক ভোজ দিলেন। জিলার জজ সাহেবকে ছাড়িয়া অপর সকলের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং ভোজে বসিলেন না; এমন কি ঐ সময়ে বাটীতেও রহিলেন না, অপর এক জনের প্রতি অভ্যর্থনাদির ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং আণ্টা খেলিবার ঘরে গিয়া আণ্টা খেলিতে লাগিলেন!

আমার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দসম্পন্ন কোন ইউরোপীয় আমাকে তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, আমি তাহা অস্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি অস্বীকার করিলে, আমি আর জিদ করিব না, কিন্তু কেন অস্বীকার করিলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "তোমার সহিত একত্রে ভোজন করা আমাদিগের সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর কি হইতে পারে? তদ্ভিন্ন, ভাবিয়া দেখ, আমাদের আর কি আছে? আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা গিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের আক্রমণ হইতেছে, আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রও এপর্য্যন্ত এমন ভাব ধারণ করে নাই যে, তজ্জন্য বিশেষ আত্মগৌরব জন্মে। আমাদের আত্মগৌরবের এবং স্বাতন্ত্রিকতার বস্তু আর কি আছে? থাকিবার মধ্যে কুসংস্কারই বল আর সমাজনিয়মই বল, এই জাতিভেদ এবং আচার ভেদ আছে, আমি তাহারও বিসর্জ্জন দিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "আর কখন তোমাকে ওরূপ অনুরোধ করিব না—আমি ঐরূপ কুসংস্কারগুলিকে বিশিষ্ট সম্মান করিয়াই

চলিয়া থাকি ; প্রত্যুত সকল প্রকার কুসংস্কারবিচ্যুত ব্যক্তি যদি কেহ থাকেন, তিনি হয় পরম জ্ঞানী অথবা "সবলোঠ" হইবেন—আমরা কেহই পরম জ্ঞানী নহি, "সবলোঠ" হওয়া অনাবশ্যক।"

অপর কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে একত্র ভোজনের জন্য অনুরোধ করেন। আমি অস্বীকার করি। তিনি ইহার উহার তাহার নাম করিয়া বলিলেন—ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত খাইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি আমার স্বীকৃতি না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"বড় ক্ষোভের বিষয়! যাহাদিগের সহিত আমরা একত্র খাইতে চাই তাহারা স্বীকার করে না, আর মনে মনে যাহাদের সহিত চাহি না, তাহারাই খাইতে আইসে"। তখন বলিলাম "যদি মহাশয়ের সহিত ভোজন স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে যাহাদের সহিত চাহেন না আমিও সেই দলভুক্ত হইয়া যাইতাম না কি?" তিনি অপ্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

আমার স্থির নিশ্চয় এই যে, শুদ্ধ বিজাতীয় ভোগসামগ্রীর লালসায় সমাজপ্রচলিত ব্যবহারের বিপরীতাচরণে সামাজিকতার বৃদ্ধি, কি জাতীয় ভাবের প্রকৃত অনুশীলন কিছুই হয় না।

আর একটি কথা শুনা যায়—খাওয়া দাওয়ার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? ধর্ম্ম মনোগত কাজ, এটা খাইলাম বা ওটা খাইলাম না বলিয়া ধর্ম্মের হানি বা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এটীও পাকা কথা নয়। আহার্য্যের সহিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। তদ্ভিন্ন এই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির সর্ব্বাঙ্গব্যাপক হিন্দু-সমাজের সর্ব্বত্র আহারের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে ব্যবহারও অবিকল একরূপ নহে। হিন্দুরা এক গোমাংস ভিন্ন অপর সকল ভক্ষ্যই কোথাও না কোথাও ভোজন করে। মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড়ের শূদ্র জাতীয়েরা মুর্গী খায়—বনভূমিনিবাসী যাবতীয় লোক ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে শূকরমাংস ভোজন করে। আর মদ্যপান ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির পক্ষে শাস্ত্রেও তত নিষিদ্ধ নহে। অতএব আহারের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যে ততটা ঘনিষ্ট সংস্রব নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাচ্ছিল্যপূর্ব্বক দেশাচারের বিরুদ্ধ হইয়া চলা অতি অপকর্ম্ম। উহা কি জন্য অপকর্ম্ম, তাহা এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত

হইবে যে, স্বজনের সহিত সহানুভূতিই ধর্ম্মের বীজ ; যেখানে সেই সহানুভূতি না থাকে, তথায় ধর্ম্মজ্ঞানের মূলেই কীট লাগিয়াছে বুঝিতে হয়।

পরধর্ম্ম গ্রহণ।

পৈত্রিক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণটা অতি গুরুতর ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু আমরা ও কাজটাকে যত গুরুতর মনে করি, ইউরোপীয়রা ততটা করেন বলিয়া বোধ হয় না। ফরাসিদিগের ত কথাই নাই—উহারা যখন বোনাপার্টির সহিত মিশরে আসিয়াছিল, তখন উহাদিগের দলকে দল মুসলমান হইবে, এরূপ কথা উত্থাপন হইয়াছিল। কিন্তু জর্ম্মণ, ইংরাজ, আমেরিকান প্রভৃতি যে সকল খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী তুরস্ক সম্রাটের অধীনে সৈনিক বা অপরাপর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারাও প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে। আজি কালি চীন সাম্রাজ্যেশ্বরীও অনেকানেক ইউরোপীয় এবং আমেরিকান লোককে আপনার সৈনিক দলে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যদিও অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করে, কিন্তু মুসলমান-দিগের ন্যায় উহাদের তত প্রৌঢ়ি নাই, এই জন্য যে সকল খৃষ্টানজাতীয় চীনদেশে চাকুরি পায় তাহাদিগকে বৌদ্ধ হইতে হয় না, কিন্তু নাম এবং পরিচ্ছদ চীনীয়দিগের অনুরূপ করিতে হয়। ঐ সকল লোকের মতে অন্নদাতা মনিবের যেমন অন্ন গ্রহণ করা যায় তেমনি তৎপ্রদত্ত বস্ত্র নাম এবং ধর্ম্মও লওয়া যাইতে পারে।

হিন্দুরা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে আর যত অপকর্ম্ম করিতে পারুন, আপনাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কেহ তলোয়ার উচ্চাইয়া বলিল, আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নচেৎ কাটিয়া ফেলিব ; হিন্দু ঐরূপ প্রাণভয়ে কখন কখন পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ; কেহ দুর্ভিক্ষের সময়ে ভাত খাওয়াইয়া জাতি মারিয়া ফেলিল, হিন্দু অগত্যা ঐ জাতি মারাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল ; অথবা হিন্দুর শিশুকে পাখি পড়াইবার মত করিয়া কোন ধর্ম্ম মন্ত্র পড়াইল, সে না বুঝিয়া তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিল। হিন্দুর স্বধর্ম্ম ত্যাগ এইরূপেই অধিক হয়।

হিন্দুদিগের তুল্য না হউক, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে ইহুদীয়েরা এবং

মুসলমানেরাও আপনাপন ধর্ম্মে দৃঢ় হইয়া থাকে। উহাদিগের ধর্ম্মে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা খৃষ্টান ধর্ম্মে কোন উচ্চতর ধর্ম্ম ভাব নাই—আর হিন্দুধর্ম্মে, অধিকারী ভেদে, যে সকল ক্রমোন্নত ধর্ম্মভাব আছে তাহা অপর কোন জাতীয় লোকে অতিক্রম করা দূরে থাকুক, সম্যক্‌রূপে হৃদ্‌বদ্ধ করিতেও পারে নাই, অপর জাতীয় বিশেষ তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরাই তাহা এপর্য্যন্ত কিছু কিছু বুঝিতেছেন মাত্র।

যাঁহারা উল্লিখিত প্রকৃত তথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না, আর অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদিগের হইতে ভজাইয়া লয়, সুতরাং কালে হিন্দুধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যাইবে। কথাটী বলিতে সহজ বটে, জমাখরচের হিসাবের উপর একটী কৈফিয়ৎ কাটার মত। কিন্তু কথাটী প্রকৃত নয়। বন পর্ব্বতাদি কুষ্টল নিবাসী কোল, ভিল, সাঁওতাল, মেক, গারো প্রভৃতি লোকেরা নিরন্তরই হিন্দু সম্প্রদায় সম্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। তাহারা অন্ত্যজ জাতীয়দিগের দলপুষ্ট করিতেছে বটে, কিন্তু যে সকল হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে তাহাদিগের পনর আনা তিন পাই কি অন্ত্যজ হিন্দু ভিন্ন অপর কিছু? দশ পাঁচটী ভদ্রবংশীয় হিন্দুও খৃষ্টান হইয়াছে দেখা যায়—কিন্তু হিন্দু দর্শন শাস্ত্র কি অপর ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রবংশীয় সুশিক্ষিত এবং বিদ্যাবান-দিগকেও আপনার মতবাদ গ্রহণ করায় নাই? মুসলমানদিগের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সুফি' সম্প্রদায় সেটী কি বেদান্ত-মত-বাদগ্রাহী মুসলমান নয়? জর্ম্মণ জাতির যে ট্রান্সেনডেণ্টাল দর্শন, তাহাও কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং কতকটা পরম্পরাসম্বন্ধে বেদান্ত দর্শন-জ্ঞান সম্ভূত নয়? চৈতন্য মহাপ্রভু কত বড় বড় মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। পাদ্রি সাহে-বেরা যদি তাঁহার সময়ে এদেশে থাকিতেন, তাঁহাদিগের অনেককেই তুলসী মালার কণ্ঠী ধারণ করিতে হইত। রামমোহন রায় শুদ্ধ মৌলবী-আবদুর রহিমকেই নিজ ব্রাহ্মমতবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এমত নহে; পাদ্রি আদমকেও ঐ মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র উহার অধি-কারী ভেদ ব্যবস্থা নিবন্ধন—কি হীনবুদ্ধি কি উন্নতবুদ্ধি সকলকেই আপনার আয়ত্ত করিতে সমর্থ।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক থিওসোফি মতাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের উল্লেখ করা অনাবশ্যক। মান্দ্রাজ নগরের সমীপবর্ত্তী আড়েয়ারের আশ্রমে শ্বেতাঙ্গদিগকে পদ্মবীজাদির মালা গলায় ও শুভ্র ওভর কোট এবং শুভ্র ইজার পরিধান, অনাবৃত পদ দেখিয়া উহাঁদিগের প্রচারিত মাসিক পুস্তিকা পাঠ করিয়া এবং সংস্কৃতের আলোচনার প্রবৃত্তি দান দেখিয়া যতই সন্তুষ্ট হওয়া যাউক, উহাঁদিগের নিকট হিন্দুয়ানী যে খাঁটি ও সত্বগুণবিশিষ্ট থাকা সম্ভব নহে একথা সর্ব্বদাই মনে করা উচিত।

হিন্দুধর্ম্মের অতি ব্যাপকতা বশতঃ এ ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। তদ্ভিন্ন সকলের পক্ষেই আপন আপন পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কেবল পাগলামি। যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় যে পরিমাণ তাহার ধর্ম্মও ঠিক সেই পরিমাণে উন্নত বা অবনত হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকৃত উন্নতি কোন একটী দুইটী সূত্র জানা থাকা বা না জানা থাকা নয়। ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল বস্তুর কথা বলে, যথা 'ঈশ্বর' 'পরকাল' 'প্রাক্তন' ইত্যাদির "অপ্রকৃত" হইতে "প্রকৃতভাব" পাওয়া আর কিছুই নয় সুধু "অপরিস্ফুট" হইতে "পরিস্ফুট" বোধ লাভ। এই জন্য একটী ধর্ম্ম গিয়া আর একটী হয় না। যেটী প্রথমাবধি থাকে সেইটীই বাড়ে বা কমে। একটী সুবোধ স্বদেশীয় যুবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়! দেশে ত এতগুলি ধর্ম্মপ্রণালী রহিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মটী সত্য।" আমি বলিলাম "তোমার পক্ষে তোমার পিতার যে ধর্ম্ম তাহাই সত্য।" আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃ পিতামহাদি হইতে প্রাপ্ত যে সংস্কার সেই সংস্কারই ধর্ম্মমূল। অতি আত্মীয় কোন ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহার মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও একটু ফুটো আছেই আছে।" আমারও তাই বোধ হয়।

মস্তিষ্ক-সংস্থান শাস্ত্রে বলে যে মস্তিষ্কের সর্ব্বনিম্ন ভাগে পূর্ব্বপুরুষ গত এবং অধিক অভ্যাসজনিত সংস্কারসকল নিবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং মস্তিষ্কের অপরাপর চারিভাগ যাহাতে পাশবপ্রবৃত্তি, ভাবুকতা এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মে, সেগুলির স্থান ঐ সংস্কার নিবদ্ধ ভাগের উপরে। অতএব

পূর্ব্বগত সংস্কার মূলের সহিত যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিশ্লিষ্ট দেখায়, তাহার বিশ্লেষ যেন কোন অস্বাভাবিক আঘাত বলেই হইয়াছে বোধ হয় এবং তাদৃশ মস্তিষ্ক কোথাও ফুটো হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

হিন্দু সমাজ ধর্ম্মনীতি।

শাব্দ প্রমাণ অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার বল নিতান্ত অল্প নয়। 'ভগবান' নামক কোন ব্যক্তি অপর দশ জনের কথায় আপনাকে 'ভূত' বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ গল্পটীতে শাব্দ প্রমাণের বল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাও উচ্চ বলিয়া দেখা যাইতেছে। অন্ততঃ পাঁচ জনে জড়িয়া একটা কোন কথা বলিলে, আর সেই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলে, উহা অনেকস্থলে সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া যায়। ইংরাজেরা কোন বিষয়েই আপনাদের ব্যাখ্যা বাহির করিতে ত্রুটি করেন না। উহাঁরা অনুক্ষণ আপনাদের ধর্ম্মনীতিরও প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং ইংরাজী শিক্ষিত নব্যদলও শুক পক্ষীর ন্যায় ঐ বাক্যটী পুনঃ পুনঃ শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লয়েন। কি করিবেন, ইংরাজীতে কথা কহিতে এবং ইংরাজীতে লিখিতে গেলেই ইংরাজের মত না বলিলে এবং না লিখিলে যেন যতিভঙ্গ দোষের ন্যায় একটা "এবারতে" দোষ পড়িয়া যায়। আজি কালি যে সে ইংরাজ বলিতেছেন, আমরা ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মনীতি উন্নত করিয়া দিতেছি—আর কৃতবিদ্যেরা সেই কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছেন। ভগবান আপনাকে ভূত বলিয়াই জানিয়াছে।

কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মনীতিকে উন্নত করিবার কোন ক্ষমতা কি ইংরাজ ধর্ম্ম-নীতিতে আছে? একটু ভাবিয়া দেখ। ইংরাজের এবং সকল ইউরোপীয় জাতির ধর্ম্মনীতি গ্রীক্, রোমীয়, প্রাচীন জর্ম্মণ, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় নীতি হইতে সংগৃহীত। গ্রীকেরা স্বাধীনতা, স্বদেশহিতৈষা এবং সাহসিকতার গৌরব করিত। সৌন্দর্য্যবোধও তাহাদিগের অতি সুপরিস্ফুট হইয়াছিল—সুতরাং তাহারা শারীর সৌন্দর্য্যও বুঝিত আর মানস সৌন্দর্য্যও বুঝিত।

রোমীয়দিগের প্রকৃতি অতি ভীষণ এবং কঠোর ছিল। তাহাদের উগ্র পাশব ভাবের দময়িতা কেবল বিধিনিষ্ঠতা। রোমীয়রা স্বদেশীয় বিধি ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিত না। প্রাচীন জর্ম্মণেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষাও কঠোর এবং দুর্দ্দান্ত কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি গৌরবযুক্ত এবং একপত্নীক ছিল। তাহারা দস্যুবৃত্তি এবং দলবন্ধনে পটু ছিল। ইহুদী অপর সকল লোকের বিদ্বেষ্টা এবং স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে ইহকালপরায়ণ। খৃষ্টান পরকালটী মানে মাত্র। খৃষ্টানধর্ম্মে শান্তিশীলতা, নম্রতা, দানশীলতার উপদেশ আছে। আর পাপ কার্য্যের প্রতিও যথেষ্ট ভয় প্রদর্শন আছে। কিন্তু খৃষ্টান উপদেশের মূলে দুইটা বড বড় গলৎ আছে। প্রথম গলৎ উহার দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ নিবন্ধন পৃথিবীর কতকটা ভাগ এবং পৃথিবীস্থ মনুষ্যের কতকগুলি, মূলতঃ দোষময়। সুতরাং খৃষ্টানেরা যেটীকে বা যাহাকে ঐ দোষময় ভাগের মধ্যে ধরিয়া লইতে পারে, তাহাই নষ্ট করিতে এবং নিপীড়িত করিতে উদ্যত হয়। কাথলিক খৃষ্টানদিগের এই দোষটা অধিক। স্পেনীয়রা এবং পোর্ত্তুগিসেরা সেই জন্যই ইউরোপীয়েতর জাতীয়দিগের প্রতি সয়তানের দলভুক্তবোধে যেখানে যতদূর পারিয়াছে অত্যাচার করিয়াছে। দ্বিতীয় গলৎ অনুগ্রহ-বাদ। অনুগ্রহ-বাদের তাৎপর্য্য এই যে মানুষ অবশ্যই আপনার কর্ম্মফল ভোগ করে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতঃ পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের তিরস্কার হয়। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রকার স্বৈরাচারিতার আরোপ করিয়া ঐ মতাবলম্বীরাও নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই ভাব বিশিষ্টরূপেই দেখা দিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ইংরাজের ধর্ম্মনীতিতে যদি উহার উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরোধী সেগুলি বাদ দিয়া লওয়া যায়—তবে পাই—(১) স্বাধীনতা (২) স্বদেশহিতৈষা (৩) সাহসিকতা (৪) সৌন্দর্য্যবোধ (৫) বিধিনিষ্ঠতা (৬) এক পত্নীকতা (৭) দলবন্ধনে পটুতা (৮) স্বেচ্ছাচারিতা। উল্লিখিত আটটী থাকিল সাধারণ জাতীয় ভাব ইহুদী স্থানে প্রাপ্ত যে (১) পরজাতিবিদ্বেষ এবং (২) ঐহিকনিষ্ঠতা—তাহার সহিত বিপরীত সম্বন্ধ খৃষ্টীয় উপদেশ সম্ভূত—(১) শান্তিশীলতা (২) নম্রতা

(৩) দানশীলতা (৪) পাপভীতি। সুতরাং জাতিস্বভাবে ঐ দোষ এবং গুণ উভয়ের তেজঃ কিছু কিছু স্তিমিত হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ প্রাচীন জর্ম্মণ জাতির ঔদ্ধত্য খৃষ্টীয় নম্রতাদিকে ন্যূন করিয়া দিবে। অথবা শিক্ষাদি ভেদে কতক লোকের মধ্যে ঐ সকল দোষ, আর কতক লোকের মধ্যে ঐ সকল গুণ অধিকতর প্রবল হইবে। যাঁহারা ইংরাজের শুদ্ধ কথা শুনেন নাই বা বহি মাত্র পড়েন নাই—অথবা যাঁহারা উঁহাদিগের কথার এবং ব্যবহারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, ইংরাজ-ধর্ম্মনীতির উল্লিখিত ব্যষ্টীকরণ প্রকৃত হইল কি না।

হিন্দু ধর্ম্মনীতিকে উহার উপাদান ধরিয়া বিভাজিত করা অসাধ্য। আর তাহার প্রয়োজনও নাই। যে সকল সদ্‌গুণের কথা হইল, তাহার মধ্যে কোন্ উৎকৃষ্ট গুণটি হিন্দুর ধর্ম্মনীতির মধ্যে এবং এই জাতির স্বভাবে নাই? খৃষ্টীয় উপদেশে যাহা যাহা পাইবার তৎসমুদায়ই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। ঐ উপদেশে পরকালের কথা আছে, হিন্দুশাস্ত্র পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। গল্প আছে যে, গ্রীক্ পণ্ডিত প্লেটো প্রণীত একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরকালের অস্তিত্বে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে একটি গ্রীক যুবা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা পরকালে বিশ্বাস এতদূর হইয়া আছে যে, সেই অতিপূর্ব্বকাল হইতে আর এই সেদিন পর্য্যন্ত মুনি, ঋষি, বীর, যোদ্ধা, যুবা, বৃদ্ধ, বনিতা, অনেকেই অনায়াসে আপনাদের জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। আর হিন্দুর শান্তিশীলতা নম্রতা এবং দয়ালুতা পৃথিবীতে আদর্শস্থলীয় হইয়া আছে। তদ্ভিন্ন (১) আত্মনিবেদন ও (২) বাহ্য ভাব—ভক্তি পথে এই দুইটী, আর (১) সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন (২) সর্ব্বত্র আত্মদর্শন এবং (৩) একত্বমাত্র দর্শন, জ্ঞানপথে এই তিনটী, হিন্দুর ধর্ম্মেই আছে, আর যে হিন্দুর স্থানে শিখিয়াছে, তাহার ধর্ম্মেও আছে, অপর কোথাও নাই। তদ্ভিন্ন, (১) পবিত্রতা (২) নিষ্কামতা, (৩) পরার্থ জীবন—এ সকলের কিছুই ইউরোপীয়দিগের নাই। গ্রীক এবং রোমীয় উভয়েই অতি অপবিত্র পাপকর্ম্মা জাতি ছিল। তাহাদিগের মধ্যে অতি প্রধান প্রধান লোকেরও এমন দোষ ছিল যে সে দোষের নাম করিতে নাই। খৃষ্টমতাবলম্বীদিগের

মধ্যেও একটি অপূর্ব্ব অপবিত্র বিচার প্রণালী আছে। উঁহারা কেহ কেহ বলেন যে শরীর এবং আত্মা দুইটি পৃথক্ বস্তু। শরীর কৃত পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না এবং আত্মা যে পাপ করে, তাহা শরীরে লব্ধ হয় না! কি আশ্চর্য্য! আবার এই জাতির লোকেরা স্পর্দ্ধা করিয়া হিন্দুসন্তানকে ধর্ম্মনীতি শিখাইতে চায়!

যাউক, উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাবে যে ইউরোপীয়ের হিন্দুকে শিখাইবার কিছুই নাই, শিখিবার জিনিসই অনেক আছে, সে কথা নিশ্চয় হইল। এখন দেখা আবশ্যক যে নীচের দিকে হিন্দুর কিছু শিখিবার আছে কি না। আমার বোধ হয় একটি বিষয় বিশেষ শিক্ষণীয়ই আছে—সেটি দল বাঁধিবার ক্ষমতা। যদি হিন্দুরা ইংরাজের স্থানে ঐ ধর্ম্মটি শিখিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে আর কোন দুঃখই থাকে না। একটি ইংরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি "উই" (we আমরা) বলিয়াছিলাম। তিনি একবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "দেখ, তোমার যদি আমরা বলিবার যো থাকিত,তাহা হইলে আমরা এখানে থাকিতাম না!" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে দুইজনেও একমত হইতে অক্ষম!

কেহ কেহ মনে করিবেন, ইংরাজের নিকট সৌন্দর্য্যবোধটাও শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি তাঁহাদিগকে বলি, একবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া আইস। কুম্ভকোণম, চিদাম্বরম, মদুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভাস্করীয় মূর্ত্তি এবং নির্ম্মাণ এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি স্ব স্ব চক্ষে দেখ। বুঝিতে পারিবে, কি জন্য ভারতবর্ষ-বিদ্বেষী ইউরোপীয়রা ঐ সকল কীর্ত্তিকে গ্রীক কারুবর্গের কীর্ত্তি বলিয়া থাকেন।

আবার যদি কেহ বলেন ইংরাজের স্থানে একপত্নীকতা শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি বলিব একপত্নীকতা আমাদিগের শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত আছে। আর এক্ষণে একপত্নীকতা প্রায়ই সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

—**:**—

পারিবারিক নীতি।

ইংরাজ সমাগমে আমাদিগের অত্যুচ্চ ধর্ম্মনীতির উপর আঘাত হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট অধিকারী কখন অপকৃষ্ট অধিকারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদিগের পারিবারিক রীতি নীতির দশা কি হইবে? ঐ রীতি নীতি যদি ইংরাজ রীতি নীতি হইতে তত উৎকৃষ্ট হয় অথবা এতদ্দেশের অধিকতর উপযুক্ত হয় তবে উহাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে নচেৎ উহা অবশ্যই কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থার মূল নিয়ম, পরিবারস্থ সকলের একত্রে মিলিয়া থাকা। উহারই অবশ্যম্ভাবি ফল—অল্প বয়সে বিবাহ।

আমাদিগের দেশ কৃষি-প্রধান, শিল্প প্রধান এবং বাণিজ্য-প্রধান নয়। কৃষি-প্রধান দেশ ভাল কি বাণিজ্য-প্রধান দেশ ভাল যদিও তাহার বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাপি ও বিষয়েও কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংলণ্ড, হলণ্ড এবং বেলজিয়ম ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল দেশই কৃষি-প্রধান। এক্ষণে, ইংলণ্ড বাণিজ্য প্রধান হইয়াও অপরাপর কৃষি-প্রধান দেশ অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া আছে। কোন সময়ে হলণ্ডও খুব প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর হলণ্ডের পূর্ব্ব প্রাধান্যের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? জর্ম্মণেরা মনে করিতেছেন উহাকে এক দিন গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। বেলজিয়ম অতি ক্ষুদ্র বস্তু, কেবল অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের পরস্পর ঈর্ষা বশতঃ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে রহিয়াছে, ফ্রান্সের কবলীকৃত হয় নাই। ফলকথা, বাণিজ্যপ্রধান দেশগুলির বল কৃষিপ্রধান দেশের অপেক্ষা কখনই অধিক বলিয়া প্রতীত হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতেও দেখ, ফিনিকীয়রা বাণিজ্য-প্রধান, কৃষিপ্রধান পারসিকদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল; বাণিজ্য-প্রধান কার্থেজ কৃষিপ্রধান রোম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল; এথেন্স কৃষিপ্রধান স্পার্টা কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল; বাণিজ্যপ্রধান বেনিস কৃষিপ্রধান অষ্ট্রীয়ার শরণাপন্ন এবং বাণিজ্যপ্রধান জেনোয়া কৃষি-প্রধান ফ্রান্সের দাস ছিল। অতএব বাণিজ্যপ্রধান হইলেই

যে কোনদেশ প্রবলতর এ কথা সত্য নহে। প্রত্যুত নেপোলিয়ান বোনাপার্টি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে, কৃষি-প্রধান দেশের বল অনেক পরিমাণেই অধিক এবং উহা বিশিষ্টরূপেই স্থায়ী বল। তিনি ফরাসিদিগকে কৃষিপ্রধান থাকিবার নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন দেশ কৃষিপ্রধান হইবে কি বাণিজ্যপ্রধান হইবে, ইহা কাহার উপদেশ বা পরামর্শের স্থল নহে। যে দেশের যেরূপ অবস্থান এবং যেরূপ প্রকৃতি, সে দেশ তদনুযায়ী হইয়া কৃষিপ্রধান বা বাণিজ্যপ্রধান হইয়া উঠে। ফ্রান্স দেশ স্বতঃই কৃষিপ্রধান। উহাতে দ্রাক্ষার চাষ এত অধিক এবং উত্তম হয় যে ওদেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং অধিক মদ্য আর কোথাও জন্মে না। ঐ দ্রাক্ষাকৃষির বলেই ফ্রান্স এত বলবান এবং বলশালী। একজন ইটালীয় রসায়নবিৎ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের মৌয়া ফুল হইতে অবিকল ফরাসিদেশ-প্রসূত ব্রাণ্ডির ন্যায় ব্রাণ্ডি প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা এত অধিক এবং এত স্বল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে যে ফ্রান্সকেও এখানকার ব্রাণ্ডি কিনিয়া খাইতে হয়। তাঁহার স্থানে ঐ কথা শুনিবার কিছুকাল পর হইতে দেখিতেছি যে ইটালী এবং ফ্রান্সে আমাদের মৌয়া ফুলের রপ্তানী হইতেছে। মৌয়া ফুল হইতে যে মদ্য এখানে জন্মে উল্লিখিত রসায়নবিৎ তাহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার কাজই আমাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রসায়নাদি বিদ্যা প্রকৃতরূপে শিখিয়া এ দেশীয় কৃষি শিল্পাদির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। ঠিক ইংরাজদিগের অনুরূপ শিল্প বাণিজ্যাদি বিস্তারের চেষ্টা সফলও হইবে না, আর প্রয়োজনীয়ও নহে।

ফলকথা ভারতবর্ষ দেশ কৃষিপ্রধানই আছে, আর কৃষিপ্রধানই থাকিবে। যদি কৃষিপ্রধান থাকে, তবে সম্মিলিত পরিবার বা একান্নবর্ত্তিতাও অবশ্য থাকিয়া যাইবে। কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই একান্নবর্ত্তিতার অগৌরব নাই। যদি কোন কারণে কৃষিপ্রধান দেশে সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সেই দেশে একটি বড়ই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে। ভূমি-শূন্য এবং একান্ত নিরন্ন শুদ্ধ

মজুরদার লোকের সংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে মজুরদার লোক সকল বহুকাল ভূমিসম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকে না, পরিশ্রমশীল এবং মিতব্যয়ী হইলে অল্প দিনের মধ্যেই ভাগে বা অন্য প্রকারে প্রায়ই অল্প স্বল্প জমা জমি ভোগ করিতে পায়। কৃষিপ্রধান রুসিয়া দেশ আরও ভাল। সেখানে গ্রাম শুদ্ধ লোকের ভূমিতে মিলিত-স্বত্ব, সুতরাং গ্রামস্থ সকল লোকেই অল্প স্বল্প ভূমিতে চাষবাস করে। কেবল মজুরদারি করিয়া খায় এমন লোক নাই বলিলেই হয়। মূলে এই সম্মিলিত স্বত্বের ভাব আছে বলিয়াই রুসিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সম্মিলিত স্বত্ব জন্মাইবার এত চেষ্টা হইতেছে। রুসিয়ার মধ্যে যে সামাজিক (Socialist) এবং বিনাশক (Nihilist) দলের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার হেতু রুসিয়া সম্রাটের একাধিপত্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ভৌমিক সম্মিলিত স্বত্বের অস্তিত্বই তাহার প্রকৃত কারণ। ফরাসিদিগের দেশেও ঐ সামাজিক (Socialist) এবং সম্মিলিতিক (Communist) দল আছে। কিন্তু তাহাদের অভ্যুত্থান স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছে। পৈত্রিক ধন সম-বিভক্ত হইবার নিয়ম থাকায় এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী না থাকায় ভূমি সম্পত্তি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া যায় যে তাহার এক এক খণ্ড এক একটী পরিবার পোষণের যোগ্য থাকে না, সুতরাং বিক্রীত হয়। সেই গুলি বিক্রীত হইয়া গেলেই তাহার পূর্ব্ব অধিকারীরা একে-বারে ভূমি-সম্পর্ক শূন্য হয় এবং তাহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত মজুরদারের পেশা গ্রহণ করিতে হয়। ঐ মজুরদার লোক সকলকে কাজ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলেই তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে এবং কখন কখন রাষ্ট্রবিপ্লবাদি অতি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে। ফ্রান্সের এই দল সর্ব্বদা অসন্তুষ্টচিত্ত এবং রাজ্য শাসনের নিয়ম যখন যাহা থাকুক তাহা পরিবর্ত্ত করিয়া সুখী হইবার জন্য যত্নশীল হয়। ইংলণ্ডেও ভূমি সম্পর্ক রহিত শ্রমজীবী লোকের দারিদ্র্য অতি কঠোর। কিন্তু ইংলণ্ড শিল্পবাণিজ্যপ্রধান দেশ। ওখানকার শ্রমজীবীরা হয় স্বদেশীয় কলকারখানায় কাজ পায়, না হয় দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষীয়েরা ওপথে যাইতে পারিবে না। গ্রেটব্রিটেনে সাড়ে তিন কোটি

মাত্র লোক। উহাদিগেরই সন্তান সন্ততি এত হয় যে শিল্পবাণিজ্য এবং উপনিবেশাদি দ্বারা তাহাদিগের খোরাক যোগাইতে সমস্ত পৃথিবীই যেন কুলায় না। ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি লোকের সন্তান সন্ততি যদি উহাদের মত শিল্প বাণিজ্য এবং উপনিবেশ দ্বারা আপনাদিগের আহার্য্য সাধন করিতে যায় তবে সমস্ত সৌর জগৎটা ইহাদিগের প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান থাকিবে এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী রক্ষা করিবে। যদি তাহাই হয় তবে কি এখানকার বৈবাহিক প্রণালী সাধারণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে? আমার বোধ হয় তাহা পারিবে না। এ দেশে বাল্যবিবাহই প্রচলিত থাকিবে। দেশভেদে বিবাহের বয়স ভিন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশমাত্রে অধিক বয়সে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশমাত্রে অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে।

অতএব অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া যে ভারতবর্ষীয়দিগের কোন একটা বিশেষ রোগ তাহা নহে। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং ইহার খুব উচ্চ স্থানীয়। উহাদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবার রীতি কন্যার ১৬ হইতে ২০বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে। অতএব বাল্যবিবাহের সহিত হিন্দুয়ানির তেমন কোন সংস্রব নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিতেন তাহার পরে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। বৌদ্ধদিগের সময়ে যতি ধর্ম্মের আত্যন্তিক বাহুল্য দেখিয়া তাহাদিগের নিরসনের পর দীর্ঘব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং সেই অবধি অল্প বয়সে ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য ছিল তখনও এদেশে কন্যাকাল বার তের বৎসরের অধিক বলিয়া অবধারিত হয় নাই।—ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।

তবে কি বৈবাহিক ব্যাপারে কোন পরিবর্ত্তই আবশ্যক হয় নাই?—আমার মতে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। (১) যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া রাজকার্য্য করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে অল্পবয়সে বিবাহ অকর্ত্তব্য। (২) কতকগুলি লোক উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ

একেবারে পরিত্যাগ করুন এবং স্বদেশীয় কৃষিশিল্পাদি উত্তমরূপে বুঝিয়া আমেরিকা ইউরোপ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া কৃষি শিল্পাদির উন্নতির উপায় অবগত হউন। তাঁহারা নির্লোভ নিঃস্বার্থ এবং ভোগ-সুখ ত্যাগী হইয়া যে উপদেশ দিবেন তাহা দেশীয় বড়লোক এবং ছোটলোক সকলেই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি হইবে। ভারতবর্ষে যে এতটুকু নিঃস্বার্থতা আছে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা এরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন তাঁহারা মাতৃভূমির প্রকৃত উপাসনা করিবেন—এবং সে উপাসনা ঈশ্বরোপাসনা হইতে অভিন্ন।

আমি ঐ পর্য্যন্ত করিবার বিশেষ চেষ্টাই করিতে বলি। আমি বেশ জানি ইংরাজ সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ভাল বলেন না এবং তিনি প্রমাণ দ্বারা দৃষ্টান্তদ্বারা এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রকেও কিছু মোচড় দিয়া সম্মিলিত স্বত্বাধিকার প্রণালী বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ অল্প বয়সে বিবাহেরও বিপক্ষ—কোন্ নিয়ম কোন্ দেশে খাটে, তিনি তাহা ভাবিয়া বুঝেন না। তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান যে তাঁহার নিজের যে রীতি নীতি তাহাই ভাল, আর সকল রীতি নীতিই অপকৃষ্ট; সুতরাং ইংরাজ ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের উপযোগী ব্যবস্থা চালাইতে চাহেন। করুন, কিন্তু যখন প্রাকৃতিক শক্তি ঐ চেষ্টার বিরুদ্ধ তখন ওরূপ কোন মোহান্ধ এবং অবৈধ চেষ্টায় বিশেষ ফলই ফলিবে না। আর যদি তাঁহার চেষ্টার ফল সত্য সত্যই ফলে, তবে এমনি বিষময় হইবে যে, পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে তাহার লক্ষণ এপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

হিন্দুসমাজ ও কূপমণ্ডূকতা।

হিন্দু সমাজের প্রতি এই একটী দোষারোপ হইয়া থাকে যে, ইহার শাসনে থাকিয়া হিন্দুরা কখন স্বদেশের বাহির হইতে পান না এবং সেই জন্য স্বদেশ বহির্ভূত কোন ব্যাপারই শিখিতে বা বুঝিতে পারেন না, নিতান্ত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইয়া থাকেন। কূপমণ্ডূকতা দোষ বই কি—কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে উহা যত দোষ হিন্দুর পক্ষে তত দোষ

না হইতে পারে। হিন্দুর বাসভূমি সমুদায় পৃথিবী মণ্ডলের প্রতিকৃতি স্বরূপ। এই বাসভূমির বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পুণ্যতীর্থ—তীর্থ দর্শন করা শাস্ত্রের বিধি, আর হিন্দুরা সেই বিধি পালনপূর্ব্বক পর্ব্বে পর্ব্বে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। অতএব স্থূলদৃষ্টিতে হিন্দুদিগকে যত বদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা তত বদ্ধভাবাপন্ন নহে।

হিন্দুদিগের সমুদ্রগমন নিষেধ চিরকালের অবস্থা নহে। হিন্দু বণিকেরা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে যে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন তাহার ভূরি পরিমাণ উল্লেখ সামান্য কাব্য গ্রন্থে এবং কিম্বদন্তীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, এবং লম্বক দ্বীপে যে হিন্দুদিগের উপনিবেশ সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার অতি সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল সুদূর সাগর মধ্যস্থ সেই সকল স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপি সেই সকল স্থানে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ লম্বক দ্বীপের রাজা হিন্দু, সেখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মুসলমান ইতিবৃত্তেও দৃষ্ট হয় যে, সিন্ধুদেশ হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমুদায় উপকূলভাগের লোক সামুদ্রিক বাণিজ্য করিত। আরব বোম্বেটিয়াদিগের দৌরাত্ম্যেই ঐ বাণিজ্য শৃঙ্খলাবিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং যদিও এদেশীয়দিগের মধ্যে সেই বাণিজ্য কার্য্যে মুসলমানেরাই প্রধান, তথাপি হিন্দু জাতীয় বিভিন্ন শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ও নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের "নাডগোট" নামক স্থানের চেটী বা শ্রেটীরা যবদ্বীপের সহিত বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। মদুরাধিষ্ঠাত্রী দেবী "মিনাচি" বা "মীনাক্ষীর" নামে তাঁহাদের ষ্টীমারের নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রগমনে জাতিপাত যদিও লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু লোকের আচারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। অতি বিচক্ষণ কোন একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনারা স্বজাতীয় বিলাতফেরৎদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন?" তিনি বলিলেন "আমরা ওবিষয় লইয়া কোন বিচার বাহুল্য করি না। যিনি বিলাত হইতে আসিলেন, তিনি বিনা আড়ম্বরে

প্রায়শ্চিত্ত ও কেশাদি সংস্কার করিয়া কয়েক দিন পরে স্বজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগের স্বজনেরাও তাঁহাদিগের বাটীতে যান। চলন বলন দেশীয় রীতি ক্রমেই হয়; ক্রমে তাঁহাকে দুই একটী ক্ষুদ্রভোজে নিমন্ত্রণ করি, তিনি আসিয়া ভোজনাদি করিয়া যান। অনন্তর বৃহৎ বৃহৎ ভোজাদিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ চলে, এবং পরিশেষে তিনি নিমন্ত্রণ করিলে সকলে গিয়া তাঁহার বাটীতে ভোজন করি। আমাদের প্রণালী এই; আমরা বিলাত যাওয়া লইয়া কোন গোলযোগই করি না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুজাতীয় ব্যক্তি, বিনা সমাজত্যাগে সমুদ্রগমন এবং বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারেন। তবে আত্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি এবং মমতা আছে, তাঁহারাই ওরূপ পারেন। যাঁহারা একেবারে আত্মগৌরব পরিশূন্য হইয়া নিজ সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ভালবাসেন এবং সমাজের নিকট নতভাব ধারণ না করিয়া তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা সমাজ মধ্যে পুনর্ব্বার গৃহীত হইতে পারেন না, সেই স্থলেই প্রায় প্রায়শ্চিত্তাদির কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আত্মগৌরব এবং সমাজগৌরব আছে। প্রকৃত কথা এই যে, যদি বিদেশ গমনের তাদৃশ প্রয়োজন এবং যথাযোগ্য উপায় থাকে, তবে বিদেশ গমনে হিন্দুসমাজ বিশেষ বাধা প্রদান করেন বলিয়া বোধ হয় না। স্পর্দ্ধা করিয়া সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিলে কোন সমাজই কখন ক্রুদ্ধ হয় না। হিন্দুসমাজ বিনয় ব্যবহার মাত্র চাহেন। এই সমাজ উদ্ধত দুর্বৃত্তদিগেরই প্রতি দণ্ড করেন। অন্যান্য সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রচলিত মতবাদ হইতে অপর কোন মতবাদ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। হিন্দু সমাজে ওরূপ কখনই হয় নাই, পরধর্ম্মবিদ্বেষ কূপমণ্ডূকতার প্রধান লক্ষণ—তাহা হিন্দু সমাজে আজিও নাই, কস্মিন্ কালেও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কথিত আছে, ভগবান শঙ্কর স্বামীর সময়ে কোন কোন বৌদ্ধের তুষানল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসম্বন্ধে ইহাও কথিত আছে যে, ঐ প্রায়শ্চিত্ত সমাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হয় নাই। যে পণ করিয়া বিচার হয় সেই পণ রক্ষা মাত্র।

যাহা হউক, কূপমণ্ডূকতার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। স্বদেশ হইতে বাহির না হইলেই যে মানুষের কূপমণ্ডূকতা জন্মে আর বাহির হইলেই যে ঐ দোষ একেবারে ঘুচিয়া যায়, একথাও প্রকৃত কথা নহে। কত ইংরাজের সহিত আলাপে দেখা যায়, অনেকানেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াও তাঁহারা সেই সেই দেশের প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। আর অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ পনর, কেহ বিশ, কেহ ত্রিশ বৎসর এদেশে কাটাইয়াও এদেশের অতি সাধারণ বিষয় সকলেও ঘোর মূর্খ থাকিয়া যান।

ঐ সকল লোককে দেখিলে একটী রুসীয় ভদ্র সন্তানের সহিত মহাত্মা পীটরের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, সেই কথা মনে পড়ে। মহাত্মা পীটর স্বয়ং সাম্রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনেকানেক ইউরোপীয় রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বড় বড় জমীদারদিগের সন্তানদিগকে ইউরোপের নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। একজনকে ইটালী যাইতে অনুজ্ঞা হইল। স্বদেশবৎসল রুসীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন পরদেশে পদার্পণ করাও দোষ মনে করিত। যে ব্যক্তি ইটালী যাইতে আদিষ্ট হইল সে নিজ ব্যয়ে একটা সুবৃহৎ যান প্রস্তুত করিল। এবং তাহারই ভিতর রান্না খাওয়া প্রভৃতি সকল কাজ চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে ঐ যান মধ্যে রহিল, ভৃত্যেরা উহা ইটালী দেশের প্রধান নগর রোম পর্য্যন্ত লইয়া গেল এবং তথা হইতে ফিরাইয়া আনিল। সে ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়াছে শুনিয়া সম্রাট পীটর তাহাকে ডাকিলেন এবং সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইটালী দেশ কেমন দেখিলে?" * * "আজ্ঞে দেশ দেখি নাই।" * * "দেশ দেখ নাই কি—এই সেদিন মাত্র তথা হইতে আসিলে না?" "আজ্ঞে তা বটে—কিন্তু দেশ দেখি নাই" * * "গেলে এলে কেমন করে?" আজ্ঞে একটা বড় গাড়ি করিয়া গিয়াছিলাম, একবারও বাহির হই নাই"—পীটর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন।

অনেকানেক ইউরোপীয়ের বিশেষতঃ কোন কোন ইংরাজের ঐরূপ এক একটী যান সমভিব্যাহারেই থাকে—উহাঁরা কখন তাহার ভিতর

হইতে বাহির হয়েন না। ঐ যান কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত নয়—উহা অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, পরজাতির প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ বিনির্ম্মিত, উহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর পদার্থ—ইংরাজ উহারই ভিতরে বসিয়া সকল দেশ ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান। আমাদের সমাজ ওরূপ কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি করিতে পারে না।

বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পূজা।

সুয়েজ প্রণালীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বহু দেশের আচার ব্যবহারের দ্রষ্টা বিচক্ষণবর লেসেপ সাহেব বলেন যে, মিশরদেশ কখন কোন ইউরোপীয় জাতির অধীন হইয়া থাকিবে না। কারণ মিশর দেশীয়া রমণীগণ কখনই ইউরোপীয়দিগকে বিবাহ করিতে সম্মতা হয় না। একথার তাৎপর্য্য এই যে, পতিভাবে গ্রহণই ভক্তি এবং প্রণয়ের চিহ্ন; মিশরীয় স্ত্রীলোকেরা যখন ইউরোপীয়দিগকে পতিভাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু, যখন ভক্তি প্রেম-সুলভ স্ত্রীহৃদয়েও ইউরোপীয়ের প্রতি ঐ ভাব জন্মে না, তখন ঐ আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতির অধীনতা হইবে না, অথবা যদি হয়, সে অধীনতা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে না।

কোন সময়ে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিয়াছিলাম ব্রহ্মদেশীয়া ভদ্রমহিলাগণও পদস্থ ইংরাজদিগের রক্ষিতা স্বরূপ হইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করে না। প্রত্যুত তাহারা তাদৃশ অবস্থাকে আপনাদিগের গৌরবসূচক মনে করে। ঐ দেশেই দেখিয়াছিলাম অতি ভদ্রবংশীয় স্ত্রী পুরুষ সকলে আপনাদিগের পুরোহিতবর্গ পরিবৃত হইয়া কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পদদ্বয়ে পুষ্প চন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

যখন ঐ ব্যাপার দর্শন করি, তখন মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় কি সমূহ মঙ্গল হইতেছে! ঐ প্রথা থাকাতে লোকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই বড় লোক দেখিতে পায়, বিদেশীয় রাজপুরুষকেই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোপরি দেখে না এবং

সেই জন্য উহাঁদিগের প্রতি অযথা ভক্তিও করে না। আমি ভাবিলাম, যে ব্রহ্মদেশীয়েরা যে কাজ করিতে পারিল আমাদিগের অতি নীচ জাতীয় লোকেও তাহা করিতে ঘৃণা বোধ করে। ভারতবর্ষীয় কোন লোক যদি নিতান্তই আত্মবিস্মৃত হয়েন, তবে ইংরাজ করস্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার সমাদর না করিলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েন; যদি নিতান্তই হীনচেতা হয়েন তবে ইংরাজের সহিত একত্রে খানা খাইতে ভাল বাসেন; যদি একান্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন তবে ইংরাজ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলে বা তাঁহার নামটীর সম্বোধন পূর্ব্বক পত্রাদি লিখিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন; যদি সর্ব্বতোভাবে পৈত্রিক গুণ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে ইংরাজের অনুরূপ চাল চলন অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন; ভারতবাসী ইংরাজী পড়িয়া শুনিয়া যদি অত্যধিক নীচ হইলেন, তবে স্বজাতীয় ধর্ম্ম এবং নীতি এবং আচার অপেক্ষা ইংরাজের ধর্ম্ম এবং নীতি এবং আচার প্রণালীকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিলেন এবং ইংরাজের সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত অহরহ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আপনার ভগিনী ও কন্যাকে ইংরাজের রক্ষিতা করিয়া দিয়া এবং ইংরাজের পায়ে পুষ্প চন্দন দিয়া স্বয়ং চরিতার্থ হইতে পারেন না। যেখানে জাতিভেদ নাই এবং পরাধীনতা আছে, সেখানে পরাধীনতার অতি বিষময় ফলই ফলে, সেখানে আত্মগৌরব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, মন ক্ষুদ্র হয় এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মিবার কোন পথই থাকে না। আমাদিগের দেশে ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেবতা স্বরূপে সম্পূজিত হয়েন না। কিন্তু তাঁহারা পূজা পাইবার নিমিত্ত যেন বিলক্ষণ সচেষ্ট হইয়াছেন; এবং তাহার ফললাভও কিছু কিছু করিতেছেন।

আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, বাঙ্গালার প্রথম চারিজন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যখন দেশের বিভিন্ন ভাগ পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন কোন আড়ম্বরই হইত না। হালিডে সাহেব নীলকরদিগের বাটীতে বাটীতে খাইতেন, রাজা এবং জমীদারদিগের সহিত ছোট ছোট দরবারে দেখা করিতেন, মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর, জজ প্রভৃতির আদালত দেখিতেন এবং

কোন গোলযোগ না করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। গ্রাণ্ট সাহেবের রীতিও প্রায় ঐরূপ ছিল, তবে তিনি নীলকর সাহেবদিগের বাটীতে গিয়া ভোজ খাইতেন না এবং প্রজারা যে সকল দরখাস্ত দিয়া আপনাদের দুঃখ জানাইত তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন। বীডন সাহেব বড় একটা ভ্রমণ করিতেন না, যাহা একটু করিতেন তাহাতেও আড়ম্বর হইত না। গ্রে সাহেব কিছু কিছু বেড়াইতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি স্বহস্তে ছাতা ধরিয়া একটী বাজারের ভিতরে পাদচারে বেড়াইতেছেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য কেমন কেমন দরে বিক্রীত হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেছেন।

তাহার পরে কাম্বেল সাহেব আসিলেন এবং সমভিব্যাহারে সওয়ার যাইবে, যেখানে যাইবেন সেখানে বাজি পুড়িবে এবং আলোক দেওয়া হইবে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কমিশনর এবং মাজিষ্ট্রেটেরা একটু একটু মুচকি হাসিলেন, কিন্তু আজ্ঞাপালন করাইলেন। আর কি, লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল! টেম্পল সাহেবের আমলে বাজি পোড়ান এবং আলোকদান বাড়িয়া উঠিল। তখন কলাগাছের সারি দিয়া আলোক দিবার জন্য এবং বাঁশের গেট করিবার জন্য এত আড়ম্বর হইত যে কোন কোন গ্রাম একেবারে বাঁশ ও কদলীবৃক্ষ শূন্য হইয়া পড়িত।

ইডেন সাহেবের সময়ে বাজীপোড়ান আলোকদান পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন হইল না, ধ্বজার সংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইল এবং স্থানে স্থানে সকের-ফৌজ তাঁহার বডিগার্ড বা শরীর-রক্ষক সৈন্যরূপে দর্শন দিতে লাগিল। টমসন সাহেবের সময়ে ইডেনের মতই সব, বেশীর মধ্যে ব্যাণ্ড বাজে। কথিত আছে বেলী সাহেবের সময়ের উৎসবে গয়াতে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। যেমন ঐ সকল আড়ম্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিতেছিল, তেমনি উহার সহিত ভোজের ধূমধামও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইলিয়ট সাহেব কিছু কমাইতেছেন; তাঁহার সকল ধরণেই একটু বিশেষত্ব আছে; তাঁহাকে এক রকম ছাড়িয়া বলা যায় যে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরেরা নিতান্ত ভোজভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; উহাঁদিগকে এখন যে ডাকে তাহারই বাটীতে গিয়া ভোজ খান। যাঁহারা ভোজ দেন তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম কি

বাড়ে তাঁহারাই জানেন, কিন্তু ধন ব্যয় অপরিমিতরূপেই হয়। এক একটা শর্ব্বরী ভোজের খরচে চারি পাঁচটা খুব জাঁকাল দুর্গোৎসব হইতে পারে—অনেক বড় বড় দিঘীর পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে। আমি বেশ জানি যে, একজন মহারাজ কোন মাড়বারী মহাজনের স্থানে আট হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া একটী সান্ধ্য ভোজ দিয়াছিলেন। আর একজন মহারাজের ঐরূপ উৎসবে পনর হাজার টাকা ব্যয় হয়; আর একজনের কয়েকদিনের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ হাজারের কিছু অধিক হইয়াছিল।

গবর্ণর সাহেবদিগের দেখাদেখি, কমিসনর সাহেবেরা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এবং চুনা পুঁটি সকল সাহেব, দেশীয় লোকদিগের খরচে ভোজ খাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। বাজি পোড়ান, আলোক দান, নিশান খাড়া ত কথায় কথায় হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজজাতির আড়ম্বর প্রিয়তা ছিল না, কিন্তু সেটী বিলক্ষণই বাড়িয়া উঠিতেছে। ইংরাজ মনে করিতেছেন যে, এইরূপ হইতে হইতে তিনি ক্রমে পূজা পাইবেন। ইংরাজ মুখে বলিতেছেন যে তিনি দেশীয়দিগের বাটীতে ভোজ খাইয়া তাহাদিগের সহিত সুসামাজিকতা করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার করিলে পূজিত হইতে পারেন, ইংরাজ সে পথে যাইতে জানেন না। তাঁহার ভোজ খাইয়া বেড়ানতে তিনি ভারতবাসীর চক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

শুদ্ধ নির্লজ্জবৎ নয় অতিশয় নিষ্ঠুরের কাজই করিতেছেন। রাজা মহারাজ বেচারারা ত একে ঋণজালে জড়িত তাহাতে ঐ সকল ভোজ দিবার দায়ে তাহারা আরও ঋণগ্রস্ত হইতেছে; আর যে দেশে চারি পাঁচ কোটি লোক অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করে তথায় দানের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।

সেদিন শুনিলাম কোন জিলার জজ সাহেব মাস কয়েকের জন্য ছুটি লইয়া একবার স্বদেশে যাইবেন। অমনি তাঁহাকে একটী ভোজ দিবার জন্য একটা চাঁদার বহি বাহির হইল, উহাতে সহি হইল, টাকা উঠিল এবং জজ সাহেব ও অপরাপর সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিলেন। আর একদিন শুনিলাম, একজন অতি

প্রধান তীর্থের প্রধান দেবসেবক নিজ ভবনে নূতন কালেক্টর সাহেবের আগমন উপলক্ষে ইংরাজভোজের একটা প্রকাণ্ড আয়োজন করিতেছেন। ভোজের ফর্দ্দ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে মুর্গি, ভ্যাড়া এবং বেঙ্গের ব্যঞ্জন এক একটী এবং গোমাংসের ব্যঞ্জন তিনটি। মদ্য বহুবিধ। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, দেবসেবক, রাজা রাজড়ার পুরোহিতের এই কীর্ত্তি! দেখিয়া শুনিয়া ভয় হইল, কালে বঙ্গদেশও বা ব্রহ্মদেশের ন্যায়—ইংরাজ পূজায় অবনত-মস্তক হইবে। যদি দেশের জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যায়, যদি বিদেশীয় রীতি নীতিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদি দেশীয় লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ একেবারে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তবে ওরূপ হইলেও হইতে পারে।

একটী সার কথা বলিয়া রাখিতেছি। ইংরাজ যতই ভোজ খাউন, মদের গ্লাস হাতে করিয়া যতই লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করুন, উনি আপনার কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তুমি রাজা বা মহারাজ বা বড়লোক যে কেবল উহাঁর খোসামোদ করিতেছ—কোন "মতলব" আছে, তাহা উনি বিলক্ষণ জানেন; তুমি উহাঁর প্রতি ভয়প্রযুক্তই ওরূপ করিতেছ ভালবাসার জন্য তিলার্দ্ধও নয় তাহাও জানেন; এবং তাহা জানিয়া তুমি একটু ঘেঁসিতে গেলেই তোমার অপমান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের ওরূপ পূজা নিতান্ত অফল পূজা। পূর্ব্বোল্লিখিত দেবসেবকটী ঐ ভোজ দেওয়ার পর তাঁহার ইন্‌কমট্যাক্স বেশী ধরা হইয়াছে বলিয়া যখন আপীল করিলেন তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ নবাগত কালেক্টর মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, "যে এক রাত্রে পাঁচ হাজার টাকা ভোজে খরচ করিতে পারে, তাহার আয় অত কম কখনই হইতে পারে না।"

যদি আমার পরামর্শ কেহ শুনেন তবে আমি বলি, ইংরাজের সম্মান কর; কিন্তু এমন ভাবে কর, যাহাতে সম্মানিত ইংরাজের নাম থাকে এবং দেশীয় লোকের উপকার হয়। বাজি পোড়াইয়া আলো জ্বালিয়া টাকা নষ্ট করিও না। ভোজ দিয়া অনর্থক অপব্যয় এবং অপকর্ম্ম করিও না। যে ইংরাজের তুষ্টিসাধনার্থ ঐ সকল করিয়া থাক, তাঁহার নামে ইন্দারা, দীর্ঘিকা, রাস্তা, ঘাট, স্কুল, অতিথিশালা, ছাত্রবৃত্তি, মেডাল,

চিকিৎসালয় প্রভৃতি যাহা কিছু পার, স্থাপন কর। এরূপ করিতে আরম্ভ করিলেই দেখিতে পাইবে যে বীরপ্রকৃতিক ইংরাজ "সত্য সত্যই" তোমার গৌরব করিবেন। এখন তোমার খরচে তোমার বাটী বসিয়া ভোজ খাইয়া মনে মনে তোমাকেই অশ্রদ্ধা করেন।

—**:**—

ঈর্ষ্যাপ্রবণতা।

ইংরাজের সংস্পর্শে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে একটী বিশেষ দোষ জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমার বোধ হয় সে দোষটী ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও উহার এত অবশেষ আছে যে, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। ঐ দোষটীর নাম ঈর্ষ্যাপ্রবণতা। বাঙ্গালী স্বজাতীয় লোকের প্রতি অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। যখন ১৮৩৫ অব্দের পর মুন্সেফ সদর-আমীন প্রভৃতির পদ সৃষ্ট হইল, তখন অনেক লোক শুদ্ধ স্বজাতীয় হাকিমদিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বলিত, আমরা কালা হাকিমদিগের নিকটে বিচার প্রার্থনা করি না—ইংরাজ হাকিমেরা আমাদিগের মোকদ্দমার বিচার করিলেই আমরা অধিক সন্তুষ্ট হই। কোন কোন ইংরাজ ঐ কথার সূত্র পাইয়া এককে এক শত করিয়া বাড়াইয়াছিলেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাতেও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা স্বজাতীয় লোক সকলকে উচ্চপদস্থ দেখিতে পারে না—অতএব উহাদিগকে উচ্চপদ দিয়া কাজ নাই। আজিও ইংরাজদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কথা বলিয়া থাকেন। এবং বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ও কথা বলিবার সকল কারণ এখনও নিঃশেষিত হয় নাই।

আমরা এখনও স্বজাতীয় লোকের সম্যক্ গৌরব করিতে শিখি নাই। ইংরাজেরা যেমন সকল কথাতে এবং সকল কাজে স্বজাতীয় সকল লোকের সম্মান এবং মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বাঙ্গালীদের এখনও সেরূপ শিক্ষাটা পাকিয়া উঠে নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী বিদ্যা এমন উত্তমরূপে

শিখিয়াছেন যে ঐ বিজাতীয় ভাষায় অনর্গল লিখিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদের ক্ষমতা কি অল্প। অপর কোন ভাষায় ওরূপ লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে কয়জন বড় ইংরাজই সমর্থ। শ্রুত আছে যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্রেলি সাহেব যখন বর্লিন নগরে গমন করিয়া ছিলেন তখন সেখানকার মন্ত্রি-সমিতির মধ্যে ভাল করিয়া ফরাসি-ভাষাও কহিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য বিসমার্ক তাঁহাকে ইংরাজী ভাষাতেই কথোপকথন করিতে বলিয়াছিলেন। আর যে যাহার পরিচিত সাহেবদিগের মধ্যেই দেখ না, তাহার মধ্যে কয়জন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা বিশুদ্ধ হিন্দিতে আপনাদিগের মনের ভাব সকল সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা কেমন ইংরাজী শিখে, আর কত শিখে। ইংরাজেরা যে উহাদের অনাদর করেন, তাহার একটা হেতু আছে। অনাদর না করিলে তাঁহাদিগের জাতীয়ভাব থাকে কৈ—আর আপনাদের অন্নসংস্থানই বা কৈ থাকে। কিন্তু উহাঁদিগের দেখাদেখি, আমাদিগেরও কি স্বদেশীয় কৃতবিদ্যগণকে অনাদর করিতে আছে? মনে কর, মহামহোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি একজন সামান্য লোক ছিলেন, উহাঁর ন্যায় পণ্ডিত বিচক্ষণ তীক্ষ্ণদর্শী এবং বাগ্মী কয়জন লোক ছিলেন? কিন্তু আমরা কি উহাঁর সম্পূর্ণ গৌরব করিয়া থাকি? অথবা যতদিন ইংরাজকেও উহাঁর গৌরব করিতে না দেখিয়াছিলাম, ততদিন উহাঁর প্রকৃত গৌরব করিতে জানিতাম? উহাঁর সমান আর কেহ থাকুন বা না থাকুন, কিন্তু আমাদিগের সম্পূর্ণ গৌরবের যোগ্য আরও অনেক আছেন। সে সকলকে আমাদিগের মাথায় করিয়া রাখা উচিত।

তাহার পর ধর, যাঁহারা স্বজাতীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন —ইংরাজের নিকট আদর খুঁজেন না। আমরা কি তাঁহাদিগেরও বেশ গৌরব করিতে পারি? বঙ্কিমচন্দ্র কি একটা সামান্য লোক! আজি কালি উহাঁর দুই একটী পুস্তক ইংরাজীতে এবং জর্ম্মেণ ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে দেখিয়া আমাদিগের মনে যদি একটু প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে ত বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উনি যে কতটা

ভক্তির পাত্র, তাহা সকলে বুঝিতে পারে নাই। একটি তথ্যকথা এই—ইংরাজমাত্রেই সকল বাঙ্গালীর অপেক্ষা বড়লোক নহেন। যত বাঙ্গালী আছে, সকলের চেয়েই বড়লোক যদি এমন ইংরাজ থাকেন ত সে ইংরাজ এখানে আইসেন না। যদি বাঙ্গালী স্বজাতীয় প্রধান লোকদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়া উঠে, তাহা হইলে এখনও দেখিতে পায় যে, বঙ্গভূমি সত্য সত্যই রত্নপ্রসবা। যে দেশে শিরোমণি এবং জয়দেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশের সকল লোক কখনই জন, চার্লস্, হনরি, মাথু হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে না। * * * * * তবে সমস্ত রাজশক্তি ইংরাজের হস্তগত, ইংরাজের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে চাকুরি হয় না, পদমর্য্যাদাও বাড়ে না, কোন কিছুতেই সুবিধা পাওয়া যায় না, এই জন্য লোকে ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিতে যায়—এবং ইংরাজ আমাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যার চিহ্ন দেখিতে পাইলে কিছু বিশেষ তুষ্টই হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক অল্প-প্রাণ বাঙ্গালী ইংরাজদিগের সাক্ষাতে স্বজাতীয়ের নিন্দাসূচক অনেক কথাই কহিয়া ফেলে।

একজন ইংরাজের সহিত কথোপকথন হইতে হইতে এ দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন "—স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা না দেওয়া বড় অপকর্ম্ম।" * * আমি বলিলাম "স্ত্রীস্বাধীনতা একটা নূতন বিশেষ কথা বলিয়াই আমার বোধ হয় না। যে দেশের পুরুষেরা যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে, সে দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়া থাকে—এই নিয়ম বই আর কিছুই নহে। তোমাদের ইংলণ্ডে আজও ত স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার বিষয়ে গণ্ডগোল চলিতেছে; অতএব সেখানেও পুরুষের স্বাধীনতা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অবশ্যই কম হইবে।" * * তাহা বটে, কিন্তু তোমরা ত আপনা আপনির মধ্যেও স্ত্রীলোকদিগকে সভাস্থলে আসিতে দেও না—ইহার কারণ কি?" এই বলিয়াই ইংরাজটি বলিলেন—অমুক বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালীরা বরং ইংরাজদিগের সভায় আপনাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু

লাভ অবান্তর বিষয় থাকিবে। তখনকার কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিতেন—দেখ, আমেরিকার ইউনাইটেড্ প্রদেশ যতদিন ইংলণ্ডের অধীন ছিল ততদিন ইংলণ্ডের বড় কিছুই লাভ হয় নাই; ঐ প্রদেশ স্বাধীন সবল এবং ধনশালী হইয়া অবধি উহার সহিত ইংলণ্ডের যে বাণিজ্য ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের সমূহ লাভ হইতেছে। তেমনি ভারতবর্ষ সবল এবং ধনশালী হইলে ইংলণ্ডের যত লাভ, উহা দুর্ব্বল এবং অক্ষম অবস্থায় ইংলণ্ডের গলায় পড়া হইয়া থাকিলে তত লাভ নাই। কেহ কেহ এরূপও বলিতেন যে, ভারতবর্ষ উহার বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ডের বলবর্দ্ধক পদার্থ নহে, উহা ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিজনক বস্তু হইয়া আছে।

এখন আর ওরূপ কথাসকল শুনা যায় না। মহারাজ্ঞীর খাস দখলে আসিয়া অবধি ইংরাজেরা কথা বদলাইয়াছেন। ডিউক অব আর্গিলই বোধ হয় ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বলেন যে ভারতবর্ষকে আমাদিগের চির-অধীনাবস্থায় রাখাই আমাদিগের রাজ-নীতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পর অবধি ঐ ভাবের কথা যার তার মুখে শুনা যাইতেছে। একদিন একটি ইংরাজের সহিত ঐ সম্বন্ধে কথা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে ভারতবর্ষকে আত্মশাসনে সক্ষম করাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য?" আমি বলিলাম "আমি স্বপ্নেও তাহা মনে করি নাই—আমি এই মনে করি যে ওরূপ একটা উচ্চতম সদুদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে রাজ্যের সুপালন হয়। যেমন যিশু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হইবার চেষ্টা কর। তাহাত বস্তুতঃ কেহ হইতে পারে না, কিন্তু ওরূপ আদর্শ মানসচক্ষে রাখিয়া চলায়, অনেকের শুভ ফল ফলে। আমি সেইরূপ ভাবিয়া মনে করি যে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলিতেন তাহা ভালই বলিতেন, উহাতে কতকটা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল। "এখন ঐ কথার বদলে যে কথা উঠিয়াছে তাহাতে কি শুভ ফল দেখিতেছেন?"—"এখন কি কথা উঠিয়াছে?" আমি—"এখন সময়ের অসময়ের বিনা বিচারে বলা হইতেছে, এ দেশে সকল বিষয়ে ইংরাজ-প্রাধান্য রক্ষা করাতেই এ দেশীয় লোকের উপকার—সেই জন্য

ইংরাজ-প্রাধান্য রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক প্রয়োজনীয়।" তিনি বলিলেন—"এমন কথা কে বলে?"। আমি বলিলাম—"অমন কথা আজি কালি কে না বলে?—গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন যে, কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কারণ ইংরাজভীতি ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য—এমন কথাতেও ত কোন ইংরাজ কিছু বলিলেন না, প্রত্যুত ওরূপ কথা যে লিখিয়াছিল, তাহাকেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল! কিন্তু ঐ মত রক্ষা করিয়া চলিলে অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের দৌরাত্ম্য বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে? ন্যায়পরতা রক্ষা না করিলেই রাজ্য ছারখার হয় —স্থায়ী হয় না!"

অপর একটী সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত আত্মশাসন সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "এখনও দেশীয় লোকের হস্তে কোনরূপ আত্মশাসন-শক্তি দিবার সময় হয় নাই —এখনও গবর্ণমেণ্টের বল দেশের লোকের উপর তেমন চাপিয়া বসে নাই।". আমি বলিলাম—"মহাশয় মনে করিতেছেন গবর্ণমেণ্টের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের বাঁধন এমনি কড়াকড় হইয়া বসিয়াছে যে, প্রায় পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়াছে।" উল্লিখিত মহাশয় সেই পর্য্যন্ত আমার উপর চটিয়া রহিলেন। কিন্তু ইনি গ্রাণ্ট ডফের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। গ্রাণ্ট ডফ্ ভারতবাসীর পীড়ক—ইনি স্বজাতিপোষক মাত্র, ফলবলতঃ পীড়ক।

আমি অপর আর এক প্রকার ইংরাজের নমুনা পাইয়াছি। এই দল দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার বড়ই প্রতিকূল। ঐ দলের কোন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন—"ইংরাজী পড়িয়া লোকে চাকুরি চাকুরি করিয়া বেড়ায়—চাকুরিও যোটে না—উহারা বড়ই ক্লেশ পায় —আমার ইচ্ছা করে ইংরাজী স্কুল কলেজের সংখ্যা কমিয়া যায়।" আমি বলিলাম—"আমার ইচ্ছা করে যে ইংরাজী স্কুল কলেজের

সংখ্যা আরও অনেক বাড়ে।" তিনি বলিলেন—"বাড়িলে কি হইবে? —আরও কতক গুলা উমেদার বাড়িবে বইত নয়।" * * "বাড়ায় হানি কি? উমেদার অধিক হইলে চাকুরি দিবার নিমিত্ত ভাল লোক পাইবার সম্ভাবনা বাড়ে বইত কমে না?" * * * তাহাতে দেশের মঙ্গল কই?" * * "তবে লোকে কি করিবে?" * * শিল্প বাণিজ্যতে যাইবে; নূতন নূতন শিল্প কার্য্যের উদ্ভাবন করিবে" * * * "বটে —ওকথা ইংরাজের মুখে কতই শোভা পায়—যে কার্য্যে অধিক মূলধন কি অধিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ প্রয়োজন নাই, আমাদিগের সেই লবণোৎপাদন শিল্প পর্য্যন্ত ইংরাজ কত পরিশ্রম এবং কত অবিচার করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে—আজি সেই ইংরাজ আমাদিগকে শিল্প কার্য্যের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করিতেছে, ধন্য ইংরাজের নির্লজ্জতা।" ইংরাজটি অধোবদন হইয়া রহিলেন,কিন্তু নিজ মাহাত্ম্যগুণে আমার উপর চটিলেন না, পূর্ব্বাপেক্ষায় যেন কিছু অধিক সদয় হইয়াই থাকিলেন!

আর একটি ইংরাজের কথা বলিব। তিনি অনেকদিন বঙ্গদেশে কর্ম্ম করিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃতি এবং চরিত্র বিশেষরূপেই অবগত হইয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপর একজন ইংরাজ ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়া প্রথমোল্লিখিত ইংরাজের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে বাঙ্গালীদের প্রিয় হইবেন। প্রথমোল্লিখিত ইংরাজ পরামর্শ দিলেন— "বাঙ্গালীদিগকে নিকটে যাইতে দিও, উহাদিগকে কথা কহিতে দিও —উহারা আমাদের কাছে আসিয়া কথা কহিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হয়। এই পর্য্যন্ত করিলেই হইবে—আর কিছু করিতে হইবে না।"

এই যে কয়েকটী উদাহরণ দিলাম, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী দলের লোকও দেখা যাইতেছে। (১) পীড়ক (২) স্বজাতিপোষক (৩) বাহ্যদর্শক (৪) অবজ্ঞাকারক। এরূপ হওয়া ভাল নয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ এ দেশীয়দিগের আদর্শ স্বরূপ থাকাই সঙ্গত। তবে এদেশাগত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যেও যে অতি মহাত্মা লোক সকল আছেন সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য

মাত্র। প্রকৃত বড় লোক ব্যতীত কোন জাতি এত বড় থাকে না এবং ধর্ম্মসূত্রের অনুসারে না চালাইলে কোন রাজত্বও সকল দিকেই এমন সুচারুরূপে চলে না।

স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য।

ইংরাজকৃত যাবতীয় কার্য্যের হাড়ে হাড়ে যে স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে তাহা তাঁহার অনুমোদিত স্বাধীন বা শুল্কবিহীন বাণিজ্য প্রণালীর ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার প্রণালীর পর্য্যালোচনার দ্বারা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। ইংরাজের মাতৃভূমি তেমন উর্ব্বরা নহে, এই জন্য সেখানে শস্যোৎপত্তি ভাল হয় না এবং শস্যোৎপত্তি ভাল না হইলে জমির খাজানা বাড়ে না। ভূম্যধিকারী দল আপনাদিগের খাজানা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিলেন যে বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী হইতে পাইবে না অর্থাৎ আমদানী শস্যের উপর এত অধিক শুল্ক গ্রহণ হইবে যে, সে শুল্ক দিয়া বিদেশীয় শস্য দেশীয় শস্যের অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রীত হইতে পারিবে না। তাহা হইলেই দেশজাত শস্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং উহাঁদের খাজনারও বৃদ্ধি হইবে। এই ব্যবস্থা (কর্ণ ল) ভূম্যধিকারিবর্গের অসীম স্বার্থপরতার ফল। সাধারণ লোক, বিশেষতঃ শিল্পজীবীরা এই ব্যবস্থায় আপনাদের স্বার্থের ব্যাঘাত দেখিল। তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আন্দোলন করিতে লাগিল। এবং ঐ আন্দোলনের সমকালীন বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহাদের প্রস্তুত শিল্পজাত বিনা শুল্কদানে অপরাপর দেশে বিক্রীত হইতে পায়, তাহা হইলে উহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। ঐরূপ হইলে অপরের ক্ষতি হয় কি না, তাহা ভাবিয়া বুঝিবার আর অবসর হইল না। উহাদের আগ্রহে কব্‌ডেন সাহেব নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে স্বাধীন বাণিজ্যটি বড়ই উৎকৃষ্ট বস্তু। তিনি আমেরিকায় গিয়া ঐ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, রুসিয়ায় গিয়া তত্রত্য সম্রাট নিকোলাস ও

ফ্রান্সে গিয়া সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে ঐ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কব্‌ডেনের মতানুগামীরা বলেন যে, তিনি সকলকেই স্বাধীন বাণিজ্যের সার তথ্য বুঝাইয়া দিলেন এবং সেই জন্যই ১৮৪৬ অব্দে প্রকাশ্য বক্তৃতায় নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়াছিলেন, "আর দশ বৎসর মধ্যেই সমুদয় পৃথিবীময় স্বাধীনবাণিজ্যপ্রণালী প্রচলিত হইয়া যাইবে।" ইংরাজ অন্যের ইষ্টানিষ্ট কিছুই বুঝিতে পারে না। সে পরচিত্তবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবেশনী শক্তিতে একেবারেই বঞ্চিত। যাহাতে তাহার ভাল তাহাতে অপরের মন্দ হইতে পারে ইংরাজের এ বোধটী নাই। অথচ এই স্বাধীন বাণিজ্য ব্যাপারের বিচারটী একবার স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলেই ইহার অসারতা দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে। বিচারটী এই—কোন দেশের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন দ্রব্যজাত স্বল্পতর পরিশ্রমে এবং সুন্দরতররূপে জন্মে। ঐ বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যদি অব্যাহতে আপনাপন প্রদেশজাত দ্রব্যের বিনিময় করিতে পায় তাহা হইলে কি সকলেরই ভোগসুখ বৃদ্ধি হয় না? অবশ্যই হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেই স্বাধীন বাণিজ্য প্রথা জন্মে, অতএব ঐ কথাও শুভকরী।

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যায় যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ একরাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের ন্যায় নহে। উহাদের রাজা ভিন্ন, সমাজ ভিন্ন, লাভালাভ ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, খনিজ ও কৃষ্যাদিপ্রসূত দ্রব্যসমূহের প্রতি যে কথা খাটে, মানব কৌশলজাত শিল্পদ্রব্যের প্রতি সে কথাগুলি ঠিক খাটে না, শিল্পজাত সকল দেশে সমান হইলেও হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ইংরাজ যে ভাবে স্বাধীন-বাণিজ্য চালাইতে চাহেন তাহাতে সকলেরই সমূহ ক্ষতি। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত লইয়াই দেখ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলা হয়, এখানে তুলা জন্মে বটে, কিন্তু ঐ তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করায় ভারতবর্ষে যত পরিশ্রম লাগে ইংলণ্ডে তাহা লাগে না। ভারতবর্ষের তন্তুবায়দিগের হস্তের বল লাগে, ইংলণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রের বলে কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বাষ্পীয় যন্ত্রের বল ভারতবর্ষেই প্রযুক্ত হউক না, তাহা হইলে দোকর জাহাজ ভাড়ার ব্যয় এবং অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক ব্যয় বাঁচিয়া

যাইবে। ভারতবর্ষীয়েরা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে জানে না। তাহা শিখাও বা শিখিবার অবকাশ দাও। যতদিন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারে যন্ত্রই পাঠাইতে থাক, বিনা শুল্কে কাপড় পাঠাও কেন? কয়েক বৎসরের জন্য আমদানী কাপড়ের উপর "কড়া" শুল্ক স্থাপিত হইলেই এদেশে অনেক কল বসে। ফলকথা, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথায় অনেক অপচয়।

মার্কিনেরা এবিষয়ে বড় যুক্তিযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করে। ইউরোপ হইতে কোন একটী নূতন দ্রব্য তাহাদের দেশে গেল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য ঐ দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া দেয়। সেই কয় বৎসরের মধ্যে তাহাদের দেশের শিল্পীরা ঐ দ্রব্যটী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টা সফল হইলে শুল্ক উঠাইয়া লওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথাটী দেশীয় শিল্পোন্নতির ব্যাঘাতক এবং অনর্থক অর্থহানিকর।

কিন্তু ইংরাজ সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, ঐ জাতির বার্ত্তা শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতেরা স্বাধীন বাণিজ্য প্রণালীর যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই—অন্ততঃ এতদিন পারেন নাই। কিন্তু যাই জর্ম্মণী ও আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য তাঁহাদের তুল্য অথবা তাঁহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে অমনি কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন যে, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথাটী বিশুদ্ধ প্রথা নয়, প্রত্যুত উহার প্রতি তাহাদের যে ভক্তিটা ছিল তাহা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তমূলক !!

স্বাধীন চিন্তা।

কোন সময়ে পল্লিগ্রামনিবাসী একজন বর্ষীয়ান্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি ইংরাজদিগের মধ্যে এ অমুক ও অমুক বলিয়া চিনিতে পার কিরূপে? ওদের ত সকলেরই বর্ণ, গঠন, পরিচ্ছদ একরূপ!" এ কথাটীতে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে। সাদৃশ্যোপলব্ধি সামান্য জ্ঞানমূলক, বৈসাদৃশ্যোপলব্ধি বিশেষজ্ঞানমূলক। দূর হইতে দেখিলে পরস্পর বিসদৃশ বস্তুজাতকে পরস্পর সদৃশ বোধ হয়, নিকটে আসিয়া

দেখিলে পরস্পর সদৃশ বস্তুর মধ্যেও যে সূক্ষ্ম ভিন্নতা আছে তাহা উপলব্ধ হইয়া উঠে।

ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজ্য করিতেছেন,ভারতবর্ষীয়দিগের অনেক সংস্রবে আসিতেছেন, আমাদিগের ভাষাও কেহ কেহ শিখিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা আমাদিগের শাস্ত্রাদি সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু যতই করুন তাঁহারা ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নরুচি, ভিন্নপ্রকৃতি। তাঁহারা কখনই ভারতবাসীর তেমন ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন না। এবং সেই জন্য তাঁহারা ভারতবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য ভাবই অধিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন ভারতবাসীদিগের মধ্যে গতানুগতিকতাই প্রবল, উহাদিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাতন্ত্রিকতা অল্প। যখন ইংরাজ এই কথা বলিলেন তখন ইংরাজি শিক্ষিত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরাও যে ঐ অভিমতি ধ্রুব জ্ঞানে গ্রহণ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ সকলেই জানেন যে, হিন্দুসমাজে বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্রবাক্যের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সময়োপযোগী সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক রীতি নীতির এবং পৌরাণিক রীতি নীতির পর্য্যালোচনা করিলে এবং এখনকার সামাজিক নিয়ম সকল ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, হিন্দুসমাজে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন নিতান্ত অল্প হয় নাই এবং উহাঁদের মধ্যে কতকটা স্বাধীন পথাবলম্বনক্ষম চিন্তাশীল ব্যবস্থাপকদিগের অপ্রতুল ছিল না। ঋষিদিগের সন্তানেরা তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়া অধিকারীভেদে বিধির ভেদ হয় এই তথ্য সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া মদ্যাদি ব্যবহারের সঙ্কোচন, বর্ণসঙ্কর এবং শূদ্রদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন, অতি অল্পে অল্পে কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণেই করিয়া আসিতেছেন। মিতাক্ষরার সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ব্যবস্থা হইতেই যিনি বঙ্গদেশের অধিকতর উপযোগী দায়ভাগের ব্যবস্থা বাহির করিয়া লইলেন তিনি ইয়ুরোপীয়ের চক্ষেও কি স্বাধীন চিন্তাশীল নহেন? শ্রুতিবাক্যের উপরেই ষড়্দর্শন স্থাপিত বটে, কিন্তু ও গুলির প্রত্যেকই কি স্বাধীন চিন্তাশীল ঋষিদিগের

প্রণীত নয়? ভাষ্যকার এবং টীকাকারেরা যে প্রধান প্রধান গ্রন্থের স্ব স্ব মতবাদানুসারী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ত স্বাধীন চিন্তার ফল।

আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ছিল এবং এখনও আছে, একথা ইংরাজী শিক্ষিতদিগের কর্ণে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইবে, এই জন্য "স্বাধীন" এবং "স্বাধীন চিন্তা" এই দুইটী কথার অর্থ একটু সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা যখন বলি ইংরাজেরা "স্বাধীন-জাতি" তখন এই কথাই বলিতে চাহি যে, উহারা ভিন্নজাতীয় অধিনায়ক-দিগের অধীন নহেন, স্বজাতীয় রাজপুরুষদিগের অধীনে এবং স্বজাতীয় ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত।—ইহাই স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে চলিলে, কোন প্রকার নিয়মের ও ব্যবস্থার অধীন না হইলে,তাহাকে স্বাধীনতা বলে না—তাহার নাম "উচ্ছৃঙ্খলতা"। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বা সমাজ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ইংরাজ যখন বাইবেল মানেন, স্বদেশীয় রীতিনীতি মানিয়া চলেন তখনও তিনি স্বাধীনচিন্তাশীল হইতে পারেন। আমরা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কুলাচার মানিয়াও তদ্রূপ স্বাধীন চিন্তাশীল থাকিতে পারি। তাহাতে পরাধীনতা ঘটে না। তবে শাস্ত্রে আছে, "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। শাস্ত্রের আদেশগুলি আমাদের যুক্তির মুখে বুঝিয়া লইতে শুধু স্বাধীনতা দেওয়া আছে এমন নয়, বিশেষ আদেশ করাই আছে। প্রতিকূল যুক্তিগুলি শুন অনুকূল যুক্তিগুলি ভাবিয়া দেখ, ভক্তি থাকিলে, উপযুক্ত গুরু পাইবে এবং অনুকূল যুক্তিগুলিই ধরিতে পারিবে, সংশয় ঢুকিতে পারিবে না এবং অন্ধ গোঁড়ামিও করিতে হইবে না। চেষ্টা করিলেই এরূপ "প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার" বলে তথ্য জানিতে পারিবে এবং বুঝিবে যে, যাঁহারা আপনার শাস্ত্র মানে তাঁহারাই স্বাধীন। তাঁহাদের মন পরাধীন হয় নাই। এই "স্বাধীনতা" আছে বলিয়াই আমাদের দেশের ব্যবস্থাপকেরা কখন প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসন ত্যাগ করেন নাই। "প্রাচীন শাস্ত্রাচার এখন আর খাটে না, এখন অপরের আচার গ্রহণ করিতে হইবে"—এমন কথা আমাদের একান্ত আত্মগৌরবসম্পন্ন মহাত্মাদিগের মনে কখনও উদয় হইতে পারে নাই।

"এখনকার অবস্থায় এরূপ করা ভাল বোধ হইতেছে বটে কিন্তু আরও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক যে সেইরূপই ভাল কি না" ?—"অনেক ভাল লোকেরই ভাল বোধ হইতেছে ? তবে ভাল হওয়া অসম্ভব নয়"।—"কিন্তু প্রাচীন সর্ব্ব দিগ্‌দর্শী শাস্ত্রকারেরা তাহা হইলে সে উপদেশ দেন নাই কেন? আমাদেরই ত ভুল হইবার কথা"। তাই ত! এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ কি এইরূপ নয়? ঋষিরা এ বিষয়ে কতকটা মত দিয়াছেন বলিয়াই ত দেখাইতেছে! আচ্ছা যতটুকু মত দিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে তাহা যখন পবিত্রতা রক্ষার—নিবৃত্তিমার্গের—অনুকূল, তখন ততটুকু মাত্র আচার ও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন করা যাউক"।—আমাদের দেশের স্বাধীন চিন্তা এইরূপ। এবং এই জন্যই সকল সময়ে আমাদের শাস্ত্র বচনের অনুসন্ধান। ফলতঃ, ভক্তিমান, আত্মগৌরবসম্পন্ন, ধীরস্বভাব ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার উপায় নাই। সংযত ব্যক্তিকে সকল কাজ সাবধানে করিতে হয়। তাঁহাকে যদি স্বাধীনতাহীন বলিতে পার তবে হিন্দুও তোমার কাছে স্বাধীন চিন্তাবিহীন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন আমাদের সংস্কারকেরা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মত প্রচার করিতে দেখিয়া নিজেদের ন্যায় "স্বাধীন চিন্তাশীল" বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্দে অধীর হন। তিনি যে আচার ব্যবহারে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাঁহাদের বড় বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন তখন আর "কৃতবিদ্যেরা" তাঁহাতে স্বাধীন চিন্তার আভাষ দেখিতে পাইলেন না। বিধবা বিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে চাঁদে কলঙ্ক বলিয়াই আমি মনে করি, কিন্তু যে জন্যই তাঁহার ঐ বিষয়ে ঐদিকে প্রবৃত্তি হউক তাঁহার জীবনে অনেকটা বরাবর একই ভাবের নিয়মানুগামিতা দেখিতে পাই। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়ে অন্তঃকরণের পরাধীনতা প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী

শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়াই সুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে পরাশর স্মৃতির অধীনে আসিয়া কতকটা স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়েও সেই স্বজাতীয় নায়কেরই অধীন ছিলেন, সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে স্মৃতির মতবাদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্য কোন কিছু খুঁজিতে যান নাই, এবং ইংরাজের গত গুলি "নিজের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত" বলিয়া থ্যাপন করিতে যান নাই। তবে তিনি যে সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজব্যবস্থার অনুকূল ছিলেন, সেটি দেশকাল পাত্র বিবেচনায় তাঁহার বুঝিবার ভুল।

যে মনুষ্য যেরূপ কুলে জন্মিয়াছে, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি সেইরূপ। যিনি সংস্কৃত শিক্ষা পাইয়াছেন, ধর্ম্মশীল কুলে জন্মিয়াছেন, নৈসর্গিক ভক্তিপ্রবণতা আছে, তীর্থভ্রমণে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সাধু সঙ্গে পবিত্র হইয়াছেন, তিনি শাস্ত্রাচারের পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি সেই জন্যই ইংরাজীওয়ালার চক্ষে স্বাধীন চিন্তাহীন। উহাঁরা বলিবেন—"সকল কথায় শাস্ত্রের উল্লেখ কেন? যুক্তি কি বলেন দেখুন" বলি, তোমার ঐ "যুক্তিটা" আর কখন কেহ ব্যবহার করিয়াছে কি? যদি কখন কেহ করিয়া থাকে তবে তুমি তাহার অধীন! তাহার সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া "তুমি" স্বাধীন কিসে হইলে? যিনি সংস্কৃত শিখেন নাই, বৈদেশিক সংসর্গে অধিক আসিয়াছেন, ইংরাজি ভাক্ত বিজ্ঞানের দুটা গত শুনিয়া শিখিয়া লইয়াছেন, এবং নৈসর্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী, তিনি নিজের বা নিজের অনুরূপ অবস্থাপন্ন লোকের চক্ষে "স্বাধীন চিন্তাশীল" হইলেও স্বজাতীয় সাধারণের নিকটে এবং প্রকৃত বুদ্ধিমান সকল জাতীয় লোকের নিকটেই স্বাধীন চিন্তাবিহীন। তিনি অসম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাক্ত বিজ্ঞানের দুটা গতের এতই অধীন যে, ঐ গত কয়েকটী অপেক্ষা উচ্চতর কিছু থাকিতে পারে, এইটুকু অনুমান করিবারও ক্ষমতা তাঁহার নাই! তাঁহার চিন্তার পরাধীনতা এতই কঠোর। ফলতঃ সংস্কারও শিক্ষা ছাড়িয়া চিন্তাই হইতে পারে না। সুতরাং "স্বাধীন চিন্তা" একটা কথার কথা মাত্র।

স্বাধীন চিন্তার প্রকৃত অর্থ স্বজাতীয় শাস্ত্রব্যবস্থার ও আচারে

অনুকূল যুক্তির আলোচনার দ্বারা স্বজাতীয় বিধির প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া আপনাদিগের পথেই অনুশীলন দ্বারা আচার ব্যবহারের পরিমার্জ্জন। উহা করিতে করিতে মহাত্মাদিগের মনে শাস্ত্রীয় আদর্শের উত্তরোত্তর উন্নত চিত্র পরিস্ফুট হইতে থাকে। উহাই স্বাধীন চিন্তার প্রকৃষ্ট ফল।

স্বজাতীয়ের অধীনে থাকিয়া ভিন্ন জাতীয়ের আগমন হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিলে যেমন স্বাধীনতা রক্ষিত হইল বলা গিয়া থাকে, তেমনি আপনার শাস্ত্রের অধীনে থাকিয়া ভিন্নজাতীয় শাস্ত্রকে যুক্তি-মুখে নিজের পক্ষে অনুপযোগী প্রতিপন্ন করিয়া প্রত্যাখ্যাত করিলেই মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা হয়। তবে আত্মরক্ষার অনুকূল বুঝিয়া ভিন্ন জাতীয়ের নিকট কোন কোন অস্ত্র চালনা বা অস্ত্র নির্ম্মাণ শিক্ষা করায় যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, তেমনি ভিন্ন জাতীয়ের কোন ভাব বা ব্যবস্থা স্বজাতীয় শাস্ত্ররক্ষার অধিকতর অনুকূল বলিয়া বোধ হইলে তাহা একেবারে নিজস্ব করিয়া লইতে পারায় স্বাধীন চিন্তার কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত প্রকৃত স্বাধীনতারই রক্ষা হয়।

মুসলমানের স্বধর্ম্মে দৃঢ়তা, ও সকল শ্রেণীর স্বধর্ম্মীর প্রতি মমতা, ইংরাজের আলস্যহীনতা ও স্বসমাজের হিতার্থে সুদৃঢ় দলবন্ধন ক্ষমতা শিক্ষা করিতে পারিলে আর্য্যশাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করাই হইবে। ওগুলিও ত আমাদের শাস্ত্রীয় উপদেশেরই অন্তর্ভূত। ইদানীন্তন কালের মুসলমানদিগের বিলাসিতা ও বহু বিবাহ বিষয়ে প্রবণতা এবং ইংরাজের ঐহিকতা ও পরজাতিবিদ্বেষ যদি আমরা স্বাধীন চিন্তাবলে (অর্থাৎ আপনাদের শাস্ত্রকারদিগের বিধি অনুসারে) বাদ দিয়া উহাদের উপরি উক্ত গুণ কয়েকটী মাত্র গ্রহণের চেষ্টা করি তাহা কোন মতেই মানসিক পরাধীনতার লক্ষণ বলিয়া দৃষ্ট হইবে না। তাহা করিতে পারিলে নিবৃত্তি-মুখে প্রকৃত শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করাই হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এদেশে স্বাধীন চিন্তার বলে ক্রমশঃ আসুর ও পৈশাচিক বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। এখন কোমটিষ্টেরা যাহা বলে তাহা আমাদের শাস্ত্রের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত বলিয়া যদি আমরা

সমাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে মৃতপত্নীকের বিবাহ প্রতিষেধ ধীরে ধীরে লোকাচার প্রবর্ত্তন দ্বারা ক্রমশঃ সামাজিক বিধির অন্তর্ভূত করিতে পারি তাহা হইলে উৎকৃষ্ট স্বাধীন চিন্তারই ফল পাওয়া যায়। বড় ঘরে ছোট ব্যবহার অর্থাৎ ম্লেচ্ছাচার, বিধবা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি—ঢুকাইবার চেষ্টা "পরাধীন চিন্তারই" লক্ষণ।

লক্ষ্মীছাড়া দশা।

ইংরাজদিগের চাল চলন ওঁদের নিজের দেশে কি রকম, তাহা ত কিছুই দেখিতে পাই না। এখানেও উহাঁদিগের চাল চালনের সমুদায়টা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা দেখিতে পাই, উহাঁরা খুব জোরে পা ফেলিয়া চলেন, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, কেহ কিছু বলিতে গেলে একেবারে অগ্নিশর্ম্মার আকার ধারণ করেন, অনেকে চাকর বাকর্‌কে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট পীড়ন করেন, এবং সময়ে সময়ে এক পয়সার জায়গায় এক সিকি, এক মুঠার জায়গায় এক সের, এক হাতের জায়গায় পাঁচ হাত খরচ করিয়া ফেলেন। আমাদের দেশে ইংরেজের মেজাজ যেমন গরম, তেমনই আলী।

ইংরেজ এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষায় বড় হইয়াছেন। যে বড়, তাহারই রীতি নীতি অনুকরণীয় হইয়া থাকে। অতএব দেশীয়েরাও ইংরেজের অনুকরণ করেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ করিয়া ইংরেজী মন্ত্রে দীক্ষিত ইংরেজীনবিস "কৃতবিদ্যেরা।"

"কৃতবিদ্য" বাঙ্গালীদিগের চলন, বলন, হাস্য পরিহাস, শব্দোচ্চারণ, মুদ্রা, ব্যবহার সকলেই একটু একটু ইংরেজী গন্ধ পাওয়া যায়। একজন সেকেলে হিন্দু বা মুসলমান তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তুমি দেখিবে তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, ধীরে ধীরে চলিয়া আসিবেন, মুখে হাস্যের একটু মৃদুপ্রভা মাত্র দেখা দিবে, এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি অল্পে অল্পে কোমল স্বরে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন। কিন্তু যখন ইংরাজীওয়ালা আসিতেছেন, তখন সিঁড়িতে

উঠিবার সময় দম্ দম্ করিয়া শব্দ হইবে। জুতা মস্ মস্ করিয়া ডাকিবে, ঝনাৎ করিয়া কবাটের শব্দ হইবে, দর্শনমাত্রে অট্টহাস্যের হো হো রব উঠিবে, ঘড় ঘড় শব্দে চেয়ার সরিবে, অন্তঃপুরবাসিনীরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিবেন, বাটীতে একজন মানুষ আসিয়াছেন বটে!

ইংরাজের অনুকরণে আমাদিগের বাহ্য ব্যবহারে এইরূপ হঠকারিতা দোষ জন্মিয়াছে। ভিতরে অপেক্ষাকৃত অতি গুরুতর দোষ সকল দেখা দিতেছে। এই সেদিন আমি একখানি পত্র দেখিলাম। পত্রখানি এক জন ইংরাজী কৃতবিদ্য তাঁহার বিদেশস্থ পীড়িত পিতাকে লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই—"শ্রীচরণেষু—মহাশয় ত সে প্রদেশে গিয়া রহিলেন। বাটীতে যাঁহারা আছেন, সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে অল্প বা অধিক পরিমাণে ভুগিতেছেন। আমার আর কোন সেবা শুশ্রূষাই হয় না।" ইহার বহুকাল পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ ঘটনা হওয়াতে আর একজন তাঁহার বিদেশগত পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারও মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "শ্রীচরণেষু—খুড়ি ঠাকুরাণী এবং পিশি ঠাকুরাণী উভয়েই পীড়িতা হইয়া আছেন। আমারও শরীর যেরূপ তাহাতে উহাঁদিগের প্রকৃতরূপে সেবা হয় না—অতএব বিরাজকে তাহার শ্বশুরালয় হইতে একবার এবাটীতে আনয়ন করিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। কিন্তু তাহারও ছেলেরা পাছে এখানে আসিলে পীড়িত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে একটু ইতস্ততঃ করিতেছি। মহাশয়ের যেরূপ অনুমতি হইবে, সেইরূপ করিব। ইতি"

এই দুইখানি পত্রের দুইজন লোকই ইংরেজীনবিস—প্রথম খানির লেখক একেলে, দ্বিতীয় খানির লেখক সেকেলে। ঐ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একেলে নিজের সেবার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়াই ব্যতিব্যস্ত,—সেকেলে গুরুজনের সেবা করিতে অসমর্থ বলিয়া উদ্বিগ্ন। কিন্তু একটী কথা বলিয়া রাখি—অনেক একেলের মধ্যে সেকেলে আছেন, এবং অনেক সেকেলের ভিতরেও একেলে ছিলেন। কোন সম্প্রদায় বা দল বিশেষের প্রতি দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়—ইংরাজীর বৃদ্ধি এবং ইংরেজের অনুকরণে অহং ভাবের আতিশয্য হইতেছে, ইহাই বলা মাত্র উদ্দেশ্য।

এ দেশে ইংরাজেরা খুব মোটা মাহিয়ানা পান, খুব বড় বড় বাড়িতে থাকেন, জমকাল গাড়ী ঘোড়া চড়েন এবং দলে দলে চাকর নফর রাখিয়া থাকেন। "কৃতবিদ্যেরা" আপনাদিগের কি অবস্থা এবং ইংরেজদিগের কি অবস্থা, তাহা না বুঝিয়া ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে বড়ই বিভ্রাট করিয়া ফেলেন। থাকেন ছোট বাড়িতে—ঘরে ঢুকেন লাফ দিয়া—মাথায় দ্বারের চৌকাঠ ঠেকে। চাকর একটির বেশী নাই—সেই জল তুলিবে, বাজার করিবে, গোরুর জাব কাটিবে, কিন্তু বাটীর "কৃতবিদ্য" বাবুর সেই খানসামা—"বেহারা"। বাবু নিজে কোন কাজ স্বহস্তে করিবেন না—স্বহস্তে কাজ করা দূরে থাকুক, জুতা, কাপড় লাঠি, ঘড়ি, কেতাব পত্র সব ছড়াইয়া ফেলিবেন; কিছুই যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিবেন না। ফল এই হয় যে, দ্রব্য সামগ্রী তছরূপ হয়, চুরি যায় এবং প্রয়োজনের সময়ে হাতে আইসে না। যে "কৃতবিদ্য" মদ ধরেন নাই, তাঁহারও সাধারণ অনুকরণ দোষে এই দশা। ইংরাজদিগের দেখাদেখি মদ ধরিলে ত আর কথাই নাই, লক্ষ্মীছাড়া দশা পূর্ণমাত্রায় ঘটে।

"* * ঐ যে সাহেবের জিনিসপত্রগুলি নীলামে কেনা গেল, ওগুলি কেমন পরিষ্কার রহিয়াছে, ঠিক যেন নূতন।" * *—ইংরেজেরা জিনিস পত্র নষ্ট করেন না, উহাঁরা বড় সাবধানে দ্রব্যাদির ব্যবহার করেন—ভাঙ্গা চোরা ময়লা করা উহাঁরা বড়ই দোষ মনে করেন। উহাঁরা বাবুয়ানা করিতে জানেন, অথচ বাবুয়ানা করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হন না।"

ইংরাজ অনেক কাজ স্বহস্তে করিয়া থাকেন—সকল কাজই স্বহস্তে করিতে পারেন। জিনিস পত্র ঝাড়া পোঁচা সযত্নে করাইয়া থাকেন। প্রত্যহ ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়া দেখেন, "মলাই ডলাই" ভাল হইয়াছে কি না। রুমাল দিয়া জিনের কোন অংশ ঘসিলে যদি ময়লা বাহির হয়, তাহা হইলে সহিসকে কৈফত করেন—ঘোড়দৌড় মাত্র করিয়া ঘোড়ার সম্বন্ধে উদাসীন হয়েন না। উহাকে উপযুক্তরূপ টহলান হয় কিনা দেখেন—উহার দানা খাওয়ান দেখেন—প্রত্যহ স্বহস্তে কিছু না কিছু খাওয়ান। কোট ভাল করিয়া রৌদ্রে দিয়া বুরুষ করা হইয়াছে কিনা

দেখিয়া লয়েন।—"এইরূপে বুরুষ করিতে হয়"—দেখাইয়া বলিয়া দিতে পারেন।

ইংরাজের বাবুয়ানায় 'আলস্য" নাই। ঘরদ্বার বল, ফুলবাগান বল, বাড়ীর ভিতরের রাস্তা বল, সকল দিকেই সযত্ন দৃষ্টি থাকে। এ দেশে অগাধ টাকা পাইয়া ইংরাজ নবাবী চাল দেখান এবং স্বজন প্রতিপালন করেন না বলিয়া নিজের উপর অধিক খরচ করিতে পারেন—কিন্তু ভিতরের খবর জানিলে উহাঁরা কিরূপ সাবধানে ও সুবিধায় জিনিস পত্র ক্রয়াদি করেন তাহা বুঝা যায়, এবং যত খরচ দেখায় তত যে নয় তাহার উপলব্ধি হয়। ফলতঃ অধিকাংশ ইংরাজই বেশ সঞ্চয়ী। উহাঁরা দেশে গেলে অতি সামান্য ভাবেই দিনপাত করিতে পারেন। উহাঁদের লক্ষ্মীছাড়া দশা নহে।

তবে উহাঁরা সকলেই স্ত্রী পুত্রের জন্য তেমন চিন্তা করেন না, কাজ কর্ম্মের অনেক সুবিধা বলিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ জন্যও তেমন ভাবেন না, হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ যাইতে বা ইনসলভেণ্ট হইতে লজ্জা বোধ করেন না, মদ্যাদি পান করেন—এজন্য অল্প আয়ের ও নিম্নশ্রেণীর ইয়ুরেশীয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবেই লক্ষ্মীছাড়া দশা আছে। আমাদের কৃতবিদ্যেরা উহাদেরই অনুকরণ করিতে যাইতেছেন। "মধ্য শ্রেণীর ইংরাজের ইংলণ্ডীয় ব্যবহারের" অনুকরণ করিতে গেলে যে একেবারে আলস্য বর্জ্জন করিতে হয়।

রাজভক্তি।

স্বহস্তঘটিত মূর্ত্তির প্রতি দেববুদ্ধি হইতে পারে। আমরা যাহাকে আপনাদিগের মনঃকল্পিত গুণ এবং শক্তি সমূহের আধার বলিয়া জ্ঞান করি, তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করা আমাদিগের পক্ষে কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, আমরা সর্ব্বস্থলেই আদৌ নিজ মানসসম্ভূত গুণাবলী দ্বারা পদার্থ বিশেষকে বিভূষিত করিয়া লইয়া

এবং তদনন্তর সেই অলঙ্কৃত পদার্থের প্রতি স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, প্রভৃতি ভাবের আবির্ভাব করতঃ তত্তৎ রসে একান্ত নিমগ্ন হইয়া থাকি।

রাজভক্তি এইরূপ ভাব। সকলেই জানি যে রাজাও অন্যান্য সামান্য ব্যক্তির ন্যায় রোগশোকাদির বশীভূত, তিনি ভয়লোভাদিকে অতিক্রম করেন নাই, ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার ধন, গৌরব, শক্তি, মর্য্যাদা কিছুই নাই—রাজার যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার প্রজাবর্গের দ্বারা প্রদত্ত —তিনি প্রজাব্যূহের প্রতিভূ বই আর কিছুই নহেন। কিন্তু এ সমস্ত জানিয়াও আমরা রাজাকে সমস্ত শক্তির এবং গৌরবের আধার জ্ঞান করি। তিনি নরদেব—মনুষ্যের মধ্যে দেবতা—তিনি পূজ্যপাদ, তিনি নিষ্পাপ, তাঁহার দর্শনে পুণ্য, তাঁহার স্পর্শে রোগক্ষয় হয়। অন্য কথায় কাজ কি?—'সর্ব্বানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ"—রাজ শরীরে ইন্দ্র, যম, বরুণ কুবেরাদি যাবতীয় লোকপাল সমস্ত বিদ্যমান—তিনি ভূস্বামিরূপে পিতৃতর্পণের অংশাধিকারী।

ফলতঃ, রাজভক্তি যে আমাদিগের কল্পনামূলক ভাব তাহার কোনও সংশয় নাই। সুতরাং ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে এবং সমাজের অবস্থা-ভেদে যেমন কল্পনাশক্তির তারতম্য হয় সেইরূপ রাজভক্তিরও যে ইতর বিশেষ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কল্পনাশক্তির প্রাবল্য থাকিলে উহা মনঃকল্পিত পদার্থের বাস্তবিক প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবেই বিস্মৃত করিয়া দেয় এবং ঐ শক্তি দুর্ব্বল হইলে প্রকৃত বিষয় কখনই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

প্রাচ্যদেশবাসী অপেক্ষা প্রতীচ্যদেশবাসীদিগের কল্পনাশক্তি প্রবলতর। সুতরাং ইউরোপখণ্ড অপেক্ষা আসিয়াখণ্ডে রাজভক্তির আধিক্য। ইংরেজ-দিগের অপেক্ষা হিন্দুরা স্বভাবতঃ সমধিক রাজভক্ত। ইউরোপীয়দিগের যে রাজভক্তি তাহার সহিত রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব এবং লোভদ্বেষসঙ্কুল মানুষভাব সর্ব্বদা সুস্পষ্টরূপে মিশ্রিত থাকে এবং রাজার প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বদা সচকিত ভাবে দৃষ্টি প্রযুক্ত থাকে। ভারতবাসীরা রাজার প্রতি সমস্ত গুণের আরোপ করিয়া, বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে মন ভরিয়াই তাঁহাকে ভক্তি করেন।

এই জন্য এদেশে সর্ব্বদা অতি সযত্নেই প্রজার হিতার্থে রাজশক্তির পরিচালনা করা আবশ্যক। যাহারা রাজাকে সর্ব্বগুণাধার মনে করেন তাহাদের সুখস্বপ্ন সুধুসুধু ভাঙ্গিয়া দিতে নাই। তাহাদের কোনও ভার বৃদ্ধি করিতে নাই। "একার্য্যটা অন্যায় তথাপি সম্প্রদায় বিশেষের বা রাজনীতির অনুরোধে করিতেছি" একথা কখন বলিতে নাই। অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক মনে করেন "আধুনিক দেশীয় সামন্ত রাজাদের মধ্যে অনেকে যখন সুধু নিজের সুখের এবং আড়ম্বরের দিকেই দৃষ্টি করেন, তখন এদেশের রাজধর্ম্মের আদর্শই ঐরূপ। হিন্দু মুসলমানের আমলে রাজা সমস্ত রাজস্ব নিজের ব্যয়ার্থে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, ঐ টাকা হইতে প্রজার জন্য কিছুই করিতে হইত না।"—কিন্তু রাজকোষ যে ন্যস্তধন, ইহা এই পুণ্য ভূমিতে নূতন কথা নহে। রামরাজ্যই ভারতবর্ষে রাজধর্ম্মের আদর্শ। বল বিক্রম এবং প্রজারঞ্জন উভয়েই অতুল্য! মুসলমান সম্রাট নাজীর উদ্দিন স্বহস্তে কোরান লিখিয়া তাহার আয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিতেন। সাম্রাজ্যের রাজস্বের এক কপর্দ্দকও নিজের শরীরের জন্য ব্যয় করিতে আপনাকে অধিকারী মনে করিতেন না। এ কার্য্য মুসলমান দিগের প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়কালেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু কখন কোনও ইউরোপীয় রাজা স্বপ্নেও একথা ভাবিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহারা সকলেই মোটা পেনসন পান এবং কখন প্রজারা দূর করিয়া দিলে কি খাইবেন তাহার জন্য সকলেই আমেরিকা ও সুইজারলণ্ডে সম্পত্তি কিনিয়া ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ানের ন্যায় দুটাকা গুছাইয়া রাখিতেছেন।

এদিকে হিন্দুশাস্ত্রের মহিমা এরূপ যে, দেশীয় রাজাদের জাঁকজমক প্রভৃতি—তুলা পুরুষ দান, দীর্ঘিকা খনন,লহরের জল আনয়ন প্রভৃতি—এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য দেবালয়াদির নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যেই মুখ্যতঃ ধনের প্রয়োগ করিয়া দেয় এবং দেশীয় শিল্পজাতেরও উৎকর্ষ উৎপাদন করে। ঢাকাই মসলিন, কাশীর কিংখাপ,কাশ্মীরী শাল, গাজিপুরী আতরের সৃষ্টি এদেশীয় রাজা ও নবাবদিগের আড়ম্বরপ্রসূত বটে, কিন্তু তাহার উৎপাদনে বহু শত বর্ষকাল ধরিয়া বহু সহস্র এদেশীয় লোক

প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে রাজা ও জমিদারেরা যে কিরূপ সামান্য বাটীতে থাকিতেন এবং কত বড় বড় যে দীর্ঘিকা খনন করাইতেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এই জন্যই ইউরোপীয়ের চক্ষে একান্ত অকর্ম্মণ্য সামন্ত রাজাও কার্য্যতঃ অনেকটা প্রজাহিতকারী এবং প্রকৃত পক্ষে প্রজার ভালবাসার পাত্র। উহাঁদের "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে খাওয়ান" ইউরোপীয়েরা একটা নিন্দার কথা স্বরূপ উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা যে অনেকটা শিক্ষাবিভাগের বৃত্তির রূপান্তর মাত্র তাহা বুঝেন না।

আজকাল দেশীয় রাজারা দীর্ঘিকা খনন, তুলাদান, দেশীয় শিল্পজাতের ব্যবহার, সকলই কম করিয়া বিলাতী শিল্প, বিলাতী খানা দেওয়া এবং বিলাতী কর্ম্মচারীতেই অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং সেই জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্য ধরণে "সিভিল লিষ্ট, বজেট এবং ডিপার্টমেণ্ট" প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় প্রজারঞ্জনে সমর্থ হইতেছেন না। প্রজারা রাজাকে যে পরিমাণ টাকা দিয়া দেশীয় কর্ম্মচারীর বেতনে শিল্পের মূল্যে ও দানে তাহার যে পরিমাণ ফিরিয়া পাইত,এখন তদপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইতেছে—অথচ ফিরিয়া অনেক কম পাইতেছে। কতক ইংরাজীশিক্ষা প্রবেশ করায় দেশীয় রাজ্যেও প্রধান প্রকৃতিবর্গ ঐ সকলের খোঁজ লইতে আরম্ভ করিতেছে।

রাজার কার্য্যের প্রতি এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে অভ্যাস হওয়ায় এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা আর "দেশীয় বেবন্দোবস্তা নিয়ম খারাপ ছিল এখনকার বন্দোবস্তে সবই ভাল হইয়াছে" এই কথা শুনিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন না—তাঁহারা আর মোটা কথায় ভোলেন না। ঠিক ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন—"মোটের উপর দেশীয় প্রজারা এসব বন্দোবস্তে রাজস্বের টাকা বেশী ফেরৎ পাইয়াছে কি না?" তাহা না পাইলেই ত ইউরোপীয় মতে রাজকার্য্যের বন্দোবস্তে মৌলিক দোষ পড়িল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয়দিগের রাজভক্তির এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন তাঁহাদের মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির অনুকূল নহে। এই জন্যই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় "ভোট" দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

প্রভৃতির হাঙ্গামা তেমন উপকারী বলিয়া বোধ হয় না। এদেশে রাজা ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া ধার্ম্মিক মন্ত্রীদিগের সহায়তায় যাহা যাহা করেন, তাহা তখনই হউক, অথবা দুই দিন পরেই হউক সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ন্যায্য এবং প্রজাহিতকারীরূপে প্রতীয়মান হইলে ইংরাজী-শিক্ষিত প্রজার মধ্যেও রাজার প্রতি একটা দেববৎ ভক্তি জন্মিবার কথা। "আমরা কি বুঝি—এত দূরদর্শন—এত সহানুভূতি মানবে কি সম্ভবে?" এদেশীয় প্রজার মনে রাজার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের উদ্রেকই প্রার্থনীয়। নচেৎ প্রজার ধর্ম্মহানি হয়। ইংরাজীশিক্ষিত হইলেও তাঁহারা ত এদেশ-জাত বটেন সুতরাং রাজাকে সর্ব্বগুণময় মনে করিতে অন্তঃকরণের অন্তঃস্থলে তাঁহাদেরও অপ্রবৃত্তি নাই। এসকল গেল ইংরাজীশিক্ষিত-দিগের কথা। এদেশীয় সাধারণ প্রজা সকল অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে এবং নিজের গুণেই চিরকাল তাহা থাকিবে।

—**:**—

জীবনরক্ষা বা দৈনন্দিন পুস্তক।

সেদিন আমাদিগের বহুপূর্ব্ব পরিচিত কোন আত্মীয়ের পৌত্রপর্য্যায়ী একটী ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। ইহাঁর পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আমার পিতৃঠাকুর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কখন কখন আমাদিগের বাটীতে আসিতেন এবং আমার বয়স যখন আট দশ বৎসর তখন আমাকে লইয়া একটু আদর করিতেন এবং আমার অধ্যয়নাদি কিরূপ হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। পিতৃঠাকুরের ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপৌত্র এই আগন্তুককে আমি কখনই পূর্ব্বে দেখি নাই। ইনি আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। পরিচয় পাইবামাত্র পিতৃ ঠাকুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্মরণ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে পিতৃঠাকুর যেরূপ ব্যবহার করিতেন তাহাও স্মরণ হইল এবং পিতৃ ঠাকুরের পাঠ্যাবস্থার যে সকল বিবরণ বালককালে শুনিয়াছিলাম তাহাও স্মরণ হইল। আমি আগন্তুকের সহিত সেই সকল পূর্ব্ব কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম।

৫২।৫৩বৎসর পূর্ব্বে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা যেন গত কল্য বা পরশ্ব হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। কাল যেন কিছুই চাপা দেয় নাই—সকলই সজীব এবং জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। জীবনের পথে গমন করিতে করিতে যখনই পাছু দিকে চাহিয়া দেখি, প্রায়ই অতীতভাগ অধিকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না—কিছু দূর মাত্র দেখা যায়। সেই জন্যই আপনাদের জীবিত কালটী অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে অতীত কালভাগ অধিক দূর পর্য্যন্ত স্মৃতির চক্ষে খুলে, তবে আর আয়ুষ্কালকে তত অল্প বলিয়া বোধ হয় না এবং জীবনসুখভোগটি অতি গাঢ়তররূপেই হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে।

বস্তুতঃ কালের পরিমাপক, ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে কালের মধ্যে ক্রিয়ার আধিক্য তাহাই দীর্ঘকাল। যে কালের মধ্যে ক্রিয়ার অল্পতা তাহাই অল্পকাল। নিদ্রাতে স্বপ্ন দর্শন অধিক হইলে নিদ্রার কালটী দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়—নিদ্রা গাঢ় এবং স্বপ্নশূন্য হইলে কালের অনুভব মাত্র থাকে না। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে কাল ক্রিয়ার আধার মাত্র নহে, ক্রিয়াই কাল।

এই ভাবিয়া আমি আত্মীয় স্বজনকে একখানি দৈনন্দিন পুস্তক রাখিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়া থাকি। যিনি যিনি সেই পরামর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের আয়ুষ্কালও তাঁহাদের দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইয়াছে—তাঁহাদের কাহার মুখ হইতে কখন পরমায়ুর অল্পতা নিবন্ধন কোন দুঃখের কথা শুনিতে পাই নাই।

বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতা।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ"। এ দেশের লোকেরা সেই বাণিজ্য অথবা কৃষিকার্য্য কিছুই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন না বলিয়াই ইহাঁরা নির্ধন হইয়া আছেন। যদি মনে করা যায়, কেনই ইহাঁদিগের ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা হয় না, তাহার আর কোন উত্তরই ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না, কেবল এই মাত্র বলা যাইতে

পারে যে, ইহাঁরা ক্ষীণপ্রকৃতি ও ভীরুস্বভাব এবং অত্যন্ত আলস্য-পরায়ণ, অতএব ইহাঁদিগের আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বল, ইহাঁরা কোন নূতন কর্ম্মে হাত দিতে পারেন না এবং পরিশ্রমকেই তদ্দ্বারা প্রতিবিধেয় সকল দুঃখের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

মহাভারতে একটি শ্লোক আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমুদায় পৃথিবীতে যাবৎ রত্ন আছে, সমুদায় প্রাপ্য হইলেও দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি-দিগের মন পরিতৃপ্ত হয় না।

পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ!
নালমেকস্য তৎসর্ব্বং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ।

আমি যখন ঐ শ্লোকটি শুনিলাম তখনই মনে মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, এমন লোক কি কখন এই বাঙ্গালার মাটীতে জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীর সমুদায় রত্ন পাইলেও সে তুষ্ট হইত না। সম্প্রতি ত তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না! সচরাচর মনুষ্যেরা বিদ্যা সম্ভ্রম শক্তি এবং ধন এই চারিটি পাইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু আমা-দের দেশের লোকেরা এক্ষণে "এণ্ট্রেন্স" পর্য্যন্ত বিদ্যা করিয়া তুলিতে পারিলেই অধিকাংশ সন্তুষ্ট হয়েন। যিনি এলএ পর্য্যন্ত উঠিলেন, তিনি ত মহামহোপাধ্যায় হইলেন। যিনি বিএ তিনি অতীতাধ্যাপক, আর যিনি এমএ তাঁহার কথাই নাই—তাঁহার বিদ্যা উপচিয়া পড়িতে থাকিল —শরীর মধ্যে আর উহার স্থান হয় না—তাঁহার চলিতে বা কথা কহিতে গেলেই বিদ্যাবত্তার চিহ্ন সমস্ত যেখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু ইউরোপে ত এরূপ হয় না। সেখানকার বিএ বা এমএ রাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোক নহেন, যাঁহারা কোন তথ্য উদ্ভূত বা আবিষ্কৃত করিতে না পারেন তাঁহারা আপনাদিগকে সামান্য লোকের মধ্যেই জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমাদের এখানেত কেহই কোন নূতন ব্যাপার বাহির করিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সচেষ্ট হইলেন না। বিদ্যালয়ের নিয়োজিত কয়েকখানি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন। আমাদিগের বোধ হয় যদি দুই একজন বাঙ্গালী কিছু নূতন কাজ করিয়া তুলিতে পারিতেন তাহা হইলেই বাঙ্গালা দেশের

উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং বাঙ্গালী জাতিটির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়া এদেশের শাসন প্রণালীও এক্ষণকার অপেক্ষাও অনেকাংশে ঔৎকর্ষ লাভ করিত।

বিদ্যা বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ত এইরূপ। সম্ভ্রমের আকাঙ্ক্ষা ইহা অপেক্ষা বড় অধিক প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।

শান্তি ও সুখ।

শান্তি ও সুখ দুইটী শব্দ লোকের মুখে শুনিতে যত পরস্পর নিকটবর্ত্তি-ভাবব্যঞ্জক প্রকৃত পক্ষে উহারা তেমন নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট নয়। নিকট কি? প্রত্যুত ঐ দুইটীর মধ্যে অনেকটা বৈপরীত্য সম্বন্ধই দেখা যায়। শান্তি ধৈর্য্যগুণকে অবলম্বন করে, হৈর্য্যকে সমানয়ন করে, আত্মপরে সম্মিলন করে; বিষয়ানুরাগ হ্রাস করে, নম্রতা, দয়া, ক্ষমা, তুষ্টি প্রভৃতি কোমল মনোভাবের পোষণ করে। সুখ কার্য্যপরতাকে অবলম্বন করায় দুরাকাঙ্ক্ষার সমানয়ন করে, আত্মপরভেদ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, বিষয়ানুরাগ জ্বালাইয়া তুলে, ধৃষ্টতা কাঠিন্য লালসা এবং অসন্তোষ প্রভৃতি মনোভাবকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। শান্তি এবং সুখে অনেক প্রভেদ। শান্তি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে, সুখ বিষমতা আনিয়া দেয়।

ঐ যে কথাগুলি বলা হইল তাহার উপর একটী বিচার চালান যায়। বস্তুতঃ আজি কালি ইংরেজদিগের হিতবাদ এবং জর্ম্মণদিগের অনুশীলন-বাদ শিখিয়া ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদল বুঝিয়াছেন যে, সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং শান্তিতে এবং সুখেতে আমি যে প্রভেদ আছে বলিলাম তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বলিতে পারেন—শান্তিই কিসের জন্য? উহাও ত সুখের জন্য। আমি বলি তাহা নয়—শান্তি শান্তিরই জন্য। যে সমাজে ধর্ম্ম শিক্ষাদি গুণে লোকের মন শান্তির দিকে যায়, সে সমাজে লোকের প্রকৃতি কিরূপ হয়, আর যে দেশে মানুষের মন সুখানুসন্ধানেই রত তথায় মনের ভাব কিরূপ হইয়া থাকে, আমি ইহাই বলিয়াছি। তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে, যাঁহারা বলেন মানুষ সুখের জন্যই সকল কাজ করে তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে অনেক প্রকার কষ্ট কল্পনা করিতে হয়

সাক্ষাৎ সুখানুসন্ধান সকল কার্য্যের মূল নহে। ঐ যে সেদিন মান্দ্রাজের অগ্নিকাণ্ডে একটি সুশিক্ষাসম্পন্ন যুবাপুরুষ চারিটী লোকের প্রাণ বাঁচাইয়া পঞ্চমটীকে বাঁচাইতে গিয়া স্বয়ং মারা পড়িল সে কি আত্মসুখের জন্যই ওরূপ করিয়াছিল? যদি এমন সকল স্থলে সুখানুসন্ধানের আরোপ করা যায়, তাহাতে প্রকৃত তথ্যের নির্ব্বাচন কিছুই হয় না। সুখ শব্দের লক্ষণ মাত্র পরিবর্ত্তিত করা হয়, অর্থাৎ এই বলা হয় যে, যে জন্য যাহা কিছু করা হউক সে সকল উদ্দেশ্যেরই নাম সুখ।

ইহাকে আত্মাশ্রয় দোষ বলে। বস্তুতঃ মানুষই বল, আর অপর প্রাণীই বল, আর উদ্ভিদই বল, আর যাহা কিছু বল, সকলই শক্তির আধার অথবা শক্তিময় অথবা শক্তিস্বরূপ বলিতে পার। একটী পরমাণু যে আর একটী পরমাণুকে আকর্ষণ করে তাহার কারণ কি? অগ্নি যে স্থানে থাকে তাহার চতুর্দ্দিকে উত্তাপ বিতরণ করে কেন? উদ্ভিদ যে দিকে আলোক পায় ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই দিকেই বাড়িয়া যায় কি জন্য? সদ্যোজাত বানরশিশু যে মাতৃগর্ভ হইতে অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া বৃক্ষশাখা ধরিতে পারে তাহার হেতু কি? নরশিশু জাতমাত্র মাতার স্তনে মুখ দেওয়াইলেই তাহা টানে কেন?—পরদুঃখ দেখিলেই ধর্ম্মশীল মনুষ্যের মনে দয়ার উদ্রেক হইয়া সেই দুঃখ নিবারণের চেষ্টা হয় কেন?—এই সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—উহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ অথবা সংস্কারজাত কিম্বা শিক্ষালব্ধ গুণ। যদি তাহারও কারণ জিজ্ঞাস্য হয় তবে নিরীশ্বরবাদীকে "জানিনা" বলিতে হয় এবং সেশ্বরবাদী বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা—কিন্তু সেই ইচ্ছার কারণ কি জানি না।" মানুষের কাজও স্বভাবসিদ্ধ, সংস্কারসিদ্ধ এবং শিক্ষাসিদ্ধ বস্তু। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই কোনও উদ্দেশ্যই নিশ্চিত থাকে না, কর্ত্তার নিজের মনেও উদ্দেশ্য অনুভূত হয় না। যেগুলির উদ্দেশ্য অনুভূত হয়, সেগুলিও সকলে সুখানুসন্ধানপ্রেরিত হয় না। এই জন্য কর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য আর কাম্য। নিত্য কর্ম্মে কোনও উদ্দেশ্য নাই করিতে হয় তাই করি। কাম্য কর্ম্মে উদ্দেশ্য এবং অভিলাষাদি থাকে। নিত্য কর্ম্মও যেমন বিধি প্রণোদিত হইয়া করিতে হয় কাম্য কর্ম্মও সেইরূপ বিধি নিষেধ মানিয়া সংযতচিত্তে করিতে হয়।

যাহা ইচ্ছা তাহাই যে নিজের সুখোদ্দেশ্যে অসঙ্কুচিতরূপে করিয়া ফেলিতে পারা যায় তাহা নহে। তবে বিধিপ্রণোদিত কার্য্যেই ক্রমশঃ শান্তি লাভ হয়।

সমাজ সংস্কার।

কোন সমাজেরই সংস্কার বিশুদ্ধ অনুকরণের দ্বারা হইতে পারে না। হিন্দু সমাজের কোন নিয়ম তোমার মন্দ বোধ হইয়া থাকে এবং তাহার সংশোধনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ যে, ঐ নিয়মের সহিত অপর কোন্ কোন্ নিয়মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, এবং তাহা দেখিলেই কোন্ ভাগে কেমন করিয়া পরিবর্ত্ত করিতে হইবে, আর হইবে কি না তাহা বুঝিতে পারিবে। ৺ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কারক গাছে গাছে ফলে না। প্রকৃত সংস্কারক বড়ই অসাধারণ জিনিস। কিন্তু আজি কালি যে দুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়াছে সেই সংস্কারক। হিন্দু সমাজ বড়ই উচ্চ পদার্থ; যে ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই ভাগ্যবান পুরুষ। এই সমাজ পৃথিবীর অপর সকল সমাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন, সুতরাং ইহাতে উপদেষ্টৃ যাজকবর্গের প্রাধান্য। উপদেষ্টার প্রাধান্য সংযম ও বিদ্যাবত্তার উৎকর্ষে; অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রে বিদ্যাবান করিলেও অনেক দূর হইবে, কিন্তু যদি উভয়, সংস্কৃত দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন করিতে পার, তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্য এতদিন এত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সজীবাবস্থ, আছে, সেই উদ্দেশ্য বিনা বিঘ্নে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহা না হইলেই যে পারিবে না এমন নহে। তবে মধ্য পথে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইবে, কখন কখন শত্রুপক্ষীয়েরা হাসিবে, আর মিত্রপক্ষীয়েরা নিরাশ

হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাব মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে। বেকন ডেকার্ট কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়া খণ্ডকে যেমন ধর্ম্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতিঃ ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে। জর্ম্মণ দার্শনিক সোপেনহার বলিয়াছেন, "যেমন গ্রীসদেশ হইতে ইউরোপ যত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাইবে—আমার জীবনের সুখ এবং মৃত্যুর সম্বল যে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ গ্রন্থনিচয় তাহা অনধিক কাল মধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতীয় সকল গ্রন্থের উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে।"

সামাজিক ব্যবস্থা।

সমাজে ব্যবস্থার প্রয়োজন দুইটী কারণে হয়। এক কারণ সমাজান্তর্গত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রীর অভাব; দ্বিতীয় কারণ, ভিন্ন সমাজের সহিত সংঘর্ষ। প্রথম কারণ হইতে সমাজান্তর্গত যাবতীয় নিয়মের উৎপত্তি। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণের সহিত জনসংখ্যার সমীকরণ দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়া এবং (২) জনসংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইতে না দিয়া। সকল সমাজে ঐ দুইটী অবলম্বিত হইয়া থাকে। তবে সমাজের মূল প্রকৃতি অনুসারে ঐ পথগুলি বিভিন্ন হয়। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রথম উপায় ভূম্যাদিতে স্বত্বসংস্থাপন। তাহা (১) অনাবাদী ভূমির আবাদ দ্বারা হয়, আর (২) আবাদী ভূমির কৃষির পারিপাট্য বৃদ্ধি

করিয়া হয়। দেশের ভূমি হইতেই মনুষ্যের জীবনোপায়, অতএব ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে স্বত্ব নিরূপণ হয়। স্বত্ব সংস্থাপিত হইলেই দ্রব্যের প্রতি স্বত্বাধিকারীর যত্ন হয়। প্রথমে স্বত্বটা গোষ্ঠীপতি বা গৃহস্বামীতে প্রকটীভূত হইয়া থাকে। বন জঙ্গল কাটিয়া যে ব্যক্তি কোন ভূমির আবাদ করিবে, সে ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবে, যে সমাজে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, (যথা মনুসংহিতার সময়ে এদেশে হইয়াছিল) তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরেই আবাদ হইয়া যায়। তাদৃশ সমাজে কৃষির পারিপাট্যও জন্মে। তদ্রূপ সমাজে পিতৃধনে সকল পুত্রেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। যে সমাজে ওরূপ নিয়ম না হইয়া সমুদয় বা অধিকাংশ ভূমি রাজার অথবা প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীর বস্তু বলিয়া অবধারিত হয় (যেমন ফিউডাল সিষ্টেমের সময় ইউরোপে হইয়াছিল) তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরে আবাদও হয় না, আর কৃষিকার্য্যের তেমন পারিপাট্যও জন্মে না। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল দেশে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃষকবর্গের নিব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে সেই সকল দেশেই ভূমির আবাদ ভাল হইয়াছে এবং কৃষিকার্য্যেরও উৎকর্ষ জন্মিয়াছে। কোন কোন দেশে এখনও ভূমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকৃত হয় না—যথা ইংলণ্ডে। ওখানে প্রজাস্বত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত এই কথা বলিয়া আজি কালি অনেকে মত প্রচার করিতেছেন এবং ভূম্যধিকারিবর্গের বিহারের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূমিভাগ যে অকৃষ্ট থাকিবে আর যাহাও কৃষ্ট হইবে তাহা পাশুপাল্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে, ইহাও অতি অন্যায্য ব্যবস্থা বলিয়া অনেকের প্রতীত হইতেছে।

ইংলণ্ডে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রভুতা অধিক এবং দায়াধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সকল স্বত্ব বিভাগের প্রতিকূল। ওখানে পৈত্রিক ধনের অধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রতেই বর্ত্তে আর কোনও পুত্র কিছুই পায় না। এরূপে ঘটিত যে সমাজ তাহার অন্তরে জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধিসহকারে জীবনোপায় বৃদ্ধি পায় না, সে সমাজের লোককে বাঁচিতে হইলে স্বদেশের বাহিরে চলিয়া আসিতে হয় অথবা কৃষি ভিন্ন অন্য কোন জীবনোপায় বাহির করিতে হয়। ইংরাজেরা দুইই করিয়াছেন। স্বদেশ হইতে দলে দলে

বাহির হইয়া অপরাপর দেশ অধিকার করিয়াছেন আর আপনাদের দেশেও কলকারখানা প্রস্তুত করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় আপনাদের শিল্পজাত বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে বিজিত রাজ্যের ভূমিতে রাজার স্বত্ব স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু পৈতৃক ধনে পুত্র কন্যা উভয় প্রকার সন্তানেরই স্বত্ব গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তাহা হইলেই ভূমিবিভাগ জন্মে এবং স্বদেশমধ্যেই অধিক লোকের জীবনোপায় হয়। চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের মধ্যে ভূসম্পত্তি রাজার বলিয়াই গণ্য এবং আর্য্যদিগের মধ্যে রাজস্ব যেমন রক্ষণাবেক্ষণের ভৃতিস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত, উহাদিগের মধ্যে তাহা নয়, রাজস্বটী রাজার স্বত্বাধিকারিতার ফল—তাঁহার ভাগধেয়। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে পৈতৃক ধনবিভাগ সকল পুত্রসন্তানের মধ্যে সম পরিমাণে হয়—আর জ্যেষ্ঠাধিকারের ত কথাই নাই—ভারতবর্ষেও যে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রচলিত ছিল তাহারও নাম গন্ধ নাই। চীন জাপান প্রভৃতি দেশে অনাবাদী ভূমি নাই বলিলেই হয়, উহারা কৃষিকার্য্যেও অতি নিপুণ অতএব ঐ সকল সমাজে, ও স্বদেশের অন্তর্ভাগেই জীবনোপায় করিবার জন্য প্রকৃত চেষ্টা হইয়াছে।

সমাজে জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার নিমিত্তও সর্ব্বত্র চেষ্টা হইয়াছে, বৈবাহিক বিশেষ বিশেষ নিয়ম সেই চেষ্টাসম্ভূত বস্তু। কোনও সমাজের আদি অবস্থার বৈবাহিক প্রথা ভাল নয়। আমাদের যে আট প্রকার বিবাহের কথা মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে তাহার একটী ভিন্ন সকলগুলিই পশুবদাচরণসম্পন্ন এবং ঘৃণাকর। সীজর নিজ গ্রন্থে তৎকালের ইংলণ্ডবাসী লোকেরা"—কেও" পত্নীত্বে গ্রহণ করিত বলিয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে আমাদের আট প্রকারের বিবাহের সকল প্রকারই ছিল, আর বৌদ্ধ জাতীয়েরা যে ঐ বিষয়ে বড়ই অল্প বিচার করিত তাহা উহাদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সমাজের আদিমাবস্থা গিয়া যখন বিচারের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বিবাহ দুই প্রণালীতে মাত্র হইয়া থাকে—এক যাহাকে আমরা ব্রাহ্মবিবাহ বলি, আর দ্বিতীয় যাহাকে গান্ধর্ব্ব

বলা যায়। হিন্দুসমাজে আর গান্ধর্ব্ব বিবাহও প্রচলিত নাই, কেবল ব্রাহ্ম বিবাহ আছে। ইউরোপে গান্ধর্ব্ব এবং ব্রাহ্ম অথবা উভয় মিশ্র আছে, মুসলমানদিগের ব্রাহ্ম এবং পিশাচ আছে, বৌদ্ধদিগের ব্রাহ্ম গান্ধর্ব্ব আছে। অতএব বিবাহপ্রণালীর সংকোচ হিন্দুসমাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এবং বোধ হয় সেই জন্য দত্তক এবং ঔরস দুই প্রকারের পুত্রত্ব বিধান হইয়াছে। অন্য সকল সমাজে ঔরস ভিন্ন পুত্র হয় না। হিন্দু-সমাজে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের বিধান দ্বারা এবং ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবা-বিবাহের নিষেধ দ্বারা বৈবাহিক প্রণালীর আরও সংকোচ হইয়াছে। বাল্য বিবাহের দ্বারা সন্তান জনন অল্প হয়, কি অধিক হয় সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয় মত পাওয়া যায় নাই—আমার অনুমান এইরূপ যে, বয়োধিক বিবাহে যত সন্তান হইবার সম্ভাবনা, বাল্যবিবাহে তাহার অধিক নয়। যে গাছে আগে ফল ধরে তাহার ফল শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, যদি একথা প্রকৃত হয় তবে বাল্যবিবাহও অন্যান্য উপায়ের ন্যায় লোকসংখ্যা ন্যূন না করুক উহা বৃদ্ধি করিতেছে না। ইউরোপীয় সমাজগুলিতেও জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার উপায় হইয়া আছে। যে সকল দেশ কাথলিক মতাবলম্বন করিয়া আছে, সেগুলিতে অনেক নরনারী চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে, আর যে সকল দেশ প্রোটেষ্টাণ্ট মতানুগামী সেখানে চিরকৌমার ব্রত না করুক কিন্তু অনেক লোকে বিবাহ করে না, আর যাহারা করে তাহারা অধিক বয়স হইলে বিবাহ করে, সুতরাং সন্তান অল্প হয়। ইংলণ্ডে কুমারীগণ ১৪।১৫ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ যোগ্যা হয়, কিন্তু ওখানে ২১।২২ বৎসরে তাঁহাদিগের বিবাহ হয়; অতএব ইহাতে যে সাত আট বৎসর বাদ যায়, সে সময়ের মধ্যে বিবাহ হইলে তিন চারিটী সন্তান হইতে পারিত। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ফরাসিজাতীয়েরাই সামাজিক নিয়মের বিনাবলম্বনে আপনাদিগের জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিয়াছে, মুসলমানেরা অল্প বয়সে বিবাহ করে এবং অনেক বিবাহ করে। সেই বহুবিবাহ অপত্যসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখে। ভূতপূর্ব্ব নবাব নাজিমের ২৬টী বেগম ছিল কিন্তু নবাব সাহে-বের সন্তানসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টী হইয়াছিল এবং তাহারও বত্রিশটী নাকি

শৈশবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ২৪টী বই বাঁচে নাই। কি এখানে, কি অন্যত্র, বড় ছোট অনেক মুসলমানের ঘরেই এইরূপ হইয়া থাকে।

বৌদ্ধমতাবলম্বি জাতীয়দিগের বিবাহ এক সময়ে একাধিক হয় না; তাহারা খুব বয়স পার করিয়া দিয়াও বিবাহ করে না। ইহাদিগের বৈবাহিক প্রণালীতে সন্তানসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার কোন উপায়ই দেখা যায় না, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে শিশুহত্যা প্রচলিত।

অধিকারী ভেদ ও স্বদেশানুরাগ।

আমি মাতৃভূমির নানা দেশ দর্শন করিয়াছি। যে সকল ভাগ স্বচক্ষে দর্শন করি নাই তাহারও বিবরণ যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছি। যখন যেখানে গিয়াছি অথবা যেখানকার বিবরণ পাঠ করিয়াছি সকলই যেন দুই প্রকার চক্ষুতে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইয়াছে—এক, আমার চর্ম্মচক্ষুতে; অপর, হৃদয়াধিষ্ঠিত কোন মহাপুরুষের জ্ঞানচক্ষুতে। যখন আমার বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষের অনধিক, তখন পিতৃদেবের স্থানে রামায়ণের প্রথম শ্লোক আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছি, পরে যখন দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স তখনও তাঁহারই স্থানে ঐ শ্লোকের সর্ব্বজনবিদিত লৌকিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। যখন বয়স দ্বাবিংশবর্ষ তখন তাঁহারই স্থানে আবার ঐ শ্লোকের আধ্যাত্মিক ভাব অবগত হইয়াছিলাম। একই শ্লোক একই গুরু, একই শিষ্য—কিন্তু কাল ভেদে অধিকার ভেদ এবং ব্যাখ্যায় প্রভেদ।

যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোন কার্য্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই

বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে আর্য্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদায় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী দেহ।

ধর্ম্ম-বুদ্ধি, ভক্তি-প্রীতি ও আচার রক্ষা।

বহুজন্ম জন্মান্তরে মনুষ্যদেহধারণ হইয়াছে, সেই দেহে মস্তিষ্কভাগ প্রধান এবং পরবর্ত্তী অপর মস্তিষ্কের মধ্যে ধূম্রভাগ (grey matter) সর্ব্ব প্রধান। সেই ভাগ বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবৃত্তিদিগের স্থান। অতএব মনুষ্য যেরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যদি সেই অনুক্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তবে বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবৃত্তিদিগের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করাই আবশ্যক। বিনা অনুশীলনে বৃত্তিদিগের বলহানি হয়।

যথা পরিণতং শস্যং পতেৎ প্রসববন্ধনাৎ।
তে পরিণতপাপ্মানঃ পতিষ্যন্তি তথা স্বয়ং॥

অর্থাৎ শস্য পাকিলে যেমন আপন বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে তেমনি পাপ পরিণত হইলে পাপিগণ আপনারাই পতিত হয়।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ, আচারঃ পরমং তপঃ।
আচারাৎ বর্দ্ধতে হ্যায়ুঃ, আচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ।

সুখ, ধর্ম্মের সহচর হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কারণ সুখ দুঃখ উভয়ই অভ্যাসস্থলে লঘু হইয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মাচরণের বিশিষ্ট অভ্যাসই ধর্ম্ম।

মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতমভাগে ভক্তি (veneration) এবং প্রীতির (Love) অবস্থান। ঐ দুই বৃত্তি সর্ব্বশেষে উন্মেষিত হয়। অতএব উহাদিগের অনুযায়ী কার্য্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। 'ভক্ত্যা প্রীত্যাচ পূজয়েৎ' এই মহাবাক্যের বিশেষ সমর্থন করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহাদের কার্য্যদর্শনে এরূপ প্রতীতি জন্মে যে তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে ভক্তি এবং প্রীতি সমধিক প্রবলা, তাঁহাদিগের অনুকরণ করা সৎপরামর্শ। তাঁহারাই প্রকৃত "মহাজন"।

যাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রীতি থাকে, তাঁহারা কখনই "আত্ম-সমাজের বিগর্হিত আচরণে" প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

প্রকৃতি দেবী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই জন্য বিভিন্ন দেশবাসীদিগের ধর্ম্মপ্রণালী ভিন্ন এবং আচারপদ্ধতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একদেশের ধর্ম্ম অন্য দেশে পরিগৃহীত হইতে গেলেই আচার পদ্ধতির বিকৃতি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য এক দেশের বা এক জাতির ধর্ম্ম অন্য দেশের বা অন্য জাতীয়ের উপর প্রচালিত করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ইউরোপীয়েরা জাত্যন্তর (য়িহুদীদিগের) হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে একেবারে আচারপদ্ধতি-পরিশূন্য হইয়াছেন এবং সেই জন্যই ইউরোপের ছোট লোকেরা নিতান্ত পশুবৎ হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয়েরা এখনও আচারপদ্ধতি-পরিহীন হয়েন নাই বলিয়াই এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে কতকটা উৎকর্ষ সংরক্ষিত হইতেছে!

স্বাধ্যায় রক্ষা না করিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কার্য্যপ্রবৃত্তি হ্রস্বতেজা হইয়া যায়। এই জন্যও অর্থাৎ যদি বিদ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ না হয়, তথাপিও কিছু কিছু স্বাধ্যায় পাঠনার নিত্যপ্রয়োজন।

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়।

সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনটী কথা যেন কতকটা কথার কথা বলিয়াই মনে হইতেছে। যাহাকে স্থিতি বলে, সেত কেবল বর্ত্তমান কাল লইয়া। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অস্তিত্বই প্রকৃতরূপে অবধারণ হয় না। উহার কিয়দংশ অতীতের অন্তর্ভুক্ত এবং অপরাংশ ভাবীর

মধ্যগত। সুতরাং বর্ত্তমান কালই নাই এবং সেই জন্য স্থিতিও নাই। যাহাকে স্থিতি বলে তাহার যে ভাগ বর্ত্তমানের প্রথমাংশে সেটী কারণতাপ্রাপ্ত সুতরাং তাহা উৎপত্তি বা সৃষ্টি এবং যে ভাগ বর্ত্তমানের উত্তরাংশে সেটী কার্য্যতাপ্রাপ্ত বা লয়। অতএব সৃষ্টি এবং লয় বই স্থিতির অন্যবিধ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তাহা কি সত্য? —নূতনও কিছুই সৃষ্ট হয় না, লয় হইয়াও কিছু একেবারে যায় না। যাহাকে নূতন বলে তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র এবং যাহাকে বিনাশ বলে তাহাও রূপান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। যখন কোন দ্রব্য সৃষ্ট হইতেছে বলি, তখন যে আর কতকগুলির লয় হইয়া গেল তাহা ভাবি না, আবার কোন বস্তুর লয় হইল যখন বলি তখনও যে সেই লয় জন্য অপর বস্তুর উৎপত্তি হইল তাহা ভাবি না। যদি তাহা ভাবিতাম তবে সৃষ্টিতে আর লয়েতে কোন বিশেষ দেখিতে পাইতাম না। অতএব সৃষ্টি এবং লয়ে অভেদ—কারণে এবং কার্য্যে—অভেদ। তবে দাঁড়াইল এই যে, সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়—এই তিন প্রকার দৃষ্টি স্থূল দৃষ্টি মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগের মধ্যে কোন ভেদ নাই। একই ক্রিয়াপ্রবাহ চলিয়া যাইতেছে—তাহার বিরাম নাই—এবং তাহার আদি বা অন্ত আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। এই জন্যই উহার নাম জগৎ। ক্রিয়া মাত্রই গমন বা স্পন্দন। জগৎও ক্রিয়াময় স্পন্দনময় পরিবর্ত্তনময়। "ইহা যাইবে—থাকিবে না" এমন অর্থে ইহাকে জগৎ বলা হয় নাই।

সন্তানোৎপত্তি।

মহাযোগী শ্রীমহাদেব প্রথমে কামকে জয় করেন, তাহার পরে পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য যে জীবজন্তুগণের কাম পরিতৃপ্তি দ্বারা স্ব স্ব সুখ সাধনোদ্দেশে হয় নাই ইহাই এই কথার তাৎপর্য্য। ফলতঃ কেবলমাত্র কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্ত্রী-সংসর্গ করা দোষ। এই জন্যই শাস্ত্রে পর্ব্বাহাদিতে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে

এবং এক্ষণকার লোকে শাস্ত্রীয় বিধি সকল অমান্য করাতে উত্তরোত্তর জাতীয় অপকর্ষ সাধন হইতেছে এবং লোকে নানাপ্রকার ক্লেশে পতিত হইতেছে। ধন্য য়িহুদী জাতি। উহারা এ সকল বিষয়ে আপনাদিগের আচার পদ্ধতি রক্ষা করিয়াই এত বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অদ্যাপি আপনাদিগের জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অপর সকল জাতি অপেক্ষা অকাল মৃত্যু অল্প, শরীরের এবং মনের শক্তি অধিক, এবং আয়ুষ্মত্তা দীর্ঘতর।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

আর্য্য পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন কাল হইতেঁ ঈশ্বরের স্বরূপতা কিরূপ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, তাহা দুইটী বৈদিক মহাবাক্যে স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। তাহার একটি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মং'—অপরটি 'তত্ত্বমসি'। এই দুইটি মহাবাক্য হইতে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহা যে কেবলমাত্র আর্য্য-পণ্ডিতদিগের হৃদয়েই সমুদিত হইয়াছিল, অপর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই এমত নহে। সকল জাতির ভাষাতেই ঈশ্বরের একটী নামার্থ "সর্ব্ব"। 'আল্লা' নামটী মহম্মদের স্বকপোল কল্পিত নহে। উহা আরবদেশে পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল এবং 'আকাশ' 'সূর্য্য' এবং 'বলশালী' এই তিনটী অর্থই বুঝাইত। য়িহুদী জাতির মধ্যে 'যেহোভা' নাম প্রসিদ্ধ। তাহার অর্থ 'অহমস্মি' বা 'অস্তীতি মাত্র' বা 'তৎসৎ'। গ্রীকদিগের 'জিউস' শব্দ 'আকাশ' বা 'ব্যাপকত্ব' বোধক। চিনীয়দিগের 'টিয়েন' শব্দ, আকাশ এবং ঈশ্বরবাচক। সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দও ব্যাপকত্ব বুঝায়। খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক সেণ্ট পল্ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরেই আমাদিগের জীবন, গতি এবং সত্ত্বা।' খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা সেণ্ট অগষ্টিনও বলেন "ঈশ্বর এরূপ একটী বৃত্তস্বরূপ যে তাহার কেন্দ্র সর্ব্বস্থলে, পরিধি কোথাও নাই।"

অতএব উল্লিখিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যের ভাব কোন না কোন সময়ে সকল জাতির মধ্যেই সমুদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে সকলের মধ্যে যে সমভাবে পরিস্ফুট হয় নাই তাহাও

নিঃসন্দেহ। কারণ অপর কোন জাতির মধ্যে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মূল সূত্রের বৃত্তিস্বরূপ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের আবির্ভাব এমন স্পষ্টাভিধানে দেখা যায় না। আর্য্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেই 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব এবং সেই প্রাদুর্ভাবেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের 'হংস' মন্ত্রাভিধান এবং সোহং' জ্ঞানাভ্যাসের উপদেশ, সমুদায় কার্য্যেই পূজাভাবের সন্নিবেশ, সমাধি যোগের অনুষ্ঠান, নিষ্কামতার প্রশংসা এবং মুক্তির নিমিত্ত অভিলাষ।

—**:**—

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও তন্ত্র শাস্ত্র।

(১)

আমাদিগের দেশের চূড়ামণি স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় হিন্দু ধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং সর্ব্বপ্রাধান্য প্রকটনপূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক স্বল্পবিদ্য, অপরিণামদর্শী, অনুচিকীর্ষা-পরায়ণ ব্যক্তিব্যূহের ভ্রমভঞ্জন এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত। যে ধর্ম্মপ্রণালী সুদূরদর্শী গাঢ় চিন্তাপরায়ণ, পবিত্রমনা মহর্ষিদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া আর্য্যসন্তানগণকে বহুসহস্র বর্ষাবধি পাপস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে, যে ধর্ম্ম প্রণালী সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনের সোপান হইয়া এই বহ্বায়ত ভারতভূমি নিবাসী হিন্দুমাত্রের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একজাতিত্ব ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী সুখময়, পবিত্রতাময় হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সংসাধিত করিয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী হিন্দু জাতীয়দিগকে পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা অস্বার্থপর ঈশ্বরপরায়ণ এবং পারলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে, সেই ধর্ম্মপ্রণালীর গুণগরিমা গীয়মান হইলে কাহার অন্তঃকরণে তৃপ্তি বোধ না হয়? আমি রাজনারায়ণ বাবুকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম, এবং তাঁহার সহিত অভিন্নহৃদয় হইতে অভিলাষী হইলাম।

রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মমতাবলম্বী, আমি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মানুবর্ত্তী, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু আর হিন্দুধর্ম্মের দ্বেষ করেন না, এবং যিনি পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ না করেন, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানপথাবলম্বী হইয়াছেন, এবং যথাকালে মুক্তিভাক্ হইতে পারেন। যে ধর্ম্ম প্রণালীর মূলে ইহলৌকিক সমৃদ্ধিকামনা নিহিত থাকে, যে ধর্ম্মপ্রণালী বিজিগীষা হইতে সমুদ্ভূত হয়, সেই ধর্ম্মপ্রণালীই পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ শিখাইয়া দেয়। আর্য্যধর্ম্ম সেরূপ মূল হইতে জন্মে নাই। একান্ত অস্বার্থপর হিন্দু মানসক্ষেত্রে, জ্ঞানবীজ হইতে, ভক্তিবারি সিঞ্চনে, এই কল্পবৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার শাখাপল্লব বিটপাদি সামাজিক শুভ নিয়ম সমস্ত, ইহার পুষ্প পবিত্রতা, ইহার ফল শান্তি।

আমি কখনই ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই নাই। ব্রাহ্মদিগের জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মেরা জন্মিয়াছেন, আমার চিরকালই এই বোধ আছে। ব্রাহ্মদিগের বিষয় যখন ভাবিয়াছি, তখনই পৌরাণিক বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় এবং রিপুদমনশীল বশিষ্ঠ মহর্ষির একটি কামধেনু ছিল। রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় সন্তান বিশ্বামিত্র রাজা সেই কামধেনুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং কিছুই করিলেন না, কিন্তু নন্দিনী (ঐ কামধেনু) আপন শৃঙ্গ ক্ষুর পুচ্ছাদি হইতে যুদ্ধপরায়ণ বিবিধ ম্লেচ্ছজাতীয়ের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহারা বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করিয়া কামধেনুকে উদ্ধার করিয়া দিল। আমার মনে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, কামধেনু হিন্দুধর্ম্ম, বিশ্বামিত্র প্রবল প্রতাপ রাজধর্ম্ম, এবং কামধেনুর শরীর নিঃসৃত ম্লেচ্ছগণ ব্রাহ্ম মতাবলম্বী আধুনিক যুবকবৃন্দ। ব্রাহ্মদিগের রূপ ধারণ করিয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আপন প্রভাব প্রকাশ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মকে সুদূরপরাহত করিলেন। কামধেনুপ্রসূত বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত ঐ ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক।

এতক্ষণ মনের কথা বলিলাম। এক্ষণে একটি কাজের কথা বলিব।

রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপপ্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রেরও সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তিনি ভালই করিয়াছিলেন।

কিন্তু কয়েকজন নিতান্ত অল্পজ্ঞ অসার ব্যক্তির প্রলাপ বাক্যকে প্রামাণিক বাক্য মনে করিয়া ডাক্তার মরে মিচেল সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ঐ জন্য রাজনারায়ণ বাবুর দোষ ধরিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবু যে আত্মপক্ষ সমর্থনে অশক্ত তাহা নহে। তিনি স্বয়ংই ঐ সকল প্রতিবাদ খণ্ডনে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি তন্ত্র শাস্ত্রের বাস্তবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। রাজনারায়ণ মহারথীর অনুবর্ত্তী সামান্য পদাতি হওয়াও গৌরবের বিষয়।

ধর্ম্মপ্রণালী মাত্রেই ত্রিধা হইয়া থাকে। প্রথম আভ্যন্তরিক, অপর গার্হ, তৃতীয় সামাজিক। ইংরাজদিগের প্রণালী দেখ, তাঁহারা শয়ন-কালে এবং শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে এক একবার ঈশ্বরোপাসনা করেন। ঐ সময়ে অপর কেহ তাঁহাদিগের নির্জ্জন আভ্যন্তরিক উপাসনার সহযোগী হয়েন না। ঐ উপাসনা উপাস্য এবং উপাসকের পরস্পর সাক্ষাৎসম্বন্ধ পরিচায়ক। তাঁহারা ভোজন করিতে বসিবার পূর্ব্ব-ক্ষণেও ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। ঐ উপাসনায় তাঁহাদের পরিবারবর্গের সাহচর্য্য হয়। ইহা গার্হ। তাঁহারা গির্জ্জা ঘরে গিয়া প্রতি রবিবারে উপাসনা করেন। এইটি সামাজিক। হিন্দু প্রণালীতেও উপাসনা ঐ প্রকারে ত্রিবিধ—যথা ইষ্টদেবতার পূজাদি। ইহা আভ্যন্তরিক। শালগ্রাম শিলা, বিগ্রহ এবং শিবাদির পূজা। ইহা গার্হ। দোল দুর্গোৎসবাদি উৎসব কার্য্য। ইহা সামাজিক।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পূজাবিধি ঐ প্রণালী ত্রিতয়ের এক ভাগ অর্থাৎ প্রথম ভাগকেই বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করে। অপর দুই ভাগের প্রতি ইহার স্পষ্ট দৃষ্টি নাই। কেন নাই এবং যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা সেইরূপ আছে কেন, তদ্বিষয়ে অধিক বলিব না। হিন্দুরা অপর ধর্ম্মাবলম্বিদিগের অধীন হইলে পর তন্ত্রশাস্ত্র প্রকটিত হয়, এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

সম্প্রতি বিচার করিয়া দেখ, আভ্যন্তরিক উপাসনার প্রকৃত মূল কি হইতে পারে? আত্মার সম্যক্ এবং সমগ্র উন্নতির সাধনই এই উপাসনার যথার্থ উদ্দেশ্য। আত্মোন্নতি কিরূপে হইবে? আত্মার

সর্ব্বপ্রধান শক্তির উত্তেজনা দ্বারা। আত্মার সর্ব্বপ্রধান শক্তি কি? ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি থাকাতেই মনুষ্যকে স্বাধীন জীব, সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার ছায়া স্বরূপ এবং সেই প্রোজ্জ্বল পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ বলিয়া অনুভব হয়। অতএব ইচ্ছাশক্তির সম্বর্দ্ধন তান্ত্রিক উপাসনার উদ্দেশ্য। ইচ্ছা-শক্তির খর্ব্বতা কি কি হেতুতে জন্মে? কতক শরীরের দোষে, কতক মনের দোষে। শরীরের দোষ নিবারণ তন্ত্রোক্ত যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, মনের দোষ সংশোধন তন্ত্রোক্ত সাধনাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম, ষোঢ়া, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ শরীর সংস্কারের উপায়। (১) শব, চিতা, পঞ্চমুণ্ডী, কমলাসন প্রভৃতি সাধন, ভয় বিশেষতঃ মৃত্যুভয় জয় করিবার উপায়, (২) লতা সাধনাদি ব্যাপার কামজয়ের উপায় (৩) কুটীচর ধর্ম্ম পালনাদি লোভ এবং ক্রোধজয়ের পন্থা (৪) মানস পূজা এবং ধ্যান ধারণাদি মনের একাগ্রতা এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্দ্ধক।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতি এই। যে শাস্ত্রের প্রকৃতি এরূপ সে শাস্ত্র যে মদ্যপান এবং পরস্ত্রীগমন শিক্ষা দিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। তবে একটি কথা আছে, সেইটি ভাল করিয়া বুঝিয়া হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে কথা এই—

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, গুরূপদেশ নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহারা সাধারণের বোধগম্য করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণালী ব্যাখ্যা করিতেন না। দ্ব্যর্থ অথবা গূঢ়ার্থ কিম্বা বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদক শব্দের ব্যবহার তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিতেন। তাঁহা-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ত কেবল কথার কথা ছিল না। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে একটি শিক্ষণীয় প্রকৃত বিদ্যা করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এই জন্য যেমন ঘড়ি গড়া, জুতা গড়া, ছুতারের কাজ, স্থপতির কাজ গুরূপদেশসাপেক্ষ, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানও তেমনি গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

(২)

আমি পূর্ব্বপত্রে তন্ত্রশাস্ত্রের বাস্তবিক প্রকৃতি কিরূপ, তাহার স্থূল স্থূল বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি তদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তন্ত্রের সংস্কৃত কালিদাসের সংস্কৃত অপেক্ষাও ললিত এবং সম্মার্জ্জিত এবং

তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় প্রকৃতি এরূপ যে, পরকীয় অধিকারের প্রভাব দেশের উপর পতিত না হইলে সেরূপ হইতে পারিত না। যেমন কোন উদ্ভিদের পত্রের বর্ণ দেখিয়াই বলা যায় যে, সেটি রৌদ্রাতপে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, ছায়াতলে জন্মিয়াছে, সেইরূপ সাহিত্যাদি শাস্ত্রের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকটন সময়ে সমাজ স্বাধীন কি পরাধীন ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। এ বিষয়েও সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। তন্ত্রের সংস্কৃত জয়দেব গোস্বামীর সংস্কৃতের গৌড়গন্ধে গন্ধিত,তন্ত্রের উপমালঙ্কারাদি বঙ্গদেশের প্রকৃতির সহিত বিশিষ্টরূপেই মিলে,এবং তন্ত্রে যে অক্ষরমালার নির্দ্দেশ আছে,তাহা বাঙ্গালা অক্ষর কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র এখনও বঙ্গপ্রদেশের বহিঃস্থ অনেকানেক স্থানে বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়া থাকে। আমি ত্রিহুতে, আগ্রায় এবং কাশ্মীররাজের অধিকারে তান্ত্রিক দীক্ষা হইয়া থাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এবং বুন্দেলখণ্ডে ও ত্রৈলঙ্গের কোন কোন স্থানে এখনও তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন আছে, তাহাও প্রামাণিক লোকমুখে শুনিয়াছি। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি এবং প্রচার সম্বন্ধে ৺রাজা রামমোহন রায়ের প্রমুখাৎ যে শ্লোকটি কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না।

"গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা মৈথিলীপ্রবলীকৃতা।
কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরাধীনাবস্থায় এই বঙ্গদেশে স্বতঃ সমুদ্ভূত হয়, এবং স্বতঃই ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া পড়ে। এ শাস্ত্র কি বঙ্গবাসীদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত? এ শাস্ত্র কি তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্তই অযোগ্য হইতে পারে? এ শাস্ত্রের কি কোন ভাগে এমন কিছু থাকা সম্ভব নয় যাহা জানিতে পারিলে এবং জানিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের বিশিষ্ট উপকার দর্শে? বুদ্ধিমানেরা আপনাপন মনো-

মধ্যে উল্লিখিত প্রশ্ন কয়েকটির সদুত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন। তাঁহারা ইংরাজীভাষা শিখিয়া যত সাহিত্য এবং যত পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন তৎসমুদয়ের "অর্থ" পর্য্যালোচনা করুন। অনর্গল বাক্যপ্রয়োগের অপেক্ষা প্রকৃত অনুষ্ঠানের কত সমধিক মাহাত্ম্য তাহা অনুধাবন করুন। তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। অনেক বাকী আছে—সারভাগই বাকী আছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম মুসলমান অধিরাজদিগের একচ্ছত্র রাজ্যকালে সমুৎপন্ন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মও রোমীয় সম্রাটদিগের সাম্রাজ্যসময়ে সমুৎপন্ন, এই জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের সম প্রকৃতিক, এবং খৃষ্টধর্ম্মের সমপ্রকৃতিক বলিয়া ঐ ধর্ম্ম নবীন ব্রাহ্মদিগের নিকট সমাদৃত এবং তৎকর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে অনুকৃত হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের অবস্থা যেরূপ, আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে যে ধর্ম্ম আমাদিগকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এবং রিপুদমন শিখাইয়া আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে তেজস্বিনী করিয়া তুলিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বাক্‌বিতণ্ডা পরিহারপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন অভ্যাস করাইবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে পরপ্রত্যাশারূপ পিশাচীর হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠায় উন্নত করিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে গুহ্য অনুষ্ঠানে শুভময় ফল গ্রহণে লোলুপ করিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগের আলস্য এবং জড়তার অপনয়ন করিয়া সাধনমাহাত্ম্য আমাদিগের চক্ষে জাজ্বল্যমান করিয়া দিবে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে। কলিতে নিগমই বেদ, শিবের উক্তি এই। প্রস্তাব দীর্ঘ হইল, তথাপি শিবভগবতীর একটি কালোচিত স্তব পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। স্তবটি আমি এখন নিজে গড়িলাম না, যেন কোথাও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, স্মরণ হইতেছে।

"হে দেশহিতেচ্ছা দেবি! দুর্গতি বিনাশিনি! দনুজদলনি! তোমার সাধকেরা কি কঠোর তপস্যাই করিয়াছেন:—ঐ দেখিতেছি একটি যুবা পুরুষ জ্বলন্ত অনল মধ্যে আপন বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাই হোমীয় করিতেছেন! ঐ একটি স্ত্রীলোক আপন দন্তবিচ্ছিন্ন রুধিরাক্ত জিহ্বাগ্রকে দেবীর চরণতলে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন! আবার ঐ একজন

গম্ভীরদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ আপন প্রিয়তম পুত্রদিগকে দেবীর সমক্ষে বলি প্রদান করিতেছেন।

হে ধর্ম্ম সংস্কার! হে দেবাদিদেব! তোমার আরাধনাও সামান্য কঠিন কার্য্য নয়! কোন্ ব্যক্তি তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সংসার সুখ কামনা পরিহার না করিয়াছেন? তোমার কোন্ সেবক কলঙ্কাভিলিপ্ত সমাজ বহিষ্কৃত এবং রাজনিগ্রহে নিগৃহীত না হইয়াছেন? ঐ দেখিতেছি একজন রাজবংশসম্ভূত মহানুভাব নিজ সদয় হৃদয় দর্শিত অহিংসা ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ পৈত্রিক রাজ্য সম্পদ তুচ্ছ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন! ঐ আর একটি মনুজদেব পৃথিবীর পাপভার স্বয়ং বহন করতঃ চৌরবৎ দণ্ডিত হইয়াও ঐশী দয়ালুতার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন!"

আরও কেমন করিয়া বলিব? তন্ত্র শাস্ত্র গুহ্য প্রকরণ। 'ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।' "গুহ্য? তবেই মন্দ, যা ভাল তাত গোপন করিতে হয় না।" বটে রে, পুঁটে ছেলে! তুই গোপনের ফল কি বুঝিবি? তুই ইংরাজীতে বক্তৃতা কর, গ্যাড্ ম্যাড্ ফিস্ ফাস্ কর্, সাহেবেরা তোর মাথায় হাত বুলাবেন, যদি চাহিস্ ত বড় চাকুরিও দিবেন, ইংরাজী কাগজে তোর নামটাও উঠিবে।

কলিতে অর্থাৎ পাপেতে মনুষ্য বামন হয় অর্থাৎ খর্ব্ববুদ্ধি হয়।

(৩)

রাজনারায়ণ বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ওয়ালা। বোধ হয়, এখনকার যে সকল পুঁটে ছেলেরা বড়ই ইংরাজীর গোঁড়ামী করে, রাজনারায়ণ বাবু তাহাদিগের সকলকেই দশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজী পড়াইতে পারেন।

যখন সেই রাজনারায়ণ বাবুই হিন্দু ধর্ম্ম এবং তন্ত্র শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন, তখন আমি বুঝিতেছি যে, ইংরাজী বিদ্যায় এমন কিছু নাই যাহাতে স্বধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষকরাকে নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী করিয়া দেয়। এইরূপ বুঝিয়া আমার বড়ই সুখ হইতেছে। যখন রাজা ইংরাজ তখন রাজবিদ্যা ইংরাজী শিখিতেই হইবে, আর ইংরাজী শিখিলেই যদি

স্বধর্ম্মবিদ্বেষ্টা হইতে হয়, তবে সকলেই ক্রমে স্বধর্ম্মবিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিবে। যখন যখন এইরূপ ভাবিতাম তখনই চক্ষুতে জল আসিত, প্রাণ বিকল হইত, শীঘ্র মৃত্যু হয় প্রায় এমন ইচ্ছাও করিতাম। কিন্তু আজি কালি একটু আশ্বস্ত হইয়াছি, আর মনে মনে করিতেছি, শিবের উক্তি কি মিথ্যা হবে—দুদিন পরে হউক, দশদিন পরে হউক তন্ত্রশাস্ত্রের সমাদর বাড়িবে, ইংরাজী ভক্তির যে প্রবল স্রোতঃ বহিতেছে তাহার মোহানায় চর পড়িবে—আবার নিজের ধর্ম্ম নিজের দেশ ভাল লাগিবে। আহা! এমন দিন কি হবে? শবসাধন সিদ্ধ হবে? মরা আবার বাঁচিবে? মহানিশা ত উপস্থিত। কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ?

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ, ঐ শাস্ত্র কেমন সময়ে প্রকট হইয়াছিল, এবং আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে ঐ শাস্ত্রের কেমন উপযোগিতা অনুভব হয়, তাহা পূর্ব্ব দুই পত্রে বলিয়াছি। এক্ষণে তন্ত্র শাস্ত্রের আর একটি অপূর্ব্ব ভাবের উল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষবাসী আর্য্য সন্তানদিগের সকল দুর্ভাগ্যের মূল কি? গৃহ বিচ্ছেদ—অনৈক্য! সেই গৃহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ সাম্প্রদায়িক মতভেদ। এই কথাটি মনে রাখিয়া তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তন্ত্রের একটি প্রকৃত গুণ উপলব্ধ হইবে।

পুরাণ পাঠ কর দেখিতে পাইবে, পদে পদে সাম্প্রদায়িক মতভেদ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবদিগের পুরাণই ভিন্ন ভিন্ন। স্কন্দ পুরাণে শিবই সর্ব্বেসর্ব্বা; কালিকাপুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদ্যা ভগবতীর অপত্য বৈ নয়, পদ্মপুরাণে বিষ্ণুই পরমেশ, ব্রহ্মা এবং শিব তাঁহার বিভূতি এবং ভগবতী তাঁহারই যোগমায়া অথবা বিদ্যাশক্তি; ফলতঃ পুরাণের সময়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বড়ই প্রভাব। শুদ্ধ মতভেদের প্রভাব নয়—মুখোমুখিও যেমন, হাতাহাতিও তেমনি। শিবরামের যুদ্ধ, বাণরাজা এবং কৃষ্ণের যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার সমস্ত বিলক্ষণ রক্তারক্তি ব্যাপার, তাহার সংশয় নাই।

যে ধর্ম্ম প্রণালীর মধ্যে ওরূপ সাম্প্রদায়িক মতভেদ জন্মে, তাহারই

একটি প্রবল শত্রু জন্মিয়া থাকে। যখন ঘরাও ঝগড়া তখনই বাহিরের শত্রুর উপদ্রব। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়দিগের পরস্পর অনৈক্যের যখন বড়ই প্রাদুর্ভাব, সেই সময়ে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি; প্রোটেষ্টাণ্টদিগের পরস্পর মতভেদের সময় জেসুইটদিগের উদয়, সুন্নি সিয়ার বিবাদ কালে সুফিদিগের জন্ম, এবং পঞ্চোপাসকদিগের পরস্পর বিসংবাদকালে বুদ্ধদেবের অবতার। আমার বোধ হয় পঞ্চোপাসকেরা যে সময়ে বিবাদ করিতেছিলেন সেই সময়ে বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রাবল্যে ভয়যুক্ত হইয়াই হিন্দু পঞ্চোপাসকেরা কিয়ৎ পরিমাণে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এবং সেই সম্মিলনের ফলে ষড়দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং গুপ্ত তান্ত্রিক সাধনাও "আরম্ভ" হয়।

যাহা হউক, পঞ্চোপাসকেরা একবার পরস্পর বিবাদ পরিহার পূর্ব্বক মিলিলেন। যিনি রাম তিনিই শিব, যিনি ব্রহ্মা তিনিই গণেশ, যিনি লক্ষ্মী তিনিই গৌরী এইরূপ অভেদ জ্ঞানের কথা সকল শাস্ত্রে প্রচারিত হইল, বিবাদ মিটিল, নূতন ক্ষত্রিয়কুলের সৃষ্টি হইল, বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার চলিল, যুদ্ধও চলিল, বৌদ্ধেরা হারিল, নির্ব্বাসিত হইয়া গেল।

পঞ্চোপাসকদিগের জয়, জয়ের পরেই জয়োল্লাস, আবার গৃহবিচ্ছেদ। উপপুরাণ কয়েকটি এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ ঐ বিবাদের পরিচায়ক। রাজাদিগের মধ্যেও বিবাদ। কাশী এবং কালঞ্জরে জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাওয়ে যে সকল যুদ্ধের কথা শুনা যায় তাহা ঐ অন্তর্বিচ্ছেদের দুই একটি শেষ শিখা মাত্র। অন্তর্ব্বিচ্ছেদে ও ভ্রষ্টাচারে তেজ হ্রাস হইল। মুসলমান আসিল, সকল আগুনই একেবারে নিবিল। স্বাধীনতা গেল, সাম্প্রদায়িক মতভেদের বিচার থামিল। আবার সম্মিলনের চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফল তন্ত্রশাস্ত্রের পুনর্ব্বার চর্চ্চা। *

তন্ত্রশাস্ত্রে ভেদজ্ঞানের বড়ই নিন্দা। কালী কৃষ্ণে, তারা রামে, বিষ্ণু

* বারভুঞাদের সময়ে কিয়ৎপরিমাণে তান্ত্রিক বীরাচারী প্রকৃত বীরপুরুষদিগের আবির্ভাব বাঙ্গালীর মধ্যেই হইয়াছিল। তান্ত্রিক শিক্ষায় তখন এই বাঙ্গালীকে কি করিয়াই তুলিয়াছিল।

শিবে ভেদ জ্ঞান করিলেই নিশ্চয় অধোগতি। রূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রভেদ কিছুই নয়—ওগুলি কেবল উপাসকেরই সুবিধার নিমিত্ত।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

তন্ত্রশাস্ত্র সমাজের পরাধীনতার সময়ে সমুৎপন্ন। পরাধীনতা দেশবাসীদিগের তেজস্বিতা থাকিতে সংঘটিত হয় না। অতএব তান্ত্রিক দীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য লোক সকলকে তেজস্বী করা। পরাধীন জাতির মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিবার যো থাকে না। মুখ ফুটিয়া বলিতে চাও বিজেতাদিগের মনের মত যাহা হয় বল, তাহাদিগের মনের মত যাহা না বলিবে তাহাতেই তাঁহারা রুষ্ট হইবেন। তন্ত্রশাস্ত্র বাহিরের চেঁচাচেঁচির মধ্যে না গিয়া, মনঃস্থির করিতে, গোপন সাধন করিতে শিক্ষা দেয়—হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান বাহির করে না। তন্ত্রশাস্ত্র একপ্রকার ফ্রিমেশনরি। বড় বড় অনেক সাহেব ফ্রিমেশন আছেন। তাঁহারা কি মন্দ লোক? কোন সময়ে ফ্রিমেশনরি দ্বারা পৃথিবীর কি অনেক উপকার হয় নাই? এখনও যে কি হইতেছে কি না হইতেছে কে বলিতে পারে? অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি ব্যর্থ কটূক্তি করিও না। তন্ত্রশাস্ত্র বই আর কোন শাস্ত্র শবসাধন শিখাইতে পারে না, মরাকে বাঁচাইতে পারে না।

বঙ্গ সমাজের বিবরণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিহার প্রদেশেই অতি প্রবল হইয়াছিল। বিহার বাঙ্গালার সন্নিহিত দেশ। অতএব বাঙ্গালাতেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধের প্রাদুর্ভাবে বেদ-বিদ্যার লোপ হইয়া যায়। কথিত আছে, গৌড়-রাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে "বেদবিদ্যাপারগ ব্রাহ্মণ" আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন।

আমি কান্যকুব্জ নগরেও এই বঙ্গকিম্বদন্তীর অনুরূপ কথা শুনিয়াছি এবং ঐ নগর হইতে অনধিক দূরে মিনেসরাই নামক

গ্রামে গিয়া দেখিয়াছি, সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ভরদ্বাজ গোত্র এবং শ্রীহর্ষের সন্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। বঙ্গকিম্বদন্তীর সহিত কান্যকুব্জ কিম্বদন্তীর বিশেষ এই, কনোজিয়ারা বলেন যে, রাজ সভায় ছয় জন প্রধান পণ্ডিত এবং কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার মধ্যে পাঁচ জন সসন্তান আর একজনের কোন সন্তান হয় নাই। যিনি নিরপত্য ছিলেন রাজা তাঁহাকে পাঠাইলেন না, অপর পাঁচ জনকে তাঁহাদের সন্তানগুলিকে দেশে রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, বঙ্গদেশে যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইয়া আছে, সে প্রথাটী বঙ্গ দেশেই জন্মে নাই। ইহার মূল কান্যকুব্জেই ছিল এবং অদ্যাপি আছে। রাজা বল্লাল সেন এই কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। তবে বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধন রাজা বল্লাল সেনের সময়েই হইয়াছিল, একথা সত্য।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গালায় আইসেন, তাহার মধ্যে যিনি শ্রীহর্ষ নামধারী তিনিই সুপ্রসিদ্ধ নৈষধচরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রণেতা। যদি তাহা হয় (না হইবার কোন কারণই দেখা যায় না) তবে উহাঁদিগের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রাবল্য হইয়াছিল বলিতে হয়। নৈষধে তান্ত্রিক শাস্ত্রানুমোদিত মন্ত্রগ্রহণের বিশিষ্ট ফলই কথিত আছে। শ্রীহর্ষ স্বয়ংই তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া আপনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "সেই চিন্তামণি মন্ত্র (ত্রিপুরা সুন্দরীর ত্র্যক্ষরী মন্ত্র) চিন্তন কালেই আমি এই কাব্য প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছি।"

তখন হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সমাজপতি ছিলেন। তখন শুদ্ধ নৈষধ বলিয়া নয়, বেণীসংহার, কাদম্বরী প্রভৃতি কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বিরচিত হইতেছিল। তখন বংশমর্য্যাদানুসারিণী কুলপ্রথাকে তাহার গুণ বর্ণনার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত। অমুকের সন্তান অতএব কুলীন শুদ্ধ একথা বলিতে হইত না। অমুকের সন্তান অতএব এই এই নবলক্ষণযুক্ত, অতএব কুলীন এরূপ বলা যাইতে পারিত। যেখানে বংশমর্য্যাদার গৌরব গুণগৌরবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে সে বড় ভাগ্যবান

দেশ। বঙ্গদেশ কিছুকাল এইরূপ ভাগ্যবান দেশই ছিল। কথিত আছে, ঐ সময়ে বাঙ্গালার রাজগণ সমুদায় গৌড়ভূমির উপর আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তখন এই বাঙ্গালীর মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যা নিপুণ সাহসিক বীর পুরুষদিগের অভাব ছিল না; কেনইবা থাকিবে? তখন তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত বীরাচার প্রবল ছিল।

তন্ত্রের ভ্রষ্টাচার প্রবল হইয়া সে অবস্থা গেল। বঙ্গদেশ মুসলমানের অধীন হইল। শাস্ত্রের লোপ হইল, আচার দূষিত হইল। পরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তান্ত্রিকাচারের দোষ ঘোষণ করিলেন কুতর্কের মস্তক ভগ্ন করিলেন। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সংবাদ প্রচারিত করিলেন; তাঁহার প্রেমময় সাম্যবাদ আবার সমুদায় দেশটীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। দেশ প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা গৌরবযুক্ত হইল; উহাতেও গ্রন্থাদি প্রণীত হইতে লাগিল আর সংস্কৃতে অতি রমণীয় কাব্য নাটক স্মৃত্যাদি প্রণীত হইল। তীর্থযাত্রা, কীর্ত্তন, মহোৎসব প্রভৃতির দ্বারা বৈষ্ণবদল দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও যেমন রামানুজ স্বামিকর্ত্তৃক বৈষ্ণবাচারের প্রচার আরম্ভ হইবামাত্র প্রাচীন আর্য্যদিগের আচার প্রণালী স্মার্ত্তাচার নামে অভ্যুত্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালাতেও তাহাই হইল। মহাপ্রভু যে সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, রঘুরাম শিরোমণিও সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইলেন। শিরোমণি সমুদায় পুরাণ এবং স্মৃতি হইতে অষ্টাদশ আচার কাণ্ড প্রস্তুত করিলেন এবং বঙ্গদেশে সেই পূর্ব্বাচরিত আচার সকল যাহা বৌদ্ধের প্রভাবে এবং তন্ত্রের প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল সেগুলিকে পুনর্ব্বার জাগরিত করিয়া তুলিলেন। সেই অবধি স্মার্ত্তাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং বৈষ্ণবাচারী বৈষ্ণবে পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল এবং উহাদিগের পরস্পরের প্রতিযোগিতায় দিন দিন আচারের আঁটাআঁটি বাড়িতে আরম্ভ হইল।

ইংরাজদিগের প্রথম আগমনের সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গ দেশে সমাজের পতি ছিলেন। তিনি স্মার্ত্তাচারের পক্ষ হইয়া বৈষ্ণবাচারকে

নিন্দনীয় করিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং দুই একটী নূতন পূজোৎসব বাহির করিয়া তান্ত্রিক মতের পোষণ করিলেন।

রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদকে সম্মিলিত করিবার জন্য সুন্দর কৌশলই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক চরম মতবাদও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উহাই দেশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তন্ত্রের প্রতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই। বেদান্ত দর্শন এবং উপনিষদের সহিত তন্ত্রের শিক্ষা অভিন্ন দেখিয়া তাহাদেরই দোহাই দিয়া সকল কথা কহিলেন। যদি তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মেরা তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ এবং সুদূরদর্শী হইতেন, আর জাতীয়ভাব সংরক্ষণের প্রকৃত উপায় সকল বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি যে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে স্খলিতপদ হইতেন না। রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পদ ত্যাগ করিয়া নব্য ব্রাহ্মেরা হতবীর্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাই করুন, ইংরাজী শিক্ষিত ভিন্ন অপর কোন লোকের উপর বড় কিছু করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু ক্রমশঃ স্বজাতির সহিত সহানুভূতি শূন্য হইয়া পড়িবেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পর শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাবই প্রধানতঃ উল্লেখ যোগ্য। ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দু মতবাদের শাস্ত্র সম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন "তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া" যদি প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্ব্বক রত হয়,তাহা হইলে আবার সমাজ মধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্ম্মঠ ও ধার্ম্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।

রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্র শাস্ত্র।

(১)

জীবনচরিত পাঠে যে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে অনেক স্থলেই জীবনচরিত গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতা দোষে সেই উপকারের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চরিতাখ্যান এই কথার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ সকল চরিতাখ্যানে প্রায়ই কিছু না কিছু অলৌকিক অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কোন্ বীজ হইতে কিরূপে কোন্ উচ্চ ভাব ঐ সংস্কারকদিগের মানসক্ষেত্রে প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, এবং কি কি সুযোগেই বা সেই ভাবের পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল তাহারও কোন প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। অমুক এত অল্প বয়সেই এই তথ্যটী অবগত হইয়াছিলেন এবং ঐ তথ্যের জ্ঞান সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পুরুষকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া এক্ষণে জাতি সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে, সকল ধর্ম্মসংস্কারকের জীবনচরিতই এই অদ্ভুত ভাবের ব্যঞ্জক।

বঙ্গদেশের আধুনিক ধর্ম্মসংস্কারক রাজা রামমোহনের চরিতেও কতক পরিমাণে অদ্ভুত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, "রামমোহন তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়সে একেশ্বর মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া আপন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কথাটী যে ভাবে লেখা তাহাতে বোধ হয় যেন রামমোহনের মনে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই জ্ঞানটি স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছিল, যেন তাঁহার পিতা রামমোহনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া একেবারে তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং পিতার তাদৃশ ক্রোধ হওয়াতেই রামমোহনকে দেশান্তরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ওরূপ কিছুই হয় নাই। একেশ্বরবাদটী এদেশে নূতন মতবাদ নয়, রামমোহনের পিতাও তেমন অজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না। রামমোহন নিজ

পিতার আদেশানুসারে ফারসী পড়িয়া গোঁড়া মৌলবীদিগের স্থানে সাধারণ হিন্দুশ্রাদ্ধাদিকে "পিশাচ পূজা" আখ্যায় নিন্দা করিতে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ৺কাশীধামে গিয়া শাস্ত্রোক্ত পুরশ্চরণও করিয়াছিলেন। তিনি মিশনরী সাজিয়া পরধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

ফলকথা, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রামমোহন রায় নিজে একটী নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিবেন এরূপ অভিমানে সম্বদ্ধ হয়েন নাই। কয়েক বৎসর গত হইল নগেন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার পুস্তিকায় স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তন্ত্র শাস্ত্র হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল পত্তন করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কার যে আজি কালিকার সংস্কারকদিগের ন্যায় কেবল মন্ত্র অনুকরণ বা স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, তাঁহার নিজের ইচ্ছা এবং কল্পনার উপর তিনি যে নির্ভর করেন নাই তাহা বিশেষ পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্য এই পত্রখানি লিখিলাম।

রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই জানিয়াছিলেন যে,

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২য় উল্লাস ৯ শ্লোক)

কলিতে আগম উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি অন্যপথপ্রবর্ত্তিত হন, তাঁহার গতি নাই; ইহা সত্য, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।

তিনি ইহাও জানিয়াছিলেন যে, আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই সকল তন্ত্রের সারাৎসার।

যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথাশশী।
ভাস্বান্ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা॥
সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪ উল্লাস ২০১, ২০৯, ২১০ শ্লোক)

পর্ব্বতের মধ্যে হিমাচল যেরূপ, তারকামণ্ডলীর মধ্যে শশী এবং তেজঃ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য যেরূপ, তন্ত্রসমূহের মধ্যে এই তন্ত্ররাজ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও সেইরূপ। তন্ত্র অনেক এবং শাস্ত্রও অনেক আছে সত্য, কিন্তু কেহই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্যও হইতে পারে না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমায় (শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন) আর কি বলিব, এই মহাতন্ত্রে জ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই সকল সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া রামমোহন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদীয় বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় মতবাদ সমস্ত জানিতেন, কিন্তু সে সকল জানিয়াও তান্ত্রিক মতবাদ এইদেশে এবং এই কালে স্বতঃ উদ্ভূত সুতরাং উহাই এই দেশের এবং এই কালের উপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহার বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

রামমোহন রায় দেখিয়াছিলেন যে, তন্ত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং পবিত্র যথা।—

আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনং।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করং॥
যেন লোকাঃ ভবিষ্যন্তি মহাবল পরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তা পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করা॥
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতা গুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্ম বিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ।
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১ম উল্লাস ৭০, ৭৩ শ্লোক)

যদ্দ্বারা মনুষ্যের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, শুভ অনায়াস লভ্য হইয়া পড়ে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্রম, শুদ্ধচিত্ত, পরহিতে রত, পিতামাতার প্রিয়কর, স্বপত্নীনিরত, পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ, দেবতা ও গুরুতে ভক্তিসম্পন্ন, পুত্র ও স্বজনগণের পোষক এবং

ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মচিন্তনে রত হয়, মনুষ্যের লোকযাত্রানির্ব্বাহের এবং পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত আপনি তাহাই বলুন।

উল্লিখিত বিষয়গুলিই বঙ্গদেশের প্রয়োজন, অতএব সেই সকল প্রয়োজন সাধনোপযোগী যে ধর্ম্মপ্রণালী রামমোহন রায় তাহাই অবলম্বন করিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত স্তবাদি লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইল।

(২)

ঐ তন্ত্রের তৃতীয়োল্লাসে উক্ত পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্রটী ব্রাহ্মসভার স্তব বলিয়া এক্ষণে প্রসিদ্ধ।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাং।
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্তিতত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ।
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।

মদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৩য় উল্লাস ৫৯,৬৩)

অর্থাৎ তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি চিৎস্বরূপ, অদ্বৈততত্ত্ব ও মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই একমাত্র জীবের আশ্রয়, তোমার ন্যায় বরণীয় আর কেহ নাই, তুমিই একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ, তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ-কর্ত্তা, তুমি একমাত্র পরমপুরুষ, তুমি নিশ্চল ও কল্পনাশূন্য, তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণের-ভীষণ, প্রাণিগণের একমাত্র গতি, পবিত্রতা বিধায়কেরও পবিত্রতার সাধন। তুমি মহান্ উচ্চপদস্থগণের (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির) নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, রক্ষকের রক্ষক। হে পরেশ, হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপ কিন্তু অপ্রকাশী, তুমি অবিনাশী অনির্দ্দেশ্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। হে সত্য, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষয়, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ততত্ত্ব, হে জগদ্ভাসক চন্দ্র সূর্য্যাদির অধীশ্বর, (অথবা হে জগতের দীপ্তিস্বরূপ, অধীশ), তুমি আমাদিগকে ভক্তি বুদ্ধ্যাদির বিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি, সেই এক জগৎ সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম করি। সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের নিধান, স্বয়ং আশ্রয়শূন্য, সেই তুমি ঈশ্বর ভবসমুদ্রের পোতস্বরূপ ; আমরা তোমার শরণ লইলাম।

ঐ তৃতীয়োল্লাসের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতেই যে রামমোহনের পূজার প্রণালী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্ব্রহ্মসাধনম্ ॥
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ।

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৭৭-৮)

অর্থাৎ পরমব্রহ্মের পূজায় আবাহন বিসর্জ্জন নাই। সকল সময়ে এবং

সকল স্থানে ব্রহ্মসাধন হইতে পারে। স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক, ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, নির্ম্মলচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা করিবে।

ভক্ষ্য পেয়াদি বিচার সম্বন্ধে যেরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরিশূন্য নহে। তৃতীয়োল্লাসে লিখিত আছে—

গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে।
পক্কং বাপি ন পক্কং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ॥
যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৮০, ৮১, ৯১)

অর্থাৎ গঙ্গাজলে বা শালগ্রাম শিলাদিতে অর্পিত দ্রব্যের স্পর্শদোষ থাকিতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্মার্পিত দ্রব্যে স্পর্শদোষ হয় না। যে কোন দ্রব্য পক্কই হউক, আর অপক্কই হউক, "ব্রহ্মার্পণ মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মসাৎ" করিয়া সাধক ব্যক্তি স্বজনগণের সহিত তাহা ভক্ষণ করিবেন। নীচজাতীয় লোকের অন্ন যদি ব্রহ্ম সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে রামমোহন রায় যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তাহারও মূল ঐ তৃতীয়োল্লাসে যথা—

কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিং
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধি স্মৃতঃ॥
কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিল্বিষং
নবিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ॥
অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥
মাৎসর্য্যহীনো দম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ॥

ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্নপরানিষ্টচিন্তনং
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৩য় উল্লাস ৯৭ ১০২)

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহার বৈদিকাচারই বা কি আর তান্ত্রিকাচারই বা কি? তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধিস্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোন ফল হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। হে মহেশ্বরি! সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকার নিরত, নির্ব্বিকার, সদাশয় হইয়া এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য্যহীন, দম্ভরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধহৃদয়, মাতা পিতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবনে তৎপর হইবেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যশ্রবণ করিবেন, ব্রহ্ম চিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিবেন। সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ" ইহা ভাবনা করিবেন, কখন মিথ্যা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না, বা পরস্ত্রী গমন করিবেন না।

এই সকল প্রমাণ প্রদর্শনের পরিশেষে দুইটী কথা বক্তব্য। একটী কথা এই যে, রামমোহন রায় কোন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই,করিতে চাহেন নাই। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মেরই অন্তর্নিবিষ্ট। উহাকে একটী নূতন ধর্ম্ম বলিয়া অকারণে উহার প্রকৃত ভাবের অপহ্নব করায় দোষ বই গুণ হইতেছে না। "আমরা তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মপদ্ধতির অনুসরণ করি" ব্রাহ্মগণ একথা স্বীকার করেন না কেন?

তন্ত্রের ত্রুটি না ত্রুটি নয়?

তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা যথাযোগ্য গুরুর দ্বারা হইলে শরীরসাধন বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা সম্পাদন এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অসীম বলবত্তা সাধন হয়। পক্ষান্তরে যথাযোগ্য গুরুর অভাবে তন্ত্রের শিক্ষায় বিবিধপ্রকার দোষের সংঘটন

হইয়া থাকে। শরীর বিকৃত, বা পীড়াগ্রস্ত হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং পরিষ্কৃত না হইয়া অসম্ভব প্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া বিকৃত হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দৃঢ়তর না হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে ব্যাঘাত জন্মে এবং কার্য্যাকার্য্য বিচার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকানেক তান্ত্রিককে এক প্রকার উন্মাদ-গ্রস্ত বলিলেও চলে। তাঁহারা মুখে 'শৈবোহং' 'শিবোহং' বলেন, অভেদ মুক্তির শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং মদ্য পানাদি বিবিধ দোষে বিলিপ্ত হইয়া পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করেন।

তন্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞান এবং তদনুযায়ী শিক্ষা ও অভ্যাস না হইবার এই সব ফল। কিন্তু তন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী শিক্ষা এবং অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেও যেন একটী প্রধান বিষয়ে ত্রুটি থাকিয়া যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে।

সহজেই মনে হইতে পারে,—"তন্ত্রশাস্ত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভের পথ দেখাইয়া দেন, কিন্তু জাতিগত উৎকর্ষলাভের কোন পথ নির্দ্দেশ করেন না। তান্ত্রিক সাধক বীরপুরুষ বুদ্ধিমান পুরুষ এবং ধর্ম্মশীল পুরুষ হইতে পারেন। প্রকৃতরূপে তান্ত্রিক সাধন করিলে মনুষ্যকে অবশ্যই তাদৃশ পুরুষ হইতে হইবে। কিন্তু সমাজের উন্নতির পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র হইতে কোন পাকা উপদেশ পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্র মৌনী হইতে, চিন্তাশীল হইতে, মন্ত্রগুপ্তি করিতে, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখাইবেন, কিন্তু বাগ্মী হইতে, অন্যকে আপনার পক্ষে আনিতে, নিজ মন্ত্রে অন্যকে দীক্ষিত করিতে দলবন্ধন করিতে শিখাইবেন না। তন্ত্র সমাজবন্ধন শিথিল করিতে পারিবেন, খাদ্যাখাদ্য বিচারে খুঁটিনাটির বাড়াবাড়ির রহিত করিতে পারিবেন, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইতে পারিবেন, অভেদ জ্ঞান বিস্তৃত এবং বদ্ধমূল করিয়া প্রণয়স্রোত বর্দ্ধমান করিতে পারিবেন, কিন্তু জাতীয় ভাব জন্মাইতে পারিবেন না।"

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র যে অপর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা অধুনাতন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তন্ত্রশাস্ত্র যে বৌদ্ধবাদ প্রবর্ত্তনের অনেক পরবর্ত্তী তাহাও নিঃসন্দেহ। তন্ত্রশাস্ত্র যে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের পরে প্রবল হইয়াছে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় সমুদ্ভূত হইয়াও

তন্ত্রশাস্ত্রে জাতীয় ভাবের সুস্পষ্ট সমুদ্রেক দৃষ্ট হয় না কেন? ও ভাবটী ত ভারতবর্ষ দেশের অনুপযোগী ভাব নয়!—ঐ ভাবের যে চিহ্ন সকল আজি কালি দেখা দিতেছে সেগুলি ত শুদ্ধ বিদেশীয় ভাবের অনুকৃতি মাত্র নয়!

সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তন্ত্রে জাতীয় ভাব উত্তেজনার তেমন কোন চিহ্ন না থাকিলেও উহার অনুযায়ী শিক্ষা অনেকাংশে বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্যই উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। অতএব জাতীয় ভাব বৃদ্ধির নিমিত্ত সাক্ষাৎ কোন চেষ্টা না করিয়া তন্ত্রের প্রদর্শিত পথে বিনা আস্ফালনে এবং বিনা আড়ম্বরে অল্পে অল্পে পাদ সঞ্চারণ করিয়া দেখিলে হয় যে ফল কি হয়। শরীর শক্ত এবং দৃঢ় কর, বুদ্ধি প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান করুক, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবান হইয়া উঠুক। ঢাক বাজান ছাড়, মৌনাবলম্বন শিক্ষা কর, আর তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক "গুরু" স্বীকার করিয়া গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে ভক্তি করিতে এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আরম্ভ কর। কিছুতেই "গুরু" ত্যাগী না হইয়া দেখ—কি হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

—∘()∘—

তন্ত্রের কথা।

(১)

গুরু।

তন্ত্রশাস্ত্রে "গুরু" শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। "গ" অক্ষর "সর্ব্বসিদ্ধি", "র" অক্ষর "পাপধ্বংস" এবং "উ" অক্ষর "শিব" বুঝায়। অতএব "গুরু" শব্দের তাৎপর্য্য সিদ্ধিদাতা এবং পাপধ্বংসকারী শিব। তন্ত্রের মতে শিবই প্রকৃত গুরু। শিবের অধিষ্ঠান সর্ব্বত্র। তিনি জগদ্ব্যাপক ও জগন্ময়। পক্ষান্তরে এই নরদেহটীও সমুদয় জগন্মণ্ডলের প্রতিরূপস্বরূপ। সুতরাং নরদেহেও সর্ব্বময় শিবের অধিষ্ঠান। তন্ত্রশাস্ত্রে এই দেহের একটি স্থল শিবের বিশেষরূপে অধিষ্ঠানভূত বলিয়া চিন্তা করিবার আদেশ আছে। স্থানটি দ্বিদল অক্ষিদ্বয়সম্ভূত একটি কল্পিত পদ্ম, অর্থাৎ মস্তিষ্কের পুরোভাগ। বিশিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইলে ঐ স্থলেরই স্নায়ুমণ্ডল সমধিক পরিচালিত হয়। চিন্তাকারীর সেই ভাগের পেশীগুলিও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহা সকলেই দেখিতে পায়। তাদৃশ চিন্তা করিতে থাকিলে শিরোদেশের ঐ ভাগের ক্লান্তির অনুভব হয়। অতএব ঐটি যে বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠানস্থল তাহা ভূয়োদর্শন ও অভিনিবেশ দ্বারা সহজেই সকলের অনুভূত হইয়া থাকে। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ব্যবচ্ছেদবিদ্যার প্রয়োগ এবং পরীক্ষাবিধান দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মস্তিষ্কের পুরোভাগের দ্বারাই বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য সমুদয় সাক্ষাৎরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব প্রাচীন আর্য্যপণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের বর্ণনা প্রণালীর অনুসারে মস্তিষ্কের যে অংশটিকে শিবের অধিষ্ঠিত বলিয়াছেন, তাহাই যে নব্যবিজ্ঞান অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যস্থল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অতএব পরমগুরু শিবের যে প্রকার অধিষ্ঠানস্থল

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরমগুরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বাবলম্বন একই কথা। গুরু সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য এই। এই তথ্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলেরই স্বীকৃত হইয়া আছে। কিন্তু তথ্যের আবিষ্কার বা জ্ঞানলাভ হইলেই ফল হয় না। মানুষকে কাজ করিতে হয়। এই জন্য কোন তথ্যের আবিষ্কার হইলে তাহা কিরূপে কাজে লাগিবে তাহা বুঝিবার এবং তাহা বুঝিয়া কাজ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠানপ্রণালী জন্মে। অনুষ্ঠানপ্রণালী কতক স্বত উদ্ভূত আর কতক শাস্ত্রের উপদিষ্ট। গুরু সম্বন্ধীয় তথ্যের স্বত উদ্ভূত অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট অনুষ্ঠান যেরূপ যেরূপ হয় তাহার স্থূল স্থূল কথা পরে বলা যাইবে।

---

(২)

সাধন প্রকরণ।

সাধন প্রকরণ অতি বিস্তৃত ব্যাপার। কিন্তু সকল প্রকার সাধনের উদ্দেশ্য রিপু দমন এবং ইচ্ছাবৃত্তির বলবৃদ্ধি। রিপুদিগের মধ্যে ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধ অতি প্রবল। উহাদিগের সমক্ষে বুদ্ধি কার্য্যকারিণী হয় না এবং ইচ্ছা অন্যবিধ থাকিলেও রিপুদিগের প্রভাববশতঃ কলুষিত হইয়া বিপথগামিনী হয়। কিন্তু যে চারিটী রিপুর উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে ক্রোধ ভয়ের এবং লোভ কামের অঙ্গ। লোভ এবং ক্রোধ ইহারা সাধারণতঃ কার্য্যের উত্তেজক, কার্য্যের নিবারক নহে। ভয়টী কার্য্যের ব্যাঘাতক।

তন্ত্র মতে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি—এই তিনের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি সকলের প্রধানা। তন্ত্রশাস্ত্র ক্রিয়ার লোপ করিতে চায় না। এই জন্য কাম, ক্রোধ এবং লোভ জয়ের অপেক্ষা ভয়ের জয়কেই বিশেষরূপে অভ্যস্ত করিতে বলে। 'নিঃশঙ্ক' 'নির্ভীক' 'ভয়হর' এবম্বিধ শব্দ তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বস্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'ভয়' বিনাশের উপায় বীরসাধনের অন্তর্ভুক্ত। বীরসাধন প্রধানতঃ (১) শবসাধন (২) চিতাসাধন (৩) পঞ্চমুণ্ডী সাধন। এই সকল সাধনই মহানিশায়

জনশূন্যস্থানে একাকী মৃতদেহ বা সাক্ষাৎ মৃত্যুসূচক পদার্থসংস্থ হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। সকল ভয়েরই মূল মৃত্যুভয়। সংসর্গে সকল ভয়েরই লাঘব হয়। বীরসাধনে মৃত্যুর সহিত পুনঃ পুনঃ সম্যক্ সংসর্গ হওয়াতে এই সাধনের দ্বারা মৃত্যুভয় লঘু হইয়া আইসে। বীরসাধনের মূল তাৎপর্য্য এই। পুস্তকে বীরসাধনের অনেক ফলশ্রুতি আছে। কিন্তু গুরূপদেশের অভাবে ঐ সকল অর্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য আর বোধগম্য হয় না এবং ব্যাপারটী কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু তাহা হইলেও আমি স্বচক্ষে বীরসাধনকারী কয়েকজনকে দেখিয়াছি—তাঁহাদিগের মধ্যে একজন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় ফলশ্রুতি হইতেই ইহাঁর বীরসাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অপর সকলকেই নির্ভীক নিঃশঙ্কহৃদয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাঁরা রাত্রি-কালে একাকী সর্ব্বস্থলে যাইতে পারিতেন; নৌকারোহণে যাইতে যাইতে প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিচল-চিত্ত হইতেন না; অতি প্রিয়তম কাহার পীড়া হইলেও হাত পা হারার ন্যায় উদ্বেগে বিহ্বল হইতেন না। এ গুলি তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত বীরসাধনেরই অবশ্যম্ভাবি শুভ ফল বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়া আছে। ঐ সকল ব্যক্তির ক্রোধও তাঁহাদিগের অনায়ত্ত ছিল না, তাঁহারা মনে করিলেই ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিতেন, তখনই ক্রোধের দমন করিতে পারিতেন। কামজয়ের ব্যবস্থাও তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহাকে লতাসাধন বলে। লতা-সাধনের প্রকৃত পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে অনেক প্রকার অযথাচার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গুরুসন্নিধানে উপদেশলাভ করিয়া যাঁহারা এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে সত্য সত্যই কামজয় করিয়া "অমরহরসমান ক্ষিতিতলে" হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। যেমন মৃত্যুসংসর্গে মৃত্যুভয়ের জয়ের বিধান, তেমনি কামিনী সংসর্গেই কামজয়ের বিধান সৃষ্ট হইয়াছে।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কয়েকব্যক্তি কোন মহাপীঠে মন্ত্র জপ করিতেছেন, এমত সময়ে একটা পর্ব্বের উপলক্ষে অনেক স্ত্রীলোক সেই

পীঠস্থলে সমাগত হইল। তাহারা স্থানাভাবে ক্রমে ক্রমে ঐ জপকারী-দিগের সমক্ষে তাহাদের শরীরে ঠেস দিয়া বসিল—হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল—কিন্তু তদ্দ্বারা জপকারীদিগের জপের কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল বোধ হইল না। আমার বোধ হইল ইহাঁরা লতাসাধনে সিদ্ধ হইয়া-ছিলেন,এবং সেই জন্যই তাদৃশ বিকারের হেতুসত্ত্বেও ইহাঁদের চিত্তবিকার জন্মে নাই।

---

(৩)

আসন।

"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।"

তান্ত্রিকদিগের অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্যই পূজার বহির্ভূত নয়। পূজা ভিন্ন তাঁহারা কোন কাজই করেন না। তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে শরীরই অভীষ্ট দেবতার মন্দির। সুতরাং এই মন্দির দৃঢ় শুচি এবং যথাযথ রাখিবার জন্য যে যত্ন করা তাহা পূজারই অঙ্গ। ঠাকুরের ঘর ঝাঁট্‌পাট্‌ দেওয়া, তাহা ধোয়া মাজা, তাহার উচিতরূপ সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম—না করিলে প্রত্যবায় আছে। 'আসন' এই সকল কার্য্যের মুখভাগ। 'আসন' করা না হইলে সামান্য বাহ্যপূজাতেও অধিকার জন্মে না। স্নানাদি যে সকল অপর আদ্যকৃত্য আছে, তাহার কোন না কোন অনুকল্প হইতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন দিন কোন কারণে জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে না পার, মন্ত্রবিশে-ষের দ্বারা কথঞ্চিৎ সে কাজ চলিতে পারে। কিন্তু 'আসন' না করিলে কোনরূপেই চলে না। আসনের পরিবর্ত্তে মন্ত্রাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রে যে কি জন্য 'আসনের' কোন অনুকল্প নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—তাহা আসনের প্রকৃতি বুঝিলেই অতি সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। 'আসন' প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যায়াম মাত্র। শারীরিক ব্যায়ামে মাংসপেশী সমস্তের দৃঢ়তা এবং পটুতা সাধন হয়; তন্ত্রশাস্ত্রের আসন প্রকরণে অবিকল সেই

ফলই ফলে। যিনি বেদিয়াদিগের বা ইংরাজী সার্কাসের বাজী দেখিয়াছেন, তিনি যদি তন্ত্রশাস্ত্র শুনেন, তবে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে, 'বীরাসন' 'বদ্ধ পদ্মাসন' ময়ূরাসন' 'বৃক্ষাসন' 'গরুড়াসন' প্রভৃতি আসন সমস্ত ব্যায়ামকার্য্যেরই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। তিনি জানিতে পারিবেন যে, 'বীরাসন' 'পদ্মাসন' এবং 'গরুড়াসন' বেদিয়াদিগের 'নোটন্-পায়রা' খেলার এবং ইংরাজদিগের "বল অব্ রবর" হওয়ার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার। 'বৃক্ষাসন'ও বেদিয়াদিগের দ্বারা এবং সারকসের অনেক বাজীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐ আসনে মাথা ভূমিতে রাখিয়া ঋজুভাবে পদদ্বয় ঊর্দ্ধে রাখিতে হয়—কখন কখন মাথাও ভূমি হইতে উন্নত করিয়া দুই হাতের উপর মাত্র ভর দিয়া পা উচ্চ করিয়া থাকিতে হয়!

পাঠক এক্ষণে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, কি জন্য 'আসনের' অনুকল্প হয় না। 'আসন' ব্যাপারটী 'কুস্তি'। কুস্তির বদল কিছুতেই হইবার যো নাই। তবে আতুর অক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই নিষিদ্ধ মাত্র। তান্ত্রিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন যে, 'আসন'গুলি উদ্ভিদ্ পশ্বাদির অনুরূপতা বই ত নয়—জ্ঞানময় মন্ত্র তাহাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর। উচ্চতর পদার্থ অধস্তন পদার্থের অনুকল্প বা প্রতিভূ হইতে পারে না। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য শরীরে খনিজ, উদ্ভিদ এবং পাশব প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম নিহিত আছে। ঐ সকল ধর্ম্ম সেই শরীরের ভিত্তিমূল; এবং সেই ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাসাধন এবং সংস্করণই 'আসন' প্রকরণের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহা ঊর্দ্ধতন মনুষ্য প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত কোন জ্ঞানময় ব্যাপারের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। বাটীর বুনিয়াদ বা একতালার মেরামত উপরের দু-তালার বা তে-তালার কোনরূপ মেরামতে নির্ব্বাহ হয় না।

আসন সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম আছে। সে নিয়ম এই যে, একই প্রকার আসনে চিরকাল চলে না। একটী আসন অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর একটী করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলগুলি করিতে হয়। আসন প্রকরণে যে এ প্রকার নিয়মের প্রয়োজন, তাহার কারণ বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শরীরস্থ সকল পেশীরই দৃঢ়তা সাধন চাই। এক

প্রকার আসনে কতকগুলি অঙ্গেরই পেশী দৃঢ় হইল, সুতরাং অপর পেশীর ব্যায়ামসাধনের নিমিত্ত আসনান্তর আবশ্যক।

আর একটী ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আসন করিতে হয়। 'পদ্মাসন' প্রাতে 'ময়ূরাসন' 'গরুড়াসন' সায়াহ্নে, 'বৃক্ষাসন' মহানিশায়। এরূপ ব্যবস্থার কারণ প্রধানতঃ এই বুঝা যায় যে, কোন আসন অর্থাৎ 'ব্যায়াম' শিক্ষিত হইয়া গেলে তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলে না—চিরকালই সকল প্রকার ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিতে হয়। যেমন কুস্তিতে 'ওঠ বইস্' 'ডন' 'মুগুরভাঁজা' প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া শিখা উচিত এবং সকলগুলিরই চর্চ্চা রাখা আবশ্যক, 'আসন'কাণ্ডেও তাহাই। কিন্তু যদি সকল প্রকার আসনেরই অভ্যাস রাখা উল্লিখিত নিয়মের প্রকৃত তাৎপর্য্য হয়, তবে দূরতর করিয়া তাহাদিগের সময় ভেদ করিবার প্রয়োজন কি? উপর্য্যুপরি প্রাতে সায়াহ্নে এবং মধ্যরাত্রিতে সকল প্রকার আসনই করিতে হইবে এই বিধি করিলেই ত হইত। এই কোটির সিদ্ধান্ত তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। শিক্ষা গ্রহণ করাইতে হইলে অভ্যাস করাইতে হয়। অভ্যাসের নিমিত্ত কালাত্যয় আবশ্যক। কোন অভ্যাসকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিতে হইলে তাহার সত্বর পরিবর্ত্তনে অনেক প্রকার দোষ জন্মিয়া যায়।

---

(৪)

মুদ্রা।

যে মূল কারণ হইতে জীবদেহের কোন বিশেষ সৌষ্ঠব জন্মে সেই সৌষ্ঠবের সম্বর্দ্ধন এবং কার্য্যকারিতার অভ্যাসে সেই মূল কারণেরও প্রাবল্য দর্শে। এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত জপপ্রণালীতে কর ধরিবার ব্যবস্থা যে কি জন্য হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যদেহ যে যে লক্ষণে অপরাপর জীবদেহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যে অপর সকল অঙ্গুলির সর্ব্বস্থান স্পর্শ করিতে পারে এই লক্ষণটী অতি প্রধান। উহাই শিল্পপ্রণালীর

নিদানভূত। শিল্পকার্য্য বাহ্যপূজার প্রকারভেদ মাত্র। বিশেষ বিশেষ শিল্পকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির বিশেষ বিশেষ সমাবেশ হয়। 'কর ধরিয়া' জপ করিতে গেলে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুল্যাদির সম্যক্ সমাবেশ হইয়া থাকে।

কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নয়। কর ধরিয়া জপ করিবার সময় শরীর উন্নত এবং ঋজু রাখিবার বিধি আছে। শরীর উন্নত এবং ঋজুভাবে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম্ম, অন্য কোন জীবের নয়। এই বিধিরও উদ্দেশ্য শরীরের সেই ভাবের অভ্যাস এবং সম্বর্দ্ধন—যে ভাব বহু জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য শরীরেই বর্ত্তিয়া গিয়াছে। কি কি গুণের প্রাদুর্ভাবে মনুষ্যশরীরের ঐ ঋজু এবং উন্নতভাব জন্মিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে দেহে ঐ ভাবের সম্বর্দ্ধন হয়, সেই দেহে ঐ সকল গুণ বজায় থাকিবে, এবং তাহাদিগের আধিক্য জন্মিবে ইহা সংস্কৃত শিক্ষা-শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ কথা।

ইংরাজীশাস্ত্রজ্ঞ যুবাদিগকে এই সূত্রটী বুঝাইবার নিমিত্ত এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কোমত্ তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দয়াবৃত্তির উত্তেজন এবং পোষণার্থে দরিদ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, তাহারা প্রত্যহ 'উপুড়-হস্ত' করিবার মুদ্রাটী অভ্যাস করে; অর্থাৎ যেন কিছু হাতে করিয়া লইয়া কাহাকে কিছু দিতেছে এইরূপ শরীরভঙ্গী করে। কোমত্ বলেন যে, ঐ মুদ্রার প্রয়োগে মাংসপেশী-দিগের এবং তৎসহ স্নায়ুসমষ্টির তথাবৎ সঞ্চালন হইয়া মস্তিষ্কে দয়াবৃত্তির উত্তেজন করিয়া দেয়। অতএব কোমত্ জানিতেন যে দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুদিগের যেরূপে উত্তেজিত করে এবং সেই স্নায়ুরা মাংসপেশীদিগকে উত্তেজিত করিয়া যে প্রকারে কার্য্য করায় সেই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ তথাবৎ মাংসপেশীর সঞ্চালন হইলে স্নায়ুদিগেরও সঞ্চালন হইয়া মস্তিষ্কে দয়াবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিতে পারে।

অতএব "ঋজু এবং উন্নতভাবে শরীর রাখিয়া কর ধরিয়া জপ করা" নিতান্ত অল্প শিক্ষা নহে। উহা দ্বারা মনুষ্যদেহের প্রকৃতভাব রক্ষা

হওয়াতে সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের সম্বর্দ্ধন হয় এবং শিল্পকার্য্যের অভ্যাসে মনুষ্যত্বের যে ভাগ লাগে তাহারও বিশিষ্টরূপ উত্তেজন হয়।

এই পর্য্যন্ত স্থির হইলেই তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির মধ্যে যে 'মুদ্রা' প্রকরণ বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে,তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অঙ্গভঙ্গীমাত্র বলিয়া বোধ হইবে না। প্রত্যুত বাহ্যপূজার মুদ্রা প্রয়োগের অবশ্য প্রয়োজনীয়তাই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। মুদ্রা অনেক প্রকার। সে সকলের নাম প্রকৃতি এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য এবং গুরুমুখে শ্রোতব্য। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রচলিত 'মুদ্রা' গুলির অধিকাংশই অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলিদিগের বিশেষ বিশেষ বিন্যাস; এবং অপ্রচলিত অনেকগুলি যাহাতে অপরাপর অঙ্গের বিভিন্নরূপ বিন্যাসের প্রয়োজন হয়, সেগুলি 'আসন' প্রকরণের অন্তর্ভূত।

আর একটী কথা বলিলেই এই প্রকরণের শেষ হয়। মুদ্রা প্রয়োগের অভ্যাস দৃঢ় হইলে পীড়া অল্প হয়, প্রায়ই হয় না এবং যদি হয় তাহার উপশম অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। তন্ত্রশাস্ত্রের এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন প্রকৃত যুক্তি দেখা যায় না। প্রত্যুত, শুনা যাইতেছে আজি কালি ইউরোপখণ্ডের মধ্যেও এইরূপ একটী মতবাদ প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে, কোন কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি প্রভৃতি সকল প্রকার প্যাথির অপেক্ষা এই ব্যবস্থাই উৎকৃষ্টতর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন রোগ বিশেষে শরীরের বিশেষরূপ সংস্থান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষরূপ সঞ্চালন করিলে রোগের আশু প্রতীকার হইয়া থাকে, ঔষধাদি সেবনের প্রয়োজন হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রও সাধকদিগের পক্ষে অবিকল তাহাই বলিয়াছেন এবং যাহারা আসন মুদ্রাদি সাধন করে না কেবল তাহাদিগেরই নিমিত্ত ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন।

(৫)

হঠযোগ।

যোগ বলিলে একটি অতি উচ্চ ভাবই বুঝায়,—সর্ব্বময় ঈশ্বরের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার সম্মিলনসাধন বুঝায়। কিন্তু এই বাহ্যপূজা প্রকরণে সে 'সমাধিযোগের' কোন কথা বলা হইতেছে না। সে যোগের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী যে শরীর-সাধন ব্যাপারকে কোন কোন স্থলে 'যোগ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, সেই 'হঠযোগের' কথাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট সংযম ও মনোযোগ ও যত্নসাপেক্ষ। 'হঠযোগ' অতি অসামান্য বস্তু। আমার বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে এই বিষয়ের প্রকৃতভাব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। ভাবটী এই;—"যেমন ব্যায়ামচর্চ্চা অর্থাৎ আসনাদিদ্বারা শরীরের বাহ্যপেশী সমস্তকে দৃঢ় এবং সবল করিতে হয়, সেইরূপ অন্তস্ত্বক্ এবং পেশীসমস্তকে দৃঢ় এবং সবল করা উচিত এবং তাহা করা যাইতে পারে।" বাস্তবিক অন্তস্ত্বক এবং পেশীদিগের ব্যায়াম সাধনের নামই 'হঠযোগ'। 'হঠযোগ' অনেক প্রকার। তন্মধ্যে 'নেতী' 'ধৌতী' এবং 'বস্তী'র নাম অনেকে শুনিয়াছেন, এবং কেহ কেহ উহাদিগের অনুষ্ঠানও স্ব স্ব চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। 'নেতী'র অনুষ্ঠান নাসিকা দ্বারা জলশোষণ করিয়া সেই জল মুখবিবর দ্বারা নির্গত করা। 'ধৌতী'র অনুষ্ঠান জলপান করিয়া তাহা উদর হইতে পুনর্ব্বার উদ্গীর্ণ করা। 'বস্তী'র অনুষ্ঠান জলের উপর বসিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া জল তুলিয়া লইয়া ক্ষণকাল বিলম্বে সেই জল ঐ দ্বার দিয়া পরিত্যাগ করা। এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠানই লোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এক্ষণে 'নেতী' ধৌতী' করিতে জানেন যদিও এমন লোক দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায়—"বস্তী" করিতে পারেন এমত ব্যক্তি নিতান্তই বিরল। যাহাঁরা এই ত্রিবিধ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরভাগ প্রত্যহ সুচারুরূপে ধৌত করিয়া ফেলিতে পারিবেন, তাঁহারা যে অবশ্যই শ্লেষ্মা, অজীর্ণ এবং উদরাময়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবেন,সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু 'হঠযোগ' ঐ ত্রিবিধ অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত নহে। হঠযোগ মনুষ্য শরীরের যাবতীয় অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করিতে চায়। ইংরাজীবিজ্ঞানশিক্ষিত সকলেই জানেন যে, শরীরে দুই প্রকার পেশী আছে। এক প্রকার পেশী জীবের ইচ্ছাধীন হইয়া কার্য করে—যেমন হাতের পায়ের চক্ষুর এবং অন্যান্য অঙ্গের পেশী। আর এক প্রকার পেশী ইচ্ছার অধীন নহে; ইচ্ছা না করিলেও তাহারা আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, যেমন হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্‌ফুসের পেশী; অথবা ইচ্ছা করিলেও কোন কাজ করে না, যেমন কাণের পাতার পেশী। হঠযোগ ঐ সকল অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত যত্ন করে। "এ কার্য্য অস্বাভাবিক—এ কার্য্য অসাধ্য' যদি এরূপ বলিয়া কেহ নিবৃত্তি করিতে যান হঠযোগ সে কথা শুনে না —বলে, 'কি স্বাভাবিক আর কি অস্বাভাবিক তাহার কোন ঠিকানাই নাই; যতক্ষণ যাহা না হয়, ততক্ষণই তাহা অস্বাভাবিক—একবার হইয়া উঠিলে আর তাহা অস্বাভাবিক থাকে না।" যদি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের স্বাদগ্রাহী কেহ বলেন যে, "ঐচ্ছিক পেশীগুলিতে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহা ঊর্দ্ধভাগে বৃহন্মস্তিষ্কে পরিণত সুতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত, আর অনৈচ্ছিক পেশী নিহিত স্নায়ুগুলির মূল পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কে, সেখানে ইচ্ছাবৃত্তির কার্য্যকারিতা নাই"—হঠযোগ এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতিও দৃক্‌পাত করে না। বলে, "অনৈচ্ছিক পেশীর স্নায়ু দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কে যাইবার পূর্ব্বে বৃহন্মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া যায় তবে কেন ইচ্ছাবৃত্তির বশে আসিবে না?—চেষ্টা করিতে করিতে নূতন স্নায়ুরও সৃষ্টি হইতে পারে; এই জন্মেই না হউক, জন্মান্তরেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে,—পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় কতক ফল অবশ্যই পাওয়া যাইবে—কিন্তু চেষ্টা না করিলে ত কখনই হইবে না।" এই সুদৃঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া হঠযোগ হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্‌ফুসের অনৈচ্ছিক পেশীকে ঐচ্ছিক পেশী করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পায়। এই প্রয়াসের নাম 'প্রাণায়াম' 'কুম্ভক' 'সমাধি'। এই অধ্যবসায়ের প্রতি নির্ভর করিয়া 'হঠযোগ' পদ্মাদি সাধন ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হয়। বলে, "মনুষ্যশরীরে

পশ্বাদি শরীরের অনেকানেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে—পশুদিগের অপেক্ষা মানুষ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—তাহা কেন হইতে দিব? সম্যক্‌রূপে মনুষ্যত্বের রক্ষা করিব এবং পশুদিগের ঐ উৎকৃষ্টগুণগুলিও পুনর্ব্বার আপনাদিগের আয়ত্ত করিব। যদি তাহাই না পারি, তবে মনুষ্য বুদ্ধিতে কার্য্য কারণ জ্ঞান কি জন্য উদ্ভূত হইল—মনুষ্যের ইচ্ছাবৃত্তিই বা কেন বলবতী হইয়া অপর সকল বৃত্তিকে আপনার আয়ত্ত করিতে সক্ষমা হইল? যদি পশুসিদ্ধিই অসাধ্য হয়, তবে ঈশ্বর সিদ্ধি কিরূপে সাধ্যায়ত্ত হইবে? হঠযোগের মূল কথা এই—"মানুষকে বড় হইতে হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে হইবে, কিন্তু তাহা কি পূর্ব্বার্জ্জিত গুণের লোপ করিয়া হইতে পারে, না সে সমুদায়ের রক্ষা এবং নূতন গুণের উপার্জ্জন করিয়া হইতে পারে? যদি প্রথম প্রণালীতে না হয় এবং দ্বিতীয় প্রণালীতেই কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়, তবে দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলা উচিত, এবং পশুদিগের মধ্যে যে সকল গুণ আছে মনুষ্যের নাই—সে গুণগুলি অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাওয়া উচিত।—চেষ্টার অসাধ্য ত কিছুই নাই!" হঠযোগের এই যুক্তিমূলক যে অনুষ্ঠানপরম্পরা তাহার নাম "পশ্বাদিসাধন।"

পাঠক একটু মনোযোগপূর্ব্বক হঠযোগের অধ্যবসায়টীর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। তাহা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্র হইতে এই হঠযোগপ্রসূত সে তন্ত্রশাস্ত্র কেমন উন্নতিশীল পদার্থ।

---

(৬)

পশ্বাদি সাধন।

অনেকানেক পশু শরীরে এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, যাহার যৎসামান্য চিহ্ন মাত্র নর শরীরে দৃষ্ট হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, "অবস্থাভেদে যে জীবের যে অঙ্গের ব্যবহার অধিক হয়, সেই অঙ্গ সবল হইয়া থাকে—আর যে অঙ্গের ব্যবহার অল্প

হয়, সে অঙ্গ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যাহার ব্যবহার অধিক, তাহার সম্বর্দ্ধন এবং পোষণ, যাহার ব্যবহার অল্প, তাহার দৌর্ব্বল্য এবং ক্ষয় ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। এই নিয়ম জানিয়া মানুষের কর্ত্তব্য কি? কোন "গুণই" ত বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই জীবৎ বলবান এবং কার্য্যক্ষম রাখা মানুষের কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সকল জীবদেহের গুণ মনুষ্যদেহে আবির্ভূত করিবার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ মানুষের শরীর এমন হইবে যে, হস্তীর বা গণ্ডারের দেহের ন্যায় ইহা শীত বাত তপন-ক্লেশসহিষ্ণু হইবে, বানরের ন্যায় ইহা দীর্ঘ লম্ফ প্রদান ও স্বল্পাবলম্বনে অবস্থান করিতে পারিবে, ভেকের ন্যায় ইহা প্লুতগতিসমর্থ হইবে, পক্ষীর ন্যায় আকাশপথে উড্ডীন হইতে পারিবে, মৎস্যের ন্যায় জলমধ্যে বিচরণ করিবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, মানুষের ঐরূপ ক্ষমতা আর তাহার শারীরিক কোন পরিবর্ত্তের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিজীবী হইয়াছে। মানুষের এখন যাহা কিছু করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা বুদ্ধিবল প্রয়োগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাই হইবে। মানুষ উড়িবে, কিন্তু বেলুন যন্ত্রের যোগে, নিজ শরীর হইতে পাখা বাহির করিয়া নয়; মানুষ জলতলে বিচরণ করিবে, কিন্তু ডাইবিং বেলের সহায়তায়, আপনার দেহভাগ হইতে স্বতন্ত্র কানক বাহির করিয়া নয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কথাই যে সফল হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তান্ত্রিক 'হঠযোগ' শরীরকোষ হইতেই ঐ সকল অঙ্গের সৃষ্টি বা তাদৃশ অঙ্গের কার্য্যক্ষম অন্যবিধ কোন গুণ জন্মাইতে চায়।

এই বিষয়ে হঠযোগের বিচারপ্রণালী কিরূপ, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে। বিড়াল ব্যাঘ্রাদি রাত্রিকালে যেমন পরিষ্কার দেখিতে পায়—মানুষ তেমন পায় না। হঠযোগ বলে মানুষ সাধন করিলে, অর্থাৎ যথোচিত চেষ্টা করিলে ঐ শ্বাপদদিগের ন্যায় রাত্রিদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে। এ কথা যে অমূলক নয়, তাহা অনেকেই বলিতে পারেন। চৌকীদার প্রভৃতি যে সকল মানুষ রাত্রিতে অধিক চলা ফেরা

করে, তাহারা অন্যের অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক দেখিতে পায়। চক্ষুতে একটী গুণের আধিক্য হয়। উহাদিগের কণীনিকার দ্বার সমধিক পরিমাণে খুলে—সুতরাং অধিক আলোক গ্রহণ করিতে পারায় অন্ধকারেও স্পষ্ট দর্শন জন্মে। হঠযোগ বলে দ্রব্যগুণেও ঐরূপ হইতে পারে—কিন্তু দ্রব্য-গুণের সাহায্য গ্রহণ করা অপেক্ষা সাধনের দ্বারা কোন কার্য্যে সিদ্ধ হওয়াই ভাল। বেলুনযোগে উড্ডীন হওয়া অপেক্ষা খেচরীমুদ্রার প্রয়োগ সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, ডাইবিং বেলের যোগে জলতলে বিচরণ করা অপেক্ষা কুম্ভকের সাহায্যে জলস্তম্ভ করা শ্রেয়ঃ।

এখন কথা এই—বেলুন, ডাইবিং বেল প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাদিগের দ্বারা মানুষের প্রয়োজন সাধনও হইতেছে। কিন্তু খেচরী মুদ্রা এবং জলস্তম্ভন ব্যাপার ত কখন দেখা যায় নাই—কেবল কথাতেই শুনা হইয়াছে। কাহার কাহার বিচারে এই কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়—আর দ্বিরুক্তির অবসর থাকে না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই ঐ কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না। আরও অনেকগুলি কথা বাকী থাকে। প্রথম কথা এই—পুঁথির লেখা যে মিথ্যা হইবেই হইবে, ইহা কি স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে? দ্বিতীয় কথা এই যে, খেচরী মুদ্রা এবং কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আকাশ গমন এবং জলতলে বিচরণ হউক বা নাই হউক, শরীরের অন্য কোন বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে না কি? আর তৃতীয় কথা এই, হঠযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা শরীরসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করিতে কি কেহ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখে? যদি তাঁহারাও অন্যান্য বিজ্ঞানবিৎদিগের ন্যায় অবাধে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বা শক্তির প্রয়োগ করিতে পারেন এমন হয় এবং হঠযোগের অনুষ্ঠানে উত্তমরূপ শরীরসাধন হইতে পারে নিশ্চিত হয়, তবে হঠযোগও কাহার অগ্রাহ্য পদার্থ না হইয়া সকলেরই বিশেষ সমাদরেরই বস্তু হইল। হঠযোগের পুস্তকোক্ত ফল সমস্ত যদিই অত্যুক্তি দূষিত হইয়া থাকে, তথাপি শরীরসাধনে উহার বিশিষ্ট উপকারিতা ত থাকিতে পারে।

গাছের ডালে পা আটকাইয়া মাথা নীচে করিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিতে পারা, পদ্মাসনে বসিয়া বেঙ্গের মত লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে পারা—জিহ্বাকে গো জিহ্বার ন্যায় দীর্ঘ করিয়া তদ্দ্বারা দাড়ি ছুঁইতে পারা—শৃগালের ন্যায় অন্ধকার রাত্রিতেও সুস্পষ্ট দর্শনশক্তি লাভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার পশুসাধন আছে। এগুলিকে পশুসাধন বলিতে ইচ্ছা না হয়, বলিয়া কাজ নাই। ব্যায়ামচর্চ্চা এবং ইন্দ্রিয়সাধন বল। কিন্তু বস্তু একই হইবে, পৃথক্ হইবে না।

---

(৭)

জপপ্রণালী।

মনোবৃত্তি নিচয়ের শক্তিসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক সে সমুদায় সাধনপ্রকরণের অন্তর্ভূত। সাধনের দুই অঙ্গ। এক, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয়; অপর, যাহাতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির তেজস্বিতা সম্পাদিত হয়। জপপ্রণালী প্রথমোক্ত অঙ্গের মুখভাগ। ইহা বাহ্যপূজা এবং সাধনের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জপ কর ধরিয়া করিতে হয়, শরীর ঋজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া করিতে হয়, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া করিতে হয়, এবং অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখিতে দেখিতে করিতে হয়। কর ধরিয়া এবং শরীর ঋজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া কেন জপ করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিবার কারণও সহজে বুঝা যাইতে পারে। দৃষ্টি ঐরূপ করিতে গেলেই চক্ষুর এমত অবস্থান হয় যাহাতে চক্ষুগোলক পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া আইসে। চক্ষুগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থান মনের একাগ্রতার এবং বুদ্ধির প্রবেশচেষ্টার বিশেষ ব্যঞ্জক। সুতরাং অক্ষিগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থানের অভ্যাসে মনের একাগ্রতা এবং বুদ্ধির প্রবেশ শক্তির বৃদ্ধি হইয়া উঠে। অতএব ইহাও এক প্রকার মুদ্রা এবং বাহ্য পূজার অঙ্গ।

কিন্তু, মনে মনে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি স্থির ভাবে রাখিয়া ওষ্ঠে জপ করা, করে সেই জপের সংখ্যা নির্ণয় করা, নাসার অগ্রভাগে চক্ষুর

দৃষ্টি স্থির রাখা এবং শরীর উন্নত এবং ঋজুভাবে রক্ষা করা, এই সকলগুলি কাজ এক সময়ে করিবার আদেশ আছে। এরূপ আদেশে কি বুঝা যায়? এই বুঝা যায় যে, মনুষ্য যে যে বিশিষ্ট শরীর লক্ষণে বিভূষিত শরীরের সেই সমস্ত লক্ষণ রক্ষা করিয়া জপের দ্বারা কাল এবং সংখ্যার জ্ঞান পরিস্ফুট করতঃ ধ্যানের দ্বারা রূপ এবং আকারের স্থির চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে হয়, এবং এই বিধির অনুযায়ী কার্য্য করিলেই "কাল" 'সংখ্যা' এবং 'রূপ' এই তিন বিষয়ে মনের অভিনিবেশ আরম্ভ হইল। এই তিনটি বিষয় যে সমস্ত মানস ব্যাপারের ভিত্তিমূল স্বরূপ এবং সকল মানসব্যাপারই ঐ ত্রিবিধ জ্ঞান বিশিষ্ট থাকে একথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। বস্তুতঃ জপ প্রণালীকে যে অন্তর পূজার প্রারম্ভ বলা যায় তাহার কারণ ইহার ধ্যানভাগের গুণে রূপের এবং আকারের স্মরণ শক্তি সম্বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু, বিশুদ্ধ মানসজপে সংখ্যা এবং কালকেও মানস ব্যাপারের আয়ত্ত করিয়া লয়। মানসজপে কর ধরিয়া জপের সংখ্যা রাখিতে হয় না। মনের মধ্যেই একটী বর্ণময়ী মালার সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয় এবং ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সেই মনোময়ী মালার দ্বারা জপের সংখ্যা করিয়া যাইতে হয়। মানুষের মন কোন এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট হইতে পারে কি না, এই কথা লইয়া প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট হওয়া মনুষ্য মনের অসাধ্য। কিন্তু তান্ত্রিকেরা এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন মানুষ চলিয়া যাইতে যাইতে কোন বিষয় ভাবিতে পারে, করে জপের সংখ্যা রাখিতে রাখিতে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করিতে পারে, মুখে কথা বলিতে বলিতে মনে মনে চিন্তা করিতে পারে। তাঁহারা বলেন, সাধন করিলে, এক সময়ে দুই কাজ কেন, বহুসংখ্যক কাজ মনুষ্য মনে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। মনোময়ী মালার জপের সংখ্যা রাখিতে রাখিতে অবিচ্ছেদে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করা অসাধ্য ব্যাপার নহে। প্রথমে কিছুদিন ধ্যানের ভঙ্গ হইতে থাকিবে, কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে আর কোন ব্যাঘাত হইবে না,

দুই কার্য্যই অবাধে এক সময়ে চলিবে। তন্ত্রের মতে কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিলেই তাহার শিক্ষা হয় না, স্মৃতিতে তাহার ধারণা হইয়া গেলেও শিক্ষা হয় না, শিক্ষণীয় ব্যাপারটী যতক্ষণ অভ্যাসগুণে মনের অঙ্গীভূত না হইয়া যায় অর্থাৎ যতক্ষণ বিনা জ্ঞানকৃত মনোযোগেও উহার সাধন না হয় ততক্ষণ শিক্ষার পূর্ণতা জন্মে না। এই কথাটী অতি সার কথা এবং আজি কালিকার শিক্ষাপ্রণালী এই কথাটীর অনুযায়ী কার্য্য না করায় অনেকানেক স্থলে বিপথগামিনী হইতেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানাচার্য্যেরা এক্ষণে বলিতেছেন মস্তিষ্কের সর্ব্বনিম্ন অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে শিক্ষিত বিষয় সমস্ত সংস্কাররূপে নিহিত হয় এবং সেই ভাগের বলে মনুষ্যেরা বিনা মনঃসংযোগেও অভ্যস্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই প্রকৃত তথ্যের অনুসারে যদি এখনকার শিক্ষাপ্রণালী আবার সংঘটিত হয় তবে তান্ত্রিক মতবাদের সমাদর হইলে হইতে পারে। সম্প্রতি সেরূপ হইবার কোন প্রত্যাশাই করা যায় না। এখন শিক্ষকেরা মনে করেন ছেলেদিগকে শিক্ষণীয় বিষয়টী বুঝাইতে পারিলেই হইল, ছেলেরাও মনে করে একবার বুঝিতে পারিলেই সব হইল। এ প্রণালীর শিক্ষায় মনের প্রকৃত শক্তির বড় একটা বৃদ্ধি হয় না। রাশি রাশি গ্রন্থের আলোচনা হয় মাত্র। কোম্‌ত রাশি রাশি গ্রন্থাধ্যয়নে দোষ দিয়াছেন বটে, কিন্তু নব্য শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই যে ঐ রাশি রাশি গ্রন্থ পড়িবার ব্যবস্থা এবং ব্যবহার জন্মিয়া গিয়াছে, সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইউরোপে ঐ দোষ সারিয়া যাইবে কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষায় যে গুণ ছিল তাহা গিয়া যখন দোষ আসিল তখন তাহার সংশোধন হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

---

(৮)

মানস পূজা।

মানস-পূজার ব্যাপারটী বাহ্যপূজা ব্যাপারেরই ছায়া। ইহার মধ্যে যে সকল ভাল ভাল কথা আছে, তাহা শুনিয়া ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবাও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হৃদয়রূপ পদ্মে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান—নিজ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যে সঞ্চলন এবং তজ্জাত ধ্বনি তাহাই সে দেবতার সন্তোষকর নৃত্য গীত বাদ্য—ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলি ৺দেবপূজার ফুল—কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্ট বৃত্তি সকল দেবপূজার বলি—মানসপূজার এই প্রকার অনেকানেক রূপক বর্ণনায় অতি সুন্দর কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি যে অতি পবিত্রভাব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

কিন্তু কবিত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের সার পদার্থ নয়। এই মানস পূজার অভ্যাসে কোন্ কোন্ মানসিক শক্তি কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা না দেখিলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় না। মানসপটে কল্পিত মূর্ত্তির জাজ্বল্যমান চিত্র প্রস্তুত করিবার শক্তি যে মানস-পূজার অভ্যাসে বিশিষ্ট-রূপেই উত্তেজিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ধ্যানে যে কাজ হয়, মানস-পূজায় তাহা অনেক বাড়িয়া থাকে। তদ্ভিন্ন একটী মহৎ তথ্যেরও জ্ঞান ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।

ক্রমে এই ভাবের উদয় হয় যে, বাহ্য ব্যাপার এবং আন্তরিক ব্যাপার, ইহারা পরস্পর অভিন্ন—অন্যোন্যের প্রতিরূপ মাত্র। মানস-পূজার একটী প্রধান অঙ্গ ষট্‌চক্র ভেদ। এই ব্যাপারে অনেকটা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিতে হয়, পর্য্যায়ক্রমে একের পর এক তাহার পর এক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মানসচক্ষুর সমক্ষে আনিতে হয়, এবং সমুদায়টীর কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ বা অস্ফুট রাখিবার যো থাকে না। এই অভ্যাস অস্ফুটভাব গ্রহণের নিতান্ত বিরোধী। এবং সেই জন্য প্রকৃতশিক্ষা-গ্রহণের অত্যন্ত উপযোগী। ষট্‌চক্রভেদ অভ্যস্ত হইলে আবছায়া মাত্র দেখিয়া আর তৃপ্ত হইবার পথ থাকে না—পরিষ্কাররূপে কিছু দেখিতে না পাইলে মনের কষ্টানুভব হয় এবং সেই কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে ষট্‌চক্রভেদ সাধন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রম অর্থাৎ কার্য্যকারণ সম্বন্ধটী অতি স্পষ্টরূপেই হৃদ্গত হইয়া যায়। সকল ব্যাপারই এক মূল শক্তিতে পরিণত এই সংস্কার দৃঢ়তর হইয়া যায়। অতএব অতি সুস্পষ্টরূপে মানসচিত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা—বাহ্যব্যাপারকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেরই প্রতিরূপ স্বরূপ বোধ—

অস্ফুট মানসদৃষ্টিতে অসন্তোষ এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দৃঢ়তা জ্ঞান, এই সমুদায় মানসপূজা অভ্যাসের ফল। অর্থাৎ মানস-পূজায় মনের স্থিরতা, অভিনিবেশ, সূক্ষ্মদর্শন, তাৎপর্য্য গ্রহণে আসক্তি এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্যক্-রূপে মার্জ্জিত হওয়াতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করিয়া তুলে।

তদ্ভিন্ন পূজাবিধির নিত্যত্ব থাকায় মনের চাঞ্চল্য একেবারেই নিবারিত হইয়া যায়। কোন কাজ ভাল লাগিলে করিব, ভাল না লাগিলে করিব না, পূজার অনুশীলনে এই চঞ্চলভাব একবারেই জন্মিতে পারে না। এক্ষণকার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এইরূপ চাঞ্চল্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশে অনেককালের শিক্ষাগুণে বিধিসমূহের নিত্যত্ব উপলব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাসের লোপ পাইয়া আসিতেছে। প্রয়োজন পড়িলেই করিব, বিনা সাক্ষাৎ প্রয়োজন বোধে কিছুই করিব না, এই পাশবভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি জানি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রায়ই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পুস্তক আলোচনা করে না; পরীক্ষার সময়ে একেবারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সাধনের প্রণালী যত দিন অবাধে প্রচলিত হইতেছিল, তত দিন এই দোষ জন্মিতে পায় নাই।

যিনিই যাহা বলুন, মানুষ অভ্যাসের দাস বই ত নয়। তন্ত্রশাস্ত্র সম্যক্-রূপে এই তথ্য স্বীকার করে এবং তাহা স্বীকার করিয়া মানুষের দেহ বুদ্ধি এবং নীতিকে এমতভাবে গঠিত করিতে চায়, যাহাতে শরীর সর্ব্ব কার্য্যক্ষম, বুদ্ধি তথ্য নিরূপণক্ষম এবং নীতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরাজয়ক্ষম হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের সাধনোপায় অভ্যাসবিধির নিত্যত্ব স্বীকার সাপেক্ষ। যাহারা বিধির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে হতাদর না হয়, তন্ত্র তাহাদিগকেই শিখাইতে পারে। থামখেয়ালির লোকেরা তন্ত্রের শিক্ষার বহির্ভূত পদার্থ—বোধ হয় তাহারা সকল শিক্ষারই বহির্ভূত। পূজা বিধি-পালনের নিত্যত্ব অভ্যাস করায়—এই জন্যই তাহার এত সমাদর।

(৯)

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম হঠযোগেরই অঙ্গ। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ। ইহার সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ফুস্‌ফুসের পেশীগুলিকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করা, পরম্পরা উদ্দেশ্য অমরত্বলাভ করা। যদি এই কথা শুনিয়া কেহ মনে করেন যে, প্রাণায়াম যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, লেখক তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না। যখন এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ কোথাও অমর হয় নাই তখন কেহ অমর হইতে পারে না, এ কথা বলিলে তাহার খণ্ডন করাও যায় না। কিন্তু অমরত্বসাধন না হউক, প্রাণায়াম যোগের প্রভাবে দীর্ঘজীবিতা সাধিত হয়। তাহা হইলেও ত অনেক হইল বলিতে হইবে। অতএব দেখা যাউক, প্রাণায়াম দীর্ঘজীবিতা সাধনের উপযোগী হইতে পারে কি না। প্রাণায়াম যোগের প্রথম প্রণালী এই।—নাসিকারন্ধ্রের এক মুখ এক অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া তাহার অপর মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ আস্তে আস্তে করিবে; মনে মনে মন্ত্রজপ করিতে করিতে করিবে; পরে নাসিকার উভয় রন্ধ্রই অঙ্গুলিদ্বারা বন্ধ করিয়া যত বার মন্ত্রজপ করিতে করিতে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলে তত বার সেইরূপে মন্ত্রজপ করিবে; অনন্তর নাসিকার যে রন্ধ্র প্রথমে বন্ধ করিয়াছিলে, তাহা উন্মুক্ত করিয়া যত বার মন্ত্রজপ সহকারে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলে, তত বার সেই প্রকারে মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিশ্বাস ছাড়িবে। মনে কর, যেন কোন মন্ত্রের দশবার করিয়া জপ করিতে করিতে এইরূপ প্রাণায়াম করিয়াছ এবং কয়েকদিন তাহা করায় ঐ কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে দ্বাদশবার করিয়া আরম্ভ কর। এবং তাহাও অনায়াসসাধ্য হইলে অল্পে অল্পে মন্ত্রজপের সংখ্যা বাড়াইতে থাক। মনে কর ক্রমে এক শত বার জপ করিতে পারিলে। তাহা পারায় তোমার কি হইল?—এই হইল যে, প্রথমে যতক্ষণ ধরিয়া দম লইতে এবং দম রাখিতে পারিতে এখন তাহার দশ গুণ অধিককাল ধরিয়া পার, তাহা কেন

পার? তোমার ফুস্‌ফুসের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার পরিচালক পেশীগুলি দৃঢ় হইয়াছে এবং তাহার অন্তঃস্থিত সকল বায়ুকোষগুলির কার্য্যকারিতা সম্বর্দ্ধিত হওয়াতে তাহারা সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। ফুস্‌ফুসের বল এইরূপে বর্দ্ধিত হওয়াতে আর কি হইয়াছে? হৃৎপিণ্ড হইতে সমধিক পরিমাণে রক্তস্রোত আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত হৃৎপিণ্ডকেও অধিক রক্ত ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইয়াছে। উহাও পূর্ব্বাপেক্ষায় বৃহত্তর হইয়াছে। লোকেও তোমাকে দেখিয়া বলে যে পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার ছাতি ফুলিয়া উঠিয়াছে। যাহাদিগের সহিত একত্র হইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে এবং সাঁতার দিতে বা ডুবোডুবি খেলিতে তাহারা আর কেহ তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না। তুমি অধিকক্ষণ সাঁতার দিতে পার—অধিকক্ষণ ডুব দিয়া থাকিতে পার—শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড় না। বিশালবক্ষ, পরিশ্রমক্ষমতা, অক্লান্তি—এগুলি যদি বলের লক্ষণ হয়, এবং বলবত্তা যদি আয়ুষ্মত্তার লক্ষণ হয় তবে প্রাণায়াম যোগ তোমাকে বলবান এবং দীর্ঘায়ুঃ করিয়াছে বলিতে হইবে।

প্রাণায়ামযোগটী যেরূপে বর্ণিত হইল, এরূপে সকলেই করিতে পারে—জপের দ্বারা সময় ঠিক রাখিতে নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, ঘড়ি ধরিয়া করিলেও এ যোগের কোন হানি হইবে না। কিন্তু ইহা নিত্য করা চাই—অল্পে অল্পে করা চাই এবং নিশ্বাস গ্রহণ, তাহার ধারণ এবং রেচন সমান সময়ে হওয়া চাই। এ সকল নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে উপকার না হইয়া অপকারের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

কিন্তু প্রাণায়ামযোগে জপের সংখ্যা যদি পরিমিত না হইয়া আরও অধিক হয়, মন্ত্রের পূর্ণমাত্রা পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে আর ওরূপে নাসিকারন্ধ্রকে অঙ্গুলি দ্বারা সম্বদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয় না। নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহার সংরোধ করিতে হয় এবং সেই অবস্থায় পূর্ণমাত্রা জপ করিতে হয়। এইরূপ করাকে 'কুম্ভক' বলে। আমি এই ব্যাপারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই। তবে ইহার

বিবরণ শুনিয়াছিলাম বলিয়া কুমার-সম্ভবে মহাদেবের তপশ্চরণ বর্ণন অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

পর্য্যঙ্কবন্ধ-স্থির-পূর্ব্বকায়
মূজ্জায়তং সন্নমিতোভয়াংসং
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্প মিব প্রদীপং॥

'কুম্ভক' করিয়া যদি কেহ যথেচ্ছকাল থাকিতে পারে, তবে সেই অবস্থাকে 'সমাধি' বলা যায়। সত্যসত্যই কেহ 'সমাধি' করিতে পারেন কি না, অর্থাৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, হৃৎপিণ্ড স্থগিত করিয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া কেহ থাকিতে পারেন কি না, সে বিষয়ের অনুসন্ধান করা অসাধ্য। অনেক জীবদেহের ওরূপ অবস্থা আপনা হইতেই হয়। রণজিৎ সিংহের নিকট একজন সন্ন্যাসী দশ মাস ঐ ভাবে ছিল বলিয়া কোন কোন ইংরাজী পুস্তিকায় লিখিত আছে। কলিকাতার নিকট ভূকৈলাস নামক স্থানে একজন মহাপুরুষ সমাধি-যোগে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সমাধিযোগ লাভ হউক বা নাই হউক সামান্য প্রাণায়াম যোগের যে শুভফল আছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ণাভিষেক।

(১০)

পূর্ণাভিষেক সংস্কারে কুলাচারপরায়ণ গুরুর একান্ত আবশ্যকতা। যদি অকুলাচার গুরুর স্থানে পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ হইয়া থাকে, তবে পূর্ণাভিষেকের সময় কুলাচারী গুরুর স্থানে আবার নিজ মন্ত্র শ্রবণ করিতে হয়। সেই কৌল গুরুকেও অপরাপর কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এই সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পূর্ণাভিষেকের

শেষভাগে যে কয়েকটী উক্তি প্রত্যুক্তির বিধান আছে, তাহার তাৎপর্য্য অতি অসামান্য।

শিষ্য গুরুকে বলিবেন—

শ্রীনাথ জগতাংনাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃত প্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথং॥

হে শ্রীনাথ! হে জগন্নাথ! হে দয়াময় মদীয়নাথ! আপনি পরমামৃত (ব্রহ্মানন্দপ্রদ মন্ত্র) প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ করুন।

গুরু বলিবেন—

আজ্ঞা মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতং॥

হে প্রত্যক্ষ শিবরূপী কৌলগণ! আপনারা আদেশ করুন, আমি বিনীত সৎ শিষ্যতে পরমামৃত প্রদান করি।

কৌলেরা বলিবেন—

চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সচ্ছিষ্যং দেহ্যমুস্মৈকুলামৃতম্॥

হে কৌল কমল-ভাস্কর পরমেশ্বর! হে ষট্‌চক্রেশ! আপনি ঐ সৎশিষ্যকে কুলামৃত প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

পূর্ণাভিষেক হইলে নূতন নামকরণ হয়। সেই নামের শেষভাগে 'আনন্দনাথ' এই পদদ্বয় সংযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ণাভিষেক ব্যতিরেকে কেহ কুলাচারী হইতে পারেন না।

পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষে 'কর্ম্মত্যাগে' এবং 'কর্ম্মের অনুষ্ঠানে' পার্থক্যবোধ পরিত্যজ্য। 'ঈশ্বর পূজা' যে 'লোকের হিতচেষ্টায়' পর্য্যবসিত ইহাই নিরন্তর চিন্তনীয়—এবং চক্রেশ্বর গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংন্যাস।

(১১)

তন্ত্রশাস্ত্রমতে আশ্রম প্রধানতঃ দুই প্রকার; গার্হস্থ্যাশ্রম এবং ভৈক্ষুকাশ্রম। কিন্তু এই দুই আশ্রমের বিভিন্নভাব পরস্পরে ভিন্নরূপে অনুস্যূত হওয়ায় অন্যান্যরূপ আশ্রম জন্মে। যথা—

(১) গৃহস্থাশ্রমী যদি ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক হয়েন তাঁহাকে যতি বা সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাদৃশ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মাবধূত বলা যায়।

(২) গৃহস্থাশ্রমী পূর্ণাভিষিক্ত হইলে তাঁহাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—তাঁহাকে শৈবাবধূত বলে।

(৩) ব্রাহ্মাবধূত এবং শৈবাবধূত পরিব্রাজক হইলে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে পরমহংস বলে।

গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেই হইবে, তন্ত্রশাস্ত্রে এরূপ কোন বিধি নাই। তবে যদি কেহ স্বেচ্ছাতঃ পরিব্রাজক হইতে চাহেন, তাঁহাকে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার বিধান আছে। পিতা মাতা ভার্য্যা শিশুসন্তান অথবা অন্য কোন অবশ্যপোষ্য বিদ্যমান থাকিলে কেহ পরিব্রাজক হইতে পারেন না। যাঁহার ঐ সকল নাই তিনি স্বজন এবং স্বগ্রামনিবাসীদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন। তাঁহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী কোন শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর নিকটে গিয়া আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। শ্রাদ্ধবিশেষ দ্বারা পিতৃঋণ দেবঋণ এবং ঋষিঋণ পরিশোধিত করিতে হয়, হোম করিয়া শিখা এবং যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হয় এবং পরিশেষে পিতৃবর্গের সহিত আপনারও পিণ্ডদান গুরুচরণে প্রণত হইয়া করিতে হয়। *গুরু কি করিবেন তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইবে—

* এইরূপ শিক্ষায় শরীর ও মন দৃঢ় ও সংযত হইলে, ইচ্ছাশক্তি অতীব তেজস্বিনী হইলে—নিজের পিণ্ডদান করিয়া—প্রকৃতই ধীর গম্ভীর ভাবে জীবন উৎসর্গ পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞায় যে ব্যক্তি—সুধু মুখে নয় সমস্ত প্রাণের বলের সহিত "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যংবা সাধয়েয়ং" বাক্য উচ্চারণ করিয়া কোন সৎকার্য্যে লোকহিত জন্য অগ্রসর হয় তাহার অসাধ্য কিছু আছে কি? ঐরূপ কয়েক শত লোক যে সমাজে প্রস্তুত হয় সেই সমাজই অক্লেশে মহাসহিমান্বিত হইয়া পড়ে।

গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিমং
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোহং বিভাবয়।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসাগুরুং
নমস্তুভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমোনমঃ
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোস্তুতে॥

অর্থাৎ গুরু দণ্ডবৎপ্রণত শিষ্যকে উত্তোলন করিয়া তাহার দক্ষি' কর্ণে এই কথা বলিয়া দিবেন—"হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি নিজেকে 'আমিই সেই' মনে করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তা কর।" শিষ্য তখন গুরুকে আত্মস্বরূপ মনে করিয়া অবনতশিরে এই বলিয়া প্রণাম করিবেন—'আপনাকে প্রণাম করি, আমাকে প্রণাম করি, আপনাকে ও আমাকে উভয়কেই প্রণাম করি, আপনিই "সেই" সেই, "আপনিই", বিশ্বরূপ আপনাকে প্রণাম।"

কুলাচার!

(১২)

কুলাচার সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশগুলি পাঠ করিলে নিতান্তই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

প্রথম আদেশ এই যে, কুলাচারে বীরভাব ধারণ করিতে হয়, ঋজুভাব এবং দিব্যভাব এ সময়ের উপযোগী নহে।

দ্বিতীয় আদেশ এই যে, যখন দেশে অধর্ম্মের আধিক্য, সামাজিক বন্ধনের শৈথিল্য, রাজা বৈদেশিক এবং লোকের অন্ন কষ্ট এবং পরস্পরে মনোবাদ, তাদৃশ কালেই সত্যনিষ্ঠ সত্যব্রত সাধুশীল ব্যক্তিরা কুলাচারী হইবেন!

তৃতীয় আদেশ এই, অপরাপর সময়ে কুলাচার গুপ্তভাবে নির্ব্বাহ করা বিধেয়, কিন্তু কলিজনিত দোষ প্রবল হইয়া উঠিলে কৌলাচার গোপন করায় দোষ বই গুণ নাই।

কুলাচারীর পক্ষে প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান, গুরুর মানস পূজা, মলাদি ত্যাগ, প্রাতঃস্নান, আসন, প্রাণায়াম, ইষ্টদেবতার সাঙ্গ বাহ্য পূজা,

সাঙ্গ মানসপূজা, পঞ্চতত্ত্বের শোধন এবং তদনন্তর সস্ত্রীক ও সবন্ধুক হইয়া পান ভোজন করিবার ব্যবস্থা।

তন্ত্রে কুলশব্দের অর্থ প্রকাশিত আছে। কুল শব্দে নয়টী পদার্থকে বুঝায় (১) জীব (২) প্রকৃতিতত্ত্ব (৩) দিক্ (৪) কাল (৫) আকাশ (৬) ক্ষিতি (৭) অপ্ (৮) তেজ (৯) বায়ু। এই নবসংখ্যক পদার্থে কল্পশূন্য যে ব্রহ্ম-বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধির অনুচারিণী যে আচরণ তাহার নাম কুলাচার।

চক্রানুষ্ঠান।

(১৩)

চক্রানুষ্ঠান কৌলিকাচারের শিরোভূত ব্যাপার। চক্র প্রধানতঃ দুই—তত্ত্ব চক্র এবং ভৈরবী চক্র। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তত্ত্ব চক্রের অনুষ্ঠানে অধিকারী। এই চক্রে যাহাঁরা প্রবেশ করিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ কুলভেদ আচারভেদ থাকিবে না। সকলেই পরস্পর সমকক্ষ ভাবে একত্র হইয়া আপনাদিগের মধ্যে যাহাঁকে ইচ্ছা হইবে তাঁহাকেই চক্রেশ্বররূপে বরণ পূর্ব্বক সর্ব্বমধ্যস্থলে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়া তাঁহার অনুমত্যনুসারে কুলপূজা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পান ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

ভৈরবী চক্রের নিয়মও ঐ প্রকার। তবে এই চক্রে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা অপেক্ষা করে না এবং সেই চক্রের নায়ক ব্যক্তিবিশেষেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু এ চক্রেও জাতি কুল এবং আচারের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য নিষিদ্ধ। চক্রপ্রবিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই ব্রাহ্মণ। চক্র হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ পুনঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে। তন্ত্রের শিক্ষায় যেখানে জাতিভেদ নাই সেখানে ব্রাহ্মণ উপবীত ফেলিয়া শূদ্র হয় না। সেখানে উচ্চকার্য্যে একত্রীকৃত সকলেই পবিত্র ও দ্বিজোত্তমের অবস্থায় উন্নত। সকল উচ্চ কার্য্যেই এদেশীয় সকল বর্ণের লোকদিগের সম্মিলনজন্য ইহা কি সুন্দর ব্যবস্থা! সম্মিলন জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্রে একত্রে খাইবার বা ছেলে মেয়ের বিবাহ দিবার প্রয়োজন

নাই। দেবীর কার্য্যসাধন জন্য "যখন" সকলে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হইবে "তখন" তোমরা সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ!

পঞ্চ-মকার।

(১৪)

পঞ্চ-মকারের কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। যাহাঁরা তন্ত্রশাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা পঞ্চ-মকারের উল্লেখ করিয়া ঐ শাস্ত্রের নিন্দা করেন, যাহাঁরা তান্ত্রিক প্রণালীর অনুকূল পক্ষ তাঁহারা অনেকেই পঞ্চ-মকারের কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, পঞ্চ ম-কারের যথাযথ প্রয়োগে গুণ আছে, দোষ নাই এবং উহার প্রকৃত তাৎপর্য্যও শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত আসন মুদ্রা পূজা ধ্যান সাধনাদির সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলেই বোধ হইবে যে, এই শাস্ত্র অপরাপর ধর্ম্ম শাস্ত্রের ন্যায় কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহে শিক্ষা প্রদান করিয়া নিবৃত্ত হয় না। তন্ত্র, মনুষ্যের দেহ, মন, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, ব্যবহার, জ্ঞান, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দেয়। তন্ত্র, মনুষ্যের ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র, জ্ঞানকে স্বতন্ত্র, দৈহিক কার্য্যকে স্বতন্ত্র, সামাজিক ব্যবহারকে স্বতন্ত্র এবং উহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবিহীন এরূপ মনে করিয়া শিক্ষাদান করে না। মানুষ এক এবং যাহার যাহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ তাহাও সুতরাং এক। অতএব প্রকৃত শিক্ষার অধীনে উহারা একদিকগামী এবং পরস্পরের বলবর্দ্ধক হইয়াই চলিবে, বিভিন্ন দিক্‌গামী হইবে না। কেহ কাহাকে দূষিত বা দুর্ব্বল করিবে না, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত। তন্ত্র নিয়ম করাইবে, সংযম করাইবে, ইন্দ্রিয়দমন শিখাইবে, লোভ নিবৃত্ত করাইবে, ভয় উৎসাদিত করিবে, কামকে পরাজয় করাইবে। কিন্তু এ সকল কেন করাইবে? কেবল ইচ্ছাবৃত্তির সম্যক বলবত্তা সাধন করিবার নিমিত্ত—ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নয়—নিশ্চেষ্ট হইবার জন্য নয়, জড় ধর্ম্ম পাইবার অভিলাষে নয়। কি

উপায়ে মনুষ্যের আয়ু, আরোগ্য ও তেজ বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কি উপায়ে মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি প্রখরা হয়, কি উপায়ে মনুষ্য বলবান বিশুদ্ধচিত্ত অন্যের হিতসাধনে নিরত এবং মাতা পিতার প্রিয়কারী ও স্বদারনিষ্ঠ এবং দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র স্বজনাদির প্রতিপালক হয় এবং কিরূপে তাহারা প্রকৃত পরম জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া "আদর্শ মনুষ্যত্ব" বা নরদেহেই দেবত্ব বা মুক্তপুরুষত্বসম্পন্ন হইতে পারে এই সমুদায় উপায় ব্যক্ত করাই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তন্ত্রের এইরূপ উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তও যে এই সকল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, একথাও তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টাভিধানে কথিত হইয়াছে। তবেই বলিতে হইল যে তন্ত্রশাস্ত্র অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্রের ন্যায় প্রবৃত্তি মার্গের নিষেধক এবং নিবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক নহে। অপর সকল আর্য্য শাস্ত্র হইতে তন্ত্র শাস্ত্রের এই বৈচিত্র্য। ইহা প্রবৃত্তির বিনাশ সাধনের নিমিত্ত যত্ন করে না। ইহা নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করিয়া প্রবৃত্তিকেই চির বলশালিনী করিবার চেষ্টা করে। পঞ্চ মকারের সামান্য লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ যে নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। আবার তন্ত্রশাস্ত্র যে সকল প্রকার অনুষ্ঠানকেই এক মাত্র ইচ্ছাবৃত্তির তেজস্বিতা এবং স্বাধীনতা সাধনের সহকারী করিতে চায় ইহা মনে করিলেই পঞ্চ মকার যে অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য্যেরও সূচক হইবে তাহাও সম্ভবপর বোধ হইবে।

বস্তুতঃ যাহাকে পঞ্চ ম-কার বলে তাহাকেই পঞ্চ তত্ত্বও বলে। আদ্য ম-কার মদ্য, উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ অগ্নি। দ্বিতীয় মকার মাংস উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ বায়ু। তৃতীয় মকার মৎস্য উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ জল। চতুর্থ মকার মুদ্রা উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ পৃথিবী। পঞ্চম মকার মৈথুন, উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ আকাশ।

সকল আর্য্য শাস্ত্রের বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে একটী মূল সিদ্ধান্ত মনে মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। সে মূল সিদ্ধান্তটী এই যে মানুষের ধর্ম্ম মানুষের সামান্য প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান সকল হইতে পৃথক্‌ভূত নয়। বার তিথি ঋতু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে সত্য কিন্তু সে সকল বিধি কেবল নিয়ম রক্ষার অভ্যাস করাইবার নিমিত্ত—বাহ্য পূজা মানস পূজা প্রভৃতির বিধি আছে সত্য কিন্তু সে সকল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত—আহার বিহারাদিও ধর্ম্ম নিয়ম দ্বারা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য কিন্তু সে সকল নিয়মের উদ্দেশ্য পশুভাবের একান্ত অপনয়ন।

তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃতিতে এই বৈচিত্র্য কি জন্য জন্মিয়াছে? ইহা যে আর্য্যজাতীয়দিগের সম্বন্ধে নিতান্ত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার একথা বলা যায় না।

প্রাচীন বেদ শাস্ত্রের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রিয়াসাধন এবং ঐহিক সুখলাভই বৈদিক ঋষিদিগের বিলক্ষণ অভিলষিত ছিল। প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যেরূপে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাঁহারা দেবতাদিগের স্থানে যে সকল ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বরপ্রার্থনা করিতেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সময়ে প্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ আর্য্যজাতীয়দিগের অভিমত ছিল না। বস্তুতঃ অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপে নিবৃত্তিপূত প্রবৃত্তির প্রাবল্য আর্য্যদিগের মধ্যে হইয়াছিল। তাহার পর জ্ঞানের চর্চ্চা, ভক্তির চর্চ্চা, যোগ সমাধির অনুষ্ঠান, প্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ, নিশ্চেষ্টতা দৌর্ব্বল্য এবং অধঃপাত। সেই অধঃপাতের পর তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব, সুতরাং যাহাতে আর্য্যজাতীয়দিগের পুনর্ব্বার উত্থান সাধন হয় তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রকারদিগের অবশ্য অভিলষিত হইয়া থাকিবে। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে আবার উন্নতির অভিলাষ, আবার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, আবার নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্করণের উপায়ের ভাবনা। এই জন্যই বঙ্গ সমাজের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারকর্ত্তা রামমোহন রায় তন্ত্রবিশেষকেই অবলম্বস্বরূপ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তন্ত্রোক্ত অনেক কথার সহিত বৈদিক উপনিষদাদির ঐক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। আধুনিক ব্রাহ্মেরা জানুন বা নাই জানুন, তন্ত্রশাস্ত্রই তাঁহাদিগের মতবাদের ভিত্তিমূল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মসংহিতায় এমন কোন সার কথা নাই যাহা তন্ত্র শাস্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত

নহে। নব্য ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের শাস্ত্রকে প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ হইতে পৃথক্‌ভূত মনে করিয়া যে আপনাদিগের পদ্ধতির প্রকৃত ভাব রক্ষা করিলেন, কি জাতীয় ভাবের দৃঢ়তা সাধন করিলেন, কি সেই পদ্ধতিরই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নতার অনুকূলতা করিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই অসংখ্য দলে বিভক্ত আন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন পরস্পর প্রতিকূলাচারী ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-সমাকুল হিন্দু সমাজে অকারণে আর একটী দল বাড়াইলেন বলিয়াই ত বোধ হয়। শাস্ত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে আগম বা তন্ত্রেরই প্রাধান্য—অন্য কোন বিধানের নয়। শাস্ত্রে ইহাও সুব্যক্ত আছে যে তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্রবিশেষই সর্ব্ব প্রধান। ঐ তন্ত্রটী দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, তাহা হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অনার্য্যভাবে কলুষিত করিয়া কেন হিন্দু সমাজকে দুর্ব্বল করা হইতেছে? কি জন্য সনাতন ধর্ম্মের আধুনিকতা প্রতিপাদন করা হইতেছে? ইহার আনুপূর্ব্বিকতার লোপ করিয়া কি সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে? কোন কালে কোন দেশে কি ধর্ম্ম সংস্কার এরূপে সিদ্ধ হইয়াছে না হইতে পারে? মানুষ ঐতিহাসিক জীব। মানুষ একেবারে পূর্ব্বভাব পরিহার করিয়া নূতন ভাব পরিগ্রহ করিতে পারে না। যেমন চলিবার সময় একপদ অগ্রবর্ত্তী হয় অপরপদ পূর্ব্বস্থানেই স্থির থাকে, সেইরূপ সংস্কার কার্য্যেও যে ভাব ছিল তাহা স্থিরতর রাখিয়া নূতন ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রাহ্মেরা ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দু সমাজে সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক উৎসাহশীল, তাঁহাদিগেরই মনে জাতীয় উন্নতি সাধনের ইচ্ছা জাগ্রৎ হইয়াছে, এক আধটুকু পরস্পর বন্ধনের চিহ্নও তাঁহাদিগেরই মধ্যে দেখা দিয়াছিল,—আর কি বলিব? তাঁহারা যে তন্ত্র শাস্ত্র হইতে আপনাদিগের মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রাধান্য স্বীকার করুন সেই শাস্ত্র যে গুরু গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধ করুন, স্ব স্ব প্রাধান্যের ইচ্ছা একেবারেই পরিহার করুন। তাহা করিলেই সাধারণ হিন্দু সমাজের গ্রাহ্য এবং সেই সমাজের অভাব মোচনের অভিপ্রায়ে সম্ভূত এমন একটী সংস্কৃত শাস্ত্র ব্রাহ্মদিগের

দাঁড়াইবার স্থল হইবে, বশ্যতাই যে একতার মূল তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে এবং সম্মিলন যে প্রকৃত প্রাধান্য সাধনের একমাত্র উপায় তাহাও সপ্রমাণ হইয়া উঠিবে। উহাঁরা ইহা না করিতে পারেন সাধারণ হিন্দু সমাজ হইতেই অপরে সেই কার্য্যে যে অগ্রসর হইবে তাহাতে আস্তিক মাত্রেরই সন্দেহ নাই।

মদ্যমাংসাদি সেবন সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রের প্রকৃত অভিমত মনুসংহিতার একটী বচনে সমুদ্ধৃত আছে—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

তন্ত্রশাস্ত্রও অবিকল তাহাই বলে, "প্রায়" বলিলাম না এই জন্য যে "একেবারে" প্রবৃত্তির নিরোধ প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য ছিল না।

"সৌত্রামণ্যাং সুরাম্পিবেৎ" এই বিধি, 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ' এই প্রামাণিক বাক্য এবং 'ঋতৌভার্য্যামুপেয়াৎ' এই সকল অনুজ্ঞা বৈদিকশাস্ত্র সম্মত সুতরাং একেবারে প্রবৃত্তির নিরোধ বৈদিক কালের ব্যবস্থা নয়। অনুষ্ঠান বিশেষ সহকারে, চিত্তের সংযম সহকারে, মনের বিকৃতি নিরাকরণ সহকারে দেশ কাল পাত্রের যথাযথ বিচার সহকারে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী আচরণে বহুল শুভ ফল সমাহিত হয় ইহাই মনুবচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তন্ত্রের ব্যবস্থাও তাই। আয়ুস্তেজ বলবুদ্ধি বিদ্যার সম্বর্দ্ধনকর পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান দূষ্য নহে। পূজাবিশেষ, অনুষ্ঠানাদিবিশেষ, ও ভাবনাদিবিশেষ সহকারে পঞ্চ-মকারের প্রয়োগে উপকার আছে। কিন্তু সেই উপকার লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে "বিজিতেন্দ্রিয়" কুলাচারী হইতে হয়। অসংযত অনধিকারীর উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারেই তন্ত্র শাস্ত্রের নিন্দা হইয়াছে।

দেবমূর্ত্তি।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় অতি "স্থূল স্থূল" রূপে তৎসমুদায়ের নাম প্রকার এবং তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে। এক্ষণে তন্ত্রবর্ণিত দেবমূর্ত্তিগুলির এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলির প্রকৃতি এবং

উদ্দেশ্য অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যত্ন করা আবশ্যক। কাহার কাহার বিবেচনা এরূপ যে, তাৎপর্য্যপ্রকাশে শাস্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তি যায়, আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলে শাস্ত্রের প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতেই পারে না। ইউরোপ খণ্ডের এক সম্প্রদায় খৃষ্টানেরা স্পষ্টই বলেন যে, প্রচলিত দেশভাষাগুলিতে বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ হওয়ায় ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিচার প্রবৃত্তিই বাড়িয়াছে। অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের ধর্ম্মান্ধতা দূর হইয়াছে। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব কোন সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের একটি দুরূহ ভাগ বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার একজন সতীর্থ তাঁহাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দিলেন। আমারও একজন পরমাত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছেন যে, দেবমূর্ত্তি সকলের তাৎপর্য্য প্রকাশে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত অপকারেরই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পক্ষান্তরে অপরাপর অনেকে বলেন যে শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ বুঝিবার চেষ্টা করায় লোকের অবকাশ এবং স্পৃহা ন্যূন হইয়া যাইতেছে, অতএব এ সময়ে তাহাদিগের শ্রমবিমুখতা দূর করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রের যে গূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহা কতক কতক দেখাইয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করা আবশ্যক। যাঁহারা স্বজাতীয় শাস্ত্র সমূহে স্বতঃই ভক্তিমান হইতে অভিলাষ করেন, কেবল বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে তাহা সমগ্র করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের কিছু সহায়তা করার প্রয়োজন আছে। ততটুকু করিলে অনধিকারীকে গূঢ় উপদেশ দেওয়ার দোষ ঘটে না—প্রত্যুত তাহা না করিলে বিদ্যার উপযুক্ত প্রকারে ব্যাঘাত ঘটে। দেবমূর্ত্তির রূপাদির যে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্য আছে তাহা তন্ত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্‌মনসোগোচরম্॥

অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্ত মিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্ব্বহু সমাধিভিঃ।
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥ *

এই কয়েকটি শ্লোকে দেবমূর্ত্তিকল্পনার প্রয়োজনাদি পরিষ্কার-রূপেই বলা হইয়াছে, এবং স্থূল ধ্যান যে সূক্ষ্ম ধ্যান বুঝাইবার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে, আর গুণ এবং ক্রিয়ার অনুসারেই যে স্থূল রূপের কল্পনা হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। **

সম্পূর্ণ

---

* সরূপ ও অরূপ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। তোমার অরূপ ও অবাঙ্ মনসোগোচর ধ্যান অব্যক্ত এবং সর্ব্বতোব্যাপ্ত। উহা এই এই প্রকার ইত্যাদি বলা যায় না। উহা অগম্য, কেবল কৃচ্ছ্রসাধ্য বহু সমাধি দ্বারাই যোগীদিগেরই গম্য হয়। মনে যাহাতে উহার ধারণা হয়, যাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ সূক্ষ্মধ্যানের বোধ জন্মে, তজ্জন্য স্থূল ধ্যানের কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। কালের মাতা, মহাদ্যুতি, অরূপা কালিকার রূপকল্পনা। গুণক্রিয়ানুসারেই করা হইয়া থাকে।

** আচার প্রবন্ধে কতক দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণই ছিল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

হুগলী

বুধোদয়যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয়টীর কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্য-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাস মূলক। অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

ইংরাজীতে 'রোমান্‌স্‌ অব হিষ্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফলস্বপ্ন' নামক উপন্যাসটী প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদ্দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত হজ্‌সন্‌ প্রাট্‌ সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্টরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের বিশিষ্ট আনুকূল্যে ইহার সংশোধন করা হইয়াছে।



ঐতিহাসিক উপন্যাস।

সফল স্বপ্ন।

প্রথম অধ্যায়।

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জু-মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝর তীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি সুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলতঃ বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্য গুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।

অনুমান হয়,পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় সম্মুখস্থ নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে হঠাৎ সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গর্জ্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মৃগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলৎশক্তি রহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বিদারণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় তেজে উদ্দীপ্ত এবং কেশর উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ কোন কার্য্যকারী হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন; দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পথিক বাহন বিনাশে নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্ত হইলেন—কিন্তু কি করেন, অপ্রতিবিধেয় দুঃখে দুঃখী হওয়া অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, দিবা ভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপৃষ্ঠে যাবৎ পাথেয় দ্রব্য সামগ্রী ছিল, সমুদায় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করত দ্রুতবেগে গমনোন্মুখ হইলেন। বহুক্ষণ কাননের কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এমত সময়ে সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখেন,প্রান্তর মধ্যভাগে এক নবপ্রসূতা হরিণী স্বীয় শাবক সমভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পথিক সত্বরপদে আসিয়া অনতিবেগবান্ সদ্যোজাত সেই হরিণ শিশুকে গ্রহণ করিলেন। ভয়বিহ্বলা হরিণী প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মৃগয়া সফল হওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম উপযোগ দ্রব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি যাপন করিতে হইলেও হানি নাই। এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মৃগশাবকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে

ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণ-শিশুকে একটা বৈদ্যুতাগ্নি-শুষ্ক বৃক্ষমূলে স্থাপন করত দুই খানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর অসি ধারণপূর্ব্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল। আহা! পশু জাতির মধ্যেও অপত্য স্নেহ কি প্রবল! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক পুনর্ব্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ব্ববৎ অপত্য-বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশুযোনিতে ঈদৃক্ মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয়? পথিক কারুণ্যরসের প্রাদুর্ভাবে বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরঙ্গের কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দানুভব করিলেন। মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধ-মনোরথা হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল—কিন্তু শাবক সমভিব্যাহারে অটবী মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, একবার সন্তানের জীবন-রক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ দ্বারা অতীব চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিলেন। জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতর প্রেমাস্পদ পদার্থ আর কি আছে? বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও ইন্দ্রিয়-প্রীতিপরায়ণ। এই জন্য জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। হায়! তাহারা কি নির্ঘৃণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর জগদীশ্বর প্রদত্ত সর্ব্ব-সুখ নিদান প্রাণাপহরণ করিয়া আপনাদিগের চিত্ত কলুষিত করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! অনুমান হয়, পবিত্র-

চিত্ত ধর্ম্মাত্মার অন্তঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ, পথিক কুরঙ্গ শাবককে মোচন করিয়া অবধি সেই ভয়াবহ গহনবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন এবং পাথেয় তণ্ডুলের কিয়দংশ হইতে যথাকথঞ্চিৎরূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাশান্তি করত অতীব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বন দেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গ-প্রভারন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তিপ্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া পথ পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, মৃগাঙ্ক-মণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময় দেব-মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সুস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—"রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখ দুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন,এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না,অদ্য পশুযোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।"

এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন নিশা অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্র-

মণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লানকিরণ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্ন দর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিমীলিত করিতে পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাম্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরি শৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্ঝটিকারাশি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পরে সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্ঝটিকা জাল বিদীর্ণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল—দূরস্থ মহীধর শৃঙ্গসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশিপ্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্রবিটপাদি বালাতপ সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল—এবং শিশির-সিক্ত শষ্পশয্যা যেন, রাত্রিবিহারী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইয়া তাদৃশ চাক্চিক্যশালী হইতে লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অম্বুভারে অবনত হইয়া সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদ্গুণাধার বশতঃ নিজ নিজ নম্রতা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—করিয়া, সকলে শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পান্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুষ্ক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জ্বালনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া ভূতলে জানু পাতনপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযতমনোবৃত্তি হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিয়া পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিজ্ঞাত কানন পথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নটী বারম্বার স্মৃতি পথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটী তাঁহার চিত্তপটে এমনি স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে; আবার ভাবিলেন, আমি এই দেশে নাম ধাম বিহীন আগন্তুক

ব্যক্তি,আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য নহে ; স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র ; জাগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, মনুষ্য তাহা বুদ্ধিবলে দমনকরিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন ; স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি ? অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখন স্বপ্নে বিশ্বাস [illegible]না—বিশেষতঃ এরূপ দুরাশা সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা ; ক[illegible]দি এহা কস্মিন্‌কালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের [illegible]ক ? আর যদি সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল [illegible]রূপ দাবাগ্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে ; অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম্ম-পথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ দুশ্চিন্তা-নিমগ্ন হইলে স্খলিত-পদ হইয়া অধঃপতিত, অথবা অন্যমনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে ! আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্য অবিনশ্বর ধর্ম্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বারা উদ্রিক্ত দুরাকাঙ্ক্ষা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন।

—০*০—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিলকানন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকূট ধূম পানে কেহ বা অন্যান্য উপযোগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্য্যটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শত্রুতাই করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?—মিত্রতা করিলেও করিতে পারে। অতএব ইহাদিগের সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনেচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ওহে ভাই সকল! আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানিনা, অনুগ্রহ করিয়া কহিয়া দেও।" এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল "ওহে পথিক! ভাল, বল দেখি, যদি এই খানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হানি কি?" পর্য্যটক উত্তর করিলেন "তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে, কিন্তু সে সকল কথা কহিবার অবকাশ নাই—এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম—নচেৎ চলিলাম"। বনেচর কহিল "তুই আর কোথা যাবি?—জানিস্ না, আমরা এই কানন-রক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমরা শুল্ক আদায় করি—আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিয়া যাইতে পারে না"। পথিক কহিলেন "ভাই আমি পণ্যজীবী বণিক্ নহি, কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করি না।—আমার স্থানে কি শুল্ক পাইবে"। তস্কর তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, 'ওরে মূর্খ! তুই নিঃসহায়, আমরা আট জন, তোর দুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আট জনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি?—যদি ভাল চাহিস্, তবে বাক্‌ছল পরিত্যাগ কর, সমভিব্যাহারে যে ধন-সম্পত্তি বা ভক্ষ্য-সামগ্রী সম্ভার আছে

সমুদায় আমাদিগকে আনিয়া দে, দিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যা, নিবারণ করিব না—আমাদিগের এই ব্যবসায়, কেহ কখন আমাদিগের কথার অন্যথা করিতে পারে না"। "তবে তোমরা চৌর্য্যবৃত্তি"? "আমরা চোর হই বা না হই সে কথায় তোর প্রয়োজন কি"?। "এই প্রয়োজন, যে তোমার সাতজন মাত্র সহায়, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসত্ত্বে আমি আজ্ঞাবহ হইব না"। তস্কর পথিকের সাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগিগণকে কহিল, "এ বেটা বলে কি রে?—এ যে মরিতে বসেও কার্দ্দানি ছাড়ে না—ভাল দেখা যাউক, দুই এক ঘা ওসারিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে" এই বলিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল—"আইস তোমার পিঠ্‌বোচ্‌কাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুব্জের মত পিঠে থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে, একবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রূপখানি দেখাও"। পথিক তস্করের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "রে চোর! আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমত কোন সুখ পাই নাই এবং কখন পাইব এমত আশাও করিতেছি না যে, জীবনভয়ে কাতর হইয়া তোর শরণ প্রার্থনা করিব—মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয়—অতএব সাবধান হইয়া আমার গতি রোধ কর্"। এই বলিয়া পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। চোরেরা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল। পরে এক জন দুরাত্মা দূর হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য হস্তে শর নিক্ষেপ করিল। পথিক তৎক্ষণাৎ শরকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন,কিন্তু শরধারে বাহুর শিরা ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভুজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত্র করিল, এবং তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত থলিয়া মোচন করিয়া ফেলিল।

লুব্ধেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির করিয়া দেখে তাহাতে এমন কিছুই নাই যে, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ অদ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিল।

অনন্তর তস্করপতি নিজ অনুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন "দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘাটা আরাম না হয়, আমাদিগের সঙ্গেই থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে"। এইরূপ কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করত তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যবর্ত্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতিপয় কুটীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটীর তস্করদিগের নির্ম্মিত এবং তাহাদিগের পরিজনের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটীর প্রস্তুত করিয়া দিল। পান্থ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিন দিবস যাপন করিলেন। তাঁহার বাহুর ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, আর দুই চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমত সময়ে তস্করেরা একত্র হইয়া তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল, "শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ-শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণের পুরস্কারে পরাঙ্মুখ নহি, তোমার পাথেয় দেখিয়া নিতান্ত দুরবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারী করিতে স্বীকার করিলাম; দেখ আমাদিগের কন্যা কলত্রাদি আছে এবং আমরা বনেচর বলিয়া নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না—ইচ্ছা হয়ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূর্ব্বে যে অভিসন্ধি করিয়াছি অবশ্য তাহাই করিব"। পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিব না—বরং তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যে, আমাকে কোন রহস্যানুসন্ধান জ্ঞাত করিও না, করিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা জানিবে"। তস্করপতি কহিলেন—"আমরা সে ভয় করি না। সাহসী বীরগণ কখন বিশ্বাস-হন্তা হইতে পারে না, বিশ্বাস-ঘাতকতা নীচ-প্রকৃতি ভীরুগণেরই ধর্ম্ম"। পথিক কহিলেন "তোমরা সে আশা পরিত্যাগ কর, চোর ও দস্যু প্রভৃতি যে সকল দুরাত্মা মনুষ্যমাত্রেরই অপকারক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির ন্যায় উচ্ছেদ

করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—না করিলে,ধার্ম্মিকগণের অনুপকার করা হয়"। চৌরপতি পথিকের ভৎর্সনা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আর তোর সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুই না ধার্ম্মিক জনের, না সাহসীপুরুষদিগের সংসর্গী হইবার যোগ্য—অতএব তুই যাদৃশ নীচপ্রকৃতি অচিরাৎ তদুপযুক্ত দাস্যবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি"। পথিক উত্তর করিলেন "নিরস্ত্র এবং আহত ব্যক্তিকে অধার্ম্মিক ভীরুজনেরাই অপমান করে—তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই"। চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত কহিলেন "ভাল ভাল এত বাক্ বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই—তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে, অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি"। এই বলিয়া তস্করেরা পথিককে সমভিব্যাহারে করিয়া চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্ব্বোধ, যে এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমত কোন কর্ম্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়।

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম সহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন আলয়ে আনিয়া বিশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক ভেষজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়া ঐ দাসটীর প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দাসটীর জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না,—কি করি?—অথবা উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে পাই, তাহাতে উহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে পারে, তবে দাস্যবন্ধন হইতে

মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না"? "মহাশয়! এ কথা কি জিজ্ঞাস্য? পিপাসাতুর কি জল পান করিতে পরাঙ্মুখ হয়"? "ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না"। "কি প্রকারে তুষ্ট করিব, অনুমতি করুন"। "অর্থদ্বারা"। দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল "স্বাধীনতা প্রাণিমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি—তাদৃশ অধার্ম্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে"। এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে লোহিত বর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। দাস-বণিক্ ভয়ে সঙ্কুচিত-চিত্ত এবং ম্লান-বদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল। সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল, যাহাতে দাসকে অন্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায়।

কিয়দ্দিনান্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান প্রদেশাধিপতি অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান্ অলেপ্তাগীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণে বদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামি বাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। এক দিন দুই জনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময়ে রাজা নিজ দাসের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা খ্যাপন করিলে দাস কহিতে লাগিল।

"মহারাজ! আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অতি সঙ্ক্ষেপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা 'কালিফ্ ওথ্মানের' আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল 'ইস্দগর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাঁহার সন্তানেরা তদ্দেশের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয়জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি।—আমার পিতা নির্ধনছিলেন, সুতরাং বালক কালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বপু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও পরিশ্রমানুরক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমঙ্কর বলিয়া মানি।—পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্দ্রিয় দমন করিতে এবং জগৎপাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে অভ্যাস করিয়াছিলাম।—শৈশবাবধি আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশ মোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল

কোন রাজসংসারে যোদ্ধৃ-কর্ম্ম স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক পরাভূত এবং দাস্যে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্দ্ধমান আশালতা একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে"

আলেপ্তাগীন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে এবং সর্ব্বসৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ উচ্চপদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। তাঁহার দান্তস্বভাব ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সুশিক্ষা সম্পন্ন হইল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাজ্য ও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণে চক্ষুকর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমৎকার! যে ব্যক্তি সহায় সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহ ভল্লূকের সহবাসী হইয়াছিল, যে নানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন-মৃত্যুস্বরূপ দাসত্ব-দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথ্বিপতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল! পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা! তিনি অতি উচ্চকে নীচ করিয়া এবং অতি অধমকেও প্রধান পদারূঢ় করিয়া মানবকুলকে সর্ব্বদাই সাংসারিক বিভবের অস্থায়িত্ব এবং ধর্ম্মপদার্থের অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান মন্ত্রী এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং বাল্যাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরম সুখ অধিকতর প্রীতিজনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেপ্তাগীন্ রাজার একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার যাদৃশ লাবণ্য-মাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাহার পাণি গ্রহণাভিলাষে আসিয়া নিরন্তর উপাসনা করিত। কিন্তু রাজকন্যা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়া অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজার অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়িযুগলের প্রীতি-প্রফুল্লনেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণদৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকসিত হইয়া উঠে, এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়। একদিন প্রধান মন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বর্ত্ম করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্ত্তৃক

সেই বর্ত্ম দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে! প্রধান মন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরল হৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন "আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইতে অসম্মতা নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনূঢ়াবস্থায় পিতার অসম্মান করে, সে যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবনা অতি বিরল"। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম, তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া শঙ্কা হয়"।

সেই দিনেই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান—এই জীবন-বৃক্ষের একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বারা আমার সংসার কানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাঁহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মতা হয় নাই—আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে"। মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার কন্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মতা আছেন; কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা; এক্ষণে আপনকার অনুকূলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে"। রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন "যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহ সংস্কার

সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,—যাহাহউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই"।

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মজার উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাত কুলশীল জনের সহিত কন্যার পরিণয় সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ মৎসর-ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভূত প্রজাসাধারণ অত্যন্ত প্রফুল্লমনে আনন্দ মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে আলেপ্তাগীন গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে পুত্র পৌত্রাদি কেহ না থাকাতে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী হইয়া নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবক্তাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন। ইহাঁরই পুত্র গজনবী মহম্মুদ, যৎকর্ত্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার সম্ভুক্ত হয়।

অঙ্গুরীয় বিনিময়।

প্রথম অধ্যায়।

পর্ব্বত-শ্রেণী সকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্রাচীরবৎ সমান উচ্চ বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে, এবং সেই সকল দ্বার অবলম্বন করিয়াই নির্ঝরিণী সমস্ত নির্গত হয় এবং মনুষ্যপশ্বাদি এক দিক হইতে অপর দিকে যাতায়াত করে। কিন্তু ঐ সকল পর্ব্বতীয় পথ অত্যন্ত কুটিল, কোথাও কোথাও অতিশয় সংকীর্ণ এবং প্রায় সর্ব্বস্থানেই বন্ধুর। এতাদৃশ পথের নাম গিরি-সঙ্কট। ভারতবর্ষের নৈর্ঋত ভাগে যে মলয় পর্ব্বত সমুদ্রের বেগ রোধ করিতেছে, তাহাতেও ঐরূপ অনেক গিরি-সঙ্কট আছে।

একদা তত্রত্য উপত্যকাবিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি—কেহ বা পাদচারে কেহ বা অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতীয় শিলা সকল উদ্ভিদ্-সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া, তাহারা সুস্নিগ্ধ সমীরণবাহী সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্য্যাস্ত না হইতে হইতেই, উদগ্র গিরিশিখরচ্ছায়ায় সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধ-তমসাবৃত হইতে লাগিল। অনতিদূর গমন না করিতে করিতেই, শৈল সমুদয়ের বিচ্ছেদভাগ অন্ধকারপূর্ণ হওয়াতে পথিকেরা আপনাদিগকে অভেদ্য-অসিতবর্ণ প্রাকারবেষ্টিতবৎ অবলোকন করিলেন। ঊর্দ্ধভাগে দৃশ্যমান সমুদায় নভোভাগ নক্ষত্রময় হইয়া শ্বেতকার্ষ্মিক ঘটিত নীল চন্দ্রাতপ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। শ্রুত আছে, সুগভীর কূপাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে দিবসেও গগনবিহারী নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পথিকেরা সন্ধ্যার প্রথমাবস্থাতেই সেই গভীর পর্ব্বত তল হইতে তাদৃশ তারাচয় নিরীক্ষণ করিয়া সেই

কথা সপ্রমাণ করিলেন। কিন্তু গিরিতলস্থ নিবিড় অন্ধকার, নক্ষত্রগণের মৃদুল-জ্যোতিঃ দ্বারা ভেদ্য হইবার নহে, অতএব পথিকেরা অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যস্থ দিব্যগঠন ও বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রাবৃত যে শিবিকা ছিল, তদ্বাহকেরা,ঐ বন্ধুর পথে পাছে স্খলিতপদ হয়,এই জন্য সকলে বিলম্ব করিয়া যাইতেছিলেন। শিবিকা-বাহকগণের অস্পষ্ট শব্দ পরম্পরা, সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও রক্ষিবর্গের পরস্পর কথোপকথন এবং পথ-প্রদর্শকদিগের উচ্চস্বর, চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, যেন সহস্র সহস্র ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া পথিকদিগের শব্দের অনুকরণ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল।

এবম্প্রকারে যাইতে যাইতে পথিকেরা এমনি একটি সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হইলেন যে, তাহাতে দুই জনও পাশাপাশি হইয়া গমন করা কঠিন। কোন সময়ে ভূমিকম্প দ্বারা তথায় উভয় পার্শ্বে স্থূলোপল সমস্ত ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পথটিকে তাদৃশ অপ্রশস্ত করিয়া থাকিবে। শিবিকা-বাহকেরা সেই স্থানে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া অতি যত্নে শিবিকা নির্গমন করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এইরূপে শিবিকা নির্গত হইবামাত্র হঠাৎ তদ্বাহকেরা কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ কর্ত্তৃক একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের ন্যায় কতিপয় বলবান পুরুষ তাহাদিগের স্কন্ধদেশ হইতে শিবিকা আচ্ছিন্দন করিয়া অতি ত্বরিত-গমনে প্রস্থান করিল। রক্ষিবর্গ ঐ আক্রমণ কোলাহল শুনিয়া শিবিকা রক্ষার্থে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলে তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী পুরুষ আক্রমণকারী জনৈকের শূলাগ্রবিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার সেই ভয়ানক রোদন শব্দে পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যচয় ভয়ে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন আক্রমণ-কারীদিগের মধ্যে একজন সুগভীর স্বরে কহিল—"এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই প্রাণ হারাইবে। যে যেখানে আছ স্থির হইয়া থাক, স্বল্পক্ষণেই নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে দিব"। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি হাস্য করত কহিল, "কখন দেখিয়াছ একটিমাত্র শাখামৃগ, ভিমরুল চাকের দ্বার রোধ করিয়া কেমন একটী একটী করিয়া সমুদায় ভৃঙ্গ বিনাশ

করে? বাহির হইবার চেষ্টা করিলে তোমাদিগেরও সেই দশা হইবে"। রক্ষিবর্গের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আমাদিগের শিবিকা কোথায়?" "শিবিকা যেথায় হউক সে কথার প্রয়োজন নাই—তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা তদারোহিণী কিশোরী কে, তাহা বিলক্ষণ জানি, অতএব তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভ্রমের ত্রুটি হইবে না। তিনি এই দুর্গম পথ-পরিশ্রমে অবশ্য শ্রান্তা হইয়াছেন, অতএব একবার আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, হানি কি? "হায়! আমরা প্রভুকে কি বলিব—তুমি কে?" "আমি যে হই, তোমরা বাদসাহকে কহিও তিনি যাহাকে পার্ব্বতীয় দস্যু বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহার আজ্ঞা সেই দস্যুরই করকবলিত হইয়াছেন"। এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই শিবিকাবাহীরা সেই সুপরিজ্ঞাত পথ দ্বারা অতি দূরে প্রস্থান করিল, এবং যিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনিও হঠাৎ শত্রু সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আরঞ্জেবের সৈন্যগণ বহির্গত হইয়া বাদসাহকে কি প্রকারে এই অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা বাদসাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি অতি ক্রূর-প্রকৃতি ছিলেন। কোন অননুভূতপূর্ব্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ঘটনা কর্ত্তৃক যদি কোন প্রযুক্ত-কর্ম্মের ত্রুটি হইত তথাপি ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার স্বেচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটিয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পরুষ দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বস্তুতঃ আরঞ্জেবও অন্যান্য নৃশংস-স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ন্যায় একান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ছিলেন—ক্ষান্তি, দয়া ও সমবেদনা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতেন না। অতএব তাহারা সকলে অক্ষত-শরীর থাকিতে তদ্রক্ষিতা রাজপুত্রী শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এই সংবাদ লইয়া তাদৃশ প্রভুর সমীপগমনে সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে সকলে এক মত হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে, বাদসাহকে কহিব, হিন্দুজাতীয় শিবিকা বাহকেরাই দুষ্টতা করিয়া আমাদিগকে বিপথে আনয়ন করত দুর্বৃত্ত দস্যুর হস্তগত করিয়াছিল। বাদসাহের প্রথম ক্রোধোদ্যমে ইহারাই বিনষ্ট হইবে, আমরা সকলে রক্ষা পাইলে পাইতে পারি। আহা! প্রকৃতদর্শী পণ্ডিতেরা উত্তম কহিয়াছেন যে, অন্যে আমাদিগের সমক্ষে অপ্রিয় বাক্য

পরিহারপূর্ব্বক যে, সর্ব্বদাই অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে তাহাও আমাদিগের দোষ। যেহেতু আপনারা ক্ষমাবান হইলে কাহার মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিবার প্রয়োজন থাকে না। সে যাহাহউক, সামন্তবর্গ এইরূপ স্থির করিয়া দুর্ভাগ্য বাহকবর্গকে রজ্জু বদ্ধ করিয়া লইল, এবং যেখানে দিল্লীশ্বর আরঞ্জেব মাদুরা নগর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়া পরম প্রিয়তমা আত্মজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় শীঘ্র গমনে উপনীত হইলেন। বাদসাহ স্বীয় দুহিতা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটন ঘটনা শ্রবণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, সৈন্যগণের অনেক নিগ্রহ করিলেন, এবং দুরদৃষ্ট বাহকেরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডার্হ হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

এখানে শিবিকাপহারীরা বাদসাহ-পুত্রীর শিবিকা বহন করত নানা কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হইয়া একটী পর্ব্বতীয় দুর্গসমীপে উপনীত হইল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থান পর্ব্বতের অধিত্যকা, অতএব তারা এবং চন্দ্র কিরণে উপত্যকা অপেক্ষা শিথিলান্ধকার ছিল। তথায় কোন বিশেষ সঙ্কেত করিবামাত্র দুর্গস্থিত ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধ হইতে একটী দোলাযন্ত্র অবতারিত করিয়া দিল। নৃপাল-তনয়া বহুবিধ সম্মানপুরঃসর তাহার উপর আরোহণ করিতে আদিষ্ট হইলে তিনি অগত্যা শিবিকা ত্যাগ করিয়া ঐ দোলাযন্ত্র অবলম্বন করত চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। দোলা-যন্ত্র নারিকেলত্বঙ্ নির্ম্মিত কঠিন রজ্জু-সংযোগে নির্ব্বিঘ্নে শূন্যমার্গে উত্থিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ প্রান্তে উত্তীর্ণ হইলে, দুর্গের কবাট উন্মুক্ত হইল, তখন সকলেই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

বাদসাহ কন্যার আবাস হেতু ঐ দুর্গমধ্যে যে গৃহটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দিল্লীর রাজ-ভবনে যাদৃশ মহামূল্য গৃহোপকরণ শোভাসামগ্রী পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এখানে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরও অসদ্ভাব ছিল না। রাজভবনে হেমপাত্র পরিপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সকল গৃহ আমোদিত করিত, এখানে অগুরু চন্দন ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধ সুগন্ধি পুষ্পাদি তাঁহার সেবার্থে সমাহৃত হইয়াছিল। পিত্রালয়ে কাশ্মীর দেশ প্রসূত সালের শয্যায় উপবিষ্ট হইতেন, এখানে সুকোমল রোমশ-পশু

চর্ম্মে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অন্তঃপুর রক্ষিগণ সর্ব্বদা নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদৃশ কিছুই দৃষ্ট হইল না।

তৎকালে বাদসাহ-পুত্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে যদিও প্রধানাসুন্দরীদিগের মধ্যে গণ্য করিতে না পারা যায়, তথাপি অবশ্যই প্রশংসনীয়রূপা বলিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটী একটী করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা সুস্থশরীর এবং আনন্দ-যুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাদৃশ মনোহারিতা হয়, নৃপদুহিতা সেই শোভাতেই জনগণের কমনীয়া ছিলেন। পিতৃ-শত্রুর কবলিত হওয়াতেও তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি মনে মনে জানিতেন পিতা সকল সন্তান অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ করেন, অতএব অচিরাৎ তাঁহার উদ্ধারার্থ যত্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; এবং প্রবল প্রতাপ আরঞ্জেব যত্ন করিলে কৃতকার্য্য হইবার অসম্ভাবনা কি? এই ভাবিয়া রোসিনারা নিশ্চিন্ত-প্রায় ছিলেন। বরং মধ্যে মধ্যে এমনও মনে করিতেছিলেন, এই দুর্ব্বোধ দস্যুরা পিতার সন্নিধানে বিপুল অর্থ পাইবার লোভেই আমার শরীর আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের অর্থ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, জাত ক্রোধ বাদসাহের সমক্ষে প্রাণ রক্ষা হওয়াও ভার হইবে—আমি সেই সময়ে তাঁহার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত যত্ন করিয়া ইহাদিগের মহাসম্ভ্রম সূচক ব্যবহারের প্রত্যুপকার প্রদান করিব। এই রূপে রোসিনারা অনুদ্বিগ্ন-মনা হইয়া কিঞ্চিৎ উপযোগানন্তর রাত্রি যাপন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় আবাস গৃহ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ফর্দ্দৌসি, হাফেজ, সেখ সাদি প্রভৃতি মহা কবিগণের পারস্য ভাষায় বিরচিত রমণীয় কাব্য গ্রন্থ সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে। রোসিনারা বাল্যাবস্থায় স্বজাতীয় ভাষা পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। কাব্য পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সকল তাদৃশ স্থলে প্রাপ্ত

হইয়া তাঁহার অত্যন্ত চমৎকার জন্মিল। অতএব স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার ঐ সকল পুস্তক এবং কে বা সেই দুর্গস্বামী, জানিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই তাঁহার কৌতূহল পরিপূরণ করিল না। দাসীগণ কেহ বা মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল, আর কেহ বা মাতঃ কেহ বা স্বামিনি অথবা কিশোরি ইত্যাদি সমর্য্যাদ সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিল, "আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন—আমরা এই বিষয় কিছুই বলিতে পারিব না—কর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিবেন—আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, তিনি তোমার মনোরঞ্জনার্থেই এই সকল পুস্তক এবং তোমার সেবার্থেই আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন"। এই সকল কথায় বাদসাহ পুত্রীর কৌতূহল আরও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় উদ্ধারের জন্য যত উদ্বিগ্ন না হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি তাদৃশ ভাবসম্পন্ন কে, ইহা জানিবার জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইলেন।

এইরূপে তিন রাত্রি গত হইল, চতুর্থ দিবস প্রাতে দুর্গ মধ্যে বহু-জন-সমাগমের শব্দ কর্ণগোচর হইল, এবং দাস দাসীবর্গ চকিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। রোসিনারা এই সকল লক্ষণে অনুমান করিলেন, দুর্গস্বামী আসিয়াছেন, অতএব শীঘ্রই তাঁহার সন্দর্শনলাভ করিব। এই স্থির করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যহ যে সকল দাস দাসী তাঁহার পরিচর্য্যার্থ যাতায়াত করিত, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই গৃহান্তরালে আসিল না। ক্রমে বেলা অধিক হইল, এবং বাদসাহপুত্রী অত্যন্ত চঞ্চল-চিত্তা হইয়া আহারে অনিচ্ছা খ্যাপন, পরিচারিকাদিগের প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অশ্রু বিনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ, অথবা আপনাকে দুর্গ-স্বামীর অবজ্ঞেয় বোধ, তাহা নির্ণীত হয় নাই—তাহা ভাবুক জনেরই নির্দ্ধার্য্য।

এমত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যক্তি বিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষঃ, বিশাল গ্রীবা এবং আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদায় বীর-

লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্র, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম। কোন মহাকবি কহিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া উহাই অন্যান্য অবয়ব এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বভাব জ্ঞাপক হয়। কারণ যাহা হউক, ফল সত্য বটে তাহা নিঃসন্দেহ। ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখিলেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত। যাহার প্রতি সেই দৃষ্টিপাত হইত তিনি বুঝিতেন, এই ব্যক্তি আমার সমুদায় গূঢ় অন্তঃকরণ-বৃত্তি পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, অতএব কেহই তাঁহার নয়নের সহিত নিজ নেত্রের সঙ্গতি করণে সাহস করিত না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই কেবল অধৃষ্যতার লক্ষণ ছিল। নচেৎ আর সর্ব্বমুখাবয়ব মাধুর্য্যভাব প্রকাশক এবং যথাবিন্যস্ত প্রযুক্ত সুদৃশ্য ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ। ফলতঃ পুরুষ-শরীর বলবিক্রম প্রকাশক না হইলে সম্পূর্ণরূপে সুশোভন হয় না। ঐ শরীরে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু উহা অপরিসীম বীর্য্যবান্ হইয়াও একান্ত কর্কশ অথবা অকোমল বলিয়া অনুভব হয় নাই।

তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ বাদসাহ পুত্রীর সম্মুখীন হইয়া ঈষদবনত-মস্তকে অভিবাদন করত নিজ বক্ষে বাহুবিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ-পুত্রী তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন বোধ হয় না। যাহাহউক, আগন্তুক তাঁহার প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টি সহকারে মৌনাবলম্বনে রহিলেন দেখিয়া রোসিনারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কোন্ ব্যক্তি আমাকে এইরূপ আতিথ্য স্বীকার করাইতে-ছেন আপনি বলিতে পারেন?" আগন্তুক উত্তর করিলেন 'শিবজী'। রোসিনারা কহিলেন—"আমি দিল্লীশ্বর আরঙ্গেবের কন্যা, কি জন্য এবং কোন্ সাহসেই বা শিবজী আমার গমনের ব্যাঘাত করিয়া এই দুর্গমধ্যে আনয়ন করিলেন"? "আপনি বাদসাহ-পুত্রী তাহা অপরিজ্ঞাত নহে—এবং শিবজী বাদসাহের সহিত স্থির সৌহার্দ্দ এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তদ্দুহিতাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন"। "একি অসঙ্গত

কথা! তৈমুর বংশসম্ভূত দিল্লীশ্বরের সহিত পর্ব্বতীয় দস্যুর সম্বন্ধ নিবন্ধন!" শিবজী, কিঞ্চিৎক্ষণ নতশিরঃ থাকিয়া মুখোত্তোলন পুরঃসর উত্তর করিলেন "আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পর্ব্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। যদি বলেন আমার বংশমর্য্যাদা এরূপ নহে যে তৈমুরলঙ্গ বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ যোগ্য হই, তাহার উত্তর এই যে, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্ত বিশ্রুত-নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন? আমি এই পর্ব্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান্ নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্ত্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে। সে যাহা হউক, আপনি এক্ষণে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে থাকুন। কেবল মাত্র এই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, নচেৎ আর আর সর্ব্ব বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার সাক্ষাৎকারমাত্র প্রার্থনা করি। বোধ হয় কালে আমাকে দস্যু অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে বিদায় হই"।

এই বলিয়া শিবজী অতি মধুর হাস্যমুখে বাদসাহ পুত্রীর প্রতি স্নিগ্ধ-দৃষ্টি করত প্রস্থান করিলেন।

———০*০———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০*০—

অস্মদ্দেশে 'মোগল পাঠান' নামক একটী যুদ্ধানুকরণ ক্রীড়া প্রচলিত আছে, সকলেই জানেন। কিন্তু যাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করা নাই তাঁহারা জানেন না যে, ঐ ক্রীড়াটি দুই প্রবল মুসলমান জাতির পূর্ব্ব-কালীন বাস্তবিক বৈরিতার প্রকাশক। ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথমে সিন্ধু-নদের পশ্চিমাঞ্চলবাসী পাঠান জাতীয় মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়। তাহারা অগ্রে ইহার উত্তরাংশ পরে দক্ষিণ ভাগ জয় লব্ধ করে। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য বহুকাল একচ্ছত্র থাকিবার নহে। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চল অতি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভূপাল বংশের অধিকৃত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে হিমালয়ের উত্তরাংশ-নিবাসী মোগল জাতীয়েরা আসিয়া দিল্লীস্থ পাঠান বাদসাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশের পাঠান রাজারা বহুকাল স্বাধীন ছিলেন। প্রবল প্রতাপ মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের দিন দিন বল হীন হইতে লাগিল, তথাপি উহাঁদের রাজধানী বিজয়পুর কখন সর্ব্বতোভাবে শত্রুগ্রস্ত হয় নাই।

এতাদৃশ সময়েই শিবজীর জন্মগ্রহণ হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অসামান্য বুদ্ধি সহকারে কখন বা মোগলদিগের সহায়তা করিয়া কখন বা পাঠানদিগের পক্ষ হইয়া, আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মি মুসলমানদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার স্থির সখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিতেন যে, এক জাতীয় রাজারা যে সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার শেষে সন্ধি-বন্ধন হইয়া সমুদায় বিবাদ নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জাতিবিশেষ প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর জাতীয়দিগের পরম প্রিয়তর ধন ধর্ম্ম বিনাশে যত্নশীল হয়, সেখানে আর সন্ধির কথা থাকে না। সেখানে যত কাল একের সম্পূর্ণ তেজোহ্রাস, অথবা সমূলে সংহার না হয়, তাবদ্দিন সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। শিবজী এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাদৃশ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চতুরতা অপেক্ষাও তিনি যে সকল নিয়ম-নিবন্ধন এবং সৈন্য-শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় করেন, তদ্দ্বারা অধিক কার্য্য সাধন হয়। তাঁহার পৈতৃক অধিকার পুনা প্রদেশে অতি সবল শরীর এবং প্রভুপরায়ণ এক প্রকার সঙ্কর জাতি নিবাস করিত। শিবজী সেই সকল লোককে সুশিক্ষা-সম্পন্ন করিয়া খড়্গ এবং মল্ল-যুদ্ধ-বিশারদ 'মাওলী' নামক পদাতি সৈন্য প্রস্তুত করেন। আর অনতিদূরবর্ত্তী বরণা, রেবা ও ভীমা প্রভৃতি নদীকূলে এক প্রকার খর্ব্ব-গঠন বীর্য্যবান্ অশ্বজাতি প্রসূত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সেই সকল স্থান আধিকার সম্ভুক্ত করিয়া 'বর্গী' নামক উত্তম অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করেন। অপরন্তু, পরশুরাম-ক্ষেত্র (যাহাকে কঙ্কণ দেশ বলে) জয়লব্ধ হইলে তত্রত্য নিকৃষ্ট জাতীয় অনেককে সৈন্য সম্ভুক্ত করিয়া গোলন্দাজ এবং ধানুষ্ক প্রস্তুত করতঃ পদাতিদিগকে 'হিতকরী' এবং অশ্বারোহী সকলকে 'সিলিদার' আখ্যা প্রদান করেন। আর তথাকার যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সৈন্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া—কখন সন্ন্যাসী কখন গণক এবং কখন বা ফকীর অথবা ঐন্দ্রজালিক ইত্যাদি বেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থলের সমুদায় রহস্য সন্ধান আনিয়া শিবজীর কর্ণগোচর করিত। এই সকল চর 'যাসু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ যাসুদিগের সহায়তায় শিবজী নানা সঙ্কট উত্তরণ এবং বিবিধ প্রকারে শত্রুদ্রোহ করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারাই দিল্লীশ্বর-কন্যার পিতৃ সন্নিধানে আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে, এবং সেই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোসিনারাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হরণ করিয়া আনেন।

শিবজী বাদসাহ-পুত্রীকে হরণ করিয়া যে দুর্গ মধ্যে আনয়ন করেন, তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। তথায় শত জন সাহসী ব্যক্তি মিলিত হইলে দশসহস্র বিপক্ষ সেনাকে পরাভব করিতে পারে, বিশেষতঃ তাহার পথ শিবজীর নিজ অনুচর ব্যতীত আর প্রায় কাহারও জ্ঞাত নহে, সুতরাং তথায় রাজ-পুত্রীকে আনিয়া তিনি তদপগমন বিষয়ে এককালে নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন।

রোসিনারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্য্যভাবে বশীভূতা হইলেন। তিনি এক দিনের জন্যও শত্রু-

গ্রস্ত হইয়াছেন এমত অনুভব করিতে পারেন নাই। যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুতঃ পিত্রালয়ে যেরূপ সর্ব্বদা গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধা থাকিতেন, ঐখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বাধীনা হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যহ এক এক বার করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কথোপকথন কালে অতি সরল মনে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য্য বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণা সমুদায় পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহপুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীর পুরুষের সহিত মিলিত-জীবন হওয়া প্রার্থনীয় বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই শুনিয়া এমন অনুমান করিবেন যে, সুবুদ্ধি শিবজী কেবল কৌশল দ্বারা রোসিনারার মনোহরণ করিলেন, তাঁহারা মনুষ্য প্রকৃতির বাস্তবিক রহস্যানুসন্ধায়ী নহেন। সত্য বটে, যখন শিবজী আরঙ্গেব কন্যাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূর্ব্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত ঝটিতি সক্ষম হইলেন। মনুষ্যেরা যতই কেন কৌশল অবলম্বন করুন না, এবং ঐ কৌশলকে যতই কেন কার্য্যক্ষম বোধ করুন না, ফলতঃ তদ্দ্বারা অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রোসিনারা স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন যে, মিষ্ট কথা সুসামাজিকতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপঢৌকন প্রদান কেবল বদান্যতা হইতেও জন্মে, কিন্তু যে নায়ক নানা কার্য্যব্যাপৃত হইয়াও নিজ সময় দানে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনি বাস্তবিক স্নেহভাবসম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। শিবজী প্রত্যহ যে সকল মন্ত্রণা করিতেন তাহা ব্যক্ত করিয়া রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন, এবং পরদিবস, পূর্ব্বদিন কিরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আবার নূতন নূতন মন্ত্রণা স্থির করিয়া যাইতেন। অতএব বাদসাহপুত্রী আপনাকে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস এবং প্রীতি-ভাজন বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত একমত হইবেন আশ্চর্য্য নহে।

এই সময়ে আবার এমত একটী ঘটনা উপস্থিত হয়, যৎকর্ত্তৃক বাদসাহ কন্যার মন শিবজীর নিতান্ত বশীভূত হইল। রোসিনারা প্রত্যহ বৈকালে বিমল-পর্ব্বত বায়ু সেবনার্থ দুর্গ প্রাকারে গমন করিতেন। একদা ঐ সময়ে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের নয়ন গোচর হয়েন। সেনানী তাঁহার লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসমীপে স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ পুত্রীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন। শিবজী সেই সময়ে কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনান্তর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোসিনারার নিকট গমন পূর্ব্বক তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় বিদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে দুর্গরক্ষী তাবৎ ব্যক্তিকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া উক্ত সেনানীর সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিলেন, "তুমি অদ্য অতি জঘন্য কর্ম্ম করিয়াছ, দুর্ব্বলদিগের রক্ষা করাই যোদ্ধাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পীড়ন করা বীরপুরুষের কর্ম্ম নহে, তুমি যে স্ত্রীলোকের অপমান করিয়াছ আমাকেই তাহার রক্ষিতা বলিয়া জান, এবং এইক্ষণে অস্ত্রধারী হইয়া আমার সহিত দ্বৈরথ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সর্ব্ব সমক্ষে অসিচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে এক একটী কর্ম্ম করেন, তাহার নানা ফল হয়, অস্মদাদির শত কার্য্যও একটী অভিপ্রেত সাধনে সমর্থ হয় না। দেখ, শিবজী রাজ-শক্তি অবলম্বন দ্বারা অনায়াসেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ বলবান পুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রাণ-পণ করাতে একেবারে বাদসাহ-পুত্রীকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ এবং নিজ অনুচর বন্ধুবর্গকে বিশিষ্ট ভক্তিভাজন করা হইল।

পরে শিবজী এবং সেনানী উভয়ে সমান রূপ অস্ত্রধারণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই এক সময়ে স্ব স্ব কৃপাণকোষ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি হইলেন এবং উভয়েই একোদ্যমে পৃথ্বী, আকাশ, পর্ব্বত প্রভৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া যেন সকলের স্থানে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে পরস্পর নিকটাগত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ শিবজী শ্যেনবৎ বেগে উল্লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেনানীর ঢালে আপন ঢালের দৃঢ় প্রহার করতঃ

সেই উদ্যমেই তাহার প্রতি খড়্গ প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ ব্যর্থ হইল না। সেনানীর স্কন্ধদেশ হইতে শোণিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আক্রমণেও ঐরূপ হইল। প্রতিপক্ষ এইরূপে দুই বার আহত হইলে ব্যথিত-মর্ম্ম হইয়া মহা ক্রোধ সহকারে মহারাষ্ট্রপতির প্রতি আক্রমণ করিল। সেনানী, শিবজী অপেক্ষা শিক্ষা এবং বিক্রমে ন্যূন ছিল বটে, কিন্তু শারীরিক বলে এবং দৈর্ঘ্যতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। অতএব তাহার বিক্রান্ত ভুজবলে পরিচালিত তীক্ষ্ণধার অসির প্রহার হইলে শিবজী তৎক্ষণাৎ ছিন্নশীর্ষ হইতেন। কিন্তু তিনি নিজ ফলক দ্বারা সেই খড়্গাবেগ নিবারণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ আঘাতে তাঁহার ফলক একেবারে দ্বিধা হইয়া গেল। শিবজী ব্যর্থ চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণে বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ, ক্ষণে দূরে পলায়ন, কখন শত্রুর দক্ষিণ ভাগে, কখন বামে, এই তাহার সম্মুখে, আবার নিমেষ মধ্যেই পশ্চাতে, এইরূপে হুহুঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করাতে, শত্রু অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ক্রমশঃ শোণিত প্রস্রবণে নিতান্ত হীন-বল হইয়া দণ্ডায়মান হইল। শিবজীও তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, এবং সেনানী সেই আঘাতেই আর্ত্তনাদ সহকারে ভূতল-শায়ী হইল।

মহারাষ্ট্রপতি এই প্রকারে লব্ধ-বিজয় হইলেন বটে, কিন্তু আপনিও সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ ছিলেন না। সেনানীর দারুণ প্রহারে কেবল তাঁহার ফলকই ভিন্ন হইয়াছিল এমত নহে। খড়্গটা ঢাল ভেদ করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রীভাবে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হওয়াতে তথাকার অস্থি ভগ্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য অধিক শোণিত পাত হয় নাই। কিন্তু আন্তরিক পীড়ার পরিসীমা ছিল না। তথাপি ক্লেশ-সহিষ্ণু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনের কি মানসিক বল! শিবজী যুদ্ধ কালে অথবা তদবসানে তিলার্দ্ধেও কাতরতা প্রকাশ করিলেন না, সেনানীর মৃতবৎ দেহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অম্লান মুখে সকলকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে কহিয়া পরে নিজ আবাস গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু অল্প ক্ষণেই প্রচার হইল মহারাষ্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। এই দুঃসমাচার রোসিনারার কর্ণগোচর হইবামাত্র

তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া এক জন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিয়া শিবজীর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিবামাত্র শিবজী উন্মীলিত নেত্র এবং সহাস্য মুখ হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রোসিনারা বাক্য দ্বারা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু শিবজী তাঁহার জিজ্ঞাসু নয়ন দ্বয়কে আশ্বাস বাক্যে উত্তর করিলেন,"শস্ত্র ব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া এমত সুখ হইতেছে যে, তজ্জন্য এমত বেদনা শত শত বার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান হয়"। রোসিনারা ঈষল্লজ্জান্বিতা হইয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন,"আমিই এই অনর্থের মূল"। এই বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রপতির গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইনি যে পর্য্যন্ত সুস্থ না হয়েন তাবৎকাল সেবা করিয়া এই কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের যত্ন করিব। আহা! স্ত্রীলোকেরা কি মনুজগণের দুঃখ দূর করণার্থই সৃষ্ট হইয়াছেন! তাঁহারা সম্পদ এবং সুখ সময়ে যেরূপ হউন, কিন্তু প্রিয় জনের দুঃখ উপস্থিত হইলে আর অন্যভাব থাকে না। বিশেষতঃ রোগীর সেবায় সহিষ্ণু-প্রকৃতি স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার নিপুণ এবং মনোযোগী, পুরুষেরা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কে না দেখিয়াছেন, মাতা নিজ পীড়িত শিশুকে ক্রোড়ে শয়ান করাইয়া আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক কেবল তাহার মুখার্পিত নয়নেই দিবারাত্রি যাপন করেন?—কোন্ ব্যক্তি রোগ-সন্তপ্ত হইয়া নিজ সহোদরাদিগের অন্তঃকরণে ভ্রাতৃবাৎসল্য ভাবের অনুভব না করিয়াছেন?—আর কে বা তাদৃশ দুঃসময়ে নিজ প্রনয়িনীর কোমল করস্পর্শ সুখানুভব করতঃ আপনাকে বিগত-ক্লেশবৎ দর্শাইয়া প্রিয়তমার অন্তঃকরণের দুঃখভার মোচন করিবার যত্ন না করিয়াছেন?—অপিচ, কন্যাপুত্রবন্ত কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার কোন্ সন্ততিগণের কাকলীস্বর অধিকতর মধুর হয়?—কাহারদিগের মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপ একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়?—আর কাহারা ধৃষ্টস্বভাব ভ্রাতৃবর্গকে সান্ত্বনা করিয়া রাখে? অতএব আশৈশব মৃদুস্বভাব স্ত্রীজাতিই পীড়িত জনের প্রতি বিশিষ্ট সমবেদনা খ্যাপন করেন। ইটি তাঁহাদিগের একটী

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রায় বোধ হয়! দেখ বাদসাহ-পুত্রী রোসিনারা কখন কাহার সেবা শুশ্রূষা করেন নাই। তথাপি স্ব-ইচ্ছায় শিবজীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার ক্লেশ নিবারণার্থ নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবজী কতিপয় দিবস মধ্যেই স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। আর তাঁহার এই একটী অধিক লাভ হইল, রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করতঃ তাঁহার সহিত মিলিত-মন এবং বদ্ধ-প্রণয় হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন সুবর্ণখণ্ডদ্বয় অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইলে সহজেই সংযুক্ত হয়, তেমনি মনুজদিগের মনও দুঃখপরিতপ্ত হইলে শীঘ্র বদ্ধ-সৌহার্দ্দ হইয়া থাকে। অতএব মহারাষ্ট্রপতি একদা অনুরোধ করিলে তৎপত্নীত্ব স্বীকার করণে তখন তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি একটী পারস্য কবিতার অর্থ করিয়া প্রকাশ করিলেন, "গুরু-জনের অসম্মত কর্ম্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে, কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়েই সুখী হই"।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবজী কর্ত্তৃক আহত এবং পরাভূত হইয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রাণসম্বন্ধ বর্জ্জিত হয়েন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরস্ত্রাণ বস্ত্র ছিন্ন করতঃ ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং তদ্দ্বারা শোণিত প্রস্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রি যে তাঁহার জীবদ্দশায় যাপন হইবে এমত কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। মলয় পর্ব্বত বহু হিংস্রজন্তুর আবাস, বিশেষতঃ তথায় ব্যাঘ্র এবং সর্পভয়, বঙ্গদেশীয় সুন্দরবনের অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু দৈবাধীন সেই রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে প্রভাত হইল। পরন্তু পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষাও তাঁহার শরীর অধিকতর ব্যথিত দুর্ব্বল ও তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠ-তালু হইয়াছিল। পিপাসার পীড়ায় কাতর হইয়া সেনানী ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নির্ঝর পার্শ্বে গমন করিয়া সেই পবিত্র বারি পান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিলেন। এবং পুনরায় নিতান্ত দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তথায় নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন। সেই দিবা এবং রাত্রি এইরূপে গত হইল। কিন্তু পরদিন অনেক সুস্থ এবং সবল হইলেন। তিনি যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, মদ্যমাংসভুক্ হইলে অবশ্যই মৃত্যু কবলিত হইতেন। কিন্তু শিবজীর প্রায় সকল সৈন্যই শিব-পরায়ণ ছিল, মদ্যমাংস ভোজন করিত না, অথচ তাহারা কখন পরিশ্রম-বিমুখ বা অধ্যবসায়-বিহীন হয় নাই। যাহাহউক, সেনানী দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বন্য-ফল ভোজন এবং সেই নির্ঝর অম্বুপান দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ এইরূপে গত হইলে, তিনি ক্রমে অতি মৃদু গমনে স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করতঃ প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সমুদায় পর্ব্বতীয় পথ উত্তীর্ণ হইলে আরঙ্গেব বাদসাহের কোন সেনানীর স্কন্দাবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। দুর্বুদ্ধি মহারাষ্ট্র সেই শিবির সন্নিহিত হইয়া প্রহরিগণকে কহিল তোমরা আমাকে সেনানীর সমীপস্থ কর, আমি শিবজীকে ধৃত করিবার উপায় বলিয়া দিব। শিবির-রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে

সমাদর করিয়া সেনাপতির নিকট আনয়ন করিল। মুসলমান সৈন্যপতি তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "রে মহারাষ্ট্র! তোর বেশভূষায় দেখিতেছি তুই শিবজীর অনুচর হইবি, অতএব কি প্রয়োজনে এই সৈন্য মধ্যে আসিয়াছিস্ বল্?" মহারাষ্ট্র আপন শরীরের ক্ষতভাগ সকল দেখাইয়া কহিল, "যে দুরাত্মা এক্ষণে মহারাষ্ট্রপতি নামধেয় হইয়াছে সেই আমার এই দশা করিয়াছে। এই সকলের শোধ দেওয়াই আমার এখানে আসিবার তাৎপর্য্য।" "কিন্তু তোর কথায় আমার বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা কি? যে স্বজনের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, শত্রুর বিশ্বাসহন্তা হইতে তাহার কতক্ষণ?" মহারাষ্ট্র কিঞ্চিৎ ক্রোধ করিয়া উত্তর করিল, "যদি আমার দ্বারা স্বকার্য্য সাধনে আপনার এতই অনিচ্ছা হয়, তবে অন্য কোন মুসলমান সেনাপতির নিকট যাই।" এই বলিয়া গমনোদ্যম করিলে বাদসাহের সেনাপতি ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণই বোধ হইতেছে যে শিবজী কর্ত্তৃক আহত হইয়া ক্রোধপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আসিয়াছে। যদি অন্য কেহ ইহার সহায়তায় এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহারই সম্পূর্ণ যশোলাভ হইবে। অতএব ইহাকে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলাম, যদি কোন প্রকারে সেই দস্যুকে আমার হস্তগত করিতে পার তবে যথোচিত পুরস্কার করিব।" মহারাষ্ট্র কহিল, "আমার অন্য পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থ লোভে জন্ম-ভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি, কেবল সেই দুরাত্মার শোণিত দর্শন করিতে চাহি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার সেই মানস সিদ্ধ না হয়, তাবৎকাল বাদসাহের পক্ষ হইলাম।" মুসলমান সেনানী এই কথায় কিঞ্চিৎ চমৎকৃত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, সকল জাতিরই অভ্যুদয় কালে তত্তৎজাতীয় জনগণের ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি, সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট-তামস-প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি লোকান্তর গত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের উপরে

কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহারা সমুদায় ভারত রাজ্যকে কখন স্বদেশ বলিয়া বোধ করে নাই বটে। কারণ এই বিস্তীর্ণ দেশ নানাপ্রকার লোকের আবাস। এদেশীয়গণের ব্যবহার, ভাষা, বৃত্তি সকলই পরস্পর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সেই জন্য যখন যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্র খণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল। দেখ, ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্ম্মি শত্রুর স্থানে ভৃতি স্বীকার করিল না। তাহার তেজো-গর্ভ-বাক্যে মুসলমান সৈন্যপতি বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শীঘ্র ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুরস্কার গ্রহণ কর বা না কর, তুমি কি উপায়ে শিবজীকে আমার হস্তগত করিবে, বল?" মহারাষ্ট্র উত্তর করিল, "এক্ষণে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমি সুস্থ এবং সবল হই। পরে আমার সমভিব্যাহারে দুই শত উত্তম সৈন্য দিবেন। আমি অন্যের অবিদিত পথ দ্বারা তাহাদিগকে শিবজীর আবাসে লইয়া যাইব। পরন্তু আপনি অস্ত্র ধারণ করিতে না পারিলে অন্যের নিকট গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিব না। তিনি যেমন আমাকে দ্বৈরথযুদ্ধে আহত করিয়াছেন, আমিও স্বহস্তে তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে চাহি"। মুসলমান জাতীয়েরা স্বভাবতই জাল্ম, তাহাতে অবজ্ঞেয় হিন্দুর প্রমুখাৎ তাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু মুসলমান সৈন্যপতি তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনাভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির যথাযোগ্য সেবা এবং চিকিৎসার্থ ভৃত্য ও ভিষক্ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্র অতি গুপ্তভাবে তাঁহার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুসলমান সেনানী স্বয়ং শিবজীকে ধৃত করিবেন, এই মানসে নিজ বাদসাহকেও এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন না।

আরঙ্গেব কোন প্রকারে শিবজীর অনুসন্ধান বা আত্মজার উদ্ধারে সমর্থ না হইয়া কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্ত-

করিলেন। কিন্তু যাইবার কালীন তাঁহার যে সেনাপতির নিকট মহারাষ্ট্র সেনানী বাস করিতেছেন, তাহারই নিকট কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া আদেশ করিয়া গেলেন, শীঘ্র পর্ব্বতীয়-যুদ্ধ-নিপুণ জয়পুর প্রদেশাধিপতি রাজা জয়সিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবেন, যাবৎকাল তিনি না আইসেন ততদিন কোন বিশেষ চেষ্টা না করেন। এদিকে শিবজী ঐ সুযোগে অনেক পার্ব্বতীয় দুর্গ নিজ অধিকার সম্ভুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে শত্রু সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি চিরকাল এইরূপ ছিল। বিপক্ষকে প্রবল দেখিলে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ সকলের শরণ লইতেন, আর তাহাদিগকে ক্ষীণবল দেখিলে নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদা মহারাষ্ট্রপতি নিজ দুর্গ প্রাকারোপরি বায়ু সেবন করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন একজন নিম্ন ভাগ হইতে দুর্গে আসিবার নিরূপিত সঙ্কেত করিল এবং সঙ্কেতানুসারে দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক রজ্জু নিক্ষিপ্ত হইল। ঐ ব্যক্তি তদবলম্বনে দুর্গে প্রবেশ করিলে সকলে মৃত সেনানীকে পুনর্জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেনানী তৎক্ষণাৎ শিবজীর সমীপস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সহকারে কহিল, "সাক্ষাৎ শিবাবতার, শিবজীর জয়! এই অধীনকৃত অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক"। শিবজী ঐ সেনানীর প্রতি পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্নেহ করিতেন, এবং তাহার অপরিসীম বীর্য্য এবং সাহসিকতাগুণে তদ্দ্বারা তাঁহার অনেকানেক কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব সে তাঁহার হস্তে একেবারে প্রাণ বর্জ্জিত হয় নাই দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন, "তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিতে হইলে তোমার মুখ দর্শন করাও অযোগ্য, কিন্তু কেবল আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া যে কোন মহারাষ্ট্র স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে নিবৃত্ত থাকিবে আমার এমন অভিপ্রায় নহে—অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, কল্য প্রাতে বিবেচনা করিয়া তোমাকে দুর্গান্তরে নিযুক্ত করিব"। সেনানী অবনত শির হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রি দুই প্রহর সময়ে ঐ দুরাত্মা আপনার নির্দ্দিষ্ট নিলয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গ প্রাকারোপরি আরূঢ় হইল। জনৈক প্রহরী সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেনানী কহিল, "ভাই রে! অনেক দিন তোমাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আর কল্য প্রাতেই এখান হইতে যাইতে হইবে, অতএব ভাবিলাম যদি কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় কথাবার্ত্তায় রাত্রি যাপন করিব"। এইরূপ সরল ভাষায় প্রহরীর প্রতীতি জন্মাইয়া দুষ্ট ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং হঠাৎ তাহার পাদদ্বয় আকর্ষণ করতঃ তাহাকে একেবারে দুর্গের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিল। প্রহরী সেই উন্নত স্থল হইতে অন্যূন দুই শত হস্ত নিম্নে নিপতিত হইয়া একেবারে চূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ হইল। বিশ্বাস-ঘাতক তখন নিরুদ্বেগে অঙ্গাবরণের অন্তর হইতে একটি দীর্ঘ রজ্জু বাহির করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সেই রজ্জু দ্বারা এক জন বলবান মোগল যোদ্ধাকে উন্নত করিল। সেই ব্যক্তির স্থানেও ঐরূপ একটী রজ্জু ছিল। উভয়ে স্ব স্ব রজ্জু সংযোগে আর দুই জনকে দুর্গে আনয়ন করিল। এইরূপে মুহূর্ত্তৈক মধ্যে শতাধিক বিপক্ষ সেনা শিবজীর দুর্গান্তরালে প্রবিষ্ট হইল।

মহারাষ্ট্র সেনানীর মানস ছিল কোন গোলমাল না করিয়া শিবজীর গৃহে প্রবেশ করতঃ স্বহস্তে তাঁহাকে হনন করে। কিন্তু মোগল সৈন্যেরা ক্রমশঃ আপনাদিগকে বর্দ্ধিত-বল বুঝিয়া সাবধানতা চ্যুত হওয়াতে দুর্গ রক্ষিগণ অনেকে জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের একজন ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাষ্ট্রপতির গৃহদ্বারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহারাজ! শত্রু সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, উপায় করুন"। শিবজী তৎক্ষণাৎ নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে বাহির হইয়া কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই নিশীথ সময়ে মহারাষ্ট্র ভট সকলের 'হর হর ভবানী'! এবং মোগল সেনার 'আল্লাঃ আকবার'! এইরূপ যোধ-রাব পুনঃ পুনঃ গগন বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়রা দুর্গের পথ সকল উত্তম জানিত বলিয়া হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াও অতি উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মোগলেরা অন্ধকারে অপরিজ্ঞাত স্থানে তাদৃশ পরাক্রম প্রকা-

করিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী কতিপয় পর্ণ এবং তৃণ কুটীরে অগ্নিদান করিল। শিবজী দেখিলেন যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা নাই। অতএব সত্বর-গমনে বাদসাহ পুত্রীর গৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার পিতৃ সৈন্যে আমার দুর্গ অধিকার করিল—তোমার কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধ্য হইব"। রোসিনারা ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "যদি কোন উপায় থাকে, নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও না, পলায়ন কর, আর কখন যদি পুনর্ব্বার মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও"। এদিকে মোগলদিগের জয়ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সুতরাং আর বিলম্বের অবকাশ নাই, শিবজী শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্গের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন।

দুর্গের সেই ভাগ অন্যান্য দিক্ অপেক্ষাও বরং অধিক বন্ধুর হইবে। কিন্তু সেই পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখি-সকল জন্মিয়াছিল, আর নীচে একটী নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিবজী সেই বৃক্ষ সকলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিলেন। মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র গাছটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা পদভরে উন্মূলিত হইল। কিন্তু ভাগ্যবলে শিবজী বহুদূর নিপতিত না হইতে হইতেই আর একটী অধিকতর-বদ্ধমূল বৃক্ষকে ধারণ করিতে পাইয়া রক্ষা পাইলেন। সেই স্থান হইতে নদীজল অন্যূন বিংশতি হস্ত দূর হইবে। শিবজী নিকটস্থ কতক-গুলি তৃণ লইয়া আপন পৃষ্ঠতলে বিন্যস্ত করিয়া বাঁধিলেন, এবং পর্ব্বত পার্শ্বে পিচ্ছলাইয়া অনতি-ক্ষতশরীরে নদীজলে পড়িলেন। সেই স্থলে নদী গভীর ছিল, এবং তন্মধ্যে বৃহৎ শিলাদি কোন কঠিন পদার্থও ছিল না। অতএব বেগে জলমগ্ন হইলেও মহারাষ্ট্রপতির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি জলে ভাসমান হইয়া সন্তরণদ্বারা স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন।

গ্রন্থকার এইবার বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পাঠকবর্গকে উদার-চরিত্র শিবজী এবং কোমল-প্রকৃতি রোসিনারার সহিত পরিচিত করাইয়া তাঁহারি এমত অনুভব হইয়াছে যে, সকলেই ইহাদিগের পরে কি হইয়াছিল জানিতে

ব্যগ্র হইবেন। যতদিন তাঁহারা উভয়ে একত্র ছিলেন, একের বিবরণেই অপরের আনুষঙ্গিক বর্ণন হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের বিচ্ছেদ হইলে কাহার বিষয় অগ্রে বর্ণনীয়?—সর্ব্ব স্থানেই পুরুষের সম্মান অধিক। সুতরাং শিবজী পুরুষ বলিয়া তাঁহারই বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু এইক্ষণে কোন কোন সুধীর-স্বভাবা কামিনীরাও কাব্য শাস্ত্রাদি পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন, অতএব পাছে তাঁহারা কেহ রোসিনারার কথা না বলিলে মনোদুঃখ করেন এই জন্য বাদসাহ-পুত্রীর বিবরণ অগ্রে বলাই বিধেয় হইতেছে। যাঁহারা মনের দুঃখ মনেই রাখেন, তাঁহাদিগের মন রাখাই সাধু পরামর্শ! বিশেষতঃ মুসলমানেরা তাহাদিগের পরম শত্রু শিবজী মরিয়াছেন এই বিবেচনাই করিয়াছিল, এবং তিনিও কয়েক দিবস কোথায় কি করিতেছিলেন, প্রথমতঃ তাহার কিছুই প্রকাশ হয় নাই, অতএব এই অধ্যায় মধ্যেই সংক্ষেপে বাদসাহ-পুত্রীর কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মুসলমান সৈন্যপতি দুর্গাধিকার বার্ত্তা প্রাপ্ত হইবামাত্র মহা আনন্দসহকারে যাত্রা করিয়া পর দিবস তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ বাদসাহ-পুত্রীকে সহস্রাধিক সামন্ত সমভিব্যাহারে পিতৃ-সদনে প্রেরণ করিলেন। রোসিনারা কতিপয় দিবস পরে পথিমধ্যে রাজা জয়সিংহের সৈন্যে উপস্থিত হইলেন। সিংহ মহারাজ মুসলমান সৈন্যপতির লিপি প্রাপ্ত হইয়া জানিলেন, শিবজীর দুর্গ জয় হইয়াছে এবং তিনি প্রস্থান কালে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। অতএব তিনি যেমন শীঘ্র সসৈন্যে আসিতেছিলেন, তাহা না করিয়া বাদসাহকে সমুদায় শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন এবং পরে আপনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সেই স্থান হইতে রোসিনারা নির্ব্বিঘ্নে পিত্রালয় প্রাপ্ত হইলে বাদসাহ, একেবারে আত্মজার উদ্ধার এবং শিবজীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। কিন্তু কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথা প্রসঙ্গে তৎপ্রমুখাৎ শিবজীর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ কন্যার আর মুখাবলোকন করিবেন না। অতএব যে কারাগৃহ-তুল্য-অবরোধ মধ্যে আপন পিতৃ

সাজাহানকে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহারই এক দেশে কন্যার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। সেই স্থানে রোসিনারা কিরূপে কালযাপন করিতেন, এবং কালে তাঁহার মানস কতদূর কিরূপে সফল হইয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে ব্যক্ত হইবে।



চতুর্থ অধ্যায়।

যে দেশে প্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং রাজবর্ত্ম সকল পরিপাটীরূপ না থাকাতে বণিক্-বৃত্তি সুসম্পন্ন হয় না, তথাকার রাজাদিগের কর্ত্তব্য প্রজার স্থানে সুবর্ণ রজতাদিরূপে কর না লইয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। এইরূপ না করিলে প্রজার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাদিগকে অল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, অথবা দূরস্থিত আপণে কৃষি-প্রসূত দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয়। শিবজী এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রজারা যাহার যেরূপে ইচ্ছা, তাঁহার ভাগধেয় প্রদান করিবে। এই নিয়মানুসারে তাঁহার পার্ব্বতীয় দুর্গ সন্নিহিত প্রজাগণ ঐ দুর্গস্থিত তৃণ ও পর্ণকুটীর সকল নির্ম্মাণার্থ তদুপযোগী পত্র তৃণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী প্রদান করিত; তাহাদিগের স্থানে আর অন্য করাদান ছিল না। পরন্তু যখন তাহারা ঐ নিয়মানুসারে তৃণাদি প্রদান করিতে আসিত, সেই সময়ে পরস্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধা হয় বলিয়া দুর্গ মধ্যে এক প্রকার বাজার বসিত।

মুসলমান সৈন্যপতি তাঁহার অধিকৃত দুর্গের সকল কুটীর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া প্রজাদিগের স্থানে ঐরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি করিলেন। তাঁহার মানস ছিল ঐ দুর্গে বহুতর সৈন্য নিযুক্ত রাখেন; অতএব এককালে অনেক কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ করিয়া যাবৎ তৎসমুদায় সমাপন না হয় তাবৎ আপনি শিবির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘোষণানুসারে দুর্গ জয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে শতাধিক ব্যক্তি নানা দ্রব্যজাত লইয়া দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে দুর্গ মধ্যে প্রবেশিত হইল তাহার সহিত একজন মোগল যোদ্ধার এইরূপ কথোপকথন হয় এবং সেই অবসরে আর আর সকলে ক্রমে ক্রমে দুর্গোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল। মোগল যোদ্ধা প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, "কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল—তেমনি একবারে জাহান্নমে গিয়াছে"। মহারাষ্ট্র কহিল, "হাঁ শুনিয়াছি, শিবজী না কি মরিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যিনিই রাজা হউন, উচিত কর দিব, রাজ্যে বাস করিব; আমাদিগের ভালও নাই মন্দও নাই—ভাল, তবু বল দেখি শিবজী মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে; তোমরা কি তাঁহার শব দেখিয়াছ?" "বেটা নদীর জলে পড়িয়া কোথায় মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে কিরূপে দেখিব"। "তবে তিনি মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে?" আমরা সেই রাত্রিতে মসাল জ্বালিয়া সকল জায়গা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না—পর দিন গড়ের মুর্চার উপর উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একটা গাছ উপড়িয়া গিয়াছে—আর বালিতে পায়ের দাগও পড়িয়া রহিয়াছে। যে নেমকহারাম্ আমাদিগকে এই গড়ে আনিয়াছিল সেই ঐ পায়ের দাগ দেখিয়া কহিল শিবজীই এই খান দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া মরিয়াছেন"। মহারাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই নেমক্‌হারাম্ এখন কোথায়?—তাহার কি হইয়াছে কিছু বলিতে পার?" মোগল দুর্গজয় হওয়াতে নিতান্ত আনন্দমগ্ন অন্তঃকরণ হইয়াছিল বলিয়াই জিজ্ঞাসুর তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখিয়াও সন্দিহানমনা হইল না। সে হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "সে এই থানেই আছে, কিন্তু তাহার জিয়ন্তে কবর হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় তোদের সকলকেই সেইরূপ করি"। মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমরা তোমাদের কি করিয়াছি"। "তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস্"। মহারাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কহিল, "রে বিধর্ম্মি মুসলমান, তুই মনে করিয়াছিস্ শিবজী মরিয়াছেন, এই তাঁহাকে সম্মুখে দেখ্"। এই বলিতে

স্থলিতে কৃষীবল-বেশধারী শিবজী আপন আনীত তৃণ কাষ্ঠাদি মধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ বাহির করিয়া ঐ ভয়ার্ত্ত মোগলের শিরশ্ছেদন করিলেন। আর আর মহারাষ্ট্র সকলেও ঐরূপে নিজ নিজ অস্ত্র বাহির করিয়া 'শিবজীর জয়! শিবজীর জয়!' এই শব্দসহকারে মোগলদিগকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। মোগলেরা অনেকেই নিরস্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়াছেন জানিয়া একান্ত অনবধান ছিল। অতএব শিবজী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহা ভয় প্রযুক্ত যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। আর যাহারা যাহারা সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল, তাহারাও সুশিক্ষিত মাওলীগণ কর্ত্তৃক স্বল্পায়াসেই পরাজিত হইল।

এইরূপে শিবজী নিজ দুর্গ পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া সেই বিশ্বাস-হন্তা সেনানীর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। পরে যথানিয়মে লোক নির্দ্দিষ্ট করতঃ তৎক্ষণাৎ দুর্গের আরক্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। তাহা করিতে করিতে দুর্গের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখেন একটী ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বার নূতন প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং চতুর্দ্দিকস্থ সকল গবাক্ষ সেইরূপে বদ্ধ হইয়া আছে। ছাদের উপর উঠিয়া দেখেন, কেবল তন্মধ্য ভাগে একটী ছিদ্র মাত্র আছে, আর সর্ব্ব দিক্ সর্ব্ব প্রকারে বদ্ধ, অন্য কি, বায়ু গমনাগমনেরও পথ নাই। তখন স্মরণ হইল, মোগল কহিয়াছিল সেনানীর জীবৎ-সমাধি হইয়াছে। অতএব তাহাই বুঝি এই হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার উন্মুক্ত করণের অনুমতি করিলেন। দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থানান্তরিত হইলে সেই অন্ধতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক প্রবেশ করাতে একটা মৃতকল্প মনুষ্য-দেহ দৃষ্ট হইল। তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বয়ং ঐ পরিশ্রমে বিমুখ হইলেন না। পরে গৃহান্তরালে প্রবেশ করিয়া যেরূপ দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে—ঐ স্থান সাক্ষাৎ-প্রেতভূমি। গৃহ মধ্যে স্থালী স্থালী পূর্ণ শোণিত সংহত হইয়া তিমির বর্ণ হইয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিসহ মাংসখণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে সেই মহারাষ্ট্র সেনানীর শীর্ণ

এবং পাংশু বর্ণ শরীর নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন হইবামাত্র মহারাষ্ট্রপতি ব্যস্ত হইয়া বহির্ভাগে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ঐ মৃতকল্প শরীর বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। বহির্ভাগের পবিত্র বায়ু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্ব্বার রক্ত সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া শিবজী কহিলেন, "এখন ও জীবন আছে, শীঘ্র শীতল জল আনিয়া উহার মুখে সেচন কর"। কেহ বারদ্বয় ঐরূপ করিলে ঐ হতভাগ্য হঠাৎ করদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া কম্পিত শরীরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!—আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না"! সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, "অনুমান হয়, দুরাত্মা মুসলমান কর্ত্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য হয় নাই, অতএব তাহাই পান করিবে না কহিতেছে"। পরে কহিলেন, "বোধ হয়, পাপিষ্ঠেরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে, বুঝি তাহাই ঐ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম। হায়! ভারত-ভূমি আর কত দিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে"? তিনি এইরূপ কহিতেছেন এমত সময়ে সেনানী একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু শিবজীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন, এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে কহিলেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক শিবজীর মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন "মহারাজ! তবে কি আমি সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়া ছিলাম? তবে কি আমি আপনকার বিশ্বাস-ঘাতী নহি?—আমি কি মুসলমানদিগকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করি নাই?—আমি কি আপনকার মৃত্যু ইচ্ছা করি নাই?—না, না, সে সকল স্বপ্ন নহে! আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে সে যে উৎকট আর্ত্তস্বর করিয়াছিল তাহা এক্ষণেও আমার কর্ণকুহর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে—আর আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথ্যা হইবার নহে"।

শিবজী নিজ সেনানীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তুমি এই ক্ষণে আর সেই সকল কিছু মনে করিও না, এই কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং জল পান কর, পরে যাহা যাহা হইয়াছে সবিস্তার শ্রবণ করিব। সেনানী কহিল, "মহারাজ! আর আমাকে আহার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে যাহা বলি সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন"। এই বলিয়া সেনানী উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদসাহী সৈন্যে মিলিত হইয়াছিলেন, এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যেমন করিয়া মোগলদিগকে দুর্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সমুদায় ব্যক্ত করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ! দুর্গ অধিকার হইবার পর আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, অবশিষ্ট জীবিত কাল তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিয়া দুরাত্মা মুসলমান সৈন্যপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না, বিদায় প্রদানে সম্মত না হইয়া বিশ্বাস-হন্তা বলিয়া আমায় বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল, "তুই মুসলমান হইয়া বাদসাহের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ"। তাহার ভৎর্সনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। না হইবে কেন? যে ব্যক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহার সেই দোষটি কহিলেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং আমি মুসলমান ধর্ম্মের অনেক নিন্দা করিলাম। সৈন্যপতি তখন কতিপয় অনুচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা পূর্ব্বেই শিক্ষিত হইয়াছিল, অতএব আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন হইয়াছিলাম। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যেন যমালয়ে আসিয়াছি। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার—সমুদায় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল গত হইলে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিয়াছিলাম। জল! জল! এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ! দেখিলাম যে আপনকার আরাধ্যা ভবানী দেবী ঘোর-বেশা ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিতেছেন, "রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জ্জিত হইয়া তাহা বিধর্ম্মি

শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব্ব দ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর পক্ষে এই দেশের সমুদায় জল গোরক্ত এবং সকল ভক্ষ্য বস্তু গোমাংস হইয়াছে—এই লইয়া আহার কর্"—মহারাজ! ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে গোরক্ত এবং গোমাংস প্রদান করিল—মহারাজ! পৃথিবীতে আমার আর ভক্ষ্যও নাই পানীয়ও নাই"।

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্ব্বার প্রায় চৈতন্য-শূন্য হইলেন, এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এমত সময়ে একজন মহারাষ্ট্র সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! ভগবান্ রামদাস স্বামী দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন,সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।" পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সরল শরীর, প্রশস্ত ললাট, সহাস্য মুখ, বিভূতি-ভূষণ এবং আরক্ত বহির্ব্বাস পরিধান ও ত্রিশূল-হস্ত সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সন্ন্যাস-স্বরূপ পুরুষবর তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রপতি নিজ দীক্ষা গুরুর দর্শন লাভমাত্র একাকী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলে, গুরু আশীর্ব্বাদ সহকারে কহিলেন, "বৎস তোমার মঙ্গল হউক! আমি যে যে কর্ম্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদায় সুসিদ্ধ হইয়াছে। যে শিষ্য প্রতিনিধি হইয়া ফকীর বেশে শত্রু সৈন্যে গিয়াছিল, সে এই মাত্র আসিয়া কহিল তথায় দুর্গ বিজয়ের কোন সংবাদ যায় নাই, আর তোমার সকল সেনাপতিই স্ব স্ব দুর্গ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর—আমি তোমার স্বস্থান প্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়া আশ্রমে গমন করি"। শিবজী উত্তর করিলেন, "গুরো! আপনি প্রসন্ন আছেন আমার অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু প্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলেরা এই দুর্গ অধিকার করে এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়া আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই, তখন বোধ হইয়াছিল সম্মুখ সংগ্রামে শত্রু সৈন্য পরাভব না করিলে দুর্গ অধিকার করিবার উপায়ান্তর নাই। সেই ভাবিয়াই আপনার শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ

দুর্গে দুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের উপায় করি। পরন্তু, যাহা কর্ত্তৃক আমার কৌশল সমুদায় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্ম্মি শত্রু তাহারই প্রতি অত্যাচার করিয়া আমার কার্য্য সাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তজ্জন্য এক প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইতেছে"। এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেনানীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অবিকল আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আগামী যুদ্ধে অবশ্য বিজয় লাভ হইবে!" পরে শিবজীকে বলিলেন, "তোমার ঐ সেনানীকে অদ্য রাত্রি আমার সমীপে আসিতে কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব না;—এক্ষণে যুদ্ধের যাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিধানে মনোযোগ কর"।



পঞ্চম অধ্যায়।

সেই রাত্রে অন্যূন বিংশতি সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা বাদসাহী সৈন্য শিবিরাভিমুখে গমন করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে এক দল ধানুষ্ক গমন করিল। তাহাদিগের গতি ব্যাঘ্রবৎ এবং কর্ম্মও ব্যাঘ্রবৎ। তাহারা কোন উচ্চ শিলা বা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সম্মুখভাগ সমুদায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে এবং শত্রু নিযুক্ত প্রহরী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থসন্ধান বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করে। এই সকল ব্যক্তি রাত্রি-যুদ্ধে কুশল। শিবজীর শিক্ষায় ইহারা পুনঃ পুনঃ নিশাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক "হিৎকরী" সেনা গমন করিল। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু কটিবন্ধে এক এক খানি অসি দোদুল্যমান হইতেছিল। ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তৎশিক্ষিত অস্মদ্দেশীয় শিপাহিগণের বন্দুকে যেরূপ সঙ্গিন থাকে, শিবজীর সেনার সেরূপ ছিল না—তাহারা যুদ্ধকালে স্ব স্ব কৃপাণ দ্বারাই সঙ্গিনের কার্য্য নির্ব্বাহিত করিত। ঐ 'হিৎকরী' সেনার অনতিদূর পশ্চাতে মহারাষ্ট্র-পতির বিশিষ্ট সমাদৃত অসি-চর্ম্মধারী 'মাওলী' সৈন্যদল গমন করিল। তাহারা সকলেই অতি বলিষ্ঠ এবং বিক্রমশালী। তাহাদিগের খড়্গ সাধারণ খড়্গ অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। এই জন্য অসিযুদ্ধে ইহারা প্রায় কখনই কাহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইত না। পর্ব্বতীয় দুর্গম স্থান গমনেও ইহারা অত্যন্ত পটু ছিল। যে উন্নত গিরিশিখরে অজ এবং সরীসৃপ ব্যতিরেকে অন্য ভূচর জন্তুর গমন অসাধ্য, বোধ হয়, শিবজীর মাওলীগণ সেই সকল স্থানও লঙ্ঘন করিতে পারিত। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সকল সৈন্য লইয়া পাদচারে যুদ্ধ করিতেন। ইহাদিগের পশ্চাতে 'বর্গী' নামক অশ্বারোহী সেনা গমন করিল। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র সুদীর্ঘ শেল। কিন্তু কাহার কাহার স্থানে একটি একটি বন্দুকও ছিল, এবং সকলেরই কটিবন্ধে করবাল দোদুল্য-মান হইতেছিল। এই সকল সৈন্যের বহুদূর পশ্চাতে 'শিলিদার' নামক অশ্বারোহী দল দৃষ্ট হইল। তাহারা ইহাদের সকলের ন্যায় সুশিক্ষিত বা

সুব্যবস্থিত নহে। তাহাদিগের বেশ ভূষা অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকার। তাহারা পার্য্যমাণে কখনও সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রেরিত হইলে পলায়ন-পর শত্রুর অনেক অপচয় করিতে পারিত।

'শিলিদার' ভিন্ন আর সকল সৈন্যের বেশ প্রায় একবিধ ছিল। সকলেরই মস্তকে উষ্ণীশ এবং সকলেরই সেই উষ্ণীশের এক এক ফের্ চিবুক নিম্নভাগ দিয়া উদ্বদ্ধ। সকলেরই অঙ্গ এক একটী অঙ্গরক্ষিণী দ্বারা আবৃত, সকলেই কটিবন্ধ বিশিষ্ট, এবং সকলেরই পায় পা-জামা পরিধান। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেরই কর্ণে এক এক প্রকার কর্ণভূষণ এবং হস্তে বলয় ছিল। সাধারণ সৈন্যের এইরূপ বেশভূষা। সেনানায়কগণের পরিধেয় বিবিধ প্রকার। পরন্তু তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ পরিচ্ছদের উপরিভাগে লৌহজাল বিনির্ম্মিত এক প্রকার অনতি গুরুভার সন্নাহ ধারণ করিতেছিলেন।

সৈন্যগণ এইরূপে গমন করিয়া সূর্য্যোদয় সময়ে যে স্থলে উপস্থিত হইল, তাহারই নিম্নে বাদসাহী সৈন্য-শিবির সন্নিবেশিত ছিল। তত্রত্য তাম্বু সকলের বিচিত্র বর্ণ, এবং সোণালী কলস সকলের প্রভা, সেই পর্ব্বততলী হইতে অতি ঈষদ্ভাবে প্রকাশমান হইতে ছিল। কিন্তু মুসলমান সৈন্যপতি শত্রু এমত নিকট আসিয়াছে ইহার কিছুই জানিতেন না। বিশেষতঃ তৎপ্রদেশীয় দুর্গাধিকার হওয়াতে তিনি সেই দিক্ হইতে এইরূপে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার কোন শঙ্কাই করেন নাই। অতএব যখন কোন মোগল প্রহরী পর্ব্বতের উপরিভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাণিত অস্ত্রে সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিলেন না। পরে অনেকেই ঐ রূপ দেখিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিলে তিনি স্বয়ং বাহির হইয়া দর্শন করিলেন। তখন সম্পূর্ণ সূর্য্যোদয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্ব্বতের উপরিভাগ কোন স্থান অপ্রকাশ নাই। অতএব সৈন্যপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনায় পর্ব্বতের শিরোদেশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন দুই প্রজ্বলিত আগ্নেয় শরীর সেই শত্রু সৈন্যের ঊর্দ্ধভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। মুসলমানেরা দেবশরীর তেজোময় বলিয়া জানে। অতএব মোগল সৈন্যপতির বিলক্ষণ প্রতীতি হইল, দেবতাদ্বয়ই বুঝি শত্রুর অনুকূল

পক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। পরে দেখিলেন ঐ দুয়ের মধ্যে একজন একটি সুদীর্ঘ খড়্গ গ্রহণ করিয়া অপরের হস্তে প্রদান করিলেন এবং পরক্ষণেই সমুদায় শত্রুসৈন্য হইতে গগন-স্পর্শী গভীর জয় ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণ-কুহর ভেদ করিল। তখন তিনি নিজ সৈন্যের প্রতি নিতান্ত দৈবাঘাত বুঝিলেন। অতএব এই তাঁহার পরম সাহস বলিতে হয় যে, একবারও পলায়ন করিবার মনন করেন নাই। তিনি শীঘ্র "সাজ! সাজ" শব্দ-সহকারে যথাস্থানে সৈন্য বিনিবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আসিয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

কিন্তু যেমন পর্ব্বতের উপরিভাগে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার পর প্রভূত জলরাশি ভয়ঙ্কর বেগে নিপতিত হয় এবং সম্মুখস্থ গিরিশৃঙ্গ ও বিস্তীর্ণ শাখা-পল্লববিশিষ্ট তরুবর সকলকে উন্মূলিত করিয়া যায়, বেগবান্ মহারাষ্ট্র সৈন্য সেইরূপে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত্রুবল তাহাদিগের সমক্ষে সেইরূপে পরাভূত হইতে লাগিল। যদি কোন শত্রুসেনাপতি বিশিষ্ট সাহস করিয়া কোন কোন সৈন্য দলকে রণস্থলে সুস্থির করিবার চেষ্টা করেন, তখনই কোথাও বা শিবজী স্বয়ং পাদচারে, আর কোথাও বা অশ্বারূঢ় এক অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি দীর্ঘকায় পুরুষ, শীঘ্র উপনীত হইয়া নিমেষ মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে পরাভূত করেন। সেই অশ্বারোহীর প্রজ্বলিত দীর্ঘ খড়্গ দর্শন মাত্রেই শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, অথবা বিনা যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপে শিবির সম্মুখস্থিত মোগল যোদ্ধা সকল ভগ্ন হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা শত্রুর তাম্বু মধ্যে প্রবেশোদ্যম করিল।

কিন্তু সেই খানে মোগল সৈন্যপতি স্বয়ং দৃঢ়-প্রহরী উত্তম উত্তম সামন্ত সমস্ত পরিবৃত হইয়া রহিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বেগে তন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, যেমন জ্বলন্ত হুতাশন খরধার বৃষ্টি পাতে স্তিমিত-তেজঃ হয়, তেমনি সেই সুশিক্ষিত প্রতিপক্ষ ভট সকলের প্রযুক্ত গুলি প্রহারে তাহারা খর্ব্ব-বেগ হইল, এবং পলায়নপর মোগলেরাও ঐ অবকাশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্থির হইতে লাগিল। মুসলমানেরা বহুকালাবধি হিন্দু জাতিকে রণে পরাভব করিয়া আসিতেছিল, অতএব অবজ্ঞেয় শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়া বিশিষ্ট ঘৃণাকর বোধ করিত। শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া তৎপ্রতিবিধান

চেষ্টা না করা অত্যন্ত দোষ। কিন্তু রণস্থলে শত্রুর প্রতি তাচ্ছিল্যভাব থাকিলে প্রায়ই জয়লাভ হয়। এই স্থানেও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইল। শিবজী সঙ্কট দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রামসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তথাপি কিছুই করিতে পারিলেন না। হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় মোগলসৈন্যপতি কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া তাঁহার মাওলী দলও ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, হঠাৎ দৃষ্ট হইল, সেই অশ্বারূঢ় পুরুষ বিপক্ষ সৈন্যপতির প্রতি বেগে ধাবমান হইতেছেন, এবং তাঁহার অপসব্য হস্তে সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গ অনল শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে। মুসলমান সৈন্যপতি সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া অবধি যেমন কোন বিষধর জন্তু বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে শরীর নিশ্চল হয়, তদ্দংশন নিবারণার্থেও পলায়ন করিবার শক্তি থাকে না, তিনিও সেইরূপ হইয়া এক দৃষ্টে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন ঐ পুরুষবর অশ্ববেগে সামন্ত সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন, পর্য্যাণ-রেকাবের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরাক্রান্ত ভুজবলে খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, তখনও সেনাপতি পলায়ন বা সেই প্রহার নিবারণের যত্ন কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং একেবারে ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

মোগল সেনাগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিল, একেবারে নিরুৎসাহ হইল, এবং পলায়ন করিতে লাগিল। সেনাপতির বিনাশে সর্ব্বদেশীয় সৈন্যই যুদ্ধে নিরুৎসাহ হয় বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ যেরূপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে এরূপ অন্যত্র অধিক শ্রুত হওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, এখানকার রাজারা একাধিপত্য-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া আপনাদিগের শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। তাঁহাদিগের সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কোন রাজকার্য্যে প্রজাদিগের কোন মতামত থাকে না। সুতরাং যিনি রাজা হউন না কেন, আমাদিগের সেই দশাই থাকিবে বুঝিয়া, সেনাগণ রাজার অথবা রাজ-প্রতিভূ সৈন্যপতির বিনাশ হইলেই রণস্থল ত্যাগ করিয়া যায়। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বেষ-ভাব-সম্পন্ন ছিল। তথাপি সৈন্যপতির বিনাশে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল।

শিবজীর অনুমত্যনুসারে পদাতি সমস্ত শত্রু-শিবির প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য

বিপুল অর্থ এবং দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিল আর অশ্বারোহিগণ পলায়ন-পর শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পরে মহারাষ্ট্রপতি আপনিও কতক সামন্ত সমভিব্যাহারে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার গুরুদেব ভগবান রামদাস স্বামী সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, "বৎস! অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ—জয় সম্পূর্ণই হইয়াছে—আর স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন নাই, এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।" শিবজী তাহাই করিয়া কহিলেন—"গুরো! আপনকার আশীর্ব্বাদে বিজয় লাভ সম্পূর্ণই হইল—কিন্তু অদ্য সেনানী কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি—সে না থাকিলে আজি ঘোর বিপদ্ ঘটিত—সে অদ্য অতিমানুষ কর্ম্ম করিয়াছে।" গুরু উত্তর করিলেন, "আমি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তাহাকে ভবানী প্রদত্ত খড়্গ প্রদান করিয়া অবধি তাহারই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, তৎকৃত সমুদায় কর্ম্ম দেখিয়াছি। মহারাজ! দেবতারা যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন,তাহার কার্য্যসাধনের উপায়ও অগ্রে করিয়া রাখেন। ঐ দেখ দেখি যে আসিতেছে উহার শরীরে কি তাদৃশ বল সম্ভব হয়?" শিবজী রামদাস স্বামীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টি করতঃ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই মোগল সৈন্য-পতির বধকারী অশ্বারোহীর সমীপস্থ হইলেন; এবং তিনি বেগে গমন করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন বলিয়াই সে ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল না! এক্ষণে আর সেই বীরমূর্ত্তি নাই। অঙ্গের নানা স্থানে অস্ত্রাঘাত হওয়াতে অজস্র শোণিত প্রস্রুত হইতেছিল। শিবজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আপন ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুমূর্ষু কালে মুখ যেরূপ শ্রীহীন হয়, তাহার মুখ সেইরূপ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও সেই যুদ্ধ-বীর হস্তের খড়্গ পরিত্যাগ করেন নাই। শিবজী ঐ অসি লইবার জন্য যত্ন করিলে, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন—মুখ ঈষৎ হাস্য প্রভাযুক্ত হইল—এবং পরক্ষণেই সমুদায় শরীর একেবারে নিস্পন্দ হইল। রামদাস স্বামী কহিলেন "মহারাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন সম্বরণ কর—সেনানী তাঁহার জীবন ঋণ পরিশোধ করিলেন।"

এই ব্যাপার হইতে হইতেই অনেক মহারাষ্ট্র সেনা সেই স্থলে প্রত্যাগত হইয়াছিল। সেনানীর মৃত্যু দর্শনে কাহারও চক্ষু নিরশ্রু ছিল না, এবং

সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া আপনাদিগের অন্তকালও যেন সেইরূপ হয়, মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। রামদাস স্বামী কিঞ্চিদ্বিলম্বে মৃত সেনানীর খড়্গ উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! এই খড়্গ ভবানী প্রদত্ত। অতএব ইহারও নাম ভবানী হইল। ইহা আপনি গ্রহণ করুন্—অদ্য ইনি যে প্রকারে শত্রু নিধন করিলেন, চিরকাল এইরূপ করিবেন। এই বলিয়া গুরুদেব সেই খড়্গ মহারাষ্ট্রপতিকে প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই অবধি ঐ খড়্গের মূর্ত্তি মহারাষ্ট্রদিগের ধ্বজে চিত্রিত হইল, এবং অদ্যাপি সেতারা প্রদেশীয় ভূপাল বংশীয়েরা প্রতি বৎসর মহা সমারোহ করিয়া ঐ খড়্গের পূজা করেন। ক্ষণকাল পরে রামদাস স্বামী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! তুমি সচ্ছন্দে স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন করিতে থাক, আমি এক্ষণে বিদায় হই, বৈষয়িক কার্য্যের কেমন মাহাত্ম্য, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মনকেও ক্রমে ক্রমে আপনার বিধেয় করিয়া ফেলে—অতএব আমি আর বিলম্ব করিব না। সম্প্রতি আশ্রমে চলিলাম কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে, শীঘ্রই তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইব। মহারাজ! দুঃখিত হইও না—যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার তৎসাধনে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কেমন বিশ্বাস হইতেছে, স্থানান্তরে তোমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার পর শিবজী আপন সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "তোমরা অদ্যকার যুদ্ধে যেরূপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন এইরূপ করিলে ভগবানের অনুগ্রহে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আজি তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা প্রথম বারেই সম্মুখসংগ্রামে প্রবল মোগল সৈন্যের পরাভব করিলে, অতএব তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিব। সৈন্য সাধারণকে একটি একটি রৌপ্য বলয় এবং সেনা-নায়ক সকলকে একটি একটি সুবর্ণালঙ্কার প্রদান করিবার অনুমতি করিলাম"। মহারাষ্ট্র সেনাগণ শিবজীর স্থানে প্রায় কদাপি অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার নিয়মানুসারে তৎকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও রাজকোষ সম্ভুক্ত হইত। অতএব এই যৎসামান্য

পুরস্কার প্রদান করিবেন শ্রবণ করিয়াও তাহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ যাহারা সর্ব্ববিষয়েই ভৃত্যবর্গকে অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁহারা ঐ রীতির সমুদায় দোষ অনুভব করেন না। একবার অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে আর অন্য কোন পুরস্কার মনঃপূত হয় না। বরং ক্রমশঃ প্রশংসনীয় কার্য্যের প্রতি অনুরাগ হ্রস্ব হইয়া অর্থের প্রতিই লোভ জন্মে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিবজী জীবদ্দশায় আছেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্য-পতিকে পরাজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই রাজা জয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎশ্রবণমাত্র নিজ পরাক্রান্ত রাজপুত্র সৈন্য সমভিব্যহারে মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সেনা শিবজীর অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক ছিল, এবং আপনিও পর্ব্বতীয় যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। দিল্লীশ্বর যেখানে যেখানে অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন, সেই সকল স্থানেই রাজা জয়সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দু রাজাদিগের সহিত বিবাদকালে রাজা জয়সিংহই আরঙ্গেবের ব্রহ্মাস্ত্র প্রায় ছিলেন। অতএব এই সংগ্রাম-সাগর মহারাষ্ট্র-পতির পক্ষেও দুস্তর বোধ হইবে আশ্চর্য্য কি? অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি তিনি এইবার মগ্ন হইলেন।

কিন্তু মহাত্ম-জনের মানসাকাশ কখনও দুর্ভাবনা কর্ত্তৃক এমন আচ্ছন্ন হয় না যে, আশারূপ নির্ম্মল নক্ষত্র-জ্যোতিঃ তাঁহাদিগের নির্ণীত পথ প্রদর্শন না করে। শিবজী সেই বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও এমন একটী অসমসাহসিক কর্ম্ম করিলেন, যাহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল অসাধ্য মাত্র নহে, তাহাদিগের বুদ্ধিরও অগম্য। সেই কর্ম্ম তিনি যে কি সাহসে বা কি বিবেচনায় করিলেন তাহা অন্যের বুঝিবার নয়। তদ্দ্বারা তাঁহার অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাঁহার পরামর্শ কেবল ফলানুমেয় এবং তাঁহার সাহস সকল লোকের চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহা-রাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। জয়পুরপতি তৎক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীরপুরুষেরা উপযুক্ত প্রতিপক্ষেরও গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার আপনার সৈন্যসংখ্যা অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং

অকিঞ্চিৎকর হইতেন। অতএব শিবজীর প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্ট সমাদর সহকারে ভ্রাতৃ-সম্বোধন এবং আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক স্বপার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করাইলেন। মহারাষ্ট্রপতি মৌনী হইয়া বসিলেন। রাজা জয়সিংহ ভাবে বুঝিতে পারিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল। শিবজী কহিতে লাগিলেন।

"মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন। হইবেনই ত। আমি যে দুরাশার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়াবিষ্ট হই। কিন্তু মহারাজ! মন যাহা বলে তাহা কখন নিতান্ত মিথ্যা হয় না। কিছু কাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য্য অবগত হইলেই এই দুরন্ত সমরাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে একপরামর্শী এবং এককর্ম্মা হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্ত্তব্য নহে?। দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা কর্ত্তৃক হ্রস্ব-তেজা হয়েন, উভয়ই আরঙ্গেবের মঙ্গলাবহ। স্মরণ করুন, তিনি এই উপায়দ্বারা ক্রমে ক্রমে কোন্ হিন্দু মহীপালকে স্বপদাবনত না করিলেন? শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভারতভূমি তাঁহার কবলিত হইয়াছে। কোথাও একটী স্বাধীন হিন্দু রাজা নাই। কেবল রাজপুতানায় আপনারা এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি। আরঙ্গেব কেবল আমাদিগকেই কিঞ্চিৎ ভয় করেন, বুঝি তাহাও আর অধিক কাল করিতে হইবে না।

ফলতঃ মহারাজ! আমি আর পরস্পর যুদ্ধে স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন।

"মহারাজ! বাদসাহ কখন আপনার অগৌরব করেন নাই সত্য, কারণ তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদি আপনি আজি লোকান্তরগত হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারেরা বুঝিবেন বাদসহ আপনকার কেমন সুহৃদ্। মহারাজ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান বাদসাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন, ইহাঁর মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটীও হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না। আমি জানি কেহ কেহ আরঙ্গেবকে জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি জাত্যস্বভাব হইলে আমার এমত ভয় হইত না। নৃশংস নির্ব্বোধ রাজারা যে সকল অত্যাচার করেন, তজ্জনিত দুঃখ স্বল্পকাল ব্যাপী হয়, কিন্তু ক্রূর-মতি নৃপালগণের যে বিষ-বৃক্ষ রূপ-মন্ত্রণা তাহার ফলাস্বাদনে সন্তান-সন্ততি সমুদায় খর্ব্ব-বীর্য্য হইয়া যায়। আমি জানি, অনেকেরই মনে এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বর-নির্দ্দিষ্ট জাতি প্রণালী হইয়া আসিতেছে, মুসলমানও সেইরূপ বাদসাহের জাতি। মুসলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ বোধ থাকাতেই এত হিন্দু রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাহা করুন—রাজ-শক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবরসাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাঁহার সময়ে রাজকার্য্যে বুদ্ধি নিয়োজন করিয়া সুশাসন-বিধি সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। আরঙ্গেব এত চেষ্টা করিয়াও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েক জন

সুমহৎস্তম্ভবৎ তাঁহার রাজ্যভার বহন করিতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহেরা যদি ইহাঁর দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া চলেন, তবে স্বল্পকাল মধ্যেই সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি-প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট নররত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা যেন এমন দিন কখনও উপস্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্ব্বল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়—তাহা সুষুপ্তি সুখানুভব নহে"।

রাজা জয়সিংহ মহারাষ্ট্রপতির আগমনেই আপনার প্রতি তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, আবার এই সকল সরল তথ্য-ভাষা শ্রবণ করিয়া উন্মীলিতজ্ঞান-চক্ষুঃ এবং উন্মুক্ত-প্রণয়-প্রণালী হইলেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগের কি বাঙ্‌নিষ্ঠা! তিনি শিবজীকে ধৃত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতে পারিলেন না। অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন। "মহারাজ! তোমার কথায় আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে তাহার উত্তর করিলে পর আমার যেরূপ পরামর্শ হয় বলিব"। "কি জিজ্ঞাস্য আছে অনুমতি করুন"। "আমি তোমার নিকট যদি এমত প্রতিশ্রুত হই যে, বাদসাহ তোমার কোন অপমান করিলে, আমি সেই অপমান আপনার হইল বোধ করিয়া তাহার প্রতিফল প্রদানের চেষ্টা পাইব, তবে তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস কর কি না"। শিবজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে আমি নিরুদ্বেগে গমন করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। কারণ তিনি আমার কোন অপমান করিলে আপনি তাঁহার শত্রু হইবেন এবং তাহা হইলেই হিন্দু জাতির অভ্যুদয় কাল পুনরুপস্থিত হইবে, অতএব এমত স্থলে আমি মৃত্যু স্বীকার করিতেও সম্মত আছি"। রাজা জয়সিংহ আশ্চর্য্যমন্য হইয়া কহিলেন,—"এমত সাহস

না হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্য্য-পরতন্ত্র না হইলে কি মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয়!—মহারাজ! কোন সন্দেহ নাই, আরঙ্গেব এত নির্ব্বোধ নহেন যে, আমি নির্ভয় করিলে তিনি কাহারও অপমান করিবেন—এক্ষণে আমার যেরূপ পরামর্শ শ্রবণ করুন। আপনি যাহা যাহা বলিলেন কিছুই মিথ্যা নহে। এতদ্দেশীয় তাবল্লোকেরই প্রতীতি হইয়াছে, তৈমুরলঙ্গবংশীয় ব্যতিরেকে আর কেহ বাদসাহ পদাভিষিক্ত হইতে পারে না। আমি সেই জন্যই বিবেচনা করি, প্রকাশে আরঙ্গেবের প্রতিকূলতাচরণে কোন বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। শুনিয়াছেন ত, মহব্বৎ খাঁ নামক জাহাঙ্গীর বাদসাহের একজন প্রধান সেনাপতি পাঁচ সহস্র রাজপুত্র সেনার সহায়তায় বিংশতি সহস্রাধিক মোগল সৈন্যের মধ্য হইতে বাদসাহকে নিজ করকলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে, প্রজা সমস্ত তাঁহার প্রতি অনুরাগ-শূন্য হওয়াতে আপনাকেই পুনর্ব্বার বাদসাহের শরণ প্রার্থনা এবং পলায়নপর হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিয়া যে, কোন প্রকার চেষ্টা করিব না তাহাও বলিতেছি না। বাদসাহের মনে যাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় থাকে এমনটী করিয়া চলা উচিত! তাহাও, উত্তরে আমি আর দক্ষিণে তুমি থাকিলেই সম্পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে বাদসাহের নামে আমি তোমার সহিত সন্ধি নিবন্ধন করিতেছি। কিন্তু পাছে আরঙ্গেব সন্দিহান-মনা হয়েন, এই জন্য তোমাকে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। আমার সৈন্যেরা বাদসাহের নামে যে কয়েকটি দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে না। কিন্তু আমার সহিত মিলিত হইয়া তুমিও দিল্লীশ্বরের প্রতিপক্ষ বিজয়পুর বাদসাহের প্রতি-কূলে যুদ্ধ করিতে চল। আরঙ্গেব তাহাতে তুষ্ট হইবেন, এবং সেই সুযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমিও আপন রাজ্যের সুদৃঢ় সংস্থা-পন করিতে পারিবে"।

রাজা জয়সিংহ এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে, শিবজী মনে মনে 'যথালাভ' বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরল-প্রকৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি

অত্যুদার-প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এই জন্য তাঁহার চরিত্র-লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল-স্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাহউক, তিনি এইক্ষণে বিবেচনা করিলেন আমার পক্ষে কি দিল্লীশ্বর, কি বিজয়পুর-বাদসাহ, উভয়ই সমান —একোদ্যমে দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না! অতএব কখন বা ইহার কখন বা উহার পক্ষতা অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ বলবর্দ্ধন করাই সদ্যুক্তি; আর হয় ত, আরঙ্গেব তুষ্ট হইলে পরিণামে রোসিনারা লাভ হইলেও হইতে পারে। মহারাষ্ট্রপতি মনোমধ্যে এই সকল অনুধাবন করিয়া নিজ সম্মতি প্রকাশ পুরঃসর কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেই রূপই করিব। কিন্তু আমার সৈন্যগণ বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাদসাহ নিজকোষ হইতে তাহাদিগের ভৃতি প্রদান না করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিজিতভূমির নির্দ্দিষ্ট করের চৌৎ অর্থাৎ চতুর্থাংশ প্রদানের অনুমতি করিলেই সৎপরামর্শ হয়। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে আপন ধনাগার হইতেও কিছু দিতে হইবে না, আর সৈন্যগণও বিশিষ্ট যত্ন করিয়া অধিক ভূমি জয় করিবে"। রাজা জয়সিংহ এই কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন কি না বলা যায় না। ফলতঃ শিবজী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাষ্ট্রীয় রাজারা ঐ চৌৎ আদায়ের নামেই ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ভারত-ভূমির উপর আপনাদিগের কর্ত্তৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাহউক, জয়পুরপতি তখনই স্বীকার করিয়া এই সকল নিয়মানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখাইলেন, এবং বাদসাহের সম্মতির নিমিত্ত তাহার অনুলিপি প্রেরণ করিয়া অচিরাৎ শিবজী সমভিব্যাহারে সসৈন্য বিজয়পুর প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

—০*০—

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই কথাটী দ্বারা বাদসাহের পার্থিব বিভবের মাত্র আতিশয্য দেখিয়া জগদীশ্বরের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়াতে অত্যন্ত অত্যুক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা অবশ্য দুষ্য বটে। কিন্তু যে সকল পর্য্যাটক তৈমুরলঙ্গবংশীয় বাদসাহদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তত্রত্য রাজসভার শোভা নয়ন গোচর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভা-বিহীন হইয়াছিল বলিয়া আরঙ্গেবের পিতা সাজাহান সমুদায় নগরটী নূতন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ নবদিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল!—তন্মধ্যে এবং উভয় দিকে কেমন পরিপাটীরূপ বিন্যস্ত পাদপগণ নগরটীকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল! এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলণ্ডীয় সম্রাট্‌দিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পায়েন। নগরের প্রাসাদগুলিও কি সুন্দর! বিশেষতঃ শ্বেত মার্‌বেলে নির্ম্মিত মসীদ্‌টীর শোভার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। রাজবাটী দুর্লঙ্ঘ্য-প্রাকার-বেষ্টিত—এবং বহুমূল্য মার্‌বেল প্রস্তরে অতি পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত। মুসলমানেরা যে হর্ম্ম্যশিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকা সকলের খোদকতা কার্য্যের আধিক্য, তথাপি দ্রষ্টৃবর্গের মনে অদ্ভুতরসের বই অন্য রসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পর্য্যাটক কহিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের নির্ম্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় সূক্ষ্মকারুতা এবং অসুরের ন্যায় অতিমানুষত্বপ্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ ঐ সাজাহান ভূপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আগ্রা নগরস্থিত জগদ্বিখ্যাত তাজ্‌মহল অট্টালিকা ঐরূপ নির্ম্মাণ কীর্ত্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশ মণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকস্তবক খচিত হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের আবির্ভাব করে, তাজ্‌মহলও সেইরূপ অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা

দর্শকমাত্রের মনে অদ্ভুত রসের উদয় করে। আর ঐ সাজাহান নির্ম্মিত 'ময়ূরতক্ত' নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব? সেই রাজাসন দুইটি দিব্য-গঠন ধাতু নির্ম্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছদ্বয় সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিত। নৃত্যকারী ময়ূরের পক্ষ ও পুচ্ছ যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুচ্ছেও নানাবিধ মণি মাণিক্যাদি দ্বারা সেই সমুদায় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল।

যে সাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী, এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদ সকল ও মহামূল্য পরম শোভাময় রাজাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? যেমন অন্যান্য সংসারাশ্রমী জনেরা যৌবন সময়ে স্ব স্ব বিভবের ভোগ ও বৃদ্ধি করিয়া চরমে তৎসমুদায় সন্তানদিগকে প্রদান করিয়া যায়েন, তিনিও কি সেইরূপে আত্মজ আরঙ্গেবকে সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন?—না; তাঁহার দুরবস্থার উপমাস্থল নাই। তিনি স্বীয় আত্মজ আরঙ্গেব কর্ত্তৃকই জীবন্মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! সাজাহানের দুরবস্থা স্মরণ করিলে কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আর স্পৃহা হয়? অথবা, কোন্ দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী নহেন বলিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান না করেন? অহো! বিভব কি ভয়ানক বস্তু! প্রভুত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ প্রার্থনীয় যে, তজ্জন্য মনুষ্যদিগের মন হইতে আশৈশব-প্রতিপালনকারী পিতার প্রতিও শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায়! বৃদ্ধ বাদসাহ সাজাহান, দুষ্ট পুত্র আরঙ্গেব কর্ত্তৃক অপহৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া কারাবাসীর ন্যায় অবরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি যে তথায় কি পর্য্যন্ত ক্লেশ অনুভব করতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন তাহা বলা বাহুল্য। যিনি সমুদায় ভারতভূমির একাধিপতি হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যের ধন প্রাণের হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন, তিনি কি কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ সাজাহানের যে এই দুঃখ কালেও কখন হ্রাস হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। কালে দরিদ্র যন্ত্রণা সহ্য হইয়া যায়, বন্ধু-বিচ্ছেদ ক্লেশও অল্প হইয়া আইসে, অন্য কি, মাতাও ক্রমশঃ অপত্য-বিরহ-বিষাদ বিস্মিতা হইয়া

থাকেন। কিন্তু যে দুর্ব্বিষহ শোক সন্তাপ অন্তঃকরণকে স্নেহ-বর্জিত করে, যাহাতে একজনের দোষে স্বজনমাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হয়, সেই দুঃখ দাবাগ্নি নির্ব্বাণে কালও কুণ্ঠিত-শক্তি হইয়া থাকে। ঐ অনল, নীরস জীবন বৃক্ষকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হয়, অথবা স্নেহরস বর্ষণে সক্ষম ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেই কিছু মন্দ-তেজ হইতে পারে।

রোসিনারা নিজ পিতার ক্রোধ-ভাজন হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান প্রাপ্ত হইলে, সাজাহানের ঐরূপ সহচরী লাভ হইল। আরঞ্জেব-পুত্রী উত্তম প্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের কেমন দোষ! রোসিনারা অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর পিতার প্রিয়তমা হইয়া প্রথমাবস্থায় আমোদ প্রমোদেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তখন দুঃখ যে কি পদার্থ ইহা জানিতেন না বলিয়াই পিতামহের দুঃখে সমদুঃখতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উদার-চরিত্র শিবজীর সহবাসে তাঁহার মনের সেই ভাবটি দূর হইয়াছিল। শিবজী বাক্য দ্বারা কখন রোসিনারাকে হিতাহিত বিবেচনার শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু স্বয়ং একাগ্রমনে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতেন বলিয়াই তৎপ্রতি প্রণয়-বদ্ধা বাদসাহ-পুত্রী তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থা হইয়াছিলেন। কার্য্য দ্বারায় যে উপদেশ হয়, তজ্জনিত সংস্কারের প্রায় অন্যথাভাব হয় না। অতএব,পরমেশ্বর মনুষ্য জীবন কেবল হাসিয়া খেলিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইবার জন্য সৃষ্ট করেন নাই, এই ভাব রোসিনারার অন্তঃকরণে সেই মহাপুরুষের সাহচর্য্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে এমত পদার্থ আছে যাহার জন্য জীবন এবং জীবনের সমুদায় সুখ পরিত্যাজ্য হইতে পারে।

শিবজীর সাহচর্য্যে রোসিনারার মানসিক ভাব সকল পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তিনি নানা ইন্দ্রিয়-সুখ-নিধান অন্তঃপুরের অন্যান্যভাগে বাস অপেক্ষা তাহারই একদেশে পিতামহ সন্নিধানে অন্য-সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করিতে প্রীতিপূর্ব্বক অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সাজাহান তাঁহাকে আরঞ্জেবের কন্যা বলিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃণা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোসিনারা আপনার বিনীত ব্যবহার,শীলতা ও মধুরালাপ দ্বারা তাঁহার দুঃখ শৈথিল্যের যত্ন করিয়া পিতামহকে পরম পরিতুষ্ট করিলেন। সাজাহান নিজ আধিপত্য

সময়ে অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রোসিনারার প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইলে তাঁহার অন্তরাত্মা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। রোসিনারাও পিতামহ সন্নিধানে মনের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দুঃখের লাঘব করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, পিতা অপেক্ষাও পিতামহের সহিত শিশুদিগের কেমন অধিক প্রণয় হয়! সাজাহান নানা কার্য্যাসক্ত থাকাতে সেই প্রণয়-সুখ পূর্ব্বে ভোগ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে নাতিনীকে সহচারিণী ও সমদুঃখভাগিনী পাইয়া তাঁহার মনে যে কি অপূর্ব্বভাব উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

ইহাঁরা উভয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শিবজী সম্বন্ধীয় বিবরণই রোসিনারার অধিক মনোগত হইত বলিয়া বৃদ্ধ বাদসাহ তৎকালে শিবজীর সহিত আরঞ্জেবের সেনাপতিদিগের যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, যত্নপূর্ব্বক সমুদায়গুলি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতেন, এবং রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন। রোসিনারা, যখন শিবজী মুসলমান সৈন্যপতিকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়াছেন শ্রবণ করিলেন, তখন আর পিতার সহিত সন্ধি হওয়া ভার হইল বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রপতি রোসিনারার নিমিত্ত আপনার প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার লোভেও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন, ইহা জানিয়া বাদসাহ-পুত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরে যখন শুনিলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে দিন দিন ক্ষীণবল হইতেছেন, তখন নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি যে দিন পিতামহ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যে, শিবজী আরঞ্জেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাজা জয়সিংহের সহায়তায় বিজয়পুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহার ম্রিয়মাণ আশালতা পুনরুজ্জীবিতা হইতে লাগিল। অনন্তর যেদিন রোসিনারার কর্ণগোচর হইল যে, মহারাষ্ট্রপতির সাহায্যে কৃতকার্য্য বাদসাহ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া নিজসভায় আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু পিতার অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাবতা ভাবিয়া মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ শঙ্কাও উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে

ভাবিতেন "যদি পিতা আমাকে সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার মনন করিতেন, তবে এতাবৎ আমার প্রতি অক্রোধ না হইলেন কেন? আমি তাঁহারই গুণানুবাদ করিয়াছিলাম বই আর ত কোন অপরাধ করি নাই।"

সাজাহান, যে দিন শিবজী বাদসাহের সম্ভাষণার্থ আসিতেছেন, সেই দিন রোসিনারাকে এই সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক কৌতুক করিয়া কহিলেন, "মহারাষ্ট্রপতি আসিতেছেন—কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও না যে তিনি আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন।" রোসিনারা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই হাস্যপ্রভা আন্তরিক দুঃখান্ধকারই প্রকাশ করিল, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষ জ্ঞাপক হইল না। পরে বাদসাহ-পুত্রী কহিলেন "বৃদ্ধ আমাকে স্বয়ং ত্যাগ না করিলে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। কিন্তু মহাশয়! আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—আমি পদে পদে বিপদ শঙ্কা করিতেছি।"বৃদ্ধ বাদসাহ এই কথা শ্রবণে বিস্ময় এবং ঈষৎ ক্রোধযুক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন।—বিপদ্ শঙ্কা কি?—আরঙ্গেব স্বয়ং পত্রদ্বারা সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছে—সে কি আপনার কথা মিথ্যা করিবে?—দিল্লীর বাদসাহ হইয়া প্রতিশ্রুত পালনে পরাঙ্মুখ হইলে কি সেই আসনের আর গৌরব থাকে?" এই বলিয়া রোসিনারার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে অধোবদন দেখিয়া বৃদ্ধ আপনার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিলেন।—"হায়! আমার আসনের অগৌরব হইবে বলিয়া আমি আরঙ্গেবের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিতেছি; কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার অপমান করিতে পারে সে কি না করিতে পারে?—আমি এমন অল্পবুদ্ধি না হইলেই বা কেন রাজ্যচ্যুত হইব—অধিক বিশ্বাসই আমার কাল হইয়াছে—পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকেই আমাকে কহিয়াছিল পুত্রদিগকে এত বিশ্বাস করিবেন না—আমি কহিতাম যদি আপনার পুত্রদিগকে বিশ্বাস না করিব, তবে কাহাকে করিব? আর পুত্রের প্রতিও অবিশ্বাস করিয়া যদি রাজ্য করিতে হয়, তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাজ কি?—হায় রে! জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বিশ্বাস-ভাজন দারসীকো! তোমারই সচ্চরিত্রতা দেখিয়া আমি সকলের প্রতি সমান বিশ্বাস করিয়াছিলাম—তুমি সরল-হৃদয় হইয়া-

ছিলে বলিয়া পাপ-পুর্ণা পৃথিবীতে স্থান পাইলে না !—আমি আর কতকাল এই দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিব ? রে কঠিন প্রাণ ! তোমার কি আরো দুঃখ ভোগ করিতে অভিলাষ আছে ? বাহির হও ! যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।" বৃদ্ধ বাদসাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার মৃত্যু স্মরণ করিয়া একেবারে বিচেতন প্রায় হইলেন। বৈষয়িক ভোগের প্রতি নিস্পৃহতা এবং বৃদ্ধাবস্থার স্মৃতিশক্তির হ্রাস বশতঃ তিনি আর আর সকল দুঃখ ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছিলেন, কিন্তু আরঞ্জেব কর্ত্তৃক প্রিয়তম পুত্র দারা নিহত হইয়াছিল, এই মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহার মনে চিরকাল সমানরূপে জাজ্বল্যমান ছিল। রোসিনারা ঐ সকল সময়ে পিতামহের সান্ত্বনার জন্য অন্য কোন উপায় না করিয়া তৎসমক্ষে দারার স্বরচিত কাব্য পাঠ করিতেন। তিনি জানিয়াছিলেন, যেমন অগ্নিদগ্ধের অগ্নিতাপই স্বাস্থ্যকর, তেমনি সুহৃৎ-বিরহ-যাতনা সেই সুহৃদ্বিষয়িনী কথাতেই শান্ত হয় ;—অন্য কথা সেই সময়ে বিষতুল্য বোধ হইতে থাকে। রোসিনারা এই বারেও সেইরূপ করিলেন। দারার বিরচিত কাব্যপাঠ একতান মনে শ্রবণ করিতে করিতে সাজাহানের নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ পরে কহিলেন, "আহা। এমন পুত্রও মরে—আহা ! সে মরিয়াও কবিতা-মৃত দানে আমার তাপিত মনকে জুড়াইতেছে—হায় ! যে ব্যক্তি আমার এই সকল দুঃখের মূল তাহার কোন সুখেরই অভাব নাই—আমি এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার ঔরসে এই রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিল ?—বুঝিলাম—বুঝিলাম—যে পিতাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অবশ্য অপমান-গ্রস্ত হইতে হয়।" বোধ হয়, সাজাহান যৌবনাবস্থায় নিজ জনক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলেন।—পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন—"আমি আপনার কর্ম্মের ভোগই ভুগিতেছি—তবে আরঞ্জেবও নিষ্পাপ ?—আমার পিতাও স্বীয় জনকের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন—তবে আমি কি জন্য অপরাধী হইলাম ?—কপালের লিখন ?—না ! না ! তাহা হইলে অসৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অনুতাপাগ্নি অন্তর্দাহ করিবে ?"

সাজাহান্ স্বীয় আত্মজের কৃতঘ্নতায় অসাধারণ দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানলাভের পথবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বোধের উপক্রম হইতেছিল যে, পরমেশ্বর পৃথক্‌রূপে সুকৃতির পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। এক জনের পাপ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা মনুষ্যের পক্ষে বিধেয় নহে। দুষ্টের প্রতিও দুষ্ট ব্যবহার করিলে দোষ হয়। যাহা হউক তাঁহার মন এমন না হইলে তিনি কি সেই দশায় জীবিত থাকিতে পারিতেন? বৃদ্ধ বাদসাহ ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে রোসিনারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আর পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, তুমি বুদ্ধিমতী যাহা পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহাই কর। আমার বুদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে—বোধ করি আর বহু দিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না—অনুমান করিয়াছিলাম জগতে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই—কিন্তু তোমার গুণে বশীভূত হইয়া এক্ষণে এই মাত্র ইচ্ছা হয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া যাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ, পৌত্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোসিনারাও ক্ষণকাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন—"পিতা, মহারাষ্ট্র-পতির যেরূপ সমাদর বা অনাদর করেন তাহা দেখিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব"। বৃদ্ধ কহিলেন "তুমি অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীগণের সমভিব্যাহারে যাইয়া জালরন্ধ্রের অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমুদায় দেখিও"।

——()০()——

অষ্টম অধ্যায়।



দিল্লীশ্বরদিগের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্‌খাস্‌। তাহার তিন দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদায় সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। উত্তরাংশে যে প্রাচীর তাহারই পশ্চাদ্ভাগে অন্তঃপুর। যে দিবস শিবজী রাজসম্ভাষণে আইসেন, রোসিনারা অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া সেই প্রাচীরের গবাক্ষ-বিবর হইতে সমুদায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপরিভাগে আরঙ্গেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ সুবর্ণময়, তন্নিম্নে অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে, এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আরঙ্গেবের মুখাবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা, এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল, দান্ত স্বভাব, কুটিল বুদ্ধি, এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্ত্তী কতকটা ভাগ রজত-রেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান ওম্রা ও রাজা এবং রাজপ্রতিভূগণ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া নতশিরা হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদিগের মস্তকোপরি কিংখাপের চন্দ্রাতপ সুবর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে। রেইলের বহির্ভাগে আর যাবৎ স্থান, তাহাতে মনসবদার প্রভৃতি যোদ্‌ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদানুসারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আমখাসের বহির্দ্দেশে এবং রাজতক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল। বাহির হইতে সেই তাম্বু উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমন সুন্দররূপে চিত্রিত যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন রমণীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম, চতুর্দ্দিক যেন ফল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই

সভামণ্ডপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই শত শত ব্যক্তি নানা কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসম্ভাষণের কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে দিল্লীশ্বর স্বকীয় বিভব সমুদায় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন এমত সময়ে একজন নকীব্ যথানিয়মে রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্রদেশাধিপতি শিবজীর আগমন সংবাদ প্রদান করিল। সকলেই শিবজীর নাম শ্রুত ছিলেন, অতএব চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ সকলেই উৎসুক হইলেন, বিশেষতঃ রোসিনারা নির্নিমেষ চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজীকে কিঞ্চিদ্বিমর্ষ বোধ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইতে লাগিল। শিবজী ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া নকীবের আদেশক্রমে রেইলের বহির্ভাগ হইতে বাদসাহকে তিনবার অভিবাদন করিলেন। এই করিয়া তিনি যেমন পুনর্ব্বার অগ্রসরণোদ্যম করিবেন নকীব উচ্চৈঃস্বরে কহিল "আলম্‌গীর বাদসাহের অনুগ্রহে শিবজী পঞ্চ-হাজারি মনসব্দারের পদে উন্নত হইলেন"। মহারাষ্ট্রপতি এই অপমান-সূচক বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্ষুব্ধ এবং অবশাঙ্গ প্রায় হইয়া সম্মুখস্থ রেইল ধারণ করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি স্বাধীন দেশের রাজা, আমাকর্ত্তৃক আপনি অল্পকাল হইল উপকৃত হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনকার প্রতিভূ রাজা জয়সিংহ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন আমি এখানে সমাদৃত এবং সম্মানিত হইব, কিন্তু আপনি আমার এই অগৌরব করিয়া সেই কথা মিথ্যা করিলেন"। আরঙ্গেব উত্তর করিলেন তুমি কি জন্য আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি আমার সেনাপতির যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছ—যুদ্ধে জেতার যাহা ইচ্ছা বিজিতের প্রতি তাহাই করিতে পারে—তথাপি জয়সিংহের সহিত তোমার কি কি কথা হইয়াছিল তাহা আমার বিদিত নাই—অতএব যাবৎ কাল পত্রদ্বারা তৎসমুদায় বিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাবৎ তুমি এই নগরে অবস্থান কর, নগরপাল তোমার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং রামসিংহ সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন—পরে আমি যথাযোগ্য শিরোপা দিয়া বিদায় করিব"।

আরঙ্গেবের মানস শিবজীকে কবলিত করেন, কিন্তু জয়সিংহ তাঁহাকে অভয়দান করিয়াছেন, অতএব প্রকাশ্যরূপে কারানিরুদ্ধ করায় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া এইরূপ কৌশলদ্বারা অভীষ্টসাধনের পরামর্শ করিলেন। "সাপের হাঁচি বেদে চেনে"—শিবজী এবং আরঙ্গেবের উপাখ্যান এই জনপ্রবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। মহারাষ্ট্রপতি বাদসাহ প্রমুখাৎ ঐ সকল কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় একেবারে বুঝিতে পারিয়া আপনিও শাঠ্য অবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "বাদসাহের জয় হউক;—আমি অবশ্য আপনার আদেশানুসারে রাজা জয়সিংহের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিব—কিন্তু এই দেশের জল বায়ু আমার অনুচরদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—আর দক্ষিণ দেশ হইতে আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর আসিতেও বহুকাল বিলম্ব হইবে—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে নিজ সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্ত সকলকে বিদায় করিয়া কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে করিয়া অবস্থান করি।" ইহা শুনিয়া আরঙ্গেবের অনুমান হইল যে, শিবজী সত্য সত্যই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সরলান্তঃকরণে এই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন যে,মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে শিবজী নিতান্ত অসহায় হইবে অতএব তখন যাহা ইচ্ছা হয় অনায়াসে করিতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়া বাদসাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন এবং শিবজীকে তাঁহার যে অত্যন্ত ধূর্ত্ত বলিয়া বোধ ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। মহারাষ্ট্রপতি অতি সাবধানে বাদসাহের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিলেন। অতএব অনুমতি প্রদান করিতে করিতে বাদসাহ যে ঈষৎ হাস্য করিলেন তদ্দর্শনেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল বুঝিতে পারিয়া আপনি তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহারাষ্ট্রপতি বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্দিবসীয় রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন। আরঙ্গেব বাস্তবিক কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য্য সমুদায় সমাধা না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনিই সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীর

ওম্রা প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্য্যসচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আম্‌খাসে এবং সন্ধ্যার সময়ে গোসল-খানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতিদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালত-খানায় গিয়া কিরূপে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্য্যে মনোযোগী আছে কি না দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কাওয়াজ দেখিয়া কাহার বা বেতন বৃদ্ধি কাহার বা কর্ত্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমুদয় দিবসাবসান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটী নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির পাণ্ডুলেখ্য সকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেই স্থান হইতেই নির্ব্বাহিত হইত। অমাত্যেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতেন না।

যে দিবস শিবজী আইসেন সেই দিন রজনীতে আরঙ্গেব একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না—তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—"রজনী গভীর হইয়াছে—এই সময়ে আমার দীন দুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কিন্তু আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজ্বরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?—ভাবি চিন্তা বিরহিত হইলে ভূতকালের দুষ্কৃত সমুদায় স্মরণ হয়!—যাহারা কখন পঙ্কিল পাপ পথের পথিক হয়েন নাই তাঁহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল। মনুষ্য জীবন সতরঞ্চ খেলার ন্যায়—ইহাতে যত ভাবনা করা যায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত হইবার সম্ভাবনা!—দেখ এমত ধূর্ত্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে

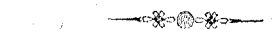
করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্খ! 'জয়সিংহ'—'জয়সিংহ'—এই নামটা আমার অত্যন্ত কর্ণ-জ্বালাকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপকারেও অসমর্থ নহে—আর কার্য্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপায়েরই বা আবশ্যকতা কি? ফল পাড়া হইলে আকর্ষীতে কি প্রয়োজন?—কিন্তু জয়সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়াছিলেন?—আমারও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাবধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাল হয়"—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশ-দত্তদৃষ্টি হইয়া কহিলেন "জয়সিংহ! সাবধান—এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে,—আমার দোষ নাই—পুত্র! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার যত্ন করিও না"। এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"হে আত্মজ! তুমি আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম সঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয়, অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না। তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা দিয়াছি; অধিককাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করিয়াছিলে। আমি অনেক ক্লেশে এই ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্ব্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান! যেন তোমারও সেই দশা না হয়। তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিদিগকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি পিতার প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ

করিবে। এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে, আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে।"

বাদসাহ দুই তিন বার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, যদি পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখন সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন করিলে কাহা কর্ত্তৃকও বিশ্বাস্য হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান্ দেখিয়া এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্ত্তব্য?—প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য্য সাধন হয় না—হায়! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য্য সাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক্ এবং আমি একলা এক দিক্ হইলেও, বুঝি জয় হইত—পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এক জন অতি বিশ্বাস-ভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি সংগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গ যখন পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাহিও, যদি পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাঁহার তাম্বুলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইও—পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহকরণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মস্‌লা এই—আরঙ্গেব এই বলিতে বলিতে ভৃত্যের হস্তে একটি কাগচের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন "যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়সিংহের তাম্বুলবাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিয়াছ!" ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশিরা হইল এবং বাদসাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

—০()০—

নবম অধ্যায়।



মহারাষ্ট্রপতি নগরপাল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে উপনীত হইয়া অবিলম্বে সমভিব্যাহারী সামন্তবর্গের অধিপতিকে আহ্বান করত তাঁহাকে স্বদেশ গমনের আদেশ করিলেন। সৈন্যপতি রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ পাথেয় সামগ্রী সকল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। শিবজী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন অনুচরবর্গ নিকটে থাকিতে বাদসাহ আমাকে বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইতে দিবেন না, কিন্তু বাহির হইতে না পারিলেও প্রস্থানের উপায়াবধারণ হওয়া দুর্ঘট; এই জন্যই তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া নিজ-সৈন্যগণকে বিদায় দিবার অনুমতি গ্রহণ করেন, আর সেই জন্যই যে কয়েক দিন তাহারা সকলে নির্গত না হইল, আপনি পীড়ার ভান করিয়া রহিলেন, একবারও বহির্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু আরঙ্গেব তখন মহারাষ্ট্রপতিকে কারারুদ্ধ করণের মনন করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিবজী সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বাস করিতেছে, অতএব যে পর্য্যন্ত জয়সিংহ বিষয়ক কোন সংবাদ না পাওয়া যায় তাবৎ ইহাকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই—নগরপালের নজর-বন্দি করিয়া রাখিলেই চলিবে। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় সমুদায় সেনা বিদায় হইয়া গেলে, শিবজী এক দিন নগরপালের সহিত কথায় কথায় স্বাস্থ্য-কর বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন নগরপাল অবিলম্বে সম্মত হইয়া স্বয়ং কতিপয় বলবান্ পুরুষ সমভিব্যাহারে অনুগমন করত মহারাষ্ট্রপতিকে বাসাবাটী হইতে নির্গত করিল।

শিবজী এপর্য্যন্ত পলায়নের কোন পন্থা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে দিন প্রথমে বাটীর বহির্গত হইলেন সেই দিনেই তাহার সোপান হইল। তিনি রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে যমুনা তটে ক্ষণকাল পরিভ্রমণ করিয়া অন্য-মনস্কতা বশতঃ ক্রমে ক্রমে বাদসাহ ভবনের সম্মুখবর্ত্তী বিপণিতে

উপনীত হইলেন। তথায় বিবিধ দ্রব্যজাত এবং নানা দেশীয় লোকের সমাগম দর্শনে কিঞ্চিৎ তন্মনস্ক হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যাঁহারা বহুকাল বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপরিচিত জনময়স্থানে স্বদেশীয় পরিচিত ব্যক্তির সন্দর্শন লাভে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হয় বুঝিতে পারেন। মহারাষ্ট্রপতি ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শিবজী, ঐ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আপনার গুরুদেব রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি যে দিকে গমন করিলেন, আপনিও ক্রমে ক্রমে সেই পথে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমভিব্যাহারী নগরপালের ভয়ে কেহই পরস্পর অভ্যর্থনা দ্বারা পূর্ব্ব পরিচয় প্রকাশ করিলেন না।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ রামদাস স্বামী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে একটী বট বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন। মহারাজ মনে মনে তাঁহার চরণ বন্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরামর্শাবধারণ করত নগরপালকে কহিলেন, অদ্য আর অধিক গমন করিব না—চল, বাসায় ফিরিয়া যাই—কিন্তু ঐ তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া স্মরণ হইতেছে, আমি পীড়িতাবস্থায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলাম সুস্থ হইলে দেবার্চ্চনা করাইব, উঁহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি; যদি উনি স্বয়ং আমার স্বস্ত্যয়নের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে বাসায় গমনের নিমন্ত্রণ করিয়া যাই। নগরপাল তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রামদাস স্বামীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকৃত-প্রায় হইলেন, পরে শিবজী স্বয়ং যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নগরপাল পাছে কোন সন্দেহ করে, এই জন্যই রামদাস স্বামী প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নচেৎ শিবজীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। অতএব তিনি পরদিবস অতি প্রত্যূষেই মহারাষ্ট্রপতির আলয়দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরপাল অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজসমক্ষে উপনীত করিল। গুরু শিষ্যে একত্র হইয়া যে কথোপকথন হইল, তাহার মর্ম্ম এই—রামদাস

স্বামী কহিলেন, আমি তীর্থ দর্শনে নির্গত হইয়া নানা দিদেশ ভ্রমণান্তর মথুরাধীশ সন্দর্শনার্থ সশিষ্য আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রতিগমনকারী মহারাষ্ট্র সৈন্যপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় অবগত হই, এবং অবগত হইয়া মনে মনে বিপদাশঙ্কায় শীঘ্র দিল্লীতে আসিয়া নানা স্থানে শিষ্য নিয়োজন করত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার উপায় চেষ্টা করি,—এক্ষণে সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে, অতঃপর আরঙ্গেবের শাঠ্যজাল হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? শিবজী কহিলেন "যখন এই ঘোর বিপৎকালে আপনকার সন্দর্শন পাইলাম, তখন অনুমান হয়, বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাহা হউক অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু যেরূপ স্বস্ত্যয়নের ভান করিয়া আপনকার সহিত সংগোপনে সন্দর্শন হইল, বোধ হয়, এই উপায়েই কোন সুযোগ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পরামর্শ হইলে রামদাস স্বামী প্রত্যহই প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত জপ পূজা হোমাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন, এবং নগরপালের যাবৎ হিন্দুজাতীয় অনুচরগণ শিবজীর আদেশানুরূপ বাজার হইতে বিবিধ দ্রব্যজাত আনিয়া স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল। আর পূজাবসানে নগরপালের নিযুক্ত প্রহরিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যথেষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াতে মহারাষ্ট্রপতির এই কর্ম্ম তাহাদিগের সমূহ সুখাবহ হইয়া উঠিল। শিবজী ঐ সকল সামগ্রীর অনেক ভাগ নগরস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগের বাটীতেও প্রত্যহ প্রেরণ করিতেন। এইরূপে প্রায় এক মাস বহির্ভূত হইল। কিন্তু শিবজী এই কাল মধ্যে কেবল আপনারই প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন এমত নহে, প্রিয়তমা রোসিনারার উদ্ধারার্থেও সবিশেষ চেষ্টা দেখিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা কি, এবং উহা কিরূপ সফল হইল, তাহা পরে প্রকাশ হইবে, এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, তিনি রোসিনারাকে পাইবার সুযোগ কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার আপনার প্রস্থানের এত বিলম্ব হইতেছিল, নচেৎ ইতিপূর্ব্বেই তদুপায় নিশ্চিত হইত।

—o()o—

দশম অধ্যায়।

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রাজবাটী এবং রাজধানীতে মহাসমারোহে আনন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ভারত রাজ্য লাভ করিয়া এই স্থানেই নিবাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব হইয়াছিল। এই হেতু উভয় জাতীয় লোকেরাই পরস্পর ব্যবহারের অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমান বাদসাহেরা পূর্ব্বকালীন হিন্দু সম্রাটদিগের ন্যায় অনেক আচরণ করিতেন এমত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয় তাঁহারা বর্ষে বর্ষে নিজ নিজ জন্মতিথির উপলক্ষে আপনারা যেরূপ সুবর্ণ রজতাদির সহিত তুলিত হইতেন তাহা হিন্দু রাজাদিগের তুলা পুরুষদানের অনুকৃতি হইবে, যেহেতু অপর কোন দেশীয় মুসলমান নৃপালদিগের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত ছিল এমত বোধ হয় না।

আরঙ্গেব ঐ দিন সুবর্ণ-নির্ম্মিত তুলা যন্ত্রে উত্থিত হইয়া আপনি এক দিকে এবং ধান্যাদি নানা প্রকার শস্য অপর দিকে রাখিয়া তুলিত হইলেন। পরে তাম্র কাংস্যাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত, অনন্তর সুবর্ণ রজতাদিব সহিত, তৎপরে কিংখাপ শাল প্রভৃতি মহামূল্য বস্ত্রাদির সহিত এবং সর্ব্বশেষে হীরক মণি মাণিক্যাদির সহিত তুলারূঢ় হইলেন। ঐ সময়ে নাগার খানায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান রাজামাত্য এবং ওমরা সকল নানা প্রকার দ্রব্যজাত আনিয়া বাদসাহকে নজর দিতে লাগিলেন। বাদসাহও হেমনির্ম্মিত কৃত্রিম বাদাম পেস্তা খর্জ্জুর লইয়া স্বহস্তে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। অশ্বপালেরা দিল্লীশ্বরের সমক্ষে অশ্বশিক্ষার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। মাহুতেরা সুশিক্ষিত হস্তিযূথ আনিয়া বাদসাহকে সেলাম করাইতে লাগিল। এইরূপে রাজকর্ম্মচারী সকলেই অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরেও অতি চমৎকার উৎসব হইতেছিল! প্রধান প্রধান অমাত্য এবং ওমরাদিগের মহিলাগণ ও দিল্লীবাসিনী অনেক বার-

ঘোষারাও সেই দিন বাদসাহের অন্তঃপুরে আগমন করিত। যাঁহারা বারবনিতাদিগের তাদৃশ স্থলে গমন হওয়া অসম্ভব বোধ করিবেন, তাঁহারা স্মরণ করুন যে, অদ্যাপি এমত অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আপন আপন স্ত্রী পরিজনকে প্রায় মুসলমান বাদসাহদিগের ন্যায় দৃঢ়তররূপে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন, অথচ মধ্যে মধ্যে বাটীর ভিতরেও নেড়ীর কবি শ্রবণ করাইয়া স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কলুষিত করা নিতান্ত দূষ্য বোধ করেন না। বরং মুসলমান বাদসাহদিগের এই প্রশংসা করিতে হয় যে, তাঁহারা ঐ দিন অশ্রাব্য কাব্য সংগীতাদি শ্রবণার্থ বারবধূগণের আনয়ন করিতেন না। সেই দিন নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক সমস্ত স্ব স্ব প্রস্তুত রমণীয় শিল্প সামগ্রী লইয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে যাইতেন। কেহ বা উত্তম জামদান কেহ বা সুদৃশ্য পসমী জুতা, কেহ বা বুটোকাটা শাটিন, কেহ বা কিংখাপ-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ, কেহ বা স্বহস্ত প্রস্তুত আতর গোলাপাদি সুগন্ধি দ্রব্য, আর অনেকেই মোহনভোগ প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন। তথায় অন্য পুরুষমাত্রের যাওয়া নিষেধ ছিল। কেবল বাদসাহ স্বয়ং বা তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ ক্রেতৃস্বরূপে ঐ মনোহর বাজারে বেড়াইতেন। ক্রয় বিক্রয় কালে কতই কৌতুক হইত। বাদসাহ কোন দ্রব্যটি মনোনীত করিয়া তাঁহার মূল্য নির্দ্ধারণার্থ কতই বিতণ্ডা করিতেন। একটি পয়সার দর প্রভেদ হইলেও বাক্য ব্যয়ের ত্রুটি হইত না। পরন্তু দ্রব্যটী গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দিবার সময় যেন ভ্রান্তিক্রমে বিক্রয়িণীকে এক পয়সার পরিবর্ত্তে কখন এক খান সুবর্ণমোহর কখন বা বহুমূল্য হীরক খণ্ড প্রদান করিয়া যাইতেন।

সাজাহান নিজ রাজ্যকালে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট আমোদ প্রকাশ করিতেন। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অবধি তাঁহার ঐ আমোদ ছিল না বটে, কিন্তু এইবার রোসিনারাকে অন্যমনস্ক করিবার আশয়ে অনেক অনুরোধ সহকারে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ মনোহর বিপণিস্থলে আনয়ন করিলেন। রোসিনারা কেবল পিতামহের অনুরোধ রক্ষার্থই আসিয়াছিলেন, নচেৎ আমোদ প্রমোদে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে অবধি শিবজী আরঙ্গেব কর্ত্তৃক সভাস্থলে অপমানিত হইয়া যান্

সেই অবধি তাঁহার আন্তরিক সুখ সমুদায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্মধ্যে কত দুঃখ ও কত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যমাত্রকেই বিবিধ দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের, ভক্তি ও স্নেহের উপযুক্ত পাত্রের প্রতি যদি কোন কারণ বশতঃ ভক্তি ও স্নেহের হ্রাস হইয়া যায় তবে, তাহাদিগকে যেমন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তেমন যন্ত্রণা আর কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। রোসিনারা নিজ পিতার একান্ত অধর্ম্ম মতি বুঝিয়া সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিতা ছিলেন। সুতরাং সামান্য আমোদ প্রমোদে তাঁহার দুঃখ শান্তি হইবার সম্ভাবনা কি?

তিনি দ্রব্য বিক্রয়িণীগণের কাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, পিতামহ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণানন্তর পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মানস করিয়াছেন এবং সাজাহানও তাঁহাকে আমোদিত করিতে না পারিয়া সেই চেষ্টায় ক্ষান্তপ্রায় হইয়াছেন, এমত সময়ে এক বারযোষা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া একটী অঙ্গুরীয় এবং উষ্ণীষ প্রদর্শনানন্তর সহাস্য বদনে কহিল "বাদসাহ নন্দিনি! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয়?—ইহা অনেক দুর হইতে আসিয়াছে, তুমি গ্রহণ করিলেই সার্থক হয়"। রোসিনারা শিবজীর হস্তে ঐ অঙ্গুরীয় এবং তাঁহার মস্তকে ঐ উষ্ণীষ অনেকবার দেখিয়াছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া বারবনিতাকে কহিলেন "তুমি আমাদিগের সমভিব্যাহারে নিভৃতে আইস, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করি"। বারবনিতা শুনিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইল। পরে অন্য সকলের শ্রবণ ও দর্শনের অগোচর হইলে রোসিনারা ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই সকল সামগ্রী কোথায় কি প্রকারে পাইলে?" বার-যোষা কোন উত্তর না করিয়া সাজাহানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোসিনারা ঐ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার ভাব বুঝিয়া কহিলেন "ইনি আমার পিতামহ, ইহাঁর অজ্ঞাত কিছুই নাই তুমি নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর"। তখন বারবনিতা কহিতে লাগিল "যাঁহার এই সকল সামগ্রী তিনিই আমাকে এই স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কহিয়া দিয়াছেন যে, যদি আপনি এতদিনেও তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া থাকেন, তবে

তাঁহার সহিত প্রস্থানের উপায় করুন। এইক্ষণে সকলই আপনার হাত, তাঁহার হাত কিছুই নাই'' রোসিনারা এই কথায় কোন উত্তর না করিতে করিতে সাজাহান কহিলেন "আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি রোসিনারা! তুমি অবিলম্বে প্রস্থানের উপায় কর—আর উপায়ই বা বিশেষ কি করিতে হইবে—ইহার সহিত ছদ্মবেশে গমন করা অদ্য বড় কঠিন হইবে না"। রোসিনারা ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া পিতামহের কথার কোন উত্তর না করিয়া বার-যোষিৎকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি বলিতে পার, তিনি আপনার প্রস্থানের কোন উপায় করিতেছেন কি না?"

বার-বধূ কহিল—তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে কহিয়াছেন যে, "যদি তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইতে তোমার সম্মতি হয়, তবে এই রাত্রি শেষে অমুক স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত দুই জনে মিলিত হইবে।" এই বলিয়া শিবজীর নির্দ্দিষ্ট স্থানের নামটী রোসিনারার কর্ণে অতি মৃদুস্বরে কহিল। তাহা সাহাজানেরও শ্রুতিমূল সংলগ্ন হইল না। রোসিনারা তাহার তাদৃশ ব্যবহারে বিশিষ্ট তুষ্টা হইলেন এবং শিবজী নিজ নৈসর্গিক মহানুভবতাগুণে অন্য ব্যক্তিকে কেমন বদ্ধ করিতে পারেন, তাহা তাঁহার জানা থাকিলেও, তিনি অল্পকালের মধ্যেই দুশ্চারিণী বার-বনিতাকেও এমত বিশ্বাসভাজন কি প্রকারে করিয়াছেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্যমন্যা হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন "এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?—অথবা কর্ত্তব্য আর কি আছে—ইহার সঙ্গেই দাসীবেশে প্রস্থান করি—কিন্তু তাহা কি উচিত হয়—পিতা আমার প্রতি অন্যায় এবং মহারাষ্ট্রপতির প্রতি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—কিন্তু সেই জন্য কি আমিও অযথাচরণ করিব? না, আমার যাওয়া হইবে না—ভাল, একবার দেখা করিয়া আসিলেই বা হানি কি?—কিন্তু যদি যাইবার কালীন ধরা পড়ি—অথবা যাইবার পূর্ব্বে ইহা কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আরঙ্গেব এই দোষ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিবেন—আর এই স্ত্রীলোক আমাদিগের উভয়ের হিতকারিণী ইহার পক্ষেও অনিষ্ট ঘটিবে, কি করি"?

রোসিনারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে সাজাহান একজন দাসীর একখানি পরিধেয় বস্ত্র স্বহস্তে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং কহিলেন "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এই পরিচ্ছদ ধারণ কর এবং ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া যাও, আমাকে স্মরণ রাখিও এবং নিশ্চয় জানিও যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমার সদাচরণ আমার অন্তঃকরণ মধ্যে দেদীপ্যমান থাকিবে"। এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অক্ষিদ্বয় সজল এবং বচন গদ্গদ-স্বর হইল। তিনি আর অধিক বলিতে পারিলেন না। রোসিনারা পিতা-মহের প্রদত্ত দাসীবেশটী একবার হস্তে লইয়া পুনর্ব্বার রাখিয়া দিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন "আমার যাওয়া কি উচিত হয়?" সাজাহান ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, "কিসে অনুচিত?—সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এ পর্য্যন্ত আসিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে; সে হিন্দু, তোমাকে বিবাহ করিলে তাহার জাতি নাশ হইবে তাহাও সে স্বীকার করিতেছে; এখানে তুমি এমন কি সুখে আছে যে, যাইতে অনিচ্ছা হয়।" —"অনিচ্ছা! আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছা যে কি পর্য্যন্ত বলবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্ত্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারিত হইতেছে না, কিন্তু এইক্ষণেই আপনি যাহা বলিলেন তাহাতেই সেই ইচ্ছার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছে, কারণ, বিবেচনা করুন, যদি পিতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিতেন, তবে পিতাই নিজ জামাতার প্রধান সহায় হইতেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রপতির স্বজাতীয়েরা বিরক্ত হইলেও তাহারা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাষ্ট্র জাতি উভয়কেই শিবজীর শত্রু করা হইবে, সুতরাং আমা হইতেই সেই প্রণয়াস্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমত কর্ম্ম কেমন করিয়া করিব।" সাজাহান এবং ঐ বারবনিতা উভয়ের কেহই জানিত না যে, যথার্থ প্রীতি কি অদ্ভুত পদার্থ! উহার আবির্ভাবে মনুষ্যের মনঃ একেবারে স্বার্থশূন্য হয়। অতএব তাঁহাদিগের কেহই রোসিনারার বাক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিতে পারিলেন না। না পারুন, কিন্তু বৃদ্ধ বাদসাহ তাঁহার যুক্তির ঔদার্য্য উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—"তুমি বুদ্ধিমতী যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয়, কর—আমি ভাবিয়া-

ছিলাম শিবজীর সহিত মিলিত হইলেই তুমি সুখভাগিনী হইবে—এবং তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে দেহযাত্রা সম্বরণ করিতে পারিব, কিন্তু যদি না যাওয়াই সৎপরামর্শ হয় তবে, ইহাকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া বিদায় কর'। রোসিনারা অবিলম্বে বারবনিতাকে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইতে কহিয়া আপনি স্বগৃহে গমন করিলেন এবং স্বল্পক্ষণ মধ্যেই একটী লিপি আনিয়া তাহার হস্তে প্রদানান্তর আপনার হস্তাঙ্গুরীয়টী বারযোষাকে সমর্পণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন। বারবনিতা বাদসাহ পুত্রীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিতে করিতে বিদায় হইল।



একাদশ অধ্যায়।

মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারেন যে, উচিত, অনুচিত, বিবেচনাসিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্য্যন্ত নিরূপণ করাই মনুষ্যের আপনার হাত, কর্ম্মের ফলাফল মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতারই অধীন। কত কত ব্যক্তি কত কত মহতী মন্ত্রণা সকল নিরূপণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আর কত কত স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াও জনগণ সুমহৎ ফল-ভাগী হইয়াছেন। অতএব সাধুশীল ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই ফল-সিদ্ধির উদ্দেশ না করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কোন কার্য্যে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য্য সফল হইলেও গর্ব্বিত হয়েন না। তাঁহারা অকৃতার্থ হইলে জগদীশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, এবং সফল-চেষ্ট হইলে তাঁহারই ধন্যবাদ করেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের দুষ্ট মন্ত্রণা সকল সিদ্ধ হইলেও দুঃখ এবং অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপ জন্মায়।

শিবজী, যে প্রকারে আরঙ্গেবের শাঠ্য জাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরঙ্গেবের ও আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতে যে প্রকার অনুতাপ এবং কতক বিফল হওয়াতে তাঁহার যে প্রকার দুঃখ জন্মিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত কথাটী মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়। যে সময় বাদসাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গণিকা প্রবিষ্ট হইয়া রোসিনারার স্থানে পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া বিদায় হয়, তাহারই কিয়ৎক্ষণ-পরে বাদসাহ, যে ব্যক্তিকে জয়সিংহের বিনাশার্থ প্রেরণ করেন, সে এক পত্র হস্তে বাদসাহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বর-দিগের এমত রীতি ছিল না যে, স্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ করেন। শুদ্ধ সেই কর্ম্মের জন্যই তাঁহাদিগের সমীপে দুই জন প্রধান

ওম্‌রা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু আরঞ্জেব ঐ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া লিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সমীপবর্ত্তী সকলেরই অনুভব হইল যে, পত্রবাহক কোন অতি প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। বাদসাহ পত্রার্থ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্যবদনে নগরপালকে আনয়ন করিতে কহিয়া সত্বরে সভার কার্য্য সমাপনানন্তর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আরঞ্জেব কখনই কৌতুক-প্রিয় ছিলেন না, অতএব তাঁহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেরূপ মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ তখন প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রায় অনেকেই, যে যাহার আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা ছিল তাহারাও তদ্দিবসীয় কার্য্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অতএব বাদসাহ কোথাও বিলম্ব না করিয়া একেবারে একাকী রোসিনারার মহলে উপস্থিত হইলেন। আরঞ্জেব নিজ কন্যার আরক্ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষমুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতি পূর্ব্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহা অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"তুমি কি জন্য রোদন করিতে ছিলে?" রোসিনারা ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিবজীর সহিত গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল—আবার মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর যে কখন পাইবেন এমত বোধও ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি পূর্ব্বে তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভয়ের আস্পদ হইয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ হঠাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি ভয়ে এবং দুঃখে একান্ত অধীরা হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ শোক-সূচক চিহ্ন সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আরঞ্জেব যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতেও পারিলেন না। বাদসাহ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন—"তুমি

কি জন্য রোদন করিতেছ—আপনিই আপনার দুঃখ উপস্থিত করিয়াছ—ভাবিয়া দেখ, আমাদিগের বংশীয় কন্যাগণ প্রায়ই কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিতে পায় না, কিন্তু তোর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম বলিয়া উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার মনন করিয়াছিলাম—সে যাহা হউক, যদি এক্ষণও তোমার দুর্বুদ্ধি গিয়া থাকে, তবে পারস্য রাজতনয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করি—কিছু উত্তর করিলে না যে?—তবে বোধ হয় তোমার অসম্মতি নাই"। রোসিনারা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "পিতঃ! আমি তোমার অসম্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না—এই বংশীয় কন্যাগণের চিরকৌমারাবস্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও তাহাই হউক—অন্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন"। আরঙ্গেব সর্ব্বদাই আপনার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের অন্যথা করিতে চাহিলে বৈরক্তির পরিসীমা থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল রোসিনারার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবেন বলিয়াই তথায় আসিয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ আত্মজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"আঃ! পাপীয়সি তোর লজ্জাভয় সকলই গিয়াছে—তুই যে পামর দস্যুর কুহক মন্ত্রের বশীভূতা হইয়াছিস্ তাহার জীবন সত্বে তোর এই দুর্বুদ্ধি যাইবার উপায় নাই, অতএব এই দণ্ডে তাহার ছিন্ন মস্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব—তোর দোষেই সে নিহত হইবে"! রোসিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার পাদমূলে নিপতিতা হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন "তাত! ক্ষমা করুন—আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতিথির প্রাণবধ করিবেন না, তাহাকে স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিউন—আমি আর যত কাল বাঁচিব ভুলিয়াও আপনার মতের বিপরীতাচরণ করিতে চাহিব না"। আরঙ্গেব বিকট হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "তবে তুমি পারস্য রাজতনয়ের ধর্ম্মপত্নী হইতে স্বীকার করিলে"?। "আমি সকলই স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি অপরাধ করিয়া থাকি আমারই দণ্ড বিধান করুন, আমার

দোষে অপরের দণ্ড করিবেন না"। নিষ্ঠুর আরঙ্গেব কন্যার এই সকল বচনে কিছুমাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত না হইয়া উত্তর করিলেন—"শুন, রোসিনারা! তুমি আমার উপরোধ রক্ষা কর নাই—আমার কথা বড় নয় সেই দস্যুর প্রাণই তোমার মনে বড় বোধ হইয়াছে—স্বচক্ষে তোমাকে তাহার বিনাশ দেখিতে হইবে, এবং আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে"। বাদসাহের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোসিনারা বিচেতনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আরঙ্গেব আত্মজাকে তদবস্থ রাখিয়াই সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন।

বাদসাহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পূর্ব্বাহূত নগরপাল সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে অভিবাদনাদি করিল। বাদসাহ তাহাকে সরোষ-বচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আরঙ্গেব ক্ষণকাল সেই খানেই দাঁড়াইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—"আর কি!—আমার ত সকল মানসই সুসিদ্ধ হইল—পুত্র আমার আদেশানুসারে বিদ্রোহের ভান করিয়া সকলের অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে—অতএব সে আর কখন কাহার বিশ্বাস্য হইবে না—জয়সিংহও, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল, অতএব সে পরীক্ষায় ঠেকিয়াই প্রাণ হারাইয়াছে—তাহাতে আমার পাপ কি?—বিদ্রোহীকে কোন্ রাজা দণ্ড না করিয়া থাকেন—বিষ দ্বারাই হউক আর বধ্যভূমিতে ঘাতকের শস্ত্র দ্বারাই হউক, জীবন বিনাশ একই পদার্থ—আর এতক্ষণে শিবজীরও নিধনসাধন হইল, সে ব্যক্তি পূর্ব্বাবধিই আমার শত্রু আছে এবং বিশেষতঃ সে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, অতএব সে অবশ্যই দণ্ডার্হ—আরঙ্গেব! তুমি এত দিনের পর সত্য সত্যই দিল্লীশ্বর বাদসাহ হইলে, এত দিনে তোমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল"। দিল্লীশ্বর এইরূপে চিন্তা করিতেছেন এবং তাদৃশ গুরুতর পাপ সমস্ত জনিত প্রবল, অনুতাপাগ্নিকে মনে মনে ব্যর্থযুক্তিরূপ বারিকণা দ্বারা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমত সময়ে নগরপাল ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া বাদসাহের পদতলে নিপতিত হইল। আরঙ্গেব নগরপালের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াই আপনার মন্ত্রণার

বৈফল্য অনুভব করত যে, কি পর্য্যন্ত বিষাদে নিমগ্ন হইলেন তাহা কথনীয় নহে। কিন্তু দিল্লীশ্বর, অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, ইচ্ছা করিলেই দুঃখ ক্রোধ ভয়াদি নিবারণ করিয়া সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিতেন। অতএব বাদসাহ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া নগরপালকে সমীপবর্ত্তী এক জন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করত স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠাবলম্বনে শিবজীর বাসাবাটীর প্রত্যভিমুখে ধাবমান হইলেন। অমাত্যবর্গও বাদসাহের সমভিব্যাহারী হইল, এবং মহারাষ্ট্রপতির পলায়ন বার্ত্তা প্রচরদ্রূপ হওয়াতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহা-কোলাহল পুরঃসর সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিল।

বাদসাহ কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, নগরপালের কতিপয় অনুচর এক ব্যক্তিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছে। বাদসাহ দূর হইতে ঐ ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুভব করিলেন সেই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হইবে। অতএব অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সকল লোক নিকটবর্ত্তী হইলে বন্দীর মুখাবয়ব দ্বারা বোধ হইল যে, সে শিবজী নহে। পরে সে ব্যক্তিও বাদসাহ সমীপে আনীত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যর্থ তাড়না করিতেছে"। পরে প্রকাশ হইল যে, ঐ ব্যক্তি নগরপালেরই একজন অনুচর; শিবজীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাহার খট্টায় শুইয়া ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, নগরপাল তাহাকে মহারাষ্ট্রপতির খট্টায় শয়ান দেখিয়া একেবারে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আপনি তৎক্ষণাৎ বাদসাহের নিকট আইসে এবং উহাকেও পরে আনয়ন করিতে আদেশ করে। আরঙ্গেব এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "অনুমান হয়, এই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া শিবজী ইহার সহিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনানন্তর ছদ্মবেশে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অধিকদূর যাইতে পারে নাই; তাহাকে ধৃত করিতে হইবে—নচেৎ;—আমার অন্য কোন হানি নাই, কেবল যথাযোগ্য প্রসাদ না লইয়া গেলে বাদসাহী পদের অগৌরব করা হয়—তোমরা কেহ, বলিতে পার, সে কি

জন্য এমত কৌশল করিয়া পলায়ন করিল?—আমার অনুভব হয় যে, সে সভাতে আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিয়াছিল, অতএব রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে লিপি আসিলেই পাছে সেই মিথ্যা প্রচার হয় এই ভয়ে পলায়ন করিয়াছে—যাহা হউক, এক্ষণে রাজা জয়সিংহ তাহার নিকট কিছু প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কি না, তাহা প্রমাণ করিবারও আর উপায় নাই—অদ্য এক লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্দ্বারা জানিলাম আমার পরম হিতকর চিরসুহৃৎ জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—হায়! তাঁহার ন্যায় আমার হিতকারী আর কে হইবে"?। কপটমতি আরঞ্জেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চাটুকার অমাত্যগণ, আকাশাভিমুখ হইয়া বাদসাহের বাক্য দৈববাণীর ন্যায় ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আকর্ণন করিতে লাগিল। জনসাধারণ আরঞ্জেবের কৌটিল্যে মুগ্ধ হইয়া ভাবিল—"আহা! বাদসাহ কি করুণ হৃদয়!"—প্রাচীন অমাত্যগণ যাঁহারা আরঞ্জেবের মন্ত্রণার ভুক্তভোগী ছিলেন, তাঁহারা কেবল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাদসাহের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, নিজ নিজ মুখাবয়বে সুখ দুঃখ কোন ভাবই প্রকটিত করিলেন না। আর যে সকল অমাত্য, মৃত রাজা জয়সিংহের প্রতি বাদসাহের মনে মনে মৎসরভাব ছিল, ইহা জানিতেন, তাঁহারা কেহ কেহ বাদসাহের কর্ণগোচর হয় এমত করিয়া মৃদুস্বরে 'কাফের' (বিধর্ম্মী) এই শব্দটী দুই একবার উচ্চারণ করিলেন।

আরঞ্জেব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও এইরূপ কৌশল সহকারে মনের ভাব সকল গোপন করত ভৃত্যদিগের উপর যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার এই ভাবনা হইতে লাগিল।—"হায়! যদি শিবজী ধরা না পড়ে তবে সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কেনই বা জয়সিংহকে হনন করিলাম! কেনই বা এই দুর্ব্বহ পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিলাম! জয়সিংহ ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, আর কিছুদিন হইলেই কালবশে লোকান্তর গমন করিত—হায়! তাদৃশ সেনাপতিই বা আর কোথায় পাইব।"

—০()০—

দ্বাদশ অধ্যায়।

সেই দিন নিশীথ সময়ে পূর্ব্বোক্ত বারাঙ্গনা একাকিনী সেতুদ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দিক্ প্রাচীন দিল্লী, তথায় অনেকানেক ভগ্ন প্রাসাদ এবং বৃহৎ বৃহৎ দেবালয় সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে এক্ষণকার অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। ঐ স্থানে একটি মনুষ্যেরও গমনাগমন নাই। কেবল স্থানে স্থানে শৃগালাদি হিংস্র জন্তুরই উপদ্রব আছে। যাহা হউক ঐ স্ত্রী একাকিনী নিঃশঙ্কহৃদয়ে ঐ স্থান দিয়া গমন করত কিয়ৎদূর অন্তরে একটী ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তথায় মহারাষ্ট্রপতি তাহাকে দর্শন করিয়া সম্ভাষণপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি? অথবা সংবাদই আর কি জিজ্ঞাসা করি—তুমি একাকিনী আসিয়াছ—তবে আমার সকল যত্নই বিফল হইয়াছে"। বার-নারী উত্তর করিল—"হাঁ মহারাজ! আপনকার চেষ্টা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা মুখে বর্ণন করিয়া আর কি জানাইব, এই পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া সমুদায় অবগত হউন"। শিবজী ব্যস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেই অঙ্গুরীয় যে, রোসিনারারই অঙ্গুরীয় তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—"তবে বাদসাহ-পুত্রীর সহিত তোমার সন্দর্শন হইয়াছে—তিনি কি বলিলেন? কেমন আছেন? আমার প্রদত্ত সামগ্রী সকল দেখিয়াই কি চিনিতে পারিয়াছিলেন? না তোমাকে পরিচয় দিতে হইয়াছিল? আর তাঁহার আগমনেরই বা কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সমুদায় একেবারে বল"। স্ত্রী উত্তর করিল "মহারাজ! সেই বাদসাহ-পুত্রীর ন্যায় উদার-চরিত্রা কামিনী কখন দেখি নাই শুনি নাই—যাহা ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন" এই বলিয়া বার-বনিতা সমুদায় বর্ণন করিলে শিবজী চমৎকৃত হইলেন, পরে বহুক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন "রোসিনারা অন্যায়

বিবেচনা করিয়াছেন—যদি তাহার নিমিত্ত আমার রাজ্য বিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি সুখী হইতাম—তাদৃশ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে অরণ্য-বাসেও অসুখ নাই"। বার-যোষা কহিল "মহারাজ! যাহা বলুন কিন্তু বাদসাহ-পুত্রী উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন—এবং তিনি উচিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সমুদায় গুণ আপনার অনুভূত হইতেছে"!

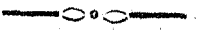
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এবং শিবজী আপনি দুই এক দিন সেই খানেই থাকিয়া রোসিনারাকে আনয়নার্থ পুনর্ব্বার যত্ন করিবেন এমত পরামর্শ করিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীমান্ রামদাস স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। অতএব ঐ বার-বনিতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল। শিবজী শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে একটি কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই—আর আপনকার নিকট আমার দোষ গুণ কিছুই অব্যক্ত নাই, অতএব শ্রবণ করুন"—এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সংক্ষেপে রোসিনারা সম্বন্ধীয় তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন। রামদাস স্বামী তৎশ্রবণে ঈষৎ কোপযুক্ত হইয়া বলিলেন—"আমি মহারাষ্ট্রে ইহার কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম—তথায় কেহ কেহ এমত কথাও কহিত যে, তুমি স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে তাদৃশ উৎসাহশীল নহ।—অর্থাৎ যদি আরঙ্গেব তোমার সহিত সন্ধি করেন তবে তাঁহার মণ্ডলেশ্বর হইতেও তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা নাই।—তখন ঐ সকল কথায় আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় নাই।—কিন্তু এই ব্যাপার শ্রবণে সেই লোক প্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে না।—এমত উদার-প্রকৃতি হইয়াও যে, স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহা না দেখিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস হইবে।—বাদসাহ-পুত্রী যে, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আসিলেন না ইহাই ক্ষেমঙ্কর করিয়া মানি"। শিবজী এই সকল কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। তখন রামদাস স্বামী ঐ বার বধূর স্থানে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন "মহারাজ! আমি অন্যায় করিয়াছি—বাদসাহ-পুত্রীর

যেরূপ বিবেচনা শুনিলাম, তাহাতে আমারও অন্তঃকরণে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইতেছে, তিনি সামান্যা স্ত্রী নহেন এবং তুমি সেই জন্যই তাঁহার প্রতি প্রণয়বদ্ধ হইয়াছ—আমি তজ্জন্য তোমার নিন্দা করিয়া ভাল করি নাই—যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া শ্রবণ করাই"। শিবজী তৎক্ষণাৎ ঐ পত্র গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তিনি সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

"হে মহারাষ্ট্ররাজ!—হে প্রিয়তম!—আমি কি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব—আর কি বা লিখিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না।—তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না—কিন্তু আমি তোমার মন জানি। অতএব আমি যে জন্য তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলাম না, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহিলেই বুঝিতে পারিবে এবং আমার প্রতি অক্রোধ হইবে। আমি আর অধিক কি বলিব—তুমিই আমার স্বামী, তাহার চিহ্নস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম—অতএব অদ্যাবধি আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল।—কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে—এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামী-সহবাস সুখে বঞ্চিত করিলাম।—যদি বল, আমাকে লইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না—সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই—কিন্তু মনে করিয়া দেখ; শুদ্ধ রাজা হওয়া মাত্র তোমার মনের মানস নহে।—অতএব আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই—একান্ত অধীনা রোসিনারা।"

রামদাস স্বামী এই পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতাদৃশ উদারচরিতা কামিনী আছে তাহা আমি জানিতাম না—মহারাজ! যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দ্বারা পাতিব্রত্য রক্ষা করেন তাঁহারাও ইহাঁর ন্যায় পতিপরায়ণা নহেন—মহারাজ!

আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন—এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহ কন্যাই আপনকার সহধর্ম্মিণী হইবেন ইহার সন্দেহ নাই।"



শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীরাজকুমার সেন দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২২ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

—:০:—

এই পুস্তক খানি বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। ইহার প্রথমে, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকবর্গের কর্ত্তব্যতা, তথা কি প্রকার শিক্ষা এক্ষণে এতদ্দেশীয় বালকদিগের প্রতি বিহিত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগে বালক সকলকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করিবার উপযোগী কতিপয় নিয়ম নিরূপ হইয়াছে, এবং সেই নিয়ম সকলের সুখাববোধার্থ কয়েকটী উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকের সর্ব্বশেষ অংশে, পরিবার মধ্যে সন্তান বর্গের যে প্রকারে প্রতিপালন হওয়া আবশ্যক, তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ কিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে।

পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ; অতএব ইহাতে শিক্ষা শাস্ত্রের প্রথম প্রস্তাবনা মাত্রই হইতে পারে। পরন্তু, এক্ষণে দেশীয় ভাষায় বিদ্যা-বিস্তারের নিমিত্ত যে প্রকার প্রযত্নারম্ভ হইয়াছে, যদি এই নিবন্ধ দ্বারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থম্মন্য হইব।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। ইহাতে যে সকল নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা গিয়াছে, তাহা নিম্নবর্ত্তী সূচীপত্র দর্শনেই স্পষ্ট বোধ হইতে পারিবে।

সূচীপত্র।

—:০:—

প্রথম অধ্যায়।

জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা—শিক্ষকের ব্যবসায়—বঙ্গীয় শিক্ষকদের প্রতি উপদেশ। পৃষ্ঠা, ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষকদিগের প্রতি বিশেষ উপদেশ—বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানের রীতি। পৃষ্ঠা, ২১

তৃতীয় অধ্যায়।

লিখন এবং পঠন শিখাইবার রীতি—কাষ্ঠ ফলকের ব্যবহার—ধ্বনির ধারায় বঙ্গীয় বর্ণমালার শিক্ষা। পৃষ্ঠা, ২৬

চতুর্থ অধ্যায়।

গণিত বিদ্যা—কাষ্ঠফলকের ব্যবহার—'গণনক' যন্ত্রের ব্যবহার—সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিবিধ পাঠ—শতিকা—নামতা—সঙ্কলন, ব্যবকলন, পূরণ, হরণ—ত্রৈরাশিক পরিমাণ সূত্র—ভিন্ন রাশি। পৃষ্ঠা, ৪৪

পঞ্চম অধ্যায়।

পাঠ বলিয়া দিবার রীতি—বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পুস্তক কতিপয় হইতে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন। পৃষ্ঠা, ৫০

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বস্তুবিদ্যা—বস্তুমঞ্জুষা—কাচবিষয়ক কতিপয় আনুক্রমিক পাঠ প্রদর্শন—সরল বাক্য রচনা—প্রশ্নোত্তর রচনা—পদ পূরণ দ্বারা বাক্য রচনা পৃষ্ঠা, ৬১

সপ্তম অধ্যায়।

কারিক—পদ এবং বাক্যের অন্বয় করিবার রীতি—শব্দের ব্যুৎপত্তি বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পুস্তক কতিপয় হইতে ইহার উদাহরণ প্রদর্শন। পৃষ্ঠা, ৭১

অষ্টম অধ্যায়।

ক্ষেত্র তত্ত্ব—'কাষ্ঠিকাপাঠ'—যুক্তিদের প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞা কতিপয়ের কার্য্যোপযোগিতা প্রদর্শন—দূরত্ব এবং উচ্চতা পরিমাণের সূত্র—বর্গ পরিমিতি—ঘন পরিমিতি। পৃষ্ঠা, ৭৭

নবম অধ্যায়।

বাচনিক শিক্ষা—পরীক্ষা বিধান—সামান্য বিবিধ বিষয়ক প্রশ্নমালা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত। পৃষ্ঠা, ৯১

দশম অধ্যায়।

মানচিত্র করণ—ভূগোল, ইতিহাস। পৃষ্ঠা, ১০০

একাদশ অধ্যায়।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম এবং শারীরিক শিক্ষার উল্লেখ—গৃহে সন্তানদিগের কিরূপ শিক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য তাহার স্থূল বিবরণ। পৃষ্ঠা, ১০৮

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব।

—:০:—

প্রথম অধ্যায়।

—:*:—

[সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—শিক্ষা প্রণালী সংশোধনের তাৎপর্য্য—শিক্ষকদিগের প্রতি উপদেশ।]

—:০:—

"ছাত্রাণা মধ্যয়নং তপঃ" অর্থাৎ বিদ্যাভ্যাসই বিদ্যার্থীদিগের প্রধান তপস্যা। যিনি এই কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, তিনি কাহারও পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন না। তিনি জানেন, বিদ্যাভ্যাসের অন্য ফল আর যত হউক বা না হউক, তদ্দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলের অনেক সদ্‌গুণ জন্মে—তিনি জানেন যে, অধ্যয়নরূপ তপস্যা দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দমন, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরোক্ষ জ্ঞান এবং পরিণাম-দর্শন প্রভৃতি গুণ সকল অবশ্য কিঞ্চিন্মাত্রও বর্দ্ধিত হয়। ইহা জানিয়া তিনি কোন ব্যক্তির বিদ্যা শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েন না—অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি লোক-দিগেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ থাকা প্রার্থনীয় বোধ করেন। এই জন্যই অস্মদ্দেশীয় কোন প্রধান পণ্ডিত কহিতেন, যদি কেহ সামান্য কৃষি-কর্ম্ম করিতেও যায়, তথাপি একরূপ ব্যাকরণ পড়িয়া যাওয়া ভাল।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় এবং আমেরিকার সভ্য জাতি মাত্রেরই সেইরূপ বিবেচনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জর্ম্মনি, স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, ইঙ্গলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে তত্রত্য শাসনকর্ত্তৃগণ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার্থ সমূহ প্রযত্ন করিতেছেন। এই দেশের ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যেশ্বরেরাও পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমত

কেবল অর্থশালী ব্যক্তিবর্গের বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত এবং আরবীয়, অথবা ইঙ্গরেজী পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিতেন, এক্ষণে শুদ্ধ তাহা করিয়াই তুষ্ট হয়েন না। যাহাতে কি দরিদ্র, কি আঢ্য, কি কৃষক, কি বণিক্‌বৃত্তিশালী সকলেরই সন্তানগণ কিছু কিছু জ্ঞানযুক্ত হইয়া যাহার যে বৃত্তি তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে, সর্ব্ব সাধারণকে দেশীয় ভাষায় এমত শিক্ষা প্রদান করিতে রাজ্যেশ্বরদিগের অভিলাষ হইয়াছে। তাঁহারা তদর্থ অর্থ ব্যয় করিতেও কাতর নহেন। দেশীয় জনগণ স্বীয় বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিবার মানসে পাঠশালা সংস্থাপন করিলেই রাজকোষ হইতে যথোচিত পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

বঙ্গদেশের উন্নতি সাধনবিষয়ে এমন সুযোগ আর কখন হয় নাই। দেশীয় মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাশিক্ষা হইলে দেশের কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শিবে। যে সকল অত্যাচারের জন্য লোক সকলকে এক্ষণে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইতেছে—যে সকল প্রমাদ হেতু মানববর্গ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া শঠপ্রকৃতি লোকের চাতুর্য্যে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইতেছে—যে সকল মূর্খতা দোষে এতদ্দেশীয় মনুষ্যকুল কূপমণ্ডূকবৎ দিগ্‌দর্শনশূন্য হইয়া রহিয়াছে, সে সমুদায় না হউক,—তাহা অনেক নিরাকৃত হইবে। তখন এই বঙ্গদেশের মুখ কেমন উজ্জ্বল হইবে! দেশীয় মহাশয়েরা এই সকল বিবেচনা করিয়া এমত মহৎ কর্ম্মে উৎসাহ এবং অনুরাগ প্রকাশ করুন।

আমাদিগের দেশে সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যা শিক্ষা যে কখন প্রচলিত ছিল না এমত নহে। কেবল বেদ, মনু এবং তত্তুল্য কতিপয় গ্রন্থ পাঠেই স্ত্রী শূদ্রাদির অনধিকার আছে। অতি পূর্ব্বতন কালেও সাধারণ লোকের ধর্ম্মজ্ঞান এবং বিষয় বুদ্ধি সম্বর্দ্ধনার্থ মুনিগণ পঞ্চ লক্ষণযুক্ত পুরাণ সকলের ব্যাখ্যা করিতেন। আর এক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যায়, এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গভূমির মধ্যে এমন একটী প্রধান গ্রাম নাই, যেখানে ভাল হউক, বা মন্দ হউক, একটী পাঠশালা নাই। অতএব বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরদিগের যে সর্ব্বসাধারণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রথা, তাহা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত নূতন ব্যাপার নহে।

যদি বল তবে তাঁহারা কি করিবেন, আমাদের ত সকলই আছে। তাহার উত্তর এই। ঐ সকল পাঠশালায় এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা উত্তম হয় না। বহু কালাবধি ভিন্ন জাতীয় রাজাদিগের এতদ্দেশীয় বিদ্যার প্রতি বিরাগ থাকাতে ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্য অতি অকর্ম্মণ্য লোকের হস্তগত হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি প্রধান বিদ্যার কথা দূরে থাকুক, উহারা মাতৃজাতীয় বঙ্গভাষা শিক্ষা করাইতেও অক্ষম, আর তাঁহারা যে অঙ্ক বিদ্যার গৌরব করিয়া থাকেন, তাহাও কদাচিৎ 'কড়িকষার' উর্দ্ধে উঠে না। কোন দরিদ্র কায়স্থ সন্তান মুহুরিগিরী, সোমস্তাগিরী প্রভৃতি কর্ম্ম কার্য্যে অশক্ত হইলেই পরিশেষে একটী পাঠশালা খুলিয়া 'গুরু-মহাশয়' হইয়া বসেন! কে না জানে যে, দীন হীন ব্রাহ্মণ কুমারদিগের যজমান যাজন প্রভৃতি জীবনোপায় কোথাও কিছু না যুটিলেই অবশেষে তাঁহারা গুরু মহাশয়ের বৃত্তি অবলম্বন করেন!

যখন এমন অকর্ম্মণ্য লোক সকল অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখন বিদ্যারও গৌরব হ্রাস হইবে, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমাদিগের দেশের লোক সকল প্রাচীন রীতির কেমন বশীভূত! ঐ সকল পাঠশালায় সন্তানগণকে প্রেরণ করিয়া কোন ফলোদয় হয় না জানেন, তথাপি অনেকেই স্বজনদিগকে কিছু কালের নিমিত্ত গুরু-মহাশয়বর্গের অধীন করিয়া রাখেন। এমন দেশে রাজা প্রজা উভয়ের একদা বিদ্যার প্রতি আগ্রহ দেখিতে পাইলে কাহার মনে সন্তোষ এবং সাহস না জন্মে?

রাজেশ্বরদিগের এমত অভিপ্রায় নয় যে, বর্ত্তমান গুরু-মহাশয় সকলকে একবারে বৃত্তিহীন করিয়া আপনাদিগের মনোনীত লোক সকল নিযুক্ত করেন। তাঁহারা উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত উভয় প্রকার উপায় অবলম্বনদ্বারা গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী সংশোধন করিতে চাহেন। এক্ষণে বালকেরা পাঠশালায় কোন উত্তম পুস্তক পাঠ করিতে শিখে না, একখানি পত্র শুদ্ধরূপে সাধু বঙ্গ-ভাষায় লিখিতে পারে না, বিশ্বপাতা কত আশ্চর্য্য নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা সুসৃষ্ট সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্রও অবগত হয় না—এই সকল ক্ষমতা এবং জ্ঞানের উৎপাদন করাই শিক্ষাপ্রণালী সংশোধনের একমাত্র তাৎপর্য্য।

কিন্তু তদর্থ যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের বিশিষ্ট যত্ন ব্যতিরেকে ঐ তাৎপর্য্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। অতএব তাঁহাদিগকে কহি, হে অধ্যাপকবর্গ! আপনাদিগের প্রতি অতি সুমহৎ ভার অর্পিত হইয়াছে। অতি সাবধানে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন—আপনারা যত্ন করিলে এই দেশীয় সকল ব্যক্তির ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলগ্রাম দর্শনের সোপান করিতে পারেন, নচেৎ নিয়ন্তৃগণকে নিরুৎসাহ করিয়া আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থাকে আরও শত বৎসর অধিক স্থায়ী করিতে পারেন।

প্রথমতঃ—আপনাদিগের এই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, আপনারা কি কেবল বিত্ত লাভের জন্য সে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা অন্য সকল কর্ম্ম অপেক্ষা ইহাতে সন্তোষ অধিক বলিয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদি অর্থ প্রয়াসে আসিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অনুসন্ধান করুন। যে হেতু শিক্ষকের কর্ম্মে যথা কথঞ্চিৎ রূপেও ধনাশা পরিপূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন দেখিবেন যে, আপনাদিগের অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি, অল্পবিদ্য, অল্প পরিশ্রমী এবং অল্পবয়স্ক লোকে অন্যান্য রাজকার্য্যে বা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষা ধনশালী এবং জনসমাজে অধিক মাননীয় হইতেছেন, তখন আপনাদিগের মনোবেদনার পরিসীমা থাকিবে না। তখন স্বীয় ব্যবসায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবে, একান্ত তাচ্ছিল্য হইবে—কিন্তু শিক্ষকের কর্ম্ম এমত স্বল্পায়াসসাধ্য নহে যে, ইহাতে বিশিষ্ট অনুরাগ না থাকিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়। অতএব অগ্রেই সাবধান করি, যাহারা ধনাকাঙ্ক্ষী বা অলস প্রকৃতি হও, তাহারা কদাপি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। এই বিষয়োপলক্ষে অধিক কি বলিব? কোন সুমহৎ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি কহিয়াছেন, "ইহলোকে মনুষ্যের উপকার করা এবং পরলোকে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া, শিক্ষকদিগের প্রতি ইহাই বিধাতার নির্ব্বন্ধ।"

দ্বিতীয়তঃ—হে শিক্ষকবর্গ! যদি আপনারা নিজ ব্যবসায়ের প্রতি প্রীতি সম্পন্ন হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে জানিবেন যে, শিক্ষাকার্য্যের সুপ্রণালী সমুদায় স্বতঃই আপনাদিগের হৃদ্‌গত হইবে। বালক

বালিকাদিগের সরস হৃদয় ক্ষেত্রে বিদ্যা এবং ধর্ম্মের বীজ বপন করায়—ও সেই বীজ সকল ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পরিবর্দ্ধিত, পুষ্পিত এবং ফলিত হইতেছে দর্শন করায় যে সাতিশয় আমোদ জন্মে, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া আপনারা যে কত পরিশ্রম, কত সহিষ্ণুতা স্বীকার করিবেন তাহা এক্ষণে কি বলিব? যাঁহারা আপনাদিগের মনোনীত কর্ম্মে অর্থ ব্যয় করেন, শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেন, নিজ নিজ পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিয়া ফেলেন, তাঁহারাই কর্ম্ম করিবার সমুদায় সুখ অনুভব করিতে পারেন। শিক্ষকতা কার্য্যের প্রতি সমধিক অনুরাগ থাকিলে কি প্রকারে ছাত্রবর্গকে সুশিক্ষা-সম্পন্ন করিবেন, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইবে—তাহাদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পাছে কোন কুসংস্কার সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া আপনারা স্ব স্ব চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা পাইবেন—যদি কোন ভ্রান্তি শিক্ষা বশতঃ তাহাদিগের কদাপি কোন অমঙ্গল ঘটে, এই জন্য আপনাপন ভ্রম সংশোধনের নিমিত্ত যত্ন করিবেন—শিশুগণের প্রণয়ভাজন না হইলে তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা সম্পন্ন করা যায় না, ইহা জানিয়া আপনাদিগের আমোদ প্রমোদও তাদৃশ বিশুদ্ধ করিবেন—এইরূপে স্বীয় কার্য্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলেই আপনাদিগের মন বিশদ, বুদ্ধি পরিষ্কৃত, বিদ্যা প্রমাদশূন্য, আমোদ অনিন্দ্রিয়পর হইবে। এই সকল গুণ উপস্থিত হইলে সুখেরই বা অভাব কি?

তৃতীয়তঃ—যে সদাশয় অধ্যাপকগণ স্বীয় ব্যবসায়ের প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রীতিসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে যদিও অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি এতদ্দেশের প্রচলিত শিক্ষা প্রথা বিবেচনা করিলে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। অস্মদ্দেশে গ্রন্থ অভ্যাস করার নামই বিদ্যা হইয়াছে। অতএব যে সকল অধ্যাপক স্বীয় কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারাই ঐ ভ্রম প্রযুক্ত সাধারণ শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বিশিষ্ট মনোযোগী হইয়া শিশুগণকে অতিরিক্ত গ্রন্থ অভ্যাস করাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু বস্তুতঃ গ্রন্থ অভ্যাস করার নামই বিদ্যা শিক্ষা নহে। পুস্তক পাঠ করাইবার কালে অধ্যাপক মাত্রের স্মরণ করা উচিত যে, গ্রন্থকার সকল যে প্রকার প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, আমাদিগের ছাত্র-

বর্গের মধ্যেও অনেক সেই রূপ হইলে হইতে পারেন। অতএব গ্রন্থকারদিগের কৃত গ্রন্থ সকল শিশুদিগের কণ্ঠস্থ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা যাহাতে উহাদিগের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয়, এমত যত্ন করাই বিধেয়। গ্রন্থ সকলের নিন্দা করা এই কথার তাৎপর্য্য নহে। যেমন ইন্ধন সংযোগ অগ্নি প্রজ্বালনের এবং বারি সেচন উদ্ভিদ্ সম্বর্দ্ধনের, তেমনি পুস্তক পাঠও বুদ্ধি বিকাশের এক অসাধারণ উপায়। কিন্তু যেমন অতিরিক্ত কাষ্ঠাদি সংযোগে অগ্নিকণা প্রজ্বলিত না হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, এবং অজস্র অম্বুপাতে বীজ সকল অঙ্কুরিত না হইয়া একেবারেই পচিয়া যায়, সেইরূপ অপরিমিত গ্রন্থ অভ্যাসে শিশুদিগের কোমল বুদ্ধি খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করায় সর্ব্বদা সাবধান হইতে হয়, যেন শিক্ষার দোষে তাহাদিগের প্রাকৃতিক বুদ্ধির কোন দোষ না জন্মে। তাহারা প্রত্যহ যাহা যাহা পাঠ করে, তাহা যেন উত্তমরূপে বুঝে এবং আপনাদিগের ক্রীড়া-কলাপের সহিত মিলাইতে পারে। তাহা হইলেই দিন দিন তাহাদের বুদ্ধির বল বৃদ্ধি হইবে, ধারণাশক্তি অধিক হইবে এবং পুস্তক পাঠের প্রতিও বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে। তখন শিক্ষকেরা অনায়াসে তাহাদিগকে অনেক পুস্তক পাঠ করাইতে পারিবেন। ক্ষুধার সময়ে আহার করিলে যেমন কোন ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত শরীরের উপকার দর্শে, তেমনি বিদ্যার্থক্ষুধা উপস্থিত হইলে যত পুস্তক পাঠ করাইবেন ততই মানসিক বল বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কিন্তু যতদিন সেইটি না হয়, তত দিন অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত।

পুস্তক পাঠ করাইবার উপলক্ষে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য এই যে, পুস্তকগুলিই কেবল সমুদায় বিদ্যার আধার নহে। অনেকে পুস্তক না পড়িয়াও কৃতকর্ম্মা এবং বিচক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মনুষ্য বিরচিত গ্রন্থ অপেক্ষা পরমেশ্বর প্রণীত এই জগন্মণ্ডল অতি উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ। যাঁহারা কেবল কাল্পনিক পুস্তক সকল পাঠেই অহোরাত্র নিমগ্ন থাকেন এবং শৈশবে ঐ সকল পুস্তক পাঠের উপযোগী বর্ণমালাদি শিক্ষা করেন, কিন্তু সর্ব্ববিদ্যার আধার এই জগৎরূপ গ্রন্থ যে বর্ণমালায় এবং যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষা করেন না, তাঁহারা কি দুর্ভাগ্য! তাঁহারা কেবল পুস্তকের

ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যতক্ষণ পুস্তক পাঠ করেন, তত-ক্ষণই শিক্ষা করিতে পারেন। সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে যখন তাঁহাদিগকে পুস্তক পরিত্যাগ করিতে হয়, তখনই তাঁহাদিগের শিক্ষারও বিরাম পড়ে। কিন্তু যিনি কেবল পুস্তক পাঠ করিতে না শিখিয়া এই সৃষ্টির বিবিধ ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার উপায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যে কর্ম্ম কেন করুন না সকলই তাঁহার শিক্ষার সহকারী হয়।

চতুর্থতঃ—বিদ্যার্থিবর্গের অন্তঃকরণে এইরূপ প্রখর বিদ্যাভিলাষ উদ্রিক্ত করিতে পারিলেই শিক্ষক কৃতকার্য্য হইলেন। তাহার পর শিশুগণ স্বয়ং বিদ্যাধ্যয়নে প্রযত্নবান হইবে। তাহাদের আর অন্য আমোদে উৎসুকতা থাকিবে না। কিন্তু প্রথমে যে প্রকারে অত্যল্প কালের মধ্যে বালকদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী হয়, বুদ্ধি-শক্তি বিকশিত হয়, এবং কার্য্যোপযোগী বিষয়জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমত যত্ন করা উচিত। কারণ বঙ্গীয় বিদ্যালয় সকলে যাঁহারা সন্তানগণকে বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের অনেকেরই এমন ক্ষমতা নাই যে, তনুজগণকে বহু বৎসর পাঠশালায় রাখেন। দেহযাত্রা নির্ব্বাহের সাহায্যার্থ অতি শীঘ্রই তাহাদিগকে বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত করিতে হইবে। অতএব অধ্যাপকবর্গ! তোমরা স্বয়ং ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র হও বা কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাক, যদি পাঠাবস্থার পর বিষয়জ্ঞানের বৃদ্ধি না করিয়া থাক, তবে এক্ষণে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছ, সর্ব্বতোভাবে তাহার যোগ্য হও নাই। যদি পূর্ব্বে ইংরেজী পড়িয়া থাক, তবে কোন দেশে কোন রাজা ছিলেন, কে কি নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা প্রজাদিগের কি মঙ্গলামঙ্গল হইয়াছিল, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তোমাদিগের অবগতি আছে। তোমরা শুভঙ্করের অনির্ণীত অঙ্ক সকলও অনায়াসে সাধন করিতে পার। তোমরা ক্ষেত্রব্যব-হার কাণ্ডেও কিছু মাত্র ন্যূন নহ। আর অনুমান হয়, পদার্থতত্ত্বেও তোমা-দিগের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে। তোমরা এই সকল প্রধান বিষয় জান বটে, কিন্তু শঙ্কা হয়, 'সপ্তম পঞ্চম' কাহাকে বলে? কয় বুড়িতে কাহন হয়? জরীপের রীতি কি প্রকার? এবং কোন্ সময়ে কোন্ শস্যের চাস হয়? এই সকল অতি সামান্য বিষয় তোমরা কিছু মাত্র জান না। যদি বল, ঐ

সকল জানিবার প্রয়োজন কি, বালকেরা পাঠশালা হইতে নির্গত হইয়া কে কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে তাহার নিশ্চয় নাই—আর আপনাপন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেই তাহারা এমত সকল বিষয়ের মধ্যে, যাহার যাহা জানা আবশ্যক অতি শীঘ্রই অবগত হইতে পারিবে। এই কথাই সত্য বটে। কিন্তু বহু বিষয়জ্ঞতার নানা ফল। প্রথমতঃ ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু জানা থাকিলে তোমরা ছাত্রবর্গের পিতৃ পিতৃব্যাদির বিশিষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ হইবে, ইহাও অল্প লাভ নয়—আর দ্বিতীয়তঃ বালকদিগকে কথা প্রসঙ্গে অনায়াসে অনেক সুশিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে। সামান্য বিষয় সম্বলিত যাহা যাহা শিক্ষা করাইবে তৎসমুদায় অতি শীঘ্রই কার্য্যকারী হইবে। সেই সকল সুসংস্কার যাবজ্জীবন অপগত হইবে না। আর তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে কহি, আপনাদিগের সংস্কৃত শাস্ত্র সকলে জ্ঞান থাকাতেই আপনারা এতদ্দেশীয় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী জনগণের বিশিষ্ট মাননীয় হইতে পারেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আপনারা বিষয়ানভিজ্ঞতা প্রযুক্ত বিষয়ী লোকের নিকট এক্ষণে যথেষ্ট সমাদৃত নহেন। যে বিদ্যার দ্বারা লোকের উপকার না হয়, সেই বিদ্যার নিয়ত উন্নতিও হয় না এবং লোকে তাহার সমাদরও করে না।

পঞ্চমতঃ—বিষয়জ্ঞান বিস্তারের আর এক প্রধান ফল এই যে, তদ্দ্বারা বাহ্যবস্তুর পরীক্ষায় অভিরুচি জন্মে। এতদ্দেশীয় লোক স্বভাবতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ইহাঁরা অনায়াসে পরচিত্তজ্ঞ হইতে পারেন। ইঙ্গরেজ, মুসলমান এবং হিন্দু এই তিন জাতীয় বালকের মধ্যে হিন্দু শিশুদিগকেই দর্শনশাস্ত্রের তথ্য সকল স্বল্পের প্রযত্নে বুঝাইতে পারা যায়। অস্মদ্দেশীয় লোকের নিগীত ন্যায় এবং বেদান্ত দর্শনাদি শাস্ত্রও বুদ্ধি বৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু ইহাঁদিগের প্রকটিত ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, অর্থ শাস্ত্র, ইতিহাস গ্রন্থ কিছুই উত্তম নাই। শিক্ষার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ইহা দুর্ব্বল মনোবৃত্তি সকলকে প্রবল করিবে এবং যাহারা স্বভাবতঃ প্রবল তাহাদিগকে তদবস্থ রাখিবে। অতএব এই দেশীয় লোকের অন্তরিন্দ্রিয় স্বভাবতঃ অধিক অন্তর্ম্মুখ, যাহাতে তাহা কার্য্যোপযোগী ও উভয়-মুখ হয়, শিক্ষা-প্রণালী এমত করা নিতান্ত আবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ—বিষয়জ্ঞান বিস্তার করায় অপর একটি প্রধান ফল দর্শিতে পারে এবং সর্ব্ব প্রকারে যাহাতে সেই ফলটী ফলে, শিক্ষকবর্গের এমন করা কর্ত্তব্য! এতদ্দেশীয় জনগণ অনেকেই চাকুরী-প্রয়াসী হইয়াছেন। বিজাতীয় একাধিপতি নৃপালদিগের সময়ে অতি সামান্য রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও ব্যক্তিবর্গ অন্য সর্ব্ব ব্যবসায়ী লোক অপেক্ষা অধিক প্রভুত্ব-শক্তি সম্পন্ন হইত। সুতরাং রাজকর্ম্ম করাই উন্নতিপরায়ণ মাত্রের একমাত্র প্রার্থনীয় হইয়াছিল। কিন্তু আর কিছু কাল পরে ঐরূপ হইবে না। দেশ মধ্যে সাধারণ্যে বিদ্যা প্রচার হইলে রাজপুরুষদিগের তাদৃশ গৌরবের অনেক হানি এবং অর্থাগমের খর্ব্বতা হইবে। চাকুরী দ্বারা বিশিষ্ট প্রভুত্ব হয় না, অর্থাগমও অধিক হয় না, দেখিলেই লোকে বৃত্ত্যন্তরে নির্ভর করিবে—এবং জন সাধারণ আপনাপন পরিশ্রম দ্বারা স্ব স্ব জীবিকা করিতে পারিলেই স্বাধীন-স্বভাব, উদার-প্রকৃতি এবং কার্য্যে তৎপর মতি হইবে। শিক্ষকবর্গ সেই শুভদিন আপনাদিগের নিকটে আনয়ন করিতে পারেন। বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত বিষয়েই লোকের প্রবৃত্তি হয়, অজ্ঞাত বিষয়ে কখন প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এক্ষণে বিদ্যালয়ের বালক সমূহ শিক্ষকদিগের স্থানে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় না। এই জন্যই তাহারা কোন ব্যাপারে আপনাদিগের প্রবৃত্তি প্রকাশ করিতে পারে না। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়। যদি বালক কালাবধি নানাপ্রকার বিষয় বুঝিতে থাকে, তবে কেবল ভৃতিভুক্ হইবার যত্ন না করিয়া যে সকল কর্ম্মে অর্থ প্রসব হয় তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[পাঠশালার শিক্ষকদিগের প্রতি বিশেষ উপদেশ—শিক্ষা শাস্ত্রের কতিপয় বিশেষ সূত্র।]

পূর্ব্বাধ্যায়ে অস্মদ্দেশীয় শিক্ষকবর্গের কি কি স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম করা উচিত, তাহা সাধারণরূপে কথিত হইল। এক্ষণে শিক্ষা-কার্য্যের কয়েকটী সদুপায় সবিশেষ বর্ণন করা যাইতেছে। কোন গ্রন্থকার বিশেষের মতোল্লেখ করা এ স্থলে উদ্দেশ্য নহে। সকল গ্রন্থকারের মতই দোষ গুণ উভয় মিশ্রিত। বস্তুতঃ শিক্ষা-বিধায়ক শাস্ত্র সকল পাঠের সর্ব্ব প্রধান গুণই এই যে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ হওয়াতে আপন আপন বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া শিক্ষার সুপ্রণালী সমুদায় আবিষ্কৃত হয়।

ফলতঃ শিক্ষক মাত্রেরই কর্ত্তব্য তাঁহারা শিক্ষা-বিধায়ক গ্রন্থ সকল লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করেন। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই কর্ম্ম অতি সহজ হইবে, যেহেতু ঐ ভাষায় তাদৃশ গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য আপনাপন স্থানে এক এক খানি বই বান্ধিয়া রাখেন—শিক্ষা সম্বন্ধে যখন যাহা কিছু মনে উঠিবে, ঐ বহিতে লিখিবেন—এবং যাঁহারা এই বিষয় উত্তম বুঝেন, এমত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ কথা উত্থাপন করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ইংরেজীতে শিক্ষা-বিধায়ক-পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এইরূপ করিলে বিশিষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবেন। সমব্যবসায় ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া এই সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করাও সমূহ ফলোপধায়ক।

পরদিন যে পাঠ পড়াইতে হইবে পূর্ব্বে সেই পাঠ দেখিয়া রাখা উচিত। যদি অন্য পুস্তক হইতে, অথবা কোন সুবিদ্বান্ ব্যক্তির স্থানে তদ্বিষয়ের কিছু অধিক জানিতে পারা যায়, তাহাও জানা কর্ত্তব্য। অতিশয় বোধ-সুলভ পুস্তক পাঠ করাইতে হইলেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলা উচিত। তাহা করিলেই ছাত্রগণ অল্পকালের মধ্যে অধিক বিদ্যা-সম্পন্ন হইতে পারে। বালক কালে শিক্ষকের প্রমুখাৎ গ্রন্থের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে

প্রবৃত্তি হয়, কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করিতে কদাপি তেমন কৌতূহল জন্মে না।

বালকেরা শিক্ষকের প্রমুখাৎ নানা বিষয়ের কথা শুনিতে ভাল বাসে বটে, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত চঞ্চলমতি, অতএব শিক্ষকের কথায় তাহাদিগের মনোযোগ আছে কি না, মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। তজ্জন্য শিক্ষকের কর্ত্তব্য আপনি কথা কহিতে কহিতে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের প্রতি প্রশ্ন করেন। ঐ সকল প্রশ্ন এমন হইলে ভাল হয় যে, তদ্দ্বারা বালকদিগের মনোযোগ আছে কি না, এবং তাহারা কথিত বিষয় বুঝিতেছে কি না, এই দুই একবারে পরীক্ষিত হয়।

কোন ক্ষেত্র এমত আছে যে, তাহাতে দুই তিন বৎসর উপর্য্যুপরি এক প্রকার ফসল উত্তম হয় না। এক বৎসর ধান্য উত্তম হয়, তাহার পর বৎসর সর্ষপ বা কলায় উত্তম হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার তৃতীয় বৎসরে ধান্য উত্তম হইতে পারে। কৃষকেরা এইটী জানে। কিন্তু মনুষ্যের মনেরও যে ঐ প্রকার একটী গুণ আছে, তাহা অনেক শিক্ষক জানেন না। তাঁহারা কোন এক বিষয়ের কথা লইয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া বালকদিগের সমক্ষে কহিতে থাকেন, এবং শিশুরা তচ্ছ্রবণে অমনোযোগী হইলেই ক্রোধাবিষ্ট হয়েন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, এক কথা এক শ বার শুনিতে শিশুদিগেরও বিরক্তি জন্মে। বস্তুতঃ কোন শাস্ত্র-বিশেষ সম্বন্ধীয় কথায় কেবল বিশেষ বিশেষ কতিপয় মনোবৃত্তির চালনা হয়, সুতরাং সেই বৃত্তিগুলি শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যদি সেই সময়ে অন্য কথার উত্থাপন দ্বারা অন্য মনোবৃত্তির উদ্রেক করা যায়, তাহা হইলেই ক্লান্তিবোধ হয় না। যেমন মধুমক্ষিকাগণ একবারে একটী পুষ্পের সমুদায় মধুশোষণ করিয়া লয় না, কখন এফুলে কখন ও ফুলে বসিয়া মধুপান করে; সুকুমার মতি শিশুগণ ও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিবিধ বিদ্যার রসাস্বাদন করিতে চায়। অতি বৃহৎকায় মৎসেরাই অগাধ জলে নিবাস করে; সফরী অগভীর অম্বুরপরি আনন্দ সহকারে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়।

সকল বালকের বুদ্ধি সমান নয়। সকলের স্মৃতিশক্তিও এক প্রকার নয়। এই জন্য শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য, এক অভিপ্রায় নানা প্রকারে ব্যক্ত

করিতে শিখেন। তাহা না করিলে এই এক দোষ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রেরা সকলেই এক প্রকারে আপনাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করে, ভিন্ন ভিন্নরূপে বাক্য রচনা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু পূর্ব্বেই কহিয়াছি, শিশুদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহাদিগের প্রাকৃতিক বুদ্ধি বিকল বা খর্ব্ব না হয়। অতএব নানা প্রকারে নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করা সুশিক্ষকের একটী প্রধান লক্ষণ।

বালকদিগকে কোন প্রশ্ন করিলে তাহারা যেন কেবল না হাঁ দিয়াই উত্তর শেষ না করে। তাহারা যে কোন উত্তর করিবে, তাহা কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া বিশিষ্ট একটী বা তদধিক সম্পূর্ণ বাক্য হওয়া আবশ্যক। যাহারা সর্ব্বদা না হাঁ তেই উত্তর সমাপন করে, তাহারা কখন বাক্‌পটুতা প্রাপ্ত হয় না। সহস্র বিদ্যা থাকিলেও তাহারা কখন আপনাদিগের মনোগত ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারে না।

বালকেরা কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে ঠেকিলে শিক্ষক তৎশ্রেণীস্থ অপর বালক গুলিকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং যে কেহ তাহার সদুত্তর করিতে পারে, তাহাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। এই রীতি মন্দ নহে। কিন্তু শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত করিয়াই নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। যে প্রশ্নে বালকের ভ্রম হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার এমন করিয়া জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ঐ ভ্রম আপনা হইতেই দূর হয়। অর্থাৎ ঐ প্রশ্নে যে বিষয় লক্ষিত, তৎসংশ্লিষ্ট আর শত শত বিষয় আছে। এমত কৌশল করিয়া সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হয়, যাহাতে বালক আপনার ভ্রম আপনি দেখিতে পায়। এই রীতি অবলম্বন না করিলে শিশুদিগের স্মৃতিশক্তি-মাত্রের প্রাখর্য্য জন্মিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি উত্তম হয় না।

বালকেরা কথা কহিতে কহিতে কোন অশুদ্ধ প্রয়োগ করিলে তাহা অশুদ্ধ হইয়াছে, সর্ব্বদা এমত প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষক আপনি শুদ্ধ করিয়া সেই প্রয়োগ করিলেই সম্পূর্ণ ফল দর্শে। মনুষ্য মাত্রেরই অনুকরণবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী, উপদেশ গ্রহণেচ্ছা তাদৃশ প্রবল নয়।

পেষ্টালোজাই নামক কোন সুবিখ্যাত শিক্ষা-শাস্ত্রকার কহেন, বালক

সকলকে কৌশল ক্রমে বিদ্যার্থী করিবার যত্ন করা বিধেয়। বিদ্যাভ্যাস করাইবার নিমিত্ত ভয় প্রদর্শনাদি রূক্ষ উপায় অবলম্বন করা বিহিত নহে। রিখ্‌টর নামক অপর কোন মহামহোপাধ্যায় কহিয়াছেন যে, শিশুদিগের মনেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ জন্মাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। অতএব সর্ব্বদা ছলে কলে কৌশলে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা করা বিহিত নহে। এই পাঠাভ্যাসটী তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব তোমাকে করিতে হইবে, এইরূপ অনুজ্ঞা দ্বারা বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করা সুযুক্তি-সিদ্ধ। অনুমান হয়, ইহাঁদিগের প্রদর্শিত উভয় পথের কোনটিই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নহে। পাঠের প্রথমাবস্থায় পেষ্টালোজাই মহাশয়ের রীতি অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক—ক্রমশঃ রিখ্‌টর মহোদয়ের নিয়মানুযায়ী হইতে পারা যায়। কিন্তু শিক্ষক, শিষ্যবর্গের সম্পূর্ণ প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাস-ভাজন না হইলে এই উভয় উপায়ের কিছুই কোন কার্য্যকারী হয় না।

অপরন্তু ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, সঙ্গীত যেমন আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতিকর, আলোক দর্শনেন্দ্রিয়ের আনন্দকর, পরিমিতাহার সমুদায় শরীরে তৃপ্তিজনক, তেমনি জ্ঞানোপার্জ্জন এবং জ্ঞানালোচনাও অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। অতএব যে স্থলে দেখা যায় কোন বালক পাঠাভ্যাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তথায় তাহার দুষ্টতা বিবেচনা না করিয়া তাদৃশ অনৈসর্গিক প্রবৃত্তির কারণান্তর অনুসন্ধান করা বিধেয়। সেই কারণানুসন্ধান করিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, শিক্ষক সেই বালকের প্রকৃতি যথার্থ অনুভব করিতে পারেন নাই, কিম্বা তাঁহাকে অধিক কঠিন পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, অথবা অন্য কোনরূপে শিক্ষকের প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছিল; সেই প্রমাদ নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার বুঝিয়া চলিতে পারিলেই শিশু অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ-পুরঃসর কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

বালকদিগকে কোন কিছু শিক্ষা করাইয়া, সেই বিষয়টী জানিবার প্রয়োজন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ বুঝাইয়া দিলে পাঠ গ্রহণে সমধিক আগ্রহ হয় এবং নিষ্প্রয়োজনীয় কর্ম্মে সময়াতিপাত করা অনুচিত বোধ হইতে থাকে। যাহাতে আপনার বা অন্যের উপকার দর্শে, এমত

সকল বিষয়েতেই কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, মনুষ্যমাত্রেরই বিশিষ্ট মনোযোগ হইয়া থাকে।

কোন বৃদ্ধ, মৃত্যুকালে আপনার অমিতব্যয়ী সন্তানকে কহিয়াছিলেন "বাপুরে! প্রত্যহ ঘর খরচের খাতা খানি দেখিও"। কথিত আছে, তাঁহার সন্তান নিয়ত পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া অল্পকালেই অতি সুমিতব্যয়ী হইয়াছিল। অর্থ ব্যয়ের খাতা অনেকেই দেখে। কিন্তু যাহা হইতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ উৎপন্ন হয়, মনুষ্যের এমত অমূল্য জীবন যে, কি প্রকারে ব্যয়িত হয়, তাহার খাতা কেহই রাখে না। অতএব বাল্যাবধি সময়ের মিতব্যয়িতার শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য পৃষ্ঠান্তরে 'আত্মপরীক্ষা' নামক একখানি দৈনন্দিন পুস্তকের আদর্শ প্রস্তুত হইল। যদি ভাল বোধ হয়, শিক্ষকেরা বালকদিগকে ঐরূপ এক একখানি পুস্তক প্রদান করিবেন, এবং তাহাতে ঐ আদর্শের অনুরূপ লিখাইবেন।

প্রথমেই এইরূপ 'আত্মপরীক্ষা' পুস্তক না দিয়া ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া দেওয়া ভাল। অর্থাৎ একবারেই শারীরিক ও মানসিক সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনের প্রতি শিশুদিগের মনোযোগ হওয়া সম্ভব নহে। অতএব প্রথমে কোন একটী বা দুইটী নিয়ম কতবার প্রতিপালিত বা লঙ্ঘিত হইয়াছে, ইহাই লিখান সৎপরামর্শ। ক্রমে ক্রমে নিয়মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এবং তাহা হইলেই সমুদায় নিয়ম সুচারুরূপে হৃদ্গত হইয়া আসিবে। একেবারে অনেক ব্যবস্থা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা বিফল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হয়।

ইহাতে কেবল সময়ের সদ্ব্যয় করিতে শিক্ষা হইবে এমত নহে। শৈশবাবধি নিজ নিজ অন্তঃকরণ-বৃত্তি পরীক্ষা করাও অভ্যস্ত হইয়া আসিবে। যে সকল বালক লিখিতে শিখে নাই, তাহাদিগকে উক্ত পুস্তক দেওয়া নিষ্ফল। শিক্ষক আপনি ঐরূপ একখানি পুস্তক রাখেন, ইহা জানিতে পারিলেই তাহাদিগের সমগ্র ফল দর্শিবে। সেনেকা লাক্ এবং ফ্রাঙ্কলিন্ ইহাঁরা সকলেই একমত হইয়া এই প্রকার বহি প্রস্তুত করিয়া রাখিবার বিধি দিয়াছেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত মহানুভাব স্বয়ং কৃতকর্ম্মা হইয়া ইহার

গুণ বুঝিয়াছিলেন। বিলাতীয় সাময়িক শিক্ষা-পত্রিকাতেও বিদ্যার্থী বালকদিগকে ঐ রীতি ক্রমে শিক্ষা প্রদান করিবার উপদেশ আছে। অতএব অনুমান হয়, বিবেচক ও সুধীর স্বভাব শিক্ষক এই উপায় দ্বারা অপরিমিত উপকার দেখাইতে পারেন। কিন্তু ইহা আসুরিক ভেষজ নহে যে, একবার ব্যবহার করিলেই উপকার বোধ হইবে, ইহা সেব্য ঔষধের ন্যায় নিত্য ব্যবহার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত দৈনন্দিন পুস্তকোপলক্ষে আরও বক্তব্য এই যে, বালকেরা অনেকেই স্বভাবতঃ পরিহাসপ্রিয় হয়, অতএব শিক্ষক ঐ বহি লইয়া যেমন গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিবেন, শিশুগণ প্রথমতঃ সেরূপ না করিলে না করিতে পারে। কিন্তু এই বৈষম্য দেখিয়াই উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করা অনুচিত। প্রতি সপ্তাহে তাহাদিগের পুস্তকগুলি লইয়া এক একবার সংগোপনে পরীক্ষা করিলে ভাল হয়। যদি কেহ কোন দিবস কিছু না লিখিয়া থাকে, তবে যত স্মরণ হয়, তদ্দিবসের কর্ম্ম সেইক্ষণে তাহাকে লিখান উচিত। আর কেহ কোন বিষয় যদি মিথ্যা লিখিয়াছে বোধ হয়, তবে অতি সাবধানে সংগোপনে তাহার স্থানে ঐ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক।

বালকদিগের কোন দোষ জানিতে হইলে বা তজ্জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিতে কিম্বা ভর্ৎসনা করিতে হইলে প্রায় সর্ব্বদাই তৎকার্য্য সংগোপনে করা বিধেয়। লজ্জাভয় অনেক দুষ্কর্ম্মের নিবারক, অতএব যাহাতে সেই ভয়টী না ভাঙ্গে, এমন করিয়া চলা আবশ্যক। অপিচ, যদি বালক কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপনার দৈনন্দিন পুস্তকে লিখিয়া থাকে, শিক্ষক যেন সেই দুষ্কর্ম্মের উপলক্ষে তাহাকে কোন তিরস্কার না করেন, প্রত্যুত তজ্জন্য বালকের যে অনুতাপ হইয়াছে, তাহা মিষ্টবাক্য দ্বারা উপশান্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

দুইটী বালকের দৈনন্দিন বহি লইয়া পরস্পরের তুলনা করা অতি অকর্ত্তব্য। একজনেরই দুই বহি লইয়া তুলনা করিলে হানি নাই—বুঝিয়া করিতে পারিলে বরং তাহাতে উপকার দর্শে।

কোন কোন শিক্ষক ছাত্রবর্গকে কোন বিষয় একবারের অধিক বুঝাইয়া

দিতে হইলেই বিরক্ত হন। তাঁহারা স্মরণ করুন যে, ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে অন্ধ, বধির, মূক প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় সকলেরও অধ্যাপনার্থ অনেকানেক পাঠশালা আছে এবং ছাত্রবর্গ সেই সকল পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কেমন সহিষ্ণু! তাঁহাদিগের ছাত্রবর্গকে কোন সামান্য বিষয় বুঝাইবার নিমিত্তও কত যত্ন এবং কত পরিশ্রম করিতে হয়, আমাদিগের কাহাকেও তাহার সহস্রাংশের একাংশ করিতে হয় না। তথাপি আমরা বিরক্ত হই। আমাদিগের সহিষ্ণুতাকে ধিক্! যখন কোন কথা দুইবার চারিবার বলিলেও বালকেরা বুঝিতে না পারে, তখন আপনাদিগেরই ব্যাখ্যার দোষ হইতেছে, ইহাই বিবেচনা করিয়া ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত! বালকদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার বা উপেক্ষা করা বিধেয় নহে। আর যদি তাহারা নির্ব্বোধই হয়, তথাপি তাহাদিগের বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি করিবার জন্যই তাহারা আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, অতএব বিরক্ত হইলে অবশ্য কর্ত্তব্যেরই অন্যথাভাব হয়।

কখন কখন বিদ্যালয়ে বালকদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন অধ্যাপকের নিকট অভিযোগ হইয়া থাকে। অধ্যাপকের কর্ত্তব্য বিশিষ্ট মনঃসংযোগপূর্ব্বক ঐ সকল বিবাদের মীমাংসা করেন। 'ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া' বলিয়া তাহাতে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কোন শিক্ষাশাস্ত্রের মতে বাদী প্রতিবাদীর সমকক্ষ দল হইতে 'জুরি' নির্দ্ধারণ করিয়া ঐ সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করা বিধেয়। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিয়াছি ঐ সকল বালক-জুরি, ধর্ম্মাধিকরণ স্থলের বয়োবৃদ্ধ জুরিদিগের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী নহে! অতএব অনুমান হয়, বালকদিগের সাক্ষাতে শিক্ষক আপনি বিচার করিবেন, ইহাই সৎপরামর্শ। জুরি নির্দ্ধারণের যে ফল, তাহা বালক সমূহের সাক্ষাৎকারে বিচার করিলেই সম্পূর্ণ ফলিবে।

শিক্ষকবর্গকে যেমন 'জজের' কর্ম্ম করিতে হয়, তেমনি কখন কখন তাঁহাদিগের প্রতি 'মাজিষ্ট্রেটী' ভারও পড়ে। অর্থাৎ সময়ে সময়ে অপরাধী বালকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিতে হয়। ঐ গুলি বড় কঠিন সময়।

বালকদিগের প্রতি কখন দৈহিক দণ্ডের আবশ্যকতা হয় কি না, ইহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ যে যে প্রকার দণ্ডের রীতি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহার কোনটীই সম্পূর্ণ দোষ শূন্য বোধ হয় নাই। পরন্তু প্রায় সকল শিক্ষা-শাস্ত্রকারই দৈহিক দণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন—আর ইহাও দেখিতেছি যে, যে বালককে একজন অধ্যাপক অতি হেয় বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বালকই আবার অন্য অধ্যাপকের নিকট সুশিক্ষা সম্পন্ন ও সুশীল হইয়াছে। অতএব যেখানে দৈহিক দণ্ড না করিলে হয় না, এমন বোধ হইবে, তথায় শিক্ষকের কর্ত্তব্য আপনার পরাভব স্বীকার করিয়া বালককে অন্য পাঠশালায় প্রেরণ করিবার পরামর্শ দেন।

যদি অনেকগুলি শিশু এক সময়ে এক প্রকার দোষে দোষী হইয়া থাকে, তবে শিক্ষক অতি সাবধান হইয়া তাহাদিগের প্রতি দণ্ডপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবেন। অনেকে যাহা করে সেই কর্ম্ম করিতে কাহারও অধিক লজ্জা হয় না। অতএব অপরাধী বালকেরা যেন আপনাদিগের দল অতি বৃহৎ এমনটী কোন প্রকারেই জানিতে না পারে। কোন বিদ্যালয়ে একটী শ্রেণীর বালকগুলি অনেকেই একেবারে গোলমাল করিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সকলকে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। বালকেরা ঐ দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণমাত্র যে প্রকার আনন্দযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল এবং দাঁড়াইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে ঐ দণ্ড-বিধান হওয়াতে তাহারা যে আপনাদিগকে কিছুমাত্র অবমানিত বোধ করে নাই, ইহার কোন সন্দেহ রহিল না। বরং ঐ শ্রেণীর মধ্যে যে কয়েকটী শিশু গোলমাল করে নাই, অতএব দাঁড়াইতেও পায় নাই, তাহারাই কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিল। এবম্প্রকার দণ্ডের কিছুমাত্র গুণ নাই, প্রত্যুত অনেক দোষই আছে।

শ্রেণীর মধ্যে যে বালকগুলি সুশীল ও মনোযোগী, শিক্ষক স্বভাবতই তাহাদিগের প্রতি অধিক স্নেহবান্ হন। ঐ স্নেহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ভুক্তভোগী তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, উহা গোপন করাও অত্যন্ত কঠিন। যদি কথায় না হয়, তথাপি ঐ স্নেহ কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এমত স্থলে শিক্ষকবর্গের স্মরণ করা কর্ত্তব্য

য়, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পরিশ্রম-শালী বালকগুলি আপনা হইতেই অনেক শিখিতে পারে। অতএব তাহাদিগের প্রতি অধিক মনোযোগী না হইয়া যাহাতে অল্পবুদ্ধি-ভীরু-স্বভাব গুলিকে সুশিক্ষিত করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। সর্ব্বদা এই সংকল্প মনোমধ্যে জাগরূক থাকিলে, শিক্ষকবর্গ কেমন অনুক্ষণ সুবোধ বালকদিগের প্রতিই মনোযোগী হইতেন, আর সেইরূপ হইবেন না। যাহাদিগকে নির্ব্বোধ বা দুর্ব্বোধ ভাবিতেন, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের মধ্যেও অনেক গুণ দেখিতে পাইবেন। অপিচ ইহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি সকলই সম্পূর্ণরূপে স্বপ্রকাশিত বোধ হওয়াতে বিশিষ্ট আনন্দানুভব হইবে। সুতরাং এমন শিক্ষক কখন পক্ষপাতী হইতে পারিবেন না।

বালকেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিলে প্রায় তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বহুক্ষণ অধোবদন হইয়া থাকে। দুই একটী অত্যন্ত মৃদুস্বভাব প্রযুক্ত এইরূপ হয়; কিন্তু অধিকাংশেরই ইহা অন্যমনস্কতার চিহ্ন। বিশেষতঃ অধোবদন হওয়া নির্দ্দোষ বালকের স্বভাব সিদ্ধ নহে। এই দোষ সংশোধনার্থ শিক্ষকের কর্ত্তব্য কেবল একটী বা দুইটী বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথোপকথন না করেন। অনেক উত্তম অধ্যাপকেরও এই বিষয়ে বিশেষ অবধান নাই। তজ্জন্য তাঁহাদিগের শিক্ষিত কতিপয় ছাত্র অতি সুব্যুৎপন্ন হয়, অপর গুলির কিছুই হয় না। যদি শিক্ষকেরা সর্ব্বদা আসনে উপবিষ্ট না থাকিয়া বালক শ্রেণীর মধ্যে বেড়িয়া বেড়ান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের এই দোষ সংশোধন হইতে পারে। এইরূপ চঙ্‌ক্রমণের আরও অনেক গুণ আছে।

অন্যমনস্কতা দোষ নিবারণের জন্য এবং ভীরু-স্বভাব ও দুর্ব্বল শিশুগুলিকে সাহসিক এবং সবল বালকগণের সহিত একত্র শিক্ষা-সম্পন্ন করিবার জন্য জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে আর একটী উপায়াবধারণ হইয়াছে। অস্মদ্দেশেও সেই রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রথা সন্দর্শনে তাহা এক্ষণে অনেক স্থলে অনাদৃত হইতেছে। পুনর্ব্বার সেই প্রথা অবলম্বন করা বিধেয়। উহাকে 'যুগপৎ পাঠধারা' বলা যাইতে পারে। উহার অনুযায়ী হইয়া সকল বালকেই একেবারে পাঠ বলে, একেবারে প্রশ্নের উত্তর করে, একেবারেই আপনাদিগের অঙ্ক বা লিপি প্রদর্শন করে—কো

অগ্রে কেহ পশ্চাতে করে না। স্থানান্তরে যে কয়েকটী পাঠ গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই ধারার অনুক্রমেই লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন শিক্ষক এমত উগ্রস্বভাব বা স্বকার্য্যতৎপর যে, তাঁহারা নির্ব্বোধ বা অলস ছাত্রবর্গের প্রতি একেবারে দ্বেষভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠেন, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই কটু বাক্য প্রয়োগ করেন, এবং পাঠকালে তাহাদিগের ভ্রম হইলে কখন কখন ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন। এই গুলি অত্যন্ত দোষ। শিক্ষকের এমন দান্ত স্বভাব হওয়া আবশ্যক যে, কদাপি ক্রোধ প্রকাশ না হয়। মধুর, অনুচ্চ, প্রীতি জনক ভাষা ব্যবহার করা আচার্য্য দিগের প্রতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বেই কহিয়াছি বালকদিগের সহিত শিক্ষকের প্রণয় করা কর্ত্তব্য। এই কথা সকলেরই অনুমত-বটে। কিন্তু ইহা প্রতিপালনের উপযুক্ত কর্ম্ম করায় প্রথমতঃ অনেকের প্রবৃত্তি হয় না। পিতা পুত্রের যেরূপ ব্যবহার গুরু শিষ্যেরও সেইরূপ হওয়া উচিত, কিন্তু এখনও এই দেশে পিতা পুত্রের মধ্যে পরস্পরের প্রণয়সাধন চেষ্টা অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাছে পুত্রের নিকট কিছু সম্ভ্রমের ক্রটী হয়, এই ভয়ে অনেকেই স্ব স্ব সন্তানগণের সহিত অধিক মিলিত হইতে চাহেন না। আমার কাছে বসিয়া পড়া শুনা করুক এবং চক্ষুর বাহির হইয়া খেলা দেলা যাহা করিতে হয় করুক, অধিকাংশ লোকেই সন্তান এবং শিষ্যবর্গের পক্ষে ইহা পথ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু এইরূপ বিবেচনা করেন বলিয়াই বালকদিগের ক্রীড়া তাহাদিগের পাঠের প্রতিবন্ধক হয়, এবং শৈশবাবস্থাতেই এত কুসংস্কার জন্মে। যদি শিক্ষকেরা বালকদিগের ক্রীড়ার সংসর্গী হন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ কিছুই হইতে পারে না। ক্রীড়াও নানা সুশিক্ষার সহকারিণী হয়, এবং বাল্যাবধি দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা জন্মে।

কথায় বলে 'ছেলের সঙ্গে থেকে ছেলে হইতে হয়'। এই কথা অতি যথার্থ, এবং যে শিক্ষক সর্ব্বতোভাবে আপনি 'ছেলে মানুষ' হইতে পারেন, তিনিই স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম হন। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, বড় বড় পণ্ডিতেরা শিশুদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে পারেন না। তাঁহারা বড় কথাকে ছোট করিয়া বলিতে পারেন না।

বরং ছোট কথা তাঁহাদিগের মুখে বড় হইয়া উঠে। কিন্তু বালকদিগকে কোন বিষয় শিক্ষা করাইতে হইলে আপনাকে সেই বালকের স্থানীয় হইয়া দেখিতে হয় যে, ইহার ন্যায় অল্প বুদ্ধিকে কি প্রকারে তাদৃশ বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? এইরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ কঠিন বিষয়টি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অল্পে অল্পে শিশুর হৃদ্গত করিয়া দিতে হয়। ইহাই সুশিক্ষকের অতি বিচিত্র শক্তি। এই শক্তিটি স্বাভাবিক, ইহা শিক্ষা এবং যত্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু যাহার নাই তাহার মনোমধ্যে কদাপি নূতন সৃষ্ট হইতে পারে না।

ক্রীড়া কালে বা অন্য সময়ে বালকদিগের কোন দোষ দেখিলে তাহার নিষেধ করা তৎক্ষণাৎ বা সময়ান্তরে কর্ত্তব্য? কতক দোষ এমত যে, তৎক্ষণাৎ নিষেধ না করিলে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অধিকাংশই কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে নিষেধ করিলে ভাল হয়।

শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য আপনারা ঠিক্ সময়ে আইসেন এবং ঠিক্ সময়ে যান। কদাচিৎ সময়ের ব্যত্যয় না হয়। বালকদিগের হাজিরা লইবার ও অন্যান্য প্রাত্যহিক কর্ম্ম করিবারও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত।

বিদ্যালয়ের বহিগুলি ও অন্যান্য উপকরণ সমস্ত যেন কিছুই বিশৃঙ্খল না হইয়া থাকে। ফলতঃ শিক্ষকেরা ছাত্রবর্গকে যে যে গুণ সম্পন্ন করিতে চাহেন, আপনারা সেই সমুদায় গুণ সংযুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন।

সকল কর্ম্মই নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সেই সকল নিয়মের যত অল্প আড়ম্বর হয় এবং অল্প সংখ্যা হয় ততই উত্তম। নিয়মগুলি কখন লঙ্ঘনীয় হয় না, এই সংস্কার জন্মাইবার চেষ্টা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়। তর্জ্জন গর্জ্জন করা বিশিষ্ট ফলোপধায়ক নহে, বরং কোন নিয়মের লঙ্ঘন হইলে সেই নিয়মটী প্রতিপালন করাইয়া কার্য্য করান উচিত। সর্ব্বদা এইরূপ করিলে কোন বালক আর স্বেচ্ছাতঃ নিয়ম লঙ্ঘন করে না, এবং যদি কেহ ভ্রম প্রযুক্ত করে, তাহারও নিয়ম পালন করা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া যায়।

যাহারা 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল' সকলের শিক্ষা প্রথা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা স্ব স্ব শ্রেণীভুক্ত ছাত্রগণকে

একটি একটি পাঠ দেখাইয়া দেন, এবং পরদিবস ছাত্রেরা পাঠ অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে কি না, প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করেন। এই রীতি অবলম্বন করাতেই উক্ত পাঠশালা সকলে অধিক কাল না পড়িলে প্রায় কিছুই শিক্ষা হয় না। অতএব বঙ্গীয় বিদ্যালয় সকলের শিক্ষকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা বালকগণকে তাহাদিগের পাঠ বলিয়া দেন এবং পরদিবস সেই পাঠ অভ্যাস হইয়াছে কি না? পুনর্ব্বার পরীক্ষা করেন—অপিচ যাহাদিগের পাঠ অল্প তাহাদিগকে পাঠশালাতেই প্রত্যহ দুই তিনটী পাঠ অভ্যাস করাইতে যত্ন করেন।

পরিশেষে আর্ণল্ড নামক কোন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বীয় ব্যবসায়ে যে যে গুণের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন তাঁহার সেই লিপ্যর্থের অনুবাদ করিতেছি। তিনি কহেন "ধর্ম্মপরায়ণতা, কার্য্য-তৎপরতা, শারীরিক এবং মানসিক বল, বালকের ন্যায় সারল্য, তথা গাম্ভীর্য্য, নম্রতা, বিদ্যা এবং দাক্ষিণ্য, এই সকল গুণ না থাকিলে কোন ব্যক্তি সুশিক্ষক হইতে পারেন না। কিন্তু এই সমুদায় সদ্গুণালঙ্কৃত পুরুষ প্রায় পাওয়া যায় না। এমত লোক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বটে, তথাপি যাঁহারা শিক্ষকের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে, আপনারা এই সমুদায় গুণ-সম্পন্ন হইবার যথা সাধ্য চেষ্টা করেন"।

তৃতীয় অধ্যায়।

[লিখন এবং পঠন শিক্ষার রীতি—তদ্বিষয়ে কাষ্ঠফলকের ব্যবহার—ধ্বনির ধারা।]

বালকেরা পাঠশালায় 'লেখা পড়া' শিখিতে যায়। তাহাদিগকে ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি আর যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া যাউক, সকলই ঐ 'লেখা পড়ার' অঙ্গমাত্র, অথবা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী। অতএব শিশুদিগকে কি প্রকারে উত্তমরূপে পড়িতে এবং লিখিতে শিখাইতে পারা যায়, তাহা কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালায় পড়া এবং লেখা একবারেই শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পাঠশালা সমস্তে এই রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথারই একান্ত বশবর্ত্তী, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ঐ রীতি পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী রীতি যে, প্রথমতঃ কেবল পড়িতে শিক্ষা দেওয়া তাহাই অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা বিবেচনা করুন, ইংরাজীতে দুই প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে। ইংরাজদিগের পুস্তক সমস্ত এক প্রকার অক্ষরে মুদ্রিত হয়, আর তাঁহাদিগের হাতের লেখা অন্য প্রকার। সুতরাং ইংরাজীতে লেখায় এবং পড়ায় যেমন স্বাভাবিক প্রভেদ হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালায় সেরূপ হইবার আবশ্যকতা নাই। অপরন্তু, ইংরাজী লেখায় এবং পড়ায় এইরূপ স্বাভাবিক প্রভেদ থাকিলেও কোন কোন ইংলণ্ডীয় শিক্ষক, স্বজাতীয় বর্ণ মালার শিক্ষা অধিক সহজ হইবে বলিয়া বালকদিগকে ছাপার অক্ষর গুলিও প্রথম হইতে লিখাইয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! ইংরাজেরা আমাদিগের মধ্যে কোন সুরীতি দেখিলে তাহা অবলম্বন করিতে কালবিলম্ব করেন না, কিন্তু আমাদিগের অনুচিকীর্ষা বৃত্তি কেমন বলবতী হইয়াছে, আমরা আপনাদিগের প্রচলিত কোন রীতির গুণাগুণ বিবেচনা না করিয়াই, যাহাতে ইংরাজদিগের কোন গন্ধ আছে, তাহা একেবারে গ্রহণ করিয়া থাকি। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যে, কোমল-মতি শিশুদিগকে একেবারে লেখা পড়া দুই ধরাইলে তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত ভার বোধ হইবে। ইহাঁরা এমন বলিলেও বলিতে পারেন যে একেবারে দুই পায়ে চলা বড় কঠিন ব্যাপার, অতএব প্রথমতঃ একপায়ে চলিতে শিখাই ভাল। বস্তুতঃ যাঁহারা একেবারে লিখিতে এবং পড়িতে শিখা এত বিষম ব্যাপার বোধ করেন, তাঁহারা কখনই বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। নচেৎ, জানিতেন যে অতি শৈশবাবস্থাতেও কার্য্যানুরক্তি এমত প্রবল হয় যে, শিশুরা লিখিবার আদেশ পাইলে যেমত সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তৎকর্ম্মে যেমন মনঃসংযোগ করে, শুদ্ধ বহিখুলিয়া ক, খ, গ, প্রভৃতি অক্ষর গুলির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে কদাপি তেমন সন্তুষ্ট বা মনোযোগী হয় না। লিখিবার সময় যতগুলি ইন্দ্রিয়ের এবং মনোবৃত্তির পরিচালনা হয় কেবল অক্ষরগুলির দিকে

চাহিয়া থাকিতে গেলে কখনই তত হয় না। এই জন্যই শিশুরা লিখিতে যত ভালবাসে প্রথমতঃ পড়িতে তেমন ভালবাসে না। অপরন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লোকে আগে কথা কয় পরে লেখে, অতএব লেখা শিক্ষা শেষেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম। তাঁহারা বিবেচনা করুন যে, লেখার অগ্রে কথা কহা হয় বলিয়া লেখার পূর্ব্বে পাঠ করা হইতে পারে না।

ফলতঃ এই বিষয় উপলক্ষে অধিক বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক। একেবারে লিখন এবং পঠন শিক্ষা দেওয়াতে যে বিশেষ ফল দর্শে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে।

বিদ্যালয়ে এই প্রণালী ক্রমে শিক্ষা দিতে হইলে একখানি বৃহৎ কাষ্ঠ ফলক অত্যন্ত আবশ্যক। উহা পুস্তক অপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয়। শিক্ষক সেই কাষ্ঠ ফলকে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিয়া এক একটী করিয়া প্রথমে দুই তিনটী স্বরবর্ণ এবং তাহার পর দুই তিনটী হলবর্ণ লিখিতে এবং পাঠ করিতে শিখাইবেন। তৎপরে ঐ সকল অক্ষরের যোগে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয় তাহারও কতকগুলি লিখাইয়া পাঠ করাইবেন। এইরূপে সমুদায় বর্ণমালা এবং 'বানান' 'ফলা' শিক্ষিত হইলে, তাহার পর বালকেরা পরস্পর কথোপকথনে যে সকল সরল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা লিখাইতে এবং পাঠ করাইতে হইবে। অনন্তর বালকদিগের হস্তে পুস্তক সমর্পণ করা যাইতে পারে। এইরূপে শিখাইলে লিখন পঠনে বিলক্ষণ আমোদ হইয়া অত্যল্প কালেই সুন্দররূপে অক্ষর পরিচয় হয়।

কিন্তু এই বিষয়ে সম্প্রতি ইউরোপ খণ্ডে আর একটী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাকে 'ধ্বনির-ধারা' বলা যায়। যাঁহারা ঐ প্রথা সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারাও উহার কোন কোন অঙ্গ অতি উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই হেতু মান্যবর মিসনরী বম্‌উইচ্ সাহেব প্রণীত ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া 'ধ্বনির-ধারা' প্রবর্ত্তকদিগের অভিপ্রায় সমস্ত নিম্নে প্রকাশিত করা যাইতেছে।

ধ্বনির-ধারা প্রবর্ত্তকেরা বলেন যে, যে রীতি অবলম্বন দ্বারা ইউরোপীয় শিক্ষকেরা আজন্ম বধিরদিগকেও পুস্তক পাঠ করাইতে শক্ত হন, সেই শিক্ষা-রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বধির

ছাত্রগণকে কোন বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা করাইতে হইলে শিক্ষক মুখভঙ্গী দ্বারা ঐ বর্ণ কি প্রকারে উচ্চারিত হয়, তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া দেখান। তিনি সেই বর্ণের 'নাম' বলেন না, তাহার 'ধ্বনি' কি প্রকারে হয়, তাহাই দেখাইয়া দেন। অর্থাৎ যদি 'অ' বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, তবে 'অকার' বলেন না 'অ' মাত্র বলেন, 'ক' বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা করাইতে হল্ বর্ণের শেষে যে মুখ-সুখার্থ 'অ, উচ্চারিত হয়, তাহারও উচ্চারণ করেন না; 'ক্' কি প্রকারে উচ্চার্য্য হয়, তাহাই প্রদর্শন করেন। অতএব যাঁহারা শিশুদিগকে বর্ণোচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিবেন তাঁহারা যেন জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত, তালু প্রভৃতির কেমন অবস্থান হইলে কোন্ ধ্বনি নির্গত হয় এইটী বিলক্ষণরূপে জানেন। এইরূপে দুইটী তিনটী স্বরবর্ণ এবং তিনটী বা চারিটী হল্ বর্ণের যথার্থ উচ্চারণ শিক্ষা হইলেই শিশুদিগকে অনেক গুলি শব্দ পাঠ করাইতে পারা যাইবে। তাহারা সেই সকল পদের অর্থ বুঝিবে এবং অত্যন্ত আহ্লাদ-পূর্ব্বক পাঠে মনোযোগ দিবে। ইহার আর একটী মহৎ লাভ আছে। সমুদায় বর্ণের 'নাম' মাত্র অগ্রে শিক্ষা করাইয়া পুনর্ব্বার 'বানান' এবং 'ফলা' শিক্ষা করাইতে হইলে পূর্ব্ব শিক্ষিত অনেক কুসংস্কার ভুলাইবার যত্ন করিতে হয়। তাহাতে অনেক সময় এবং অনেক পরিশ্রম ব্যর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাষা-শিক্ষায় তদ্ভাষার বর্ণমালা উত্তম নয় বলিয়া যদিও ঐ প্রকার সময় এবং শ্রম অপব্যয়ের প্রয়োজন হয়, হউক, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালা যেমন পরিপাটীরূপে বিন্যস্ত, ইহার বর্ণ সমস্তের উচ্চারণ যেমন সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্ব স্থানেই একবিধ, ইহাতেও যে যৎকিঞ্চিৎ মনো-যোগ অভাবে শিক্ষক এবং শিশুদিগকে এত ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে হয়, ইহা উচিত নহে।" ধ্বনির ধারা প্রবর্ত্তকদিগের এই সকল কথা কতদূর কার্য্যকালে সফল হয়, তাহা বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়া কেহই এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না। এই প্রণালী যে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবে এমত আশাও অতি বিরল। অতএব এইরূপ পাঠনা প্রণালীর একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যাইবে।—শিক্ষক, বালক শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া একটী বৃহৎ কাষ্ঠ ফলকে অতি বৃহৎ অক্ষরে 'আ' এই স্বরবর্ণটী লিখিয়া কহিবেন এটী 'আ'। বালকেরা তাঁহার অনুবর্ত্তী

হইয়া উচ্চৈস্বরে 'আ' উচ্চারণ করিবে। তাহার পর শিক্ষক ঐ কাষ্ঠ-ফলকে যেখানে 'আ' লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দ্দূরে 'ম' লিখিয়া আপনার অধর এবং ওষ্ঠ ভিতরের দিকে ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া নাসিকা দ্বারা বায়ু নিঃসারণ করত হসন্ত 'ম্'য়ের উচ্চারণ করিবেন। বালকেরাও শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া 'ম' কারের যথার্থ উচ্চারণ করিতে পারিবে। শিক্ষক ঐ দুইটী বর্ণের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করাইয়া পরে 'আ' এবং 'ম্' দুইটী বর্ণই লিখিবেন, কিন্তু একবারও 'ম্' কে 'ম' বলিবেন না। তাহার পর, তিনি 'আ'য়ে হাত দিলেই বালকেরা 'আ' উচ্চারণ করিবে এবং শিক্ষক ঐ আয়ের উচ্চারণ না ফুরাইতে ফুরাইতেই 'ম্'য়ে হাত দিবেন। বালকেরা অমনি 'ম্' উচ্চারণ করিবে। কতিপয় বার এইরূপ করিয়া পরে শিক্ষক কিঞ্চিৎ শীঘ্র শীঘ্র 'আ' হইতে 'ম্'য়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা করিলেই বালকবর্গ ক্রমে 'আম্' উচ্চারণ করিতে পারিবে। এইরূপে আম্, আন্, আর্, আল্, আশ্, আষ্, আস্, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিতে এবং লিখিতে শিখাইয়া অধ্যাপক যখন্ দেখিবেন যে, ঐগুলি সমুদায় সম্পূর্ণরূপে শিশুদিগের হৃদ্গত হইয়াছে, তখন আর একটী 'আ' ঐ কষ্ঠফলে লিখিয়া কহিবেন, এইটী কি? —বালকেরা উত্তর করিবে 'আ'। শিক্ষক বলিবেন এইটী 'আ' বটে কিন্তু ইহার এই পর্য্যন্ত পুঁছিয়া ফেলিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও 'আ'। এই বলিতে বলিতে শিক্ষক 'আ'য়ের 'অ' ভাগ পুঁছিয়া ফেলিবেন। তাহার পর 'ম্'য়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেই বালকেরা পূর্ব্ববৎ অনুনাসিক শব্দ করিতে থাকিবে, এবং শিক্ষক সেই শব্দ শেষ না হইতে হইতেই 'া'য়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন। কতিপয় বার এইরূপ করিয়া পরে কিঞ্চিৎ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেই 'মা' শব্দ উচ্চারিত হইবে। এইরূপে না, লা, রা, শা, ষা, সা, কতকগুলি লিখিতে এবং পড়িতে শিক্ষা হইবে। পূর্ব্বে যে শব্দ গুলি শিক্ষা হইয়াছে এবং পরে যে গুলি হইল এই সমুদায়ে অনেক কথা হইতে পারে। সেই কথা গুলি শিখাইয়া এবং পড়াইয়া ঐ বর্ণ সমস্তের উচ্চারণ এবং লিখন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। প্রথমতঃ এই রীতি জর্মেন ভাষায় প্রচলিত হয়। এক্ষণে ইহা ইউরোপ খণ্ডের প্রায় সকল দেশেই পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রশস্ত বাঙ্গালা বর্ণমালা এই

প্রণালী ক্রমে শিক্ষিত হইবার যেমন উপযুক্ত, কোন ইউরোপীয় বর্ণমালাই ইহার তেমন উপযুক্ত নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

[অঙ্ক-শিক্ষা—গণনকযন্ত্র—অঙ্ক কথন এবং লিখন—নামতা—যোগাবলী—বিয়োগাবলী—পূরণ—হরণ—ত্রৈরাশিক পরিমাণ—সূত্র—ভিন্নরাশি।]

যেমন লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ায় প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, অঙ্ক শিক্ষা প্রদানেও সেইরূপ করা বিধেয়। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত পেষ্টালোজাই মহাশয়ের প্রদর্শিত রীতির (যাহা সকলেই প্রাকৃতিক রীতি বলিয়া স্বীকার করেন) অনুযায়ী হইয়া কি প্রকারে অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করাইতে হয়, তাহার সবিস্তার বর্ণন করা যাইতেছে।

অঙ্কশিক্ষার প্রথমেই সঙ্খ্যা গুলির নাম শিখাইতে হয়। কিন্তু শিক্ষাশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন পদার্থের নাম শিক্ষা করাইবার সময়ে সেই পদার্থকে শিশুদিগের প্রত্যক্ষ গোচর করান কর্ত্তব্য। পরন্তু সঙ্খ্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। উহা কেবল মনে মনে ভাবিয়াই বুঝিতে হয়। এইরূপ বৈষম্য নিবারণের অভিপ্রায়েই আমাদিগের দেশে ১কে—চন্দ্র, ২য়ে পক্ষ—ইত্যাদি প্রচলিত শতিকা পাঠের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাকে উত্তম রীতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ 'পক্ষ' 'নেত্র' 'বেদ' প্রভৃতি পদার্থ গুলি শিশুদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইবার নহে। সুতরাং ঐ সকল শব্দের ব্যবহার করা সুযুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। বরং তৎপরিবর্ত্তে শিশুরা যদি আপনাদিগের হস্তের এক একটী অঙ্গুলি দেখাইয়া এক, দুইটী দেখাইয়া দুই, তিনটী দেখাইয়া তিন, ইত্যাদিক্রমে অন্য অন্য গুলির নাম পাঠ করিতে শিখে, তাহা হইলে, ভাল হয়।

কিন্তু শিক্ষাশাস্ত্রকারেরা এক্ষণে শতিকা পাঠের নিমিত্ত আর একটী বিশেষ উপায় করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করা অধিকতর শ্রেয়স্কর সন্দেহ

নাই। তাঁহারা একটী কাষ্ঠের ফ্রেমের ভিতরে দশটী লৌহের শলাকা পরিহিত করাইয়া এবং তাহার প্রত্যেক শলাকায় দশটী দশটী করিয়া কাষ্ঠময় বর্ত্তুল গ্রথিত করিয়া যে, একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার ব্যবহার দ্বারা শতিকা শিক্ষা অত্যন্ত সহজ এবং শিশুদিগের আনন্দকর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ যন্ত্রকে 'গণনক' যন্ত্র কহা গিয়া থাকে।

বালকশ্রেণীর সমক্ষে ঐ যন্ত্র স্থাপিত করিয়া শিক্ষক একটী কাষ্ঠিকা দ্বারা সর্ব্বোপরিস্থ লৌহ শলাকার প্রথম বর্ত্তুলকে সরাইয়া দিয়া 'এক গুলি' এইরূপ উচ্চারণ করেন, বালকেরা ঐ দিকে দৃষ্টি করিয়া 'এক গুলি' বলে—শিক্ষক আবার একটী বর্ত্তুলকে প্রথমটীর নিকটে সরাইয়া 'দুই গুলি' বলিলে বালকেরাও সেইরূপে বলে এবং এইরূপ ক্রমশঃ 'তিন গুলি' 'চারি গুলি' প্রভৃতি বলিয়া প্রথম শলাকাস্থিত 'দশ গুলি' পর্য্যন্ত পঠিত হয়।

বালকেরা এই সময় হইতে অঙ্ক লিখিতেও শিক্ষা করে। শিক্ষক গণনকের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠ-ফলকে একটী ক্ষুদ্র বৃত্ত লিখিয়া বলিবেন 'এইরূপে এক গুলি লিখিতে হয়'। বালকেরাও স্ব স্ব শ্লেটে তাহার অনুকরণ করিবে। শিক্ষক তাহার পর একটী দাঁড়ি কাষ্ঠ-ফলকে লিখিয়া বলিবেন এইরূপে 'এক দাঁড়ি লিখিতে হয়'। বালকেরাও আপন আপন শ্লেটে ঐরূপ লিখিবে। শিক্ষক এইরূপে তিন চারি প্রকার পদার্থের এক একটীর অনুকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লিখাইয়া পরে বলিবেন, শুদ্ধ এক লিখিতে হইলে 'এইরূপ লিখিতে হয়'। ১

এইরূপে ক্রমশঃ 'দুই গুলি' 'দুই দাঁড়ি' প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লিখিয়া পরে শুদ্ধ 'দুই' লিখিতে শিখিবে। এবম্প্রকারে ৯ পর্য্যন্ত লিখিতে শিক্ষা হইলে, শিক্ষক গণনকের সমীপস্থ হইয়া বলিবেন দেখ 'দশ গুলি' হইলে এক শারী পূর্ণ হয়, অর্থাৎ এক শারী হইয়া আর গুলি থাকে না; অতএব (কাষ্ঠ ফলকের সমীপস্থ হইয়া) উহা এইরূপে লিখিতে হয়—১০—বালকেরাও ঐরূপ লিখিবে।

এইরূপে ১০ পর্য্যন্ত লিখিতে এবং পড়িতে শিক্ষা হইলে শিক্ষক স্বয়ং ঐরূপে শিক্ষা না দিয়া বালকদিগের মধ্যে এক এক জনকে ঐরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে কহিবেন। পরে তাহারা সকলেই একরূপ শিক্ষা প্রদানে

সমর্থ হইলে শিক্ষক পুনর্ব্বার গণনকের সমীপস্থ হইয়া দ্বিতীয় শলাকার কাষ্ঠ বর্ত্তুল গুলিকে এক একটী করিয়া সরাইয়া 'এক শারী এবং এক গুলি বা এক দশ এবং একগুলি অথবা এগার গুলি' 'এক শারী এবং দুই গুলি বা দ্বাদশ গুলি অথবা বার গুলি' এইরূপে উনবিংশ পর্য্যন্ত পড়াইবেন। পরে কাষ্ঠ ফলকের নিকটে গিয়া বলিবেন 'এক শারী এবং এক বা এগার এইরূপে লিখিতে হয়—১১। 'এক শারী এবং দুই বা বার এইরূপে লিখিতে হয়—১২। বালকেরাও ঐ প্রকারে লিখিবে। পরে শিক্ষক বলিবেন, দুই শারী পূর্ণ হইলে অর্থাৎ দুইশারী হইয়া আর গুলি না থাকিলে, এইরূপ লিখিতে হয়, এই বলিয়া ২০ লেখাইবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দশ শারী পূর্ণ অর্থাৎ ১০০ পর্য্যন্ত পাঠ করা হইলে এবং শিক্ষা হইলেই উত্তমরূপে শতিকা শিক্ষা হইবে।

শতিকা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে বালকেরা নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন সমস্তের উত্তর করিতে পারিবে, যথা (১) আমাদিগের কয়টী মাথা? (২) কয়টী চক্ষু? (৩) চক্ষুতে এবং কর্ণেতে কয়টী? (৪) গোরুর পা কয়টী? (৫) হস্তের অঙ্গুলী কয়টী? (৬)এক হস্তের সকল অঙ্গুলী এবং অপর হস্তের একটী অঙ্গুলী সর্ব্বশুদ্ধ কয়টী অঙ্গুলী? (৭) এক হস্তের সমুদায় এবং অপর হস্তের দুইটী অঙ্গুলী একত্রে গুণিলে কয়টী অঙ্গুলী হয়? (৮) দুইটী গোরুর কয়টী পা? (৯) এক হস্তের সমুদায় এবং অপর হস্তের চারি অঙ্গুলী একত্র করিলে কয়টী অঙ্গুলী হয়? (১০) দুই হস্তের অঙ্গুলী একত্র করিলে কয়টী অঙ্গুলী?

শতিকা শিক্ষার পর 'যোগ-নামতা' শিক্ষা করাইবার আবশ্যকতা হয়। তাহাও পূর্ব্বোক্ত গণনক-যন্ত্র দ্বারা অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। তাহার রীতি অধিক বিস্তারিতরূপে না লিখিয়া নিম্নলিখিত কতিপয় প্রশ্ন দ্বারাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে। শিক্ষক গণনকের নিকট গিয়া কাষ্ঠিকা দ্বারা কাষ্ঠ বর্ত্তুলদিগকে যথোচিতরূপে সরাইয়া এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন—

(১) এক গুলি 'আর' এক গুলি, কয় গুলি?

(২) এক গুলি 'আর' দুই গুলি, কয় গুলি?

(৩) দুই গুলি 'আর' দুই গুলি, কয় গুলি?

(৪) দুই গুলি 'আর' তিন গুলি, কয় গুলি ?

(৫) পাঁচ গুলি 'আর' চারি গুলি, কয় গুলি ?

(৭) সাত গুলি 'আর' এক গুলি, কয় গুলি ?

(৮) নয় গুলি 'আর' তিন গুলি, কয় গুলি ?

(৯) দশ গুলি 'আর' দশ গুলি, কয় গুলি ?

(১০) বার গুলি 'আর' এগার গুলি, কয় গুলি ?

ক্রমে ক্রমে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর করিবার উত্তমরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছে, দেখিলে শিক্ষক প্রশ্নের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া বিবিধ প্রকারে যোগাবলীর প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিবেন। পরে ঐরূপ প্রশ্ন লিখাইবার রীতি শিক্ষা করাইবেন। তদর্থে + 'ধন' চিহ্নের এবং = সম চিহ্নের অর্থ শিখাইতে হইবে। পরে কাষ্ঠ-ফলকে ১ + ১ = ২, ২ + ১ = ৩, এইরূপ লিখিয়া দিলেই বালকেরা তাহার অনুকরণ করিয়া সমুদায় যোগাবলী লিখিতে এবং পাঠ করিতে শিখিবে; মধ্যে মধ্যে যদি ১ + ১ = ২, ১ + ১ + ১ = ৩, ১ + ১ + ১ + ১ = ৪, এইরূপে শতিকার অঙ্ক সমস্ত লিখান যায়, তাহা হইলে সঙ্খ্যা সমস্ত যে একেবারেই সমষ্টি মাত্র, এই ভাব শিশুদিগের মনে অধিকতররূপে সম্বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

ইহার পরে 'বিয়োগ-নামতা' গণনকের দ্বারাই শিক্ষা করাইয়া—পরে 'ঋণ' চিহ্নের প্রকৃতি এবং বিয়োগাবলী লিখিবার রীতি শিখাইতে হয়। ইহার প্রণালী নিম্নলিখিত কতিপয় প্রশ্ন দর্শনেই স্পষ্ট বোধ হইবে।

(১) দশ গুলি 'হইতে' এক গুলি 'লইলে' কত গুলি থাকে ?

(২) নয় গুলি 'হইতে' এক গুলি 'লইলে' কত গুলি থাকে ? ইত্যাদি।

পরে, ১০—১ = ৯, ৯—১ = ৮, ইত্যাদি, এবং ১০—২ = ৮, ৯—২ = ৭, ৮—২ = ৬, ইত্যাদিরূপে সমুদায় বিয়োগাবলী লিখাইয়া পরে যোগ এবং বিয়োগাবলী উভয়কে একত্র করিয়া লিখাইলে ভাল হয়। যথা, ১০—১ = ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১—১ = ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ = ৯, ৪—২ = ২ + ২—২ = ২, ৯—৩ = ৩ + ৩ + ৩—৩ = ৬ + ৩ = ৬, ইত্যাদি।*

* এই সময়ে ( ) বন্ধনী চিহ্নের প্রকৃতি শিক্ষা করাইবার আবশ্যকতা হয়, কিন্তু প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই সৎ পরামর্শ।

গণনক-যন্ত্রের দ্বারাই 'পূরণ-নামতা' শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তদুপযোগী কতিপয় প্রশ্ন নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১) একবার একগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়?

(২) দুই 'বার' এক গুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়? ইত্যাদি—

(৩) এক 'বার' দুই গুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়?

(৪) দুই 'বার' দুইগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়? ইত্যাদি—

(৫) তিন 'বার' একগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়?

(৬) তিন 'বার' দুইগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়? ইত্যাদি—ইত্যাদি।

(৭) দশ 'বার' একগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়?

(৮) দশ 'বার' দুইগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়? ইত্যাদি।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, শিক্ষক 'বার' সংখ্যাটী বিভিন্ন লৌহ শলাকা হইতে গুলি সরাইয়া বুঝাইবেন, নচেৎ 'গুণক্রিয়ায়' এবং 'যোগ ক্রিয়ায়' কোন বিশেষ প্রভেদ বোধ হইবে না। এই কথার তাৎপর্য্য একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা অধিক স্পষ্ট করাইতেছে। 'দুই বার তিন গুলি' বলিবার সময় প্রথম শিক হইতেই এক বার তিন গুলি এবং দ্বিতীয় বার তিন গুলি না সরাইয়া প্রথম শিক হইতে তিন গুলি এবং দ্বিতীয় শিক হইতে তিন গুলি সরাইয়া নীচের এবং উপরের গুলিতে সর্ব্বসমেত যে ছয়টী গুলি হয়, তাহাই দেখান আবশ্যক। এইরূপ সর্ব্বত্রই করা বিধেয় বোধ হয়।

'পূরণ-নামতা' শিক্ষা হইলে উহা লিখিবার নিমিত্ত × গুণ চিহ্নের তাৎপর্য্য বুঝাইতে হইবে, তাহা হইলেই বালকেরা সমুদায় পূরণাবলী লিখিতে শিখিবে। যথা, ১×১=১, ১×২=২, ২×২=৪, ৩×৪=১২, ইত্যাদি। এইরূপে ১০×১০=১০০ পর্য্যন্ত লিখিতে শিক্ষা হইলে যোগাবলীর সহিত মিলিত করাইয়া পূরণ-ক্রিয়া শিক্ষা কারণ ভাল। যথা,

৩×২=১+১+১	৪×২=১+১+১+১
১+১	১+১
১+১+১	১+১+১+১
১+১+১	১+১+১+১
২+২+২=৬	২+২+২+২=৮

ইত্যাদি।

গণনক যন্ত্র দ্বারা ভাগ ক্রিয়াও শিক্ষা করাইতে পারা যায়। তদুপযোগী কতিপয় প্রশ্ন নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১) দশটী গুলিকে সমান দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ লইলে কয়টী গুলি পাওয়া যায়?

(২) আটটী ... ... ?

(৩) ছয়টী ... ... ?

ইত্যাদি।

(৪) নয়টী গুলিকে সমান তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ লইলে কয়টী গুলি পাওয়া যায়?

ইত্যাদি। ... ... ইত্যাদি।

(৫) নয়টী গুলিকে সমান দুই ভাগ করিলে এক এক ভাগে কয়টী থাকে, এবং কয়টীর ভাগ হয় না?

(৬) আটটী গুলিকে সমান তিন ভাগ করিতে গেলে, এক এক ভাগে কয়টী হয়? এবং কয়টীর ভাগ হয় না? ইত্যাদি।

ইহার পর + 'ভাগ' চিহ্নের অর্থ এবং ভাগাবলী লিখাইতে হইবে; যথা,

১০ + ২ = ৫, ৮ + ২ = ৪, ইত্যাদি।

৯ + ৩ = ৩, ৬ + ২ = ৩, ইত্যাদি।

৮ + ৪ = ২, ৪ + ৪ = ১, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

* ১০ + ৩ = ৩, অবশিষ্ট ১,

৯ + ২ = ৪, অবশিষ্ট ১, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গণনক যন্ত্রদ্বারা এই পর্য্যন্ত অতি উত্তমরূপে শিখাইয়া পরে গণিতের কঠিনতর বিষয় সমস্ত শিখাইবার যত্নকরা আবশ্যক। প্রথমতঃ রাশি সমস্ত লিখিবার নিয়ম উত্তমরূপে বুঝাইতে হইবে। অর্থাৎ এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত প্রভৃতি রাশি সমস্তের প্রকৃতি এবং লিখিবার রীতি শিখাইতে

* এই সময়ে ভিন্ন রাশির প্রকৃতি শিক্ষা করাইবার আবশ্যকতা হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা কর্ত্তব্য।

হইবে এবং সঙ্খ্যা সমস্ত বিভিন্ন স্থানে নিবেশিত হইলে তাহাদিগের মূল্যের যেরূপ তারতম্য হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ করিয়া দেখাইতে হইবে। তজ্জন্য নিম্নলিখিতরূপ অঙ্ক সকল লিখান বিশেষ ফলোপধায়ক বোধ হয়। যথা—

১২৩=১০০+২০+৩=১×১০০+২×১০+৩×১=এক বার শত+দুই বার দশ+তিন বার এক। ১২৩৪=১০০০+২০০+৩০+৪=১×১০০০+২×১০০+৩×১০+৪×১=একবার সহস্র+দুইবার শত+তিন বার দশ+চারি বার এক ইত্যাদি।

৩২১=৩০০+২০+১=৩×১০০+২×১০+১×১=তিন বার শত+দুই বার দশ+এক বার এক।

৪৩২১=৪০০০+৩০০+২০+১=চারি বার সহস্র+তিন বার শত+দুই বার দশ+এক বার এক। ইত্যাদি।

ইহার পর সঙ্কলন শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবে। তাহাতেও পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রথা অবলম্বন করাইয়া ক্রিয়া সাধন করা এবং সঙ্কলন ক্রিয়া সজাতীয় রাশির মধ্যে বই বিজাতীয়ের মধ্যে হয় না, ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখান অত্যন্ত আবশ্যক। কতিপয় প্রশ্নের দ্বারা এই কথার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করা যাইতেছে।

(১) তিন শত পঞ্চদশ টাকা এবং দুই শত ঊনবিংশ টাকার সমষ্টি কত হয়?

৩০০+১০+৫
২০০+১০+৯
৫০০+২০+১৪=৫০০+২০+১০+৪=
৫০০+৩০+৪=৫৩৪ টাকা হয়।

(২) দশটী মনুষ্য এবং তেরটী ব্যাঘ্রের সমষ্টি কত হয়?—উত্তর সমষ্টি হয় না।

(৩) তেরটী পয়সা এবং দুইটী আনা পয়সা ইহাদের সমষ্টি কত হয়?

১০+৩ পয়সা

দুই আনা=৮ পয়সা

১০+১১=১০+১০+১=২০+১=২১ পয়সা হয়।

যেমন সঙ্কলন ক্রিয়া সজাতীয় রাশিদিগের মধ্যেই হইতে পারে, বিজাতীয় রাশির মধ্যে হইতে পারে না, ব্যবকলন ক্রিয়াও সেইরূপ। প্রথমে যেরূপ প্রশ্ন সকল দিয়া ব্যবকলনের সূত্র বালকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করা বিধেয় বোধ হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১) যদি ৫৩৪ টাকা হইতে ৩১৫ টাকা খরচ হয়, কত টাকা অবশিষ্ট থাকে?।

৫০০+৩০+৪=৫০০+২০+১৪

৩০০+১০+৫=৩০০+১০+৫

২০০+১০+৯=২১৯ টাকা থাকে।

(২) ত্রিশ টাকা হইতে পাঁচ সের বাদ গেলে কত থাকে? উত্তর, বাদ যাইতে পারে না।

(৩) পাঁচ আনা একপয়সা হইতে তের পয়সা বাদ গেলে কত থাকে?

১০+১১ পয়সা

১০+ ৩

৮ পয়সা থাকে।

পূরণ শিখাইবার সময়ে পূর্য্য এবং পূরক উভয়ই যে কদাপি 'সঙ্খ্যেয়' রাশি হইতে পারে না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু বালকেরা 'সঙ্খ্যান' এবং 'সঙ্খেয়' বৃত্তির বিশেষ প্রভেদ বুঝিতে সমর্থ হয় না। অতএব প্রথমে এই দুইটী শব্দ তাহাদিগের কণ্ঠস্থ না করাইয়া এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, পূরণ ক্রিয়ার 'কোন রাশিকে' কতিপয় 'বার' লইতে হয়। বিশেষতঃ প্রশ্ন সকল বিবেচনা করিয়া করিতে পারিলে এই বিষয় ক্রমশঃ আপনা হইতেই বালকবৃন্দের হৃদ্গত হইবে। নিম্নে তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) চারিবার সাত গুলি লইলে কত গুলি পাওয়া যায়?

প্রথম বারে ৭ গুলি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বারে আর ৭ ,, ,,

তৃতীয় বারে আর ৭ গুলি পাওয়া যায়।
চতুর্থ বারে পুনর্ব্বার ৭ ,, ,,
সর্ব্বশুদ্ধ ৭+৭+৭+৭=২৮ গুলি পাওয়া যায়।

ইত্যাদি

(২) পাঁচ বার ১৫ টাকা লইলে কত টাকা পাওয়া যায়।

১০+৫
৫
২৫
৫০
৭৫ টাকা পাওয়া যায়।

ইত্যাদি।

(৩) যদি কোন মুষ্টিতে ৫৬টী করিয়া পয়সা উঠে, তবে ছয় মুষ্টি পয়সা লইলে সর্ব্বশুদ্ধ কত পয়সা পাওয়া যাইবে?

৫০+৬
৬
৩৬
৩০০
৩৩৬ পয়সা পাওয়া যায়।

ইত্যাদি।

(৪) যদি কোন বৃক্ষের একটী ডালে ৩৬টী ফল ধরিয়া থাকে, তবে বারটী ডালে সমান ফল ধরিলে সমুদায় বৃক্ষে কতগুলি ফল ধরিত?

উত্তর, ৩৬টীর বার গুণ ধরিত। পুনঃ প্রশ্ন, ৩৬ এর ১২ গুণ কত?

৩৬
১২
৬×২=১২
৩০×২=৬০
৬×১০=৬০

৩০ × ১০ = ৩০০

৪৩২ । অতএব ৪৩২টী ফল ধরিত ।

ইত্যাদি ।

উপরের অঙ্কটী এইরূপে কসিলেও হইতে পারে এই বলিয়া বালক-দিগকে নিম্নলিখিত প্রণালী প্রদর্শন করিতে হইবে। যথা,

৩৬

১২

৩৬ × ২ = ১২ + ৬০ = ৭২

৩৬ × ১০ = ৩০০ + ৬০ = ৩৬০

৪৩২

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত হইলেই পূরণের প্রকৃতি এবং নিয়ম সমুদায় শিক্ষা হইল। ভাগক্রিয়া শিখাইবার উপযোগী কতিপয় প্রশ্ন নিম্নে লিখিত হইতেছে। এ স্থলেও হার্য্য এবং হারক উভয় রাশি কদাপি 'সঙ্খ্যেয়' হইতে পারে না এবং হরণ-ফল হার্য্য রাশির সজাতীয় হয় ইহা বিবেচনা করিয়া প্রশ্ন করা আবশ্যক।

(১) ২৮টী গুলিকে সমান চারিভাগ করিলে প্রতি ভাগে কয়টী গুলি হয় ?

২৮ গুলি হইতে প্রথম বার ৭টী গুলি লইলে ২১টী গুলি থাকে, দ্বিতীয় বার ৭টী লইলে ১৪টী থাকে, তৃতীয় বার লইলে ৭টী থাকে এবং চতুর্থ বার লইলে কিছুই থাকে না।

অর্থাৎ ২৮—৭ = ২১

২১—৭ = ১৪

১৪—৭ = ৭

৭—৭ = ০

অতএব প্রত্যেক ভাগে ৭টী করিয়া গুলি হয়।

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

(২) ৭৫ টাকাকে ৫ ভাগ করিয়া দিলে প্রতি ভাগে কত টাকা পড়ে ?

৫)৭০ + ৫(১৪ + ১ = ১৫ টাকা

৭০

———

৫

৫

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

(৩) ৩৩৬টী পয়সা ৬ ভাগে বিভক্ত হইলে এক এক ভাগে কত পয়সা হইবে ?

৬)৩৩৬(৫০ + ৬ = ৫৬ পয়সা

৩০০

———

৩৬

৩৬

ইত্যাদি। ইত্যাদি

(৪) যদি কোন গাছে ৪৩২টী ফল ধরিয়া থাকে এবং সেই গাছে ১২টী ডাল হয় তবে প্রত্যেক ডালে সমান ফল ধরিলে এক একটীতে কতগুলি ফল হইতে পারে ?

উত্তর ৪৩২কে সমান ১২ ভাগ করিলে যত হয় প্রত্যেক ডালে তত হইবে। পুনঃ প্রশ্ন। ৪৩২এর ১২ ভাগ কত ?

১২)৪৩২(৩০ + ৬

৩৬০

———

৭২

৭২

অথবা এইরূপে কসিয়া দেখিলেও হয় যথা ;

১২)৪৩২(৩৬

৩৬

———

৭২

৭২

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত হইলেই হরণের প্রকৃত = নিয়ম সমুদয়ের শিক্ষা হইল।

ফলতঃ এই প্রণালীক্রমে অঙ্ক শিক্ষা করাইলে বালকদিগকে কোন ক্রিয়ার নিয়ম শিখাইতে হয় না ; যে যে ক্রিয়া হইতেছে তাহার পদে পদে সমুদায় কারণ উত্তমরূপে আপনা হইতেই বোধগম্য হইতে থাকে, সুতরাং অতি কোমলমতি শিশুরাও স্বয়ং নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারে। কেবল মাত্র নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা অতিশয় দোষাবহ। নিয়ম গুলির তাৎপর্য্য শেষে বুঝাইয়া দিলে ঐ দোষের কতক পরিহার হয় মাত্র—কিন্তু যেরূপে শিখাইলে স্বতঃই নিয়মের তাৎপর্য্য বোধ হইয়া উঠে, সেই প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলোধায়ক তাহার সন্দেহ নাই।

ইহার পর রাশিদিগের মৌলিক বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষা করাইতে হইবে, এবং কেমন রাশি সকল কাহার ভাজ্য হয়, তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রেরা ঐ প্রণালী শিক্ষা করিলে স্ব স্ব শ্লেটে নিম্নলিখিতরূপে রাশি সমস্তের মৌলিক লিখিয়া শিক্ষককে দেখাইবে, যথা—

৪ = ১ × ৪ = ১ × ২ × ২

৫ = ১ × ৫

৬ = ১ × ৬ = ১ × ২ × ৩

৭ = ১ × ৭

৮ = ১ × ৮ = ১ × ৪ × ২ = ১ × ২ × ২ × ২

৯ = ১ × ৯ = ১ × ৩ × ৩

১৬ = ১ × ১৬ = ১ × ৮ × ২ = ১ × ২ × ৪ × ২ = ১ × ২ × ২ × ২ × ২

২০ = ১ × ২০ = ১ × ২ × ১০ = ১ × ২ × ২ × ৫ × ১ × ৪ = ৫

কোন রাশি তাহার আপনার মৌলিক বই আর কাহার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত হইতে পারে না' এই সূত্রটী অনায়াসেই বালকদিগের হৃদ্গত হইতে পারে। অনন্তর 'একাধিক রাশির সাধারণ মৌলিক থাকিলেই তাহাদিগের সাধারণ-ভাজক থাকে' ইহাও ছাত্রবর্গের হৃদ্গত করা যায়। তাহা হইলেই 'সাধারণ ভাজক' বাহির করিবার রীতি শিক্ষা হইতে পারে। এই বিষয় শিক্ষার উপযোগী প্রশ্ন পাইলে বালকেরা স্ব স্ব শ্লেটে নিম্নলিখিতরূপে উত্তর লিখিয়া দেখাইবে যথা—

৪, এবং ৮, ইহাদিগের সা, ভা = ১, ২, এবং ৪।

৬, ,, ৯, ,, ,, সা, ভা = ১, এবং ৩।

১২, ,, ২০, ,, ,, সা, ভা = ১, ২, ৪।

৪৮, ৮৪ ইহাদিগের মধ্যে ৪৮ = ১ × ২ × ২ × ২ × ২ × ৩

এবং ,, ৮৪ = ১ × ২ × ২ × ৩ × ৭

অতএব ইহাদিগের সা, ভা = ১, ২, (২ × ২ = ৪), ৩, ইহার পর 'গরিষ্ঠ সাধারণ ভাজক' ও 'লঘিষ্ঠ সাধারণ ভাজ্য' বাহির করিবার রীতি অনায়াসেই শিক্ষিত হইবে।

এই সময়েই বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি মূল সমস্ত বাহির করিতে শিখাইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার প্রণালী নিম্নলিখিতরূপ করিতে হইবে। পাটী-গণিতের যে যে সূত্র বীজ-গণিতের সাহায্যে নিরূপিত হইয়াছে তাহা অভ্যস্ত করাইবার আবশ্যকতা নাই।

৩৬ = ৩ × ২ × ৩ × ২ = (৩ × ২) × (৩ × ২) = (৩ × ২)২

∴ √ ৩৬ = ৬ ; ২৭ = ৩ × ৩ × ৩ = ৩ ∴ ৩ ২৭ = ৩

ইহার পর সমান্য ত্রৈরাশিক প্রণালী শিক্ষা করাইতে পারা যায়। কিন্তু অধুনা ইংরাজী বিদ্যালয় সমস্তে যেরূপে ত্রৈরাশিক শিক্ষার বিধি প্রচলিত হইয়াছে তাহা উত্তম বোধ হয় না। তথায় একেবারেই অনুপাতের সূত্র

স্মরণ করিয়া রাশি-সমস্তের সংস্থাপন এবং তাহাদের 'প্রথম ও চতুর্থের গুণ-ফল দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের গুণফলের সমান হয়' ইহা স্মরণ করিয়া কার্য্য করা হইয়া থাকে। এই প্রণালী অতিশয় কঠিন; অল্প বয়স্ক বালকদিগের কথা দূরে থাকুক অধিকবয়স্ক ব্যক্তিরাও শীঘ্র ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ নহেন। অতএব প্রথমে নিম্নলিখিত প্রশ্নের অনুরূপ অঙ্ক সকল কষাইয়া ত্রৈরাশিক শিক্ষা দেওয়াই উচিত পরামর্শ।

(১) যদি ৫ টাকাতে ১৫টী দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ১ টাকাতে কয়টী পাওয়া যাইবে? যদি ১ টাকাতে ৩টী দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ৫ টাকাতে কয়টী পাওয়া যাইবে?

(২) যদি ১০ দিনে ৭০ ক্রোশ পথ গমন হইয়া থাকে, তবে ১ দিনে কত ক্রোশ গমন হইয়া থাকিবে?— যদি ১ দিনে সাত ক্রোশ গমন হইয়া থাকে তবে ১০ দিনে কত ক্রোশ গমন হইবে?

(৩) প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কয়টী করিয়া বর্ণ থাকিলে ১৬ পংক্তিতে ১৪৪টী থাকিবে?—প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ৯টী বর্ণ থাকিলে ১৬ পঙ্‌ক্তিতে কয়টী বর্ণ থাকিতে পারে?

(১) যদি ৫ টাকায় ২০টী দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ৪ টাকায় কয়টী দ্রব্য পাওয়া যাইবে?

(২) যদি ৮ দিনে ৭২ ক্রোশ পথ যাওয়া যায় তবে ৫ দিনে কত ক্রোশ যাওয়া যাইতে পারে?

(৩) যদি ২২ পঙ্‌ক্তিতে ৪৪টী বর্ণ থাকে তবে ৫ পঙ্‌ক্তিতে কয়টী বর্ণ থাকিবে?

শেষের তিনটী প্রশ্নের উত্তর যে প্রথমে হরণ করিয়া পরে পূরণ করিলে পাওয়া যায় এবং প্রথমে পূরণ করিয়া পরে হরণ করিলেও পাওয়া যাইতে পারে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া ভাল।

এইরূপে সকল ত্রৈরাশিক শিক্ষা হইলে পর মুদ্রা এবং গুরুত্ব, তথা দৈর্ঘ্য প্রভৃতির 'পরিমাণ সূত্র' সমুদয় অভ্যাস করাইতে হয়। সচরাচর বিদ্যালয়ের বালকেরা ঐ সকল সূত্র গুলি কেবল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে এবং শিক্ষকেরা

সেই সকল নিয়ম গুলি অভ্যস্ত হইয়াছে কি না, এক এক খানি বহি ধরিয়া আপনারা পরীক্ষা করেন। পরে অঙ্ক পুস্তক হইতে তৎসমুদায়ের উদাহরণ কষাইয়া দেন। এই প্রণালী সর্ব্বতোভাবে উত্তম বলিয়া বোধ হয় না। কারণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকেরা দিবস কতিপয় মধ্যেই ঐ সকল সূত্র গুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যায়, অন্ততঃ অনেকানেক স্থলে তাহাদিগের অভ্যাস 'পাপড়ি ভাঙ্গা' হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বিজাতীয় পরিমাণ-সূত্র গুলি পুনঃ পুনঃ বিস্মৃত হইতে হয়। এই সকল দোষ নিবারণার্থে হলণ্ড দেশের বিদ্যালয় সমূহে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অবলম্বন করা বিধেয় বোধ হয়। যদি কেহ সেই রীতি গ্রহণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই উহার সমগ্র ফল উপলব্ধ হইবেন।

হলণ্ডের বিদ্যালয় সকলে তদ্দেশ প্রচলিত মুদ্রা এবং পরিমাণ সমস্ত দেখাইয়া বালকদিগকে সেই গুলির নাম বলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা ঐ সকল পরিমানের তারতম্য আপনারা পরীক্ষা করিয়া শিখিয়া থকে। যদি আমাদিগের দেশ-প্রচলিত কতিপয় মুদ্রা এবং পরিমাণ পাঠশালা সমস্তে রাখা যায় এবং বালকেরা সেইগুলি দেখিয়া এবং তাহাদিগের পরস্পর তারতম্য বিবেচনা করিয়া সূত্রগুলি স্বয়ং বুঝিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে প্রথম শিক্ষায় কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব হইলেও পরিণামে অনেক উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই।

একটী উদাহরণ দ্বারা এইরূপ শিক্ষার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। তিন খণ্ড কাষ্ঠের একটীর উপর 'ইঞ্চি' দ্বিতীয়টীর উপর 'ফুট' এবং তৃতীয়টীর উপর 'গজ' লিখিতে থাকিবে। বাস্তবিক ও কাষ্ঠ খণ্ড গুলি ঐ ঐ পরিমাণেই হইবে। শিক্ষক সেই গুলি ক একটী বালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন এবং বালক স্বহস্তস্থিত কাষ্ঠগুলি দেখিয়া এবং মাপিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতে থাকিবে।

(১) ইঞ্চি ফুট এবং গজ, এই তিনটীর মধ্যে কোনটী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র? কোন্‌টী মধ্যম? কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ?

(২) ইঞ্চিটীকে কতবার লইলে ফুটটী পূর্ণ হয়? ইঞ্চি অপেক্ষা ফুট কত বড়?

(৩) ফুটটীকে কতবার লইলে গজটী পূর্ণ হয়? ফুট অপেক্ষা গজ কত বড়?

(৪) ইঞ্চিটীকে কতবার লইলে গজ পূর্ণ হয়?— ইঞ্চি অপেক্ষা গজ কত বড়?

(৫) ২ গজ ১ ফুট ৩ ইঞ্চি একটী রেখা এই ঘরের মেজ্যায় অঙ্কিত কর।

(৬) আমি যে এই রেখাটী অঙ্কিত করিলাম, ইহা কত দীর্ঘ হইল মাপিয়া বল?

(৭) তোমার চাদরটী কত দীর্ঘ?— অমুকের চাদর কত দীর্ঘ?— অমুকের চাদর কত দীর্ঘ— দুইটী যোড়া দিলে কত দীর্ঘ হইবে?— না মাপিয়া বল; মাপিয়া দেখ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৮) ইঞ্চি, ফুট গজের দ্বারা কি মাপা যায়? এই সকল পরিমাণ কাহারা ব্যবহার করে?

পরিমাণ সূত্র সমুদায় শিক্ষিত এবং তাহার পর মিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণন এবং হরণপ্রণালী সমুদায় সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইলে ভিন্ন রাশি প্রকরণ আরম্ভ করা আবশ্যক। ভিন্ন রাশির অববোধ অতি সুকঠিন ব্যাপার। অতএব শিক্ষকের কর্ত্তব্য প্রতিপদে তাহাদিগের প্রকৃতি সমস্ত যত দূর পারেন, বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন। তজ্জন্য কাষ্ঠিকা কাগজ রজ্জ্বাদি ছিন্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৪}$ প্রভৃতি ভিন্ন রাশি সমস্তের তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া দেখাইবেন। পরে ঐ প্রণালী দ্বারা $\frac{১}{৫}$, $\frac{১}{৬}$, $\frac{১}{৭}$, $\frac{১}{৮}$, ইত্যাদি ভিন্ন রাশির তাৎপর্য্যও বুঝাইবেন। অনন্তর, $\frac{১}{১০}$ $\frac{১}{১২}$ $\frac{১}{১৬}$ ইত্যাদি রাশি দ্বারা কিরূপ পদার্থের বোধ হয়, তাহাও দেখাইয়া দিবেন।

নিম্নলিখিত প্রশ্ন কতিপয় দর্শনে এই সকল বিষয় শিক্ষা করাইবার নিয়ম কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে।

শি। দেখ, এই কাগজের ফালিতে ১২টী সমান সমান ভাঁজ আছে। ইহা সমুদায়ে ১টী কাগজ; অতএব উহার কথা লিখিতে গেলে ১লিখিলেই হয়, কিন্তু এই বারটী অংশের এক অংশ লিখিতে গেলে $\frac{১}{১২}$ এইরূপ লিখিতে হয়। যদি বারটী অংশের কোন দুইটী অংশ লিখিতে হয়, তাহা হইলে $\frac{২}{১২}$ লিখিতে হয়, যদি তিনটী অংশ লিখিতে হয়, তবে $\frac{৩}{১২}$ লিখিতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু যদি ২টী অংশই লিখিতে হয় তবে $\frac{১২}{১২}$ অথবা ১ লিখিতে হয়।

শি। ঐ কাগজের এই দুইটী অংশ কিরূপে লিখিবে? এই ৫টী অংশ কিরূপে লিখিবে?—এই ৬টী অংশ কিরূপে লিখিবে?—এই বারটী অংশই কিরূপে লিখিবে?

পরে শিক্ষক আর একটী কাগজ লইয়া নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিবেন।

শি। দেখ, এই কাগজটী সমান ১৬ ভাঁজে বিভক্ত, উহার এক এক অংশের নাম ষোড়শাংশ। উহার এক অংশ কিরূপে লিখিবে?—কোন দ্রব্য যদি সমান ২০ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার এক ভাগ কিরূপে লিখিবে? তাহার পাঁচ ভাগ কিরূপে লিখিবে?—কোন দ্রব্য সমান ৮ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহার তিন ভাগ লওয়া হইয়াছে, কত লওয়া হইয়াছে?—এই কাগজ খণ্ডকে ভাঁজিয়া দেখাও উহার কতটুকু হইলে ৃ ভাগ লওয়া হয়?—যদি কোন কমলালেবুতে ১২টী কোষ থাকে এবং দুইটী ভাই তাহা এমন করিয়া খায় যে ছোট ভাইটী এক ভাগ এবং বড়টী দুই ভাগ পায়, তবে কে কি ভাগ এবং কয়টী করিয়া কোষ পাইবে? ইত্যাদি—ইত্যাদি—

ইহার পর ভিন্নরাশিদিগকে এক জাতীয় করিবার প্রয়োজন এবং প্রণালী শিক্ষা করাইতে হইবে। তাহাও ঐ কাগজ, কাষ্ঠিকাদি ভাঙ্গিয়া স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারা যাইবে। তাহার একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

শি। দেখ, এই কাগজটী দুই সমান ভাগে বিভক্ত; আর এই আর একটী কাগজও ঠিক উহার সমান কিন্তু ইহা তিনটী সমান সমান ভাগে বিভক্ত। প্রথমটীর একটী অংশ লিখিতে হইলে ১/২ এইরূপ লিখা যায়, দ্বিতীয়টীর একটী অংশ লিখিতে হইলে ১/৩ এইরূপ লিখিতে হয়। কিন্তু প্রথমটীর একাংশে এবং দ্বিতীয়টীর একাংশে কখনই সমান দুই অংশ হইতে পারে না। যদি প্রথম কাগজটীর প্রত্যেক অংশকে সমান ৩ অংশে ভাগ করা যায়, তবে সমুদায় কাগজখানি ৬ অংশে বিভক্ত হয়, আর যদি দ্বিতীয় কাগজখানির প্রত্যেক অংশকে দুই দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, তবে উহাও সর্ব্বশুদ্ধ ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণে দেখ, প্রথম

কাগজের $\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ের $\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$ হইয়াছে, সুতরাং উভয়ে মিলিয়া $\frac{৪}{৬}$ হইবে। বাস্তবিক ঐ দুইটী কাগজের মধ্যে কোন একটীর $\frac{৪}{৬}$ যাহা, আর প্রথমটীর $\frac{১}{২}$ এবং দ্বিতীয়টীর $\frac{১}{৩}$ মিলিয়াও তাহাই হয়। ইত্যাদি. ইত্যাদি।

এইরূপে সঙ্কলন এবং ব্যবকলন শিক্ষা হইয়া গেলে তাহার পর পূর্ণরাশি দ্বারা ভিন্ন রাশির পূরণ এবং পূর্ণ রাশির ভাগ শিক্ষা করাইতে হয়। তজ্জন্য নিম্নলিখিতরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে।

শি। এই কাগজখানি সমান সমান ছয় ভাগে বিভক্ত আছে, উহার দুই ভাগকে অর্থাৎ $\frac{২}{৬}$ কে যদি দুইবার লওয়া যায়, তবে $\frac{৪}{৬}$ ভাগ পাওয়া যায়—কিন্তু $\frac{২}{৬}\times ২=\frac{৪}{৬}$ হয়; অতএব "ভিন্ন রাশির অংশকে গুণ করিলেই ভিন্ন রাশিকে গুণ করা হয়" ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়া এই সূত্র সপ্রমাণ করিয়া দেখ কোন স্থলে ইহার অন্যথা হইবে না।

শি। আবার দেখ, এই ছয় ভাঁজে বিভক্ত কাগজ খানির এই অংশকে $\frac{২}{৬}$ বলা যাইতেছে। যদি ইহার দ্বিগুণ লইবার নিমিত্ত $\frac{২}{৬}$ কে দুইবার না লইয়া ভাঁজ গুলির সংখ্যা কমাইয়া তিন করি এবং তাহার দুই ভাঁজ লই, তাহা হইলেও পূর্ব্বে যে ফল পাইয়াছি তাহাই পাওয়া যায় (অর্থাৎ $\frac{২}{৬\div ২}=\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$ হয়) এইরূপ অন্য সর্ব্বস্থলেও হইয়া থাকে। অতএব 'ভিন্ন রাশির ছেদককে ভাগ করিয়া লইলেও ভিন্নরাশি পূরণ হইতে পারে'। পরে ভিন্ন রাশির হরণ যে যে অংশকে ভাগ, অথবা ছেদককে বৃদ্ধি করিলে হইতে পারে তাহাও কাগজে চিহ্ন করিয়া দেখাইতে হইবে। অনন্তর অনেকানেক উদাহরণ দ্বারা এই সকল বিষয় শিক্ষা করাইয়া পরে অপবর্ত্তের রীতি এবং সরলতাপাদনের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া যাইবে। তাহার পর ভিন্ন রাশির পূরণ ও হরণ শিক্ষা করাইয়া ক্রমশঃ কঠিনতর এবং জটিলতর রাশি সমস্তের সরলতা সম্পাদন করাইয়া পরে ভিন্নরাশি সম্বন্ধিষ্ট ত্রৈরাশিক শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

ভিন্ন রাশির পর দশমিক ভিন্ন রাশি এবং তাহার পর অনুপাত প্রকরণ

শিক্ষা করাইতে হইবে। পরন্তু এই সকল বিষয় আর অধিক বাহুল্য করিয়া লিখিবার আবশ্যকতা নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কোন স্থলেই যেন শিক্ষক স্বয়ং নিয়মিত শিখাইয়া না দেন। এমত করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আবশ্যক যে, ছাত্রেরা যেন আপনা হইতেই অঙ্কগুলি কষিয়া ক্রমে ক্রমে নিয়মটী আবিষ্কৃত করিতে পারে। ফলতঃ পাটীগণিত শিক্ষার্থ এইরূপ প্রশ্নমালা অতিশয় প্রয়োজনীয় বোধ হয় এবং শিক্ষক মাত্রেরই কর্ত্তব্য তাঁহারা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া ঐরূপ এক একটী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

[পাঠ বলিয়া দিবার রীতি—বিদ্যালয়ের ব্যবহৃত কতিপয় পুস্তক হইতে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন।]

যে প্রকারে বালকদিগকে পাঠ বলিয়া দেওয়া এবং তাহাদিগের প্রতি যদ্রূপে প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা এই অধ্যায়ে কতিপয় উদাহরণ দ্বারা প্রকটিত করা যাইতেছে। এই স্থলে যেরূপ লেখা যাইবে, বোধ হয়, অনেক কৃতকর্ম্মা শিক্ষক তদপেক্ষা অনেক উত্তমরূপে পাঠ গ্রহণ করাইতে পারেন। তথাপি যাঁহারা অধ্যাপনা কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহারা দুই একটী নিকৃষ্ট আদর্শ পাইলেও উপকার স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। বোধোদয় এবং নীতিবোধ এই দুইখানি পুস্তক ভাবশুদ্ধ ও অতি সরল ভাষায় লিখিত, অতএব অবশ্য সকলেরই গ্রাহ্য হইবে। এই হেতু ঐ দুইখানি পুস্তকের প্রথম পংক্তি কতিপয় অবলম্বন করিয়া পাঠ গ্রহণ করাইবার রীতি প্রদর্শন করা যাইতেছে। এই স্থলে আরও বক্তব্য যে, নিম্নে যাহা যাহা লিখিত হইতেছে, তাহার অতি অল্প অংশই স্বকপোল কল্পিত। কোন বিদ্যালয়ে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রায় অবিকল লিপিবদ্ধ হইল।

"আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই সে সমুদায়কে পদার্থ কহে"। বোধোদয়।

শিক্ষক আপনি এই পর্য্যন্ত অতি স্পষ্টরূপে পাঠ করিয়া বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তোমরা ইহার অর্থ বুঝিয়াছ? বালকেরা অনেকেই নিরুত্তর হইয়া রহিল, কেহ কেহ কহিল হাঁ বুঝিয়াছি।

শি। বুঝিয়াছ—উত্তম, 'ইতস্ততঃ' পদের অর্থ কি?

বা। চারিদিকে।

শি। ইতস্ততঃ পদের অর্থ চারিদিকে—ঠিক, ইতঃ অর্থে হেথায়, ততঃ অর্থে সেথায়—অতএব ইতস্ততঃ অর্থে হেথায় সেথায়—এখানে সেখানে—সকল স্থানে—চতুর্দ্দিকে।—ভাল, "আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই" "আমরা" কে?। বা। আমরা সবাই—সকল মনুষ্য। শি। "আমরা" এই শব্দটী একবচন বা বহুবচন?—আমরা বলিলে এক জনকে বুঝায় না অনেক জনকে বুঝায়? বা। আমরা বলিলে অনেক জনকে বুঝায়। শি। অতএব ইটি—? বালক। বহুবচন হইল। শি। 'যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই'—তবে দেখিতে পাই না—এমন বস্তু কি কিছু আছে? বা। আছে। শি। একটীর নাম বল। বা। বাতাস! শি। বায়ু একটী অদৃশ্য পদার্থ বটে, আমরা বায়ুকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই এমত বোধ করি না—তবে বায়ু কি একটী পদার্থ নয়?

(সকল বালকই নিরুত্তর হইয়া শিক্ষকের প্রতি চাহিয়া রহিল।)

শি। বায়ুও একটী পদার্থ বটে,—পদার্থ শব্দের অর্থ কি? বা। বস্তু। বা। দ্রব্য। বা। সামগ্রী। বা। যাহা কিছু আছে সকলই পদার্থ। শি। পদার্থ শব্দটী যৌগিক—ইহা দুইটী শব্দে যোগ করিয়া হইয়াছে, তাহার একটী শব্দ পদ অপরটী অর্থ—অতএব পদার্থ বলিলে পদের অর্থ বুঝায়; পদ অর্থে কি?। বা। পদ মানে কথা—শি। অতএব পদার্থ অর্থে?—বা। কথার অর্থ। শি। পদার্থ মানে কথার অর্থ—পদের অর্থ; অতএব কোন পদ বলিলে যাহা বুঝায় তাহারই নাম পদার্থ—'বহি' একটী পদ অতএব?।—বা। বহি একটী পদার্থ। শি। বহি একটী পদ অতএব বহি বলিলে যাহা বুঝায় সেইটী একটী পদার্থ—বহি শব্দ মাত্র কিন্তু

এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে তোমরা যাহা বুঝ, তাহা একটী পদার্থ। তেমনি শ্লেট ?—শ্লেট একটী পদার্থ। শ্লেট ইটী শব্দ মাত্র—ইহা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাই এক পদার্থ। যদি তোমাকে বলি মহেন্দ্র! ঐ শ্লেট খানি আন, তবে আমি শ্লেট এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলাম, তুমি যাহা আনিয়া দিবে সেইটী একটী পদার্থ হইবে। তেমনি কলম আন বলিলে ?—বা। কলম আন বলিলে আমি যাহা আনিয়া দিব, সেইটী একটী পদার্থ হইবে। শি। যদি আমি বলি কলম রাখ।—বা। আমি যাহা রাখিয়া দিব, তাহাই একটী পদার্থ। শি। ভাত খাও বলিলে ?—বা। আমি যাহা খাইব তাহাই একটী পদার্থ। শি। ভাত এই শব্দটী খাইয়া ?—বা। (হাস্য সহকারে) পেট ভরে না। শি। অতএব কোন শব্দ বা পদ উচ্চারণ করিলে যাহা বুঝায় ?—বা। তাহাই একটী পদার্থ। শি। শব্দগুলি পদার্থের নাম, তাহারা স্বয়ং ?—বা। পদার্থ নয়। শি। যেমন মহেন্দ্র তোমার—বা। মহেন্দ্র আমার নাম, আমি (চমৎকৃত হইয়া) মহেন্দ্র নহি। শি। যদি তোমার পিতা তোমার নাম মহেন্দ্র না রাখিয়া গোবিন্দ রাখিতেন, তাহা হইলেও তুমি কিছু গোবিন্দ হইতে না, তোমার নাম ?—বা। আমার নাম গোবিন্দ হইত। শি। দেখ, আমরা গোলাপ ফুলকে গোলাপ বলি, আম্র ফলকে আম্র বলি—ইঙ্গরেজের গোলাপকে রোজ এবং আম্রকে ম্যাঙ্গো বলেন; কিন্তু রোজ এবং ম্যাঙ্গো, গোলাপ এবং আম্র হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। উহারা পদার্থ এক উহাদিগের ?—বা। নাম এক নয়। শি। পদার্থে এবং পদে কি প্রভেদ এইক্ষণে বুঝিলে ? বা। হাঁ বুঝিলাম, পদার্থ, বস্তু, সামগ্রী, এবং পদ তাহার নাম। শি। তবে যাহার নাম আছে তাহাই ?—বা। পদার্থ। শি। তবে বায়ুরও ত নাম আছে, অতএব বায়ুও একটী ?—বা। বায়ু একটী পদার্থ। শি। কিন্তু তোমাদের পুস্তকে লিখিতেছে আমরা (সকলে ইতস্ততঃ (সর্ব্ব স্থানে) যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই সে সমুদায়কে পদার্থ (পদের অর্থ) কহে। কিন্তু বায়ুকে ত দেখিতে পাই না, বায়ু কি প্রকারে পদার্থ হইল ?—(সকল বালকই নিরুত্তর হইয়া রহিল।) শি। যদি আমি বলি তোমরা যতগুলি এখানে আছ সকলেই বালক, তবে যাহারা এখানে

নাই, তাহারা কি বালক নয়? বা। হাঁ তাঁহারাও বালক বই কি। শি। তেমনি?—বা। আমাদিগের পুস্তকে লিখিতেছে আমরা যাহা যাহা দেখিতে পাই সকলই পদার্থ। শি। কিন্তু যাহা দেখিতে পাই না, তাহার মধ্যেও অনেক?—বা। পদার্থ আছে। শি। যাহা দেখিতে পাই তাহা ত পদার্থ বটেই, আর তাহা ছাড়াও কতকগুলি পদার্থ আছে।

"এই ভূমণ্ডলে এবম্বিধ বহুতর ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে, যে তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না"।—নীতিবোধ।

শি। ভূমণ্ডল শব্দের অর্থ কি?। বা। ভূমণ্ডল শব্দের অর্থ পৃথিবী। শি। এবম্বিধ? বা। এমন—এই প্রকার। শি। এবম্বিধের বিপরীত অর্থ বুঝায়, এমন শব্দ কি? এবম্বিধ মানে এই প্রকার, তাহার বিপরীত অর্থাৎ এই প্রকার নয়?। বা। অন্য প্রকার—অন্যবিধ। শি। মানব জাতি বলিলে মনুষ্যের কোন্ জাতি বুঝায়? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কি বুঝায়?। বা। মানব জাতি বলিলে মনুষ্যের সকল জাতিকেই বুঝায়। শি। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইহাদিগের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাকে কি জাতিভেদ বলে না?। বা। হাঁ তাহাকেও জাতিভেদ বলে। শি। হিন্দু, ইংরাজ, মোগল পাঠান, ইহাদিগের মধ্যে যে প্রভেদ?। বা। তাহাকেও জাতি ভেদ বলে। শি। তবে যখন সমুদায় মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায়, তখন মনুষ্যের সহিত কাহার প্রভেদ করিয়া ঐরূপ কহা যায়? বা। তখন অন্য জীব জন্তুর সহিত প্রভেদ করিয়া মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায়। শি। অন্য জীব জন্তুর সহিত ভেদ করিয়া সমুদায় মনুষ্যকে এক জাতি কহে, মনুষ্যের মধ্যেও পরস্পর প্রভেদ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির নাম হয়, আর আমরা এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং এক ভাষা ভাষী, আমাদিগের মধ্যেও যে প্রভেদ তাহার নামও জাতিভেদ, কিন্তু ইহার আর একটী নাম আছে, তোমরা জান?। (বালকেরা নিরুত্তর হইয়া থাকিল)। শি। ইহাকে বর্ণ-ভেদও বলে। অপকার শব্দের অর্থ কি?। বা। অপকার অর্থে অনিষ্ট মন্দ, হানি। শি। অপকারের বিপরীত কি? বা। উপকার। শি। গ্রন্থকার লিখিতেছেন (আমাদিগের কখন কোন অপকার করে না, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনেক আছে) 'কখন' অপকার করে না কি?। বা। কখন কোন

অপকার করে না, অর্থাৎ কোন সময়ে একটুও হানি করে না। শি। তবে কখন কখন অনুপকার করে এমত জন্তু আছে—তাহার একটির নাম বল। বা। বিছা—বোলতা—ভিমরুল। শি। বৃশ্চিক, বরটা, ভৃঙ্গ; ইহারা কোন কোন সময়ে আমাদিগের অপকার করে?—ইহারা কখন্ হানিকর হয়?। বা। উহাদিগের গায়ে হাত দিলেই উহারা কামড়ায়। শি। উহাদিগের গায়ে হাত দিলেই উহারা কামড়ায় কেন, বলিতে পার? বা। উহাদিগকে লাগে। শি। ভয় পায় অথবা ক্লেশ হয়, এই জন্যই উহারা দংশন করে, উহাদিগকে ভয় বা ব্যাথা না দিলে উহারা দংশন করে না—তবে গোবিন্দ! তোমার নিকট সে দিন যে বোলতাটি আসিয়াছিল তাহাকে কি জন্য মারিতে উদ্যত হইয়াছিলে?। গো। পাছে আমাকে কামড়ায় এই জন্য মারিতে যাইতেছিলাম। শি। অতএব যে সকল জন্তু কখন কখন আমাদিগের অনুপকার করিতে পারে, আমরা অগ্রেই তাহাদিগকে মারিতে বা স্থানান্তর করিতে উদ্যত হই। (কখন কোন অপকার করে না) 'কোন অপকার কি?'। বা। একটুও অপকার করে না। শি। অল্প মাত্রায়ও অপকার করে না—অল্প অল্প অপকার করে, এমত কয়েকটীর নাম বল। বা। মশা, মাছি। শি। মশক, মক্ষিকা, মৎকুণ, প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু প্রায় সর্ব্বদাই মনুষ্যের অহিত করে, এই জন্যই মনুষ্যেরা তাহাদিগকে নষ্ট করে। এই ক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কখন কখন (অর্থাৎ সর্ব্বদা নয়) অপকার করে এমত কতকগুলি জন্তুর নাম করিয়াছ, আর অতি অল্পমাত্রায় মনুষ্যের অহিত করে, এমত কতকগুলিরও নাম করিলে, সম্প্রতি কখন কোন অপকার করে না, এমত দুই একটী জন্তুর নাম কর, শুনি। বা। এমত অনেক আছে কিন্তু তাহাদিগের নাম জানি না। শি। প্রাণি বিদ্যা বলিয়া একটী শাস্ত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে উহাদিগের অনেকের আকার, প্রকার, নাম, ব্যবহার জানিতে পারিবে। কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বতোভাবেই অনপকারী এমন দুই একটীর নাম তোমাদিগের জানা আছে, এইক্ষণে স্মরণ হইতেছে না—একটীর নাম প্রজাপতি—প্রজাপতি কখন মনুষ্যের কোন অপকার করে না, আর উহার কি মনোহর দৃশ্য! কি কোমল শরীর! যাহারা উহাদিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দুর্দ্দশা করে, তাহারা

কি নিষ্ঠুর! বা। ফড়িঙ্ কখন কাহার মন্দ করে না। শি। প্রজাপতি এবং ফড়িঙ্ দুইটী হইল। বা। গঙ্গাফড়িঙ্। শি। তিনটী হইল। বা। আশুলা। শি। (একটী বালক, আশুলায় গরল হয় কহিয়া উঠিলে, ঈষৎ হাস্য সহকারে) তবে চারিটী হইল না। বা। টিক্‌টিকি। শি। এই চারিটী হইল—এইরূপ সহস্র সহস্র—লক্ষ লক্ষ আছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী কখন কখন মনুষ্যের অপকারী হয়, মনুষ্যেরা ভয় প্রযুক্ত তাহাদিগকে বিনাশ করেন, আর যাহারা সর্ব্বদা অল্প অল্প বিরক্ত করে, সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা তাহাদিগকেও মারিয়া ফেলি। কিন্তু তোমরা প্রজাপতি প্রভৃতি যে গুলির নাম করিলে বালকেরা উহাদিগকে কি জন্য নষ্ট করে? বা যন্ত্রণা দেয়?—ঐ নিষ্ঠুরতা তাহাদিগের কিসের দোষ? বা। ইহা তাহাদিগের স্বভাবের দোষ। শি। উত্তম বলিয়াছ; ইহার পর তোমাদিগের পুস্তকে কি লিখিয়াছে পড়। বা। "কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমত নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় এবং উহাদিগের প্রাণবধ করে।" শি। এই স্থলে 'স্বভাবতঃ' এমত নিষ্ঠুর কেন বলিয়াছে, বুঝিতে পারিলে?

"এমন করিয়া পড়াইতে গেলে এক পাঠেই সমুদায় দিন শেষ হয়, আর এক বৎসরেও একখানি বহি সমাপ্ত হয় না" যদি কেহ এমত আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে, এইরূপে একটী পাঠ পড়াইলে এক শত পাঠের কার্য্যকারী হয়, এবং পাঠশালার বহি সমাপন্ না হউক, কিন্তু শীঘ্র অপঠিত গ্রন্থ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে। অপরন্তু, এইরূপে পড়া অল্প হয়—কেবল পুস্তক অভ্যাস করায় পাঠ অধিক হয়, ইহাও একটী ভ্রম মাত্র। পুস্তক অভ্যাস করিয়া গেলে পুনর্ব্বার তাহা বিস্মৃত হইতে হয়, সুতরাং পুরাতন পাঠ পুনঃ পুনঃ পড়িবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুরাতন পাঠ অভ্যাস করায় বালকদিগের কখনই অধিক প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষককে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অধ্যাপিত পাঠসকল বারবার শিক্ষা করাইতে হয়। তাহাতেই অনেক সময় যায় এবং অনেক পণ্ডশ্রম হয়। বৎসরের শেষে, সমুদায়

বৎসরে কত পাঠ হইয়াছে বিচার করিয়া দেখিলে, প্রায়ই দেখা যায় দিন প্রতি পাঁচ, সাত, দশ পঙক্তির অধিক পড়ে না। পূর্ব্ব-প্রদর্শিতরূপে পাঠ গ্রহণ করাইলেও তাহাই হইবে। অতএব এই প্রকারে অধিক সময় লাগে এই কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য।

"কিন্তু এইরূপে পড়াইতে গেলে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, অনেক বকিতে হয়, শীঘ্র শরীর জীর্ণ হইয়া পড়ে" যদি কেহ এমত বলেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করি। পরন্তু শিক্ষকের কর্ম্ম অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। অতএব তাহা জানিয়া শুনিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশ্রম বিমুখ হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কোন কোন ব্যবসায়ী লোক কতকাল ব্যাপিয়া জীবিত থাকে, ইহার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে; এবং তদ্দৃষ্টে অবগতি হয় যে, চিকিৎসকেরা সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প আয়ুষ্মান্ হয়েন, এবং শিক্ষকেরা তাঁহাদিগেরই নীচে। অতএব যিনি ইহা জানিয়াও শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, পরিশ্রম অধিক বলিয়া কোন সুপ্রণালী পরিত্যাগ করেন। অপিচ বালকদিগের বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি করিবার অভিপ্রায়ে অধ্যয়ন করাইতে করাইতে যে প্রকার মনের সুখ হয়, তাহাদিগকে গ্রন্থ অভ্যাস করাইতে গেলে, কখনই তেমন সুখ হয় না।

—:০:—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[বস্তুবিদ্যা—বস্তুমঞ্জুষা—কাচ বিষয়ক কতিপয় আনুক্রমিক-পাঠ-প্রদর্শন—সরল বাক্য রচনা—প্রশ্নের উত্তর রচনা। পদ-পূরণ দ্বারা বাক্য রচনা।]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বালকেরা পুস্তক পাঠ করা অপেক্ষা শিক্ষকের স্থানে বাচনিক উপদেশ গ্রহণ করিতে অধিক অনুরক্ত হয়। কিন্তু কো

বিষয় শুদ্ধ কথায় শুনিয়া মনে রাখা অপেক্ষা যদি তাহার প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর অধিক আনন্দ হয়, এবং তদ্বিষয়ক সংস্কার অধিকতর সুপরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই জন্য নানা দ্রব্যের গুণ, প্রকৃতি প্রয়োজন এবং ব্যবহারোপযোগিতা শিখাইবার সময় সুবিজ্ঞ শিক্ষাচার্য্যেরা কেবল মাত্র পুস্তক, অথবা আপনাদিগের বাচনিক উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া সেই সকল দ্রব্য লইয়া ছাত্রবর্গের প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন। ছাত্রেরা তাহা পাইয়া দর্শনাদি করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়, এবং সচ্ছন্দে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। শিশুগণ সহজেই সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট। তাহারা কোন নূতন বস্তু দেখিলেই তাহার বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। শিক্ষক সেই কৌতুহল পরিপূরণ করিবার যত্ন করিয়া অনায়াসে অনেক বিষয় শিক্ষা করাইতে পারেন। অতএব বিদ্যালয় মাত্রেই এক একটী 'বস্তু মঞ্জূষা' রাখা বিধেয়। বালকেরা স্ব-স্ব ইচ্ছানুসারে আপন আপন গৃহাদি হইতে যে যে দ্রব্য আনয়ন করিবে, শিক্ষক তৎসমুদায় অতি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ 'বস্তু মঞ্জূষায়' রাখিয়া দিবেন। পরে সময়ে সময়ে তাহা হইতে এক একটী দ্রব্য লইয়া বালকবর্গকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবেন। বস্তু মঞ্জূষায় অনেকগুলি 'দেরাজ' এবং প্রতি দেরাজে অনেকগুলি করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকিবে। প্রতি প্রকোষ্ঠে এক এক প্রকার দ্রব্য থাকিবে, এবং শিক্ষক যত্ন করিয়া যে সকল দ্রব্য বালকবর্গের দুষ্প্রাপ্য তাহা স্বয়ং সংগ্রহ করিবেন। তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যদি কোন বালক নিজ বাটী হইতে একটু রেসম আনিয়া থাকে, তবে শিক্ষক ঐ রেসমের বিষয়ে কোন শিক্ষা প্রদান করিবার পূর্ব্বে আপনি একটী 'গুটি', একটী 'পোকা', কতিপয় গুটির ডিম্ব এবং চেলি, মকমল, প্রভৃতি যে সকল বস্ত্র রেসম দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিবেন।

যদি কোন বালক স্বগৃহ হইতে এক খণ্ড লৌহ আনয়ন করে, তবে শিক্ষককে বিমিশ্র লৌহ, ঢালা লৌহ, পেটা লৌহ, ইস্পাত এবং লৌহজাত বিভিন্ন প্রকার পাঁচ সাতটী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। যদি বালকেরা বাটী হইতে কিঞ্চিৎ তূলা আনয়ন করিয়া থাকে, তবে শিক্ষকের কর্ত্তব্য

যে তিনি কার্পাস-বৃক্ষ, কার্পাস, সবীজতূলা, সূত্র এবং বিবিধ প্রকার বস্ত্র খণ্ড সমস্ত স্বয়ং সংগ্রহ করেন। এইরূপ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই 'বস্তু মঞ্জুষা' অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্তে পূরিত হইয়া উঠিবে।

এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, বালকদিগের বয়ঃক্রম এবং বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া এই সকল পাঠ সহজ অথবা অপেক্ষাকৃত কঠিন করা আবশ্যক। ইহার কতিশয় আদর্শ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

শিক্ষক বস্তু মঞ্জূষা হইতে এক খণ্ড কাচ লইয়া বালকদিগকে উহা দেখাইয়া উহার নাম জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহারা উহার নাম বলিলে তিনি কাষ্ঠফলকে 'কাচ' এই নামটী অতি স্পষ্টরূপে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিবেন। পরে ঐ কাচ খণ্ডকে রৌদ্রে ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিবেন, কাচকে কেমন দেখায়? বা। 'চক্‌চকে' দেখায়। শি। হাঁ, কাচ দেখিতে 'উজ্জ্বল'। পরে কাষ্ঠফলকে যেখানে 'কাচ' লিখিয়াছেন তাহার পার্শ্বে 'দেখিতে উজ্জ্বল' এইরূপ লিখিবেন। শি। এই কাচ লইয়া স্পর্শ করিয়া বল উহাকে কিরূপ বোধ হয়, স্পর্শ মাত্র করিও, উহার গাত্রে হাত বুলাইও না। আপন আপন গালে ছুঁয়াইয়া দেখ। বা। গালে শীতল ঠেকে। শি। তবে কাচ, স্পর্শে শীতল, এই বলিয়া কাষ্ঠফলকে লিখিবেন 'স্পর্শে শীতল'। শি। এই বারে উহার উপর হাত বুলাইয়া দেখ, কেমন বোধ হয়। বা 'বেস তেলপানা' বোধ হয়। শি। হাঁ তেল-পানা, খস্‌খসে নয়, মসৃণ—কি বলিলাম? বা। মসৃণ। শি। তবে কাচের উপর হাত বুলাইলে উহাকে? বা। মসৃণ বোধ হয়। শিক্ষক কাষ্ঠফলকে 'হাত বুলাইলে মসৃণ' এইরূপ লিখিবেন। শি। কাচকে টিপিয়া দেখ কেমন বোধ হয়? বা। শক্ত। শি। কাচ টিপিলে শক্ত—কঠিন না কোমল? বা। কোমল নয়, কঠিন। শিক্ষক 'টিপিলে কঠিন' এইরূপ লিখিবেন। শি। আপন আপন শ্লেট লইয়া চক্ষুর উপর ধরিয়া দেখ উহার ভিতর দিয়া কিছু দেখিতে পাও কি না? বা। না, কিছুই দেখা যায় না। শি। ঐ কাচখণ্ডকে চক্ষুর উপর ধরিয়া দেখ। বা। উহার ভিতর দিয়া দেখা যায়। শি। যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় তাহাকে স্বচ্ছ বলে—অতএব কাচ? বা। স্বচ্ছ। শিক্ষক কাষ্ঠফলকে লিখিবেন

'চক্ষুর উপর ধরিলে স্বচ্ছ'। শি। আর কোন দ্রব্য স্বচ্ছ আছে বলিতে পার? বা। জল। বা। অভ্র। শি। ভাল, আর আর যত স্বচ্ছ দ্রব্য দেখিতে পাইবে তাহার নাম আমাকে বলিবে। এক্ষণে ঐ কাচ খণ্ডকে হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া দেখ। বা। উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। শি। যে দ্রব্য এইরূপ সহজে ভাঙ্গিয়া যায় তাহাকে কি বলে? বা। পক্কা। বা। ঠুনক্। শি। হাঁ, যে সকল দ্রব্য অল্প আঘাতেই ভাঙ্গে তাহাদিগকে পক্কা বা ভঙ্গ-প্রবণ বলে, অতএব কাচ? বা। ভঙ্গ-প্রবণ। শিক্ষক 'আঘাত করিলে ভঙ্গ-প্রবণ' এইরূপ লিখিয়া পরে সর্ব্ব নিম্নে 'বোধ হয়' লিখিয়া দিবেন। এইরূপে কাচের গুণ সমুদায় কাষ্ঠফলকে সুস্পষ্টরূপে লিখিত হইলে বালকেরা তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবে। পরে শিক্ষক উহা পুঁছিয়া ফেলিবেন এবং বালকেরা আপনাপন শ্লেটে তাহা পুনর্ব্বার লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইবে। কাষ্ঠফলকে যে প্রণালী ক্রমে এই পাঠ লিখিত হইবে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কাচ

দেখিতে	... ...	উজ্জ্বল
স্পর্শে	... ...	শীতল
হাত বুলাইলে	... ...	মসৃণ
টিপিলে	... ...	কঠিন
চক্ষুর উপরে ধরিলে	...	স্বচ্ছ
আঘাত করিলে	... ...	ভঙ্গ প্রবণ

বোধ হয়।

সামান্য প্রত্যক্ষ দ্বারা দ্রব্য সমস্তের যে সকল গুণ অনায়াসে পরীক্ষিত হয় প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপে সেই সকল গুণ শিক্ষা করাইয়া পরে ছাত্রবর্গ বয়োধিক হইলে তাহাদিগের ধারণাশক্তি এবং অন্যান্য মনোবৃত্তিকে উদ্রিক্ত এবং উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইতে হয়। নিম্নলিখিত আদর্শ দর্শনে তাহার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারিবে।

শি। কাচ কৃত্রিম পদার্থ— মনুষ্যেরা উহাকে? বা। প্রস্তুত করে। শি।

যে দ্রব্যকে মনুষ্যেরা প্রস্তুত করে তাহাকে ? বা। কৃত্রিম বলা যায়। শি। অতএব কাচ ? বা। কৃত্রিম দ্রব্য। শি। দেখ মনুষ্যেরা যত দ্রব্য প্রস্তুত করেন সকলেরই উপাদান পূর্ব্বাবধি থাকে—ইষ্টকের উপাদান মৃত্তিকা—কাপড়ের ? বা। উপাদান সূতা—তুলা। শি। ভাতের ? বা। চাউল—জল। শি। কাচের উপাদান বালি এবং ক্ষার অর্থাৎ বালি এবং ক্ষার হইতে—? বা। কাচ হয়। শি। বালি এবং ক্ষারকে একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইলেই—? বা। কাচ হয়। শি। বালি অতি সামান্য বস্তু, ক্ষারও সচরাচর পাওয়া যায়—কাষ্ঠ তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ মাত্রেই—? বা। ক্ষার থাকে। শি। অতএব কাঠ বা খড় দগ্ধ করিলে যে ভস্ম হয়—? বা। তাহাতে ক্ষার থাকে। শি। তবে যদি কোন স্থানে অনেক বালি এবং খড় থাকে এবং ঐ খড়ের রাশিতে অগ্নি লাগিয়া উহা পুড়িয়া যায়—তাহা হইলে—? বা। সেই স্থানে কাচ হইতে পারে। শি। অতি বহুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি বণিক নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে একটী বালুকাময় স্থানে উঠিয়া কালয় নামক বৃক্ষের কাষ্ঠে রন্ধন করিয়াছিল—রন্ধনের পর তাঁহারা দেখিল চুল্লীর ভিতরে অতি 'উজ্জ্বল' 'মসৃণ' কঠিন' এবং 'স্বচ্ছ' একটী পদার্থ জন্মিয়া রহিয়াছে—তাহাই—? বা। কাচ। শি। সেই অবধি কাচ প্রস্তুত করিবার রীতি প্রকাশিত হয়—যদি বণিকেরা ঐ দ্রব্যটী দেখিয়াও তাহাতে মনোযোগী না হইত—তাহা হইলে—? বা। কাচ প্রস্তুত হইত না। শি। কাচ প্রস্তুত না হইলে আমরা কি কি দ্রব্য পাইতাম না—? বা। আর্শি পাইতাম না। বা। সাঁসি পাইতাম না। বা। লণ্ঠন। বা। সেজ। বা। দেয়ালগির। বা। ঝাড়। বা। কাচের গ্লাস। বা। কাচের বাসন। বা। বোতল। বা। শিশি বা। চস্‌মা। শি। আর অনেকানেক যন্ত্রেতেও কাচের প্রয়োজন আছে—অতএব কাচ আমাদিগের অনেক—?। বা। প্রয়োজনে লাগে। শি। ভাল এক্ষণে বল দেখি, কাচের কি কি গুণ থাকাতে কোন্ কোন্ প্রয়োজনসিদ্ধ হয় ? কাচ যদি স্বচ্ছ না হইত, তবে যে যে দ্রব্যের নাম করিলে তাহার কোন্‌টী কোন্‌টী কাচ হইতে প্রস্তুত হইত না ? বা। কাচ স্বচ্ছ না হইলে সার্সি—হইত না। বা। লণ্ঠন হইত না। বা। সেজ হইত না। বা। ঝাড় হইত না। শি। কেন ঐ সকল দ্রব্য হইত না ? বা। স্বচ্ছ না হইলে

আলো আসিতে পারিত না। শি। হাঁ, কাচ স্বচ্ছ না হইলে উহাকে ভেদ করিয়া বাহিরের আলোক ভিতরে এবং ভিতরের আলোক বাহিরে আসিতে পারিত না। বা। কাচ স্বচ্ছ না হইলে আর্সিও হইত না। শি। বিবেচনা করিয়া বল—কাচ স্বচ্ছ থাকিলে কি তাহাতে আর্সি হয়? আর্সির কাচের ভিতর দিয়া কি অন্যদিকের দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়? বা। না, আর্সির পিঠে পারা দেওয়া থাকে, পারা উঠিয়া গেলে আর মুখ দেখা যায় না। আমাদের বাড়িতে একখানি ভাঙ্গা আর্সি আছে। তাহার যেখান যেখান হইতে পারা উঠিয়া গিয়াছে সেইখানে সেইখানে মুখ দেখা যায় না, যেখানে পারা আছে সেখানে দেখা যায়। শি। যথার্থ কথা; কাচের পৃষ্ঠে পারা এবং রাঙ্গমিশ্রিত করিয়া মাখায় তাহাতে ঐ কাচ আর স্বচ্ছ থাকে না এবং থাকে না বলিয়াই উহাতে মুখ দেখা যায়—উহা দর্পণ হয়। অতএব কাচ স্বচ্ছ বলিয়া উহাতে দর্পণ হয় এমত নহে—দেখ কাঁশার ঘটী—বাটী—থালা ভালরূপে সম্মার্জ্জিত হইলে ঐ সকল দ্রব্যেও—?। বা। মুখ দেখা যায়—শি। কিন্তু উহারা স্বচ্ছ নয়—কাঠের বাক্সে যদি উত্তম পালিস হয়, পাল্‌কীতে যদি ভাল বার্ণিসকরা যায়—তাহা হইলে উহাতেও? বা। মুখ দেখা যায়। শি। ভালরূপে সম্মার্জ্জিত হইলে দ্রব্যটী মসৃণ এবং উজ্জ্বল হয়, অতএব কোন দ্রব্য অতিশয় মসৃণ এবং উজ্জ্বল এবং অস্বচ্ছ হইলেই? বা। তাহাতে মুখ দেখা যায়। শি। তাহাতে মুখের প্রতিবিম্ব—? বা। দেখা যায়। শি। যে দ্রব্য প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে তাহাকে বিম্বোদ্গ্রাহী বলে—আর্সি? বা। বিম্বোদ্গ্রাহী দ্রব্য। শি। কিন্তু আর্সি স্বচ্ছ বলিয়া? বা। বিম্বোদ্গ্রাহী হয় না। শি উহা মসৃণ এবং উজ্জ্বল আর—শি। পারা এবং রাঙ্গ মাখাইয়া অস্বচ্ছ হয় বলিয়াই—? বা। বিম্বোদ্গ্রাহী হইতে পারে। শি। ভাল, এক্ষণে বল দেখি, কাচ উজ্জ্বল এবং মসৃণ বলিয়া উহা হইতে আর কি কি দ্রব্য হইয়া থাকে? বা। কাচের বাসন হয়। শি। কাচের বাসন পিত্তল কাঁসার বাসন অপেক্ষা দেখিতে উত্তম এবং উহার মূল্যও? বা। অধিক নয়। শি। তবে উহার দোষ কি? বা। শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। শি। হাঁ কাচ অতিশয় ভঙ্গ-প্রবণ বটে—কিন্তু কাচের বাসনের আর একটী

গুণ আছে। পিত্তল বা কাঁসায় কোন দ্রব্য অধিকক্ষণ থাকিলে কলঙ্ক পড়ে, কাচের বাসনে ?—বা। কলঙ্ক পড়ে না। শি। এই জন্যই কোন দ্রব্য অধিক দিন রাখিতে হইলে তাহাকে—? বা। বোতলে বা শিশিতে পুরিয়া রাখে। শি। এই জন্যই ডাক্তারখানার ঔষধ সকল—? বা। বোতলে বা শিশিতে রাখা যায়।

এই পাঠ সমাপন হইলে শিক্ষক নিম্নলিখিত কতিপয় প্রশ্ন কাষ্ঠ-ফলকে লিখিবেন এবং বালকবর্গ স্ব স্ব শ্লেটে তাহার প্রত্যুত্তর দিবে।

(প্রশ্ন।)

(১) কাচ কিরূপ বস্তু ? (২) কাচের উপাদান কি কি ?

(৩) কাচ কিরূপে প্রস্তুত হয় ?

(৪) কাচ নির্ম্মাণের উপায় কি রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ?

(৫) কাচ কঠিন এবং স্বচ্ছ বলিয়া উহা হইতে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে ?

(৬) কাচের বিম্বোদ্গ্রাহিতা গুণ কি প্রকারে জন্মে ?

(৭) কাচের বাসনের গুণ কি ?

(৮) কাচের বাসনের দোষ কি ?

(উত্তর।)

(১) কাচ কৃত্রিম বস্তু। (২) কাচের উপাদান বালি এবং ক্ষার।

(৩) অগ্নির উত্তাপে বালি এবং ক্ষার গলাইয়া কাচ প্রস্তুত হয়।

(৪) কতকগুলি বণিক কোন বালুকাময় স্থানে রন্ধন করিয়া দেখিয়াছিল যে চুল্লীর ভিতর কাচ জন্মিয়া রহিয়াছে।

(৫) কাচ কঠিন এবং স্বচ্ছ বলিয়া উহা হইতে সার্সি, লণ্ঠন, সেজ, দেয়াল-গির, ঝাড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৬) কাচের পৃষ্ঠে পারা এবং রঙ্গ মিশ্রিত করিয়া মাখাইলে উহা অস্বচ্ছ হয় এবং কাচ স্বভাবতই মসৃণ এবং উজ্জ্বল আছে, সুতরাং উহার বিম্বোদ্গ্রাহিতা গুণ জন্মে।

(৭) কাচের বাসনের গুণ এই যে, উহা মসৃণ ও উজ্জ্বল হয় এবং উহাতে কলঙ্ক ধরে না।

(৮) কাচের বাসনের দোষ এই যে, উহা অতি অল্প আঘাত পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ছাত্রবর্গ আরও বয়োধিক এবং বুদ্ধিমান হইয়া উঠিলে বিশেষতঃ অনেকানেক বিষয়ে তাহাদিগের জ্ঞান জন্মিলে উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি মনোবৃত্তিদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ যত্ন করা আবশ্যক। তজ্জন্য নিম্নলিখিত আদর্শ প্রদর্শিত হইতেছে।

শি। এক খণ্ড কাচ হাতে করিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসিবেন, উহা ভারী বা হাল্কী, (গুরু কিম্বা লঘু) কি বোধ হয়? বা। ভারী বোধ হয়। বা। হাল্কী বোধ হয়। শি। তোমরা কেহ ভারী কেহ লঘু বলিতেছ, তবে আমি কি নিশ্চয় করিব? দেখ, কাচ তুলা অপেক্ষা—? বা। ভারী। শি। কিন্তু লৌহ অপেক্ষা—? বা। লঘু। শি। তবে কোন দ্রব্য গুরু কিম্বা লঘু বলিতে হইলে—? বা। অন্য দ্রব্যের সহিত তুলনা করিয়া বলিতে হয়। শি। এই জন্য অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা করিয়া বলিতে হয় বলিয়া গুরু এবং লঘু ইহাদিগকে 'সাপেক্ষ' শব্দ বলে। পণ্ডিতেরা কোন্ দ্রব্য গুরু এবং কেবা লঘু তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে সেই দ্রব্যকে জলের সহিত—? বা। তুলনা করিয়া থাকেন। শি। কাচ জল অপেক্ষা—? বা। গুরু। শি। জল অপেক্ষা গুরু কিরূপে জানিলে? বা। কাচ জলে ডুবিয়া যায়। শি। কিন্তু কাচের শিশি—? বা। জলে ভাসে। শি। তবে—? বা। তেমন লৌহের কড়া, লোহার জাহাজও জলে ভাসে। শি। তবে জল অপেক্ষা ভারী হইলেই ত কোন দ্রব্য জলে ডুবে না? বা। যদি নিরেট হয় এবং জল অপেক্ষা ভারী হয়, তাহা হইলেই জলে ডুবে। শি। তবে 'নিরেট কাচ জলে ডুবে' এই জন্যই—? বা। কাচকে জল অপেক্ষা ভারী বলা যায়। শি। কাচ স্পর্শে কঠিন কি কোমল? বা। কাচ অতিশয় কঠিন। শি। হাঁ, সচরাচর আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা কাচ কঠিন বটে। কিন্তু কঠিন এবং কোমল এই দুইটীও—? বা। সাপেক্ষ শব্দ। শি। অর্থাৎ—? বা। কোন দ্রব্যকে কঠিন বা কোমল বলিতে হইলে অন্য কাহার অপেক্ষা উহা কঠিন বা কোমল তাহা ভাবিয়া বলিতে হয়। শি। কাচ লৌহ অপেক্ষা কঠিন বটে কি না? বা। কাচ লৌ

অপেক্ষা কঠিন। বা। না, কঠিন নয়, কারণ লৌহের আঘাতে কাচ ভাঙ্গিয়া যায়, অতএব উহা লৌহ অপেক্ষা কোমল। শি। কাচ ইষ্টকের আঘাতেও ভাঙ্গিয়া যায়, কাপড়ের মুটির আঘাতেও ভাঙ্গিয়া যায়, হাতের চাপনেও ভাঙ্গিয়া যায়, কাচ কি ইষ্টক, কাপড় এবং হস্তের মাংস অপেক্ষাও কোমল? বা। না, উহা কঠিন; উহা ভঙ্গপ্রবণ বলিয়াই ভাঙ্গিয়া যায়। শি। তবে লৌহের আঘাতে ভাঙ্গে বলিয়া উহাকে লৌহ অপেক্ষা কোমল—? বা। বলা যায় না। শি। তোমাদের হাতের শ্লেট, এই খড়ি, এবং এই ছুরি, এই তিনের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন? বা। ছুরি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। শি। তাহার নীচে? বা। শ্লেট। শি। তাহার নীচে? বা। খড়ি। শি। শ্লেটের উপর ছুরিরও আঁচড় দিলে শ্লেটের গাত্রে—? বা। দাগ পড়ে। কিন্তু খড়ি দিয়া আঁচড় দিলে—? বা। খড়ি আপনিই ভাঙ্গিয়া শ্লেটে লেপিয়া যায়। শি। অতএব যাহা দ্বারা আঁচড় দিলে দাগ পড়ে, স্বয়ং লিপ্ত হইয়া যায় না সেই দ্রব্যই—? বা। অধিক কঠিন। শি। লৌহের দ্বারা কাচের গাত্রে দাগ দেওয়া—? বা। যায় না, কিন্তু কাচের দ্বারা লৌহের উপর দাগ দেওয়া যায়, অতএব কাচ লৌহ অপেক্ষা কঠিন। শি। কিন্তু কাচের দ্বারাও কাচের গাত্রে—? বা। দাগ দেওয়া যায়। শি। অতএব সমান কঠিন দুইটী দ্রব্যের মধ্যে একটীর দ্বারা অপরটীর উপর—? বা। দাগ দেওয়া যাইতে পারে। শি। আবার সধার ইস্পাতের দ্বারাও কাচের উপর? বা। দাগ দেওয়া যাইতে পারে। শি। অতএব যদি সধার হয় তবে কিঞ্চিন্মাত্র অল্প কঠিন দ্রব্যের দ্বারাও কিঞ্চিন্মাত্র অধিক কঠিন দ্রব্যের উপর? বা। দাগ দেওয়া যাইতে পারে। শি। যে দ্রব্য অধিক কঠিন তাহার দ্বারাই অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, কারণ—? বা। তাহার দ্বারা অন্য সকলের গাত্রে অনায়াসে দাগ দেওয়া যায় বা অন্য সকলকে কাটা যায়। শি। হীরক কাচ অপেক্ষা কঠিন, অতএব হীরকের দ্বারাই—? বা। কাচ কাটিয়া থাকে।

শি। কোন দ্রব্যকে তুলিয়া সেইটী গুরু কি লঘু—তাহাকে টিপিয়া উহা কঠিন কি কোমল—তাহা জানা যায়, কিন্তু কেবল স্পর্শ মাত্র

করিলে—? বা। উহা শীতল অথবা উষ্ণ তাহা জানা যাইতে পারে। শি। কাচকে স্পর্শ করিলে কি বোধ হয়? বা। শীতল বোধ হয়। শি। সচরাচর শীতল বোধ হয় বটে, কিন্তু অতিশয় শীতল জলে কিয়ৎক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার পর যদি কাচ স্পর্শ কর, তবে উহাকে শীতল বোধ হইবে না। বাস্তবিক, যে দ্রব্য আমাদিগের শরীর অপেক্ষা শীতল তাহাকেই আমরা শীতল বলি এবং যে দ্রব্য আমাদিগের শরীর অপেক্ষা উষ্ণ তাহাকেই—? বা। উষ্ণ বোধ করিয়া থাকি। শি। দেখ, শীত কালের রাত্রিতে আমাদিগের শরীর অত্যন্ত শীতল হয় বলিয়া প্রাতঃকালে কূপের জল—? বা। উষ্ণ বোধ হয়। শি। কিন্তু কিঞ্চিৎ বেলা হইলে শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে অতএব তখন—? বা। সেই কূপের জল শীতল বোধ হইয়া থাকে। শি। আবার দেখ, সহজ অবস্থায় তোমার হাত আমার গাত্রে দিলে উহা উষ্ণ বোধ হয়, কিন্তু আমি জ্বরিত হইয়া যদি স্বয়ং উষ্ণ হই, তবে ঐ হাতই—? বা। শীতল বোধ হইবে। শি। অতএব শীতল এবং উষ্ণ ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ, সুতরাং কোন দ্রব্য কত উষ্ণ বা শীতল, ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়াই—? বা। বলিতে পারা যায় না। শি। তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্রের নাম তাপমান। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এই পাঠ সমাপন হইলে শিক্ষক কাষ্ঠফলকে নিম্নলিখিতরূপে ইহার তাৎপর্য্যার্থ সঙ্কেতে লিখিয়া দিবেন, ছাত্রেরা তাহা স্ব স্ব শ্লেটে লিখিয়া পরে বাক্য পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইবে।

কাচ।

কোন্ দ্রব্য গুরু—ইহা নিশ্চয়——হাতে করিয়া——বুঝিতে হয়। গুরু এবং লঘু——শব্দ পরস্পর——পণ্ডিতেরা——সহিত তুলনা করিয়াই দ্রব্য সমস্তকে গুরু বা লঘু——। যে জলে——যায় তাহাকে——বলেন। যে নিরেট দ্রব্য——ভাসে তাহাকে লঘু——। ——কাচ

জলে ডুবিয়া——উহা জল——গুরু——যেমন পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ, কঠিন এবং কোমল এই দুইটীও সেই রূপ——। দ্রব্যের কাঠিন্য——বুঝিতে হয়। যে অধিক——তাহার দ্বারা——দ্রব্যের গাত্রে——কাচের——লৌহের——দাগ দেওয়া যায়। অতএব কাচ——। কিন্তু হীরক——কঠিন। এই জন্য হীরকের——কাটে। কঠিন——অস্ত্র শস্ত্র——শৈত্য এবং——পরস্পর——শব্দ। যে——আমাদিগের——উষ্ণ তাহাকেই——বোধ করি। যে দ্রব্য——অপেক্ষা শীতল তাহাকেই——বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু এক প্রকার——আছে তাহার দ্বারা কোন্ দ্রব্য বাস্তবিক——কে——তাহা নিশ্চয়——সেই যন্ত্রের নাম——। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

বালকেরা এই পাঠের বাক্য সমস্ত পূর্ণ করিয়া লিখিলে উহা নিম্নলিখিত রূপ হইবে।

কাঁচ।

কোন দ্রব্য গুরু কি লঘু ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে, উহাকে হাতে করিয়া তুলিয়া বুঝিতে হয়। গুরু এবং লঘু এই দুইটী শব্দ পরস্পর সাপেক্ষ। পণ্ডিতেরা জলের সলিত তুলনা করিয়াই দ্রব্য সমস্তকে গুরু বা লঘু অবধারিত করিয়া থাকেন। যে নিরেট দ্রব্য জলে ডুবিয়া যায় তাহাকে গুরু বলে। যে নিরেট দ্রব্য জলে ভাসে তাহাকে লঘু বলা যায়। নিরেট কাচ জলে ডুবিয়া যায় অতএব উহা জল অপেক্ষা গুরু।

যেমন গুরু এবং লঘু পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ, কঠিন এবং কোমল এই দুইটীও সেইরূপ পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ। দ্রব্যের কাঠিন্য হস্তের দ্বারা টিপিয়া বুঝিতে হয়। যে অধিক কঠিন তাহার দ্বারা অল্প কঠিন দ্রব্যের গাত্রে দাগ দেওয়া যায়। অতএব কাচ লৌহ অপেক্ষা কঠিন। এই জন্য হীরকের দ্বারা কাচ কাটে। কঠিন দ্রব্য দ্বারাই অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করা যায়।

শৈত্য এবং উষ্ণতাও পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ। যে দ্রব্য আমাদিগের শরীর অপেক্ষা অধিক উষ্ণ তাহাকেই আমরা উষ্ণ বোধ করি। যে দ্রব্য আমাদিগের শরীর অপেক্ষা শীতল তাহাকেই শীতল বোধ করিয়া থাকি।

কিন্তু এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহার দ্বারা কোন্ দ্রব্য বাস্তবিক কত উষ্ণ? কে কত শীতল? তাহা নিশ্চয় নিরূপিত করা যায়। সেই যন্ত্রের নাম তাপমান যন্ত্র।

সপ্তম অধ্যায়।

[ব্যাকরণ পদ এবং বাক্যের অন্বয় করিবার রীতি—শব্দের ব্যুৎপত্তি—বিদ্যালয়ের ব্যবহৃত পুস্তক কতিপয় হইতে উদাহরণ প্রদর্শন।]

প্রচলৎ ভাষা মাত্রেরই ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ হয়। যে সাধু ব্যবহার এবং সাধু প্রয়োগকে মূলস্বরূপ করিয়া বৈয়াকরণেরা শব্দশাস্ত্রের নিয়ম সমস্ত অবধারিত করেন, প্রচলদ্ভাষার পক্ষে সেই সাধু ব্যবহার এবং প্রয়োগ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল থাকাতে বৈয়াকরণদিগের নিয়মগুলিও সুতরাং অব্যাপ্তিদোষে দূষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা এক্ষণকার প্রচলিত ভাষা। অতএব ইহার ব্যাকরণও যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহা অনায়াসেই বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার এই প্রথম উন্নতির সময়। এক্ষণে যে ইহার কতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে তাহারও নিশ্চয় নাই। অতএব এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ব্যাকরণ যে সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া উঠে নাই, তাহাও কোন প্রকারে আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে না। অপিতু, কোন ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা সেই ভাষায় বাক্য রচনার জ্ঞান জন্মে। পরন্তু, প্রচলিত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারা, সেই ভাষাভাষী ব্যক্তিবর্গের সহিত সর্ব্বদা সম্পর্ক রাখিলেই অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মাতৃজাতীয় ভাষায় কথোপকথন করিবার নিমিত্ত ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপদেশ আবশ্যক করে না। এই জন্যই বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে বাঙ্গালার ব্যাকরণ শিক্ষা করা জনসাধারণের বিশেষ ফলদায়ক বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যুত কোন কোন স্থলে ব্যাকরণের সূত্র সমস্ত এমত

নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হয় যে, লোকের নিকট তাহা পাঠ করিতে গেলে একান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ফলতঃ এই সকল নানা কারণে বাঙ্গালার ব্যাকরণ এ পর্য্যন্ত জনসাধারণের নিকট অধিক সমাদৃত হয় নাই। আর যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানেন, তাঁহারা বাঙ্গালার বৈয়াকরণদিগের, 'শব্দ-রূপ' 'ক্রিয়ারূপ' প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকৃতি দর্শনে 'ছাতারের নৃত্য' মনে করিয়া নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও বঙ্গবিদ্যালয় সমস্তের ছাত্রবর্গকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাঙ্গালার ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক বোধ হয়। কারণ যদিও কেবল মাত্র অনুকৃতি দ্বারাই বাক্য রচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে, তথাপি সেই রচনাটী বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না, ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতীত তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ব্যাকরণ জ্ঞান না থাকিলে উত্তম আর্থিকতাও হয় না, সুতরাং সাহিত্য শাস্ত্রের সম্যক অর্থ গ্রহ হইতে পারে না। আর ব্যাকরণ শিক্ষা দ্বারা উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি মুখ্য বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তের সুন্দররূপে পরিচালনা হইয়া, তাহাদিগের সামর্থ বৃদ্ধি হইতে পারে। অতএব ব্যাকরণশাস্ত্র যে শিক্ষার অতি প্রধান অঙ্গ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। শিশুদিগের কোমল মুখে কেবল নিয়মময়-অস্থিসার-সর্ব্বাঙ্গ ব্যাকরণ নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বোধ হয়। প্রথমে তাহারা যে যে পুস্তক পাঠ করিবে, সেই সকল পুস্তকের প্রাত্যাহিক পাঠ হইতেই ব্যাকরণের নিয়ম গুলি ক্রমশঃ শিক্ষা করাইতে হয়। স্বর এবং ব্যঞ্জন, যুক্ত এবং অসংযুক্ত, হ্রস্ব এবং দীর্ঘ, বর্ণগত এই সকল প্রভেদ সর্ব্বাগ্রে শিক্ষণীয়। তাহার পর বিশেষ্য এবং বিশেষণের ভেদ কিরূপ? এবং সর্ব্বনাম কাহাকে বলে? আর কোন্‌গুলি ক্রিয়া পদ? ক্রিয়া বিশেষণ? এবং সম্বন্ধ পদ তথা সম্বন্ধ? এবং কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-অধিকরণাদি কারক সকলের পরস্পর প্রভেদ কি? এ সকল যে প্রকারে বোধ হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করাইতে হইবে। এই সকল শিক্ষার উপযোগী কতিপয় পাঠ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম পাঠ।

অথ, অক, ইহ, উভ,

এই চারিটী শব্দের মধ্যে কোন্‌গুলি স্বর, কোন্‌গুলি ব্যঞ্জন্ বর্ণ? থ, ক, হ, ভ, এই চারিটী হল্ বর্ণের পরে কোন স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় কি না? যদি ঐ স্বরবর্ণটীর উচ্চারণ না করা যায় তবে ঐ চারিটী শব্দ কিরূপ শুনায়? ইত্যাদি—ইত্যাদি—

২য় পাঠ।

আর, আম, ঈত, উঢ়, এধ, ঐব, ওজ, ঔর্ণ, এই সাতটী শব্দের মধ্যে কোন্‌গুলি স্বর, কোন্‌গুলি হল্? আ, ঈ, ঊ, এ, ও, ঔ, ইহারা কিরূপ স্বর? ই—এবং ঈর উচ্চারণ বিশেষ কিরূপ? ইত্যাদি—ইত্যাদি—

৩য় পাঠ।

আঊ, আত্ত, ইত্ম, ঈক্ষ, উন্ন, ঊর্দ্ধ, এস্ম, ঐক্ষ, ওত্ত, ঔধ্ব।

এই সকল শব্দের মধ্যে কোন্‌গুলি স্বর, কোন্‌গুলি হল্? এই সকল স্বরের মধ্যে কোন্‌গুলি হ্রস্ব এবং কোন্‌গুলি বা দীর্ঘস্বর?—সংযুক্ত হল্ কোন্‌গুলি?—'ঊ' কোন্ কোন্ হল্ বর্ণের যোগে হইয়াছে?—'ত্ত' কাহার কাহার যোগে হইয়াছে ইত্যাদি—ইত্যাদি। 'ধ্ব' এর মধ্যে যে 'ধ' এবং 'ব' আছে, যদি তাহাদিগের মধ্যে একটী 'অ' থাকিত, তবে উহার উচ্চারণ কিরূপ হইত? তাহা হইলে সংযোগ হইত কি না? ইত্যাদি—ইত্যাদি।

অনুনাসিক বর্ণ কি কি?—অনুনাসিক বর্ণের মধ্যে কাহার সহিত 'ক' বর্গের যোগ হয়? কাহার সহিত চ বর্গের যোগ হয়? বর্ণমালায় স কয়টী? কোন্ স-এর সহিত কবর্গের সংযোগ হইয়া থাকে? কাহার সহিত ট বর্গের?—যে সকল যুক্ত অক্ষর বহিতে দেখিয়া থাক, তাহার মধ্যে কোথাও খ-এ খ-এ, বা ছ-এ ছ-এ, সংযোগ দেখিতে পাও কি না?—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

৪র্থ পাঠ।

"সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়া করে।"

(শিশু শিক্ষা।)

'বালক' এই শব্দটী একটী বস্তুর নাম। দ্রব্যের নামকে বিশেষ্য বলে—অতএব 'বালক'? আরও দুই একটী বিশেষ্য শব্দ বল। যে শব্দ অন্যের গুণ বা দোষ বুঝায়, তাহাকে বিশেষণ বলে, অতএব 'সুশীতল'—? এই পাঠের মধ্যে আর কোন বিশেষণ শব্দ আছে কি না? 'ভাল আম্র' এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী বিশেষণ কোন্‌টী বিশেষ্য? 'ভাঙ্গা শ্লেট'—এই দুইয়ের মধ্যে কে বিশেষণ, কে বিশেষ্য? বিশেষ্য এবং বিশেষণ দুই থাকে এমত কতকগুলি বাক্য রচনা করিয়া শ্লেটে লেখ। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

৫ম পাঠ।

করা বা হওয়া যে সকল শব্দের দ্বারা বোধ হয়, তাহাদিগকে ক্রিয়া পদ কহে এবং যে করে বা হয় সেই কর্ত্তা, উক্ত পাঠে কোনটী ক্রিয়া পদ? এবং কোনটী বা কর্ত্তৃপদ?—যাহা করে সেইটী কর্ম্ম পদ, উক্ত পাঠে কোনটী কর্ম্মপদ? ক্রিয়ার গুণ বা দোষ যে শব্দের দ্বারা বোধ হয়, তাহাকে 'ক্রিয়া-বিশেষণ' বলে, উক্ত পাঠে কোনটী ক্রিয়া বিশেষণ?। "লোভী রাম শীঘ্র শীঘ্র পাকা আম্রটী খাইল"। এই বাক্যের মধ্যে কোনটী বিশেষণ, কোনটী বিশেষ্য, কোনটী ক্রিয়া বিশেষণ, কেবা কর্ম্মপদ এবং কে ক্রিয়া?।

কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াবিশিষ্ট কতকগুলি বাক্য রচনা করিয়া স্ব স্ব শ্লেটে লেখ। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ পাঠ।

"গোপাল! তুমি ঘোষালদের শ্যামকে দেখিয়াছ?"

(শিশু শিক্ষা।)

এরূপ পাঠ দিবার সময় সম্বোধন এবং সম্বন্ধ ও কর্ম্মপদের চিহ্ন সমুদায় আর সর্ব্বনামের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহার পর ঐরূপ পদ বিশিষ্ট রচনা করাইতে হইবে।

এইরূপে প্রধান "প্রধান পদ সমস্তের নাম এবং প্রকৃতি শিক্ষা হইয়া গেলে তৎপরে বাক্য সমস্তের অন্বয় করাইয়া পাঠ দেওয়া আবশ্যক। তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

৭ম পাঠ।

"উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥"

(শিশু শিক্ষা।)

শি। 'উঠ' এইটী কিরূপ পদ? উহার 'কর্ত্তা' কে? উহার কর্ম্ম নাই, অতএব এইরূপ পদকে কিরূপ ক্রিয়াপদ বলে? 'মুখ' কিরূপ পদ? উহা কোন্ ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ হইয়া আছে? 'পর' এই ক্রিয়ার কর্ত্তৃ পদ কে? 'নিজ' কিরূপ পদ? 'বেশ' কোন্ ক্রিয়ার কর্ম্ম? আপন কাহার বিশেষণ? 'পাঠেতে' কোন্ কারক? 'করহ' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ কে?—অর্থাৎ কি করহ? এই প্রশ্নের উত্তরে কিরূপ পদটী বলিবে? কাহার নিবেশ করিবে? তবে 'মন' কিরূপ পদ? এই প্রকারে অন্বয় করিয়া যদি এই কবিতাটী লিখা যায় তবে কি রূপ হইবে, তাহা লিখিয়া দেখাও।

শেষোক্ত এই প্রশ্নের উত্তরে বালকেরা নিম্নলিখিত রূপে ঐ দুই পংক্তি লিখিবে। যথা——

"হে শিশু! তুমি উঠ, মুখ ধোও, নিজ বেশ পর এবং আপন পাঠেতে মনের নিবেশ করহ"।

এইরূপ অন্বয় করাইয়া 'কথামালা' 'বোধোদয়' এবং 'চরিতাবলী' প্রভৃতি সরলপুস্তকগুলি পাঠ করাইলে ব্যাকরণের অনেক বিষয়ে সুপরিস্ফুট জ্ঞান জন্মিতে পারে। ফলতঃ ঐ সকল পুস্তকের পাঠকালে যদি পূর্ব্বোল্লিখিত কবিতার ন্যায় সরল এবং ভাব পরিশুদ্ধ দুই এক খানি কবিতার পুস্তকও পাঠ করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ ফল দর্শে। বালক বৃন্দ স্বভাবতই কাব্যানুরাগী হয়। তাহারা ছন্দোবন্ধ-বিশিষ্ট পাঠ গুলিকে

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করে, এবং উচ্চৈস্বরে তাহার আবৃত্তি করিতে ভাল বাসে। বালক কালাবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কবিতা পাঠের দ্বারা যে শীঘ্রই ভাষা বোধ এবং ব্যাকরণ বোধ উত্তম হয় তাহা নিঃসন্দেহ এবং কবিতা পাঠ নিবন্ধন যে মানসিক অনেকানেক বৃত্তির সম্যক্ উপকার দর্শে, ইহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব তাদৃশ দুই খানি কবিতার পুস্তক বঙ্গভাষায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে বোধ হয়। এক্ষণকার পাঠ্য পুস্তক সকলে কেবল বিষয়-জ্ঞান, অথবা নীতি জ্ঞান মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে, যাহাতে মনের সাধুতা সরলতা এবং ঔদার্য্য সম্বর্দ্ধিত হয়, বালক-বৃন্দের পাঠোপযোগী এমত কোন পুস্তকই বাঙ্গালায় দেখিতে পাওয়া যায়না।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি বঙ্গ-ভাষায় প্রচলিত যে কতিপয় পুস্তকের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা ব্যাকরণের এই পর্য্যন্ত শিক্ষা করাইয়া পরে ছাত্রবর্গ যেমন অধিক দুরূহ পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিবে সেই সময় অবধি তাহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী সামান্য সামান্য সূত্র সমস্ত শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। উপসর্গ এবং প্রচলিত অব্যয়দিগের নাম তৎপরে ণত্ব এবং ষত্ব বিধানের স্থূল স্থূল নিয়ম শিক্ষা করাইয়া পরে প্রথমে সন্ধির সূত্র সমস্ত শিক্ষা করাইতে হইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' নামক গ্রন্থ হইতে শিক্ষকেরা এই বিষয়ে সমূহ সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাহাতে যে রূপে সূত্র সকল বিস্তৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে, সেই প্রণালীক্রমেই পাঠ দেওয়া কর্ত্তব্য। মূল সংস্কৃত ব্যাকরণে যে প্রকার ব্যাপক নিয়ম সমস্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রথমে সেই প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয় বোধ হয় না। আর প্রত্যেক সূত্রের উদাহরণ বাঙ্গালা হইতে বিশেষতঃ পঠিত পুস্তক সমস্ত হইতেই দেওয়া আবশ্যক।

ঐ উপক্রমণিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া এবং উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন-পূর্ব্বক হল্ সন্ধির শিক্ষা দেওয়াও যাইতে পারিবে। 'শব্দরূপ' শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত বাঙ্গালায় অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে বাক্যের অন্বয় করিতে শিক্ষা হইয়া থাকে, তবে 'শব্দরূপ' শিক্ষা সম্পূর্ণই হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কেবল মাত্র সম্বোধনে যে কোন কোন

শব্দের রূপান্তর হয় তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। শব্দের উত্তর যে সকল স্ত্রীবিহিত প্রত্যয় হয়, তাহারও নিয়ম 'উণক্রমণিকা' হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, শিক্ষক কেবল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। 'কারক' শিক্ষা বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, বাঙ্গালায় কতকগুলি কারক নাই, সেই সকল কারকের অর্থ অব্যয়াদির যোগে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সেই সকল কারকের নাম শিক্ষা দিবার বিশেষ আবশ্যকতা বোধ হয় না। কিন্তু যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী ষট্‌কারকের নাম এবং তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ অর্থ শিখাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও কোন হানি বোধ হয় না, প্রত্যুত কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলেও দর্শিতে পারে। পরন্তু সকল কারক গুলির নাম শিখাইয়া দেওয়া হউক বা না হউক, বাক্যের অন্বয় করাইতে করাইতেই কারকার্থগুলি সুস্পষ্ট হইয়া আইসে, সুতরাং এই প্রকরণে কোন নিয়ম শিক্ষা করিতে হয় না।

বাঙ্গালায় সমাসের ব্যবহার যথেষ্ট হইয়া থাকে, অতএব প্রধান প্রধান কতিপয় সমাসের লক্ষণ ও তাহার প্রত্যেক প্রকারের অনেকানেক উদাহরণ বালকদিগের অবগত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বালকেরা আপনা হইতেই সমাসের অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারে। তদ্ধিতের ব্যবহারও বাঙ্গালায় অনেক হইতেছে। অতএব তদ্ধিত প্রকরণের কতকগুলি নিয়ম দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হয়। কৃৎ-প্রত্যয় বিষয়েও ঐ কথা বক্তব্য। কিন্তু কৃদ্বিহিত প্রত্যয় সমস্ত শিক্ষা করিবার সময় আরম্ভ না হইতে হইতেই "ধাতুর" নাম এবং তাহাদের উত্তর ইচ্ছার্থে, প্রেরণার্থে, অতিশয়ার্থে যে সকল প্রত্যয় হইয়া রূপান্তর হয়, তাহা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে। ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় এবং বাচ্য বাচকের বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত ধাতু সকলের নাম শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়; "হোঁচট খাই" বা "ধরা পড়ি" অথবা "হড়কান' প্রভৃতি ধাতুর রূপ শিক্ষায় কোন বিশেষ ফল হয়, ইহা বোধ হয় না। উল্লিখিত কতিপয় বিষয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রদর্শনার্থ নিম্নে এক একটী উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় প্রশ্নমালা সন্নিবেশিত হইতেছে।

———

স্বরসন্ধি।

'অপরাপর জন্তু যেরূপ স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারে—(চারু-পাঠ ১ম ভাগ)।

শি। এই বাক্যের মধ্যে 'অপরাপর, 'গমনাগমন, 'স্বেচ্ছানুসারে, এই তিনটী পদ কিরূপ? ইহারা প্রত্যেকে কোন্ কোন্ পদের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে? ঐ সকল পদের পরস্পর মিলনের নাম কি? এই সকল স্থলে কোন্ নিয়মানুসারে সন্ধি হইয়াছে? এই প্রকার সন্ধির আরও কতিপয় উদাহরণ পুস্তকের প্রথম পাঠ হইতে বাহির করিয়া লিখ।

এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর বালকেরা শ্লেটে লিখিয়া দেখাইবে। এই রূপে স্বরসন্ধির প্রকরণ উত্তমরূপে শিক্ষা করাইতে পারা যায়।

হল সন্ধির উদাহরণ বাঙ্গালায় অপেক্ষাকৃত অল্প; অতএব তাহা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে।

হলসন্ধি।

শিক্ষক কাষ্ঠফলকে নিম্নলিখিতরূপে কয়েকটী সন্ধির উদাহরণ লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, এই কয়েকটী উদাহরণ দেখিয়া সন্ধির কিরূপ নিয়ম নিশ্চয় করা যায়?

জগৎ + অন্ত = জগদন্ত,
জগৎ + আদি = জগদাদি,
জগৎ + ইন্দ্র = জগদিন্দ্র,
জগৎ + ঈশ = জগদীশ,

আজিকার পাঠ হইতে এইরূপ সন্ধির সকল উদাহরণগুলি সংগ্রহ কর। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

স্ত্রীবিহিত প্রত্যয়।

স্ত্রীবিহিত প্রত্যয় সমস্ত শিক্ষা করাইবার নিমিত্তও এই প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক; যথা—

পুংলিঙ্গ	স্থির	স্ত্রীলিঙ্গ	স্থিরা
"	কৃশ	"	কৃশা
"	ক্ষুদ্র	"	ক্ষুদ্রা
"	নদ	"	নদী
"	হংস	"	হংসী

প্রশ্ন। এই সকল উদাহরণ দেখিয়া অকারান্ত শব্দ সমস্তের স্ত্রীলিঙ্গে কি কি রূপ হইয়া থাকে, বোধ হয়? এইরূপ হইবার অন্যান্য উদাহরণ সংগ্রহ কর।

সমাস।

"মনুষ্যেরা" পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্নসম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হন নাই" —(চারুপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ)।

শি। এই বাক্যের মধ্যে অনেকগুলি সমাসান্ত পদ আছে, এক একটী করিয়া সেইগুলি সমুদায় দেখাইয়া দাও। "অযত্নসম্ভূত" এই পদটী কাহার কাহার সম্মিলনে জন্মিয়াছে? অ' এর অর্থ কি? উহা কেমন সকল স্থলে 'অন্' হয়? 'অযত্ন' এবং সম্ভূত' এই দুই পদের মধ্যে কোন্ শব্দ ছিল? ইহাকে কি সমাস বলে? 'স্বভাব' এবং 'জাত' এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ শব্দ নিবেশিত করিলে ঐ পদের অর্থ সম্পূর্ণ হয়? 'বাস এবং স্থান সমাস হওয়াতে প্রথম পদের কি লুপ্ত হইয়াছে? এ স্থলে যে যে সমাসের দৃষ্টান্ত পাইলে তাহার প্রত্যেক প্রকারের দুই একটী করিয়া উদাহরণ দাও।

ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত শিক্ষা হইলে সাধারণরূপে, অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি সকল প্রকার প্রত্যয় এবং বাচ্যবাচক সমস্ত লিয়া দিয়া ব্যাকরণ পাঠ করাইতে আরম্ভ করা আবশ্যক। তাহারই মধ্যে মধ্যে সূত্র সমস্ত নিরূপিত করিয়া লিখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তদুপযোগী দুইটী পাঠ ও প্রশ্নমালা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"সূর্য্য নিজে তেজোময়, চন্দ্র ও পৃথিবী নিজে তেজোময় নহে, ইহা চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে।" (চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ।)

'দ্বিতীয়' কতকগুলি পূরণবাচকের উত্তর 'তীয়' কাহার উত্তর 'মট' এবং এবং কাহার উত্তর 'থট' হয়। মটের 'ম' ও থটের 'থ' থাকে ইহার উদাহরণ দাও। 'ভাগ' কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে বল? যে কয়েকটী নূতন নিয়ম শুনিলে তাহা লিখিয়া দেখাও।

শি। 'সূর্য্য' শব্দটী সৃ ধাতু হইতে সিদ্ধ—সৃ ধাতুর অর্থ কি? তেজোময় অর্থে তেজঃ স্বরূপ; স্বরূপ কিসের অর্থ? উহাকে 'ময়ট' প্রত্যয় বলে—যে প্রত্যয়ের 'ট' যায় তাহার স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ রূপ হয়?. তেজোময় এস্থলে 'জ' এর 'ও' কার কি প্রকারে আসিল? 'চন্দ্র'—'চদি' ধাতু হইতে সিদ্ধ 'চদি' অর্থে আহ্লাদ, 'চদি'র 'ই' যায় 'চদ' থাকে। যে সকল ধাতুর 'ই' যায় তাহাদিগের পূর্ব্বে 'ন' হয়। "পৃথিবী"—'পৃথু' শব্দ হইতে সিদ্ধ 'পৃথু' অর্থে গুরু। 'পাঠ' কিরূপে সাধ্য? "ঘঙ" প্রত্যয়ের 'ঘ' যায় অতএব যে ধাতুর উত্তর হয় তাহার শেষে 'চ' থাকিলে উহা 'ক' এবং 'জ' থাকিলে উহা 'গ' হয় এবং 'ঞ' যায় বলিয়া উপান্তিম 'অ' 'আ' হয় এবং অন্তিম ইকারাদির বৃদ্ধি হয়। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

"তাঁহার পিতা মাতা অতি দীন গ্রাম-পুরোহিত ছিলেন। লিনিয়স অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্য সমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছেন।" (জীবনচরিত।)

শি। "পিতা' 'মাতা' এই দুইটী পদ কোন কোন শব্দ হইতে হইয়াছে? 'পিতা ঠাকুর'—'মাতা ঠাকুরাণী' এইরূপ বলা যাইতে পারে কি না? 'দীন' কি প্রত্যয়ের যোগে সিদ্ধ হইয়াছে? 'দী' ধাতুর অর্থ ক্ষয় অতএব "দীন" পদের অর্থ কি হইবে? "গ্রাম-পুরোহিত" এই পদে কিরূপ সমাস আছে? "পুরোহিত" শব্দটী কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে? "পুরস্" শব্দের অর্থ কি? "ধা" ধাতুর অর্থ কি? "ধা" ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয় হইয়া অনেকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় চলিতেছে, তাহার কতকগুলির নাম বল। "দরিদ্র" শব্দটী "দরিদ্রা" ধাতু হইতে উৎপন্ন। "দরিদ্রা ধাতু "দুর্গতি"

বুঝায়। অতএব "দীন" এবং "দরিদ্র" এই দুই শব্দের অর্থের ভেদ কিরূপ? "দরিদ্রদশা" এই শব্দটী শুদ্ধ কি না? "অগণ্য" এই পদটী কোন ধাতু হইতে কি প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে? অলোকসামান্য এই পদে কি সমাস আছে? কোন্ শব্দের উত্তর কোন্ তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া "সামান্য" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে? "অলোকসামান্য" এই পদটীর ব্যুৎপত্ত্যধীন অবিকল অর্থ কিরূপ হইবে? "বুদ্ধি" এই শব্দটী কোন্ লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়? উহা কি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে? এই বাক্যের মধ্যে আর কোন শব্দ ঐ প্রত্যয়ের যোগে সিদ্ধ? "মহোৎসাহশীলতা" এই পদে কিরূপ সমাস আছে? "মহৎ" শব্দ যে সমাসে "মহা" হইয়া যায় তাহার আর দুই একটী উদাহরণ দাও। তা প্রত্যয় কি অর্থে হয়? অধ্যবসায় এই পদটী সো ধাতুর উত্তর ঘঙ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ—"অধ্যবসায়" শব্দের অর্থ কি? তাঁহার সৎকর্ম্মে মন যায় কিন্তু অধ্যবসায় থাকে না, এই বাক্যের অর্থ কি? "প্রভাব" ভূ ধাতুর উত্তর "ঘঞ্" প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'অল' করিলে কিরূপ পদ হইত? "বিজ্ঞান" কি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে? "শাস্ত্র"—"শাস" ধাতুর উত্তর "ত্র" প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ—শাসন করা যায় যাহা দ্বারা তাহাকে "শাস্ত্র" বলে—"ত্র" প্রত্যয় কোন্ কারক বাচ্যে হইয়াছে?—'নেত্র' 'পুত্র' 'বস্ত্র'—এই সকল শব্দও ঐ "ত্র" প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। "বিদ্যা" "বিদ" ধাতু হইতে কিরূপে হইবে? "মনুষ্য" "মানুষ" "মানব" তিনটী শব্দেই মনুর অপত্য বুঝায়। "সমাজ" মনুষ্যের এবং "সমজ" পশুদিগের সভাকে বলে—ঐ দুইটী পদ কোন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে? "অগ্রগণ্য" এই পদে কিরূপ সমাস হইয়াছে?

এইরূপে বাঙ্গালার ব্যাকরণ শিক্ষা করাইলে মূল সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠে উত্তম অধিকার হয় এবং যাঁহারা স্বয়ং বঙ্গভাষার শিক্ষক হইবেন তাঁহাদিগের পক্ষে মূল ব্যাকরণ পাঠ করা সম্যক প্রকারেই বিধেয় তাহার সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

(ক্ষেত্রতত্ত্ব—কাষ্ঠিকাপাত—প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞা কতিপয়ের কার্য্যোপযোগিতা প্রদর্শন—দূরত্ব এবং উচ্চতা পরিমাণের সূত্র—বর্গপরিমিতি—ঘন পরিমিতি।)

অতি বালককালাবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষেত্র ব্যবহার শিক্ষা করাইতে পারা যায়, এবং বাল্যাবধি সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিবার চেষ্টা করিলে এই অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিতান্ত নীরস অথবা ব্যর্থ বলিয়া ছাত্রবর্গের বোধ হয় না; প্রত্যুত ইহার শিক্ষাধীন বুদ্ধি বৃত্তি সমস্তের যাবৎ শুভ ফল ফলিবার সম্ভাবনা করা যায় সকলই নির্ব্বিঘ্নে ফলিতে পারে। প্রথমে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠিকা লইয়া দুইটী দুইটী কাষ্ঠিকা এক একটী বালকের হস্তে সমর্পণ করত তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া বসাইয়া দিতে হয়। তাহারা যে যত প্রকারে পারে ঐ কাষ্ঠিকাগুলিকে ঘরের মেজায় অবস্থিত করিবে, এবং যে যেরূপে কাষ্ঠিকাগুলি অবস্থিত হইবে শ্লেটে তাহার অবিকল অনুকৃতি অঙ্কিত করিবে। এইরূপ করা অভ্যস্ত হইয়া আসিলে বালকবর্গকে তিনটী করিয়া কাষ্ঠিকা প্রদান করিতে হয়। ঐ কাষ্ঠিকাদিগকে লইয়াও বালকেরা পূর্ব্ববৎ বিবিধ প্রকারে অবস্থিত করিবে এবং স্ব স্ব শ্লেটে তাহার অবিকল অনুকৃতি লিখিবে। এইরূপে চারিটী, পাঁচটী কাষ্ঠিকার বিবিধরূপ অবস্থান এবং তদনুকৃতি অঙ্কিত করা অভ্যস্ত করাইতে হইবে।

ইহার পর সরল রেখা, লম্ব রেখা, সমান্তরাল রেখা প্রভৃতি রেখা সমস্ত কাষ্ঠ-ফলকে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগের নাম শিক্ষা করাইতে পারা যাইবে। কিন্তু শিক্ষক যেন ঐ সকল সংজ্ঞামাত্র শিখাইয়াই নিবৃত্ত না হয়েন। যাহাতে বালকেরা স্বয়ং ঐ সকল রেখার নাম শ্রবণ মাত্র অঙ্কিত করিতে পারে এবং তাহার প্রত্যেকের নানা উদাহরণ প্রদর্শিত করিতে পারে এমত করিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যথা, পুস্তক, শ্লেট, বোর্ড

এবং ঘরের মেজ্যার ধার সকলই সরল রেখা; প্রাচীর এবং দরজা ঘরের মেজ্যার উপর লম্বভাবে অবস্থিত; ছাদের কড়িকাঠগুলি এবং বরগা সমস্ত পরস্পর সমান্তরাল হইয়া থাকে ইত্যাদি নানা উদাহরণ প্রদর্শিত করা বিধেয়।

ইহার পর ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্র সকলের নাম এবং উদাহরণও তাহাদিগকে অঙ্কিত করিবার প্রণালী শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। তৎপরে বৃত্ত অঙ্কিত করিবার প্রণালী এবং বৃত্ত পরিধি যে কোণের সহিত নিত্য বর্দ্ধনশীল প্রযুক্ত তাহার পরিমাপক হইয়াছে, এবং স্বয়ং ৩৬০ 'অংশে' বিভক্ত বলিয়া কোণের ও পরিমাণ যে ঐ সকল 'অংশ' দ্বারা হইয়া থাকে, এই সকল বিষয় ক্রমশঃ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পরে প্রোট্রাক্টিং স্কেইল প্রস্তুত করিবার রীতি শিক্ষা করাইয়া প্রত্যেক বালককে এক একখানি ঐ স্কেইল প্রস্তুত করাইতে হয়। অনন্তর য়ুক্লিডের প্রথমাধ্যায়ের ৩২ এবং ৪৭, প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াও আবশ্যক। যদিও য়ুক্লিডের মতানুযায়ী প্রমাণ সমুদায় প্রথমে বালকবর্গের হৃদয়ঙ্গম না হয় তাহাতে অধিক হানি নাই। প্রত্যুত পুনঃ পুনঃ গজ্ ও প্রোট্রাক্টিং স্কেইলের দ্বারা মাপিয়া উহাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ বুঝাইয়া দেওয়াই সৎ পরামর্শ। বুদ্ধিমান শিক্ষকেরা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই ঐ প্রতিজ্ঞা দ্বয়ের শত শত প্রয়োগ স্থল দর্শাইয়া ছাত্রবর্গের আনন্দ উদ্ভাবন করণে সমর্থ হইবেন, এবং সেই সময়ে অন্যান্য প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য গ্রহণ করাইতেও পারিবেন। এই স্থলে তাদৃশ উদাহরণের কতিপয় স্থল প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) পাঠশালার কোন গৃহের একটী দ্বারের উন্নতি এবং বিস্তার পরিমাণ করিয়া বালকদিগকে সেই দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী কোণদ্বয়ের পরস্পর দূরত্ব নিশ্চয় করিতে বল, এবং তাহাদিগের উত্তর ঠিক হয় কি না তাহা দড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেখিতে বল।

ঘরের এক কোণ হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ পর্য্যন্ত কত দূর? শ্লেটের এক কোণ হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ পর্য্যন্ত কত দূর? বহির এক কোণ হইতে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ পর্য্যন্ত কত দূর। এই সকল

প্রশ্নের ও পূর্ব্বোক্তরূপে ৪৭ প্রতিজ্ঞার সাহায্যে উত্তর করাইতে পারা যায়।

(২) এই কাগজে যে ত্রিভুজ হইয়াছে, তাহার একটী কোণ ৯০ অংশ অপরটী ৪৫ অংশ, অবশিষ্ট কোণটী কত অংশ হইবে? উহার তিনটী বাহুরই বা পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ? এই আর একটী ত্রিভুজের তিনটী বাহু সমান সমান আছে উহার কোণগুলির পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ এবং তাহারা প্রত্যেকই বা কত অংশ করিয়া হইয়াছে?

বালকেরা ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া প্রোট্রাক্টিং স্কেইল এবং গজের দ্বারা মাপিয়া সেই সকল উত্তরের যাথার্থ্য বুঝিয়া লইবে।

রেখা এবং কোণ পরিমিতির প্রধান প্রধান সূত্র সমুদায় এইরূপে ছাত্রবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহার পর ধরাতল পরিমাণের নিয়ম কতিপয় শিক্ষা করাইতে হইবে। তজ্জন্য একটী ধারাতলিক ইঞ্চি বা অঙ্গুলি প্রস্তুত করিয়া য়ুক্লিডের দ্বিতীয়াধ্যায়ের সংজ্ঞাতে আয়ত ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ভুজদ্বয়ের গুণফলে যে আয়তের ক্ষেত্রফল অবধারিত হয়, ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখান আবশ্যক। তৎপরে আয়তের ক্ষেত্রফলের দ্বারাই যে সমান্তরাল চতুর্ভুজমাত্রের ক্ষেত্রফল অবধারিত হইয়া থাকে, ইহা বুঝাইতে হইবে এবং তাহার পর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যে তাহার সমান উন্নতি এবং ভূমি বিশিষ্ট সমান্তরাল ক্ষেত্রের অর্দ্ধেক লইলেই পাওয়া যায় ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে। এই সকল বিষয় শিক্ষা করাইবার উপযোগী কতিপয় প্রশ্নের আদর্শ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) কোন ক্ষেত্র যদি আয়তের আকারে থাকে এবং তাহার এক দিকে ৫টী এবং তন্নিকটবর্ত্তী অন্য দিকে ৬টী বৃক্ষ থাকে, তবে ঐ ক্ষেত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি বৃক্ষ আছে?

(২) এই কাগজটী সামান্য সমান্তরাল চতুর্ভুজের আকার হইয়া আছে, ইহাকে একটীমাত্র ছেদ দিয়া অবিকল আয়তের আকার কর।

(৩) এই কাগজখানি ত্রিভুজের আকারে আছে ইহাতে আর কত বড় একটী ত্রিভুজ সংযুক্ত করিলে উহা সমান্তরাল চতুর্ভুজের আকার বিশিষ্ট

হইবে?—তাহা সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সমান্তরাল ক্ষেত্রকে আয়তের আকারে পরিবর্ত্তিত কর।

এইরূপ বিবিধ প্রশ্নের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমস্ত ছাত্রবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেলে পরে নানা প্রকার সরল রৈখিক ক্ষেত্রের ফল নিশ্চয় করিতে বলা বিধেয়। তাহা হইলেই ক্ষেত্র সমস্তকে ত্রিভুজে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন এবং রীতি ছাত্রবর্গের বোধগম্য হইবে।

এই পর্য্যন্ত হইলেই য়ুক্লিডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞা যে 'সম-প্রকৃতিক ত্রিভুজদিগের বাহুগুলি সমানুপাতিক হয়,' ইহা শিক্ষা করাইতে হইবে এবং তাহা শিক্ষা হইলেই ভূমি সমস্ত জরিপ করিয়া তাহার অনুকৃতি কাগজে তুলিয়া পরে সেই কাগজ হইতেই যে উহাদিগের ক্ষেত্র ফল নিরূপিত করা যায় তাহার কারণ স্পষ্ট বোধ হইবে।

ফলতঃ গজ্ এবং প্রোট্রাক্টিং স্কেইল্ দ্বারা জ্যামিতি এবং সরল-ত্রিকোণমিতি এই উভয় শাস্ত্রেরই প্রধান প্রধান প্রয়োজন সমস্ত সুসিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ দেবদারু অথবা অন্য কোন কাষ্ঠের একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার পরিধি ৩৬০ অংশে বিভক্ত এবং ঐ সকল অংশ চিহ্নে চিহ্নিত করত তাহার কেন্দ্রে একটী সূক্ষ্ম স্ক্রু দ্বারা একটী নলিকা বিদ্ধ করিয়া এবং সেই স্ক্রু হইতে একটী ওলন দড়ি ঝুলাইয়া যদি একটী বৃত্ত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায় তবে অনায়াসে বৃক্ষ, গৃহ, প্রাচীর প্রভৃতির উন্নতি পরিমাণ করাইয়া বালকবর্গের বিশিষ্ট কৌতূহল এবং আমোদ জন্মাইতে পারা যায় সন্দেহ নাই।

এই যন্ত্রের প্রয়োগ যেরূপে করিতে হয় তাহা একটী উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে।

কোন তাল বৃক্ষের মূল হইতে ৬০ হাত দূরে আসিয়া উক্ত বৃত্ত যন্ত্রের নলিকা দ্বারা ঐ বৃক্ষের শিরোদেশ দেখিতে গেলে ওলন দড়ি হইতে নলিকাটি ১৫০ অংশ উন্নত হইয়াছে দেখা গেল; এক্ষণে বৃক্ষটী কত উচ্চ হইবে ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে গজ্ দ্বারা কাগজে ৬০ হস্তের পরিবর্ত্তে ৬ ইঞ্চি পরিমিত একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার এক প্রান্ত হইতে (১৫০—৯০) ৬০ অংশ পরিমিত কোণ অঙ্কিত কর, পরে প্রথম রেখার অপর প্রান্ত হইতে

লম্ব উত্তোলন কর। সেই লম্বে এবং উক্ত ৬০ অংশ কোণজনক রেখায় সম্পাত হইবে। এক্ষণে ঐ লম্বকে গজ দ্বারা মাপিয়া দেখ উহা ১০ ইঞ্চির অধিক হইবে। সুতরাং যেমন ৬০ হস্তের পরিবর্ত্তে ৬ ইঞ্চি লওয়া গিয়াছে সেই রূপ লইলে দর্শকের চক্ষুর উপর বৃক্ষের উচ্চতা ২০৩ হাত অবধারিত হইবে।

যদি ঐ তাল বৃক্ষের মূলদেশ হইতে পরিমাণ করিতে না পারা যায় তবে প্রথমে কোন এক স্থান হইতে বৃত্ত যন্ত্র দ্বারা উহার শিরোদেশ কত উন্নত হইয়া আছে তাহার কোণ মাপিয়া লও; পরে সেই স্থান হইতে ঐ বৃক্ষের ঠিক্ মূলদেশকে লক্ষ্য করিয়া যতদূর পার অগ্রসর হও, সেই স্থলে গিয়া আবার বৃত্ত যন্ত্র দ্বারা বৃক্ষের শিরোদেশ দর্শন করত কোণ মাপিয়া লও, পরে কতদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছ তাহা নিশ্চয় করিয়া গজ ধরিয়া সমুদায় চিত্রটী কাগজে অঙ্কিত করিলেই বৃক্ষের উন্নতি এবং দূরত্ব উভয়ই নিশ্চিত হইবে।

বস্তুতঃ ক্ষেত্র-তত্ত্ব শাস্ত্রকে প্রথমাবধি ন্যায়দর্শনের তুল্য কঠিন না করিয়া এই সকল রূপে উহার কার্য্যোপযোগিতা দেখাইলে এবং ইহার নানা বিষয়ে অভিরুচি জন্মাইতে পারিলে উত্তম হয়। পরে য়ুক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব পড়াইলে উহা দুরূহ বা নীরস বোধ না হইয়া বিলক্ষণ সহজ এবং অতীব প্রীতিকর বোধ হইতে পারিবে।

ধারাতলিক পরিমাণের নিয়ম শিক্ষা সমাপন হইলেই ঘন পরিমাণের নিয়ম অবগত করাইতে হয়। তজ্জন্য কতকগুলি ঘন চতুষ্কোণ ইঞ্চি বা অঙ্গুলিপরিমাণ প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। উহা শূন্য-গর্ভ কাষ্ঠের বা টিনের হইলেই উত্তম হয়, নচেৎ মম অথবা মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইলেও হইতে পারে। বস্তুতঃ মমের হইলে কোন কোন স্থলে বিশেষ উপকার দর্শে। ঘন দুই ইঞ্চিতে যে ৮টী এক এক ঘন ইঞ্চি থাকে, ঘন তিন ইঞ্চিতে যে ২৭টী এক এক ঘন ইঞ্চি থাকে, এই সকল বিষয় প্রথমে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া পরে বিষম ঘন চতুষ্কোণ সকলের ঘন-ফল যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, এবং বেধের ক্রমিক গুণনের দ্বারা লব্ধ হয় তাহা দেখাইতে হইবে এবং নানা উদাহরণ দ্বারা ঐ সূত্রের প্রয়োগস্থল বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর ত্রিকোণ চতুষ্কোণ প্রভৃতি সূচী সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদিগের ঘন-ফল পরিমাণের রীতি শিক্ষা করাইতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত হইয়া আসিলে বৃত্ত, বৃত্তাভাস, ক্ষেপণী প্রভৃতি রেখা সমস্তের পরিধি এবং ক্ষেত্রফল পরিমাণের সূত্র সমস্ত অভ্যস্ত করিয়া দিবার আবশ্যকতা হইবে। তৎপরে স্তম্ভ, বর্ত্তুল, বৃত্তসূচী প্রভৃতি ঘনপদার্থ সমস্তের পৃষ্ঠফল ও ঘন-ফল জানিবার নিয়ম এবং ঐ সকল আকারের পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ঐ সকল পদার্থের চিত্র সমুদায় এবং এই সকল সূত্রগুলি বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিয়া বিদ্যালয়ের ভিতর স্থানে স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলে ভাল হয়।

পরন্তু যদিও পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমস্তের সূত্র মাত্র বালকবর্গকে অভ্যস্ত করিয়া রাখিতে হয় তথাপি যতদূর পারা যায় পরীক্ষা দ্বারা উহাদিগের প্রমাণ সমস্ত বালকবৃন্দের হৃদ্গত করিবার চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ।

নবম অধ্যায়

[বাচনিক শিক্ষা—পরীক্ষাবিধান—সামান্য বিষয় ঘটিত প্রশ্নমালা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত।]

বঙ্গভাষায় বালকদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত অধিক হয় নাই। অতএব শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য কথোপকথন দ্বারা ছাত্রবর্গকে নানা বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিবার যত্ন করেন। পুস্তক অধিক নাই বলিয়াই বলি, কিন্তু যদি বঙ্গভাষায় রাশি রাশি পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উঠে, তথাপি বাচনিক উপদেশ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা যে কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন হইবে, এমত বোধ হয় না। ইংরাজী ভাষায় সকল বিষয়েই অসংখ্য পুস্তক আছে, কিন্তু কৃতকর্ম্মা ইংরাজী শিক্ষকেরা বাচনিক উপদেশ প্রদানের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুমোদিত শিক্ষাপ্রণালীর একটী আদর্শ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

শিক্ষক। আজি তোমাদিগের নিয়মিত পাঠ সকল সমাপন হইয়াছে। কিন্তু এইক্ষণেও বাটী যাইবার সময় হয় নাই। আর অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্বে ছুটী হইবে। দেখ, আজি পাঠাভ্যাস উত্তম করিয়াছিলে বলিয়া এতক্ষণ অবকাশ পাওয়া গেল। যদি প্রত্যহ এইরূপ কর, তবে আজি যেমন গল্প করিতেছি প্রত্যহ এইরূপ করিতে পারিব। আজি কে কি খাইয়া পাঠশালায় আসিয়াছ, বল।

বালক। ভাত, দাউল, মাছের ঝাল, দুগ্ধ, চিনি, গুড়। শি। তোমরা ভাত, সূপ, প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ভোজন করিয়াছ, তাহার কোন্‌টী কি প্রকারে প্রস্তুত হয় জান? বা। হাঁ—জানি, চাউল জল দিয়া জাল দিলেই ফুটে এবং ফেন গড়াইয়া নামাইলেই ভাত হয়। শি। চাউল হইতে ভাত হয় এবং তাহা খাইয়া আমরা প্রাণধারণ করি। কিন্তু সেই চাউল কি প্রকারে হয়? বা। ধান্য হইতে চাউল হয়। শি। ধান্য হইতে কি প্রকারে চাউল হয়? বা। ধান্‌কে প্রথমে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে দেয়, তাহার পর ঢেঁকিতে ফেলিয়া কুটে, কুটিলেই ধানের খোসা আলাদা এবং চাউল আলাদা হয়। শি। ধান্যকে সিদ্ধ করিতে হয় কেন? বা। সিদ্ধ না করিলে ধানের খোসা ছাড়ে না। শি। তবে কি সিদ্ধ চাউল বই আর অন্য কোন চাউল নাই? বা। হাঁ আছে, আমাদের বাটীতে ঠাকুরের নৈবেদ্যের জন্য আলো চাউল আইসে—সে চাউলকে সিদ্ধ চাউলের সহিত মিশায় না—কিন্তু তাহাকে কি সিদ্ধ করিতে হয় না? শি। ধান্যকে সিদ্ধ করিয়া যে চাউল প্রস্তুত হয়, তাহাকেই সিদ্ধ চাউল বলে—অন্য প্রকার চাউলের নাম, কি বলিলে? বা। আলো চাউল। শি। উহার নাম আলো নয়। বা। আতোব চাউল। শি। আতোব নয়—আতপ চাউল। আতপ শব্দের অর্থ কি?—কোথায়ও কি পড় নাই, 'সূর্য্যের আতপে তাপিত'? বা। আতপ মানে রৌদ্র। শি। যেমন সিদ্ধ চাউলকে অগ্নিতে সিদ্ধ করিতে হয়, তেমনি আতপ চাউলকে—? বা। রৌদ্রে সিদ্ধ—শুকাইতে হয়। শি। ঠিক্ বলিয়াছ, রৌদ্রে সিদ্ধ করিয়াও আতপ তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, আর শুদ্ধ শুকাইয়া লইলেও আতপ চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বা। শুকাইলে ত কঠিন হইবে, তাহাতে খোসা ছাড়িবে

কেন, ঢেঁকিতে ফেলিয়া কুটিতে গেলে সকল চাউলই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইবে। শি। যাহারা ধান্যকে কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া চাউল প্রস্তুত করে, মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দেয় না, তাহাদের চাউল অনেক ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ হয়। কিন্তু কেবল রৌদ্রে শুকাইলেও যে খোসা ছাড়ে তাহার তাৎপর্য্য আছে। ধান্যের খোসায় যত রস থাকে, তদপেক্ষা তাহার শস্যে অধিক—এই জন্য প্রথমতঃ চাউল স্ফীত হইয়া অর্থাৎ ফুলিয়া থাকে। রৌদ্রে দিলে উপরকার খোসার রস অল্প এবং সেই খোসা চাউলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত, অতএব তাহা অধিক সঙ্কুচিত হইতে পারে না—ভিতরকার চাউলের রস শুষ্ক হইলেই সেই চাউল সঙ্কুচিত হয়—সুতরাং ধান্যের খোসায় এবং তাহার শস্যে যে বন্ধন থাকে, তাহা শ্লথ হইয়া পড়ে। এই হেতু শুদ্ধ শুকাইয়া লইলেও ধান্যের খোসা ছাড়িয়া যায়। তোমরা একজন নিকটে আইস, বিশেষ করিয়া দেখাইতেছি। আমি আপনার হস্তের সমুদায় অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া রাখিলাম, তুমি দুই হাতে আমার হাতকে বেষ্টন করিয়া ধর—ধরিয়াছ? দেখ এখন আমি কিঞ্চিৎ বল না করিলে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইতে পারি না। কিন্তু এই একবারে সমুদায় অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিলাম, তোমার হাত, যেমন চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছিল তাহাই রহিল, এবং তুমি টেরও পাইলে না আমি আপনার হাত বাহির করিয়া লইলাম, চাউলেরও—? বা। এইরূপ হয়, উহা প্রথমে রসে ফুলিয়া থাকে, কিন্তু রৌদ্রে দিলে সেই রস শুকাইয়া যায়, এবং চাউল ছোট হইয়া ধান্যের ভিতরে আল্‌গা হইয়া পড়ে। শি। তবে মনুষ্যেরা ধান্য হইতে যে দুই প্রকারে চাউল প্রস্তুত করে, তাহার এক প্রকারের নাম—? বা। সিদ্ধ চাউল, এবং অন্য প্রকারের নাম আতপ চাউল। শি। মনুষ্যের কৃত সামগ্রীকে কি সামগ্রী বলে?—পরমেশ্বর যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নাম স্বাভাবিক, অকৃত্রিম। মনুষ্যকৃত সামগ্রী—? বা। কৃত্রিম শি। তবে চাউলের কৃত্রিম প্রভেদ? বা। দুই; সিদ্ধ এবং আতপ; শি। ইহার স্বাভাবিক প্রভেদ—? ধান্যের প্রভেদ হইতেই হইবে—ধান্য কয় প্রকার কিছু বলিতে পার? বা। এক প্রকার ধান্যকে হৈমন্তিক বলে। বা। এক রকম আউশ ধান আছে। বা। আর এক রকমের

নাম বোরো। শি। এই তিন প্রকার ধান্যের আরও বিশেষ ভেদ আছে। ইহাদিগের চাষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে হয়। এক্ষণে বল দেখি যাহাকে হৈমন্তিক বলে, তাহা কখন জন্মে? তাহার চাষ কি প্রকার? এবং অন্যান্য ধান্য হইতে তাহার বিশেষত্ব কি? অনুমান হয়, তোমরা ইহার কিছুই জান না। কার্ত্তিকের ১৫ই হইতে পৌষের ১৫ই পর্য্যন্ত হেমন্ত ঋতু। হেমন্তে যে ধান্য পাকে তাহারই নাম—? বা। হৈমন্তিক। হৈমন্তিক ধান্যের রোপণ এবং বর্দ্ধন সম্বন্ধে কৃষকদিগের দুইটী কারিকা আছে। চাষাদিগের ভাষা উৎকৃষ্ট সাধুভাষা নয়, কিন্তু তাহারা এই সকল বিষয়ের তথ্য উত্তম জানে। অতএব তাহাদিগের স্থানে অনুসন্ধান করিলে কৃষি কার্য্যের অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। ঐ দুইটী কারিকার একটী এই—

"আষাঢ়ে রোয় দলকে। শ্রাবণে রোয় ফলকে। ভাদ্রে রোয় তুষে। আশ্বিনে রোয় কিষে?"

অর্থাৎ আষাঢ় মাসে হৈমন্তিক রোপণ করিলে অনেক দল অর্থাৎ পাতা জন্মে; ফল উত্তম হয় না। শ্রাবণে রোপণ করিলে? বা। ফল উত্তম হয়। ভাদ্রে রুইলে তুষ অধিক হয়। বা। আশ্বিনে রুইলে কিছুই হয় না। শি। অপর কারিকাটি এই—

"কার্ত্তিকের বিশে না থাকে অফুলা।
অগ্রহায়ণের বিশে না থাকে অপাকা।"

হৈমন্তিক ধান্যের কর্ত্তন পৌষ মাসে হয়। এই জন্য ঐ সময়ে সকলের বাটীতে লক্ষ্মী পূজা হইয়া থাকে। লক্ষ্মী, ধান্যের দেবতা। বৎসরের মধ্যে যত বার লক্ষ্মী পূজা হয়, তত বার ধান্য বিষয়ক কোন কারণ-বশতঃ হইয়া থাকে। ধান্য পাকিলেই লোকে লক্ষ্মী-পূজা করে। ধান্য-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে লক্ষ্মী-পূজা নাই।

শি। হৈমন্তিক ধান্যের যে চাউল, সে অন্য সর্ব্ব চাউল অপেক্ষা উত্তম। তাহার গুঁড়া শীঘ্র উঠে, তাহার ক্ষীর শীঘ্র মরে অর্থাৎ রস ত্বরায় শুষ্ক হয়। অতএব তাহার ভাতও দিব্য সড় সড়ে হয় এবং কদাপি দুষ্পচ হয় না। হৈমন্তিকের প্রকার ভেদও অনেক আছে। তাহার গুটি-

কতকের নাম বলিতেছি ; অধিক বলিলে মনে থাকে না। রামশালি, লক্ষ্মীবিলাস, মধুমাধব, কনকচুর ইত্যাদি। হৈমন্তিক ধান্যের মধ্যে কতকগুলি অতি সুগন্ধ। সেই সকল ধান্যের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বেড়াইতে বড় সুখ হয়; এবং কৃষক লোককে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ নাম ও লক্ষণ অনেক জানিতে পারা যায়।

শি। হৈমন্তিক ধান্যের বিষয় কিঞ্চিৎ শুনিলে, আর কোন্ ধান্যের নাম করিয়াছিলে, পুনর্ব্বার বল। বা। আউশ। শি। আউশ নয়—আশু। আশু শব্দের অর্থ কি—?—"এই কর্ম্মটি আশু সমাপন করিতে হইবে" বলিলে কি বুঝায়? বা। শীঘ্র করিতে হইবে বুঝায়—আশু অর্থে শীঘ্র—। শি। তবে ইহার নামেই বোধ হইতেছে যে এই ধান্য?——। বা। অতি শীঘ্র ফলে। শি। কৃষকেরা কহে।

"আউশ ধানের চাষ। লাগে তিন মাস।"

ইহার রোপণ জ্যৈষ্ঠে এবং কর্ত্তন ভাদ্রে হইয়া থাকে। এই ধান্য হৈমন্তিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ ভূমিতে জন্মে। ইহার প্রকারও অনেক, যথা বেনাফুল, বেউড়ঝাড়, মধুমালতী ইত্যাদি।

শি। দুই প্রকার ধান্যের বিবরণ শ্রবণ করিলে। আর এক প্রকার কি? বা। বোরো। শি। বোরো ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইহার বর্ণ শ্যামল, চাউল ভারী এবং সুসিদ্ধ হইতে অনেক বিলম্ব হয়। বোরো ধান্যের সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। জল পাইলেই বোরো জন্মে। ভূমি ভেদে ইহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকার ভেদও আছে। ফলতঃ এই সকল বিষয় কথায় শুনিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় না; চক্ষে দেখিতে হয়, এবং যাহারা এই সকল কর্ম্মের কর্ম্মী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। আজি ত কেবল ভাতের বিবরণেই সময় শেষ হইল; তবু সমুদায় কথার শেষ হইল না। না হউক, যদি কালি শীঘ্র শীঘ্র পাঠ সমাপন হয়, তবে ব্যঞ্জনের কথা হইবে। কিন্তু কালি কে কি চাউলের ভাত খাও, বাটীতে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিও।

এবম্প্রকার কথোপকথন দ্বারা পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়েরও শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে। পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে যে

গণিত এবং ক্ষেত্রতত্ত্বে সমধিক ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন হয়, এই কথা সামান্যতঃ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, পদার্থতত্ত্বঘটিত অতি প্রধান প্রধান নিয়মগুলি গণিতসাপেক্ষ হয় না। বাল্যাবধি আমরা স্ব স্ব স্বভাববশতঃ আপনা হইতেই পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকি এবং প্রকৃতিগত বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের পরীক্ষা দ্বারা সাধারণ নিয়ম সমস্তও অনুমান করিয়া লই। বস্তুতঃ শৈশবের প্রথম দুই তিন বৎসরের মধ্যে যে কত বিষয়ের কেমন সহজে শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে হয়। একটী ভাষা সমুদায় শিক্ষিত হইয়া যায়—কাল, আকাশ, সংখ্যা জাতি প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা এমত কঠিন, তৎসমুদায়েরও অতি শৈশবে অবরোধ হয়, অনেকানেক দ্রব্যের দোষ গুণ কার্য্যোপযোগিতা এবং ব্যবহার প্রণালীও শৈশবে অবগত হওয়া যায়, আর সেই সময় মধ্যে অন্যের মন বুঝিবার ক্ষমতা অনেকাংশে জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ প্রথম দুই তিন বৎসর বয়সের মধ্যে আমরা যত বিষয় শিখি এবং অধিক বয়সে উদ্রিক্ত হইবার উপযোগী যত প্রকার জ্ঞানের বীজ ঐ সময় মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া যায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশিষ্ট যাবজ্জীবনের মধ্যে এত পুস্তক পাঠ করিয়াও তাহার সমান হইয়া উঠে কি না তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় জন্মে। বাল্যের শিক্ষায় কোন কাল্পনিক নিয়ম শিক্ষা নাই—প্রবলতর কৌতূহল পরিপূরণের আশায় শিশুরা নিরন্তর দ্রব্য সমস্ত লইয়া পরীক্ষাবিধান করিতে করিতেই বিষয় শিক্ষা এবং মনোবৃত্তির উদ্রেক করিয়া লয়। অতএব এই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী হইয়া পদার্থতত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করিতে পারিলে যে, সমগ্র শুভফল দর্শিবার সম্ভাবনা হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে যে বিষয়ের উপদেশ দিতে হইবে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করাইয়া শিশুদিগের হৃদ্গত করাইলেই পদার্থতত্ত্বের শিক্ষা হইবে। ক্রমে ছাত্রবর্গ বয়োধিক হইলে পদার্থ-তত্ত্বগত নিয়ম সকলে গণিতের প্রয়োগ দেখাইয়া তাহাদিগের মনে পুনর্ব্বার অভিনব আনন্দের আবির্ভাব করিতে পারা যাইবে।

কিন্তু পদার্থ-তত্ত্বের বিষয় সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইলে বিবিধ

প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র সমস্ত থাকিলে শিক্ষা দেওয়া সহজ হয় বটে, কিন্তু তাহা না থাকিলেও পরীক্ষা-বিধান করা নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার হয় না। সচরাচর যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহা হইতেই অনেকানেক স্থলে পরীক্ষা বিধান করা যাইতে পারে।

কতিপয় উদাহরণ দ্বারা এই কথার তাৎপর্য্য প্রকট করা যাইতেছে।

(১) বায়ু স্থিতিস্থাপক। একটি শিশির তলভাগকে ছিদ্র করিয়া পরে সেই ছিদ্র কিঞ্চিৎ মম দিয়া বন্ধ করিয়া লও এবং একটি গামলায় অলক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল রাখ।

এক্ষণে, শিশিটিকে বিপর্য্যস্ত ভাবে ঐ গামলার জলে মগ্ন করিতে গেলে উহা সমুদায় মগ্ন হইয়া যাইবে না, শিশির অভ্যন্তরস্থ বায়ু কতক স্থান অবরোধ করিয়া থাকিবে। শিশির উপরে কিঞ্চিৎ অধিক চাপ দিলে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর পর্য্যন্ত মগ্ন হইবে, কিন্তু সেই চাপ তুলিয়া লইলে উহা পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিবে, এবং পরিশেষে শিশির তলভাগের মম খুলিয়া লইলে উহা আপনার ভারেই ডুবিয়া যাইবে, আর সেই সময়ে ছিদ্র দ্বারা বায়ুও নির্গত হইয়া যাইবে। এই সকল ব্যাপারগুলি দেখাইয়া বায়ুর স্থানাবরোধকতা, সঙ্কোচ্যতা, এবং বিস্তার্য্যতা এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি সমুদায় গুণ অতি স্পষ্টরূপে অনুভূত করা যাইতে পারে।

(২) বায়ুর চাপ আছে। একটি পেঁপের ডাল লইয়া তাহার এক দিক সমুদায় জলে মগ্ন করিয়া অপর প্রান্তে মুখ দিয়া শোষণ করিলে জল উঠিয়া মুখের ভিতরে আইসে, কিন্তু ঐ নলের মধ্যভাগে কোন একস্থানে ছিদ্র করিয়া দিলে আর উঠে না।

(৩) পরীক্ষাবিধানে যে প্রকার শিশির বিবরণ করা গিয়াছে, সেই প্রকার শিশিকে প্রথমতঃ জলে ডুবাইয়া পরে বিপর্য্যস্ত ভাবে জল হইতে তুলিতে গেলে স্পষ্টই দেখা যায় যে যতক্ষণ শিশির মুখভাগটী জলের ভিতরে থাকে, ততক্ষণ শিশি হইতে জল বাহির হইয়া পড়ে না; কিন্তু শিশির পশ্চাদ্ভাগের মম খুলিয়া লইবামাত্র, সমুদায় জল উহা হইতে বহির্গত হইয়া যায়। (জল ৩৩ ফুট পর্য্যন্ত এই প্রকারে উচ্চ হইয়া থাকিতে পারে,

পারা জল অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক ভারী, উহা কতদূর উন্নত হইয়া থাকিবে?) এই সকল ব্যাপারের কারণ উত্তমরূপে হৃদ্গত হইলে বায়ুমান এবং বোমাকলের প্রকৃতি সুস্পষ্ট হইবে।

(৪) একটি গ্লাস জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার উপর একখানি মসৃণ প্রস্তর ফলককে বসাইয়া দেও, পরে সাবধানতাপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র ঐ গ্লাস এবং প্রস্তর ফলককে উল্টাইয়া ধর, তাহাতে জলপূর্ণ গ্লাসটী পাথরের উপর উপুড় হইয়া বসিবে, এক্ষণে ঐ গ্লাসের তলভাগ ধারণ করিয়া সমানভাবে তুলিলে প্রস্তর ফলক শুদ্ধ উঠিয়া আসিবে।

সমচতুষ্কোণ এক খণ্ড চর্ম্মের মধ্যভাগে একটি রজ্জু বন্ধন কর, পরে সেই চর্ম্ম খণ্ডকে উত্তমরূপে জলসিক্ত করিয়া তাহাকে একটী মসৃণ কাষ্ঠ ফলকের ঠিক মধ্যভাগে বসাইয়া দেও, এক্ষণে রজ্জু ধরিয়া তুলিলে ঐ কাষ্ঠফলক সমেত উঠিয়া আসিবে। ঐ কাষ্ঠফলকের উপর ভারী বাঠখারা সকল বসাইয়া সমুদায়ের ভার পরিমাণ করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে, চর্ম্ম খণ্ডে যত বর্গ ইঞ্চি স্থান আছে, ততবার সাত সের ভার ঐরূপে উন্নত হইতে পারে। (যে চর্ম্মখণ্ডের ব্যাস ৩ ইঞ্চি তাহার দ্বারা কত ভার এইরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে?)

(৫) তাপ সংযোগে বায়ু বিস্তৃত হয়। কাগজের একটী ঠুলী প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অল্প অল্প টিপিয়া পরে সূত্র দ্বারা বান্ধিয়া তাহার মুখ বন্ধ কর, এক্ষণে ঐ ঠুলীকে অগ্নির তাপে ধরিলে দেখা যাইবে যে, উহার যে সকল ভাগ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তাহা সমুদায় পুনর্ব্বার বিস্তৃত হইয়া উঠে। ঐ কাগজের ঠুলীকে পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে উহা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে।

(৬) একটী কাচের গ্লাসে একখানি কাগজকে কিঞ্চিৎ মম দিয়া আঁটিয়া বসাও, উহাকে অগ্নি সংযুক্ত কর, উহা জ্বলিতে থাকুক, সেই সময়ে ঐ গ্লাসকে উপুড় করিয়া তাহার মুখ ভাগটী কোন পাত্রস্থিত জলে ডুবাইয়া রাখ; যতক্ষণ কাগজটী জ্বলিবে ততক্ষণ গ্লাসের নীচ হইতে জল অপসৃত হইয়া আসিবে, কিন্তু ঐ কাগজ নির্ব্বাপিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকের জল অতিশয় বেগে গিয়া গ্লাসের ভিতর প্রবেশ করিবে, এবং বাহিরের অপেক্ষা গ্লাসের ভিতরে অধিক উচ্চ হইয়া থাকিবে।

উচ্চ হইয়া উঠে কেন ইহা বুঝাইতে হইলেই বায়ুর রাসায়নিক প্রকৃতি বলিয়া দিয়া কোন বস্তু দগ্ধ হইলেই যে তাহার সহিত অম্লকর-বায়ু যাইয়া মিশে, ইহা বুঝাইতে হইবে।

(৭) একটী বোতলের অর্দ্ধভাগ জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখ কাকের দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ কর। পরে সেই কাকে দুইটী নল পরিহিত করাইয়া একটী নলকে জলের ভিতর পর্য্যন্ত আর একটীকে জলের বাহির পর্য্যন্ত প্রবেশিত কর। এক্ষণে যে নলটী জলের বাহির পর্য্যন্ত আছে, তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বোতলের ভিতর হইতে জল উঠিয়া অপর নলের মুখ দিয়া অতি সুন্দর ফুয়ারার আকার হইয়া পড়িতে থাকিবে।

(৮) জল কিরূপে ফোটে। একটী জলপূর্ণ পাত্রকে অগ্নির উপর চড়াইয়া উহা স্ফুটিতে আরম্ভ হইবামাত্র উহাতে অল্পে অল্পে সুরকীর গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া দেখ, পার্শ্বে যেগুলি পড়িল সেগুলি ডুবিয়া যাইবে, মধ্যের গুলি ক্রমশঃ কতকদূর উন্নত হইয়া উঠিবে, আবার ডুবিবে ইত্যাদি।

(৯) একটী শিশির অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত স্ফুটন্ত জলে পূর্ণ করিয়া উহার মুখ কাক দিয়া আঁট, শীঘ্রই স্ফোটন নিবারিত হইবে, তাহার পর শিশির উপরিভাগে শীতল জল প্রক্ষেপ করিলে পুনর্ব্বার ভিতরের জল স্ফুটিয়া উঠিবে; এইরূপ দুই তিন বার পর্য্যন্ত হইতে পারে। জলের উপর চাপ অল্প থাকিলে উহা শীঘ্র ফোটে এবং অধিক চাপ থাকিলে বিলম্বে ফোটে, তাহা এই পরীক্ষা দ্বারাই স্পষ্টীকৃত হইতে পারে।

(১০) আপেক্ষিক গুরুত্ব। একটী নিক্তী বাটখারা এবং জলপাত্র থাকিলেই দ্রব্যাদির আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাণ করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। যথা—

একটী প্রস্তর খণ্ডকে প্রথমে ওজন করিয়া দেখা গেল, উহা এক ছটাক ভারী, পরে জল পরিপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করাতে যে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল তাহা অন্য পাত্রে ধরিয়া পরে ওজন করিলে সেই জল সিকি ছটাক হইল, ঐ প্রস্তর খণ্ড জল অপেক্ষা কত ভারী হইবে?

(১১) শিশির কিরূপে হয়?—এক ভরি পরিমাণ উর্ণা লইয়া কোন দিন সন্ধ্যার সময়ে তাহাকে চারি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ঘাসের উপর একভাগ কাচ পাত্রের উপর, এক ভাগ ছাদের উপর এবং এক ভাগ মৃত্তিকার উপর রাখিয়া পরদিন প্রাতে ওজন করিয়া দেখিলে ঐ চারি ভাগ উর্ণার ভার পরিমাণের বিলক্ষণ তারতম্য বোধ হইবে।

(১২) তাপ পরিচালকতা। কোন ধাতু পাত্রের উপর এক খণ্ড কাগজকে যদি আঁটিয়া ধরিয়া দীপ শিখায় ধরা যায়, তবে ঐ কাগজ পুড়ে না, কিন্তু কাষ্ঠের উপর ঐরূপে ধরিয়া অগ্নি সংযুক্ত করিলে উহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হয়।

(১৩) তাপ শোষকতা। দুই খানি শ্লেটের এক খানিতে খড়ি এবং অপরটীতে কয়লা ঘর্ষণ কর, উভয় শ্লেটকেই রৌদ্রে সমান ক্ষণ রাখ, পরে স্পর্শ করিয়া দেখ, কয়লা মাখান শ্লেটটী অধিক উষ্ণ বোধ হইবে।

(১৪) বর্ণ। ঘরের সকল দ্বার বন্ধ করিয়া কোন একটী ছিদ্র দ্বারা একটী আলোক রশ্মি প্রবিষ্ট করাও, সেই আলোক রশ্মিকে কাল, সাদা, লাল, প্রভৃতি নানা বর্ণের দ্রব্যের উপর ধরিয়া দেখ।

(১৫) আঘাত-প্রতিঘাত-কোণ সমান হয়। একখানি দর্পণ লইয়া তাহার সম্মুখ ভাগে কোন এক দ্রব্য রাখিয়া দেও, সেই দ্রব্য হইতে ঐ দর্পণের কোন স্থানে লম্ব না হইয়া পড়ে এমত একটী সরল রেখা টান, পরে দর্পণের সেই স্থান হইতে একটী লম্ব টান এবং প্রথম রেখা দ্বারা লম্বের সহিত যেরূপ কোণ হইয়াছে, লম্বের অপর পার্শ্বে তত বড় একটী কোণ কর; পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যকে সেই কোণে দেখা যাইবে।

(১৬) উভকুব্জ দর্পণে বিপর্য্যস্ত প্রতিবিম্ব হয়। একখানি চসমার গ্লাস লইয়া হাত বুলাইয়া দেখ, উহার মধ্য ভাগ উচ্চ বোধ হয় কি না; যদি উচ্চ বোধ হয়, তবে একটী দীপ শিখার সমক্ষে ঐ গ্লাসখানি ধরিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে একখানি শুভ্র বর্ণ কাগজ লইয়া ক্রমশঃ ঐ চসমার নিকটে আনয়ন করিতে করিতে দেখিতে পাইবে যে, কোন একটী স্থানে ঐ কাগজের উপর দীপ শিখার একটী সুন্দর প্রতিবিম্ব হইয়া আছে। সেই প্রতিবিম্বে শিখার অগ্রভাগ নীচের দিকে দৃষ্ট হইবে।

(১৭) আলোকের ভঙ্গুরতা। একটী গামলা বা অন্য কোন জলপাত্রের তলভাগে একটী টাকা রাখিয়া দিয়া ক্রমশঃ তাহার নিকট হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে থাকে; কিয়ৎ দূর গমন করিলে ঐ টাকাটীকে আর দেখিতে পাইবে না। কিন্তু যদি সেই সময়ে অন্য কেহ ঐ গামলায় জল ঢালিয়া দেয়, তবে ঐ টাকা পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইবে। ফলতঃ এইরূপ পরীক্ষা বিধান শত শত প্রকারে করা যাইতে পারে, এবং ইহা দ্বারা পদার্থবিদ্যার অনেকানেক বিষয় শিক্ষা করাইতে পারা যায়, সমধিক গণিত বিদ্যা, অথবা বহুমূল্য যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ এইরূপে ছাত্রবর্গের বিবেচনা এবং দর্শন শক্তির সমধিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে; এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে সামান্য বিষয় ঘটিত প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করায় এবং তত্তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে অনুসন্ধিৎসু করিবার যত্ন করায় শিক্ষার প্রকৃত ফলই দর্শিয়া থাকে। তাদৃশ কতকগুলি প্রশ্ন এইস্থলে লিখিয়া দেওয়া যাইতেছে।

(১) ছেলেরা যে সকল কাগজের নৌকা প্রস্তুত করে, তাহাদিগের তলায় তৈল মাখাইলে অধিকক্ষণ ভাসে নচেৎ শীঘ্র ডুবিয়া যায়, ইহার কারণ কি?

(২) কোন কোন কীট জলের উপর দিয়া চলিয়া বেড়ায়, তাহারা ডুবিয়া যায় না কেন?

(৩) কচুপাতার উপর যে জল পড়িয়া থাকে তাহাতে কচুপাতা ভিজিয়া যায় না কেন?

(৪) মিশ্রির পানা করিতে হইলে মিশ্রিকে কাপড়ে বান্ধিয়া ভিজাইলে উহা শীঘ্র গলিয়া যায় কেন?

(৫) লোকে বলে যে, ঘরে আগুন লাগিলে তাহার নিকট ঝড় বয়, এই কথার মূল কি?

(৬) কোন পাত্রে আঘাত লাগিয়া শব্দ হইতেছে এমত সময় ঐ পাত্রকে স্পর্শ করিলেই শব্দ থামে কেন?

(৭) বিদ্যুদ্দর্শনের ৫ সেকেণ্ড পরে যদি বজ্রধ্বনি শুনা যায়, তবে মেঘ কতদূরে আছে নিশ্চিত হইতে পারে?

(৮) যে রাত্রিতে গঙ্গায় জোয়ার পূর্ণ থাকে সেই রাত্রিতে কলিকাতায় তোপের শব্দ অধিক শুনা যায়, ইহার কারণ কি।

(৯) দন্তের দ্বারা কোন সূত্রের এক দিক এবং হস্ত দ্বারা তাহার অপর দিক টানিয়া ধরিয়া যদি ঐ সূত্রকে সেতারের তারের ন্যায় করিয়া বাজান যায়, তবে নিজের কর্ণে যেমন সুন্দর শব্দ শুনা যায় অন্য কেহ তেমন শুনিতে পায় না, ইহার কারণ কি?

(১০) বাহাদুরী কাঠ পরীক্ষা করিবার সময় একজন ঐ কাঠের এক দিকে কাণ দিয়া থাকে, আর এক ব্যক্তি অন্যদিকে হাতুড়ীর দ্বারা আঘাত করে, এইরূপ কি জন্য করে এবং উহা দ্বারা কি জানা যায়?

(১১) শীতকালে ঘৃত, নারিকেল তৈল প্রভৃতি অনেকানেক স্নেহ দ্রব্য জমাট বান্ধিয়া থাকে, গ্রীষ্মে তরল হয়, তাহার কারণ কি?

(১২) শীত কালের প্রত্যুষে নদী এবং কূপের জল উষ্ণ বোধ হয়, অধিক বেলা হইলে আবার শীতল বোধ হয়, উহার কারণ কি?

(১৩) ধাতুপাত্র মাত্রেই সচরাচর স্পর্শে শীতল বোধ হয় কেন?

(১৪) বরফ আনিবার সময় কম্বল মুড়িয়া আনে কেন?

(১৫) কাঁচা ফল গাছ হইতে পাড়িয়া খড়, তুষ, চাপা দিয়া না রাখিলে ঐ সকল ফল ভাল হইয়া পাকে না কেন?

(১৬) অন্ধকার ঘরে মিশ্রি ভাঙ্গিলে উহা হইতে অগ্নি কণা বাহির হয় কেন?

(১৭) শীতকালে প্রাতে নিশ্বাস হইতে বাষ্প নির্গত হয় কেন?

(১৮) শীতকালে দক্ষিণবায়ু বহিলেই কোয়াসা অথবা মেঘ দেখা দেয় কেন?

(১৯) ভাতের হাঁড়িতে শরা চাপা থাকিলে শীঘ্র সিদ্ধ হয়, ইহার কারণ কি?

(২০) ব্যঞ্জনের তরকারি সিদ্ধ না হইতে হইতে তাহাতে লবণ দিলে ব্যঞ্জন উত্তম সিদ্ধ হয় না, এই কথার কোন তাৎপর্য্য আছে কি না?

(২১) পর্ব্বতের উপর অল্প আলে জল ফুটে, এই কথা সত্য হইতে পারে কি না?

(২২) বৃষ্টিতে ভিজিলে বৃষ্টির জল অপেক্ষা ভিজা কাপড় অধিক শীতল বোধ হয়, ইহার কারণ কি ?

(২৩) বেলে কলসীতে জল রাখিলে অধিক শীতল হয় কেন ?

(২৪) দোয়াতের কালী দুই এক দিন থাকিলে ঘন হইয়া উঠে কেন ?

(২৫) অগ্নিতে জল দিলে উহা নির্ব্বাপিত হয় কেন ?

(২৬) অগ্নি শিখা সূচ্যগ্র হইয়া উঠে কেন ?

(২৭) অগ্নিতে বাতাস দিলে অগ্নির বৃদ্ধি হয় কেন ?

(২৮) দীপ শিখায় ফুৎকার দিলে উহা নিবিয়া যায় কেন ?

(২৯) রন্ধনশালায় অধিক কালবর্ণ ঝুল পড়ে কেন ?

(৩০) মসাল জ্বালিয়া তাহার ঊর্দ্ধভাগে প্রদীপ ধরিয়া রাখিলে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, ইহার কারণ কি ?

(৩১) চুনের জলের উপর হাই দিলে ঐ জলের উপর কি নিমিত্ত শর পড়িয়া যায় ?

(৩২) গ্রীষ্ম বোধ হইলে শরীরে বাতাস করিলে শীতল বোধ হইবার কারণ কি ?

(৩৩) অতি পরিষ্কার বঁটীতেও কোন ফল কাটিলে সেই ফলের গায়ে কাল দাগ পড়ে কেন ?

(৩৪) গ্রীষ্মকালে পর্য্যুষিত অন্নব্যঞ্জন শীঘ্র টক হইয়া যায়, শীতে তাহা হয় না, ইহার কারণ কি ?

(৩৫) জলে ফেলিলে সকল দ্রব্যকেই হাল্কী বোধ হয় কেন ?

(৩৬) রাত্রিকালে মাথার উপর আকাশে যত নক্ষত্র দেখা যায়, আকাশের চতুর্দ্দিকে তত দেখা যায় না, ইহার কারণ কি ?

(৩৭) প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি করা যায়, অন্য সময়ে পারা যায় না, ইহার হেতু কি ?

(৩৮) প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় চন্দ্র এবং সূর্য্যকে অধিক বড় দেখা যায়, ইহার কারণ কি ?

(৩৯) একখানি টীকা বা কয়লার কিয়দ্দূর অগ্নিতে ধরাইয়া সেইটীকে শীঘ্র শীঘ্র নাড়িলে যেন আলোকময় একটা চাপ দর্শন হয় ইহার কারণ কি ?

(৪০) চন্দ্র পরিবেশ চন্দ্রের নিকটে হইলে বিলম্বে জল হইবে, এবং দূরে হইলে জল শীঘ্র হইবে, এই জনপ্রবাদের কোন মূল আছে কি না?

(৪১) ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতিতে তৈল মাখাইয়া রাখিলে মড়িচা ধরে না, নচেৎ মড়িচা ধরে, ইহার তাৎপর্য্য কি?

(৪২) বৃদ্ধ লোকেরা অনেকেই চসমা ব্যবহার করেন কেন?

(৪৩) দূরের দ্রব্যকে ছোট এবং নিকটের দ্রব্যকে বড় দেখায়, ইহার কারণ কি?

(৪৪) ইংরাজী কালীতে লিখিলে প্রথমে জলের ন্যায় দাগ পড়ে, তাহার পর কাল হইয়া উঠে—কি হেতু এইরূপ হয়?

(৪৫) কলমের মুখ চেরা না থাকিলে লেখা যায় না কেন?

(৪৬) বিদ্যুৎপাত হইলে বৃক্ষাদি চিরিয়া যায় কেন?

(৪৭) মেঘ করিলে স্ত্রীলোকেরা ঘটি বাটী প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য সমস্ত ঘরের ভিতরে সরাইয়া আনে কেন?

(৪৮) ঘুঁটের ছাইয়ের একদিক জলে ডুবাইলে সমুদায় ভিজিয়া উঠে কেন?

(৪৯) গাছের ডালের অগ্রভাগ ধরিয়া টানিলে ডাল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তাহার গোড়া ধরিয়া টানিলে ডাল ভাঙ্গে না, ইহার কারণ কি?

(৫০) বাখারি চুণে জল দিলে উহা উষ্ণ হইয়া উঠে কেন?

এইরূপে সামান্য বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসমুদায়ের মীমাংসা করিয়া দিলে সুচারুরূপে পদার্থ বিদ্যার শিক্ষা হইতে পারে। বহি ধরিয়া পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা এই প্রণালী সমধিক ফলোপধায়ক বোধ হয়। এইরূপে প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ও শিক্ষা করাইতে পারা যায়। তদ্বিষয়ে অধিক বাহুল্য বর্ণন না করিয়া প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধীয় এবং উদ্ভিজ্জ বিদ্যা সম্বন্ধীয় দুইটী পাঠের স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যাইবে।

১।—উদ্ভিদ মাত্রেই দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার এক ভাগের পুষ্প জন্মে, অপর উদ্ভিদের পুষ্প হয় না।

২।—যাহাদিগের পুষ্প হয় তাহারা আবার তিন প্রকার। এক প্রকা-

শিক্ষক। গোপাল! সর্ব্বদাই তোমার পীড়া হয়, এবং তজ্জন্য তুমি পাঠশালাতে অনুপস্থিত থাক। অতএব আমার ইচ্ছা হয় তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আহার ব্যবহারের যেরূপ নিয়ম করিলে এমত ব্যামোহ না হইতে পারে, তাহার সদযুক্তি নির্দ্ধারণ করি; কিন্তু তোমাদিগের বাটী কোথায় জানি না; আমাকে পথ বলিয়া দেও।

গোপাল। আমাদিগের বাটী যাইতে হইলে পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া ঠিক পশ্চিম মুখে যাইতে হয়, তাহার পর বড় রাস্তায় পড়িয়া দক্ষিণ মুখে গেলে ডানি দিকে একটি রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়; খানিক সেই রাস্তায় গিয়া ফের দক্ষিণমুখ হইতে হয়, সেই রাস্তায় দুই, তিন চারি খানি বাটীর পর আমাদিগের বাটী। শি। তুমি ঠিক বলিয়া থাকিবে; কিন্তু একবার শুনিলে এত স্মরণ থাকে না। তুমি এই খড়ি খানি লইয়া ঐ বোর্ডের উপর সমুদায় পথটি অঙ্কিত করিয়া দেখাও। বোর্ডের উপরি ভাগ উত্তর দিক, অধো ভাগ—? গো। দক্ষিণ দিক। শি। তুমি কোন্ মুখে দাঁড়াইয়া আছ? গো। উত্তর মুখে। শি। তবে এই বোর্ড এমন হইয়া আছে যে, এই পাঠশালার যে দিকটি যে দিকে বোর্ডেরও সেই দিক্‌টি সেই দিকে আছে। তবে বোর্ডের পূর্ব্বদিক্ কোথায়? গো। আমার ডানি হাত যে দিকে বোর্ডের সেই দিক্ পূর্ব্ব। শি। এইক্ষণে এই বোর্ডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সমুদায় দিক গুলির নাম যথা স্থানে লিখ।—লিখিলে? একটী বিন্দু দ্বারা পাঠশালার স্থান নির্দ্দিষ্ট কর। করা হইল? তবে পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া প্রথম কোন্ মুখে যাইতে হয়? গো। পশ্চিম মুখে, সেই জন্য পশ্চিম দিকে একটি রেখা টানিলাম, তাহার পর দক্ষিণ মুখে যাইতে হয়, অতএব দক্ষিণ দিকে আর একটি রেখা টানিলাম। শি। দক্ষিণ মুখের রেখা পশ্চিম দিকের রেখা অপেক্ষা এত দীর্ঘ করিলে কেন? গো। পশ্চিমে যত পথ যাইতে হয়, দক্ষিণে তাহার অপেক্ষা অধিক যাইতে হয়, এই জন্য দক্ষিণ মুখের রাস্তা এত বড় করিলাম। শি। উত্তম করিয়াছ; দক্ষিণের রাস্তা পশ্চিমের রাস্তা অপেক্ষা কত দীর্ঘ হইবে? গো। চারি বা পাঁচ গুণ হইবে। শি। তবে পশ্চিমের রেখাটী মাপিয়া দেখ কয় অঙ্গুলি দীর্ঘ করিয়াছ, দক্ষিণ মুখের রেখা তাহার

চারি বা পাঁচ গুণ করিতে হইবে। করিলে—? তাহার পর কোন্ মুখে কত দূর যাইতে হয়? গো। পশ্চিম মুখে প্রায় ইহার অর্দ্ধেক পথ। শি। অঙ্গুলি দ্বারা পরিমাণ করিয়া সেইরূপ কর। তাহার পর—? গো। পুনর্ব্বার দক্ষিণ মুখে অতি অল্প যাইতে হয়। শি। তাহাই লেখ। ঐ বিন্দুটী কি হইল? গো। ঐটি আমাদিগের বাটী। শি। এই চিত্র দেখিয়া আমি অক্লেশে তোমার বাটী যাইতে পারি। হে বালক সকল! তোমরাও কি এই পথ দেখিয়া গোপালের বাটী যাইতে পার না? বা। হাঁ, অনায়াসেই পারি।

শি। দেখ, কথায় বলিলে কোথায় কাহার বাটী—কোথায় কোন্ স্থান—কখনই তেমন বুঝিতে পারা যায় না, চিত্র করিয়া দেখাইয়া দিলে কেমন স্পষ্ট বুঝা যায়। এই জন্যই যে সকল লোক দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই দেশের ম্যাপ, অর্থাৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন। আমরা সেই সকল দেশে না গিয়াও ঘরে বসিয়া কোথায় কোন্ দিকে কোন নগর, নদী বা পর্ব্বত আছে, স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। অতএব যদি তোমরা নানা দেশ বিদেশের বিবরণ জানিতে চাহ, তবে সর্ব্বদা মানচিত্র লইয়া আলোচনা করিও! এক্ষণে গোপাল যে প্রকারে আপনাদিগের বাটী যাইবার পথ দেখাইয়া দিল, আমিও আমাদিগের দেশের কিয়দংশের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া দেখাই—আমরা কোথায় আছি?—এই নগরটীর নাম কি?—বা। কলিকাতা। শি। তবে এই বিন্দুটী যেন কলিকাতা হইল। কলিকাতার পার্শ্বে কোন্ নদী আছে? বা। গঙ্গা। শি। ইহার নাম গঙ্গা নয়—ইহার নাম ভাগীরথী—ভাগীরথীর কোন পারে কলিকাতা? বা। পূর্ব্ব পারে। শি। তবে এই বক্র বক্র রেখাটী যেন ভাগীরথী নদী হইল। নদীকে কেন এমন বক্র করিয়া লিখিলাম বলিতে পার? বা। গঙ্গা—ভাগীরথীত সোজা হইয়া আইসে না। শি। তোমরা কেমন করিয়া জানিলে যে, ভাগীরথী নদীর ঠিক্ সরল গতি নয়?—জল কখনই সরল রেখাক্রমে চলে না, উঠানে এক ঘটী জল ঢালিয়া দিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—বা। উচ্চ স্থান সম্মুখে ঠেকিলেই জল সেই খানে বাঁকিয়া নিম্ন দিয়া যায়। শি। উত্তম; যদি এক এক ক্রোশ পথকে এক

এক অঙ্গুলি পরিমাণ করিয়া কলিকাতার ঠিক উর্দ্ধভাগে ছয় বা সাত অঙ্গুলি অন্তরে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এই বিন্দুটী লিখি, তবে ইটী কি হইল? বা। ঐটী একটী নগর হইল, উহা কলিকাতার উত্তর—ছয় বা সাত ক্রোশ দূর এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থিত। শি। উহার নাম শ্রীরামপুর—উহা পূর্ব্বে দিনামার জাতির অধিকার ছিল, দিনামারেরা ইংরাজদিগের ন্যায় একটী ইউরোপীয় জাতি। উহাদিগের দেশ কোথায়? কি প্রকার? পরে জানিতে পারিবে। শ্রীরামপুরের ঠিক অপর পারে যে বিন্দুটী দিলাম ইহা? বা। একটী নগর। শি। ইহার নাম বারাকপুর—ইহাকে চানকও বলে। ভাল, বল দেখি শ্রীরামপুরটী কোন জাতীয় নাম?—রাম, কৃষ্ণ, গোপাল, এই সকল কি ইংরাজের নাম হয়? বা। এই সকল নাম বাঙ্গালির। শ্রীরামপুরও ইংরাজি নাম নহে, উহাও বাঙ্গালির রাখা নাম। শি। বারাকপুর সেরূপ নহে; ইংরাজীতে 'বারাক' শব্দে পল্টনের ছাউনি, অর্থাৎ সৈন্যের আবাস স্থান বুঝায়। এই নগরটি ইংরাজদিগের স্থাপিত, এই জন্য ইহার নাম ইংরাজী মূলক হইয়াছে; বারাকপুরে অনেক সিপাহী থাকে এবং ঐ স্থলে আমাদিগের বড় সাহেবের অতি রমণীয় উদ্যান আছে। বারাকপুরের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ হইতে পাঁচ অঙ্গুলি পরিমাণ একটী সরল রেখা ঠিক পূর্ব্ব মুখে টানিলাম। ভাগীরথীর তীর হইতে ইহা কত দূর হইল? বা। পাঁচ ক্রোশ দূর হইল। শি। তাহার পর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে রেখাটি টানিয়া রেখার বাহিরে এবং ঠিক ঐ কোণের উপর যে বিন্দুটি দিলাম ইহার নাম বারাসত—বারাসত কলিকাতা হইতে কত দূর হইবে?—বলিতে পার না?—একটী সূত্র লইয়া বারাসত এবং কলিকাতার মধ্যে সেই সূত্রটি ফেলিয়া পরিমাণ করিয়া লও, তাহার পর অঙ্গুলি দ্বারা মাপিয়া দেখ, সূত্রটি কত অঙ্গুলি হইল; যত অঙ্গুলি হইবে তত— বা। ক্রোশ।—বারাসত কলিকাতা হইতে আট অঙ্গুলি—আট ক্রোশ হইতেছে। শি। তবে আমার চিত্র ঠিক হয় নাই; বারাসত কলিকাতা হইতে ছয় বা সাত ক্রোশের উর্দ্ধ নহে—অতএব এই রেখাটি যত পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছিল তত যাইবে না; কিঞ্চিৎ অধিক দক্ষিণে এইরূপ হইয়া আসিবে। এইবার মাপ করিয়া

দেখ। বা। এই বার ছয় ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক—পূর্ণ সাত ক্রোশ হয় নাই। শি। বারাসত হইতে রেখাটি প্রায় দ্বাদশ অঙ্গুলি দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া ঠিক দক্ষিণ মুখ হইল। পরে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম মুখ হইয়া পুনর্ব্বার ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইল। ভাগীরথীর তীরে যে এই বিন্দুটি দিলাম ইহারই নাম কলাগাছিয়া—ইংরাজেরা ইহাকে ডায়মণ্ডপয়েণ্ট বলেন। ইহা ভাগীরথীর কোন পারে? বা। পূর্ব্ব পারে। শি। তাহার পর ভাগীরথী প্রায় ঠিক গোল হইয়া উত্তর পশ্চিম মুখে কলিকাতা পর্য্যন্ত উঠিল। কলিকাতা এবং কলাগাছিয়ার মধ্যভাগে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এই যে বিন্দুটি দিলাম ইহা উলুবেড়িয়া।—এইক্ষণে, যে স্থানটি চতুঃসীমাবদ্ধ হইল, তাহার বহির্ভাগে যে যে স্থানে তাহা লিখিতেছি—পশ্চিমে কি লিখিলাম? বা। জিলা হুগলী। শি। উত্তরে? বা। জিলা বারাসত। শি। দক্ষিণে এবং পূর্ব্বদিকে? বা। সুন্দর বন। শি। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানটির নাম জিলা চব্বিশ পরগণা। পরগণা মুসলমানি শব্দ। দেখ, আমরা হিন্দু আমাদিগের দেশে শ্রীরামপুর, কলাগাছিয়া, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি হিন্দু নাম আছে—এই দেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, অতএব পরগণা, জিলা, প্রভৃতি মুসলমানদিগের শব্দ ও এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই দেশ, এইক্ষণে ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছে, অতএব বারাকপুর, খিদিরপুর ডাএমণ্ডপয়েণ্ট প্রভৃতি ইংরাজী নামও এই দেশে প্রচলিত হইয়া যাইতেছে।

যে বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা পড়ে, যে শ্রেণীতে তাহারা সর্ব্বদা থাকে, যে পথ দিয়া আপন আপন বাটী যায়, মধ্যে মধ্যে সেই সকলের মানচিত্র প্রস্তুত করাইলেও অনেক লাভ হয়।

ক্রমে ক্রমে এক একটী দেশের মানচিত্র পূর্ব্বোক্তরূপে অঙ্কিত করিবে, এবং কম্পাস, গজ প্রভৃতির আশ্রয় না পাইলেও যতদূর হইতে পারে ছোট দেখিয়া বড় এবং বড় দেখিয়া ছোট চিত্র সকল প্রস্তুত করিবে। এইরূপে ব্যবহারিক ভূগোল শিক্ষা করিলে আর পুস্তক দেখিয়া নীরস নাম মালা সমস্ত অভ্যাস করিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু দেশ এবং নদী নগরাদির নাম এবং অবস্থান শিক্ষা করিলেই সমগ্র ভূগোল শিক্ষা

হয় না। দেশ ভেদে উচ্চানুচ্চতা শীতাতপ এবং উদ্ভিদ্ ও প্রাণিভেদ, তথা তত্তদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য, আর সেই সেই দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্য সামগ্রী কিরূপ তাহাও জানা আবশ্যক। এই সকল বিবরণ প্রাকৃত ভূগোলের বিষয়ীভূত। প্রাকৃত ভূগোলও কতিপয় চিত্র দ্বারা বিলক্ষণ স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভূগোল শিক্ষার সহিত তত্তদ্দেশের লোক সকলের প্রকৃত ইতিবৃত্তের উপদেশ প্রদান করাও আবশ্যক। বস্তুতঃ ভূগোল শিক্ষা সর্ব্বদাই ঐতিহাসিক বিবরণ এবং ঐতিহাসিক নিয়ম সমস্তের সহিত সম্মিলিত করিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাকৃতিক পদার্থ সমস্ত মনুষ্যের চিত্তাকর্ষক হয় বটে, কিন্তু সেই সকল পদার্থের সহিত সজাতীয়ের সম্পর্ক দর্শন করিলে আমাদিগের যেমন বিশেষ আনন্দ এবং কৌতূহল হয়, মনুষ্য-সম্বন্ধ-বিরহিত প্রাকৃত পদার্থের পর্য্যালোচনায় কখনই তেমন হইতে পারে না। অতএব ভূগোল বিবরণ পাঠের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক প্রদর্শন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইতিহাস অধ্যয়নে যে সমূহ মহোপকার দর্শে, তাহার সবিস্তার বর্ণনার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। ইহা সহজেই বোধ হইবে, যে সকল বিদ্যাই মনুষ্যের অভিজ্ঞানমূলক। পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়াই পরে কি কি হইবে, তাহার সম্ভাবনা এবং অসম্ভাবনা বিচার করা যায়। ইতিহাস গ্রন্থ সকল সেই সাধারণ-অভিজ্ঞানের আধার-স্বরূপ হইয়া আছে। সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধি-বৃত্তি বিষয়ক সকল শাস্ত্রই যদিও ইতিহাস হইতে সমুদ্ভূত না হয়, তথাপি তাহারই রস পানে পুষ্ট এবং সবল হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইতিহাসের সর্ব্বাংশই সমভাবে রমণীয় হয় না। ইহার যে যে স্থলে ব্যক্তি বিশেষের উদার চরিত বর্ণিত থাকে, তাহাই বিশিষ্ট বিনোদজনক। আর তাহা কেবল ক্ষণিক-সুখকর বলিয়া গ্রাহ্য এমত নহে, তদ্দ্বারা নানাবিধ নীতি শিক্ষাও হইতে পারে। বস্তুতঃ ইতিহাসের কোন ভাগই সম্পূর্ণ ফলহীন হয় না; বিশেষতঃ এই ভাগটী ফল ও পুষ্প উভয়ে সুশোভিত। এই জন্য শিক্ষকের কর্ত্তব্য,—ইতিহাস শিক্ষা করাইতে হইলে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র বর্ণনার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। অপিচ, ঐ সকল ব্যক্তির নাম ও প্রধান

প্রধান কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়াই নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। এমন করিয়া বর্ণন করিতে হয়, যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তির আকার, প্রকার, ব্যবহার, চরিত্র সমুদায় স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতে পারে। যে দেশের ইতিহাস শিক্ষা করাইতে হইবে সেই দেশের মানচিত্রে ছাত্রবর্গের বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। ইতিহাস পাঠনায় একটী আদর্শ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

শিক্ষক। অদ্য তোমাদিগকে বঙ্গেতিহাসের একটী বিবরণ শ্রবণ করাই। বঙ্গ দেশের মানচিত্রে নদিয়া জেলার মধ্যে নবদ্বীপ নগরটী দেখিয়াছ। এইক্ষণে সেই নবদ্বীপ কি জন্য প্রসিদ্ধ? বা। তথায় অনেক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করেন। শি। পূর্ব্বে ঐ নবদ্বীপ সমুদায় গৌড় দেশের রাজধানী ছিল। এই জন্যই তাহা অদ্যাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রধান সমাজ হইয়া আছে। এইক্ষণে ইংরাজি ভাষায় বিদ্বান লোক কোন্ স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক? বা। কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শি। যেমন কলিকাতা ইংরাজদিগের রাজধানী বলিয়া এখানে ইংরাজীতে বিদ্বান লোক অধিক হইয়াছে, তেমনি নবদ্বীপ হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ছিল বলিয়া তথায় সংস্কৃত বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমি যে সময়ের কথা কহিতেছি, তখন ঐ নবদ্বীপে লক্ষ্মণ সেন নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। সেন উপাধিবিশিষ্ট আর কোন রাজার নাম শুনিয়াছ? বা। বল্লালসেন। শি। যে বল্লাল সেনের নাম শুনিয়াছ, এই লক্ষ্মণ সেন তাঁহারই বংশোদ্ভব হইবেন। তখন লক্ষ্মণ সেনের বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং বৃদ্ধ রাজা রাজ-কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিতেন না। তিনি কেবল ধর্ম্মকার্য্যেই মন দিয়াছিলেন।

এক দিন রাজা লক্ষ্মণসেন বসিয়া আছেন, এমত সময়ে তাঁহার পুরোহিত এবং অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ব্রাহ্মণদিগের যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলে পর রাজ-পুরোহিত কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্রের উক্তি মিথ্যা হইবার নয়; বঙ্গদেশ যে যবনাধিকৃত হইবে, তাহার কাল উপস্থিত হইল। শুনিলাম, যবন সেনা আগত প্রায়; অতএব চলুন, শ্রীক্ষেত্রে প্রস্থান করি।" রাজা বৃদ্ধ হইয়া-

ছিলেন। প্রাচীনাবস্থায় প্রায়ই স্থান পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছা হয়। অতএব নৃপাল, পণ্ডিতবর্গের পরামর্শ গ্রহণে অসম্মত হইলে ব্রাহ্মণেরা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমরা এই বৃদ্ধ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব কি না। যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু থাকিয়াই বা কি করিব? এই ভাবিয়া অনেকেই আপনাপন সম্পত্তি ও পরিজন সমভিব্যহারে উড়িষ্যায় প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কেহ কেহ রাজার প্রতি স্নেহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না।

যে সময়ে নবদ্বীপে এই ব্যাপার ঘটে, তাহার এক মাস পূর্ব্বে দিল্লীর বাদসাহ কুতুবুদ্দীন একদিন মঞ্চোপরি বসিয়া বন্য পশুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। পূর্ব্বকালের রাজাদিগের ইহা একটী প্রধান আমোদ ছিল। তাঁহারা কেবল বন্য পশুদিগের পরস্পর যুদ্ধ দেখিয়াই তুষ্ট হইতেন এমন নহে, বলবান মল্লগণের সহিত ঐ সকল পশুর সংগ্রাম করাইতেন। তাহাতে অনেক নরহত্যাও হইত। কি নিষ্ঠুর ব্যাপার! সে যাহা-হউক, কুতুবুদ্দীন সাহ ঐরূপ যুদ্ধ দেখিতেছেন, এমত সময়ে একটা বিকৃতাকার পুরুষ সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইল। তাহার হস্ত বানরের হস্তের ন্যায় দীর্ঘ, আকার খর্ব্ব এবং গাত্র সমুদায় বড় বড় লোমে আবৃত। ভাল বল দেখি ঐ ব্যক্তি মুসলমান—মুসলমানেরা গায়ে জামা দেয়, তবে উহার সমুদায় শরীর বড় বড় লোমে আবৃত কেমন করিয়া দৃষ্ট হইল?—যাহারা কুস্তি করিতে যায় তাহারা কি জামা জোড়া পরিয়া যায়? বা। তাহারা কেবল কাচ পরিয়া যায়, আর কিছুই পরে না। শি। সেই খর্ব্বাবয়ব ব্যক্তি রঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী প্রকাণ্ডকায় হস্তীর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে দর্শক মাত্রেই চমৎকৃত হইয়া রহিল। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ঐ ব্যক্তি হস্তীর সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া পরে তাহার শুণ্ডে এমনি দারুণ প্রহার করিল যে হস্তীটা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল। তখন বাদসাহ তাহার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে অনেক পুরস্কার প্রদান করিলেন। উহারই নাম বখতিয়ার খিলিজি। তিনি এই ব্যাপারের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে বেহার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন; পুনর্ব্বার বঙ্গ দেশ বিজয়ার্থ নির্গত হইলেন। দিল্লী হইতে

বঙ্গদেশে আসিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, বল?—কোন দেশে সৈন্য লইয়া যাইতে হইলে সেই দেশ দিয়া যে নদী গিয়াছে, তাহারই তীরে তীরে যাইতে হয়। বা। তবে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া যমুনা নদীর ধারে ধারে গমন করিলে এলাহাবাদ অর্থাৎ প্রয়াগ পর্য্যন্ত আসা যায়; তাহার পর গঙ্গার পার্শ্বে পার্শ্বে যাইয়া কাশী এবং বেহার উত্তীর্ণ হইলেই বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হওয়া যায়। শি। বখতিয়ার খিলিজি প্রায় ঠিক্ ঐ পথ দিয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহারই আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নদীয়ার ব্রাহ্মণেরা পলায়নপর হইয়াছিলেন। বখতিয়ার খিলিজি গঙ্গার তীরে তীরে আসিয়া কোথায় ভাগীরথীর মোহানা দেখিতে পাইলেন?—মানচিত্রে দেখ। বা। নিম্ন ভাগীরথীর মোহানায় কোন নগর বা গ্রামের নাম নাই—নিকটেই শিবগঞ্জ বলিয়া একটী স্থান আছে। শি। ঐ সকল স্থান নদীর ধোয়াট মাটিতে পরিপূর্ণ। অনেক স্থল কেবল বালুকাময়। এই জন্য নদীর মুখ সর্ব্ব সময়ে ঠিক এক স্থানে থাকে না। যেখানে বর্ষাকালে গঙ্গার বেগ অধিক লাগে, সেই স্থান দিয়াই ভাগীরথীর মোহানা হয়। সে যাহা হউক, বখতিয়ার ভাগীরথীর তীরে তীরে আসিয়া রাজধানী নবদ্বীপের সন্নিহিত হইলে, সৈন্য সামন্ত সমুদয়কে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া আপনারা সপ্তদশজন অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগররক্ষী কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, আমরা বেহার-জেতা যবন রাজার দূত। এইরূপে বঞ্চনা করিয়া মুসলমান সেনাপতি রাজবাটীর দ্বারে উপনীত হইলেন, এবং অসতর্ক রক্ষি-বর্গকে হনন করিতে লাগিলেন। রাজা আসন্নমৃত্যুসময়ে আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইয়া অনতিদূরবর্ত্তী ভাগীরথীর তীরে গিয়া এক খানি নৌকা-যোগে প্রস্থান করিলেন। বঙ্গদেশ এইরূপে মুসলমানের আয়ত্ত হইল।

—:০:—

একাদশ অধ্যায়।

[বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম এবং শারীরিক শিক্ষার উল্লেখ—গৃহে সন্তানদিগের কিরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।]

এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা কথিত হইল তাহা কেবল বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ শিক্ষার তাৎপর্য্য কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্দ্ধন নহে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল যথোচিত রূপে উদ্রিক্ত না হইলে মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না। সহস্র সহস্র স্থানে দেখা হইতেছে যে অতি স্থূলবুদ্ধি এবং স্বল্পবিদ্য ব্যক্তিরাও ধর্ম্মশীল হইলে সমাজে সমাদৃত এবং সম্মানিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু অধার্ম্মিক ক্রূর ব্যক্তিরা সহস্র বিদ্যা বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলেও কাহার বিশ্বসনীয় বা প্রীতিভাজন হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা অবহিত হইয়া ছাত্রবর্গের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমস্তকে উদ্রিক্ত করা শিক্ষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। যে পুস্তক পাঠ করান যাউক, যে বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা যাউক, সর্ব্বদাই যত্ন করিয়া সুনীতি সমস্তের অঙ্কুর শিশুদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। যদিও বিদ্যালয়ে পরমার্থ সম্বন্ধীয় কোন কথার অধিক আন্দোলন করার আবশ্যকতা নাই, তথাপি যে কতিপয় বিষয়ে মনুষ্য সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যথা—ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পাপ পুণ্যের ভেদ, এবং পাপ কর্ম্মে জগদীশ্বরের অসন্তোষ এবং পবিত্র কর্ম্মে তাঁহার তুষ্টি, এই সকল কথা শৈশবাবধিই বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। তথা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরু সম্বন্ধীয় সকল লোকের প্রতি ভক্তি, দরিদ্র এবং দুঃখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া এবং বয়স্যদিগের প্রতি সখ্য প্রকাশ করিয়া যথোচিত আচরণ করিতে শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। এক্ষণে দেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, এমত অবস্থায় লোক সকল সহজেই স্বার্থপর এবং অভক্তিমান হইয়া উঠে। অতএব যদি শিক্ষকবর্গ ঐ দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই

সময় অবধি সবিশেষ যত্ন না করেন তবে পরিশেষে যে কি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠিবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সময়টী এতদ্দেশীয়দিগের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের সন্ধিস্থল। শিক্ষকবর্গ যেন সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়া রাখেন যে, কেবল শিক্ষার দোষেই এক্ষণে নাস্তিকতার, স্বার্থপরতার এবং অবজ্ঞার প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নচেৎ হিন্দুজাতি স্বভাবতঃ ভক্তিমান, সুতরাং এই দেশে অশ্রদ্ধার প্রাদুর্ভাব হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমূহের উদ্রেক করা কখনই কেবল শিক্ষকদিগের উপদেশ বাক্যে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে না। এই কথা সত্য বটে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সুধীর-স্বভাব এবং ধর্ম্মশীল শিক্ষকের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত উভয় সম্মিলিত হইলে যে সমূহ ফল দর্শে, তাহাও নিঃসন্দেহ। শিক্ষকেরা এক্ষণে যেমন ছাত্রদিগের বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে তাহারা বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক পায়, তদ্বিষয়ে সযত্ন থাকেন, যদি সেইরূপ যত্ন সহকারে উহাদিগকে সুশীল, প্রীতিমান এবং ভক্তিমান করিয়া তুলিবার নিমিত্তও পরিশ্রম করেন, তবে অবশ্যই ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন।

বিদ্যালয়ে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের কতকগুলি নিয়ম করিয়া রাখাও অত্যন্ত আবশ্যক। তজ্জন্য অধিক চেষ্টা করিতে হয় না। যদি বালকবর্গ আপনাদিগের নৈসর্গিক প্রবৃত্তির অধীন হইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রীড়া করিতে পায়, অঙ্গ চালন করিতে পায়, এবং ব্যায়াম করিতে পায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কাহার কাহার মনে এমন ভ্রম আছে যে, বিজাতীয় ক্রীড়া সকল প্রবর্ত্তিত না করিলে কোন রূপেই ব্যায়াম শিক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু বোধ হয় যদি অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত কপাটী, গুলিডাং প্রভৃতি কতিপয় ক্রীড়ার প্রতি সমধিক উৎসাহ প্রদান করা যায়, আর সময়ে সময়ে বালকেরা কুদ্দাল ধরিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কৃষি কর্ম্ম করে, তথায় শিক্ষকেরা স্বয়ং যদি ঐরূপ করিয়া তাহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, তাহা হইলেই বিদ্যালয়ে যতদূর পর্য্যন্ত ব্যায়াম শিক্ষার আবশ্যকতা, তাহা সম্পন্ন হইতে পারে।

"কিন্তু আমরা সহস্র করিলেও যদি শিশুগণ আপন আপন পিতা মাতার স্থানে সুশিক্ষা না পায়, তবে কখনই সুস্বভাব ব্যক্তী হইতে পারে না।" শিক্ষকদিগের এই কথা অতি যথার্থ। কোন শিশুকে দুর্ব্বল দেখিলে অনেকেই বিতর্ক করিয়া থাকেন, ইটী বুঝি যথোচিত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় নাই। কিন্তু লোকে কোন্ কোন্ কারণে শরীরের ভদ্রাভদ্র হয়, যেমন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, অন্তঃকরণের দোষগুণ কি প্রকারে জন্মে তেমন উত্তম বুঝেন না। নচেৎ সকলেই জানিতেন যে, মাতৃদুগ্ধ অভাবে যেমন শিশুগণের শরীর দুর্ব্বল হয়, তেমনি মাতার নিকট অতি শৈশবাবধি সুশিক্ষা না পাইলে যাবজ্জীবন স্বভাবের দোষ থাকিয়া যায়। সন্তান পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক হইলে পর শিক্ষার কাল প্রাপ্ত হয়, তাহার পূর্ব্বে শিক্ষণীয় হয় না, ইহা অত্যন্ত ভ্রমমূলক সংস্কার। হাতে খড়ি পাঁচ বৎসরে দিলেও হয়, ছয় বৎসরে দিলেও হয়। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার দুই তিন মাস মধ্যেই সন্তানের শিক্ষার কাল উপস্থিত হইয়া উঠে।

শিশু, যে সময় হইতে 'মানুষ চিনিতে' আরম্ভ করে, সেই সময় হইতেই তাহার শিক্ষারম্ভ হয়। তখন, যাহাতে তাহার কোন শারীরিক ক্লেশ না হয়, এমত করাই নিতান্ত আবশ্যক। শারীরিক ক্লেশে বয়োধিকদিগেরও সমূহ দোষ জন্মায়। পীড়িত হইলে লোক স্বভাবতই খিটখিটা হয়, আর ক্ষুধিত হইলে জঠরানল এবং ক্রোধানল একবারে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুশীলতা ইহাদিগের পরস্পর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু শিশুদিগের মনে, সুশীল হইলে সুখী হওয়া যায়, এমত ভাব উপস্থিত হওয়া অসম্ভব, অতএব—প্রথমতঃ যাহাতে তাহাদিগের শরীর সর্ব্বতোভাবে সুস্থ থাকে, এমন যত্ন করাই বিধেয়। উৎকট শব্দ শ্রবণে—হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোক দর্শনে—কঠিন শয্যায় শয়নে—বহুক্ষণ ক্ষুধিত থাকায়—এবং অনিয়মিত রূপে আহার প্রাপ্ত হওয়ায়, শিশুদিগের ক্লেশ হয়—অতএব সাবধান হইয়া ঐ সকল পীড়াজনক ব্যাপার নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

কিছুকাল পরেই সন্তানবর্গ ক্রন্দন, হস্ত প্রসারণ প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা স্ব স্ব অভিলাষ প্রকাশ করিতে শিখে। তখন হইতেই শিশুকে স্বাবলম্বন এবং সুশীলতা শিক্ষা করাইতে পারা যায়। যাহাতে সে অধিকক্ষণ ক্রোড়ে থাকিতে না চায় এবং কোন কিছু চাহিতে হইলেই না কাঁদে, এমন করিয়া

চলা উচিত। যে দ্রব্য শিশুদিগকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়, সুতরাং চাহিলেও পাইবে না—এমত সামগ্রী তাহারা যেন দেখিতেও না পায়। অতি শৈশবাবস্থাতেও শিশুগণ অন্যের মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহাদিগের মনের ভাব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে সমর্থ হয়। অতএব মাতা পিতা প্রভৃতি পরিবার সমস্তের কর্ত্তব্য যে, সন্তান সকলকে সদা সহাস্য অম্লান মুখ প্রদর্শন করেন। এইজন্য তাঁহারা স্ব স্ব চিত্ত সংশোধন করত দ্বেষ, মাৎসর্য্য, কলহাদি দোষ পরিত্যাগ করিবার যত্ন করিবেন। পরিবার ভাল না হইলে সন্তান কখনই সুশিক্ষাসম্পন্ন হয় না। যেমন দেশের বায়ু দুষ্ট হইলে লোক সকল যথেষ্ট সুসামগ্রী আহার প্রাপ্ত হইয়াও নানা সংক্রামক রোগগ্রস্ত হইতে থাকে, তেমনি কুপরিবার পরিবৃত হইলে সহস্র সদুপদেশ সত্বেও শিশুগণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে চিরস্থায়ী কালিমা সংযুক্ত হয়।

কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে, যখন ভাল মন্দ বিবেচনার শক্তি উদ্রিক্ত হইতে থাকে, তখন ভাল কর্ম্ম করিলেই পিতা মাতা এবং পরিজন সমস্তের স্নেহভাজন হওয়া যায়, এবং দুষ্কর্ম্ম করিলেই তাঁহারা স্নেহ করেন না, বরং অতিশয় দুঃখিত হন, শিশুদিগের এইরূপ বুঝিতে পারা অত্যন্ত আবশ্যক। বাটীর মধ্যে কোন এক জনকে ভয় করিলেই শিশুরা সুশিক্ষিত হইবে, এমত নহে। ঐরূপ একজন 'যুযু' হইয়া থাকিলে আমরা তাঁহার ভয় দেখাইয়া স্ব স্ব অভিলষিত কর্ম্ম সুখে সম্পন্ন করাইতে পারি বটে, কিন্তু ইহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে পায় না। বরং কর্ত্তব্য কর্ম্ম গুলি নিতান্ত ক্লেশকর অনুভব হয়, এবং ধর্ম্মই যে সুখের একমাত্র সাধন তাহা বোধ না হইয়া, পাপেরই পথ কুসুমাকীর্ণ জ্ঞান হইতে থাকে। যাহারা বাল্যাবস্থায় এই প্রকারে শিক্ষিত হন, তাঁহারা বয়োধিক হইয়া সহস্র বিদ্যাসম্পন্ন হইলেও কখন নির্ভয় হৃদয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। দেশ-ব্যবহার, কুলাচার, প্রভুর অনুজ্ঞা এই সকলই তাদৃশ ব্যক্তি সকলের ধর্ম্ম অপেক্ষাও সমধিক মাননীয় হয়। তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না "এই কর্ম্মটী করা উচিত, অতএব করিব, প্রভু বিরক্ত হন হইবেন, অজ্ঞ লোকে নিন্দা করে করিবে"। তাঁহারা ত, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাজ্য—অতএব করা উচিত নহে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণীয়—অতএব অবশ্য

করিতে হইবে, এমত শিক্ষা পান নাই। তাঁহারা যেমন বাল্যাবস্থায় 'যুযুর' ভয়ে কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বা করেন নাই, পরেও সেইরূপ, তাঁহাদিগের প্রভু বা দেশাচার বা কুলব্যবহার, ঐ যুযুর' পদাধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রয়োজক বা নিবারক হইতে থাকে। ফলতঃ শিশুদিগের প্রতিপালনে পিতা মাতার একান্ত অস্বার্থপর হওয়া উচিত। ঐরূপ ভয় দেখাইয়া রাখিলে আপনাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে না, এমন বিবেচনা করা কদাপি উচিত নয়। আপনারা এইক্ষণে যদিও কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাই, তথাপি এমন করিয়া চলিব যাহাতে সন্তান সুস্বভাব এবং স্বাধীন বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, যাঁহারা এমত ভাবেন, তাঁহাদিগের সন্তান অবশ্যই সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করে।

সন্তানবর্গের প্রতি ভয় প্রদর্শন অপেক্ষা স্নেহবান হওয়াই লোকের সাহজিক ধর্ম্ম এবং অতি সুপ্রশস্ত পরামর্শ। কিন্তু সেই স্নেহ বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রকাশ না করিলে তদ্দ্বারাও মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ভয় দ্বারা যত মন্দ হয়, প্রীতি দ্বারা কখনই তত হয় না বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া না চলিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধের অনেক ত্রুটি হইতে পারে। ইনি আমাকে ভাল বাসেন, অতএব যাহা বলিবেন তাহাই করিব, এবং যে কর্ম্ম নিষেধ করিবেন, তাহাতে কখন প্রবৃত্ত হইব না, স্নেহ দ্বারা এই পর্য্যন্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু যিনি সন্তানের মনোমধ্যে এই সদ্ভাব উদ্রিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যেন কখন পরিহাস-চ্ছলেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বই অকর্ত্তব্য কর্ম্মের আদেশ না করেন, আর অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বই কখন নির্দ্দোষ কর্ম্মের নিষেধ না করেন। বাল্যাবস্থায় পিতাকেই পরমেশ্বরের স্থানীয় হইতে হয়। যেমন জগৎপিতা কখনই অসৎকর্ম্মের ফল সুখ, এবং সৎকর্ম্মের ফল অসুখ, বিধান করেন না, তেমনি পিতাও যেন কখন দুষ্কর্ম্মের পুরস্কার বা সৎকর্ম্মের তিরস্কার না করেন।

এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের বিশিষ্ট সাবধান হওয়া উচিত যেন আপনারা গৃহকার্য্যের কোন ব্যাপারে অসুখী হইয়া আছেন বলিয়া সন্তান-দিগের প্রতি সেই বৈরক্তী প্রকাশ না করেন। কোন কোন স্ত্রীলোকের এমত ক্রুদ্ধ স্বভাব যে, বাটীর মধ্যে কাহার সহিত বিবাদ হইলেই, তাহারা

স্ব স্ব সন্তানদিগকে প্রহার করে। ইহারা অত্যন্ত দুরাচারিণী। ইহাদিগের সন্তানগণ কখনই সুশিক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রায় অনেকে বিরক্ত হইলে স্ব স্ব সন্তানের প্রতি সেই বৈরক্তী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক দোষ হয়। পিতা বা মাতা কি জন্য বিরক্ত হইলেন, বুঝিতে না পারিয়া শিশুগণের মনে ক্রমশঃ এই সংস্কার জন্মিয়া যায় যে, ইহাঁরা অন্য কোন বিষয়েও বিরক্ত হইলে আমাদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতএব এই যে বিরক্ত হইতেছেন, ইহাও আমাদিগের দোষে না হইবে। একবার শিশুর মনে এমত ভাব উপস্থিত হইলে আর তাহাদিগের শিক্ষার উপর পিতা মাতার কোন ক্ষমতাই থাকে না। শিশুদিগকে সর্ব্বদাই নানা কর্ম্মের নিষেধ করিতে হয়; এবং তাহারা সেই সকল নিষেধ না মানিলেই পিতা মাতা তাহাদিগকে দুঃশীল বিবেচনা করেন। কিন্তু অনুমান হয় যে সর্ব্বদা নিষেধ করা অপেক্ষা বিধি মুখে সুশিক্ষা দেওয়া অধিক ফলোপধায়ক। অর্থাৎ ইটী করিও না, উটী করিও না, বলা অপেক্ষা এইরূপ কর বা ঐরূপ কর, বলা ভাল। ইহার দুই গুণ। প্রথমতঃ কার্য্যানুরক্তি মনুষ্যমাত্রেরই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। নিষেধ দ্বারা কেবল কার্য্য ত্যাগ করাইতে হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক ধর্ম্মের এবং উপদেশের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে প্রকৃতির বলবত্তা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ হইতে থাকে, এবং শিশুরা নিষেধ মানিতেছে না, পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকটিত করিতেছি। তিন বা চারি বর্ষ বয়স্কা একটী বালিকা একখানি চৌকির উপর দুইটী পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। সেই সময় তাহারই নীচে আর একটী শিশু বসিয়া জল পান করিতেছিল। যেটী নীচে ছিল তাহার মস্তকে উপরিস্থ বালিকার পা লাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, সন্নিহিত কোন ব্যক্তি তাহাকে কহিলেন "দেখিও যেন ভাইটীর মাথায় পা না লাগে"। এই কথা বলিবামাত্র বালিকাটী পা দুলাইতে আরম্ভ করিল, সুতরাং তাহার ভাইটীর মাথায় পুনঃ পুনঃ পাদস্পর্শ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ নিষেধ বাক্য অমান্য করা ঐ বালিকাটীর তাৎপর্য্য ছিল, এমত বোধ হয় না। নিষেধ করাতে সে একটী কর্ম্ম পাইল, অতএব অন্য কার্য্যাভাবে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল।

যদি "দেখিও তোমার ভাইএর মাথায় যেন পা না লাগে" এমত না বলিয়া তাহাকে অন্য কোন কর্ম্মের আদেশ করা হইত, তবে সে অবশ্যই তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ বিধি মুখে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানের আর একটী সুমহৎ ফল আছে। অনেকের মনে, দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকার নামই ধর্ম্ম হইয়াছে। সুতরাং যাহারা অলস-প্রকৃতি, দীর্ঘসূত্রী, অথবা স্থূল বুদ্ধি প্রযুক্ত কর্ম্মে অক্ষম, তাঁহারাই সুশীল বলিয়া অভিমান করেন এবং পরিচিত হন। বস্তুতঃ ক্রিয়া লোপের নাম ধর্ম্ম নহে। সৎকর্ম্ম করার নাম ধর্ম্ম। কিন্তু কেবল নিষেধ মুখে ধর্ম্ম শিক্ষা হওয়াতে অনেকের এই কুসংস্কার হইয়াছে। এই জন্যই অমুক অতি ভাল মানুষ বলিলে অনেকেই অমুককে একটী গোতুল্য নির্ব্বোধ ব্যক্তি বুঝিয়া থাকেন। বাল্যকালের শিক্ষার দোষই ইহার প্রধান কারণ। অতএব দুষ্কর্ম্মে বিরত করা অপেক্ষা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা অধিক সহজ এবং শ্রেয়স্কর।

মনুষ্য যতই কেন বয়োধিক এবং বিদ্যাসম্পন্ন হউন না, যাবৎকাল জীবন আছে, তাবৎকাল তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয় সকলও আছে। কিন্তু যতদিন বাঁচিতে হয়, ততদিন শিখিতে হয়, এই ভাবটী শিশুদিগের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল করিবার উপায়, পিতা মাতা সর্ব্বদা আপনারা নূতন নূতন বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, দেখিতে পাইলেই যেমন উত্তম হয়, আর কিছুতেই তেমন হয় না। যে সকল শিশু সর্ব্বদা দেখিতে পায় যে, বয়োধিকেরা সদা তাহাদিগকেই শাস্ত্রালোচনা করিতে বলেন, আপনারা কখন পুস্তক খুলিয়া দেখেন না, কেবল গল্প করিয়া বা খেলা করিয়া সময়াতিবাহন করেন, সেই সকল শিশু বিদ্যোপার্জ্জনের কালকেই অতি জঘন্য কাল বিবেচনা করে, এবং তাহারাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোন চাকুরি বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে পর পুস্তকাদি সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, অথবা গৃহ শোভনার্থ রাখিয়া নানা প্রকার ব্যসনা সক্ত অথবা নিতান্ত অলস হইয়া পড়ে। অতএব বয়োধিকদিগের কর্ত্তব্য আপনারা এই বিষয়ে যথোচিত সাবধান হইয়া কোন ব্যর্থ কর্ম্মে সময় বিনাশ না করেন। বিশেষতঃ শিশুরা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সদুত্তর প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, এবং আপনারা না পারিলে ব্যগ্র হইয়া অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা

করিয়া তাহার উত্তর শিখেন। "আমি এইটী জানি না, বোধ করি অমুক জানেন, তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লই" যে ব্যক্তি শিশুর নিকট আপনার গৌরবলাঘব হইবার ভয় না করিয়া এইরূপ সত্য বাক্য কহিতে পারেন, তিনিই শিশুর বাস্তবিক বন্ধু।

যেমন দুইটী মনুষ্যের মুখ এক প্রকার নয়, হাতের পাঁচটী অঙ্গুলি সমান নয়, তেমনি দুইটী বালকের স্বভাব কখন সর্ব্বতোভাবে এক প্রকার হয় না। সুতরাং শিশুদিগের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া, কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য, নিশ্চয় করা আবশ্যক। শিক্ষা বিধায়ক পুস্তকের দোষই এই যে, তাহাতে কেবল একই প্রকার শিক্ষা রীতির বিবরণ থাকে। সুতরাং বিভিন্ন-স্বভাব বালক বালিকার প্রতি ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে লোকে শিক্ষা শাস্ত্রের যথোচিত গৌরব করেন না। কিন্তু পূর্ব্বেই কহিয়াছি, শিক্ষা শাস্ত্র আলোচনার প্রধান ফল এই যে, তদ্বিষয়ে স্ব স্ব বুদ্ধির পরিচালনা হওয়াতে জনগণ আপন আপন উপযুক্ত পন্থা দেখিয়া লইতে পারেন। অতএব যদি এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব পাঠে কোন ব্যক্তি স্বীয় শিষ্য বা সন্তানবর্গের সুশিক্ষা প্রণালী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।

"সমাপ্ত।"

াল মাস দিন।	সন্ধ্যার সময় হইতে শয়ন করিতে যাওয়া পর্য্যন্ত যাহা যাহা করিয়াছি তাহার পরীক্ষা।	বেলা ২ প্রহর ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাহা যাহা করিয়াছি তাহার পরীক্ষা।	বেলা ৯টা হইতে ২ প্রহর ১টা পর্য্যন্ত যাহা যাহা করিয়াছি তাহার পরীক্ষা।	প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছি তাহার পরীক্ষা।	সমুদয় দিবসটা কেমন গিয়াছে।
সাল					
মাস					
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					

* এক রোক ফুলস্কেপ এক পৃষ্ঠে এক সপ্তাহের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। মাসে মাসে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহি বান্ধিয়া দেওয়া ভাল এবং পুরাতন বহিগুলি না হারাইয়া যায় এমন সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রী :——

(সংক্ষিপ্ত)

ভূদেব জীবনী।

প্রথম সংস্করণ।

চুঁচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

(সংক্ষিপ্ত)

ভূদেব জীবনী।

রাজানো যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ।
সাধবো যং প্রশংসন্তি স পার্থ পুরুষোত্তমঃ॥

নির্ম্মল চরিত্র, গভীর বিদ্যাবত্তা, অকপট স্বধর্ম্মভক্তি, প্রগাঢ় স্বদেশবাৎসল্য এবং শিক্ষাবিভাগে পদগৌরব, এই সকলের বৈশিষ্ট্যে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি আই মহাশয় তাঁহার সমকালিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আদর্শ জীবনে এবং গ্রন্থাবলীর উপদেশে পাশ্চাত্য স্বদেশভক্তির ও উদ্যমের এবং প্রাচ্য ধর্ম্মপরায়ণতার শুভ সম্মিলন দেখা যায়। সেই জন্যই উহা ভারতের নূতন জীবন গঠনে গূঢ়ভাবে সাহায্য করিতেছে এবং ক্রমশঃই অধিকতর পরিমাণে করিবে। উহাঁর প্রদর্শিত পথই যে আমাদের প্রকৃত পথ—নীরবে অনাড়ম্বরে জন্মভূমির সেবা!

হুগলী জেলায় খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর গ্রামে ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস। ভূদেব বাবুর পিতামহ হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। সরিকি বিবাদ হইলে তিনি পৈতৃক জমিজমার এবং সম্পত্তির কিছু মাত্র অংশ না লইয়া রিক্তহস্তে বাটী ত্যাগ করেন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার এই ত্যাগ হইতেই তাঁহার বংশের উন্নতি দেখা যায়—অসামান্য পুত্র ও পৌত্র লাভ হয়। কলিকাতা

হরীতকী বাগান লেনে ১৮২৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (৩রা ফাল্গুন রবিবার) ভূদেব বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃ পিতামহাদি মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল এবং সকলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ জীবনের শাস্ত্রাদিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি যথাযথ প্রতিপালন করিয়া চলিতেন।

ভূদেববাবুর পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল এবং সচরাচর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তাঁহার বিষয় জ্ঞানেরও অভাব ছিল না। ভারতের নানা তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে অনেক দেশ ভ্রমণের গুণে সে দোষ হইতে তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক ছাত্র ৺ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সম্পূর্ণ সাহায্য লইয়া মনুসংহিতার এক উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। গোল্ডষ্টকার সাহেব এই অনুবাদের প্রশংসা করতঃ উহা স্যর উইলিয়ম জোন্স কৃত অনুবাদ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়াছিলেন। তাঁহার দুই জন ছাত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্বন্মোদ নামক মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষতা লইয়া তর্কভূষণ মহাশয় অনেকানেক পুস্তকাদি ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশিত করেন। উহা তৎ-কালে কলেজের পাঁজি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মহারাজা রণ-জিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় স্বাধীন এবং অপরাপর করদ এবং মিত্র হিন্দু রাজগণ যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে ঐ পঞ্জিকা গ্রহণ করি-তেন। ১২৪০ সালে তর্কভূষণ মহাশয় ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকুড়ায় জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত বিদ্বন্মোদ যন্ত্র হইতে তৎকর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (কিয়দংশের) টীকায় তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা, শান্তিশতকের টীকায় তাঁহার আন্তরিক

বৈরাগ্য, বালবোধিনী নামক বালক শিক্ষার পুস্তিকায় তাঁহার শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান, এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের এবং বেদের শিরোভাগ উপনিষদে পরস্পর অভিন্ন মতবাদই প্রকটিত হইয়া আছে এবং সদ্‌গুরুর সাহায্যে উচ্চাধিকারী তান্ত্রিক সাধক শরীর ও মনের এত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন যে, সর্ব্বরিপূজয়ী হইয়া "স্মরহর-সমান ক্ষিতিতলে" বিচরণ করিতে পারেন; ভ্রষ্ট মাতাল শাক্ত দেখিয়া তন্ত্রে অভক্তি বা নেড়ানেড়ি মাত্র দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে অভক্তি করা অনুচিত; কোন সম্প্রদায়েরই একান্ত নিকৃষ্ট অধিকারিগণ মনোহর নহেন; তন্ত্রই কলির বেদ; তন্ত্রে শক্তি সঞ্জীবনের উপায় আছে। তর্কভূষণ মহাশয় নিজে শব সাধনাদি করিয়াছিলেন কিন্তু কোনরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। বিজয়া দশমীর দিন কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কপালে একটি সিদ্ধির ফোঁটা লাগাইতেন মাত্র। তিনি এ বিষয়ের উল্লেখে বলিতেন কোন কোন ফৌজ ব্র্যাণ্ডি মদ খাইয়া, কোন কোন ফৌজ বা ভাঙ খাইয়া যুদ্ধে তোপের মুখে ধাওয়া করিবার সাহস অর্জ্জন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ ও ছত্রি সিপাহী শুদ্ধাচারে থাকিয়া সহজ ভাবেই মনের জোরে যুদ্ধে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে চলিয়া যায়; উচ্চ তান্ত্রিক সাধক জগজ্জননীকে মা মা বলিয়া ডাকিয়াই শ্মশানে অমানিশায় শবসাধন কার্য্যে মনে তেজ এবং শরীরে বল পাইয়া থাকেন—অন্য কোন প্রকার অসৎ বা দুষ্ট অবলম্বনের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি আরও বলিতেন যে, পুরাণশাস্ত্র সমুদয় লৌকিক ব্যাপারগুলিকে অবলম্বন মাত্র করিয়া বেদের শাখা সকলকে ব্যাখ্যাত করে। তাঁহার মতে মহাভারত গ্রন্থ কর্ম্মকাণ্ড বেদকে এবং রামায়ণ উপাসনাকাণ্ড বেদকে

সুবিস্তৃত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক সকল আখ্যায়িকারই এক একটি গূঢ়ার্থ প্রকটিত করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্যার্থ যে সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অতি সহজে এবং সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাখ্যাত করেন। উহারই আদিকাণ্ড মাত্র "বিশ্বনাথ রামায়ণ" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। সংসারাশ্রমের সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করিয়াও লোভ মোহ মাৎসর্য্য অভিমানাদির সর্ব্বতোভাবে অনধীন এবং শোক হর্ষ বিষাদ বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সজ্ঞানে ৺ ভাগীরথীতীরে তর্কভূষণ মহাশয়ের পরম গতি লাভ হওয়ার পরে সোমপ্রকাশপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রকাশিত হয়—

"স্বর্গীয় তর্কভূষণ মহাশয় একজন অতি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্ভিন্ন বৈদ্যশাস্ত্র এবং মিশ্রের প্রণীত ঘটকদিগের গ্রন্থেও তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন ছিল। ×. × তিনি একান্ত সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মানুষ্ঠান তাঁহাকে ভয় লোভ কামাদি রিপুবর্গের একান্ত অতীত করিয়াছিল। তিনি এই নব্যকালে প্রাচীন ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি ইংরাজী ব্যবসায়ী নব্য সম্প্রদায়ের লোক, সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার তেজোগর্ভ সরল বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এবং স্বয়ং ধর্ম্মকার্য্যে উত্তেজিত

হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রত্বগুণ সর্ব্বতোভাবেই বিদ্যমান ছিল।"

ভূদেব বাবু তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি নামক গ্রন্থখানির উৎসর্গপত্রে পিতৃদেব তর্কভূষণ মহাশয়কে যেভাবে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্ঞানগভীরতা এবং ভূদেব বাবুর পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।—

"হে স্বর্গীয় পিতৃদেব! তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু, আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহার স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অত্যুদার সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন শাস্ত্রার্থ সকল শ্রবণ করিতাম, তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত হইত—যাবতীয় কূটার্থ উদ্ভিন্ন হইয়া রূপকমালার স্নিগ্ধ রশ্মিজাল প্রকাশ করিত—আপাত-বিরুদ্ধ মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহার প্রণালী জন্মিত—এবং চিত্তক্ষেত্রের সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইত। ইহলোকে আর আমার ভাগ্যে সে সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা আর ভঞ্জন হয় না। এখন জগৎকার্য্যের কোন বিষয় বোধাতীত হইলে তাহা বোধাতীতই থাকিয়া যায়। এখন কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিব এবং যাহা জানিব তাহা ঠিকই জানিব এ প্রতীতিটী এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। এই যে পুস্তকখানি লিখিয়াছি ইহার কোন্ স্থানে কি ভ্রম আছে তাহা আর কে বলিয়া দিবে? এবং আর কে বলিয়া দিলেই বা ভ্রম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিবে?

কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি—ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য আছে। একবার তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনাইয়া লইতে পারিতাম, তবে ইহা জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।

তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর্ব্বাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু—অতএব কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কি পরম্পরাসম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার—তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।"

ভূদেববাবুর মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে কেহ তাঁহার জীবন চরিত লিখিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন "আমাতে যাহা কিছু ভাল বলিয়া মনে হইবে তাহা সমস্তই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতিরূপ স্বরূপ আমার পিতৃদেবের গুণেই হইয়াছে ইহা যদি দেখাইতে পার তাহা হইলেই জানিবে যে আমার জীবন চরিত লেখা ঠিক হইয়াছে।"

সুকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে।
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে॥"

কবিবরের সহিত দেখা হইলে ভূদেব বাবু বলেন "তুমি আমার বাবাকে দেখ নাই, দেখিয়া থাকিলে ইংরাজী শিক্ষার উল্লেখও করিতে না।" কবিবর বলেন, "আপনার উদ্যম ও কার্য্যশৃঙ্খলা?" —ভূদেব বাবু উত্তর করেন " আমি পাল্‌কী চড়িয়া স্কুল পরিদর্শন করি, পিতৃদেব পদব্রজে গিয়া দেবমন্দির এবং তীর্থদর্শন করি-

তেন! আর তোমরা মনে কর প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় কার্য্যশৃঙ্খলা ছিল না? যাঁহারা ভাব পদার্থের কয়েক ডজন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের কুরুক্ষেত্রের মাঠে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর ব্যূহ রচনা হইয়া ছিল এবং যাঁহারা আশ্রমে যোগাভ্যাস রত থাকিয়া বেদ বেদান্ত পাঠনা করিতে করিতে দশ সহস্র শিষ্য খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাঁহাদের মাথায় এবং কাজে শৃঙ্খলা বেশ ছিল। আমরাই হীন হইয়া পড়াতে ও সকল যেন নূতন করিয়া শিখিতে যাইতেছি! আমার পিতৃদেবে ঋষিযুগের কোন গুণেরই অভাব ছিল না। অথচ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় যোগশাস্ত্র হইতে শিল্প, কৃষি (বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ) চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন, বিজ্ঞান, স্থপতি বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা, জ্যোতিষ, ধনুর্ব্বেদ বা যুদ্ধশাস্ত্র এবং রাজনীতি সমস্ত শাস্ত্রই ঋষি প্রণীত। আমার পিতৃদেবও স্মৃতি এবং দর্শনের অধ্যাপনা করিতে করিতে সুঁদরী কাঠের গুঁড়া হইতে চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এ দেশের কয়জন ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার সেরূপ পরীক্ষা বিধানে মন দিলেন?"

ভূদেববাবুর মাতাও আদর্শ ঋষি পত্নীর ন্যায় ছিলেন। কথিত আছে তিনি ইষ্ট মন্ত্রজপের সময় কখন কখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন এবং সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার ক্লেশের সময় একবার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেই যেন অমানুষিক প্রশান্ততা লাভ করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া কখনও জল গ্রহণ করিতেন না।

যখন ভূদেব বাবুর বয়ঃক্রম তিন কি চারি বৎসর মাত্র, তখন একদিন ক্রীড়াচ্ছলে তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের চর্ম্মপাদুকা, পায়ে দিয়াছিলেন। পাছে পিতার জুতা পায়ে দেওয়া অধর্ম্ম হেতু সন্তানের ও পরিবারবর্গের অকল্যাণ হয়, তজ্জন্য তর্কভূষণ মহা-

শয়ের স্ত্রী নিজে উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া ছেলের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তৎক্ষণাৎ সেই জুতা পুত্রকে মস্তকে বহন করাইয়া উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

এইরূপ মাতার গুণেই শিশুর মনে পিতৃমাতৃভক্তি ও ধর্ম্মে আস্থার প্রকৃত ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। গুরুজন এতই সম্মান ও ভক্তির পাত্র যে, তাঁহাদের দিকে পা করিয়া বসিলে বা শয়ন করিলে কচি ছেলেরও পাপ হয়, এইভাবে পরিবারস্থ সকলে আচরণ করিলে তবে না আশৈশব সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে ছেলেরা বড় হইয়া গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিবে?

আট বৎসর বয়সে ভূদেব বাবু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসর কাল তথায় অধ্যয়নের পরই ইণ্ডিয়ান একাডেমী নামক ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক উলাষ্টন নামক একজন ইংরাজ উঁহাকে অযাচিতভাবে ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার জীবনে এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। ইণ্ডিয়ান একাডেমিতে কিছু কাল পাঠ করার পর তিনি নবীন মাধবের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। এই স্কুলে তিনি প্রথম প্রাইজ পাইলে তাঁহাদেরই বাটীতে প্রতিপালিত তাঁহার খুড়ার শ্যালক ছিরু তাঁহাকে বলে "তুমি বাড়ীর একমাত্র ছেলে। তুমি প্রাইজ না পেলেও তোমাকে কেহ কিছু বলিত না। আমি প্রাইজ না পাওয়ায় তিরস্কৃত হইব। তুমি আমাকে বইগুলি দাও, আমি নাম বদলাইয়া লইয়া যাই।" সরলমনা উহারহৃদয় বালক, প্রার্থীকে নিজের যশ এইরূপে দিয়া ফেলিলে ছিরুর খুব প্রশংসা হইল। কোনরূপ তিরস্কার বা গঞ্জনায় একথা ভূদেববাবুর দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। অনেক দিন পরে মাষ্টারের নিকট তাঁহার খুড়া ভূদেববাবুর প্রশংসা শুনিয়া জিজ্ঞাসায় ঐ প্রাইজের কথা জানিতে পারেন;—তর্কভূষণ মহাশয়কে সেকথা বলিলে তিনি বলেন "বেশ করেছিল।"

নবীনমাধবের স্কুলে পাঠের পর ভূদেববাবু মধু চক্রবর্ত্তীর স্কুলে ও তাহার পর হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অনাস্থা এবং স্বধর্ম্মে অভক্তি খুবই বাড়িতেছিল। সময়ে অসময়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি বিদ্রূপ করাই যেন সুশিক্ষিতের লক্ষণ মনে করিতেন। প্রথম দিনই ভূগোল পড়াইতে পড়াইতে মাষ্টার রামচন্দ্র মিত্র বলেন "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল; কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" পিতৃভক্ত ভূদেব বাবু গৃহে উপস্থিত হইয়াই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তাঁহার পিতা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পরম সাধক তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "কেন? পৃথিবীর আকার গোল।" এই বলিয়া তিনি গোলাধ্যায় পুস্তক হইতে দেখাইয়া দিলেন,— "করতলকলিতামলকবদমলং বিবস্তি যে গোলং।" পরদিন রামচন্দ্র বাবুকে গোলাধ্যায়ের ঐ অংশটি দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কথাটি বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল। তা তোমার বাবা বল্‌বেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহারা পৃথিবীকে সমতল এবং ত্রিকোণ বলেন।" স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির প্রতি ভক্তি, ভূদেব বাবুর পিতৃভক্তির সহিত জড়িত ছিল।

এই সময়ে তর্কভূষণ মহাশয়ের আর্থিক কষ্ট অত্যধিক হইয়াছিল। কোন রাজবাড়ীতে তিনি বার্ষিক ৫০ টাকা বৃত্তি পাইতেন। নূতন নূতন বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইতে থাকিলে সম্বাদ ভাস্করে ঐ রাজবাটী হইতে বিশেষ অগ্র পশ্চাৎ অনুধাবন না করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, অধ্যাপক মহাশয়েরা যেন বার্ষিক বৃত্তি লইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজবাড়ীতে

আসেন। ঐ বিজ্ঞাপন কাঙ্গালী জড় করার চেঁটরা দেওয়ার মত অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক বোধে তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় ঐ রাজ বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বৃত্তি ছাড়ায় অর্থ কষ্ট বড়ই দারুণ হইয়াছিল। এই ঘটনাটী ভূদেববাবুর মনে চির-কালই জাগরূক ছিল।

হিন্দু কলেজে বাবু রামচন্দ্র মিত্রের ক্লাসে ভূদেববাবু একজন সর্দ্দার পোড়ো ছিলেন। বাড়ীতে নিজের পড়া শেষ করিয়া লইয়া তাঁহার এলাকার দশজন ছাত্রকে পড়াইয়া দিতে হইত। ঐ দশ জনের কেহ পড়া বলিতে না পারিলে সর্দ্দার পোড়োরই দোষ হইত। এখনকার স্বার্থপর ছেলেরা অনেকেই এ নিয়মে আপত্তি করিবেন—তাঁহারা হিন্দুর শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছেন। পরার্থেই যে সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ জড়িত! পড়াইয়া দিতে পারিলে পড়া সর্ব্বাপেক্ষা পাকা হয়। ভোর সাড়ে তিনটা বা চারিটার সময় উঠিয়া নিজের লেখাপড়ার সব কাজ সারিয়া লওয়া তাঁহার চিরকালই অভ্যস্ত ছিল। ইহাতে অপরের কাজের জন্য সময় দিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত না। ঐ নিস্তব্ধ সময়ে শ্রান্তিশূন্য মস্তিষ্কে পড়াশুনা এবং জপ সাধনা দুয়েরই সুবিধা! এজন্য বাল্যকাল হইতেই ঐ সদভ্যাস অর্জ্জন সকলেরই করা ভাল।

হিন্দু কলেজে তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তথাকার পারিতোষিক এবং বৃত্তিসমূহ লাভ করায় তথায় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি খুবই হইয়াছিল। তাঁহার পিতা তৎসন্নিধানে থাকিয়া সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য সকলের সম্বন্ধে যেরূপভাবে ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ সকল অপেক্ষাও উচ্চতর ভাব সকল সংস্কৃত শাস্ত্র রত্নাকর হইতে বাহির করিয়া

দেখাইতেন তাহাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব তাঁহার স্বধর্ম্ম বিশ্বাসকে এবং জাতীয় মর্য্যাদার বোধকে কখনই অধিকক্ষণের জন্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। অসাধারণ প্রতিভাশালী পাদরী ডাক্তার ডফের সংসর্গে পড়িয়া এবং মূর্ত্তিতে একাগ্রভাবে পূজার সহিত মূর্ত্তি-পূজার প্রভেদ না বুঝিয়া কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে সপ্তদশ বর্ষ মাত্র বয়সে অল্পকালের জন্য ভূদেব বাবুর হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বলিয়া সংশয় হয়, কিন্তু তিনি সে কথা তাঁহার পিতাকে সরলভাবে বলায় জ্ঞানী সাধক এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন তর্কভূষণ মহাশয় ওরূপ কথাতেও অণুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া বলেন, "ভক্তিই পূজার একমাত্র উপকরণ; তাহা না লইয়া পূজা করিতে যাওয়া কপটতা; ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না। তা ছাড়া "ছাত্রাণাংঅধ্যয়নং তপঃ"—ছাত্রদিগের নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নেই তপ করা হয়। এখন তোমার ঠাকুর পূজা করিয়া কাজ নাই। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি যে, সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিলেই তোমার স্বধর্ম্মে অচলা ভক্তি হইবে। তুমি জাতীয় ধর্ম্মের অবমাননা কখনই করিতে পারিবে না।" গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থবোধ সহ ভূদববাবুর সমস্ত ভ্রম কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি পরে বহু পুরশ্চরণ করিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সন্তানকে তাহার স্বধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার যে একান্তই প্রয়োজন, তাঁহার আচার প্রবন্ধে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ভূদববাবু তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু কলেজে পাঠকালে মৌঃ আবদুল লতিফ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। একদিন তিন জনে গল্প করিতে করিতে কে কি চাহেন তাহার কথা উঠিলে যিনি পরে নবাব বাহাদুর পদবী এবং ভোপালের রাজমন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন, তিনি বলেন, "রাজদত্ত উচ্চপদ প্রার্থনা করি"; যিনি পরে মেঘনাদ

মধকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি বলেন "ইচ্ছা হয় বড় কবি হইতে পারি" ; যিনি পরে সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতা এবং বিশ্বনাথ ফণ্ডের স্থাপয়িতা হইয়াছিলেন তিনি (বর্ত্তমান ভারতের সুপুত্র মাত্রেরই যাহা ইচ্ছা করা উচিত সেই ইচ্ছা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া) বলিয়াছিলেন "জন্মভূমির কোন কাজে যেন অণু-মাত্রেও লাগিতে পারি !'

ভূদেব বাবু ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হইয়া বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদার, বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহচর্য্যে টোলের পণ্ডিতের ন্যায় অর্থাগমের কোনরূপ ভাবনা না ভাবিয়া ইংরাজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত বিদ্যার বহুল প্রচার দ্বারা স্বদেশীয় জনগণের অজ্ঞানমোচন চেষ্টায় প্রায় তিন বৎসরকাল ইতস্ততঃ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় অধ্যাপনে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে পিতাকে অর্থ চিন্তা করিতে হইতেছে জানিতে পারিবামাত্র তিনি বাবু স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আড়াইশত টাকা ধার করিয়া পিতাকে দেন এবং ঐ ঋণ শোধ করিবার জন্য ডাঃ মৌয়াটের নিকট পরদিনেই চাকরী প্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দুইটী চাকরী খালি ছিল। হিন্দু স্কুলে ৭ম শিক্ষকের পদ ৭৫ টাকা বেতনে এবং মাদ্রাসা কলেজে ৫০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পড়াইতে পাইবার জন্য বাটী হইতে দূরস্থিত স্কুলে কম মাহিনার পদটীই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি প্রাপ্ত বেতনের অর্দ্ধেকে ঋণ শোধ করিতেন। এবং অর্দ্ধেক বাটীতে খরচের জন্য দিতেন। ঋণ শোধ হইয়া গেলে সেইরূপ অর্দ্ধেক মাত্র খরচ জন্য দিয়া অপরার্দ্ধ ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ার্থ রাখিতেন। এই ব্যবস্থার গুণে এবং তাঁহার নিজের উপর ব্যয় খুবই কম ছিল বলিয়া তিনি ধন

সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু ১৮৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকস্বরূপে সর্ব্বপ্রথম সরকারী চাকরী করিতে প্রবেশ করেন এবং সেই বৎসরেই দেড়শত টাকা বেতনে হাওড়া জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হন।

ভূদেব বাবু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মুসলমান ছাত্রগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। একজন অতীব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইলেও, কি মুসলমান, কি ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত অপর জাতীয় কাহারও প্রতি কখন তাঁহার কোনরূপ বিরাগ-ছিল না।

সনাতন ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট পবিত্র পথে অবিরত নিবদ্ধদৃষ্টি তাঁহার পিতা তর্কভূষণ মহাশয়ের উদার হৃদয়ে পরধর্ম্ম বিদ্বেষের লেশ মাত্র ছিল না। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল নানা পথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" (যেমন সকল নদীই আঁকিয়া বাঁকিয়া ভিন্নপথে সমুদ্রেই গিয়া পড়ে সেইরূপে হে ভগবন্! জনগণ রুচিভিন্নতা হেতু সরল বা কুটিল পথে তোমার নিকটই যাইতেছে) তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয় সনাতন ধর্ম্মের এই উদার শিক্ষায় পবিত্রীকৃত ও "সর্ব্বদেবময়োতিথিঃ" (অতিথি সকল দেবতার আধার), "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।" (অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরুর ন্যায় পূজ্য) গৃহাগত ব্যক্তির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রের এইরূপ উচ্চাদর্শ গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং পুত্রের মুসলমান ছাত্রগণ কেহ বাড়ী আসিলে তিনি তাহাদিগকে সযত্নে বসাইতে এবং জল খাওয়াইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ছাত্রেরা যে কোন মুসলমান মৌলবীর বাটীতে আসে নাই, একজন একান্ত আচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়াছে তাহা বাক্যে ইঙ্গিতে বা ব্যবহারে

কথন বুঝিতে পারিত না। উহাদের জন্য কাষ্ঠাসন এবং পিতলের ক্ষুদ্র নক্সাকাটা ঘটি ও রেকাবি ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কৃত রাখা হইয়াছিল। উহারা চলিয়া গেলে ঐগুলি আবার মাজিয়া ঘষিয়া অগ্নিস্পর্শ করিয়া রাখা হইত। ফলতঃ ৺ তর্কভূষণ মহাশয়ের বাটিতে দেশ ব্যবহারেও অনভিজ্ঞতা ছিল না এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই অতিথি পূজা হইত।

যাহারা মনে করেন স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি যত্ন হয় না এবং অপরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাধ্যাপন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর নূতন বিধান, তাঁহাদের প্রবোধের জন্যই এই ব্যবহার প্রণালী এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় বচন কয়েকটী বিশেষ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি। মূর্খ বা গোঁড়া হিন্দুর কথা বলিতেছি না, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের উচ্চাধিকারী বিশুদ্ধ হিন্দুর জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা অপেক্ষা উদারতর শিক্ষা ভূমণ্ডলে আর কখন প্রচারিত হয় নাই এবং "আজে বাজে" কাহার দ্বারা যে আবিষ্কৃত হইবে তাহাও সম্ভব নয়। এইটী একটু মনে রাখিয়া চলিতে পারিলে শাস্ত্রচর্চ্চাও বাড়ে এবং কোন আর্য্য সন্তানের নিত্য নিত্য ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করিতেও ইচ্ছা হয় না।

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান মৌলবীগণ যে ধর্ম্মজীবন ও ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষপাতী এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মও যে সাদরকার ঐহিক সুখ সম্ভোগের বিরোধী, ইহা ভূদেববাবু এই মাদ্রাসা কলেজের চাকরীর সময় ভাল ভাল মুসলমানদিগের সংস্রবে আসিয়া সুস্পষ্ট রূপেই জানিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমানের প্রতি তিনি বরাবরই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলিতেন "হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। উভয়েই এখন একদেশবাসী সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট। ফলতঃ উহারা দুধ ভাই এমন বলা যাইতে পারে"।

ভূদেব বাবু তাঁহার পরিণত বয়সের লিখিত গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের স্থানে স্থানে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যে সকল অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বেশ বুঝা যায়। সামাজিক প্রবন্ধ ১৪ পৃঃ হইতে কয়েকটী স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"ছাপরা নগরবাসী কয়েকটী ব্রাহ্মণ-তত্রত্য একটি সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্র-মনা ব্যক্তি যে আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করি তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক, মুসলমান দিগের মধ্যে এমনি উদার-চেতা, পবিত্র-কর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথন কালে যখন শুনিলাম "উও হয়েঃ হ্যায়" আমার বোধ হইল, যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটী কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।"

"যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারী দিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারত বর্ষ একটী সর্ব্বপ্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দিভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে—হর্ম্ম্য শিল্পের একটী উৎকৃষ্ট প্রণালী সুসংযুক্ত হইয়াছে—সৌজন্য-রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ

যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, সুবা এবং বাদসাহ প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটী ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।"

মাদ্রাসায় তিনি নিজের ক্লাশ পড়ান ছাড়া হেড মাষ্টার ক্লিঙ্গার সাহেবের সমস্ত পড়ানর কাজই করিয়া দিতেন এবং সুবিধা পাওয়ায় হেড মাষ্টার অনেক সময় স্কুল ছাড়িয়াই অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। কিন্তু সে কথা পরিদর্শক কর্ণেল রাইলি কলেজের মৌলভির নিকট জানিতে পারিয়া তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক ভূদেববাবুকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতেও তিনি বিনীতভাবে একই উত্তর দিয়াছিলেন—"অনুগ্রহপূর্ব্বক হেড মাষ্টারকেই জিজ্ঞাসা করুন।" কর্ণেল রাইলি ইহাতে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সমন্বিত হন এবং বলেন (young man always behave thus and you will succed in life) যুবক এইরূপ ব্যবহারই বরাবর করিও, জীবনে তোমার উন্নতি হইবে। কর্ণেল এরূপ কোপন স্বভাব ছিলেন যে, তাঁহাকে ভূদেব বাবুর অবিলম্বেই পদোন্নতি জন্য বিশেষ ভাবে সুপারিশ :করিতে দেখিয়া কৌন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটরী ডাঃ মৌয়াট সাহেব ভূদেব বাবুকে বলেন, (How could you tame that tiger) "তুমি ঐ বাঘকে বশ করিলে কিরূপে?"

হাবড়া স্কুলে তিনি সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠনার পরিদর্শন করিতেন। কোন ছেলে একান্ত অনাবিষ্ট বলিয়া উক্ত হইলে উহার অভিভাবককে বলিয়া ছেলেটীকে কয়েক দিনের জন্য নিজের বাসায় লইয়া যাইতেন এবং উহার শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে তাহার অসুবিধার এবং অক্ষমতার

নিবারণ হইতে পারে তাহা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ও বালকদিগের অভিভাবকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন এবং বালকের মনে আশা উদ্যমের সঞ্চার করিয়া দিতেন। তাঁহার সময়ে হাবড়া স্কুলের সবিশেষ প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা তথায় শিক্ষিত ও গঠিত-চরিত্র অনেকে সংসারে উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

মিঃ হজসন প্রাট ঐ সময়ে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। উহাঁর সহিত ভূদেববাবুর বিশেষ হৃদ্যতা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে হজসন প্রাট সাহেবের উল্লেখ আছে। ভূদেব বাবু তাঁহার সহিত কখন দেখা করেন না কেন, হাবড়া স্কুলে আসিয়া হজসন প্রাট সাহেব জিজ্ঞাসা করায় ভূদেব বাবু সরল ভাবে বলিয়াছিলেন "সাহেবেরা সাধারণতঃ মন খুলিয়া কথা কন না এবং চাপরাসীরা তাঁহাদিগকে খবর দিতে দেরী করে এবং গা-ঘেঁসিয়া চলে। নচেৎ ভিন্ন সমাজের সুশিক্ষিত কর্ম্মঠ ব্যক্তিদিগের সংস্রবে শিক্ষা লাভ ও স্বচিন্তার উদ্রেক করিয়া লইতে ইচ্ছা কেনই হইবে না?" ইহাতে সাহেব ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, ভূদেব বাবু সাহেবের পড়িবার ঘরে অবাধে গিয়া বসিতে পারিবেন। ভূদেববাবুর একবার জ্বর হইলে সাহেব মেম তাঁহার বাসায় আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর মিঃ প্রাট বিলাতে ঐ সংবাদ শুনিয়া তথা হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটি কথা সম্বাদ পত্রে লিখিয়া পাঠান—

"I see clearly as if it were yesterday that tall dignified figure in his pure white robe and those handsome features of fair complexion. He spoke with that thoughtfulness and gravity which mark the Hindu of high caste."

অর্থাৎ সেই সুপরিষ্কৃত শ্বেতপরিচ্ছদশোভিত, সুন্দর গৌর শরীর কান্তি, সমুন্নত, উচ্চাশয়তাসূচক আকৃতি স্পষ্টতঃ যেন চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি। সেই কতদিনের দেখা শুনা আলাপ পরিচয় যেন গত পূর্ব্বদিনের ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। উচ্চাশ্রেণীর হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি কথাবার্ত্তা কহিতেন।

এই হজসন প্রাট সাহেবই বিলাতে অবস্থান কালে মধ্যে মধ্যে আপন পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "who is my best friend in India" অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু কে? ছেলেরা তাঁহার শিক্ষা মতে উত্তর দিত 'ভূদেব মুখার্জ্জি"।

ভূদেব বাবুও বলিতেন "কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক ভাল ইংরাজের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সকলেই যে আমার বন্ধু হইয়া পড়িয়া ছিলেন, একথা আমি বলিতে পারি।" তিনি বলিতেন "ভাল ইংরাজের কাছে গেলেই কিছু না কিছু শিখিতে পারা যায়, এবং নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল জানিয়া লইয়া আপনাদিগকে পুনরায় পূর্ব্বকালের মত ভাল করিয়া লইতে ইচ্ছার উদ্রেক হয়।" তিনি ইংরাজকে বর্ত্তমান ভারতে "সম্মিলন সাধক রাজা এবং বিধিপ্রেরিত শিক্ষক" ভাবেই দেখিতেন এবং উহাঁদের ব্যবহারিক কার্য্যশৃঙ্খলা, দলবন্ধনের ক্ষমতা, এবং প্রগাঢ় স্বদেশী প্রেম সম্বন্ধে উহাঁদের প্রতি যথেষ্ট ভক্তিপোষণ করিতেন।

১৮৫৬ সালে ভূদেব বাবু হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার হন এই কার্য্যে তিনি যে কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অভিনিবেশের সহিত অধ্যাপনাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। তখন হুগলী নর্ম্মালের ছাত্রকে শিক্ষক রূপে পাইবার

জন্য সকল স্কুল সেক্রেটরীই চেষ্টা করিতেন। বাবু ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি এরূপ ভক্তিমান ছিলেন যে তাঁহারা যে মন্ত্র শিষ্য বা পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন তাহা তাঁহাদের ব্যবহারে কেহ বুঝিতে পারিত না। ভূদেব বাবুর দেহান্তের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে ইন্দ্রকুমার বাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। "অন্য গুরুকে আমার ভক্তি হইবে না বলিয়া আমি দীক্ষা লই নাই" এই কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু দীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েন। যাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মনে শিক্ষক সম্বন্ধে ভারতীয় মহোচ্চাদর্শের মলিনতা না ঘটে এরূপ শিক্ষাদাননীতিই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নর্ম্যাল স্কুলে থাকিতে থাকিতেই ভূদেব বাবুর প্রথম পুত্র মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমকালে মৃত্যু হয়। ঐ অল্প বয়সেই বালক এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়াছিল। মহেন্দ্রদেবের তুল্য বুদ্ধিমান ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বালক অতি বিরল। একদিন ভূদেববাবু অন্ধকারে বসিয়া অঙ্গুলি দিয়া পুত্রের হাতে চিত্র অঙ্কিত করিয়া ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞার প্রমাণটী বলিয়া দিয়াছিলেন। বালক তাহাতেই ঐ প্রতিজ্ঞাটি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। জ্বর হইয়া কয়েক ঘণ্টামাত্র মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়।

পারিবারিক প্রবন্ধের "গৃহে মৃত্যু ঘটনা" প্রবন্ধটিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে *। তর্কভূষণ মহাশয় সর্ব্বক্ষণই শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া স্বহস্তে পীড়িত বালকের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন কিন্তু

* সংসারে থাকিতে গেলেই কখন না কখন মৃত্যু ঘটনা দর্শন করিতে হয়। × × × আমার প্রিয়তমকে হঠাৎকারে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে উবিয়া যাইতে দেখিয়াছি এবং বজ্রাহতবৎ চেতনাশূন্য হইয়াছি। × × × আমি অনেক দিন বাঁচিয়া আছি। মৃত্যু অনেক রূপেই আমাকে দেখা দিয়াছে।

শেষ হইয়া গেলে নির্বিকৃত মুখেই উঠিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় যাবজ্জীবন আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন যে, এরূপ শোকাবহ ব্যাপারেও একদিনের জন্যও তাঁহার দুঃখ প্রকাশ হইতে পায় নাই। ভূদেব বাবু শোক দুঃখাদি বিষয়ে অনেকটা আপন মাতৃভাবেরই অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অভ্যাস দ্বারা এবিষয়ে আপনাকে অনেকটাই সংযত করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ে শোকের বিশেষরূপ বশীভূতই ছিলেন। পুত্রের এই মৃত্যুব্যাপারে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে নিদ্রিতাবস্থায় প্রায়ই স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইতেন। এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁহার সময়ে সময়ে বোধ হইত যেন পুত্র নিকট দিয়া দৌড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রদেব ইংলণ্ডের সাক্সন ভূপতি মহাত্মা আলফ্রেডের একটী জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু সেই কাগজ গুলি মধ্যে মধ্যে দেখিতেন। আত্মীয়েরা মনে করিলেন যে এগুলি সর্ব্বদা দেখায় তাঁহার শোক কমিতে পাইতেছে না। কেহ অজ্ঞাতসারে, লইয়া কাগজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ভূদেব বাবু সে জন্য বরাবরই দুঃখ প্রকাশ করিতেন; বলিতেন "সে ত গিয়াছে, কিন্তু একেবারে যে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ।"

প্রথমজাত বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন এই পুত্রটি ভূদেব বাবুর নিজের মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল তিনি তাঁহার রচনাবলীর অনেক স্থলেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উল্লেখ পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গে আছে—"কৈ?—একি হইল?—সেইটী?—সেই সর্ব্ব প্রথমেরটী?—সেই সাক্ষাৎ দেব তুল্য শক্তিসম্পন্নটী?—সেটী কোথায় গেল?—আর এখানে

থাকিব না! বৃক্ষবাটীকা হইতে বাহির হইয়া যে যথা গিয়াছে সেই খানেই যাইব।—বাহির হই—হাত ধরিলেন—নিকটে একটী গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। দেখিলাম গাছটীর তলায় অনেকগুলি অপক্ক কুঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাষ্পাদিগ্ধ গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "মুকুল যত হয় ফল তত হয় না।" তথ্য বুঝিলাম। থামিলাম। ইতি প্রবোধ দায়িনী—"

তাঁহার নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগের যাহাতে মফঃস্বলে চাকরী প্রাপ্তির সুবিধা হয় এবং তাঁহার সহিত চিঠি পত্র লেখালেখি রাখিয়া তাহাদের শিক্ষাদান কার্য্যে বরাবর উৎসাহসম্পন্ন থাকে সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

ক্রোড়পতি কার্ণেগি বলিয়াছেন যে, উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ যেন নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আরও কিছু বেশী করেন। নির্দ্দিষ্টকার্য্য ভাল না করিলে মান থাকে না এবং সে কাজও যায়; উহা ভাল করিয়া করিলে সে কাজ থাকে ও সম্মান থাকে, তাহা ছাড়াও অন্য কার্য্য করিলে তবে উন্নতি হয়। ভূদেববাবুর জীবনে এই সূত্রের যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। মফঃস্বলের সহিত সংশ্রব রাখায় তিনি ইন্‌স্পেক্টার উডো সাহেব যখন ছুটী লয়েন তখন তাঁহার পদে আগত মেডলিকট সাহেবের শিক্ষা বিভাগের বিষয় কিছু জানা না থাকা উপলক্ষে ছয় মাসের জন্য সহকারী ইনস্পেক্টার পদ প্রাপ্ত হন। মেডলিকট সাহেবের সহিত ভূদেববাবুর এরূপ প্রকৃত হৃদ্যতা হইয়াছিল যে, পরে মেডলিকট সাহেব উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে ভূদেববাবু তাঁহার কুঠীতে তাঁবু ফেলিয়া ৪০ দিন বাস করিয়াছিলেন এবং শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি "মেডলিকট" বলিয়া ডাকিলে সাহেব ঠাণ্ডা হইয়া থাইতেন ও শুইতেন; মেম সাহেব

বা অপর কেহ তাঁহাকে কথা শুনাইতে পারিতেন না। সামাজিক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে "শ্রদ্ধাভাজন ইয়ুরোপীয়" বলিয়া এই মেডলিকেট সাবেবেরই উল্লেখ আছে। ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে স্কুল সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর হইয়া কয়েকটি প্রধান জেলার প্রাথমিক শিক্ষার বৃদ্ধি সম্বন্ধে সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের অভিপ্রেত বিষয় কার্য্যে পরিণত করণে প্রধান সহায় হন। ১৮৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন এবং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করা হয়। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত বিষয় তিনি সুশৃঙ্খলায় কার্য্যে পরিণত করণে সফলকাম হয়েন এবং এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপে তিনি শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে উন্নীত হন। ১৮৬৯ সালে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধে হলকাবন্দী প্রথার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত অঞ্চলে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার প্রদত্ত এতৎ-সংক্রান্ত রিপোর্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং ষ্টেট সেক্রেটরীর অনুমোদিত হয়। স্যর এস্‌লে ঈডেন বলিয়াছিলেন, (It is a gem of a report.) ইহা রিপোর্টের মধ্যে রত্নবিশেষ। এই রিপোর্টে ভূদেব বাবু তাঁহার বক্তব্য সকল কথা তাঁহার বিরুদ্ধমতবাদীদিগের ছাপান রিপোর্টের কথা উদ্ধৃত করিয়াই প্রমাণ করিয়া দিয়া বঙ্গদেশে শিক্ষাকর স্থাপন প্রস্তাব রোধ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বেতন বৃদ্ধি না দিয়া যেন উপযুক্ত বুঝিলে পদোন্নতি দানে উৎসাহিত করা হয়; তিনি এ দেশের লোক, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা কম বেতনে চালাইতে পারেন; কিন্তু পদোন্নতি না দিলে যে অক্ষমতার আরোপ করা হয় তাহা বড়ই কষ্টকর। অতঃপর সার্কেল

ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে তিনি শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৭২ অব্দে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। ঐ সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া ছিল। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাঁহাকে স্পষ্টবাদিতা জন্য অপছন্দ করায় সেই সময়ে তিনি ছুটী লইয়া আসাম ও ব্রহ্মদেশে পরিভ্রমণ করেন। সেই সময়ে ব্রহ্মদেশের কমিশনর (পরে ছোট-লাট) ঈডেন সাহেব তাহার সম্বন্ধে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলেন—Let me say a word to you about my old friend Babu Bhoodeb Mookerjea. Bhoodeb has many of the higher qualifications of the Europeans and very few of the failings of his countrymen. × × I should like to think that even five out of ten of our civilians are as conscientious workers অর্থাৎ আমার বহুদিনের বন্ধু বাবু ভূদেব মুখার্জ্জি সম্বন্ধে একটি কথা বলি। ইউরোপীয়ের অনেক উচ্চগুণ ভূদেবে আছে এবং তাঁহার দেশীয় লোকেদের মধ্যে যে সকল ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল তাঁহাতে নাই বলিলেই হয়। আমাদের সিভিলিয়ানদলের দশজনের মধ্যে পাঁচজনও তাঁহার ন্যায় বিবেকী কর্ম্মচারী, ইহা মনে করিতে পারিলেও আমার সুখ হয়।

১৮৭৭ সালে তাঁহার উপর পাটনা (৭) (তখন ত্রিহুত কমিশনরী পৃথক হয় নাই) ভগলপুর (৫) বর্দ্ধমান (৬) ও উড়িষ্যা (৩) বিভাগের মোট ২১টি জিলার শিক্ষাসংক্রান্ত ভার অর্পণ করা হয়। তাঁহার নিম্নে কয়েকজন আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ছিলেন ইহার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দেন। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত ক্রফ্‌ট সাহেব ঐ সময়ে অসুস্থ হইয়া

তিন মাসের ছুটী লইতে চাহিলে তাঁহারই ঐ উচ্চ পদে একটিনি করার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তাহাতে ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কেহ কেহ ক্রফ্‌ট সাহেবকে ছুটী লইতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, স্বজাতীয়দিগকে এদেশীয়ের অধীনস্থ করিয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জন অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ইহাতে ক্রফ্‌ট সাহেব ছুটী লয়েন নাই এবং হয়ত তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার স্বসমাজের কৃতজ্ঞ লোকদিগের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগেই তাঁহার অসুখও সারিয়া যায়! স্বসমাজের মুখাপেক্ষিতায় ইংরাজ সকল জাতির শ্রেষ্ঠ।

বেহারের আদালত সমূহে পারসী অক্ষরের (ইহার যাবনিক বা যাবনী বা যামনী নাম দেওয়া হইয়া থাকে) পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর চালাইবার ব্যবস্থা তাঁহারই পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুরাও অনেকে (কায়স্থেরা) উর্দ্দুর পক্ষপাতী একথা ঐ সময়ে উঠিলে তিনি ছোটলাট ঈডেন সাহেবকে সরল ও সত্য পূত মনে সহজ ভাবেই বলেন, "বিহারী হিন্দু বালকেরা তাহাদের চলিত মাতৃভাষা হিন্দী, ধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত এবং রাজভাষা ইংরাজী শিখিবে, বিহারী মুসলমান বালকেরা চলিত ভাষা হিন্দী, ধর্ম্মের ভাষা আরবী, এবং রাজ ভাষা ইংরাজী শিখিবে ইহা সঙ্গত। বিহারী কোন বালককেই উর্দ্দু বা পারশী শিখিতে বাধ্য করা হয় কেন? পূর্ব্বের রাজা মুসলমানগণ হিন্দীকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছিলেন এবং বিদেশ পারস্য হইতে একটী ভাষা আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া? সে হিসাবে যে ইংলণ্ডে সাক্‌শন বিজেতাদিগের জর্ম্মণ ভাষা এবং নর্ম্মান বিজেতাদিগের ফরাসী ভাষা আজও অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রচলিত রাখা উচিত হইবে। এবং এদেশে কোন সুদূরবর্ত্তীকালে (সংসারে কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়) ইংরাজ রাজত্ব লোপ হইয়া গেলেও যে বিহারী বালককে হিন্দী উর্দ্দু সংস্কৃত

এবং পৃথক্ অপর কোন রাজ ভাষা ভিন্ন ইংরাজীও পড়িতে হইবে।" ঈডেন সাহেব এই বিচারের সোজা সাফ কথায় খুবই তুষ্ট হইয়া হাসিয়া স্বীকার করেন যে, যে কোন বালকের প্রতি তিনটী ভাষার চাপই যথেষ্ট।

হিন্দী প্রচলনে ভূদেব বাবুর উপর বেহারবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া বেহারে অনেক গীত রচিত হয় এবং ঐ গীতগুলি শীঘ্রই লোক সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম উপদেশক পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাসজী রচিত যে দুইটী গীত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে তাহা ডাঃ গ্রিয়রসন সাহেবের প্রণীত বিহারী ব্যাকরণমালার ভোজপুরী খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

নাগরী অক্ষর কচ্ হরিয়েঁা মে চলিত হোনে কে বিষয় মেঁ সরকার কী প্রশংসা—

পূরবী গীত

ধন্য ধন্য গবর্ণমেণ্ট। পরজা সুখদায়ী।
যামনীকে দূর করী। নাগরী চলাই ॥১
"ভুবন দেব" করি পূকার। লাট নিকট যাই।
পরজা দুঃখ দূর করহ। যামনী দুরাই ॥২
নানাবিধি জাল হোত। যামনী মেঁ রাই।
পরজা মন হরষ হোত। বিদ্যা নিজ পাই ॥৩
ধন্য বুদ্ধি ধন্য বিচার। ধন্য অন্তর ভাই।
করি নেয়ায় হিন্দ বীচ। হিন্দুই চলাই ॥
পরজা নিত সুযশ গাব। অম্বিকা মনাই।
যবলে চন্দ সূর্য্য রহে। রাজ রহে মাই ॥৫

(২)

হুকুম ভইল সরকারী।

রে মন পিথো নাগরিয়া ॥ ধুয়া ॥
যামন জী সে দেহুঁ তুরাই
পঢ়িগুণ কাজ কর নয়নহরিয়া ॥১
লে পোথী নিত পাঠ করহ অব।
যামনী গ্রন্থ দেহু পৈসরিয়া ॥২
অবলে নাগরী আবত নাহীঁ।
কৈথী অচ্ছর লিখ কচ্ হরিয়া ॥৩
ধন্য মন্ত্রী প্রজা হিতকারী।
অম্বিকা মনাবত রাজ ভিক্টোরিয়া ॥ ৪

হিন্দীভাষা সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর উচ্চধারণা তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের "ভবিষ্যবিচার—ভাষাবিষয়ক" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য :—

(১) "বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহু পরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষাসমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্য কালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।" (সামাজিক প্রবন্ধ ২২৫ পৃঃ)

(২) বিরাট ভারত সমাজের সকল অংশের সহিত সহানুভূতি বৃদ্ধি উপলক্ষে হিন্দীভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:— "স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন এই ভাবটী মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন

করিতে সমর্থ। অতএব ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে কথোপকথন করাই ভাল। পত্রাদি লিখিতেও সাধারণতঃ ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, , অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান, ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারতসমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি অল্পায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।" (সামাজিক প্রবন্ধ ২৮৫ পৃঃ)

(৩) বিবাহ সম্বন্ধীয় সংস্কার উপলক্ষেও তিনি হিন্দী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন;—

"একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থান ভেদ জনিত বিবাহ প্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক্ প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।" (সামাজিক প্রবন্ধ ২৩৬ পৃঃ)

বাঙ্গালা হইতে তিনি বহুসংখ্যক পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং নূতন হিন্দী পুস্তক রচনা সম্বন্ধে স্কুলের প্রাইজ ফণ্ড হইতে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিব নারায়ণ ত্রিবেদী, পণ্ডিত ছোটুরাম ত্রিবেদী এবং

বাবু রামদেনী সিংহ তাঁহার এই কার্য্যে সংসৃষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার পরম প্রীতিভাজন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বাঁকীপুর হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"এ প্রদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যাইবার আদেশ হওয়ায় মুসলমানেরা এবং মুসলমান সদৃশ হিন্দুরাও অনেকে গোলমাল করিতেছে। আমার প্রতিই অনেকে দোষারোপ করিতেছে এবং যাহারা ফারসীর পক্ষ নহে, তাহারা আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগ দেখাইতেছে। বাস্তবিক ঐ কার্য্যটিতে আমার হাত কতদূর আছে তাহা আমি নিজেই বলিতে অক্ষম। কিন্তু যদি কিছু থাকে তবে যে তাহা আত্মপ্রসাদের একটি কারণ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ফারসী উঠিয়া যায় এরূপ চেষ্টা আমি বিহারে আসিয়া অবধিই করিয়াছি। জাতীয় ভাষার (হিন্দীর) বিদ্যালয়গুলি আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে অনাদৃত ছিল। আমি সেগুলির আদর করিয়াছি এবং সেই জন্যই আমার এখানে আসায় বিদ্যালয় সংখ্যা ১০।১৫ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমার পূর্ব্বে ফারসীর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষর চালাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোমত হয় নাই। নাগরী কায়েতী অক্ষরের প্রচলন হয় একথা আমিই বলিয়াছিলাম ও সে জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। ১৮৩৯ ইংরাজী অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যায়। সেই অবধি বাঙ্গালার উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। সেই অবধি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। হিন্দী হওয়াতে বিহারে কি সেইরূপ হইবে না? কেন হইবে না? আমার আশা এইরূপ যে, বাঙ্গালায় যাহা ৪০ বৎসরে হইয়াছে, বেহারে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে সেইরূপ উন্নতি দেখা দিবে। আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রকর্ম্মগুলির মধ্যে এই কার্য্যটির

সংস্রব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ ভাব নিতান্ত স্থূল দর্শনের ফল। প্রকৃত দৃষ্টিতে "আমি" কিছুই করি নাই। যে সকল শক্তিতে মনুষ্য সমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইগুলি কাল সহকারে এইদিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে আমার অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় সেইদিকে চেষ্টা করিতে থাকি। অতএব ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।"

অধ্যাত্ম দর্শনোন্মুখ ব্যক্তির মনে কিরূপভাবে ঐশী শক্তির দিকেই দৃষ্টি থাকে এবং অহং জ্ঞান দূরীকৃত হইয়া যায় তাহা এই পত্রখানি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

ভূদেব বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বৈদেশিক জীবন চরিত হইতে বালকদিগের শিক্ষার এক অংশের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাহাদের মনে হয় যে, এদেশে বুঝি উদাহরণ দিবার উপযুক্ত ভাল লোক জন্মেন না। তিনি এই জন্য উৎসাহ দিয়া চরিতাষ্টক নীতিপথ এবং রামচরিত লিখাইয়া ছিলেন। প্রত্যেক জেলার ভূগোল পড়ান ভাল এজন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দী "গয়া কি ভূগোল" অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৮২ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে শিক্ষা কমিশনেরও সদস্য নিযুক্ত থাকায় বাঙ্গালার প্রাদেশিক রিপোর্ট প্রস্তুত করণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ঐ রিপোর্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। তবে সভ্যদিগের অধিকাংশের মতের (ভোটের) জোরে উহা সমিতিতে পাঠকালে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ছাপান রিপোর্টে তাঁহার প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির সহিত অনেক স্থলেই মিল নাই।

১৮৮৩ সালের জুলাই মাসে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ৺ বারাণসীধামে যাইয়া

কয়েক বৎসর তথায় বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরম-হংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিয়া 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ৺ বারাণসী ধামে আনন্দবাগে স্বামিজীর যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির পূজা হয় তাহার নিম্নে খোদিত সংস্কৃত শ্লোকটী ভূদেব বাবুর রচিত। শ্রীমৎ বালরাম স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিয়া চুঁচুড়ার বাড়ীতে অনেকদিন ছিলেন। বারাণসী হইতে চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া (১৮৬৩ সাল হইতে চুঁচুড়াতেই তাঁহার বাস হইয়াছিল) সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সাধন কল্পে এবং এ প্রদেশে বেদান্ত দর্শনের যাহাতে চর্চ্চা হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৮৯ সালের ১৭ই এপ্রেল তারিখে চুঁচুড়ার বাটীতে পিতার নামে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করেন। ১৮৯৪ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে তিনি স্বীয় পিতার নামে "বিশ্বনাথ ফণ্ড" নাম দিয়া একটি ধন ভাণ্ডার সংস্থাপনে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দান করিয়া দলিল রেজেষ্টারী করেন। তাঁহার পিতৃবংশীয় দিগের মধ্য হইতেই বিশ্বনাথ ফণ্ড সমিতির সভ্য নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দলিলে সর্ত্ত আছে যে, ট্রষ্টিরা কোনকালে কার্য্য ঠিক না চালাইলে গবর্ণমেণ্ট উহার ব্যবস্থা করিতে পারি-বেন। ভবিষ্যতে আয় কমিয়া না যায় এজন্য বার্ষিক আয়ের পঞ্চমাংশ মূলধনে যোগ হইবে এরূপ ব্যবস্থা আছে। সুদি কাগজ পত্র বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা আছে। প্রতি বৎসর এডুকেশন গেজেটে ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব ও বৃত্তি তালিকা প্রকাশিত হয়। উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে এই ফণ্ডের সংস্থাপন হয়। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শনের অধ্যাপকদিগকে বার্ষিক অন্যূন ৫০ টাকা বৃত্তি এবং ৺ কাশীধামে ছাত্রদিগকে অন্যূন ৩০টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে। দুইটী দাতব্য ঔষধালয়—একটী কবিরাজী ও একটী হোমিওপ্যাথি ইহার অন্তর্গত। ঔষধা-

জয়টি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণামূর্ত্তি তাঁহার মাতৃদেবী "ব্রহ্মময়ী দেবী"র নামানুসারে "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে অভিহিত করেন।

ভূদেব বাবু বলিতেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের সকল বিষয়ে উন্নতি জন্য যে-সকল চেষ্টা করিতেছেন কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার সম্পূর্ণ উপকার গ্রহণ করা এদেশীয়দিগের উচিত। কিন্তু সকলেরই নিজের ধর্ম্মে পাকা ও ঠিক থাকা চাই এবং নিজেদের শিল্প রক্ষার চেষ্টা করা চাই। অন্য সকল কার্য্যেই—এমন কি এদেশের লোকের আগ্রহ ও স্বচেষ্টা বিশিষ্ট-রূপে দেখিলে ম্যাঞ্চেষ্টার এবং বার্ম্মিংহ্যামের চাপও কাটাইয়া "কোন সময়ে" শিল্পোন্নতি সম্বন্ধেও—গবর্ণমেণ্ট আমাদের নেতা ও সহায় হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের স্বধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা জন্য ব্যয় আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। এদেশে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই! সকল ধর্ম্মেরই শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারার উপযুক্ত উদারতা হিন্দুর সংশ্রবে এবং শিক্ষায় ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে থিয়সফিষ্টেরা মাত্র এতকালে পাইতেছেন। পৃথিবীর কোন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টই তাহা এখনও প্রাপ্ত হন নাই।

ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রথম স্থাপনাকালে তিনি এই ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তিনি ঐ সময়ে মহাত্মা বালরাম স্বামিজীর নাম উল্লেখও করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ফণ্ড মুখ্যতঃ সেই ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত। ভদ্রগ্রাম মাত্রেই এক একটি সংস্কৃত পাঠ শালা স্থাপিত হইয়া সদাচারী, নির্লোভ, তেজস্বী এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক ও পুরোহিত শ্রেণী প্রস্তুত হওয়া উচিত। ধর্ম্মোন্নতি ভিন্ন ভারতে কোনরূপ প্রকৃত উন্নতি ঘটিতে পারে না। ধর্ম্মো-

ন্নতি হইলেই অপর সমস্ত হইবে। ধর্ম্মহীন বাণিজ্যে ও শিল্পে ভেজাল চলে—"তাহাতে" শিল্প বা বাণিজ্য রক্ষা হইবে না। এই রূপ সকল বিষয়েই।

তিনি বলিতেন যে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীই সমাজের সংরক্ষক। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত প্রকৃত পণ্ডিত করিতে পারিলেই সমাজের উন্নতি হইবে। বিষয়ী লোকদিগের দ্বারা ইহাঁদের মোটাভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইয়া ইহাঁরা যদি আবার নির্ভাবনায় বিবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিতে পান তাহা হইলেই সমাজের মঙ্গল হয় এবং মানবধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা সংহিতাকার মনু যে সদাচারী ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে আদর্শ করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন ভারতে সেই আদর্শ সংরক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ ফণ্ডের সৃষ্টি দেশের ধনিসন্তানগণকে সমাজের উন্নতি সাধনের এই প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতেছে। এই দান প্রকৃত সাত্ত্বিক। ফণ্ড প্রতিষ্ঠার পর বৃত্তিতালিকা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত করার জন্য লিখিয়া আনিতে কর্ম্মচারীকে উপদেশ দিলে কর্ম্মচারী যখন অন্যান্য কথা মধ্যে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন—"এ বৎসরে যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রকে এই বিশ্বনাথ বৃত্তি দেওয়া হইল ইত্যাদি" তখন তিনি বলিলেন, "দেওয়া হইল" এমন কথাটাও তুমি লিখিতে পারিলে। তুমি জান না, সমস্তই ব্রাহ্মণের, মনু বলিয়াছেন—'সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিৎ জগতি গতং।' আমি দিব কি? তাঁহাদের জিনিস তাঁহারা লইলেন। লেখ, 'যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিশ্বনাথ বৃত্তি গ্রহণ করিলেন ইত্যাদি"। বিশ্বনাথ ফণ্ডের বৃত্তি মণিঅর্ডার দ্বারা অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগকে সসম্মানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাহাকেও আসিয়া লইয়া যাইতে হয় না। তাঁহার পিতা যে বিজ্ঞাপনের

আহ্বানে ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ ৫০৲ টাকা পরিমিত রাজবাটীর বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা তিনি চিরদিন স্মরণে রাখিয়াছিলেন এবং পিতৃব্যবসায়ী ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সমাদর ও সম্মাননা দানে সর্ব্বদাই আনন্দ বোধ করিতেন। ৺ কাশীতে বেদান্ত শিক্ষা জন্য কয়েকটি ছাত্রবৃত্তিও দেওয়া হইতেছে।

ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা প্রদেশে মুনসেফ এবং পরে মধ্যপ্রদেশে সিভিল জজ ছিলেন। তিনি একান্ত দৃঢ় চরিত্র এবং পিতৃভক্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভূদেববাবুর দুই পুত্রেরই নওয়াখালিতে বদলী হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে বলেন। গোবিন্দবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া ছিলেন। আর এক সময়ে গোবিন্দ বাবুর প্রথম জাত পুত্রের দেহান্ত হওয়ার সময় তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্বা ছিলেন। পিতা ঐ নিদারুণ সম্বাদ গোপন রাখিতে বলিলে তিনি প্রসব কালের পর পর্য্যন্ত ঐ কথা প্রকাশ হইতে দেন নাই। তিনি এই ফণ্ড কমিটীর প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৫ অব্দে তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় ভূদেববাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিতেছেন।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ১৬ই মে তারিখে (বৈশাখ শুক্লা একাদশী) সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আত্মীয় পরিজন পরিবৃত থাকিয়া ৺ ভাগীরথীতীরস্থিত তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীর ঘাটে সজ্ঞানে ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে ভূদেব বাবুর পরমগতি লাভ হয়।

ভূদেববাবুর লিখিত পুস্তিকাদি দ্বারা দেশবাসীদিগের উপর তাঁহার প্রভাব বিশেষরূপেই বিস্তারিত হইয়া আছে। তিনি বলিতেন যে মাতৃভাষায় শিক্ষা না করিলে বিষয় ও বস্তু জ্ঞান দৃঢ় হয় না। এই জন্য ইংরাজিতে কিছু পড়িলেই তাহার বাঙ্গালা তরজমা মনে মনে করিয়া লইতে সকলকে উপদেশ দিতেন। মাতৃভাষাতেই

যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের পুস্তক প্রস্তুত হয়, অপর ভাষার সাহায্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র না থাকে, তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশ হিতেচ্ছা প্রণোদিত অন্তঃকরণে ইহা একান্তই অভিলষিত ছিল। নিজে পুস্তক প্রণয়ন পূর্ব্বক সে জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাশক্তি যে কতদিকে পরিচালিত হইত, তাহা তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত নানাবিষয়িণী রচনাবলী হইতেই বুঝিতে পারা যায়—

(১) শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব অর্থাৎ শিক্ষাদানের কৌশল বিজ্ঞাপক স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় পুস্তক এই প্রথম। ভূদেব বাবু অতি সুবিখ্যাত শিক্ষক। বালক শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ এই পুস্তকে নিবদ্ধ আছে।

(২) ঐতিহাসিক উপন্যাস—সর্ব্বপ্রথম রচিত বাঙ্গালা উপন্যাস গ্রন্থ। ইহার নায়ক স্বধর্ম্মানুরাগী মহারাষ্ট্রপতি শিবজী। ইহার অঙ্গুরীয় বিনিময় নামক গল্পটি বড়ই মনোহর ও পবিত্র।

(৩) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক কথা আছে। উহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ কথা গুলি অতি সুন্দর প্রণালীতে লিখিত।

(৪) পুরাবৃত্তসার—মিসরীয় প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির বিবরণ ইহাতে আছে।

(৫) (৬) (৭) (৮) গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের ও বাঙ্গালার ইতিহাস—স্কুল পাঠ্য হইলেও ইহাতে কেবল সন তারিখের ছড়াছড়ি নাই। স্বদেশ ভক্তির অঙ্কুর প্রাপ্তি ইহা হইতে সহজলভ্য এবং এ গুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই লিখিত হইয়াছে।

(৯) ক্ষেত্রতত্ত্ব—জ্যামিতির প্রথম তিন অধ্যায়।

(১০) পুষ্পাঞ্জলি—বেদব্যাসের তীর্থভ্রমণ বর্ণনাচ্ছলে আর্য্য-

শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের গূঢ় অর্থ পুষ্পাঞ্জলিতে প্রকটিত। প্রথম সংস্করণ ১৮৭৬ অব্দে মুদ্রিত হয়। ইহাতে আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, বায়ান্ন পীট সমন্বিত ভারতভূমিই সতীদেহের আধিভৌতিক রূপ এবং তীর্থদর্শনেই অধিভারতী দেবীর পরিক্রমণ করা হয়।

এই পুস্তকে এক্ষণে ভারতবাসীকে কূর্ম্ম প্রকৃতিক অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের অপরিসীম অন্তর্বলে বলীয়ান্ থাকিয়া একান্ত সহিষ্ণু হইতে এবং পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মসাধন করিতে উপদেশ দেওয়া আছে।—

(ক) "কূর্ম্মই সহ। অতএব সহভ্রষ্ট হইও না; কূর্ম্ম পৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না। অপসৃত হইলে একেবারে রসাতল দেখিবে।" (খ) "কষ্ট স্বীকার সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম! সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।" (গ) "তোমরা আপনাদিগের সন্তানগণের নিমিত্ত সেইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য কর। লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই সকল কাজ করে না। যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া মৃত্তিকাতে বৃক্ষবীজ রোপণ করে, সে স্বয়ং সেই বৃক্ষের ফল ভোগ করে না। তাহার পুত্র পৌত্রাদি ঐ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকে। তোমাদিগের এই সহিষ্ণুতার ফলও পরবর্ত্তী পুরুষে ভোগ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত সেই স্বয়ং বর লাভ করিত। কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ সাত দশ পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে কেহ তপঃসিদ্ধ হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃসিদ্ধির ফললাভ করিতে পায়। কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য; কলিযুগ এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।"

(খ) অধিভারতী দেবীর বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জাজ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইহাঁর অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইহাঁকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইহাঁর সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে—কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেব দেবী হইতে ইহাঁর বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন।"

(১১) স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভারতের উন্নতির প্রকৃত ঐতিহাসিক পথ কি তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে যেন মহারাষ্ট্রীয়েরা জয়ী হইয়া ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল এইরূপ কল্পনায় এই গ্রন্থখানি রচিত। হিন্দুয়ানী ত্যাগ না করিয়া, প্রত্যুত প্রকৃত হিন্দুয়ানী বর্দ্ধিত করিয়া কিরূপে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইতে পারে তাহার আভাষ ইহাতে পাওয়া যাইবে। অন্ত্যজ এবং বন্যদিগকে সংযত শিক্ষিত এবং পরিশুদ্ধ (জলাচরণীয়) করিয়া লইয়া ভারত সমাজের পুষ্টি সাধন সম্বন্ধীয় কথাও ইহাতে আছে।

(১২) পারিবারিক প্রবন্ধ—গার্হস্থ্য বিষয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পুস্তক। ইহা গ্রন্থকারের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক পবিত্র সুখোপলব্ধি প্রসূত। ধর্ম্মসূত্রে লক্ষ্য রাখিয়া কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে সকল বিষয়েই পারিবারিক কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইয়া সাচ্ছন্দ্য অধিক হয় এবং সন্তান পালন ভাল হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়।

(১৩) আচার প্রবন্ধ—হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান সমূহ কিরূপ বিজ্ঞানমূলক এবং আমাদের কত উপযোগী এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কত উচ্চ ও উদার তাহার কথা এই পুস্তকে আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় কথাগুলি উদ্ধৃত করা গেল :—

"শুনা গিয়াছে যে, মনুষ্যবুদ্ধিতে চিন্ময় পরব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর রূপই অতি সুসঙ্গত। এস্থলে বিষ্ণুর ধ্যানে যে যে উপাদানের কথা আছে, সে গুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। মেঘশূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম এবং শ্যামবর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌দিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তদ্ভিন্ন, মেঘ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ বিশ্বপালন কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর চারি হস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি? শঙ্খবস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ ‡। অতএব শঙ্খ আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা * শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্ত বিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্ত কাল, জ্ঞান এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণ মাত্র

‡ শব্দ—শব্দ গুণমাকাশং।

* গদ্ ধাতু ভাষণ বা প্রকাশার্থ কর্ত্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।

জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপকল্পনাও হইয়াছে! তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় † শব্দে বাঙ্‌ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ঔপনিষদ পুরুষ বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে, আকাশ বা বিষ্ণুপদ যাঁহার আধিভৌতিক রূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।" (আচার প্রবন্ধ ১৯২-১৯৩ পৃঃ)

অন্যান্য দেব দেবীরও মূর্ত্তি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উক্ত হইয়াছে।—

"কাহার কাহার মতে দেবতাদিগের মূর্ত্তির ভৌতিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করায় লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া ধর্ম্মের হানি জন্মিতে পারে। যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা ভ্রম-সংস্কারের একান্ত অধীন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন, যদি দেবমূর্ত্তির অধিভৌতিক ব্যাখ্যা থাকিল তবে আর উহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন করিয়া থাকিবে। কিন্তু এটী প্রকৃত কথা নয়। সত্যই ব্রহ্ম। সত্য এক হইয়াও অনেক। অজ্ঞতাদি দোষ-নিবন্ধন দেবমূর্ত্ত্যাদির শাস্ত্রসিদ্ধ ত্রিবিধ ব্যাখ্যার অপ্রকাশ হওয়াতেই এই প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কস্মিন্ কালেও ওরূপ কথা মনে করেন নাই। তাঁহারা অধিকারী ভেদের তথ্য পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াও চিরকালই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া আসিতেছেন এবং সেই পথে যাইবার জন্য উত্তেজনা করিতেছেন। ঋক্‌বেদেই বিভিন্ন দেবমূর্ত্তির নিদান ব্যক্ত হইয়া আছে যথা—

† গরুড়—গৃ নিগরণে ধাতু উর প্রত্যয়যোগে গরুর বর্ণ সাম্যাৎ গরুড়।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে।
যুক্তাহস্য হরয়ঃ শতাদশ॥

পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রকট হইয়াছেন; নানারূপ হইবার কারণ উপাসকের ধ্যানসৌকর্য্য। ভগবানের রূপ অনন্ত; তন্মধ্যে দশটী মুখ্য অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের উপাসনায় গৃহীত।

তাহার পর বেদাঙ্গ মধ্যে অনবগতশাস্ত্রার্থব্যক্তির নিন্দাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—

"স্থানুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্যবেদং ন বিজানাতি যোহর্থং।"

যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ (যেহেতু বৈদিক-কালে বেদের অক্ষরার্থ অধিকারী মাত্রেরই জানা ছিল) পরিজ্ঞাত না হয় সে ভারবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ হইয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রও ঈশ্বরধ্যানের ক্রমপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন—

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধংকর্ত্তুং ন শক্নোতি, তদা পৃথিব্যপ্তেজো-বায্বা-কাশ মনোবুদ্ধ্যব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চ-লক্ষ্যং পরিত্যজ্য অপরং অপরং ধ্যায়েৎ এবং পুরুষধ্যানমারভেত।

ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

যো যো যাং যাং তনুংভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।

ভগবান বলিতেছেন যে, যে যে ব্যক্তি আমার যে যে শরীর শ্রদ্ধায় অর্চ্চনা করিতে চায় আমি তাহাতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি।

ফলতঃ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত কথা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নিম্নাধিকারী আপনার অধি

কারের উপযুক্ত দেবমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেই এই বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকের সিদ্ধিসৌকর্য্যার্থ।

অতএব দেবতার রূপ শাস্ত্রকৃতের কল্পনা। সে বিষয়ে সংশয়-মাত্র নাই। কিন্তু সে কল্পনা কাহার যদৃচ্ছাসম্ভূত নয়। ঐ কল্পনার মূলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং "সর্ব্বংসর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে। আচার প্রবন্ধ (২০৪-৫-৬ পৃঃ)

(১১) বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ—উত্তরচরিত মৃচ্ছকটিক ও রত্নাবলী এই তিনখানি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর সমালোচনা এই পুস্তকে করা হইয়াছে। ইহাতেও হিন্দুর উচ্চাদর্শ প্রস্ফুটিত।

(১২) বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ—

এই পুস্তকের শেষভাগে "তন্ত্রের কথা" বলিয়া যে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে, তাহা পাঠে তন্ত্রের সাধনা সম্বন্ধে অনেকটা অভ্যাস হৃদয়ঙ্গম হইয়া উহার উচ্চ উদ্দেশ্য উপলব্ধ হয়। তন্ত্র গুরূপদেশ সাপেক্ষ। এই পুস্তকে ব্রাহ্মদিগকে মহানির্ব্বাণ "তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম পদ্ধতির হিন্দু" নাম লইতে অনুরোধ আছে। সনাতন ধর্ম্মকে মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনুর সহিত তুলনা করিয়া ভূদেব বাবু বলিয়াছেন কামধেনুর অঙ্গপ্রসূত বীরদিগের ন্যায়ই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ মিশনরি আক্রমণের নিরসন করিয়াছেন। বিরাট সনাতন ধর্ম্মের দেহেই যে ব্রাহ্মদিগেরও পৃথক্ অস্তিত্ব পূর্ণকালে লয় প্রাপ্ত হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম বিস্তার কার্য্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণগুণ-

সম্পন্ন (সংযত ও অস্বার্থপর) ভারতবর্ষীয় ভদ্রবংশীয়দিগের কর্ত্তব্য "সমাজ সংস্কার" প্রবন্ধে লিখিত আছে :—

"অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রে বিদ্বান করিলেও অনেক দূর হইবে, কিন্তু যদি উভয়, সংস্কৃত দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন করিতে পার তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্য এতদিন এত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সজীবাবস্থ, আছে, সেই উদ্দেশ্য বিনা বিঘ্নে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহা না হইলেই যে পারিবে না এমন নহে। তবে মধ্য পথে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইবে, কখন কখন শত্রুপক্ষীয়েরা হাসিবে, আর মিত্রপক্ষীয়েরা নিরাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাব মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে। বেকন ডেকার্ট কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়াখণ্ডকে যেমন ধর্ম্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতিঃ ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে। জর্ম্মণ দার্শনিক সোপেনহার বলিয়াছেন, "যেমন গ্রীসদেশ হইতে ইউরোপ যত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাইবে—আমার

জীবনের সুখ এবং মৃত্যুর সম্বল যে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ গ্রন্থনিচয় তাহা মনধিক কাল মধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতীয় সকল গ্রন্থের উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে।" (বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ ১৪২-৩ পৃঃ)

এই পুস্তকের "স্বাধীন চিন্তা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে—"বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন আমাদের নব্য সংস্কারকেরা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মত প্রচার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনাদের ন্যায় "স্বাধীন চিন্তাশীল" বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্দে অধীর হন। এই জন্য তিনি যে আচার ব্যবহারে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাহাদের বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন তখন "কৃতবিদ্যেরা" তাঁহাতে আর স্বাধীন চিন্তার আভাস দেখিতে পাইলেন না। বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তি মার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কারকরিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত ব্যবস্থা বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে "চাঁদে কলঙ্ক" বলিয়া আমি মনে করি; কিন্তু যে জন্যই তাঁহার ঐদিকে প্রবৃত্তি হউক তাঁহার জীবনে অনেকটা একই ভাবের নিয়মানুগামিতা দেখিতে পাই। তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় অন্তঃকরণের পরাধীনতা প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়া সুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে পরাশর স্মৃতির অধীনে থাকিয়া আসিয়া কতকটা স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়ও সেই স্বজাতীয় নায়কেরই অধীন ছিলেন, সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে ঐ স্মৃতির মতবাদত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্য কোন কিছু

খুঁজিতে যান নাই এবং ইংরাজের গতগুলি "নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রসূত" বলিয়া থ্যাপনা করিতে যান নাই।

ভূদেববাবুর সংস্কারপূত অতিপবিত্র পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে তাঁহাদের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বিয়োগের পরেও কেহ কখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। সুতরাং তিনি বিধবাবিবাহের বিরোধী হইবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ *। ভারত সমাজে দিব্যভাবের সম্বর্দ্ধনা হয় তাদৃশ কার্য্যকেই তিনি সংস্কার বলিয়া মনে করিতেন এবং বিধবার বিবাহ না হইয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের সুচারুরূপে সংরক্ষণ চেষ্টাকেই সমাজের হিতসাধক বলিয়া বুঝিতেন। ভদ্র হিন্দুর গৃহে বিধবার নির্য্যাতনের কথা সাহেবদের কল্পনাপ্রসূত। তবে কোন কোন গৃহস্থঘরে কর্ত্তার অজ্ঞানতানিবন্ধন অথবা কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা না থাকায় বিধবার সুপালনাভাব যে কখন কখন হয় না এমত

* যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার, তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই ত আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবেই দুইবার বিবাহ করিলে মহা সঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহাতেই কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে, পবিত্রতা নষ্ট হইবে। এই রূপে ভাবিয়া দেখিলে কোমতের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই একাধিক বার বিবাহ করিবেন না। আমাদের শাস্ত্রেও বলে প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না। (পারিবারিক প্রবন্ধ ১২৫ পৃঃ)

নহে। সেইরূপ কারণে স্ত্রী পুত্রের অপালনও কি কোথাও হয় না? ভূদেব বাবু তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থে "বৈধব্য ব্রত" নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলিকে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতায় পরিষিক্ত করিয়া যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন তদনুযায়ী বিধবা পালন করিলে সংসার অতি পবিত্র হইয়া উঠে।

(১৩) সামাজিক প্রবন্ধ—সমাজ তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধসমূহ। ১২৯৩ সালের ২৪শে পৌষ হইতে সর্ব্বপ্রথম এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার ছোট লাট বাহাদুর সার চর্লস ঈলিয়ট এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্বরূপে সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন ;—

"No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share." অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ নাই, যাহাতে একাধারে এত জ্ঞান ও এতবেশী অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সমভাবে আয়ত্ত থাকিয়া যাঁহার মনকে গঠিত করিয়াছে এমন একজন প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মণ সন্তানের ইহা আজীবন অধ্যয়নের ফল।

এই পুস্তকের কর্ত্তব্যনির্ণয়, নেতৃপ্রতীক্ষা, প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা সকল ভারতবাসীরই জানা উচিত। বর্ত্তমান ভারতে এমন কোন কথা উঠিতে পারে না যাহার সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ এবং ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ এই পুস্তকে পাওয়া যায় না। কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(ক) প্রতিবাসীর কোন কাজ করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষা গুরুতর মনে করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(খ) ভিন্ন দেশীয়দিগের প্রতি সাহায্যদানে ও দয়া প্রদর্শনে ত্রুটি করিতে নাই।

(গ) রাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন সুপালিত ও সুব্যবস্থিত পরিবারে কর্ত্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে হয় না সেইরূপ রাজার প্রতি সম্ভ্রমশীল হইয়া বিবেচনা ও ধীরতা পূর্ব্বক সকল কার্য্য সুচারুরূপে নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়।

(ঘ) রাজপুরুষদের সহিত ব্যবহারে সুনম্র ও সত্যপূত ও নির্ভীক হওয়া আবশ্যক।

(ঙ) রাজার জাতীয় লোকের সহিতও সত্যপূত ও নির্ভীক, সতর্ক ও নম্র হওয়া উচিত।

(চ) দেশীয় রাজপুরুষগণ যাহাতে স্ব স্ব কার্য্য ভালরূপে করিতে পারেন সেজন্য প্রীতিসহ সাহায্য করা আবশ্যক।

(ছ) সন্ন্যাসীদিগের সুশিক্ষিত এবং সংযত হইয়া জ্ঞান এবং সংযম বিস্তারে লিপ্ত হওয়া উচিত।

(জ) দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া অবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশপ্রসূত বিলাস দ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। স্বদেশজাত বিলাস দ্রব্যও বর্জ্জন করা সঙ্গত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পুস্তকাদি যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায় তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া একান্তই উচিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করাই সঙ্গত।

(ঝ) পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার দ্বারা উৎকৃষ্ট পানীয় জলের

সংস্থান এবং দূষিত ভূম্যাদি ভাগের উদ্ধার করা উচিত। "পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা তু লভতে মৌলিকং ফলং।"

(ঞ) যাহাতে দেশীয় লোকদিগের উপকার হয় সেইরূপ কার্য্যই রাজপুরুষদিগের নামে করিয়া তাঁহাদের সম্মান করা উচিত অপব্যয় করিতে নাই। "নাকার্য্যে ধনমুৎসৃজেৎ।"

(ট) বিদ্যা নিজেদের করিয়া লইতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়রা এবং শিখেরা ইউরোপীয় অফিসার রাখিয়াছিল; জাপানীদের ন্যায় নিজেরা ইয়ুরোপে গিয়া অথবা ইয়ুরোপীয় অফিসরদের নিকট এদেশে থাকিয়াই উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধ বিদ্যা শিখে নাই। সুতরাং ঐ বিদ্যা নিজেদের হয় নাই। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দৃঢ় চরিত্র ভাল লোক বাছিয়া বিদেশে প্রেরণ করা উচিত। নির্লোভ পরার্থপ্রাণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতেই ভারতে সকল উন্নতি হইয়াছিল। যুগোচিত কার্য্যের—নূতন তাঁত প্রভৃতি উদ্ভাবনের উপযুক্ত লোকও উহাঁদের ন্যায় গুণসম্পন্ন লোকদিগেরই মধ্য হইতে বাহির হওয়া সম্ভব। উহাঁদের মধ্যে কাহার কাহার শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে ব্রতী হওয়া সঙ্গত। সর্ব্বপ্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের কার্য্য।—বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।

(ঠ) বিজ্ঞানই ইউরোপীয় বিদ্যার সারাৎসার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনা নাই বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্পগুনা হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শাস্ত্র নয়। উহা সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে এতদিনে তাহার সমূহ ফল দৃষ্ট হইত। দেশে কলকারখানা বাড়িত এবং বিজ্ঞান শিক্ষিতেরা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের এবং আচারের প্রতি সজ্ঞান ভক্তি সম্পন্ন হইতে পারিতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন আর্য্যশাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মনুষ্যের সাধন চেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, অপরাপর

দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্য্যশাস্ত্রের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্য্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিজ্ঞান আরও অনেকদূর অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌছিতে পারিবেন। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৯৬ পৃঃ)

(ড) ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ প্রমোদ বাহাদুরী সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাত যাত্রাসম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ, শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য আগ্রহ, দীনতা প্রকাশ করেন তাঁহারা যে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেকস্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও দু একস্থলে ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি
প্রব্রুয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণাচার থাকিবেন।

অতএব যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপর, সংযতেন্দ্রিয় এবং আত্মগৌরববিশিষ্ট, সুতরাং

আত্মসমাজত্যাগে অনিচ্ছু এমন লোকদিগকেই পাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটলে বিদেশীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শিল্প ঐরূপেই আসিয়াছিল। ইরান, স্তাম্বুল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারুকরেরা আসিয়া গালিচা সিদ্রি বন্দুকাদি শিল্প এদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৯৮ পৃঃ)

(চ) ভারতবাসীর যতপ্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় সকলগুলিই সম্মিলন প্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারতবাসী রত্নপ্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়া দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল সম্মিলনে অক্ষমতা। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৬৮ পৃঃ)

কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষকর্ত্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোন পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে তৎসম্বন্ধে আমাদের অবশ্য করণীয় দুইটী। একটী এই যে, যখন কোন শুভকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত [illegible]ক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয় নতুবা রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই—আপনার প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোন স্বজা-

তীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমরা স্বহস্তে মাটী তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পূজা করিতে এবং তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিতে জানি। অতএব প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড় করিয়া লইতে পারি। বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড় লোক জন্মিয়া যাইতে পারেন। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বড় লোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়া দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড় লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই অতএব ন-কড়ে ছ-কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড় লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলতঃ অনুবর্ত্তী লোক থাকে বলিয়াই বড় লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, বৈজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা, ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৬৮-৯)

যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাঁহার কয়েকটী লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

[১] তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয়লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন। [২] তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। [৩] তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র :: অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদত্ত সমুদয় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। [৪] তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদি আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরও সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্ন মাত্র পাইলেই ভগবদ্ বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেবা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংশসম্ভবঃ॥"

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাস মাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রকৃত বড়লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

(সামাজিক প্রবন্ধ ২৭১ পৃঃ)

(গ) একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব দেশের জন সাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং মহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। শিক্ষাকার্য্যও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্দ্ধন চেষ্টার সহিত স্বজাতি বাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রে একটী দশম অবতারের কথা আছে। উহাঁর নাম কল্কি। তিনি সম্ভলগ্রামে, বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ় পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোক্তির যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কথাই সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন—"সম্ভলগ্রামের" * অর্থ নিশ্চয়াত্মকচিত্তসমূহ, "বিষ্ণু যশার" † অর্থ 'ব্যাপক আজ্ঞা', "সুমতির" ‡

* সম্ভলগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি—'ভল' ধাতু নিরূপণার্থ, অৎ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, সম্ভল অর্থে সম্যক্ প্রকারে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকচিত্ত, গ্রাম অর্থে সমূহ, অতএব সম্ভলগ্রাম—নিশ্চয়াত্মকচিত্ত সমূহ।

† বিষ্ণুযশা বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক, যশস্ শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা লভ্য, অতএব বিষ্ণুযশা—ব্যাপক আজ্ঞা।

‡ সুমতি—সুন্দর বুদ্ধি।

অর্থ 'সাধুবুদ্ধি' এবং "কল্কির" † অর্থ 'কলহ নাশন"। অর্থাৎ লোকের হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) এবং লোক সমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলে সুবুদ্ধি হইতে কলহ নিবারণ দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভলগ্রাম, সমস্ত ভারত সমাজই বিষ্ণুযশা, সকল ব্যক্তিই সুমতি স্থানীয়; এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহবিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্য্য। কল্কিদেব যে অসি ধারণ করিবেন সেটী জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসি—অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলন সাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহাঅশ্ব।

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ হয় তাহা হইলে কোন সময়ে য়িহুদী জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়া ঐ জাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আমাদেরও ভাবী অবতার কল্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটী ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য়িহুদীরা তাহাদিগের ভাবী অবতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কল্কিকে সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কল্কিদেব আয়সকৃপাণ হস্ত সামান্য অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ

‡ কল্কি—অর্থে কলহ বা পাপ (কলহাৎ কলিরুৎপন্নো যেন ধর্ম্মং বিনশ্যতি) কলি হইতে কণ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ কল্ক শব্দ। কল্কের অর্থাৎ পাপের বা কলহের নাশ করেন এই অর্থে ই প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ কল্কি=কলহ বা পাপনাশক। কল্কি পুরাণেই কথিত আছে "কল্কি-কল্ক বিনাশার্থং আবির্ভূতং বিহুর্বুধাঃ।"

বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, ভারতাদিষ্ঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভবপর।

(৩) জাতীয় ভাবটী হৃদয়োন্নতি সোপানের একটী প্রশস্ত ধাপ। [১] নিজের প্রতি অনুরাগ, [২] নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ [৩] বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, [৪] স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, [৫] নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, [৬] স্বজাতি বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে [৭] স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোম্‌টির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। [৮] মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের এই সীমা। [১০] সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সার্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে আত্ম নিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, সেটী আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্ব্বজনীন প্রীতিকে হৃদয় নিহিত করিয়া ভারতবাসী স্বদেশীদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃপুরুষোত্তমের

প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্ম্মসূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্র সহায়ে আপনার রক্ষা বিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে কুশিক্ষালব্ধ স্বাতন্ত্রিকতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরিহার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন এবং আত্ম সমাজকেই ধর্ম্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ়ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে, এই স্বজাতি বাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যা-বৃদ্ধিকর, ধনবৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর কার্য্য সকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছু-কাল ঐ সকল কার্য্য সত্যাবলম্বনে, সতেজ, সুবিস্তৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকসিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্ম-বাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতম আলোক স্ফূরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পর-জাতি বিদ্বেষ এবং পরজাতি পীড়ন তাঁহার স্বজাতি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটী মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

(সামাজিক প্রবন্ধ ৩১৩—৩১৫ পৃঃ)

স্বদেশবাসীকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্য সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত আরও কয়েকটী সাধারণ উপদেশের উল্লেখ করা যাই-তেছে।—

(১) যুগাবতারের আবির্ভাব নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু কখন কোন পরিবারে ঘটিবে তাহা জানা নাই, সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবের আশায় সকল পরিবারেরই শুচি ও সমাহিত হইয়া ধর্ম্ম পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত।

(২) জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং কর্ম্মমার্গ মধ্যে ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ভক্তি জ্ঞান সমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করা উচিত। ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ করিতে নাই। জীবনের ছোট বড় সকল কার্য্যই পূজাভাবে করিতে হয়।—"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।"

(৩) পুত্র যাহাতে নিজের অপেক্ষা [বল বুদ্ধি ও চরিত্রে] উন্নত হয় সেই চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে ও ব্যবহারে করা কর্ত্তব্য। তাহাতেই পারিবারিক কার্য্যে ভগবানের পূজা হয়। উহাতেই মনুষ্য সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতি। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং" ইহাই বিধি।

[৪] যাহাতে অন্যের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সম্বর্দ্ধিত হয়, কায়, মন, বাক্য এবং ব্যবহারে এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা।

[৫] সর্ব্বদাই বিচার দ্বারা এবং ভক্তির সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভেদ জ্ঞানের ত্যাগ পূর্ব্বক সকল কর্ম্মে এবং সকল সময়ে বিশ্বে এবং বিশ্বাত্মায় প্রীতির বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা অবিচলিত শান্তি ও আনন্দ লাভ চেষ্টা করিবে। সচ্চিদানন্দের সজ্ঞান সভক্তিক ধ্যানলব্ধ সমাধিই চরম লক্ষ্য। উহাতেই জীবন্মুক্তি।

ভূদেব বাবু ১২৭১ অব্দ হইতে "শিক্ষাদর্পণ" নামক এক খানি শিক্ষা বিষয়ক পত্র পাঁচ বৎসর পরিচালিত করেন। ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এডুকেশন গেজেট নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারিত্ব অর্পণ করেন।

১৮৫৬ অব্দে তাঁহার কথাতে মিঃ হজসন প্রাটের উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষাদান এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এবং প্রজার অভাব পরস্পরকে সহজ ভাবে জ্ঞাপন করা। রাজা প্রজা উভয়েই কতকটা ভুল বুঝাতেই ১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহী মিউটিনি হইয়াছিল ভূদেব বাবুর এই বিশ্বাস ছিল।

ভূদেব বাবুর পূর্ব্বে রেভাঃ ওব্রিয়েন স্মিথসাহেব, বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বাবু প্যারীচরণ সরকার মাসিক বেতনে সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। পত্রখানি গবর্ণমেণ্টেরই ছিল। ভূদেব বাবু ভূতিভুক্ সম্পাদক হইতে স্বীকার না করায় এডুকেশন গেজেটের স্বত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা বিভাগ হইতে মাসিক ৩০০৲ গ্রাণ্ট-ইন-এড সাধারণতঃ যেরূপ স্কুল প্রভৃতির সাহায্যে দেওয়া হইয়া থাকে সেইভাবে দেওয়া হয়। ঐ সংবাদ পত্রের স্বত্ব বিশ্বনাথ ফণ্ডে তিনি দান করায় সেই ফণ্ডের সমিতি দ্বারা উহা এক্ষণে পরিচালিত হইতেছে।

অনেক ইংরাজেও ভূদেব বাবুকে ভক্তি করিতেন। দেশীয় লোকের ত কথাই নাই!

স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্বরূপে কনভোকেশনের বক্তৃতা স্থলে [১৮৯৪] ভূদেববাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

A man of wide culture, familiar with all the main developments of European thought and holding liberal views on many social subjects, he was a Hindu of Hindus in all that concerned the regulation of his own life and the doctrines of his religion. In the efficacy of the doctrines of

the Vedantic Philosoply he had a profound belief both as a system of philosophy and as a rule of faith. In it he claimed to find full satisfaction for all his spiritual needs—অর্থাৎ ভূদেব বাবুর পড়াশুনা অনেক ছিল এবং ইউরোপীয় চিন্তাশীলতার ফলস্বরূপ উৎপন্ন প্রধান, প্রধান, বিষয়গুলি সমস্তই তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। অনেক সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে তিনি উদার মতের পরিপোষক ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম এবং দৈনন্দিন জীবনের অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে তিনি এক-জন খাঁটি হিন্দু ছিলেন—সর্ব্বদা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথানুযায়ী হইয়াই চলিতেন। বেদান্ত দর্শনেই তাঁহার সমধিক বিশ্বাস ছিল। দর্শনশাস্ত্র হিসাবেও তিনি বেদান্তকেই শ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া মান্য করিতেন। আধ্যাত্মিক কোন বিষয় বুঝাইবার আবশ্যক হইলে তিনি ঐ দর্শন সাহায্যেই তাহা বুঝিয়া সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করি-তেন।

মিঃ সিঃ ই বকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "বেঙ্গল অণ্ডার দি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরস্" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"সম্পূর্ণ সৌজন্য সহ একান্ত দৃঢ়তার সুমিশ্রণ ভূদেব বাবুর চরিত্রে ছিল। সর্ব্ব বিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত যে ভাবে চলিতেন তাহা-তেই তাঁহার এইরূপ চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাওয়া যায়।

অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যেমন কড়া, অপর সময়ে আবার সে সকলের প্রতি তেমনি সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন।

প্রতি বৎসর বার্ষিক রিপোর্ট দিবার সময় অধীনস্থ ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ ৪।৫ দিনের জন্য সকলেই আসিয়া একত্রিত হই-তেন। সকলেই ভূদেব বাবুর বাড়ীতে বাসা পাইতেন। এবং ভূদেব বাবুও সকলকে লইয়া একত্রে আহারাদি ও আমোদ আহ্লাদ

করিতেন। সন্তানদের ন্যায় আদর সকলেই পাইতেন। বস্তুতঃ স্বদেশীয় উচ্চতর পদস্থ সহৃদয় ব্যক্তির অধীনে চাকরি করিয়া যে কত সুখ হইতে পারে তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতেন। এক সময়ে একত্রে খাইতে বসিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন "এটা ত আমাদের (মিটিং) কার্য্যের জন্য একত্র সম্মিলন) নয়, এ মিট ইটিং (মাংস ভোজনের বন্দোবস্ত)। সমস্ত-দিন একাগ্রচিত্তে সকালে সরকারী কার্য্য করিয়া সকাল বৈকাল ও রাত্রিতে একত্র মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

কোন এক আধ পাগলা ডেপুটী ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবুর অধীনে আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ডাইরেক্টারের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করেন যে "ভূদেব বাবু ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরদিগের সহিত হাস্য পরিহাস দাবা খেলা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, আবার কাজের সম্বন্ধে সেইদিনেই হয়ত সামান্য মাত্র ত্রুটি দেখিলে অত্যন্ত অধিক কড়াকড়ি করিয়া থাকেন। 'তখনই' ভুল শোধরাইয়া দিতে বলেন। তাঁহার মেজাজের ঠিক না পাওয়ায় বড়ই অসুবিধা হয়। ডাইরেক্টার সাহেব সেই দরখাস্ত ভূদেববাবুর নিকট দিয়া লেখেন যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সহৃদয়তা, উদারতা ও কার্য্য দক্ষতার এরূপ সুন্দর প্রশংসাপত্র লাভ অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।"

তিনি ইউরোপীয়দিগকে যে সকল কথা বলিতেন তাহা গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন ও সরস উপদেশ মূলক এবং নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন ও আলোচনায় মনকে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইত।

সার লোপার লেথব্রিজ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Vidya-sagar was the very ideal of a high mind, bene-volent and intellectual Brahmin of the old school—Kristo Das the model of the kindly, clever,

versatile man of the world—but Babu Bhoodeb in his later years seemed to me to combine some of the best qualities of both these great men," অর্থাৎ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চাশয়, উপকারক এবং বুদ্ধিমান প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মণের, এবং কৃষ্ণদাস পাল একজন সদয় স্বভাব সুদক্ষ কাজের লোকের আদর্শ ছিলেন ; বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে উল্লিখিত মহাত্মদ্বয়ের প্রধান প্রধান যাবতীয় উৎকৃষ্টগুণ গুলির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়।

ভূদেববাবু সম্বন্ধে কতকগুলি চলিত গল্প একত্র করিয়া দেওয়া যাইতেছে ;—

(১) জেলের প্রধান পরিদর্শক মিষ্টার হিল একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যে ভাষায় যে শব্দ নাই, সে জাতির মধ্যে তদনুরূপ ভাবও নাই। যেমন বাঙ্গালা ভাষায় "থ্যাঙ্ক ইউ" (তোমাকে ধন্যবাদ) শব্দের মত কোন কথা প্রচলিত নাই।" ভূদেব বাবু বলেন "এ সূত্র ঠিক। বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে গভীর [Too deep for words] কৃতজ্ঞতা আছে। কে তাহার জন্য কি করিল তাহা সে বুঝিতে পারে ও মনে রাখে ; মুখে একটা "থ্যাঙ্ক ইউ" বলিয়া সারিয়া দেয় না। আর দেখুন 'হমবগ' কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দও নাই আর বাঙ্গালীর মধ্যে সেভাবও নাই"।

হঠকারিতাসহ একটা জাতির নিন্দা করিয়া ফেলিয়া সাহেব একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত উত্তরে খুব খুসি হইয়া বলিয়াছিলেন, (you have served me right অর্থাৎ আমার উচিত হালই করিয়াছ।

(২) অ্যাটকিনসাহেব (ডিরেক্টার) একদিন জিজ্ঞাসা করেন "আপনি মুখোপাধ্যায় না লিখিয়া মুখার্জ্জি লেখেন কেন ?" ভূদেব বাবু হাসিয়া উত্তর দেন "আপনারা বিদ্যার গৌরব কম করেন,

ধনের গৌরব বেশী করেন। তাই বাঙ্গালায় লিখি মুখোপাধ্যায় আর ইংরাজীতে লিখি মুখার্জ্জি। কোন সুদূর প্রাচীনকালে আমাদের মুখরা গ্রাম জায়গীর ছিল। 'মুখরীয় ইতি খ্যাতো মুখরা গ্রামি বাসতঃ'।"

(৩) কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ সহৃদয় সাহেবের সহিত রক্ষণশীলনীতি ও অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে ভূদেববাবু বাগানে শিশু পুত্র ক্রোড়ে উপবিষ্ট সাহেবের মেমকে জানলা দিয়া দেখাইয়া বলেন "তোমার জন্য বিশেষ যত্ন রক্ষণের আর প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঐ শিশুটীর আছে। ভারতের দুর্ব্বল কারখানা গুলির এখন শৈশব।"

(৪) এক সময়ে অ্যাটকিনসন সাহেব ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ভূদেববাবুকে বলেন "তুমি বা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বা বাবু কৃষ্ণদাস পাল আমাদের সহিত একত্রে খাইলে আমাদের তৃপ্তি হইত, কিন্তু তোমরা খাও না। যাহাদের সহিত খাইতে প্রবৃত্তি হয় না তাহারাই হ্যাট কলার ও নেকটাই সজ্জা পরিয়া আমাদের সহিত খাইতে আইসে।" ভূদেব বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন "আমরা তিন জনে আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া আমাদের বেশ ও আহার পরিবর্ত্তন করিলে আমরাও সেই দলে পড়িতাম নাকি? আপনার ভাল লাগে আমাদের সমাজভক্তি। উহা ত্যাগ করিলেই বীরপ্রকৃতিক এবং স্বসমাজ ভক্ত ইংরাজের ঘৃণার উদ্রেক হয়।" অ্যাটকিনসন সাহেব ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন।

(৫) ১৮৭১ অব্দে যখন ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন তখন তাঁহার ক্লাসের মাষ্টার কথায় কথায় বলেন "তোমাদের বাড়ী এক কৃপণের বাড়ী, দুর্গোৎসব হয় না, অথচ অত টাকা মাহিনা আসিতেছে।" এই কথা পুত্র পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "আমাদের দুর্গোৎ-

সব হয় না কেন ?" ভূদেব বাবু বলেন "ঠাকুর ঘরে চণ্ডীপাঠ, ঘটে পূজা এবং ঐ সময়ে কয়েকটী ব্রাহ্মণভোজন, এ সবই ত হয়। তবে নূতন করিয়া প্রতিমা আনা বা ঢাকঢোল বা যাত্রা গান হয় না বটে। কিন্তু ওগুলি ত পূজার প্রধান অঙ্গ নয়!" তেইশ বৎসর পরে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল দস্তখত হইলে ভূদেব বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের দুর্গোৎসবের ঢাকঢোলের যাত্রাগানের টাকা বাঁচানয় একটী স্থায়ী সৎকার্য্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইতে পারিল। একথা যেন পুরুষ পুরুষানুক্রমে স্মরণ থাকে। অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় কার্য্যে ধনের বা শক্তির অপব্যয় করিয়া ফেলিলে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার জন্য ক্ষমতা বাকী থাকে না।"

(৬) ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র যখন হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ৺ বঙ্কিম বাবু ও ৺ গৌরদাস বাবুও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কাছারি বন্ধ হইবার পর এক এক করিয়া তিন জনেই ভাড়াটে গাড়ী ডাকাইয়া রওয়ানা হইলেন। ঐ দিন ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুত্র রেভিনিউ বোর্ডে কোন কার্য্যের জন্য গিয়াছিলেন। তথায় অনেকটা দেরী হওয়ায় সময় হিসাবে গাড়িভাড়া ২৷৷০ পড়ে। মাসের শেষে ভূদেব বাবুর এই পুত্রই তাঁহাকে খরচের খাতার নকল পাঠাইয়া দিতেন। উহা চুঁচুড়ার বাড়ীর সাংসারিক খরচের খাতায় আঁটা হইত। ঐ হিসাবে গাড়ি ভাড়া ২৷৷০ দেখিয়া ভূদেব বাবু আপত্তি করিলে পুত্র বলিলেন হাঁটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়াই কলিকাতার কাজে অন্য দিন যাই, কিন্তু ঐ দিন দুইজন ডেপুটী গাড়ী ডাকানয় তাঁহাদের সমক্ষে আমিও গাড়ি ডাকিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভূদেব বাবু তখন আর কিছুই বলিলেন না। পরবারের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন পিতাপুত্রে

চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইল তখন জানাইলেন যে সে দিন তিনি সেই বয়সে হাবড়ার পুল হাঁটিয়া পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গিয়াছিলেন এবং খরচ বাঁচাইয়াছেন। ভূদেব বাবু বলিলেন "অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রেই অপব্যয়।" পুত্রের ইজ্জত সম্বন্ধে বৃথা ভয় এবং অসঙ্গত সকল ভ্রম কাটিয়া গেল।

ঐ সময়ে তিনি আরও বলেন "নিজের শরীরের উপরে ব্যয় সঙ্কোচে লজ্জার কারণ নাই। সৎপথে—নিবৃত্তির পথে—যখন চলিবে তখন লোক নিন্দার বা লোক লজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং যাহাতে সাধারণের মত সৎপথে যায় সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যান কেন?" তিনি উত্তর পান "চতুর্থশ্রেণী নাই বলিয়া।" ঐ কথাতে ধনী ইংলণ্ডের অনেক উপকার হইয়াছে—আর আমরা দরিদ্র সাবেক মোটা চাল চলন ছাড়িয়া কাঙ্গালের ঘোঁড়ারোগে পড়িতেছি। চটী পায়ে দোবজা গায়ে পদব্রজে আগত পবিত্র মহা পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়াই এদেশের আদর্শ ছিল। অর্থাৎ বিদ্যা ও পবিত্র চরিত্রই এদেশে মান্যের স্থান ছিল।"

ভূদেববাবুর বয়স যখন সাত বৎসরেরও কম, তখন একদিন তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মাণিকতলার একটী বাগানে আনিয়া একাকী ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তুমি একেলা এখান হইতে বাড়ী যাও। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য বালককে ঐ সময় হইতেই আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া! আত্মনির্ভরতা শিখাইবার জন্য তিনি আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতেন। এরূপ পবিত্র স্বভাব অসাধারণ সংযমশীল শাস্ত্রজ্ঞ স্থিরবুদ্ধি স্নেহময় পিতার চেষ্টা কখনই বিফল হয় না।

(৭) ভূদেব বাবু বহরমপুরে থাকার সময়ে বঙ্কিমবাবু তথাকার ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি ভূদেব বাবুর বাসায় আসিতেন। বহরমপুরের কলেক্টরীর একজন প্রধান আমলাও মধ্যে মধ্যে ভূদেব বাবুর বাসায় আসিয়া কথাবার্ত্তায় সকলের সহিত যোগ দিতেন। একদিন বঙ্কিম বাবু যখন ভূদেব বাবুর নিকট বসিয়া আছেন এমন সময়ে ঐ আমলা আসিয়া সেখানে বসিলে বঙ্কিমবাবু হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দুই একদিন পরে আর একদিন বঙ্কিম বাবু আসিয়া দেখিলেন ঐ আমলাটি বসিয়া আছেন, দেখিয়া আর না বসিয়া 'কাজ একটা মনে পড়িল' বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ যে ঘটিতেছে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহার পরদিন ভূদেব বাবুকে বলেন, "আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?" তাহাতে ভূদেব বাবু বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, চাকরীর পদমর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে, চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকরে নয়—সিভিলিয়ান কমিশনর ইউরোপীয় সব ডেপুটীর সহিতও ক্লবে মিশেন। ঐ আমলাটিও ত ব্রাহ্মণ। এ সকল কথা বঙ্কিমবাবুর মনঃপূত হইল না। "সব ডেপুটীরা আমলা ক্লাসের নয়"—সেদিন একটু ক্ষুণ্ণভাবে ইহা বলিয়াই অন্য কথাবার্ত্তা পাড়িলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভূদেব বাবু বলিলেন, "কন্যা বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইতেছে। যাহাদের কুল আছে তাহাদের বিদ্যা নাই, যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে তাহাদের অন্নসংস্থান নাই"—এই কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার একটি মেয়ের বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি," ভূদেব বাবু বলিলেন, "তোমাদেরই ঘর, পুরুষে তোমার চেয়ে কিছু উঁচু একজন আছেন। ছেলে এবারে প্রথম বিভাগে বি এ পাশ হইয়াছে, ছেলে মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

বাপ কেরাণীগিরি করে এবং বলে ছেলের বিষয় থেকে খাইব কেন? কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করায় কোন অসুবিধা নাই যে, উহার বিষয় রক্ষায় সাহায্য করাতে নিজে খাটিয়া খাইবার সময় পাইব না, সে লোকটিকে তুমি জান, এখানকার কলেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে লাগিতে পারে।" বঙ্কিম বাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন, "কে? তাঁর ছেলে এত ভাল আর তাঁর মন এত উঁচু এবং কুলেও এরূপ তাহাত জানিতাম না!" তখন ভূদেব বাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিম বাবু সব বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এটা সেদিনকার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল। আপনার কাছে আসিয়া যদি সৎশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব? যেখানে কন্যাদানের কথা মনে হইতে পারে সেখানে আর আফিসের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায়? এ বিষয়ে আমার বড়ই বিষম ভ্রম ছিল।"

(৮) এক সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন নাই, ইহার কারণ কি?" উত্তরে তিনি বলেন —"গ্রীক রোমীয় এবং ইংরাজ এই তিনটী সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখিবার জিনিস অনেক আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ত দুইটি প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র।" ভারতবাসীর কি কি পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে জিজ্ঞাসায় ভূদেব বাবু উত্তর দেন, "(১) স্বধর্ম্মবিদ্বেষ,—হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর কোন স্থানে বসিলে তথায় গোবর জল দেওয়া হয়—একটী ছাগল আসিয়া তথায় বিষ্ঠাত্যাগ

করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে। অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বঘটে নারায়ণ আছেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং শ্বপাকে" সমদর্শন করিতে হয়। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের জন্য ভগবান তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মীপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে—শাস্তা ও শিক্ষক রূপে ভারতে প্রেরণ করেন। ইহাঁরা আহারে ব্যবহারে স্বধর্ম্মীর মধ্যে পণ্ডিতে এবং মূর্খে, সুলতানে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহস্র সহস্র "একত্র" হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বন্দনা কি সুন্দর দৃশ্য! অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানীর ভিতর থাকে ততক্ষণই ঘৃণিত, উহারা যেই মুসলমান হয় অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব!" তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়। এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজত্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে ঐ দোষটা একটু কাটিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়ের মোগলের সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধের সময়, বিবাহে ও আহারে বর্ণভেদ রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার জাতিতে ধাঙ্গড়, গাইকবাড় জাতিতে মেষপালক এবং সিন্ধিয়া জাতিতে কাহার হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহপদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও সকলে আহার সম্বন্ধে সম্মিলন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (১) স্বদেশী বিদ্বেষ—ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মীরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্ট্রীয় এবং শিখ প্রাদেশিক ভাবের গণ্ডীর

বাহির হইতে পারে নাই, সকলেই যে ভারত সন্তান এবং তাহাদের ভালবাসার পাত্র ইহা বুঝিয়া স্বদেশী প্রেমিক হইতে পারে নাই। শিখ সহিন্দ প্রভৃতি বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় নির্ম্মমভাবে রাজপুতানা ও বাঙ্গালা লুঠিয়াছিল এবং লুঠিয়াই থাকিয়া গিয়াছিল; ভারতে একচ্ছত্র মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশীপীড়ন পাপ জন্য তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের ক্ষালন জন্য ভগবান সমগ্র পৃথিবী মধ্যে স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ওয়েল্‌শ, স্কচ, আইরিশ, ডিসেণ্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেসবিটিরিয়াম, রোমান কাথলিক প্রভৃতি ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই দেশের কাজে এক জোট। ক্লাইব একজন সামান্য ইংরাজ কেরাণী ছিলেন। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজকোষের ধনে উহাঁকে কেহ স্বদেশীদ্রোহী করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি অনায়াসে মিরজাফর প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। কোন একজন ইংরাজকে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জাতিই পরিতৃপ্ত হয়। এমন কি সাধারণ ইংরাজ জুরি সময়ে সময়ে ইংরাজ অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাকে অন্যায্যভাবে "নটগিল্টি" (নির্দ্দোষ) বলিয়া নিজেরাই নরকে যাইতে প্রস্তুত! অতটা ভাল নয়—ধর্ম্মই সর্ব্বোপরি—কিন্তু ইহাঁদের আগমনে ও সুদৃঢ় রাজ্যশাসনে সমগ্র ভারত যে একদেশ তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহাঁদের প্রদত্ত রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধায় ভারতের আভ্যন্তরিক সম্মিলন সাধন দ্রুতবেগেই হইতেছে এবং ইংরাজরাজ ভারতের একছত্রে সম্মিলন সাধন করিয়া অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়াছেন। ফলতঃ ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম এবং বর্ণ নির্ব্বিশেষে একটা জাতীয় ভাব বা স্বদেশী প্রেম বিধিপ্রেরিত ইংরাজের

আগমনেই সাধারণের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইতেছে এবং বহুশত বৎসর ইহাঁদের শাসনে থাকিয়াই ভারতবাসী উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভারতবাসীরই মুসলমানের আদর্শে স্বধর্ম্মী-প্রেম ও ইংরাজের আদর্শে স্বদেশী-প্রেম অনুশীলন করিবার খুবই সুবিধা ইংরাজদের আমলে ঘটিয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভারত ভূমিতে স্বধর্ম্মের এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ভালবাসার পোষণ উপলক্ষে অপর ধর্ম্মের বা অপর দেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ করা বা ধর্ম্মপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হওয়া চলিবে না; উহা ভারত-বাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার এবং উচ্চ আছেন।"

(৯) দয়াসাগর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন সময়ে ক্ষুব্ধ হইয়া কাহাকেও বলিয়াছিলেন "আমি ত উহার কোন উপ-কার করি নাই, ও কেন আমার নিন্দা করিতেছে?" ভূদেব বাবুকে কখনও এরূপ অকৃতজ্ঞতা জন্য ক্ষোভ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার সংসৃষ্ট সকলেই তাঁহাকে তাঁহার নিষ্কাম সহায়তার জন্য একান্ত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাদান ক্ষমতায় অনেকটাই ভাল হইয়া যাইতেন। এক সময়ে কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ উক্তি উল্লেখে লোকের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন "কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করাটাতেই আশাভঙ্গের কারণ নিহিত আছে। তা ছাড়া সক-লের প্রতি সব সময়ে এক মাপের দয়ার কার্য্য করাও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। দানটা "দেশে কালে চ পাত্রে চ" হওয়া চাই। যে সকল ভাল লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা উপকার পাইয়াছেন তাঁহারা কি উহাঁর প্রতি একান্তই ভক্তিমান নহেন? সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই ত ভাষার উপকার জন্য বিদ্যাসাগরে

ভক্তিমান। তবে, সকল অপাত্রগুলাই তাঁহার দান পাইলে সুপাত্র হইয়া পড়িবে এরূপ দুরাশা করিলে তাহা সফল হইবে কেন?

ভূদেব বাবু জীবনের সকল কার্য্যই নিখুঁতরূপে শ্রীভগবানের পূজাভাবে করিতেন। "যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং" তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলিয়াই তাঁহার মনে রাজভক্তি ও দেশভক্তি এবং স্বসমাজভক্তি ও অপর সমাজের প্রতি ভক্তি, এ সমস্তেই সুসামঞ্জস্য ছিল। তাঁহার সমস্তই যে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ মাত্র।

তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ আধুনিক বিবিয়ানীর ছাঁচ ছিল না। পুরাকালীন আদর্শ নারী চরিত্রই তাঁহার স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছিল।

গৃহশিক্ষকের নিকটে এবং তাঁহার নিজের কাছে মেয়েদের সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই মেয়েদের বাটনা-বাটা গৃহমার্জ্জন ও রন্ধন প্রভৃতি নিত্যকার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। এবিষয়ে তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রতি-যোগী পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে দিন যাহার রান্না সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে সেই সেদিন বাগানের সবচেয়ে বড় গোলাপ-ফুলটি মাথায় পরিতে পাইবে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষক ও পুরস্কার-দাতা তিনি নিজেই। কন্যা এবং নাতিনীদিগের বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার মত উদার ছিল। আধুনিক সংস্কারকদিগের মত উচ্ছৃ-ঙ্খল সমাজ সংস্কার তাঁহার অভিপ্রেত না থাকিলেও সুদূরদর্শী ধীর জনোচিত ধীরে ধীরে সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর পথে তাঁহার গতিকে চালিত করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হন নাই।

এই জন্য মেয়েদের বিবাহে মেলবন্ধন ত্যাগ করিয়া চারি কন্যাকে —তাঁহার নিজের মেল খড়দহ—ভিন্ন ভিন্ন মেলে প্রদান করিয়া

ছিলেন। এবং ধনবান্ পাত্র না খুঁজিয়া বিদ্বান্ দরিদ্রকেও সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বারাসতের বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২য় বারের বি এ এবং ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট—১৮৭২ নবেম্বরের বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ইহাঁর প্রবন্ধ "প্রিভিলেজড অফেণ্ডার্স" অনেক ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল) পণ্ডিতরত্নী মেলের, দ্বিতীয় জামাতা উত্তরপাড়ার বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল (ইনি হাইকোর্টের উকিল এবং উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহাঁর পুত্র বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ বিশ্বনাথ ট্রষ্টের সভ্য ছিলেন) এবং তৃতীয় জামাতা সুবর্ণপুরের শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি এল (ভগলপুরের উকিল এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি) দুজনেই ফুলে মেলের এবং ৪র্থ জামাতা বারাসতের বাবু সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ বি এল (ইনি বাঙ্গালায় সরল বেদান্ত দর্শন প্রণেতা, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেন) ভূদেব বাবুর ন্যায় খড়দহ মেলের ছিলেন।

কন্যাপণের সম্বন্ধে যেমন অনেক শিক্ষিত ও ধনিলোকেও আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহার মত সেরূপ ছিল না।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥" এই শাস্ত্রবাক্যের পুরা শ্লোকটিই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন কন্যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নৈসর্গিক দাবীর টাকাটা ধনরত্নে একেবারে দেওয়ার বিধিই উৎকৃষ্ট বিধি। বিষয়ের অংশ দেওয়াও ভাল নয় এবং তোমার কন্যা পরের বাড়ীতে ভরণ পোষণ জন্য যাওয়ার সময় তাহাদের ভাঁড়ারে উপযুক্তরূপ জমা দেওয়াই সঙ্গত। তিনি পুত্রদিগের বিবাহে কিছু চাহিতেন না। অন্য বিষয়ে মত হইলেই হইত।

যেরূপভাবে শিক্ষা দান করিলে শিশুদিগের চিত্তে সমধিক পরি-

আগে কার্য্য করিবে তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন, এমন যেন আর দেখা যায় না।

ভোরে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে শুচিভাবে গৃহদেবতার আরাধনার্থ তপোদ্যানে তাঁহার সম্মুখে পুষ্পচয়ন করিয়া সাজি হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় তাঁহার গৃহশিশুগুলিকে পুণ্য তপোবনবাসী ঋষির শান্ত ও স্মিতদৃষ্টিপূত তপস্বী কুমার কুমারীরই মতন দেখাইত।

ফুলতোলা হইয়া গেলে সব শিশুগুলি একত্র হইয়া তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া চুম্বন প্রাপ্তে তাঁহার সম্মুখে সারিবাঁধিয়া নম্রমুখে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যদলের মত নিঃশব্দে দাঁড়াইত এবং তারপর তিনি আদেশ করিলে সমকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহার আশ্রমতুল্য গৃহকে কিছু ক্ষণের জন্য গম্ভীর শব্দঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া তুলিত। দেবতার সম্মুখে সাধকের মত দাদাবাবুর সম্মুখে দুষ্ট ছেলেটিও অশান্ত হইতে পারিত না। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে এমনিই ভক্তি ও বাধ্যতার শক্তি ছিল।

চাণক্য শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেবদেবী ধ্যান প্রণাম ও গীতা উপনিষদের পর্য্যন্ত সরলার্থ সুমিষ্ট শ্লোক নির্ব্বাচিত ছিল। চাণক্য শ্লোকগুলির মধ্যে যে গুলিতে রাজনৈতিক কৌশল মাত্র আছে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি প্রণোদিত নহে, সেগুলি বাদ দেওয়া ছিল। শ্লোকশিক্ষার সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি শিক্ষিতব্য বিষয়টি কাগজে লিখিয়া দিতেন না, তাহা অপেক্ষাকৃত মেধাবী কোন বালক বা বালিকাকে (যাহার সবচেয়ে শীঘ্র মুখস্থ হয়) শিখাইয়া দিতেন, সে আবার অন্য ছেলেদের শিখাইত। ইহাতে একটি সুফল ফলিত এই যে, সকলেই এই সম্মান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিত। ভূদেব বাবু নিজে হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বে পিতার

নিকট হইতে অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেইগুলি পিতৃসমীপে আবৃত্তি করিতেন। ঐ শ্লোকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটির অর্থ বুঝাইয়া দিলে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, এবং সেই শৈশব হইতেই বংশের সুপুত্র হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

"একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্‌বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।"

সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন ভারতবর্ষের উন্নতি নাই ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া ছিলেন বলিয়াই তিনি সংস্কৃত শিক্ষাদানের উন্নতিকল্পে অত টাকা দিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজের ঘরেও সেই আদর্শ স্থাপন করিয়া অন্যকে দৃষ্টান্ত দেখাইবার সুযোগ দিবার জন্যও তিনি একান্ত উৎসুক ছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পৌত্রদিগের মধ্যে কোন একটি অর্থকরী রাজবিদ্যার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত হইয়া বংশের গৌরব রক্ষা করে, দেশের উপকারে লাগে, এই ইচ্ছা তিনি পুত্রদের কাছে প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের তৃতীয় পুত্র পরম সুন্দর মূর্ত্তি সোমদেব তাহার অত্যন্ত শৈশবেই তাহার পিতামহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি উদ্রেক করিতে সক্ষম হওয়ায় ও তিন বৎসরে তাহাকেই পরমহংস স্বামী ভাস্করানন্দ জীউ বাড়ীর সকল ছেলের মধ্যে এই কার্য্যের জন্য যোগ্যতম বলায় দেবোদ্দেশে সুগন্ধি পুষ্পটীর মত তাহাকে তাহার দেশের, সমাজের ও বংশের মঙ্গলের জন্য মনে মনে তাহার শৈশবেই উৎসর্গ করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্বামীজি বলিয়াছিলেন ইংরাজি শিক্ষার অপেক্ষা প্রকৃত উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সূক্ষ্মতর বুদ্ধির এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের ও সংযত ভাবের একান্তই প্রয়োজন। সোমদেব তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথই যে উচ্চতর পথ তাহা সম্পূর্ণ

রূপে বুঝিয়া তাহার দুর্ব্বল শরীরেই সানন্দে ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা, এণ্ট্রান্স ও ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করে এবং মধ্যপরীক্ষার এবং সংস্কৃত অনার লইয়া বি এ পরীক্ষার জন্য পড়িতে ছিল। মন প্রশস্ত, কার্য্য সুসংযত, ও একান্তই পরার্থজীবন ছিল। রোগের সেবায় এবং অপরের কার্য্যে সোমদেব সকলের অগ্রণী ছিল। রুগ্ন হইয়া পড়ায় স্থান পরিবর্ত্তন ও চিকিৎসা উপলক্ষে সাধুসঙ্গ ও তীর্থদর্শন লাভ হইয়াছিল। ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী, তাঁহার গুরু শ্রীমৎ কেশবা-নন্দ স্বামী, পরমহংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামিজীর গুরু পণ্ডিত অনন্তরাম, ৺ কাশীর কুরুক্ষেত্রনিবাসী শ্রীমৎ মাগনি রাম, স্বামী ও আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্যাল মহাশয় সকলেই বলিয়াছিলেন যে, সংযত, সুশিক্ষিত, একান্ত ধীরস্বভাব ঐরূপ যুবক দলেরই এখন দেশের জন্য প্রয়োজন। সোমদেব নিজের কাজ ঠিক ঠিক করিত। কাহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিত না। ধৃষ্টতায় তাহার একান্তই উপেক্ষা ছিল। কেহ তাহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। কেহ কিছু বলিয়াছে বা কেহ কিছু করিবে শুনিলে সকলকেই উপদেশ দিত "বলুগ্‌গে", "করুগ্‌গে"। জন্ম চুঁচুড়ায় ২৬।১।১৮৯০। দেহত্যাগ ৺ কাশীতে ১৮।১৯১০ খৃঃ)।

ভাল ভাল হিন্দু পরিবারের মধ্যে উপযুক্ত ছেলে বাছিয়া ঐরূপ আদর্শে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিতে থাকিলেই ভারতে অত্যুচ্চ শিক্ষার ও সংস্কারের বীজ রক্ষিত হইতে পারিবে। সেই চেষ্টাই বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

তাঁহার দাম্পত্য জীবনের সম্বন্ধে এই খানে সামান্য একটি উদাহরণ দিলেই তাঁহার পিতৃভক্তি ও কর্ত্তব্যশিক্ষাদানপ্রণালী সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

একবার তাঁহার বাড়ীতে কৃষ্ণনগরের সরভাজা আনাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী হাঁড়ী হইতে তাহা বাহির করিয়া তাঁহাকে জল খাইতে দিলে ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাকে দেওয়া হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "তাঁহার জলখাবার সময় তাঁহাকে দিব।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "ঠাকুরের জন্য অগ্রে কোন কিছু দ্রব্য তুলিয়া রাখার ন্যায় আমাদিগকে দিবার আগে বাবার জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়াছ কি না?" তাঁহার পত্নী মিথ্যাকথা জানিতেন না; ত্রুটি বুঝিয়া সঙ্কুচিতা হইয়া বলিলেন "না, স্বতন্ত্র তাঁহার জন্য রাখা হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু জল খাবার ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন "এমন যেন আর কখন হয় না"। তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তাঁহার পত্নীও তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধে তাঁহার সুখকর গার্হস্থ্য জীবনের অনেক কথাই আছে। একবার ভূদেব বাবু অনেক টাকা কাহাকেও বিনা লেখা পড়ায় ধার দেওয়াতে তৎসম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে বলিয়াছিলেন, "যাহা যাহা বলিতেছ সত্য বটে, এরূপ করিয়া ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি যখন বলিয়াছেন তখন ত করিতেই হইবে, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবে না।" স্বামীর ধর্ম্ম পালনের সহায়তা করাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য। ভূদেব বাবুর বাড়ীতে তাঁহার অতি সামান্য বিষয়ের অনুজ্ঞাও নিখুঁতরূপে পালিত হইত। "তিনি বলিয়াছেন এখনও হয় নাই!" গৃহিণীর এই রূপ সাগ্রহের ও সযত্নের অনুজ্ঞা পালন চেষ্টা দেখিয়া গৃহের সকলেই সেই ভাবে কাজ করিত।

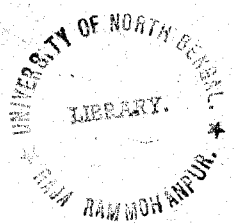
সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভূদেব বাবুর জীবন প্রকৃত আদর্শ জীবন। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার প্রতি নিয়ত ভক্তি, বাল্যাবস্থায় রুগ্নশরীর হইলেও অসাধারণ অধ্যবসায়সহ অধ্যয়ন,

পরিবার প্রতিপালনে ও তাঁহাদের অন্নসংস্থানে যত্ন, সহধর্ম্মিণীকে আপনার উচ্চ আদর্শে গড়িয়া লওয়া, পুত্রদিগকে সুশিক্ষাদান, কন্যা ও পৌত্রীদিগকে সৎপাত্রে প্রদান, বন্ধুবর্গের সহিত যাবজ্জীবন সমসৌহার্দ্দ্য, আত্মীয় স্বজনের এবং পরিচিতদিগের পীড়ায় চিকিৎসার সাহায্য এবং সকলকেই সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান, কর্ত্তব্য বোধে একান্ত দৃঢ়ভাবে স্বদেশী শিল্পের পোষণ, কাহার সহিত কখন বিবাদ না করা, মাতৃভাষার প্রতি চিরকাল অনুরাগ, পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতায় বিদেশীয় ইংরাজের শ্রদ্ধা উৎপাদন, হৃদয়ে স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপোষণ, আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতীয় দিগের প্রতি একান্ত প্রীতি বশতঃ তাঁহাদের সুশিক্ষার জন্য বাক্য ব্যবহার ও লিপিদ্বারা শেষাবস্থাপর্য্যন্ত অতুলনীয় যত্ন, পত্নীবিয়োগের পর দ্বাবিংশতিবর্ষকাল পুত্র কন্যা বধূ প্রভৃতির প্রতি মাতা পিতা উভয়েরই কার্য্য সুচারুরূপে পালন, নিজ সমাজের প্রাণস্বরূপ অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের রক্ষার জন্য সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দান, কখন অসাধুতার সহিত সংস্রব না রাখা, সকল অবস্থাতেই সুদৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রণোদিত থাকা, তাঁহার সুগভীর দেশহিতেচ্ছা প্রণোদিত এবং অচিন্তনীয় দূরদৃষ্টি সংযুক্ত রচনা এবং তাঁহার সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং ধর্ম্মপ্রাণ জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে, তিনি সংসারের সকল বিষয়েই যথাযথ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল বিষয়েই আমাদের সমাজের অনুকরণীয় পুরুষ।

স্বসমাজের "প্রকৃত" হিত কোথায় তাহা তিনি "জ্ঞানচক্ষে" দেখিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি আধুনিক সকলের অপেক্ষাই বড়। তিনি স্বধর্ম্মত্যাগ বা যাহাতে সমাজ মধ্যে নূতন নূতন সম্প্রদায় বা দল বাড়িয়া অন্তর্বিচ্ছিন্ন সমাজের বল আরও হ্রাস হইতে পারে এমন কোন কার্য্যকে ভাল মনে করেন নাই। হিন্দু সমাজের

সংস্কার "আমরা অধিকতর হিন্দু অর্থাৎ অধিকতর উদারহৃদয়, সদাচারী, আত্মসংযমশীল এবং স্বসমাজের মুখাপেক্ষী হইলেই সাধিত হইবে" এই মহান্ তথ্য তিনিই বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভারত সমাজের জীবন রক্ষার উপযোগী ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও স্বদেশ বাৎসল্যের মহামন্ত্র প্রচার করিয়া এদেশে "গৃহস্থের আদর্শ চরিত্র" দেখাইয়া গিয়াছেন বলা যাইতে পারে। এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থাবলী এবং জীবনচরিত্র একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে হয়।—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
মহতাং চরিতংতস্মাৎ বেদিতব্যং বিশেষতঃ॥


UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.
RAJA RAMMOHANPUR.



(স্বাক্ষর) শ্রীভূদেবমুখোপাধ্যায়।

দলিলদাতা—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, পিতা ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ বাসস্থান—চুঁচুড়া, পরগণে—আর্সা, জেলা—হুগলী।

আমার অর্জ্জিত ধনের মধ্যে যে ১,৫০,০০০ দেড় লক্ষ টাকা এক্ষণে নিম্নলিখিতরূপে নিয়োজিত (ইনভেষ্ট) হইয়াছে অর্থাৎ (১) বাউড়িয়া কটন মিল কোম্পানীর ইং ১৮৯২ সালের ২২শে এপ্রেল তারিখের শতকরা ৫৷৷০ সুদি ৭ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চর যাহা ইং ১৯০২ সালের ২২শে এপ্রেল তারিখে পরিশোধ্য তাহার ৩৩৭ নং হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৬১ নং পর্য্যন্ত ২৫ খণ্ড ও ৪০১ নং হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০ নং পর্য্যন্ত ১০০ খণ্ড—সর্ব্বশুদ্ধ ১২৫ খণ্ড প্রত্যেকে ১০০০৲ এক হাজার টাকা করিয়া, ও (২) কলিকাতা পোর্ট ট্রষ্টের ইং ১৮৮১ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ৮০২।৫৩৯ নম্বরের ২৪ হাজার টাকার ডিবেঞ্চর (ইং ১৮৮১ সালের লোন শতকরা ৪৷৷০ টাকা সুদি), ১৮৮৩ সালের ১লা এপ্রেল তারিখের ১৮৮৮।১৭৬৭ নং ১০০০ এক হাজার টাকার ডিবেঞ্চর (১৮৮৩ সালের লোন শতকরা ৪৷৷০ টাকা সুদি) ঐ দেড় লক্ষ টাকা এবং আমার স্থাপিত বুধোদয় যন্ত্র এবং গবর্ণমেণ্ট

হইতে প্রাপ্ত স্বত্ব এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্র এবং ঐ টাকার ও যন্ত্রের এবং সংবাদ-পত্রের বর্ত্তমান ও ভাবী উৎপন্ন ও আমার সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক ও চিকিৎসা পুস্তক, সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার উন্নতি ও বিনা ব্যয়ে সাধারণের সুচিকিৎসা এবং অন্যান্য দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য আমি কয়েকটি ট্রষ্টির হস্তে অর্পণ করিয়াছি। ঐ সম্পত্তির মোট মূল্য এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। ঐ ট্রষ্টিগণ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী ট্রষ্টীগণ যে যে প্রণালীতে ও নিয়মে নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইবেন ও উক্ত ট্রষ্টের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি, যথা—

১। ঐ ট্রষ্টফণ্ডের নাম বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড হইবে।

২। ঐ ট্রষ্ট ফণ্ডের টাকা হইতে ট্রষ্টিগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট বা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চর বা পোর্ট ট্রষ্ট ডিবেঞ্চর কিম্বা ... কোন ব্যবসা বা কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ... ী থাকিবেন, সেই কার্য্যে বা ব্যবসায়ের সেয়ার কিম্বা ডিবেঞ্চর অথবা সকল ট্রষ্টীর একমত হইলে, কোন ল্যাণ্ডমর্টগেজ লোনের ডিবেঞ্চর এবং যে জমিদারী পত্তনি বিলি থাকিবে, বা যে জমিদারী ক্রয় করিয়া পত্তনি বিলি করিবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্নেই হইয়া যাইবে, বা পত্তনি বা লাখরাজ সম্পত্তি যাহার বিলি (সব লেটের) বন্দোবস্ত তৎকালেই হইয়া যাইবে, ঐরূপ ভূসম্পত্তি ক্রয়

করিতে পারিবেন। অন্য কোনরূপে ঐ টাকা নিয়োজিত (ইনভেষ্ট) হইতে পারিবে না।

৩। ঐ ট্রষ্টফণ্ড সম্বন্ধে সহর কলিকাতার বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে অথবা যদি কস্মিনকালে গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন তাহাতে বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড নামে একটি পৃথক করেণ্ট একাউণ্ট হিসাব খুলিতে হইবে, ফণ্ডের সমস্ত আয় ঐ করেণ্ট একাউণ্টে জমা দিতে হইবে ও খরচের জন্য তাহা হইতে চেক দ্বারা টাকা বাহির করা হইবে। ঐ ফণ্ডের মজুত টাকা ঐ ব্যাঙ্কের করেণ্ট বা ডিপজিট একাউণ্টে জমা রাখিতে হইবে। ফণ্ডের গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট, ডিবেঞ্চর সেয়ার ও সম্পত্তির দলিলাদি ঐ ব্যাঙ্কে (সেফ কাষ্টডি) নিরাপদার্থ জমা থাকিবে, এবং ট্রষ্ট ফণ্ডের সুদ ডিবিডেণ্ড আদি বাহির করিয়া করেণ্ট একাউণ্টে জমা দিবার জন্য ট্রষ্টীগণ এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ২য় দফার নিয়মানুসারে ফণ্ডের জন্য ভূসম্পত্তি খরিদ হইলে ট্রষ্টিগণ প্রয়োজনমত কারপরদাজ নিযুক্ত করিয়া টাকা আদায়াদি কার্য্য সামান্য ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন অথবা আবশ্যক বোধ হইলে উপরোক্তরূপে ক্রীত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব আদায় ভার গবর্ণমেণ্টের বা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করিয়া সেই উপস্বত্ব হইতে এই ট্রষ্টের কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

৪। ঐ করেণ্ট হিসাব হইতে ঐ ফণ্ডের টাকা বাহির করিতে হইলে ঐ ফণ্ডের ট্রষ্টিদের

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি—উভয়ের স্বাক্ষরিত চেক দ্বারা বাহির করিতে হইবে। যদি কোন সময়ে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি উভয়ের চেক স্বাক্ষর করা সুবিধা না হয় তাহা হইলে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে একজন এবং ট্রষ্টীদের অপর একজন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া ঐ টাকা বাহির করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্ক হইতে ট্রষ্টফণ্ডের গচ্ছিত রাখা টাকা, সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চর ও দলিল ফেরত লইতে হইলে সমস্ত ট্রষ্টীদের স্বাক্ষর দ্বারা বাহির করা হইবে।

৫। ঐ ট্রষ্টফণ্ডের আয় ভবিষ্যতে যাহাতে কমিতে না পায় এবং ট্রষ্টের কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তার হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এবং হঠাৎ কোন প্রয়োজন হইলে তাহা তৎসময়ে নির্ব্বাহ হইবার জন্য ঐ ফণ্ডের উপস্বত্বের এক পঞ্চমাংশ রিজার্ভ ফণ্ডস্বরূপ থাকিবে। রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা দুই বৎসরান্তে মূলধন (ক্যাপিটাল) ভুক্ত হইয়া যাইবে। রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা সম্বন্ধেও এই দলিলের সমস্ত নিয়ম খাটিবে।

৬। উক্ত ফণ্ডের উপস্বত্বের অবশিষ্ট চারি-পঞ্চমাংশ হইতে ট্রষ্টীগণ আমার পিতৃদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ও মাতৃদেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় বজায় রাখিবেন। নিম্নে প্রকাশিত নিয়মমত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বৃত্তি দিবেন।

৭। উক্ত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠিতে মাসিক অন্যূন ২০ টাকা বেতনে একজন অধ্যাপক এবং অন্যূন বার্ষিক ৩০ ত্রিশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়া অন্যূন পাঁচটি ছাত্র রাখিতে হইবে এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের থাকিবার জন্য পৃথক বাড়ী দিতে হইবে।

৮। ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ের জন্য ঐরূপ পৃথক বাড়ী দিতে হইবে। তাহার একাংশে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাসিক অন্যূন ১০৲ টাকা বেতনে রাখিতে হইবে, ও ঔষধাদি ক্রয় জন্য প্রয়োজন মত টাকা দিতে হইবে। এবং অপরাংশে মাসিক অন্যূন ১০ টাকা বেতনে একজন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক রাখিতে হইবে এবং ঔষধ ক্রয়, সংগ্রহ ও প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজন জন্য বার্ষিক অনধিক ২৫০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। ঐ ঔষধালয়ে সমাগত রোগীদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ ও ঔষধ বিনামূল্যে বিতরিত হইবে।

৯। উক্ত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে ও ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ে যে অধ্যাপক ও ডাক্তার এবং কবিরাজ ও ঐ ট্রষ্টফণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অন্যান্য যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন বা হইবেন তাঁহারা ট্রষ্টীদের সম্পূর্ণরূপ অধীন থাকিবেন এবং ট্রষ্টীগণ প্রয়োজন মত তাঁহাদের সকলকেই নিয়োগ ও পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

১০। ট্রষ্টিগণ বুধোদয় যন্ত্রের কার্য্য উপযুক্ত বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া চালাইবেন। ঐ যন্ত্রে যে লাভ হইবে তাহার প্রয়োজন মত অংশ এবং আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত বৎসরে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার করিবেন। এডুকেশন গেজেটও ঐ যন্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবে। তদ্ভিন্ন ঐ ছাপাখানার অপরাপর পুস্তক ছাপা, যবওয়ার্ক প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য করিয়া ব্যবসায় চলিবে। ট্রষ্টীগণ সুবিধা বিবেচনা করিলে ঐ ছাপাখানার লভ্য হইতে উহার উন্নতি করিতে পারিবেন এবং যদি উক্ত ছাপাখানা রাখা সুবিধা-জনক না হয় তাহা হইলে ঐ ছাপাখানা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা ট্রষ্টফণ্ডে জমা দিবেন।

১১। ট্রষ্টীগণ এডুকেশন গেজেটের জন্য উপযুক্ত বেতনে একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন, এবং উক্ত সম্পাদক ট্রষ্টীদের অধীনে তাঁহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। ঐ কাগজ এ পর্য্যন্ত রাজনীতি বিষয়ে যে প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে সেই প্রণালীতেই চলিবে। ঐ কাগজ চালাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ঐ ফণ্ডের উপস্বত্ব হইতে বৎসরে ৮০০ টাকা পর্য্যন্ত ট্রষ্টীগণ দিতে পারিবেন। এক্ষণে ঐ কাগজের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে আমি মাসিক ৩০০ টাকা সাহায্য পাইয়া আসিতেছি। আমি ভরসা করি যে আমার লোকান্তর হইলে ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট

আমার নিযুক্ত ট্রষ্টীদিগকে দিয়া সাহায্য করিবেন। কিন্তু যদি কোন কারণে কোন সময়ে গবর্ণমেণ্ট ঐ সাহায্য বন্ধ করেন এবং ঐ কাগজের মূল্যদাতা গ্রাহক সংখ্যা ২০০ দুই শতেরও কম হইয়া যায়, তাহা হইলে ট্রষ্টীগণ ঐ কাগজ উঠাইয়া দিতে পারিবেন বা উহার গুড উইল বিক্রয় করিয়া উৎপন্ন টাকা ট্রষ্টফণ্ডে জমা দিবেন।

১২। উক্ত বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ডের উপস্বত্ব হইতে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ও ব্রহ্মময়ী ভেষাজালয়ের ও বুধোদয় যন্ত্রের ও এডুকেশন গেজেটের উল্লিখিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া এবং এই দলিলের ১৪ দফার লিখিত মত এষ্টাবলিসমেণ্ট খরচ ও বাজে খরচ হইয়া যে টাকা থাকিবে তাহা হইতে যে সকল টোলে শ্রুতি, স্মৃতি বা দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপিত হয় তাহার অধ্যাপকদিগের মধ্যে মনোনীত করিয়া প্রত্যেককে বর্ষে বর্ষে অন্যূন ৫০ টাকা করিয়া এবং শ্রুতি ও স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নকারী ছাত্রদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া প্রত্যেককে বর্ষে বর্ষে অন্যূন ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিতে হইবে। এক্ষণে অধ্যাপকদিগকে আমি ঐরূপ দশটী বৃত্তি দিতেছি। ট্রষ্টিগণ এই ট্রষ্টের নিয়ম অনুসারে ঐ দশটী বৃত্তি দিবেন এবং ফণ্ডের আয় অনুসারে তদতিরিক্ত অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবেন। এই বৃত্তিগুলি বিশ্বনাথ অধ্যাপক বৃত্তি ও বিশ্বনাথ ছাত্রবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইবে। সকল বৃত্তিই এক বৎসরের জন্য দেয়, কিন্তু যে

অধ্যাপক বা ছাত্র এক বৎসর বৃত্তি পাইবেন তাঁহার বিশেষ দোষ না দেখিলে ট্রষ্টীগণ পর-বৎসরও তাঁহাকেই ঐ বৃত্তি দিতে পারিবেন, কিন্তু অধ্যাপক অধ্যাপনা এবং ছাত্র পাঠত্যাগ বা সমাপ্ত করিলে অথবা কোন গুরুতর দোষে দোষী হইলে আর তাঁহাকে বৃত্তি দিতে পারিবেন না। অধ্যাপক টোলে একাকী না পড়াইয়া যদি স্কুলের ন্যায় অপরের সহিত একত্রে অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে বৃত্তি পাইবার পক্ষে তাঁহার কোন ব্যাঘাত হইবে না। উক্ত বিশ্বনাথ ছাত্রবৃত্তি ভারতবর্ষের যে কোন স্থান নিবাসী ছাত্র পাইতে পারিবেন, কিন্তু ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা কাশীতে বা নাসিক বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থানে বেদান্ত দর্শন শিক্ষা করিবেন, বৃত্তি দিবার সময় ট্রষ্টীগণ তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিবেন। ট্রষ্টিগণ বৃত্তি দিবার জন্য বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে উপযুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্র অনুসন্ধান করিবেন। কোন এক জিলাতে বদ্ধ থাকিবেন না।

১৩। ট্রষ্টিগণ প্রয়োজন বিবেচনা করিলে টোল ও ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান জন্য একজন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ঐ কার্য্য জন্য এই ফণ্ডের উৎপন্ন আয়ের শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক ব্যয় করিতে পারিবেন এবং তাদৃশ নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা আবশ্যক মত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর কার্য্যও করাইতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ আবশ্যক মত অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের সাহায্যার্থ সংস্কৃত পুস্তক দান করিতে পারিবেন।

১৪। এই ফণ্ডের উৎপন্ন আয় হইতে ট্রষ্টীগণ তাঁহাদের আফিস এষ্টাবলিসমেণ্ট খরচ ও অন্যান্য বাজে খরচ করিতে পারিবেন, কিন্তু বার্ষিক আয়ের শতকরা পাঁচ টাকার অধিক ঐ দুই বিষয়ে ব্যয় করিতে পারিবেন না। তাঁহারা প্রথমতঃ ৫ দফার লিখিত মত রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা হইতে যদি কোন বিশেষ কারণে টাকা খরচ হইয়া থাকে তবে সেই টাকার পূরণ করিয়া অবশিষ্ট টাকায় উপরিলিখিত ব্যয় সমস্ত নির্ব্বাহিত করিয়া যদি কোন টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ঐ ট্রষ্টফণ্ডে জমা করিয়া দিবেন।

১৫। এই দলিল অনুসারে ঐ বিশ্বনাথফণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ (ম্যানেজ) করিবার জন্য আমি আমার পুত্র শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় বি, এল, ও শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, এবং গোঁদলপাড়ানিবাসী ৺ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবর্ণপুর নিবাসী ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ও বারাসত নিবাসী শ্রীকৈল'সচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এবং উত্তরপাড়া নিবাসী ৺ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কে উক্ত বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের ট্রষ্টী ও উক্ত শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়কে ট্রষ্টীদিগের সভাপতি ও শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়কে ট্রষ্টীদিগের সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছি।

১৬। উক্ত সভাপতি শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার পরবর্ত্তী সভাপতি এবং অতিরিক্ত দুইজন ট্রষ্টী, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার পরবর্ত্তী সহকারী সভাপতি এবং অতিরিক্ত দুইজন ট্রষ্টী এবং অপর ট্রষ্টীগণ স্বীয় স্বীয় পরবর্ত্তী এক একজন ট্রষ্টী মনোনীত করিতে পারিবেন। এইরূপে ট্রষ্টী সংখ্যা দশজন পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। যদি কেহ কোন নাবালককে তাঁহার পরবর্ত্তী ট্রষ্টী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা করিতে পারিবেন। যদি কেহ স্বীয় পরবর্ত্তী সভাপতি, কি সহকারী সভাপতি, কি ট্রষ্টী মনোনীত না করিয়া লোকান্তরিত হন বা ট্রষ্টির কার্য্য হইতে অবসর লয়েন, তাহা হইলে অপর ট্রষ্টীগণ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভোটের দ্বারা নূতন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি বা নূতন ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি কেহ কোন নাবালককে তাঁহার পরবর্ত্তী সভাপতি বা সহকারী সভাপতি বা ট্রষ্টি মনোনীত করিয়া অপসৃত হন তাহা হইলে উক্ত নাবালক যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবে সেই পর্য্যন্ত তাহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য অপর ট্রষ্টীগণ প্রতিনিধি সভাপতি বা প্রতিনিধি সহকারী সভাপতি বা প্রতিনিধি ট্রষ্টি নিযুক্ত করিবেন, পরে উক্ত নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি তৎকালে ট্রষ্টিগণ তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার নির্ব্বাচিত পদাভিষিক্ত হইবেন। ট্রষ্টি মনোনীত

করিবার সময় আমার পিতা ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সন্তান সন্ততিদিগের বংশে (descendants in the male or female line) যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই অগ্রে মনোনীত করিবেন। উত্তরকালে মনোনীত যে ট্রষ্টি ঐ বংশীয় অর্থাৎ আমার পিতা মহাশয়ের সন্তান সন্ততি বংশীয় (descendants in the male or female line) না হইবেন তিনি বরাবরই অস্থায়ী (temporary) বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ঐ বংশীয় বয়ঃপ্রাপ্ত কেহ ট্রষ্টী হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে ট্রষ্টিগণ অধিকাংশের ভোটে যদি উহাঁকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে তাৎকালিক অস্থায়ী (temporary) ট্রষ্টির স্থলে তাঁহাকেই ট্রষ্টি নিযুক্ত করিবেন। এই দফার কথিত উপযুক্ততা সম্বন্ধে ট্রষ্টি দিগের মতই চূড়ান্ত হইবে। ট্রষ্টির সংখ্যা ৬ জনের কম বা ১০ জনের অধিক হইবে না। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বী বা স্ত্রীলোক কেহ ট্রষ্টি হইবেন না ও কোন ট্রষ্টী সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ট্রষ্টীর পদ হইতে চ্যুত হইবেন।

১৭। ট্রষ্টীগণ সময়ে সভা করিয়া উক্ত ট্রষ্টফণ্ড সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় মীমাংসা করিবেন। ট্রষ্টীদিগের মধ্যে দুইজন উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য চলিবে। অনুপস্থিত সভ্যগণ পত্র দ্বারায় তাঁহাদিগের ভোট দিতে পারিবেন অথবা সভায়

যে সভ্যগণ উপস্থিত হইবেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারায় ভোট দিতে পারিবেন। ঐ ট্রষ্টফণ্ড সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই, যাহার সম্বন্ধে সকল ট্রষ্টীর একমত হইবার বিশেষ বিধি নাই, ট্রষ্টীদিগের অধিকাংশ ভোট অনুসারে মীমাংসিত হইবে। এক্ষণকার সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি প্রত্যেকের দুইটী করিয়া ভোট দিবার ও অপর মেম্বরদিগের প্রত্যেকের একটী করিয়া ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু ১৬ দফার নিয়মানুসারে যে সকল সভাপতি, সহকারী সভাপতি বা ট্রষ্টী উত্তরকালে মনোনীত হইবেন তাঁহাদের সকলেরই একটী করিয়া ভোট থাকিবে। মিটিংএ সভাপতি উপস্থিত থাকিলে তিনিই আসন গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত অপর সভ্যগণ তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করিবেন। সভায় যখন যিনি সভাপতি থাকিবেন, ভোটের সংখ্যা উভয়দিগের সমান থাকিলে তাঁহার কাষ্টিং ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। ট্রষ্টীগণ এই ট্রষ্ট ডীডের উদ্দেশ্যের ও ব্যবস্থার সানুকূলে আপনাদিগের কার্য্য চালাইবার উপযোগী নিয়মাবলী (rules of business) প্রস্তুত করিতে এবং প্রয়োজনমত ঐ নিয়মাবলী সকলের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে সম্পাদক (Secretary) নিযুক্ত করিবেন এবং উক্ত সম্পাদক উক্ত ফণ্ডের হিসাব সকল

প্রস্তুত করাইবেন এবং সভা অধিবেশনের সংবাদ দিবেন এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবেন।

১৮। আমার নিয়োজিত ট্রষ্টিগণ বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী ট্রষ্টিগণের মধ্যে যে কেহ ট্রষ্টির কার্য্য হইতে অবসর লইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি অপর ট্রষ্টিদিগকে জানাইয়া অবসর লইতে পারিবেন।

১৯। এক্ষণকার ট্রষ্টিদিগের পরবর্ত্তী ট্রষ্টি যাঁহারা হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরবর্ত্তী ট্রষ্টি উপরিলিখিত নিয়মানুসারে মনোনীত করিবেন। এইরূপে এই ট্রষ্ট ফণ্ড বজায় রাখিয়া চিরকাল ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত হইবেন ও কার্য্য করিবেন ও আমার নিয়োজিত ট্রষ্টী ও তাঁহাদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিদিগের যেরূপ ক্ষমতা দিলাম ও তাঁহাদের যেরূপ দায়িত্ব রহিল, ভবিষ্যতে যিনি যখন এই ফণ্ডের ট্রষ্টি বা সভাপতি বা সহকারী সভাপতি হইবেন, তাঁহার ঐরূপ ক্ষমতা থাকিবে ও ঐরূপ দায়িত্ব থাকিবে। কেবল ১৭ দফার নিয়মানুসারে উক্ত সভাপতি ও সহকারী সভাপতি একটি মাত্র করিয়া ভোট দিতে পারিবেন; দুইটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন না; এবং একজন মাত্র করিয়া ট্রষ্টি মনোনীত করিতে পারিবেন; একাধিকজন করিয়া মনোনীত করিতে পারিবেন না। এই দলিলের সমস্ত নিয়ম চিরকাল বলবৎ থাকিবে।

২০। ট্রষ্টিগণ কেহ কখন এই ট্রষ্ট ফণ্ড নষ্ট করিতে বা এই ফণ্ডের সম্পত্তি দান বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। কিন্তু আবশ্যকমত ২য় দফার নিয়মানুযায়ী এক্ ইনভেষ্টমেণ্টের পরিবর্ত্তে অন্য ইনভেষ্টমেণ্ট করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য যে বিক্রয়াদি আবশ্যক তাহা করিতে পারিবেন। ঐরূপ হস্তান্তর ট্রষ্টিগণের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে ট্রষ্টিদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

২১। যদি কোন সময়ে ট্রষ্টিগণ ট্রষ্টের কার্য্য ত্যাগ করেন বা অন্য কোন কারণে একজনও ট্রষ্টি না থাকে, তাহা হইলে আমার পিতা ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সন্তান সন্ততির বংশে (Descendant in the male or female line) যে কেহ বর্ত্তমান থাকিবেন তাঁহারা এই ট্রষ্ট ডীডের নিয়ম ও কার্য্য বজায় রাখিবার জন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হন তাহা হইলে আমার প্রার্থনা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া এই ট্রষ্টফণ্ড গ্রহণ করিয়া ট্রষ্ট ডীডের নিয়মানুসারে কার্য্য করেন।

২২। যদি কোন কারণে এই ট্রষ্ট অসিদ্ধ হয় বা এই ট্রষ্টের কার্য্য চালান না হয়, তাহা হইলে যে সময়ে ঐরূপ ঘটনা ঘটিবে তৎকালে ট্রষ্টফণ্ডে যাহা মজুত থাকিবে তাহা আমার ষ্টেটের সামিল হইবে এবং আমার যে কোন উত্তরাধি-

কারী তৎকালে বর্ত্তমান থাকিবে সে তাহা পাইবে।

ইতি তারিখ ২৩শে পৌষ, সংবৎ ১৯৫০, সন ১৩০০ সাল, ইংরাজী ৬ই জানুয়ারী ১৮৯৪।

সাক্ষিগণ

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
মহেশপুর, জেলা যশোহর, হাল সাকিম চুঁচুড়া।

শ্রীহরিনাথ স্মৃতিভূষণ ভট্টাচার্য্য
সেনহাটী, জেলা খুলনা, হাল সাকিম চুঁচুড়া।

শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য্য
নৈহাটী ২৪-পরগণা।

শ্রীনৃত্যগোপাল লাহিড়ী
শান্তিপুর জেলা নদীয়া, হাল সাকিম চুঁচুড়া।

শ্রীঅভয়চরণ সিংহ
খররা, জেলা নদীয়া, হাল সাকিম চুঁচুড়া।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL.
LIBRARY.
RAJA RAMMOHUNPUR.